বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪ - ১৯৭১

বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪ - ১৯৭১

১ম খণ্ড রাজনৈতিক ইতিহাস

২য় খণ্ড অর্থনৈতিক ইতিহাস

৩য় খণ্ড সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

বাংলাদেশের ইতিহাস
১৭০৪-১৯৭১

দ্বিতীয় খণ্ড

অর্থনৈতিক ইতিহাস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

দ্বিতীয় সংস্করণ

সম্পাদকের কথা

আমরা আনন্দিত ও গর্বিত যে, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) বিদ্বৎ সমাজে আদৃত হয়েছে। এর প্রথম সংস্করণ (শোভন ও সুলভ) নিঃশেষিত হয়েছে অল্প সময়ের মধ্যেই। গ্রন্থের ইংরেজি দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ আগে শুরু হওয়ায় এর বাংলা ভাষ্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে বিলম্ব ঘটেছে এবং এর ফলে বাজারে বেশ কিছুকাল বইটি অপ্রাপ্য ছিল। এজন্য বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ও সম্পাদকীয় পর্ষদ ও আমার পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি।

বর্তমান সংস্করণটি আরো সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে যেসব দিক অপর্যাপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে বা মোটেই আলোচিত হয় নি সেগুলি বর্তমান সংস্করণে নিরসনের চেষ্টা করা হয়েছে। যেসব লেখা পুনরাবৃত্তিমূলক বা কম প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হয়েছে সেগুলি প্রত্যাহার করে বেশ কয়েকটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। অন্যান্য অধ্যায়গুলো পর্যালোচনা করে আরো সাবলীল করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় যেসব লেখক, পর্যালোচক আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। একইসঙ্গে বাছাই প্রক্রিয়ায় যেসব পণ্ডিতের লেখা প্রত্যাহার করা হয়েছে তাঁদের প্রতি আমরা সবাই ক্ষমাপ্রার্থী।

মোট ৫১ জন পণ্ডিতের ৬৪টি লেখা নিয়ে বর্তমান সংস্করণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিন খণ্ডের এ সুবিশাল গ্রন্থ কতটুকু অবদান রেখেছে এর মূল্যায়ন প্রয়োজন। এ মূল্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় এখন পর্যন্ত গ্রন্থটি সুধি সমাজে সমাদৃত আছে বলে মনে হয়। এটা গ্রন্থের সঙ্গে জড়িত সকলের সাফল্য বলতে হবে।

বর্তমান সংস্করণের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিল, প্রকাশনা কমিটি ও গ্রন্থের সম্পাদনা কমিটির কাছে। তবে এ সংস্করণ প্রকাশনায় যিনি সর্বাধিক সময় দিয়েছেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য নিজ উদ্যোগেই দিনরাত পরিশ্রম করেছেন তিনি হলেন প্রকাশনা কনসালটেন্ট জনাব মোহাম্মদ ইবরাহিম। তিনি আমার নিজের কাজকে বহুলাংশে সোজা করে দিয়েছেন। তার প্রতি আমি সাতিশয় কৃতজ্ঞ। কম্পিউটার অপারেটর জুলফিকার আলী ভূট্টো ও দেলোয়ার হোসেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষ করে জুলফিকার আলী ভূট্টো অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরিতে। তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। এশিয়াটিক প্রেসের স্বত্বাধিকারী জনাব আবদুল হাই ও কামরুল হাই বইটি যেন সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় সেজন্য সব সময় তৎপর ছিলেন। গ্রন্থের সহ সম্পাদক অধ্যাপক সাজাহান মিয়া তার কর্তব্যনিষ্ঠা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

সম্পাদনা পর্ষদ

সূচিপত্র

১

অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট

সিরাজুল ইসলাম*

বাঙালি জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল দিক বোধ হয় তাদের অর্থনৈতিক জীবন ও কর্মকাণ্ড। কেন? রাজনৈতিকভাবে খুব অল্প সময়ই বাঙালিরা তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পেরেছে। সাংস্কৃতিকভাবে বাঙালিরা কখনোই বাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে নি। ব্রাহ্মণ্যবাদ, বৌদ্ধবাদ, ইসলাম এবং সকল বিজয়ী শাসক শ্রেণীর সংস্কৃতি বাঙালি সাংস্কৃতিক জীবনের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছে। বাঙালির অভ্যাস, আচার-প্রথা, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানাদিতে বিদেশী এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। কিন্তু একটি মাত্র ক্ষেত্রে বাঙালিরা ছিল বাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাঙালিরা ছিল চির স্বাধীন। বৃটিশ আধিপত্য বিস্তারের সময় এবং এর আগে সমগ্র বিশ্বে বাংলার পরিচিতি ছিল এবং সে পরিচিতির কারণ ছিল বাংলার শিল্পপণ্য। প্রাক-আধুনিক বিশ্ব বাংলার কোন রাজবংশের নাম বা এর সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানাদির কথা শোনে নি; শুনেছে, দেখেছে এবং সংগ্রহ করেছে বাংলার সূক্ষ্ম কারুপণ্য, বাংলার মসলিন। গ্রীক ঐতিহাসিক প্লিনির লেখায়ও বাংলার শিল্পপণ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার ইতিহাসে একটি লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বহির্বিশ্বে বাংলার পরিচয় ঘটেছে পাল, সেন, তুর্কী, পাঠান প্রভৃতি জাতি-গোষ্ঠীর শাসকশ্রেণী বা সমরনায়কদের দ্বারা নয়। সাধারণ কারিগরদের উৎপাদিত পণ্যই ছিল বহির্বিশ্বে বাংলার দূত। শৈল্পিক ও প্রযুক্তিগতভাবে বাংলার শিল্পপণ্যের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এদেশ রাজনৈতিকভাবে প্রায়শই বিদেশীদের করতলগত হলেও বিদেশী শাসনের প্রভাব কখনো গ্রাম পর্যায়ে এসে না

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পৌঁছানোর ফলে শিল্পপণ্যের কারিগররা ছিল বিদেশীদের প্রভাবমুক্ত। অতএব বাইরের প্রভাবমুক্ত পরিবেশে স্থানীয় কারিগরগণ বিভিন্ন শিল্পের, বিশেষকরে বয়নশিল্পের যে উৎকর্ষ সাধন করেছে তা স্থানীয় বাজারে তো বটেই, বিশ্ববাজারেও নন্দিত হয়। বিশ্ববাজারের সঙ্গে বাংলার যে সংযোগ তা কখনো কোন রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে বিনষ্ট হয় নি।

সতেরো ও আঠারো শতকে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক বাণিজ্যিক দেশসমূহের মাধ্যমে বাংলা বিশ্ববাজারের সঙ্গে একীভূত হলো—এ ধরনের মন্তব্য অবশ্যই ভিত্তিহীন। ইউরোপীয়রা এদেশে আসার আগে বাংলাদেশ বিশ্ববাজার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এমন যুক্তি দেয়া যায় না, কারণ বাংলার পণ্য ইউরোপে বাজারলাভ করেছে ইউরোপীয়রা এদেশে আগমনের বহু শত বছর আগে থেকেই। বস্তুত ইউরোপে বাংলার পণ্যের পরিচয় ছিল বলেই ইউরোপের বণিকেরা জলপথে এদেশে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করে, কারণ তুর্কী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংযোগকারী বাণিজ্যপথগুলি তুর্কী সম্রাটের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তুর্কী সরকার বাধ্যতামূলক বাণিজ্যকর আরোপ করলে ইউরাপীয়রা বিকল্প জলপথে প্রাচ্যের পণ্যলাভের চেষ্টা করে। সতেরো শতকে সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ আবিষ্কারের ফলে অধিক পণ্য ইউরোপে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা স্থলপথে সম্ভব ছিল না। যোগাযোগ বিপ্লবের আরেক দিক হচ্ছে বিপুলহারে মূল্যবান ধাতব আমদানি। পণ্যের পরিবর্তে ধাতব লাভ বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যের এক নতুন দিক। স্থলপথে বাণিজ্যিক লেনদেন হতো স্থানীয় মুদ্রায় বা পণ্যের পরিবর্তে পণ্যে। রপ্তানিবাণিজ্য থেকে মূল্যবান ধাতব লাভ করায় বাংলার অর্থনীতির জন্য খুলে গেল এক নতুন দিগন্ত।

নৌপথে বাংলা-ইউরোপ বাণিজ্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সামুদ্রিক বাণিজ্যপথগুলোতে জলদস্যুর উৎপাত থাকায় বাণিজ্যজাহাজগুলো নৌসেনার প্রহরায় যাতায়াত করতো। ঐ নৌসেনাই পরবর্তী সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে রাজ্যজয়ের জন্য। স্থানীয় শাসক শ্রেণীর উপর ইংরেজরা তাদের চাপ প্রয়োগ করতে পেরেছিল ঐ নৌবাহিনীর বলেই। বিশ্ব যোগাযোগব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলেই বিশ্বের সনাতন বাণিজ্যশক্তিগুলির মধ্যে সম্পর্কে নাটকীয় পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটে স্থানীয় রাজনীতিতে। এমনি একটি ঘটনা পলাশীর যুদ্ধ এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ। স্থানীয় ও বিশ্ব অর্থনীতির ইতিহাসে এসব ঘটনার রয়েছে গভীর তাৎপর্য। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, বাংলা সর্বপ্রথম পশ্চিমা বণিকদের মাধ্যমেই বিশ্ববাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলো।[১]

১. এ মতবাদের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ইমানুয়েল ওয়ালেস্টেইন (Immanual Wallerstein)। *The Modern World-System* (New York 1974, 1980, 1989) শিরোনামের গ্রন্থ সিরিজে তিনি অতি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন কিভাবে বিশ্বের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন এলাকা আঠারো ও উনিশ শতকে পুঁজিবাদী বিশ্বঅর্থনীতির মাধ্যাকর্ষণে বিলীন হয়ে পুঁজিবাদী শিল্পায়িত দেশসমূহের বাজারে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে তাঁর গবেষণার মূল্য অনেক। কিন্তু আঞ্চলিক পর্যায়ে তাঁর তত্ত্ব সবসময় পূর্ণভাবে খাটে না। বাংলার অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী বিশ্বঅর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে বিশ্লেষণ রয়েছে তাঁর সিরিজের তৃতীয় অংশে (১৯৮৯)। পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য, ১৩৯-৪০, ১৫৮-৫৯, ১৬৭-৮৭।

নৌপথে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়ায় শ্রেষ্ঠ অবদান রাখে পর্তুগীজেরা। নৌ-বাণিজ্যে পর্তুগালের সঙ্গে বাংলার প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয় ষোল শতকের শেষভাগে। কিন্তু অচিরেই পর্তুগীজেরা বাণিজ্যের চেয়ে জলপথে দস্যুবৃত্তিতে বেশি উৎসাহী হয়ে উঠে। বাংলায় ব্যাপক বাণিজ্য শুরু করে প্রথম ওলন্দাজেরা। সতেরো শতকে ওলন্দাজেরা বাংলা বাণিজ্যে প্রায় একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যে ওলন্দাজদের পরে শরিক হয় ফরাসী, ইংরেজ, ওস্টেন্ডার (বেলজিয়াম) ও অন্যান্য ইউরোপীয় নৌ-জাতি। মুগল সরকার এদের সবাইকে স্বাগত জানিয়েছে এদেশে বাণিজ্য করার জন্য। কারণ এর ফলে দেশের রপ্তানিবাণিজ্য অভূতপূর্ব প্রসারলাভ করে। আর যেহেতু বাংলাদেশ আমদানির চেয়ে রপ্তানি করতো অনেক বেশি, সেহেতু বাংলার পক্ষে বাণিজ্যউদ্বৃত্ত ছিল অনেক বেশি এবং সে উদ্বৃত্ত রপ্তানির ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশীরা আমদানি করতো বিপুল পরিমাণ সোনারূপা। নতুন বিশ্বে অর্থাৎ পশ্চিম গোলার্ধে যে সোনারূপা আহরিত হয়েছে, এর একটি বড় অংশ ইউরোপ হয়ে বাংলায় এসে জমা হতো। প্রতি বছর শত শত জাহাজ নোঙ্গর করতো কলকাতা বন্দরে। সেসব জাহাজের ব্যবসায়ীগণ বিশ্ববাজারে বিপণনের জন্য ক্রয় করতো বাংলার রকমারি পণ্যসামগ্রী। আর রপ্তানির বিনিময়ে মুগল সরকার লাভ করতো বিপুল পরিমাণ সোনারূপা।

রপ্তানিবাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত সোনারূপা দিয়ে এ দেশের সরকার ও জনগণ কি করতো? বিপুল রপ্তানির বিপরীতে মূল্যবান ধাতব আমদানি দেশের সমকালীন অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির উপর কি প্রভাব বিস্তার করেছে এর উপর বিশেষ তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গবেষণা এখনো তেমন হয় নি। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, আমদানিকৃত ধাতব দিয়ে মুগল সরকার মুদ্রা খচিত করতে সক্ষম হয় যার ফলে সাম্রাজ্যের অর্থনীতি পণ্য বদল অবস্থা থেকে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিতে উন্নীত হয়। কিন্তু এতে নিশ্চয়ই মূল্যবান ধাতবের সবচেয়ে উৎপাদনশীল ব্যবহার হয়েছে বলে মনে করার কারণ নেই। বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে অন্য যেকোন সস্তা ধাতব বা জৈব কিছু ব্যবহার করা যেতো, যেমন তামা, দস্তা, কড়ি, গাছের বাকল, কোন লতাপাতা বা অন্য কোন কিছু। কিন্তু রপ্তানির বিনিময়ে প্রাপ্ত মূল্যবান কোন ধাতব উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার না করে মুদ্রায় পরিণত করার সিদ্ধান্ত অর্থনৈতিকভাবে কতটুকু যথার্থ হয়েছে এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। রৌপ্যবিহীন মুদ্রায় বা অন্য ব্যবস্থায় এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। অতএব অর্থনীতিকে মুদ্রাভিত্তিক করার উদ্দেশ্যে দেশের রপ্তানিবাণিজ্য ইউরোপীয়দের হাতে তুলে দেয়া হলো বলে মনে করা বোধ হয় একপেশে চিন্তা হবে। মুগলদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল একটি বিরাট সেনাবাহিনী পোষা এবং এর জন্য রৌপ্য ছিল একটি অত্যন্ত সুবিধাজনক উপায়। কিন্তু রৌপ্যমুদ্রা সাধারণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করেছে বা সাধারণ মানুষ এর ফলে উপকৃত হয়েছে মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ

নেই। এটি সত্য যে, উৎপাদক শ্রেণী গঞ্জে রপ্তানিযোগ্য পণ্য বিক্রি করে হাতে কিছু নগদ রৌপ্যমুদ্রা পেয়েছে, কিন্তু ঐ মুদ্রা খাজনা আকারে আবার সরকার উঠিয়ে নিয়েছে। বিদেশ থেকে পাওয়া রৌপ্যের এক বড় অংশ রূপান্তরিত হয় অভিজাত শ্রেণীর গহনাপত্রে। দামি অলঙ্কার পরিধান আভিজাত্যের একটি প্রতীক। আভিজাত নারী-পুরুষ সবাই অঙ্গ সজ্জিত করতো নানা মূল্যবান ধাতবের গহনা দিয়ে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে ধাতবের এহেন ব্যবহার ছিল এক বিশাল অপচয়।

বাংলার অর্থনীতি সঙ্কটময় হয়ে উঠলো যখন দিল্লীর বাদশাহ বাংলার রাজস্ব মুদ্রায় সংগ্রহ করা শুরু করলেন। পূর্বে রাজকীয় রাজস্ব প্রেরিত হতো হুন্ডিতে। দিল্লীতে মুদ্রায় রাজস্ব পাঠানো শুরু হবার পর প্রতি বছর প্রায় দেড় কোটি টাকা দেশ থেকে পাচার হতো। শত শত চটের থলেতে করে রৌপ্যমুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণের পর দেশ এমন মুদ্রাসঙ্কটে পড়ে যেতো যে টাকার সরবরাহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সময় লাগতো ন্যূনপক্ষে ছয় মাস।[২] মুদ্রা অর্থনীতির সুযোগ গ্রহণ করে ইউরোপীয়রা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও যোগদান করে। তারা এক বাজার থেকে পণ্য কিনে অন্য গঞ্জে বিক্রি করতো এবং প্রাপ্ত মুনাফা দিয়ে রপ্তানিপণ্য কিনে দেশত্যাগ করতো। এহেন রপ্তানি ছিল দেশের জন্য সম্পূর্ণ ক্ষতিকর, কেননা এই রপ্তানির বিপরীতে কোন আমদানি হয় নি। ১৭১৭ সালে বাদশাহী ফরমানলাভের পরই ইংরেজরা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যাপক হারে যোগদান করে। ঐ ফরমানবলে ইংরেজ কোম্পানি দেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। কিন্তু এই ফরমানের অপব্যাখ্যা দিয়ে কোম্পানির কর্মচারিরাও তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা বিনাশুল্কে করতে শুরু করে।[৩]

বাংলা-ইউরোপ বাণিজ্যের চরিত্র সম্পূর্ণ দ্বিপাক্ষিক ছিল না। এ বাণিজ্য অনেকাংশে ছিল বহুপাক্ষিক। স্থানীয় পণ্যের সঙ্গে ইউরোপীয় মূল্যবান ধাতবের বিনিময় ছাড়াও ইউরোপীয়দের মাধ্যমে বাংলার পণ্যের সঙ্গে অনেক প্রাচ্যদেশের পণ্যের বিনিময় হতো। ঐ বিনিময় ছিল বাংলা-ইউরোপ বাণিজ্যিক লেনদেনেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ বাণিজ্যের প্রকৃতি ছিল একদিকে সরাসরি বাংলা-ইউরোপীয়, অপরদিকে বাংলা-প্রাচ্য-ইউরোপীয়। ওলন্দাজ বাণিজ্যের উপমা টেনে এই ত্রিমুখী বাণিজ্যধারার একটি চিত্র তুলে ধরেন ওম প্রকাশ। তিনি দেখিয়েছেন যে, জাপান থেকে পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত এ বাণিজ্য পরিচালিত হতো এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে। জাপান থেকে ইউরোপ পর্যন্ত সকল প্রধান

---

২. J. Steuart, *Principles of Money Applied to the Present State of the Coin in Bengal,* (London 1772), 63.

৩. সমসাময়িক শাসকদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য এই ফরমান একটি কৌতূহলোদ্দীপক দলিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Sukumar Bhattacharya, *The East India Company and the Economy of Bengal,* 1704 to 1740, (London 1954), 25-39; Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and Hist Times,* (Dhaka 1963), 166-173

বন্দর ছিল এই বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক-এর অন্তর্গত। বহুপাক্ষিক ওলন্দাজ বাণিজ্যের উপমা টেনে ওম প্রকাশ মন্তব্য করেন : ভারতীয় তাঁতবস্ত্র কেনার জন্য ওলন্দাজেরা সঙ্গে নিয়ে আসতো রৌপ্য। ঐ রৌপ্যের পরিমাণ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং ঘাটতি পূরণের জন্য রৌপ্য সংগ্রহ করা হতো দূরপ্রাচ্য বাণিজ্যের মাধ্যমে। ওলন্দাজেরা চীনে ক্রয় করতো রেশম ও অন্যান্য দ্রব্যাদি, যা তারা বিক্রয় করতো জাভায়। বিক্রয়লব্ধ জাভাই রৌপ্য এবং ইন্দোনেশীয় গোলমরিচের বিনিময়ে তারা তাইওয়ানে লাভ করতো স্বর্ণ। পাশ্চাত্য থেকে আনা রৌপ্য এবং দূরপ্রাচ্য বাণিজ্যলব্ধ স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতির বিনিময়ে কেনা হতো ভারতীয় তাঁতবস্ত্র। ঐ তাঁতবস্ত্রের কিছু অংশ বিনিময় হতো ইন্দোনেশীয় গোলমরিচ ও অন্যান্য মসলার সঙ্গে, আর বাকি অংশ রপ্তানি হতো বিভিন্ন এশীয় দেশে ও ইউরোপে। দূরপ্রাচ্য থেকে প্রাপ্ত গোলমরিচ ও মসলাদির বেশিরভাগ রপ্তানি হতো ইউরোপে এবং বাকি অংশ বিপণন করা হতো ভারত, পারস্য, তাইওয়ান ও জাপানে। গোলমরিচ ও অন্যান্য মসলা, চিনি ও ভারতীয় তাঁতবস্ত্রের বিনিময়ে পারস্য ও চীন থেকে সংগৃহীত হতো কাঁচা রেশম এবং সে রেশম রপ্তানি হতো ইউরোপে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন যে, এই বহুজাতিক বাণিজ্য দেশে দেশে সৃষ্টি করে নতুন সম্পর্ক, যে সম্পর্ক তৈরি করে একটি বহুজাতিক ও বহুমুখী বাজার—এ বাজার ছিল একদিকে আন্তঃএশীয়, অপরদিকে এশীয় বনাম ইউরোপীয়।[৪]

বাংলার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ, বিশেষকরে স্বর্ণরৌপ্যের আমদানি কি পরিমাণ ছিল এর উপর অনেক গবেষণা হয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্য-পরিসংখ্যানের অভাবে পণ্ডিতগণ উক্ত গবেষণার জন্য একটি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেছেন। তাঁরা দেখাতে চেষ্টা করেছেন কত দেশ থেকে কতগুলো এবং কত ওজনের জাহাজ এ দেশের বন্দরে নোঙ্গর করেছে এবং পণ্যসম্ভার নিয়ে বন্দর ত্যাগ করেছে এবং কোন্ শর্তে বিদেশীরা এখানে বাণিজ্য পরিচালনা করেছে।[৫] এসব গবেষণাকর্মে আমরা দেখতে পাই প্রতি বছর কত শত বৈদেশিক বাণিজ্যপোত এদেশের রপ্তানিবাণিজ্যে যোগদান করেছে এবং কি কি পণ্য নিয়ে ওসব পোত বিশ্ববাজারে বিপণনের উদ্দেশ্যে বন্দর ত্যাগ করেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন পণ্ডিতই একটি প্রশ্নে কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। সেটি হচ্ছে, দেশের সার্বিক অর্থনীতির উপর ব্যাপক রপ্তানিবাণিজ্যের কতটুকু প্রভাব পড়েছিল ? বিশ্ববাজারে বাংলার পণ্যের ব্যাপক চাহিদা এবং সে চাহিদা মোতাবেক বিপুল রপ্তানি কি দেশের উৎপাদনপ্রযুক্তি এবং উৎপাদনসংগঠনে কোন কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল

৪. Om Prakash, *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal, 1630-1720,* (Princeton 1985), 19.

৫. বাংলার রপ্তানিবাণিজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, এই খণ্ডের নবম অধ্যায়ে সুশীল চৌধুরী রচিত নিবন্ধ, *আঠারো শতকে ইউরোপীয় কোম্পানি ও বাংলার রপ্তানিবাণিজ্য* ; Om Prakash, *Dutch East India Company;* S. Bhattacharya, *The East India Company and the Economy of Bengal, 1704-1740,* (London 1954); A. Karim, *Murshid Quli Khan;* K. N. Chaudhuri, *The Trading World of Asia and the English East India Company, 1660-1760,* (Cambridge 1978).

ব্যাপক রপ্তানি কর্মকাণ্ডের ফলে কি এমন কোন শক্তিশালী উদ্যোক্তা শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল, যাদের নেতৃত্ব দেশের অর্থনীতিতে যুগান্তর সৃষ্টি করতে পারতো ? পণ্ডিতগণ একমত যে, বিশ্ববাজারে বৃটিশ পণ্যের ক্রমপ্রসারের ফলে বৃটেনে শিল্পবিপ্লব ঘটেছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, বাংলার পণ্য অনুরূপ বিশ্ববাজার পেলেও এখানে কোন শিল্পবিপ্লব ঘটে নি কেন ?

রপ্তানিপণ্যের শীর্ষে ছিল তাঁতবস্ত্র। বাংলার তাঁতশিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সমকালীন বিশ্বে দ্বিমতের কোন অবকাশ ছিল না। তাঁতজাত শিল্পকর্মের রকমারিতা, সূক্ষ্মতা, শিল্পসৌকর্য সম্পর্কে কাহিনী ও উপকথা বাংলায় এবং বহির্বিশ্বে প্রচলিত ছিল। শুধু শিল্পসৌকর্য নয়, তাঁতশিল্পের সংগঠন ও অর্থসংস্থান সম্পর্কেও পণ্ডিতগণ একমত যে, তাঁতশিল্পের সাফল্যের পশ্চাতে রয়েছে অতি অনুকূল বিনিয়োগ ও ক্রেডিটব্যবস্থা, যা কিনা সমকালীন ইউরোপীয় ঋণ ও লগ্নিব্যবস্থার চেয়ে কোন অংশেই কম দক্ষ ছিল না। স্থানীয় ব্যবস্থাপনাদক্ষতার দরুনই বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ শীর্ষস্থান দখল করেছিল। ইউরোপীয় বণিকদের এশীয় বাণিজ্য সারা প্রাচ্যদেশব্যাপী হলেও এদের বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাংলাদেশ। আঠারো শতকে রপ্তানিবাণিজ্যে বাংলার ব্যাপক ভূমিকা উল্লেখ করে ওম প্রকাশ তথ্য প্রদান করেন :

> সতেরো শতকের শেষ সিকিতে ইউরোপীয় বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের হামলা ইউরোপ-ভারত বাণিজ্যে এক নতুন পর্বের সূচনা করে। এই পর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে বাংলা শুধু ভারতের মধ্যেই নয় সমগ্র এশিয়ায় ছিল সেরা। আঠারো শতকের প্রারম্ভে ওলন্দাজরা এশিয়া থেকে যে পণ্যসম্ভার হল্যান্ডে রপ্তানি করতো এর শতকরা চল্লিশ ভাগই সংগৃহীত হতো বাংলা থেকে। আর ওলন্দাজ কোম্পানি এশিয়া থেকে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করতো, মূল্যের নিরিখে এর অর্ধেকেরও বেশি রপ্তানি হতো বাংলার বস্ত্র আকারে। বাংলায় সবচেয়ে বড় রপ্তানি-অংশীদার ছিল ইংরেজ কোম্পানি এবং এদের বেলায়ও একই চিত্র বিদ্যমান। এশীয় বাণিজ্যের প্রায় অর্ধেক পণ্য রপ্তানি হতো বাংলা থেকে।[৬]

পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এশিয়ার বাণিজ্যজগতে বাংলার স্থান ছিল সর্বোচ্চে। এ অবস্থায় এটা আশা করা অযৌক্তিক নয় যে, বাংলার এই শিল্পোন্নতির জন্য ক্রিয়াশীল ছিল উৎপাদন-সংগঠন, প্রযুক্তি, বিপণন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা এবং এই শিল্পোন্নতির ফলে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি এসেছিল। রপ্তানির নিরিখে এও অনুমান করা অমূলক নয় যে, রপ্তানিপণ্যের উৎপাদক শ্রেণীর জীবনযাত্রা ছিল সচ্ছল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যধিক দুর্বল। সাধারণ মানুষের অবস্থাও ছিল তাই। তাদের গড় আয় ছিল অত্যধিক কম। কৃষিজাত ও অন্যান্য দ্রব্যের দাম ছিল এত অল্প যে, উদ্বৃত্ত ফসল বাজারজাত করার কোন উৎসাহ কৃষকরা পেতো না।

৬. Om Prakash, *Dutch East India Company*, 8

১৭৩৯ সালে এক টাকায় আট মণ সাধারণ মানের চাল কেনা যেতো এবং সে সুবাদে নাকি ঢাকা শহরের পশ্চিম দ্বার খুলে দিয়েছিলেন নবাব শুজাউদ্দিন। কথিত আছে যে, সুবাদার শায়েস্তা খানের (১৬৭৯-৮৮) সময় একবার চালের মূল্য টাকায় আট মণে নেমে এসেছিল। তখন তিনি শহরের পশ্চিম তোরণ বন্ধ করে দম্ভভরে ঘোষণা দেন যে, ভবিষ্যতে তখনই ঐ তোরণ আবার খোলা যাবে যখন চালের মূল্য ঐ পর্যায়ে নেমে আসবে।[৭] ১৭৩৯ সালের মূল্যমাত্রা অবশ্য একটি চরম উপমা। সাধারণত মওসুমভেদে চালের মূল্য ছিল তখন টাকায় তিন থেকে চার মণ। এই মূল্যকাঠামোয় সাপ্তাহিক আয় যাদের গড়ে এক টাকা ছিল, তারা মোটামুটিভাবে পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে পারতো। কিন্তু কয়জন লোক সপ্তাহে গড়ে এক টাকা আয় করতে পারতো ? এই প্রশ্নের সহজ জবাব নেই, কারণ তথ্যের অভাব। তবে সমকালীন টুকিটাকি তথ্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, মাসে গড়ে চার পাঁচ টাকা উপার্জনকারী সাধারণ লোকের জন্য অবশ্যই তা ছিল একটি বিরল ব্যাপার।

লক্ষণীয় যে, নিম্নমূল্য এবং নিম্নআয়ের ধারা অপরিবর্তিত ছিল দীর্ঘকাল। সাধারণ ভোগ্যপণ্যের মূল্য সতেরো শতকের মধ্যবর্তী সময়ে যে মাত্রায় ছিল প্রায় একই মাত্রা বিরাজমান থাকে এর এক শত বছর পরেও। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চালের মূল্য। কৃষকঅর্থনীতি বিচারের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড হচ্ছে চালের মূল্য। যুগ যুগ ধরে চালের বাজারমূল্য ছিল স্থিতিশীল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন অস্বাভাবিক কারণে চালের মূল্য স্থানীয়ভাবে ওঠানামা করলেও এটা ছিল নেহাতই সাময়িক ও স্বল্পমেয়াদী। দীর্ঘমেয়াদ বিবেচনায় চালের মূল্য ছিল মোটামুটি অপরিবর্তিত। তবে যে বছর খুব ভাল ধান উৎপন্ন হতো সে বছর চালের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে পড়ে যেতো। ভাল ফসলের সময় বিদেশী জাহাজ এসে উদ্বৃত্ত ফসল ক্রয় না করলে ধান-চালের দাম এমন পড়ে যেতো যে, কৃষকরা তাদের ফসল বিক্রি করতে না পেরে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তো। ভাল ফসল হলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হতো এবং এটা ঘটতো বাজারঅর্থনীতির অসম্পূর্ণতার কারণে।

কৃষিপণ্যের মতো শিল্পপণ্যের মূল্যও ছিল দীর্ঘমেয়াদের জন্য স্থিতিশীল। যদিও সতেরো শতকে বিশ্ববাজারে বস্ত্রের চাহিদা বহুগুণ বেড়েছে, কিন্তু বস্ত্রের বাজারমূল্য মোটেই বাড়ে নি, বরঞ্চ স্বল্পমেয়াদের জন্য অনেক সময় কমেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও কখনো এর মূল্য বৃদ্ধি পায় নি, কিন্তু কোন কারণে চাহিদা হ্রাস পেলে তুলনামূলকভাবে মূল্য হ্রাস পেতো আরো বেশি। বাজারের এই প্রচণ্ড অসম্পূর্ণতার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উৎপাদক শ্রেণী। নিম্নমূল্যের স্থিতিশীলতা দীর্ঘমেয়াদী হওয়ার ফলে শিল্পপণ্য উৎপাদনে কোন প্রযুক্তিক পরিবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি, সঞ্চারিত হয় নি উৎপাদকদের হাতে পুঁজি, সূচিত হয় নি উৎপাদকদের মধ্যে নব উদ্যোগ। অভিনবত্ব ও

৭. *Ghulam Husain Salim, Riyaz-us-Salatin.* ed. by Abdus Salam, (Calcutta 1904), 228.

উদ্যোগের অভাবে শিল্প ক্রমে ঐতিহ্যনির্ভর হয়ে উঠে। শিল্পের মালিক, কারিগর ও শ্রমিক সবাই আটকা পড়ে খোরাকি অর্থনীতির আবর্তে।

ইউরোপীয় বণিকদের আগমনে এখানে শিল্পোৎপাদন বেড়েছে, যদিও মূল্য বাড়ে নি। মূল্যবৃদ্ধিকে সফলভাবে রোধ করেছে দাদনি ব্যবস্থা। বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যে যোগদানের প্রথম থেকেই ইউরোপীয় বণিকরা দাদনি ব্যবস্থা অনুসরণ করেছে। এই ব্যবস্থাধীনে কোম্পানি এবং তাঁতীদের মধ্যে চুক্তি হতো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহ করার জন্য। মূল্যও নির্দিষ্ট হতো চুক্তির সময়। তবে সে মূল্য চাহিদা ও সরবরাহের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হতো না, হতো চলতি নিরিখের উপর ভিত্তি করে। চুক্তির সময় তাঁতীদের দাদন বা আগাম দেয়া হতো। চুক্তি মোতাবেক সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য তাঁতীদের উপর তাগিদকার বা তাগিদ্দার বসানো হতো। আবাসিক তাগিদ্দারদের ভয়ে তাঁতীরা থাকতো সন্ত্রস্ত। তাগিদ্দার নিয়োগের আসল উদ্দেশ্য ছিল তারা অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির সঙ্গে যেন চুক্তিবদ্ধ হতে না পারে তা লক্ষ্য রাখা। অতএব তাঁতীরা ক্রেতাদের সঙ্গে দরকষাকষির মাধ্যমে সুবিধাজনক মূল্যলাভ থেকে ছিল বঞ্চিত। বাস্তবে তাঁতীরা ছিল এক ধরনের মুচলেকাবদ্ধ দাস। এই সব দাস-তাঁতীদের উৎপাদন ও বিপণনব্যবস্থা প্রাক-আধুনিক ইউরোপের কারিগরদের চুক্তিব্যবস্থার (Putting Out System) সঙ্গে তুলনীয়। তখন ইউরোপের কারিগরেরাও ছিল বিপণনবণিকদের কাছে বন্দি। কারিগরদের উৎপাদন নির্ভর করতো বণিকের আগামের উপর। শুধু অতি অল্প সংখ্যক তাঁতীর নিজস্ব পুঁজি ছিল বিনিয়োগের জন্য। অধিকাংশ তাঁতীর উৎপাদন ছিল আগামের উপর নির্ভরশীল। এবং আগাম নেবার মানে হচ্ছে পুঁজি সঞ্চয়ের সুযোগলাভের পরিবর্তে শুধু খেটে খাওয়া। বাজারে স্বাধীনভাবে পণ্য বিপণন করে প্রতিযোগিতাভিত্তিক মূল্যলাভ আগামগ্রহীতার ভাগ্যে জুটতো না। এর ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, দেশীয় পণ্যের বিপুল বিশ্বচাহিদা ও রপ্তানি সত্ত্বেও এর কোন লক্ষণীয় প্রভাব দেশের মূল্যকাঠামোর উপর পড়ে নি অর্থাৎ তা সাধারণ অর্থনীতির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। নিম্ন মূল্যকাঠামোয় আয়ও ছিল নিম্ন, ফলে জীবনের মানও ছিল নিম্ন। এই বিষাক্ত চক্রের ফলে কারিগরদের অর্থনৈতিক জীবনে কোনই পরিবর্তন আসে নি যদিও তাদের পণ্যের বিপুল চাহিদা ছিল এবং বিপণন ছিল বিশ্বব্যাপী। ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আহৃত রৌপ্য ইউরোপে এনেছিল মূল্যবিপ্লব। অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে বিপুল মুনাফা সৃষ্টি হয়, মুনাফা থেকে সৃষ্টি হয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি। মূল্যবিপ্লবের ফলে ইউরোপে Putting Out বা আগামভিত্তিক গৃহশিল্পের পতন ঘটে এবং উন্মেষ ঘটে আধুনিক পুঁজিবাদের। কিন্তু যদিও প্রতি বছর বাংলায় বিপুল পরিমাণ রৌপ্য আমদানি হয়েছে, কিন্তু বাজারমূল্যের উপর এর বিশেষ কোন প্রভাব পড়ে নি। মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁতী ও তাঁতশিল্পের সঙ্গে জড়িত বণিকদের মুনাফা বৃদ্ধি পায় নি, সঞ্চয় সৃষ্টি হয় নি। আগের মতোই তাঁতীরা তাদের উৎপাদনের জন্য নির্ভরশীল থাকে দাদনের উপর। শাসক এবং শাসিত উভয় শ্রেণীই গর্ববোধ করেছে নিম্ন বাজারমূল্যের জন্য, কিন্তু নিম্নমূল্যের অর্থনীতির তাৎপর্য তারা অনুধাবন করতে পারে নি। আভিজাত্যিক সমাজকাঠামোয় পেশাজীবীদের

লম্বিক উঠানামার সুযোগ প্রায় নেই। যারা সাধারণ তাঁতী তারা সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজিবাদী হয়ে উঠুক এটা সামরিক আভিজাত্যের কাম্য ছিল না। অতএব ল্যাটিন আমেরিকার রৌপ্য ইউরোপে যে মূল্যবিপ্লব ঘটিয়েছে, বাংলার রপ্তানির বিনিময়ে প্রাপ্ত রৌপ্য অনুরূপ মূল্যবিপ্লব ঘটাতে পারে নি। এখানে মূল্য নির্ধারিত হয়েছে প্রচলিত প্রথা অনুসারে, অর্থনৈতিক নিয়মে নয়। ফলে বাজারমূল্য এবং মুদ্রা সঞ্চালন কোন সময়েই চাঙ্গা হয়ে উঠে নি। অর্থনৈতিকভাবে নিম্নমূল্য মানে নিম্নআয়, নিম্ন জীবনমান। তাঁতীদের মধ্যে সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি সৃষ্টি হয় নি, কারণ তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য দিয়ে শুধু কোন রকম জীবন ধারণ করতে পেরেছে, সঞ্চয় করতে পারে নি, দাদন ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে উৎপাদনে উপনীত হয়ে দরকষাকষির মাধ্যমে সঞ্চিত হতে পারে এমন মুনাফা অর্জন করতে পারে নি।

বাংলার তাঁতশিল্পের উপর গবেষণা হয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় এই যে, বাংলার অন্যান্য শিল্পের উপর অনুসন্ধান হয়েছে খুবই কম, বলা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে আদৌ হয় নি। এদেশের চারু-কারু শিল্পের ছিল ব্যাপক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজার। এসব শিল্পের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল মুর্শিদাবাদের পিত্তল, কৃষ্ণনগরের মৃন্ময়, ঢাকার কশিদা, শাখা, স্বর্ণ-রৌপ্যগহনা, সিলেটের শীতলপাটি ও আরো অনেক শিল্প। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারের চাহিদা মেটাতে গড়ে উঠেছিল নৌ-শিল্প, কাঠশিল্প, ধাতব শিল্প এবং চিনি, লবণ ও বিভিন্ন ভেষজ শিল্প। স্থলপথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হতো পাল্কী। অতএব পাল্কী নির্মাণও ছিল একটি বড় শিল্প। প্রত্যেক শিল্পের ছিল এর আঞ্চলিক বিশেষত্ব, এবং কোন না কোন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন শিল্প-কারখানা। ঐ বিশেষ শিল্পকে কেন্দ্র করে বিশেষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য হাট, বাজার, গঞ্জ। দূর দূরান্ত থেকে আগমন করতো ক্রেতারা ঐ সব বিপনীকেন্দ্র থেকে পণ্য সংগ্রহ করার জন্য। ঐ সব কেন্দ্রের মালিকদের বলা হতো মহাজন বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অর্থনৈতিকভাবে মহাজন শ্রেষ্ঠই ছিলেন বটে। মহাজনের আড়ং থেকে বিদেশী ক্রেতাদের পণ্য ক্রয় করতে হতো। মহাজনরা মুনাফা লুটতো তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে। সরাসরি উৎপাদকদের কাছ থেকে পণ্য কিনতে পারলে একদিকে যেমন ক্রেতাগণ অনেক কম মূল্যে পণ্য সংগ্রহ করতে পারতো, অন্যদিকে খুচরা বিক্রেতারাও লাভ করতে পারতো সুবিধাজনক মূল্য। বিদেশীরা পছন্দ করতো না যে প্রতিযোগিতার বদলে বাজারমালিকগণ পণ্যের মূল্য তাদের খেয়ালখুশিমতো নির্ধারণ করুক। বাজারে মহাজনদের দৌরাত্ম্য থেকে রেহাই পাবার জন্য ঢাকার কালেক্টর (১৭৮৫) একবার সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন আঞ্চলিক বাজারগুলোর ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত করে বাজারগুলোর উপর সরকারি মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার জন্য।[৮] শিল্পের আঞ্চলিক বিকাশ, আঞ্চলিক বাজার ও বাজারমালিক (মহাজন), দেশী-বিদেশী ক্রেতার সঙ্গে মহাজনের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ের রয়েছে অনেক অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক দিক, যা

৮. M Day, Collector of Dhaka, to Board of Revenue, 1785, Sirajul Islam, (ed.), *Bangladesh District Records. Dacca District*, Vol. 1 (1784-1787), (Dhaka 1981), 136-37.

এখনো ঐতিহাসিকগণ গভীরভাবে অনুসন্ধান করেন নি। আঞ্চলিক শিল্পোৎপাদন ও উৎপাদকদের সাধারণ অর্থনৈতিক জীবন, বিপণন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোলা যায়। এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাঁতশিল্পে লিপ্ত কারিগরদের মতো এসব আঞ্চলিক শিল্পের কারিগরদের অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল খুবই করুণ। এরাও তাদের উৎপাদনের ন্যায্যমূল্য লাভ থেকে ছিল বঞ্চিত। বাজারমালিকদের শোষণের শিকার ছিল আঞ্চলিক চারু-কারু শিল্পকারিগরেরা। এরা যদি তাদের উৎপাদনের ন্যায্যমূল্য পেতো, মুনাফার মাধ্যমে এদের হাতে যদি সঞ্চয় সৃষ্টি হতে পারতো, তাহলে হয়তো এদের সঞ্চয় পুঁজিবাদে রূপ নিতে পারতো এবং পুঁজিবাদের অভিঘাতে উৎপাদনপদ্ধতি, প্রযুক্তি ও বিপণনব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে পারতো।

শিল্পে নিয়োজিত কারিগর-শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার চেয়ে কৃষককুলের অবস্থা ভাল ছিল না মোটেই। মুগল সরকার ছিল একটি বিশাল কৃষি-সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষক। যদিও আঠারো শতকের শুরু থেকে আমদানি-রপ্তানিশুল্ক বাবদ সরকারের আয় অনেক বেড়ে যায়, তথাপি কৃষিই ছিল সরকারি আয়ের সর্বপ্রধান উৎস। রাজনৈতিক কারণে মুগল সরকারের নীতি ছিল রায়ত শ্রেণীকে আকাল-দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধা ও মৃত্যু থেকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক সাহায্য-সহায়তা প্রদান করা। কৃষিঋণ প্রদান, লঙ্গরখানা স্থাপন, খাজনা মওকুফ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আপৎকালীন সময়ে রায়ত শ্রেণীকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষার চেষ্টা করা হতো। কিন্তু দুর্যোগ পেরিয়ে উৎপাদন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলে সরকার কৃষকদের বাধ্য করতো বর্ধিত খাজনা প্রদানের মাধ্যমে সকল সরকারি ঋণ পরিশোধ করতে। স্বাভাবিক খাজনার হার ছিল এত বেশি যে, সরকারি খাজনা পরিশোধ করার পর কৃষকের হাতে খায়খোরাকি ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। খাজনা আকারে কৃষকের গোটা উদ্বৃত্ত সংগ্রহের জন্য মুগল সরকার গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত করেছিল এর বিশাল রাজস্ব আমলাতন্ত্র।

যেকোন মানদণ্ডে মুগল আমলে কৃষকের উপর খাজনার হার ছিল খুবই বেশি। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পূর্বকালে খাজনার হার ছিল সমগ্র উৎপাদনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ আর আওরঙ্গজেবের সময়ে উক্ত হার আরো বৃদ্ধি পেয়ে হয় উৎপাদনের প্রায় অর্ধাংশ।[৯] মুর্শিদকুলী খানের সময়ে (১৭০৪-১৭২৭) খাজনার হার ফসলের অর্ধাংশ ধার্য করা হয়।[১০] এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আজকের বর্গাদারদের মতো সে যুগের রায়ত শ্রেণীকে তাদের উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ ছেড়ে দিতে হয়েছে খাজনা হিসেবে। অতএব, এমন ভাবা অযৌক্তিক নয় যে, আজকের বর্গাদারদের অর্থনীতির মতো প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের কৃষকের অর্থনীতি ছিল একই রকম দুর্বল ও নড়বড়ে। কোন প্রাকৃতিক কারণে ফসলহানি হলে দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব ছিল না। মুগল বাংলার অর্থনীতির যে রঙিন ছবি বিদেশী

৯. W. H. Moreland, *Agrarian System of Muslim India,* (Cambridge 1929).

১০. A. Karim, *Murshid Quli Khan,* 85.

পর্যটকরা এঁকেছেন, তা আসলে আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক প্রতিচ্ছবি ছিল না। বিদেশী পর্যটকেরা চিত্র এঁকেছেন মূলত অভিজাত, জমিদার ও বণিক শ্রেণীর অর্থনীতির। সাধারণ মানুষ বাস করতো পর্ণ কুটিরে, সরকারি রাজস্ব আমিল কেড়ে নিত তাদের সমস্ত কৃষি-উদ্বৃত্ত। খোরাকির উপরে তাদের হাতে কোন সঞ্চয় সৃষ্টির উপায় ছিল না। সাধারণ মানুষের চাহিদা ছিল নগণ্য, কারণ আয়ও ছিল নগণ্য। তাদের ক্রয়ক্ষমতা নিম্নপর্যায়ে থাকার দরুন পণ্যসামগ্রীর মূল্যও ছিল নিম্নপর্যায়ে। মন্দামূল্যের বাজারে উৎপাদক শ্রেণী কখনো কোন সুবিধা অর্জন করতে পারে নি। বিদেশী পরিব্রাজকগণ এদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করেছেন স্বদেশের পাঠকের জন্য। ইউরোপের পাঠকরা বিমোহিত হতো প্রাচ্যের ঐশ্বর্যের কথা শুনে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা দিলে ভ্রমণবৃত্তান্তের রোমাঞ্চে তাল কাটার সম্ভাবনা ছিল বলে অভিজাত শ্রেণীর বর্ণাঢ্য জীবনযাত্রা অঙ্কনই ছিল বিদেশী পর্যটকদের লক্ষ্য। ভট্টাচার্যের ভাষায় :

> প্রাক-বৃটিশ বাংলার অর্থনীতি চিত্রণে ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণের উপর এতটা নির্ভর করা উচিত হবে না। পর্যটকগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সোনালী চিত্র অঙ্কন করেছেন। এঁরা অভিভূত হয়েছিলেন গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলের মাটির উর্বরাশক্তি দেখে। বাংলার বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁরা উচ্ছ্বাসে প্রায় আত্মহারা হয়েছেন। প্রাচ্য দরবারের সাজসজ্জা, রাজপুরুষ ও অমাত্যদের ঐশ্বর্য, হীরা, মুক্তা, জহরত দেখে পর্যটকেরা এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে তাঁদের প্রতীতি জন্মে যে, সারা দেশই বুঝি এমন ঐশ্বর্যপূর্ণ। কিন্তু আসলে যে তা ছিল না এমন উপলব্ধি তাঁদের কখনো হয় নি।[১১]

তবে আমির-ওমরাহ, জমিদার শ্রেণীর বাইরে আরেকটি শ্রেণী প্রভূত ধনার্জন করেছিল আঠারো শতকে। বিদেশী বণিকদের সহায়তাকারী দেশী দালাল-মুৎসুদ্দি শ্রেণী অভূতপূর্ব মুনাফা অর্জন করেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে। বিদেশীরা এদেরকে বলতো বেনিয়া বা বানিয়া। বানিয়াদের সাহায্যেই বিদেশী কোম্পানিগুলো এখানে বাণিজ্য করতো। স্থানীয় ভাষায় কথোপকথন ছিল বিদেশীদের বিরাট সমস্যা। বানিয়ারা এদের সঙ্গে লেনদেন করতে করতে অনেক ইউরোপীয় শব্দ আয়ত্ত করে ফেলে। ইউরোপীয়রাও আয়ত্ত করে অনেক দেশী শব্দ। বানিয়ারা ঐসব শব্দ ব্যবহার করে এবং বিশেষ অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ভাব আদানপ্রদানে সফল হয়েছিল এবং ঐ সাফল্যই ছিল ধনার্জনের কারণ। ভাষার সমস্যা, ওজন ও মাপের সমস্যা, মুদ্রা ভাঙানোর সমস্যা প্রভৃতি কারণে বিদেশী বণিকেরা বানিয়াদের সাহায্য নিতে বাধ্য হতো। বানিয়াদের কাছ থেকে প্রয়োজনে ঋণও নিত বিদেশী বণিকগণ।

নিঃসন্দেহে বৈদেশিক বাণিজ্য সৃষ্টি করেছিল একটি শক্তিশালী বানিয়া অর্থনীতি। বানিয়া অর্থনীতি আভিজাত্যের বাইরে বিশেষ একটি শ্রেণীকে সমৃদ্ধ করেছিল। এরা হচ্ছে উচ্চবর্ণের হিন্দু বণিক-মুৎসুদ্দি শ্রেণী। বানিয়াদের সম্পর্কে প্রচুর তথ্য রয়েছে ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের দলিলখানায়। বানিয়াদের কর্মকাণ্ডের উপর বেশ কিছু গবেষণাকর্মও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এসব গবেষণার কোনটাই বানিয়া অর্থনীতির উপর তেমন গুরুত্ব

১১. S. Bhattacharya, *East India Company*, 13.

আরোপ করে নি। বানিয়া পুঁজির পরিমাণ ও বিনিয়োগ সম্পর্কে এখনো আমরা প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কোম্পানির দালাল হিসেবে বানিয়ারা রপ্তানিমূল্যের উপর শতকরা দেড় টাকা থেকে আড়াই টাকা পর্যন্ত কমিশন (সে যুগের ভাষায় সেলামি) দাবি করতো। এর ভিত্তিতে বানিয়াদের অর্থাগমের একটি মোটামুটি চিত্র পাওয়া যেতে পারে। তবে এর জন্য প্রয়োজন সে যুগের রপ্তানির পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা। কিন্তু বানিয়াদের মধ্যস্থতায় কি পরিমাণ রপ্তানি সম্পাদিত হয়েছে এ সম্পর্কে আমাদের কোন সঠিক ধারণা নেই, এমনকি এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্যভাবে অনুমান করার মতো তথ্যও আমাদের কাছে নেই। তাছাড়া কমিশনভোগী বানিয়ারা ছাড়াও সুদূর হাট-বাজারে পর্যায়ক্রমে নানা ধরনের দালাল নিযুক্ত হতো। ওরাও নির্দিষ্ট হারে কমিশন পেতো। কিন্তু এই সব মধ্যবর্তী দালালের লেনদেন সম্পর্কে আমাদের কোন রকম তথ্য নেই। বানিয়া অর্থনীতির আলোচনা থেকে এই মধ্যবর্তী দালালদের বাদ দেয়া যায় না। কারণ রপ্তানিবাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত মুনাফার একটি বড় অংশ লাভ করেছিল এই মধ্যবর্তী দালাল শ্রেণী। তবে মোদ্দাকথা এই যে, রপ্তানি বাণিজ্য দেশের সার্বিক অর্থনীতির উপর কোন ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে না পারলেও দেশে একটি শহরভিত্তিক বাণিজ্যিক পুঁজিপতি শ্রেণী সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

সকল তথ্য সাক্ষ্য দেয় যে, রপ্তানিবাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত বিপুল পুঁজি দেশের উৎপাদন সংগঠন ও প্রযুক্তি, বিতরণ ও বিপণন, উৎপাদক শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা, পণ্যের মূল্যকাঠামো প্রভৃতিতে কোন ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। শহরভিত্তিক বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুদয় ইউরোপে পুঁজিবাদী পরিবর্তন আনয়ন করেছিল, কিন্তু বাংলার বেলায় বানিয়া-মুৎসুদ্দি শ্রেণী তেমনটি ঘটাতে পারে নি। এর কারণ ? অনেকে যুক্তি দেন যে, বানিয়া পুঁজি বিকাশের স্বাভাবিক লক্ষ্যে পৌছার আগেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ঘটায় সে পুঁজি বিকৃত পথ ধরে সামন্ত রূপ পরিগ্রহ করে। উৎপাদন ও শিল্পোদ্যোগ থেকে বানিয়াপুঁজি প্রত্যাহৃত হয়ে অনুপ্রবেশ করে ভূমিনিয়ন্ত্রণে। এই যুক্তি আপাত দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় ঠেকে বটে, তবে প্রশ্ন উঠে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে পুঁজিবাদী পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা যায় নি কেন ? বাণিজ্যিক পুঁজিপতি শ্রেণী হিসেবে বানিয়াদের আবির্ভাব ঘটে সতেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে এবং আঠারো শতকের প্রথম দশক থেকে আশির দশক অব্দি বানিয়াপুঁজির মহা দাপট বজায় থাকে। এই দীর্ঘ সময়ে পুঁজিবাদী পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয় নি কেন ? ১৮১৩ সনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার বিলুপ্ত করে অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তন করা হলে বানিয়াপুঁজি বিকাশের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। অবাধ বাণিজ্যের কারণে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বিপুলভাবে বিস্তারলাভ করে। ফলে বৃদ্ধি পায় বানিয়াদের আয়। উপমাস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে বানিয়া রামদুলাল দে'র কথা। শুধু সদ্যাগত মার্কিন বণিকদের দালালি করে রামদুলাল অচিরেই কোটিপতিতে পরিণত হন।[১২] অথচ মার্কিনীদের সঙ্গে বাণিজ্য

১২. Susan S Bean, 'Calcutta Banians for the American Trade', in Pratap Pal (ed.), *Changing Vision, Lookings, Images: Calcutta through 300 Years*, (Bombay 1990), 71-73.

শুরু করার আগে তিনি ছিলেন একজন ছা-পোষা সরকার (কেরানি) মাত্র। রামদুলাল দে এবং তাঁর শ্রেণীর লোকদের কোটি কোটি টাকা অর্জন দেশের পুঁজিবাদী উন্নয়নে কোন অবদান রাখে নি। বানিয়াদের বাণিজ্যিক যোগ্যতা সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু বিস্ময় এই যে, তাঁদের বাণিজ্যিক যোগ্যতা পুঁজিবাদী যোগ্যতায় রূপান্তরিত হয় নি। এই ব্যর্থতা ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পত্র-পত্রিকায় আমরা দেখতে পাই, নানা ধর্মীয়-সামাজিক উৎসব, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে বানিয়ারা খরচ করছেন একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। তাঁরা সামাজিক স্বীকৃতি লাভের প্রয়াস পাচ্ছেন অনুৎপাদনশীল খাতে অর্থ উড়িয়ে, সঞ্চয় ও পুঁজিবাদী বিনিয়োগের মাধ্যমে নয়।

২

কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে ঘন ঘন, কিন্তু সেসব ঘটনা দেশের সমাজ ও অর্থনীতিকে খুব কমই প্রভাবিত করেছে। নতুন শাসকরা পুরাতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কে কোন হস্তক্ষেপ করে নি। কৃষি ও শিল্পব্যবস্থা আবহমানকাল থেকে অপরিবর্তিত থাকার এটা একটি বড় কারণ বটে। বলা যায়, অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিক থেকে গ্রামবাংলা চিরকালই ছিল স্ব-নিয়ন্ত্রিত। উপরের স্তরে রাজনৈতিক পরিবর্তন কখনো গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে পারে নি। গ্রামীণ অর্থনীতি সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় রাজনীতির প্রভাব অনুভব করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। কোম্পানিশাসনের প্রভাবে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও অন্যান্য সব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয় এবং সে পরিবর্তন ছিল নেতিবাচক। কোম্পানিশাসনের প্রাথমিক শোষণ ও লুণ্ঠননীতির ফলে দেশের গোটা অর্থনীতি ভেঙে পড়ে।

বাংলায় ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পশ্চাতে রবার্ট ক্লাইভের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। ক্লাইভ চেয়েছিলেন মুগল সরকারের রাজস্ব সংগ্রহে যোগদান করে কোম্পানির আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন নিশ্চিত করতে। লুটতরাজের মাধ্যমে সম্পদ আহরণ করা মোটেই তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তিনি কোম্পানির কর্মকর্তাদের প্রশাসন থেকে দূরে রাখলেন। রেজা খানকে তিনি দিলেন মুগল প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে স্বাধীনভাবে রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব। এমনকি ক্লাইভ কোম্পানির কর্মচারিদের নির্দেশ দিলেন দেশের আইন মেনে চলতে এবং কোম্পানির ক্ষমতার অপব্যবহার না করতে।[১৩] ক্লাইভ কলকাতা ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর থাকাকালীন কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারিরা লুণ্ঠন-লুটতরাজ থেকে বিরত ছিল। শোষণ-লুটতরাজ শুরু হয় ক্লাইভের বৃটেনে প্রত্যাবর্তনের পর। কোম্পানির সকল শ্রেণীর কর্মচারি দেশের অভ্যন্তরে ছোটে সম্পদ লুণ্ঠনের লক্ষ্যে।[১৪]

১৩. For Reza Khan's rule see, Abdul Majed Khan, *The Transition in Bengal, 1756-1775: A Study of Saiyid Muhammad Reza Khan,* (Cambridge 1969), chapters six and seven.

১৪. J Malcolm, *Robert Lord Clive,* Vol. 3, 88.

ব্যবসার নামে তারা চালায় পাশবিক অত্যাচার-উৎপীড়ন। ইংরেজ অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরে ঐতিহাসিক টমসন বাংলাকে প্যাগোদা বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন—'ঝাঁকুনি দাও, লুফে নাও স্বর্ণ-রৌপ্যের ঝরা ফল'। ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় দেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার। প্রধানত এই ইস্যুর উপরই নবাব মীর কাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধে কোম্পানির। কোম্পানির কর্মচারিদের বিনাশুল্কে বাণিজ্য মানে প্রতিযোগিতায় স্থানীয় বণিকদের উৎখাত হওয়া। শুধু বিনাশুল্কে বাণিজ্য করেই কোম্পানির কর্মচারীরা ক্ষান্ত হয় নি, তারা অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্যের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে দেশীয় বণিকদের দ্বারা ঐসব পণ্যের বেসাতি বেআইনি ঘোষণা করেছে। এমন অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিবাদ উঠেছে। কিন্তু কোন ফল হয় নি। ক্ষমতামত্ত, অর্থগৃধ্নু ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারে কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। ইংরেজের অত্যাচার-উৎপীড়ন সম্পর্কে কতিপয় সাহসী ভূম্যধিকারী কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের কাছে নিম্নরূপ অভিযোগ করেন (১৭৬৫) :

> ইংরেজ বণিক গোমস্তাগণ বাংলার সর্বত্র কুঠি স্থাপন করেছেন, ছড়িয়ে পড়েছেন গ্রামে-গঞ্জে। তাঁরা দেশের তাবৎ উৎপন্নদ্রব্যের কেনাবেচা করেন, যেমন বস্ত্র, চুনাপাথর, তৈলবীজ, তামাক, হলুদ, তৈল, চাল, শন, দড়ি, গম এবং সব রকম খাদ্যশস্য। এসব দ্রব্য কেনার জন্য সাহেবরা রায়তকে টাকা গ্রহণ করতে বাধ্য করেন এবং এভাবে তাঁরা নিম্নমূল্যে জিনিস ক্রয় করেন, কিন্তু বিক্রয়ের সময় বাজারের ক্রেতাদেরকে উচ্চমূল্যে ক্রয় করতে বলপ্রয়োগ করেন। সরকারকে তাঁরা শুল্ক দেন না। যেকোন রকমের জঘন্য কাজ করতে তাঁদের মোটেই বাধে না। ফলে দেশ এখন এক শূন্য শ্মশানে পরিণত হয়েছে।[১৫]

বাঙালির চোখে কোম্পানির কর্মচারীরা ছিল মনুষ্যরূপী পঙ্গপাল। এই পঙ্গপালদের আক্রমণে বাংলার হাট, বাজার, গঞ্জ ও সকল শিল্পোৎপাদনকেন্দ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এক দশকের মধ্যেই। হাট-বাজারে গিয়ে এরা উৎপাদক ও সরবরাহকারীদের বলপ্রয়োগে বাধ্য করতো তাদের কাছে বাজারমূল্যের চেয়ে অনেক কমমূল্যে পণ্য বিক্রি করতে।[১৬] একের পব এক পুতুল নবাব ও তাদের আমির-ওমরাহ ও জমিদারগণ চাপের মুখে বাধ্য হন তাঁদের সকল উদ্বৃত্ত নজরানা, পেশকাশ ও বকশিসরূপে ফিরিঙ্গিদের হাতে তুলে দিতে। এদের দুঃশাসন ও অত্যাচারের ফলে সকল আইন-কানুন, প্রতিষ্ঠান অকার্যকর হয়ে দেশ একটি জংলী সমাজে পরিণত হলো। কার্থেজ বিধ্বংসের পর বাংলাদেশই বোধ হয় এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতি ধ্বংসের দ্বিতীয় নজির।[১৭]

কোম্পানি-কর্মচারীদের লুটপাট নীতি শুধু বাংলার অর্থনীতিকেই বিনষ্ট করে নি, এর দুষ্ট অভিঘাতে একই সঙ্গে খোদ কোম্পানির অর্থনীতিও ধ্বংস হয়েছে। পলাশীর আগে

১৫. Cited in Edward Thompson and G T. Garratt, *Rise and Fulfillment of British Rule in India*, (Allahabad 1962), 102

১৬. ঐ.

১৭. Charles Caraccioli, *Life of Clive*, Vol 1, 106, cited in Thompson and Garratt, *Rise and Fulfillment*, 104

কোম্পানির বাংলাবাণিজ্য ছিল বিপুল লাভজনক, প্রতি বছর এর শেয়ারহোল্ডারগণ পেতেন অতি উচ্চহারে লভ্যাংশ। কিন্তু রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর কোম্পানি বাণিজ্যে ক্রমাগত লোকসান দিয়ে চলে। প্রতি বছর বাড়তে থাকে সে লোকসানের মাত্রা। বাণিজ্যিক ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য কৃষকের উপর খাজনা বৃদ্ধি করা হয় বার বার। কিন্তু সে বর্ধিত খাজনা পরিশোধ করার ক্ষমতা কৃষকের আছে কিনা সে বিষয় কোম্পানি কখনো ভেবে দেখে নি। ফল দাঁড়ায় এই যে, ১৭৬৮ সন থেকে শুরু হয় আকাল ও দুর্ভিক্ষ। ১৭৬৮ থেকে ১৭৮৯ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ কখনো আকাল ও দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্ত ছিল না। স্থানীয় বা জাতীয়ভাবে আকাল বা দুর্ভিক্ষ লেগেই ছিল। ১৭৬৮ সন থেকে দুর্ভিক্ষজনিত অনাহার ও মৃত্যুর কারণে দেশের জনসংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে। ১৭৯২ সনে এক সরকারি হিসাবে অনুমান করা হয় যে, কৃষিকর্মীর অভাবে দেশের কৃষিযোগ্য ভূমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পতিত অবস্থায় পশু-পাখি অধ্যুষিত জঙ্গলে পরিণত হয়েছে।[১৮] তা সত্ত্বেও বণিক সরকার প্রতি বছর নতুন বন্দোবস্ত করেছে রায়তের উপর খাজনা বৃদ্ধি করে। জমিদারগণ সরকারি রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হন, কেননা রায়ত শ্রেণী বর্ধিত হারে খাজনা দিতে সক্ষম হয় নি। সরকার সনাতন নিয়মে জমিদারের সঙ্গে জমি বন্দোবস্ত না করে অধিক রাজস্ব আদায়ের লোভে ভূমি বন্দোবস্ত করে নিলামের মাধ্যমে। নিলামে যারা সর্বোচ্চ হারে বন্দোবস্ত গ্রহণে সম্মত হয়েছে, তাদের সঙ্গে পাঁচ বছর মেয়াদে ভূমি ইজারার বন্দোবস্ত করা হয়।। ভূমি নিয়ন্ত্রণ ও রায়তের সঙ্গে সম্পর্কহীন এসব মেয়াদী ইজারাদার পরোক্ষ সরকারি অনুমোদন লাভ করে রায়ত শ্রেণীর সকল উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করার জন্য।

রায়ত শ্রেণীর মতো তাঁত ও অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত শিল্পোদ্যোক্তা ও শিল্পশ্রমিকরা কোম্পানি ও কোম্পানি-কর্মচারীদের লাগামহীন শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হয়। সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ রপ্তানিপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার শাস্তিমূলক আইন জারি করে। চুক্তি মোতাবেক সরবরাহ না করতে পারা চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। এই সব নিবর্তনমূলক আইনের অধীনে তাঁতীরা বস্তুত মুচলেকা-মজুরে (bonded labour) পরিণত হয়। মুচলেকা-তাঁতীরা খোলা বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। যদিও উৎপাদনের সকল উপকরণের মূল্য বেড়ে গিয়েছিল এবং খোলা বাজারে পণ্যমূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল, তবু কোম্পানির তাঁতীরা চুক্তি মোতাবেক পূর্বেকার মূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে বাধ্য হতো।[১৯]

১৭৯০-এর দশক থেকে ইউরোপে বিদ্যমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের দরুন বাংলার রপ্তানিবাণিজ্য অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের ফলে সামুদ্রিক

১৮. Governor General Lord Cornwallis's Minute, 18 September 1789, *Fifth Report,* 1812.
১৯. Debendra Bijoy Mitra, *The Cotton Weavers of Bengal 1757-1833,* (Calcutta 1978), 62.

যোগাযোগ ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠে। ফলে বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যে ইউরোপের যোগদান নিম্নতম পর্যায়ে নেমে আসে। তা ছাড়া বৃটিশ শিল্পজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টি করার জন্য বৃটেনে বাংলার রপ্তানিপণ্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপ করা হয়। ফলে ইউরোপীয় বাজারে বাংলার রপ্তানিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এসব কারণে ইউরোপে ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে বাংলার রপ্তানিপণ্যের বাজার ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হতে হতে আঠারো শতকের শেষে এসে আন্তর্জাতিক রপ্তানিবাণিজ্যে বাংলার অবস্থান তার পূর্বেকার সকল গৌরব ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। ১৮১৩ সালে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তিত হলে বাংলার বস্ত্ররপ্তানি বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মূল্যে ও গুণে বৃটিশ শিল্পজাত পণ্যের কাছে বাংলার রপ্তানিপণ্য মার খেতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, কিছুকাল আগেও যেখানে বাংলার তাঁতবস্ত্র বিশ্ববাজারে সমাদৃত ছিল, সেখানে ১৮২০-এর দশকে বাংলাদেশ ইউরোপ থেকে বস্ত্র আমদানি শুরু করে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই পরিবর্তনে তাঁতশিল্পের সঙ্গে জড়িত তাঁতী শ্রেণী ছাড়াও অসংখ্য বানিয়া, আড়তদার, পাইকার, বেপারি, যাচনদার, বয়াল, গোমস্তা, সরকার বেকারে পরিণত হলো।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে, রপ্তানিবাণিজ্যে চূড়ান্ত পতনের পর ঐসব শিল্পোদ্যোক্তা, তাঁতী, কারিগর, বানিয়া ও অন্যান্য মধ্যস্থ দালালদের কি গতি হলো? জীবিকা নির্বাহের জন্য এরা কোন পথ বেছে নিল? বিশেষকরে রপ্তানিবাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত বিপুল বানিয়াপুঁজির কি হলো? অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বানিয়াপুঁজি বাণিজ্য থেকে ভূমিনিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বিপুল সংখ্যক জমিদারি সরকারি রাজস্ব অনাদায়ের জন্য নিলামে বিক্রি হয়, এবং সে প্রক্রিয়ায় নবাগত জমিদারদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল রপ্তানিবাণিজ্যে লিপ্ত বানিয়া-মুৎসুদ্দি। দেব, মল্লিক, নন্দী, ঠাকুর, ঘোষাল ও আরো অনেক বিখ্যাত বানিয়া পরিবারগুলির ভূমিনিয়ন্ত্রণে আগমন উক্ত তত্ত্বের ভিত্তি। কিন্তু কারা কত পুঁজি বিনিয়োগ করেছে জমিদারি ক্রয়ে, এর সঠিক তথ্য রয়েছে নিলামের দলিলপত্রে। এই সব দলিলপত্র থেকে জানা যায় জমিদারি ক্রয়ে কত পুঁজি বিনিয়োজিত হয়েছে, কারাই বা ক্রেতা। সত্য যে নবাগত জমিদারদের মধ্যে বানিয়াদের সংখ্যা কম নয়, তবে যে পরিমাণ পুঁজি ভূমিক্রয়ে ব্যবহৃত হয়েছে তা ছিল সমগ্র বানিয়াপুঁজির এক ক্ষুদ্রাংশ। বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, বাকি বানিয়া পুঁজি উজাড় হয়েছে অন্যান্য অনুৎপাদনশীল খাতে, যেমন বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজা-পার্বণ, মন্দির, ঘাট, পুকুর, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণে। বানিয়াপুঁজির একটি অংশ হয়তো মহাজনি ঋণদান, শস্য ব্যবসা, কোম্পানির কাগজ ক্রয় প্রভৃতি খাতেও বিনিয়োজিত হয়েছে।

৩

মার্কিন স্বাধীনতাযুদ্ধে পরাজিত জেনারেল লর্ড চার্লস কর্নওয়ালিস যখন কলকাতায় এসে বৃটিশ রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন (১৭৮৬) তখন বাংলার অর্থনীতি ইতিমধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্নওয়ালিসকে নিয়োগ করে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনেব জন্য। সেটি হচ্ছে বাংলায় বৃটিশ লুণ্ঠন বন্ধ করা, অর্থনীতিকে পুনর্জীবিত করার

লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এমন একটি স্থায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা, যার অধীনে অর্থনীতি আবার গতিশীল হবে, জনগণ শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করবে এবং কোম্পানি ও বৃটিশ জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থও সাধিত হবে।[২০]

এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তন করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং এর আনুষঙ্গিক আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠানাদি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিকল্পনা অবশ্য লর্ড কর্নওয়ালিসের কোন মৌলিক অবদান নয়। ১৭৭৬ সালে কাউন্সিলসদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস সর্বপ্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করেন। এর পর থেকে কলকাতা ও লন্ডনে এ ব্যাপারে প্রচুর আলোচনা-পর্যালোচনা হতে থাকে এবং কর্নওয়ালিসের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রস্তাব একটি ভিন্ন গুরুত্ব লাভ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে কর্নওয়ালিস ও তাঁর উপদেষ্টাদের চিন্তা-ভাবনা ছিল ফিলিপের চেয়ে অনেক ভিন্ন। এ বন্দোবস্তের সুফল সম্পর্কে কর্নওয়ালিস ছিলেন নিঃসন্দেহ। তিনি আশা পোষণ করেছিলেন যে, এই বন্দোবস্তের ফলে দেশের কৃষি অর্থনীতিতে উত্তরণ ঘটবে।[২১] তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, একটি বিশেষ ব্যবস্থার ফল একেক দেশে একেক রকম হতে পারে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিপক্ষবাদীদের যুক্তির উত্তরে তিনি বলেন যে, ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা যদি ইংল্যান্ডে কৃষিবিপ্লব আনয়ন করতে পারে, তবে অনুরূপ ভূমিমালিকানা বাংলায় সৃষ্টি করলে এখানেও অনুরূপ কৃষিবিপ্লব ঘটতে বাধ্য। কর্নওয়ালিসের উন্নয়নচিন্তায় জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান ছিল একটি বড় প্রত্যয়। তাঁর মতে মানুষ সম্পদ সৃষ্টির জন্য প্রয়াসী হয় তখনই, যখন সে তাঁর সৃষ্ট সম্পদ ভোগ করতে এবং সে সম্পদ নিয়ে নিরাপদভাবে জীবন যাপন করতে পারে। কলকাতায় আগমন করে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা দেখে তিনি দারুণভাবে মর্মাহত হন। তাঁকে বিশেষভাবে পীড়া দিয়েছে সরকার কর্তৃক জমিদারকে এবং জমিদার কর্তৃক রায়তকে শোষণ। রায়তের সকল উদ্বৃত্ত কেড়ে নেয় রাষ্ট্র। একে কর্নওয়ালিস স্রেফ রাষ্ট্রীয় লুটতরাজ বলে গণ্য করেন, এবং তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই লুটতরাজপ্রক্রিয়ার ফলেই বাংলা এবং কোম্পানির অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে।

ভূমিতে জমিদারি সম্পত্তি সৃষ্টি করার প্রেরণা কর্নওয়ালিস লাভ করেছিলেন সমকালীন বৃটিশ রাজনৈতিক অর্থনীতি ও ফরাসী ফিজিউক্রেসীর চিন্তাধারা থেকে। বৃটেন ও ফ্রান্সে কৃষিঅর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল ভূস্বামীদের নেতৃত্বে। কিন্তু জমিদারদের নেতৃত্বে বাংলায় অনুরূপ পরিবর্তন আনয়ন করার চিন্তা অবাস্তব ছিল। কারণ, ইউরোপের

২০. কর্নওয়ালিসের পরিকল্পনাসমূহের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, C A. Aspinal, *Cornwallis in Bengal,* (Manchester 1931).

২১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Sirajul Islam, *Permanent Settlement in Bengal: A Study of its Operation 1790-1819,* (Dhaka 1978); R Guha, *A Rule of Property for Bengal. An Essay on the Idea of Permanent Settlement* (Paris 1963).

কৃষিবিপ্লবের পশ্চাতে শুধু ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানার প্রশ্ন ছাড়াও আরো অনেক কারণ ছিল ক্রিয়াশীল। প্রধান কারণগুলির মধ্যে ছিল নৌ-শক্তিবলে বিশ্বময় সমুদ্র উপকূলসমূহে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে বাজার সৃষ্টি, মূল্যবিপ্লব, শিল্পবিপ্লব, ঋণ ও লগ্নি সংস্থার ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বিকাশ, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি উন্নয়নকামী স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। এ সবের কোনটাই বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে বর্তমান ছিল না।

অতএব কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। কৃষি অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠে নি, কৃষক শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি বৈ কোন উন্নতি হয় নি। জমিদারদের উপর প্রত্যাশা স্থাপন করা হয়েছিল যে, এরা কৃষিউৎপাদন ও কৃষিসম্পর্ক উন্নয়নে উদ্যোগী নেতৃত্ব দেবে, যেমনটি দিয়েছিল ইউরোপের ভূস্বামী শ্রেণী। কিন্তু বাস্তবে জমিদারগণ গরিব কৃষকের কাছ থেকে জবরদস্তিমূলকভাবে আদায়কৃত তাদের অর্জিত খাজনার উপর নির্ভরশীল একটি পরনির্ভর শ্রেণীতে পরিণত হয়। জমিদারগণ কেন উন্নয়নকামী হয় নি এ নিয়ে অনুসন্ধানের যথেষ্ট অবকাশ আছে। তবে পুঁজিবাদী উন্নয়নে জমিদারদের অনীহার অর্থনৈতিক কারণ এই হতে পারে যে, পুঁজি বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনের যতোগুলি সুযোগ ছিল এর মধ্যে সবচেয়ে কম লাভজনক এবং সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল কৃষিখাত। অধিকতর লাভজনক এবং তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগপন্থা ছিল মহাজনি ব্যবসা, শস্য ব্যবসা, কোম্পানির কাগজ ইত্যাদি। মূল্যবিপ্লবের দরুন বৃটিশ ভূস্বামীরা কৃষিবিনিয়োগ থেকে যে হারে মুনাফা লাভ করতো, তা অন্য যেকোন বিনিয়োগক্ষেত্রের তুলনায় ছিল অধিক সুবিধাজনক। সমকালীন বাংলার কৃষি বিনিয়োগ থেকে অনুরূপ মুনাফা অর্জন ছিল অকল্পনীয়। মহাজনি, শস্য ব্যবসা প্রভৃতি ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিনিয়োগক্ষেত্র। তবে বাংলার কৃষির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বিনিয়োগের অভাব বিশ্লেষণ করতে শুধু লাভ-ক্ষতির পাল্লায় বিচার করলে চলবে না। জমিদারদের সিদ্ধান্ত শুধু অর্থনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত হয় নি। বরঞ্চ সমকালীন অভিজাত শ্রেণীর মনোভঙ্গি ছিল সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী নয়। অতএব তাদের জীবনধারায় অর্থনৈতিক উপাদানের চেয়ে সামাজিক উপাদানের প্রভাব ছিল বেশি গভীর। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নটি বিবেচনায় এসেছে অতি গুরুত্ব সহকারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যেসব বানিয়া ভূমিনিয়ন্ত্রণে এসেছে তারা অধিক মুনাফার জন্য ঐ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ কথা বলা যায় না। তারা জমিদারি এস্টেট ক্রয় করেছে অধিক সম্মানের জন্য, সামাজিক স্বীকৃতির জন্য।

পুরনো এবং নতুন জমিদার সবাই অবগত ছিলেন, তারা জমির মালিক হলেও এই মালিকানা ছিল শর্তাধীন। জমিতে রায়তের অধিকার ছিল। সে অধিকারের উৎস ছিল প্রচলিত প্রথা ও রেওয়াজ। ইচ্ছে করলেই রায়তের প্রদেয় খাজনার হার বৃদ্ধি করা যেতোনা

আর ইচ্ছে করলেই কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করা সম্ভব ছিল না। খাজনার হার নির্ধারিত হতো পরগনা নিরিখ অনুসারে, চুক্তি অনুসারে নয়। পরগনা নিরিখ উপেক্ষা করে খাজনার হার বৃদ্ধি করলে প্রজাকুলের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ছিল অবশ্যম্ভাবী। পুঁজি বিনিয়োগ করে উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি করলে তদনুপাতে খাজনা বৃদ্ধি করা ছিল সুকঠিন কাজ। এদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি হলে খাজনা মওকুফ করতে বাধ্য হতো জমিদার। ভাল ফসল ঘরে আসলে কৃষিপণ্যের মূল্য কমে যেতো এবং ভাল ফসলের সুবিধা থেকে কৃষক বঞ্চিত হতো। তা হলে জমিদার কোন্ অর্থনৈতিক যুক্তিতে জমির উন্নয়নে পুঁজি বিনিয়োগ করবে?

তবে কৃষির উন্নয়নে না হোক, কৃষির সম্প্রসারণে অনেক জমিদার পরোক্ষ অবদান রেখেছেন। কৃষিযোগ্য পতিত জঙ্গলভূমি আবাদ করার জন্য অনেক জমিদার আবাদ তালুক সৃষ্টি করে নামেমাত্র খাজনায় মধ্যস্বত্বাধিকারীর কাছে তা বন্দোবস্ত দেন। বস্তুত নগদ সেলামি দিয়ে মধ্যস্বত্বাধিকারীরা তালুক কিনে নেন এবং বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করে ঐ সব পতিত জমি কৃষিযোগ্য করে তোলেন। মধ্যস্বত্বাধিকারীদের পুঁজি বিনিয়োগ ও উদ্যোগের ফলে উনিশ শতকে কৃষির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। প্রধান প্রধান আবাদ-এলাকাগুলোর মধ্যে ছিল চট্টগ্রামের সমগ্র উপকূল অঞ্চল, নোয়াখালীর উপকূল অঞ্চল, মেঘনা ব-দ্বীপ এলাকা, সুন্দরবন এলাকা, বরেন্দ্র এলাকার অনেক অংশ এবং উত্তর-পূর্ব বাংলার হাওর অঞ্চল। আঠারো শতকের শেষ সিকিতে ঐসব অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, এবং মধ্যস্বত্বাধিকাবীদের আবাদ আন্দোলনের ফলে উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে এগুলি শ্যামল শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়।[২২] ১৭৭০-এর দশকে রেনেলকৃত জরিপে সুন্দরবন এলাকাকে দেখানো হয়েছে "জনশূন্য, তবে একদা জনপদবহুল"। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ ঐ অঞ্চল আবার জনাকীর্ণ হয়ে উঠে। আবাদ আন্দোলনের ফলে সুন্দরবন এলাকা কেমন অর্থনৈতিক রূপ ধারণ করে এ সম্পর্কে একটি সরকারি রিপোর্টে বলা হয় :

> দেশের অন্যান্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৃক্ষবেষ্টিত গ্রাম আর গ্রাম। কিন্তু সুন্দরবন এলাকায় দেখা যায় একটি ভিন্নরূপ। তাকিয়ে দেখুন, এ যেন একটি মহা প্রান্তর, উভয়দিকে প্রসারিত মাইলের পর মাইল সোনালী ধানে ভরা সমতল মাঠ। দোলা খাওয়া ধান্যভূমির সমুদ্র মিশে গেছে ভাটির বনভূমির নীলিমায়। এই চিত্র শুধু ঐ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ, যেখানে বছরের পর বছর চলেছে আবাদ অপারেশন।[২৩]

২২. হাওর অঞ্চল আবাদ হয়েছে অনেক পরে। জনসংখ্যার চাপের মুখে উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে এই অঞ্চল আবাদ হতে থাকে। আবাদি কৃষক আসে পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর প্রভৃতি বর্তমান বৃহত্তর জেলা থেকে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, *Villages in the Haor-Basin of Bangladesh*, (Tokyo 1985), দ্বিতীয় অধ্যায়।

২৩. *Annual Report on the Internal Trade of Bengal, 1876-77*, (Calcutta 1877), 27.

উনিশ শতকের বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য বোধ হয় কৃষি সম্প্রসারণ। দেশের অর্থনীতির অন্য কোন খাতে এত বিস্তার দেখা যায় নি। জঙ্গলভূমি পরিষ্কার করে আবাদকাজ পরিচালনা অবশ্যই দেশের কৃষি-অর্থনীতির বড় দিক, যে বিষয়টি এখনো পণ্ডিতদের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। উনিশ শতকের কৃষি-অর্থনীতির এ গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যে জমিদারদের ভূমিকা অতিশয় গৌণ। এটা ছিল মধ্যস্বত্বাধিকারী শ্রেণীর প্রায় একক কৃতিত্ব। আবাদ সংগঠনে জমিদারদের ভূমিকা ছিল আবাদকার তালুকদারদের কাছে জঙ্গলভূমি চিরস্থায়ী ইজারা দিয়ে দেয়া। আবাদকার তালুকদারগণ কিছু পুঁজি বিনিয়োগ করে ভূমিতে আরেক ডিগ্রি চিরস্থায়ী ইজারা স্বত্ব সৃষ্টি করেন। এমনিভাবে আবাদকাজ সম্পন্ন করে ভূমি কৃষিউপযোগী করা পর্যন্ত আবাদকার তালুকদার থেকে কৃষক পর্যন্ত কয়েক দফা মধ্যস্বত্ব স্তর সৃষ্টি হয়। মধ্যস্বত্বের স্তর গ্রাম পত্তনকারী প্রধান কৃষক পর্যন্ত পৌঁছেছে। তবে উপর থেকে নীচে পর্যায়ক্রমে মধ্যস্বত্বগুলি সৃষ্টি হয়েছে ভূমির আবাদকে মূল লক্ষ্য বিবেচনা করে। আবাদের পর ভূমি থেকে যে আয় হবে সেটার উপর লক্ষ্য রেখেই সবাই মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থায় যোগদান করেছে। আবাদের জন্য প্রয়োজন ছিল বিপুল পুঁজির এবং সে পুঁজির বৃহদংশ সরবরাহ করেছে আবাদকার তালুকদার এবং তাদের অধীনস্থ মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ। গ্রাম পত্তনকারী নেতাও ছিলেন একজন মধ্যস্বত্বাধিকারী, তবে তিনি তাঁর স্বত্বের জন্য প্রধানত বিনিয়োগ করেন শ্রম। সকল স্তরের মধ্যস্বত্বাধিকারীর লক্ষ্য ছিল কৃষকের উদ্বৃত্ত থেকে মুনাফা অর্জন। সুন্দরবন আবাদ অঞ্চলের খাজনার হার থেকে মধ্যস্বত্বের মুনাফার একটি চিত্র পাওয়া যায়। ১৮৪০-এর দশকে সেখানে এক কানি (১ কানি=২.৬৫ একর) জমির খাজনার হার ছিল ছয় টাকা। জমিদার থেকে নিম্নতম স্তরের মধ্যস্বত্বাধিকারীর মধ্যে উক্ত খাজনা ভাগাভাগি হতো। এ ভাগাভাগিতে জমিদারের অংশ ছিল নামেমাত্র, কারণ সেলামি গ্রহণ করে তারা জমি চিরস্থায়ী ইজারা দিয়ে দেন আবাদকার তালুকদারের কাছে।

দেখা যাচ্ছে যে, কৃষি অর্থনীতিতে মধ্যস্বত্ব শ্রেণী ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল উনিশ শতকে। মধ্যস্বত্বাধিকারীর পুঁজি বিনিয়োগ ও সংগঠন ছাড়া উনিশ শতকের আবাদ আন্দোলন মোটেই গতিলাভ করতে সক্ষম হতো না। কিন্তু মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর বিনিয়োগ পুঁজিবাদের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে নি। বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন না করে মধ্যস্বত্বাধিকারীরা অচিরেই নির্দিষ্ট খাজনা ও সেলামির বিনিময়ে আরেক দফা মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করে নিজেদেরকে অনর্জিত আয়ের উপর নির্ভরশীল পরজীবী শ্রেণীতে পরিণত করে। দ্বিতীয় স্তরের মধ্যস্বত্বাধিকারী সৃষ্টি করে তৃতীয় স্তর, তৃতীয় স্তর হতে সৃষ্টি হয় চতুর্থ স্তর। এমনিভাবে জমিদার থেকে আসল চাষী এ দুই শ্রেণীর মধ্যখানে সৃষ্টি হয় বহু স্বত্বস্তর। দক্ষিণ বঙ্গে এই সব স্বত্বস্তরকে বলা হতো সেকা। সেকার উপর সেকা সৃষ্টির মানে মধ্যস্বত্বাধিকারীসহ কৃষককুলের দারিদ্র্য বৃদ্ধি, কারণ প্রত্যেকটি সেকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিছুটা লাভের উপর। একই জমির উপর এতগুলো সেকার মানে একদিকে কৃষকের উপর জুলুম, অন্যদিকে মধ্যস্বত্বাধিকারীর দারিদ্র্য।

ইংল্যান্ডের ইজারাদারদের মতো বাংলার মধ্যস্বত্বাধিকারী নামে স্থায়ী ইজারাদারগণও ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে পুঁজিবাদী পরিবর্তন করতে পারতেন। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নি। কেন মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ পুঁজিবাদী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে নি এ নিয়ে অনেক যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা যায়। তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, মধ্যস্বত্বাধিকারী শ্রেণী পুঁজিবাদী নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কৃষি-অর্থনীতিতে এরা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে আবাদপ্রক্রিয়ার সময়। পতিত জমি আবাদ পর্ব শেষ হয়ে গেলে সাধারণ জমিদারদের মতো মধ্যস্বত্বাধিকারীরাও নিজেদের খাজনাজীবী শ্রেণীতে রূপান্তরিত করে। ভূমি ব্যবহারে তাদের কোন ভূমিকা না থাকায় এবং কৃষিকাজের সঙ্গে কোন সরাসরি সম্পর্ক না থাকায় মধ্যস্বত্বাধিকারী ভূস্বামীগণ গ্রাম ছেড়ে শহরে যাত্রা করে, গ্রহণ করে কোন না কোন শহুরে পেশা। কৃষকদের থেকে সংগৃহীত খাজনা পাচার হয় শহরে। শহরে গ্রামীণ সম্পদ পাচার বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বাংলার অর্থনীতির এক বড় বৈশিষ্ট্য। জমিদার, মধ্যস্বত্বাধিকারী, ইজারাদার ও অন্যান্য ভূস্বামী শ্রেণীর গ্রামত্যাগ পল্লীর সনাতন আর্থকাঠামোকে চরমভাবে আঘাত করেছে। পল্লীর কাছারি, সালিশ, গ্রাম-পঞ্চায়েত, মেলা, পুণ্যাহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিমূলে আঘাত আসে। গৃহনির্মাণ, পুকুর-ঘাট-জলাশয় নির্মাণ, চারু-কারুশিল্প, যোগাযোগ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে সমুদয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্তিমিত হয়ে পড়ে। ম্রিয়মান হয়ে যায় গ্রামের সনাতন কর্মচাঞ্চল্য।

ফসলবিন্যাসের দিক থেকে উনিশ শতকে যুগান্তকারী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ সুতী ও রেশমবস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হতো। এটা সম্ভব ছিল এজন্য যে, চট্টগ্রাম থেকে পূর্ণিয়া পর্যন্ত এলাকায় বিভিন্ন মানের তুলা উৎপন্ন হতো। সর্বোৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদিত হতো ঢাকায়। আঠারো শতকের শেষ দশক থেকে তাঁতজাত পণ্য রপ্তানি হ্রাস পেতে থাকায় তুলার চাহিদাও হ্রাস পেতে থাকে। স্বাভাবিক কারণেই আনুপাতিক হারে তুলার আবাদও কমতে থাকে। তুলার আবাদ নগণ্য পর্যায়ে নেমে আসে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে। কারণ তখন তুলাজাত পণ্যের রপ্তানিও নেমে আসে প্রায় শূন্যের কোঠায়। একই সময়ে বৃদ্ধি পায় নীলচাষ। এদেশে নীলচাষের প্রচলন ছিল প্রাচীনকাল থেকেই। তবে এর আবাদ ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু বিশ্বযোগাযোগের উন্নয়ন ও বিশ্ববাজারের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের প্রথম থেকে নীলের আবাদ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। নীল আবাদ বৈপ্লবিক হারে বৃদ্ধি পায় লর্ড বেন্টিংক-এর শাসনামলে এবং এর পরবর্তী দুই দশকে। ঔপনিবেশিক শাসনকালে উদ্বৃত্ত ফসল স্বদেশে প্রেরণের প্রয়োজনে তাদের রপ্তানিযোগ্য বাণিজ্যিক ফসল প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। নীল ছিল এই বাণিজ্যিক ফসলের অন্যতম। কিন্তু বিবিধ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক কারণে নীল-অর্থনীতি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৮৫০-এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলার নীলের চাহিদা হ্রাস পেতে থাকে এবং স্বাভাবিক কারণেই এর সঙ্গে কমতে থাকে নীল আবাদ। চাষীদের জন্য নীলচাষ একটি অত্যাচারের

মাধ্যমে পরিণত হয়। নীল উৎপাদনে অনিচ্ছুক চাষীদের সংগঠিত প্রতিরোধের মুখে অবশেষে ইউরোপীয় নীলকরেরা নীলচাষে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে নেয়। ১৮৬০-এর দশকে বাংলায় নীলচাষ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে।

অচিরেই নীলের স্থান দখল করে আরেকটি অর্থকরী ফসল, পাট। নীলের মতো পাটও এদেশে উৎপন্ন হতো সুপ্রাচীন কাল থেকেই। কিন্তু তখন এর ব্যাপ্তি ছিল গৃহস্থালী প্রয়োজন মেটানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পাটের তেমন কোন বাণিজ্যিক আকর্ষণ ছিল না। ইউরোপীয় বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পাট উৎপাদন শুরু হয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি অবধি পাটের আবাদ ছিল অতিশয় নগণ্য। ব্যাপক হারে পাটচাষ এবং পাট-আঁশের বাণিজ্যিকীকরণ শুরু হয় ১৮৭০-এর দশক থেকে। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে পাট বাংলার কৃষি-অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে নেয়। কৃষি-আয়ের উৎস হিসেবে পাটকে তখন তুলনা করা হয় স্বর্ণের সঙ্গে। কিন্তু এই স্বর্ণ-আঁশের স্বর্ণযুগ শেষ হয় ১৯২৬ সনে, যখন পাটের বাজারে মন্দা শুরু হয়। ১৯৩০ সনে পাট-অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। পাট ছিল বিশ্বমন্দার অন্যতম শিকার।

বাংলার কৃষি-অর্থনীতির ইতিহাস রচনায় তুলা, নীল, আফিম, ইক্ষু, পাট প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম। এসব ফসলের সঙ্গে জড়িত ছিল বাংলার কৃষককুল ও অন্যান্য মধ্যবেপারির ভাগ্য। জাতীয় অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সকল গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসলের উত্থান-পতনের একটি সমন্বিত ইতিহাস রচনা আমাদের পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাস প্রণয়ন প্রচেষ্টাকে অনেক দূর এগিয়ে নিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি অর্থকরী ফসলের উপর কোন বিস্তারিত বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাস রচিত হয় নি। অনেক সুযোগ্য অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক এ মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এদেশে বাণিজ্যিক ফসলের প্রবর্তন করা হয়েছে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। নগদ অর্থে খাজনা সংগ্রহ এবং ঔপনিবেশিক শাসনের উদ্বৃত্ত স্বদেশে প্রেরণের জন্য কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাছাড়া রপ্তানির চেয়ে আমদানি অধিক হওয়ায় বাণিজ্যিক ঘাটতি পরিশোধ করার জন্যও নগদ অর্থের প্রয়োজন ছিল। তাঁদের মতে, বাংলার কৃষককুল খাদ্যশস্যের পাশাপাশি অর্থকরী ফসল উৎপাদন করেছে ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, বাধ্য হয়ে। এই তত্ত্বের সমর্থকগণ যুক্তি দেন যে, অর্থকরী ফসল চালু করা হয়েছে বৃটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থে, কৃষকের স্বার্থে মোটেই নয়। তাঁরা আরো মনে করেন যে, বাণিজ্যিক ফসল প্রবর্তনের ফলে খাদ্যশস্যের আবাদ স্বাভাবিক কারণেই হ্রাস পায় এবং এর প্রভাবে দেশে খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাঁদের মতে, বাংলার কৃষকরা বাজারমূল্য সম্পর্কে ছিল উদাসীন এবং বাজারমূল্য কৃষকের উৎপাদন-সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে নি।

তবে এই তত্ত্বের সারবত্তা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। প্রথমত এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, নীল, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি অর্থকরী ফসল এদেশে নতুন প্রবর্তিত

হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার আগেও দেশী ও বিদেশী জাহাজের চালানে নীল ও পাটজাত পণ্য, বিশেষকরে চটের থলের উল্লেখ দেখা যায়। ঐতিহাসিক সত্য এই যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ফসলের আবাদও বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন আঠারো শতকে তুলার আবাদ ছিল ব্যাপক এবং পাট ও নীল আবাদ ছিল নগণ্য। কিন্তু উনিশ শতকে তুলার আবাদ নেমে আসে এবং বেড়ে যায় নীল ও পাটের আবাদ। উনিশ শতকের শেষপাদে পাটের আবাদ তুঙ্গে উঠে, কিন্তু নীলচাষ নেমে আসে সর্বনিম্নে। এই সব পরিবর্তন ঘটেছে অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ববাজার অবস্থার পরিবর্তনের ফলে। চাষীরা বাজারমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করে বিশেষ অর্থকরী ফসলের আবাদও কমিয়েছে বা বাড়িয়েছে। কোন ফসল যদি অন্য ফসলের তুলনায় কম লাভজনক মনে হতো, তখন কৃষকরা অবশ্যই এর আবাদ কমিয়ে দিত, এমনকি বন্ধ করে দিত, যেমন ঘটেছে তুলা ও নীলের ক্ষেত্রে। প্রথম প্রথম চাষীরা নীলচাষে আগ্রহী ছিল, কেননা তখন এর বাজারমূল্য ছিল সুবিধাজনক। কিন্তু ১৮৫০-এর দশকে নীলের মূল্য পড়ে গেলে কৃষকরা এর আবাদে অনাসক্ত হয়ে পড়ে। ইংরেজ নীলকরগণ নীল আবাদ করতে কৃষকদের চাপ দিলে কৃষকরা এর প্রতিবাদে বিদ্রোহ করে।

এ মর্মে যথেষ্ট প্রমাণ নেই যে, বাণিজ্যিক ফসল ফলাতে কৃষকরা বাধ্য হয়েছিল এবং বাণিজ্যিক ফসলের দরুন খাদ্যশস্যের আবাদ কমে যায় এবং কৃষক শ্রেণী খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। সবক'টি অর্থকরী ফসল একই সময়ে সারাদেশে উৎপাদিত হতো না। যেমন নীল ও পাটের ব্যাপক আবাদ একই সময় ঘটে নি। তাছাড়া অর্থকরী ফসল ফলানো হয়েছে খাদ্যশস্যের বদলে নয়। ধান ও পাটের জমি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাট উৎপাদিত হতো নিম্নভূমিতে, যা ধান বা অন্য কোন খাদ্য-ফসল চাষের জন্য অনুপযোগী।[২৪] এ যুক্তিও প্রমাণিত নয় যে, চাষীরা পাটচাষ করেছে মহাজনদের চাপের মুখে। এ ব্যাপারে আকবর আলী খান যুক্তি দেন যে, চাষীরা আসলে পাটের মতো অর্থকরী ফসল উৎপন্ন করেছে বাজার অর্থনীতির কারণে, মহাজনের প্রভাবে নয়।[২৫]

কিন্তু আকবর আলী খানের যুক্তিতে আমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। চাষীরা যদি খানের মতানুসারে মূল্যমুখী (price-responsive) হয়ে থাকে এবং তারা যদি উৎপাদনক্ষেত্রে অন্ধ ঐতিহ্যের অনুসারী না হয়ে থাকে, তাহলে বাংলার সনাতন খোরাকি কৃষিতে (subsistence agriculture) পুঁজিবাদী পরিবর্তন সূচিত হয় নি কেন? এ ব্যাপারে জমিদার ও অন্যান্য ভূস্বামী শ্রেণীকে কোন পুঁজিবাদী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় নি। এদের ব্যর্থতার ফলে সরকার কৃষিকে অধিকতর গতিশীল করে তোলার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনের সংস্কার করে ভূমিতে কৃষকের সীমিত অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (১৮৮৫)-এর উদ্দেশ্য ছিল উপরস্থ কৃষকদের উদ্বৃত্ত যেন জমিদারগণ হরণ

২৪. এ প্রসঙ্গে একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, Akbar Ali Khan, *Some Aspects of Peasant Behaviour in Bengal 1890-1914: A Neo-Classical Analysis,* (Dhaka 1982), 45-72.

২৫. ঐ, 113

করতে না পারে। আশা করা হয়েছিল, উপরন্তু রায়তের হাতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হলে সে সঞ্চয় পুঁজি গঠনে সহায়তা করবে এবং কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের সৃষ্টি হবে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ফলে খাজনা বৃদ্ধি করা খুব দুরূহ হয়ে পড়ে। তাই দেখা যায় যে, তিন দশকের মধ্যে কৃষকের উপর জমিদারি খাজনার চাপ বিপুলভাবে কমে আসে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কৃষকদের খাজনার হার মোট উৎপন্ন ফসলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চতুর্থাংশ দাবি করা হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম সিকিতে সে খাজনার হার নেমে আসে উৎপন্ন ফসলের ষোল ভাগের এক ভাগ থেকে বিশ ভাগের এক ভাগে।[২৬]

তবে ভূমিতে কৃষকের স্বত্ব সৃষ্টি করে পুঁজিবাদী পরিবর্তন আনার নীতিও দারুণভাবে ব্যর্থ হয়। ১৮৫৯ সাল থেকেই পর্যায়ক্রমে প্রজাদেরকে ভূমিতে স্বত্ব প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ প্রক্রিয়াতেই প্রণীত হয় ১৮৮৫ সালের বিখ্যাত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে এই আইনকে কৃষকের অধিকারের এক মহাসনদে পরিণত করা হয়। কিন্তু ভূমিতে প্রজার স্বত্ব সৃষ্টির যে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল তা মোটেই সফল হয় নি। কৃষকের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী পরিবর্তন ঘটে নি। বরঞ্চ, এর ফলে সমাজকাঠামোর অনেক নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। কৃষক শ্রেণী জমি হস্তান্তরের অধিকার প্রাপ্ত হলে গ্রামে কৃষক পর্যায়ে একটি ভূমিবাজার সৃষ্টি হয়। ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অচিরেই ভূমি নিয়ন্ত্রণে বিরাট বৈষম্য প্রকাশ পায়। গ্রামের জমি কতিপয় শক্তিমান জোতদারের হাতে পুঞ্জীভূত হবার প্রবণতা দেখা দেয়। এ প্রক্রিয়ার ফলে দেখা যায় যে, ১৯৩০-এর দশকে এসে রায়ত শ্রেণীর এক বিরাট অংশ ভূমিহীন হয়ে পড়ে। ক্ষুদ্র কৃষকে পরিণত হয় আরেকটি বড় অংশ। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হয় গ্রামের জমি, কিন্তু ঐ মুষ্টিমেয় বড় জোতদার পুঁজিবাদী মালিকে পরিণত হয় নি। পুজিবাদী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা না করে এই সব জোতদার সামন্ত মডেলে বর্গাদার বা আধিয়ার নামে ভাগচাষীর মাধ্যমে উৎপাদনব্যবস্থা চালিয়ে যায়। ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকগণ এখন জোতদারের বর্গাদার, পুঁজিবাদী নিয়মে বেতনভোগী মজুর নয়। বর্গাদার কৃষক অবশ্যই পুঁজিহীন। অতএব বর্গাদার কর্তৃক ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগের প্রশ্ন উঠে না। এর সামগ্রিক ফল দাঁড়ায় এই যে, জমিতে উৎপাদন বাড়ে নি। মালিক হিসেবে জোতদাররা ফসলের অর্ধেক অংশ হস্তগত করতো। মুনাফার দিক দিয়ে বিচার করলে জোতদারগণ জমি বর্গা দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন, কেননা অনুন্নত পুঁজিবাদী কৃষি-সম্পর্কে বর্গার চেয়ে অধিক মুনাফা

২৬. মনে রাখা দরকার যে, গোটা দেশের জন্য কোন একক খাজনার হার বলবৎ ছিল না, কোন জেলায়ও না। এমনকি একটি বিশেষ পরগনার মধ্যেও কোন একক খাজনার হার বিদ্যমান ছিল না। খাজনাকাঠামোর দিক থেকে প্রতিটি মৌজাই ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। খাজনার হার অনেকাংশে নির্ভর করেছে জমির উৎপাদনক্ষমতার উপর। তবে কৃষি-স্বত্বও ছিল খাজনাহারের একটি নিরূপক। আবাসিক স্থিতিশীল রায়তের খাজনার হার অস্থিতিশীল রায়তের খাজনার চেয়ে ছিল অপেক্ষাকৃত কম। রাজস্ব জরিপে দেখা গেছে, উনিশ শতকে এবং এর পরে যে পরিমাণে কৃষকের আয় বেড়েছে সে পরিমাণে খাজনার হার বৃদ্ধি পায় নি।

অর্জন সম্ভব ছিল না। ক্ষতিকর বর্গাব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরকার কোন আইন প্রণয়ন করে নি, করলেও তা হয়তো কার্যকর করা সম্ভব হতো না। কারণ শহরে শিল্পায়ন ব্যতিরেকে ভূমিহীন কৃষকদের কর্মসংস্থান করা সম্ভব ছিল না। অতএব, জোতদারের শর্ত মেনে নিয়ে গ্রামে থেকে বর্গাদার হতে তারা বাধ্য হতো। জোতদারি শোষণের বিরুদ্ধে কোন জনমত সৃষ্টি করাও সম্ভব হয় নি, কারণ ১৯১৯ ও ১৯৩০ সালের ভারতীয় আইনের অধীনে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত জোতদার শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ে। জোতদারদের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার জোতদারদের অনুকূলেই আইন প্রণয়ন করে।[২৭]

৪

মানুষের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা কতটুকু ভাল বা মন্দ তা যাচাইয়ের একটি নির্ভরশীল মানদণ্ড হচ্ছে মজুরিসূচক। আরেকটি সমগুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হচ্ছে ভোগ্যপণ্যের বাজারমূল্য। মজুরি ও মূল্য—এ দু'টি উপাদান বিশ্লেষণ করলে একটি বিশেষ সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি নির্ভরযোগ্যভাবে জানা সম্ভব। কেননা মজুরি ও মূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতার একের প্রতি অন্যের প্রাপ্যকে চিত্রিত করে। এই বহুল উদ্ধৃত উক্তি নিরর্থক যে একদা জীবনযাত্রা ছিল এত সহজ যে টাকায় তখন আট মণ পর্যন্ত চাল ক্রয় করা যেতো। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে এর অর্থ শুধু এই যে, রৌপ্যমুদ্রার সঙ্গে চালের বিনিময়ে রৌপ্য ছিল অনেক তেজি। এর মানে এ নয় যে, গোটা অর্থনীতিই ছিল তেজি। রৌপ্যের উচ্চমূল্য ভোক্তাদের উচ্চ ক্রয়ক্ষমতা বোঝায় না। অন্য কথায়, রৌপ্যের বাজারমূল্য রৌপ্যের সরবরাহ ও চাহিদাকে চিত্রিত করে, মালিকানা ও বিনিময়-অবস্থাকে চিত্রিত করে না। এক খণ্ড রৌপ্যের যেমন ক্রয়ক্ষমতা আছে, তেমনি আছে এক ইউনিট শ্রমেরও ক্রয়ক্ষমতা। এক ইউনিট শ্রমের বিনিময়ে কতটুকু ভোগ্যপণ্য ক্রয় করা যায় এটাই নির্ণিতব্য বিষয়। শ্রম ও পণ্যের বিনিময়ব্যবস্থা যদি এমন হয় যে এক ইউনিট শ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য প্রাপ্য পণ্য কম, তাহলে শ্রমবিক্রেতার জীবন হবে দুর্বিষহ এবং পণ্যবিক্রেতা হবে ঐশ্বর্যশালী। এখানে পণ্য বলতে শ্রমের সঙ্গে বিনিময়যোগ্য অন্য সব কিছুকে বোঝানো হচ্ছে। অসম বিনিময়ব্যবস্থায় টাকায় আট মণ চাল পাওয়া গেলেও শ্রমিক ক্রয়ক্ষমতার অভাবে পুষ্টিহীনতায় ভুগতে পারে বা দুর্ভিক্ষের শিকার হতে পারে। একই যুক্তি খাটে ঐ কৃষকের বেলায়, যে তার শ্রম ও পুঁজি দিয়ে চাল উৎপাদন করলো। সে টাকায় যদি আট মণ চাল বিক্রয় করে আর ঐ টাকায় যদি অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের সাথে ন্যায্য বিনিময় না ঘটাতে পারে, তাহলে অভাব-অনটন তার অবশ্যম্ভাবী।

মূল্য ও মজুরি সংক্রান্ত তথ্য খুবই সীমিত, বিশেষকরে উনিশ শতকের মাঝামাঝি অব্দি। অতএব, আঠারো ও উনিশ শতকের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা কেমন ছিল এ ব্যাপারে নির্ভরশীল বিবরণ দেয়া কঠিন। তবে যেহেতু প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে দেশ শাসিত হয়েছে একটি সামরিক আভিজাত্য কর্তৃক এবং রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ছিল সমাজের

২৭. George Blyn, *Agricultural Trends in India, 1891-1947,* (Philadelphia 1966), 165-184.

উচ্চশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে, সেহেতু অনুমান করা যায় যে, সম্পদ বিনিময় ও বণ্টন ব্যবস্থায় উচ্চশ্রেণীই ভোগ করেছে সম্পদের সিংহভাগ, যদিও সংখ্যায় এরা ছিল নগণ্য। একজন ফৌজদার বা তার সমতুল্য কর্মকর্তার আয় ছিল রাজকীয়। শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠ আয় থেকে শাসক শ্রেণী ভোগ করেছে এমন এক জীবনযাত্রা, যা ছিল সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত। অনুরূপভাবে কোম্পানি আমল এবং এর পরেও উচ্চ আমলা শ্রেণীর আয় ছিল বিপুল। ১৭৯৩ সালে একজন জেলা কালেক্টরের মাসিক বেতন ছিল অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ছাড়া তিন হাজার টাকা। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও ছিল প্রায় সম অঙ্কের। ঐ সময় যেকোন মফস্বল শহরে টাকায় দুই মণ সরু চাল কেনা যেতো। সুতরাং চালের হিসেবে তখন একজন জেলা কালেক্টরের মাসিক বেতন ছিল ন্যূনতম ছয় হাজার মণ চাল। আর বর্তমানে একজন জেলা কমিশনারের মাসিক বেতন হচ্ছে চালের হিসেবে সর্বোচ্চ তেরো মণ চাল। অতএব নবাবি ও কোম্পানি আমলে শাসক শ্রেণীর জীবনযাত্রা যাচাই করা একটি নিরর্থক চেষ্টা। শাসক শ্রেণী দেশ শাসন করেছে তাদের নিজেদের স্বার্থে। স্বাভাবিকভাবে সম্পদ বিনিময় ব্যবস্থায় তাদের অবস্থান ছিল অকল্পনীয়ভাবে অসম ও অন্যায্য। তবে সাধারণ মানুষের জীবনমান তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া অবশ্যই অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকদের একটি পরম কর্তব্য।

নবাবি যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের মজুরি সম্পর্কে কোন স্থানীয় উপাদান এখনো উদঘাটিত হয় নি। অবশ্য ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের নথিপত্রে মজুরির হার সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তবে বিদেশী কুঠিসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরির হার দেশের সাধারণ শ্রমিকের মজুরির হারকে প্রতিফলিত করে কিনা বলা কঠিন। ইংরেজদের কাশিমবাজার ফ্যাক্টরি রেকর্ডস (১৭৩৯)-এ বিভিন্ন মজুর শ্রেণীর মাসিক মজুরি নিম্নোক্তভাবে বিধৃত হয়েছে[২৮]:

রাজমিস্ত্রি	৩-০০-০	টাকা
ছুতোর	২-১৫-০	"
কুলি	২-০০-০	"
মাঝি	৩-০০-০	"
ধোবা	১০-০০-০	"
নাপিত	৩-০০-০	"
মশালচি	২-০০-০	"

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সাধারণ শ্রমিকদের আয় ছিল অনেক নিম্নপর্যায়ের।[২৯] তবে বাজারমূল্যও যেহেতু ছিল অতিশয় নিম্নপর্যায়ের, ফলে একজন দিনমজুর পাঁচ জনের একটি

---

২৮. Cited in Bhattacharya, *East India Company,* 205.

২৯. Abdul Karim, *Dacca: The Mughal Capital,* (Dhaka 1964), 105.

পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারতো। দুঃসহ অভাব-অনটন তার ছিল না। মোটা চাল তখন টাকায় প্রায় দুই থেকে তিন মণ পর্যন্ত পাওয়া যেতো। অতএব বিদ্যমান বাজারমূল্যে তখন একজন শ্রমিক তার মজুরি দিয়ে পাঁচ-ছয় মণ চাল কিনতে পারতো যা বর্তমানে সম্ভব নয়। নবাবি যুগে বয়নশ্রমিকদের অবস্থা অবশ্য ততোটা ভাল ছিল না। বয়নশ্রমিকের মায়না ছিল মাসিক দু'টাকার কম। ফলে তার অর্থনীতি ছিল খুবই দুর্বল। অভাব ছিল তার নিত্যসঙ্গী।[৩০] কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের অস্তিত্ব প্রায় নেই বলা যায়। কারণ চাষাবাদ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করার জন্য তখন জমির অভাব ছিল না। জমি ছিল সরকারি সম্পত্তি। কৃষক জমি ভোগ করতে পারতো, কিন্তু হস্তান্তর করতে পারতো না। ফলে কৃষকের পক্ষে ভূমিহীন মজুরে পরিণত হবার সম্ভাবনা ছিল না। পারিবারিক শ্রমে পরিচালিত হতো কৃষিকর্ম। পারিবারিক শ্রমের বাইরে শ্রমের প্রয়োজন হলে প্রতিবেশীর শ্রম ধার করার প্রথা ছিল। শ্রমের সঙ্গে বিনিময় হতো শ্রমের। বিনিময়যোগ্য শ্রম ছাড়াও ছিল কৃষিদাস শ্রম। অভিজাত ও ধনী কৃষক শ্রেণীর লোকেরা দাসশ্রম ব্যবহার করতো। কৃষিদাসের ভাগ্যোন্নতির কোন অবকাশ ছিল না বটে, তবে পরিবারে তার অবস্থান ছিল নিরাপদ। তার ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল মালিকের এবং দাসের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের কোন ঐতিহ্য ছিল না। পরিবারের অন্যান্যদের মতো দাসও ছিল পরিবারের একজন সদস্য, তবে উত্তরাধিকারবিহীন।

আঠারো শতকের শেষ অব্দি কোম্পানিশাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নমজুরি এবং উচ্চমূল্য। ফলে মানুষ আকাল ও দুর্ভিক্ষের শিকার হতো। ১৭৬৭ থেকে ১৭৯০ পর্যন্ত বলা যায় আকাল-দুর্ভিক্ষের যুগ। এ সময়কালে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও অভাবের ফলে জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে বড় শিকার ছিল বয়নশ্রমিক শ্রেণী। এদের শ্রমের বিনিময়ে যা ক্রয় করা যেতো তা দিয়ে জীবন চলতো না। চালের মূল্য ছিল ক্রমোর্ধ্বমুখী, কিন্তু শ্রমের মূল্য স্থিতিশীল থাকায় শ্রমিকের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। ১৭৮৪ সনে ঢাকায় সাধারণ চালের মূল্য ছিল টাকায় এক মণ বা এরও কিছু কম। অর্থাৎ নবাবি যুগের তুলনায় এ মূল্য ছিল প্রায় দ্বিগুণ বেশি।[৩১] স্বল্পমেয়াদী উঠানামা ব্যতিরেকে চালের এই উচ্চমূল্যের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় ১৮৪০ অব্দি। তবে, এর পর চালের মূল্য আরো দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে। হান্টারের জেলা গেজেটিয়ার (*Statistical Account*) থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ১৮৪১ থেকে চাল ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের মূল্য ক্রমশ উঠতির দিকে ছিল। ১৮৭০-এর দশকে এসে দ্রব্যমূল্য নবাবি যুগের সূচকে প্রায় পনেরো গুণ বেড়ে যায়, কিন্তু একই সময়ে মজুরির হার বৃদ্ধি পায় মাত্র আধা গুণ।

৩০. ঐ, 105-106

৩১. Mathew Day, the Collector of Dhaka, to the Committee of Revenue, 9 January 1784, in Sirajul Islam, *Bangladesh District Records : Dacca District,* Vol. 1 (1784-1787), (Dhaka 1981), 58.

আমরা তাহলে ভট্টাচার্যের সঙ্গে একমত হতে পারি যে, “তখন সাধারণ মানুষের প্রচুর পরিমাণ খাবারের সামর্থ্য ছিল এবং তাদের অবস্থা আঠারো শতকে অবশ্যই উনিশ শতকের চেয়ে অনেক ভাল ছিল, বর্তমানের সঙ্গে তো এর কোন তুলনাই চলে না।”[৩২] নোয়াখালী জেলা কালেক্টর তাঁর জেলার মজুরি ও মূল্য (১৮৬৫-৬৬) নিরূপণ করার জন্য মাঠ পর্যায়ে একটি সমীক্ষা করেন। তাঁর সমীক্ষা ভট্টাচার্যের দাবিকে সমর্থন করে। কালেক্টরের সমীক্ষায় দেখা যায় যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রকৃত মজুরি কমেছে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।[৩৩] শ্রমিক শ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতা আরো কমেছে উনিশ শতকের শেষার্ধে। জেলা গেজেটিয়ারের তথ্যের উপর নির্ভর করে স্বেন্ডেল এবং ফরায়জী ১৯০১-১৮ সময়কালে গ্রামীণ শ্রমিকের দৈনিক মজুরি চালের নিরিখে নিম্নরূপ বিদ্যমান ছিল বলে মনে করেন[৩৪] :

পশ্চিম বঙ্গীয় জেলা		২.৫ সের
মধ্যবঙ্গীয়	”	২.৫ ”
উত্তর বঙ্গীয়	”	৪.০ ”
পূর্ব বঙ্গীয়	”	৬.০ ”

মনে হয় যে, শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা সবচেয়ে হ্রাস পেয়েছে পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বঙ্গীয় জেলাসমূহে। পূর্ববঙ্গীয় জেলাসমূহে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে ভাল। বস্তুত পূর্ববঙ্গে শ্রমিকের মজুরি প্রদান করা হতো দু'রকমভাবে—নগদ অর্থে এবং ফসলে। ঐতিহ্যগতভাবে কৃষিশ্রমিক নিয়োগ করা হতো শুধু ফসল তোলার সময়। ফসল তোলার শ্রমিককে মজুরি দেয়া হতো ফসলেই। উনিশ শতকের প্রথম সিকিতে ঢাকা জেলার ফসল ভাগের নিরিখ ছিল সংগৃহীত ফসলের এক-পঞ্চমাংশ।[৩৫] ভাগ-ফসলে মজুরি দেবার রেওয়াজ ছিল শুধু খাদ্যশস্যের বেলায়। ভাগশ্রমিকগণকে মালিকের বাড়িতে মজুরির অংশ হিসেবে খাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল। নগদ অর্থে মজুর নিয়োগ করা হতো পাট ও অন্যান্য অর্থকরী ফসলের ক্ষেত্রে।

৩২. Bhattacharya, *East India Company,* 206

৩৩. Report on the rates of prices and wages in the district of Noakhali in 1865-66, in H Noma and R L. Chakraborty (eds), *Select Records on Agriculture, Land Revenue, Economy and Society of Noakhali District, 1849-1878,* (Dhaka 1990), 60-61.

৩৪. Willem Van Schendel and Aminul Haque Faraizi, *Rural Labourers in Bengal 1880 to 1980,* (Rotterdam 1984), 83-84

৩৫. Sirajul Islam, *Rent and Raiyat: Society and Economy of Eastern Bengal 1859-1928,* (Dhaka 1989), 54

নগদি মজুরগণ মজুরির অংশ হিসেবে মালিকের বাড়িতে সকাল ও দুপুরের খাবার খেতো। ঢাকা জেলার কেওয়াটখালী (১৯১৭) মৌজার মজুরিকাঠামো সম্পর্কে সার্ভে এ্যান্ড সেটেলমেন্ট অফিসার নিম্নরূপ উক্তি করেন :

> সাধারণত হালচাষের সময় শ্রমিক নিয়োগ করা হয় না। যাদের নিজেদের লাঙ্গল-গরু নেই বা অপর্যাপ্ত আছে তারা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কিনে নেয়। এক পাখি জমি (একরের এক-তৃতীয়াংশ) চাষ করতে মজুরির হার হচ্ছে আট আনা এবং দুবেলা মালিকের বাড়িতে খাবার। পাটশ্রমিকরা পায় দৈনিক আট আনা থেকে বারো আনা এবং দুবেলা মালিকের বাড়িতে খাবার। ধান কাটার মজুর অর্থাৎ দাওয়ালের পারিশ্রমিক হচ্ছে শুধু কর্তিত ধানের এক-পঞ্চমাংশ।[৩৬]

তিরিশের মহামন্দার পর কৃষিশ্রমিকের দরকষাকষিক্ষমতা বিপুলভাবে হ্রাস পায়। প্রাক-মন্দা যুগের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা, উঠতি মূল্য ও ঋণিতা। এসব কারণ এবং পরিশেষে মহাদুর্ভিক্ষ শ্রমিকশ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। যুদ্ধোত্তর ও বিভাগোত্তরকালে অর্থনীতি এমন মোড় নেয় যে, এর অধীনে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা গতিলাভ করে বিশ শতকের গোড়ার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি। সুতরাং আমরা অতি আস্থার সাথেই মন্তব্য করতে পারি যে, পলাশীর পর থেকে শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত মজুরি বা ক্রয়ক্ষমতা নিম্নগতি লাভ করে এবং এই প্রবণতা আরো গুরুতর হয়ে উঠে মহামন্দার পর থেকে। যুদ্ধোত্তর ও বিভাগোত্তরকালেও মজুরের ক্রয়ক্ষমতার কোন উন্নতি ঘটে নি।

---

৩৬. ঐ, 54

সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা : নবাবি আমল

সুশীল চৌধুরী*

সতেরো শতকে সুবা বাংলাকে 'জান্নাত-আবাদ' বা 'স্বর্গরাজ্য' বলে অভিহিত করা হতো। দ্বিতীয় মুগল সম্রাট হুমায়ুন নাকি স্বয়ং এই আখ্যা দিয়েছিলেন।[১] আওরঙ্গজেবও বাংলাকে 'জাতির স্বর্গ' বলে উল্লেখ করতেন। সত্যিই কোন মুগল ফরমান, নিশান বা অন্যান্য সরকারি নথিপত্রে বাংলাকে 'ভারতের স্বর্গ' জাতীয় আখ্যা ছাড়া উল্লেখ করা হতো না। আঠারো শতকের মাঝামাঝি কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির প্রধান জাঁ ল'র মতে সুবা বাংলার এই বর্ণনা যথার্থ।[২] আঠারো শতকের প্রথম ভাগে নবাবি আমলেও যে বাংলা সতেরো শতকের মতো সমান সম্পদশালী ও ক্রমউন্নতিশীল ছিল তার সাক্ষ্য মেলে তখনকার প্রায়-সমসাময়িক ফার্সি ইতিহাস *রিয়াজ-উস-সালাতিন* রচয়িতার লেখায়। তিনিও বাংলাকে 'জান্নাত-উল-বিলাদ' বা 'জাতির স্বর্গ' বলে বর্ণনা করেছেন।[৩] বাংলার অতুল ঐশ্বর্য ও সকল জিনিসপত্রের সুলভতার কথা কিংবদন্তিরূপে সমসাময়িক ইউরোপীয়দের বর্ণনায় স্থান পেয়েছে। ইংরেজ কোম্পানির পদস্থ কর্মচারী চার্লস গ্রান্ট প্রাক-বৃটিশ যুগের বাংলা সম্বন্ধে বলেন : "[তখন] এ রাজ্য ছিল সচ্ছল, ব্যয় বেশি নয়, স্বাধীন রাজ্য পরিচালনার ব্যয় ও দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত। এদেশের মানুষ কৃষি ও ব্যবসা-

---

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. Abul Fazl, Ain-i-Akbari, Vol. 1, Text (ed.) Blochmann, 390, trans., Jarret, Vol II, 122-23; Al Badaoni. Muntakhab-ut-tawarikh, Text (ed.) Maulavi Ahmed Ali, Vol I, 349, trans. Ranking, Vol 1, 458.

২. S. C. Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol.3, (London 1905), 160.

৩. Ghulam Husain Salim, *Riyaz-us-Salatin*, Text (ed.) Maulavi Abdul Hak Abid, (Calcutta 1890), 4, trans., Maulavi Abdus Salam, (Calcutta 1904), 4.

বাণিজ্যের কাজে সুখী। তারা প্রাচুর্য ও শান্তিতে জীবন যাপন করতো।"[৪] হ্যারি ভেরেলস্ট নামে ইংরেজ কোম্পানির অন্য এক পদস্থ কর্মকর্তার মতে :

> নবাবি বাংলার সম্পদশ্রীর কারণ তার শিল্পজাত দ্রব্যের সুলভ মূল্য ও গুণগত উচ্চমান, যার জন্য সর্বত্র এসব জিনিসের প্রচণ্ড চাহিদা ছিল। বড় বড় ইউরোপীয় জাতির রপ্তানি ছাড়াও বাংলার কাঁচা রেশম, বস্ত্র ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে স্থলপথে দেশের পশ্চিম ও উত্তর প্রান্তে গুজরাট, লাহোর, এমনকি ইস্পাহান পর্যন্ত রপ্তানি হতো।[৫]

আসল কথা, অর্থনৈতিক জীবনে সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধির প্রয়োজনীয় সব অবস্থা তখন বাংলায় পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। উর্বরা ভূমিসম্পদ কৃষিব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতির অনুকূল ছিল। ফলে বাংলার কৃষিজাত সম্পদ ছিল বিচিত্র ও অফুরন্ত। তাই বাড়তি কৃষিজাত পণ্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও প্রতিবেশী দেশগুলিতে সরবরাহ করা সম্ভব হতো সহজেই। সতেরো শতকের প্রায় সব বিদেশী পর্যটকই এ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং আঠারো শতকেও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির এই ধারা অব্যাহত ছিল।[৬] ওলন্দাজ কোম্পানির মহাফেজখানায় বাংলার বন্দরগুলি থেকে এশীয় বণিকদের যেসব জাহাজ আঠারো শতকের প্রথমার্ধে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল সেগুলির তালিকা আছে। এই তালিকায় জাহাজগুলির গন্তব্যস্থল ও পণ্য থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, প্রাক-পলাশী বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণ চাল, গম, চিনি, ঘি এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রপ্তানি হতো।[৭] নবাবি আমলে বাংলায় হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন, বিশেষকরে সুতীবস্ত্র ও রেশমের উৎপাদন চরম উন্নতিলাভ করেছিল। এই সময় এসব জিনিস দ্বারা ইউরোপ ও এশিয়ার বিপুল চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়েছিল এবং তার ফলে অপরিমেয় রূপা/নগদ টাকা এদেশে আমদানি হয়েছিল। অর্থনৈতিক অবস্থার এই রকম উন্নতি সম্ভব হয়েছিল নবাবি শাসনে রাজনৈতিক সুস্থিরতার জন্য। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এধরনের রাজনৈতিক স্থিতি তখন ছিল প্রায় অকল্পনীয়। মুর্শিদকুলী খান প্রতিষ্ঠিত নবাবি শাসন পরবর্তীকালে শুজাউদ্দিন খান ও আলিবর্দী খানের মতো দক্ষ শাসকের পরিচালনায় প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে সুবা বাংলায় রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বজায় রেখেছিল। মারাঠা ও মগ আক্রমণ সত্ত্বেও বাংলায় শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধি মোটামুটি বজায় ছিল। রাজনৈতিক অশান্তি বা অস্থিরতা না থাকায় কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভূত উদ্যোগ-উদ্দীপনা সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং নবাবি আমলের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা যে পরবর্তী কোম্পানি শাসনামলের

৪. *Parliamentary Papers*, House of Commons, Vol. VIII, quoted in N. K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, Völ II (Calcutta1968), 230

৫. Verelst to Court of Directors, 5 April 1769, Bengal Public Consultantions, (B.P.C.) Vol 44, f, 324, Para 6.

৬. সপ্তদশ শতকে পর্যটকদের কিছু মতামতের জন্য দ্রষ্টব্য, S. Chaudhury, *Trade and Commercial Organization in Bengal*, 1650-1720, (Calcutta 1975), 4-5.

৭. ওলন্দাজ কোম্পানির নথিপত্রে এশীয় বণিকদের জাহাজের তালিকা পাওয়া যাবে Vereenigde Oost-Indische Compagnie (এর পর থেকে V.O.C) নামক সিরিজে, আগে যার নাম ছিল Kolonial archief (K. A এর পর থেকে)। এগুলি আছে Algemeen Rijksarchief, The Hague-এ।

চেয়ে অনেক উন্নত ছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রিচার্ড বেচার নামে কোম্পানির এক কর্মকর্তা একথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। তিনি পলাশী যুদ্ধের আগে এবং পরেও অনেকদিন বাংলায় ছিলেন। তাঁর ভাষায়, "একজন ইংরেজের পক্ষে বিশ্বাস করতে অবশ্যই কষ্ট হয় যে কোম্পানির দীউয়ানি ক্ষমতা অধিগ্রহণের পরে এদেশের লোকের (অর্থনৈতিক) অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না।"[৮]

স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা এবং দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থার জন্য নবাবি যুগে বাংলায় কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও রপ্তানিবাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। সন্দেহ নেই, সতেরো শতকেও বাংলার সনাতন শিল্পজাত সামগ্রী এশিয়া তথা ইউরোপে প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে এশীয় ও ইউরোপীয় বাজারের প্রচণ্ড চাহিদা মেটাতে এসব শিল্পজাত সামগ্রীর উৎপাদন বহুলাংশে বেড়ে যায়। নবাবি আমলের ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির, বিশেষকরে ওলন্দাজ ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা থেকে রপ্তানির পরিমাণ সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে। এশিয়া ও ইউরোপের বাজারের চাহিদা মেটাতে বাংলার প্রধান শিল্পজাত সামগ্রীর (বস্ত্র ও রেশম) উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যায়। এখন জানা যায় যে, ইউরোপে রপ্তানি বাদ দিয়ে শুধু এশীয় বণিকরাই আঠারো শতকের চল্লিশের দশকের শেষদিকে ও পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে বাংলা থেকে বছরে গড়ে ৪৮ লক্ষ টাকা মূল্যের কাঁচা রেশম রপ্তানি করতো। নবাবি যুগের বাংলা সম্বন্ধে উইলিয়ম বোল্টস যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে এই পরিমাণ রপ্তানির কথা শুনে আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ নেই। তিনি লিখেন, "নানা ধর্ম ও জাতের বণিক—যেমন কাশ্মিরী, মুলতানী, পাঠান, শেখ, সন্ন্যাসী, পাগাইয়া, বেতিয়া এবং আরো অনেকে কাফেলা আকারে বা হাজারে হাজারে দলবদ্ধ হয়ে অসংখ্য বলদের পিঠে চেপে বাংলা থেকে পণ্যদ্রব্য হিন্দুস্থানের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে যেতো।"[৯] লিউক স্ক্র্যাফটনের বক্তব্যেও একই রকম চিত্র পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন : "অতি সম্প্রতিও এশিয়ার সব প্রান্ত থেকে, বিশেষত হিন্দুস্থানের অন্যান্য অংশ থেকে অসংখ্য বণিক, কখনও কখনও হাজারে হাজারে বণিকের দল শুধু নগদ টাকা এবং বিল (হুন্ডি) নিয়ে বাংলায় আসতো এই প্রদেশের বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য কিনতে।"[১০]

সুতরাং একথা বলা যায় যে, নবাবি আমলে বাংলার অন্তর্বাণিজ্য এবং ইউরোপীয়দের বাদ দিয়েও বহির্বাণিজ্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এর অর্থ, নবাবদের শাসনে স্বেচ্ছাচার থাকলেও তা চরম উৎপীড়নমূলক হয়ে উঠে নি। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন উৎপাদনশিল্পে

৮. Richard Becher's letter to Governor Verelst, 24 May, 1769, quoted in W K Firminger, *Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report*, reprint, (Calcutta 1962), 183.

৯. William Bolts, *Considerations on Indian Affairs*, (London 1772), 200.

১০. Luke Scrafton, *Reflections on the Government of Indostan*, (London 1760), 20.

নবাবরা উৎসাহ দিয়েছিলেন। তার ফলে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যে অনুকূল ভারসাম্য (favourable balance of trade) বজায় ছিল এবং "এই গহ্বরে [বাংলায়] সোনা-রূপা অদৃশ্য হয়ে যায়, তা বেরিয়ে যাবার কোন রাস্তাই থাকে না"। অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের ভাষায়, "আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলার সমৃদ্ধিশীল অবস্থার কথা ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল।"[১১]

রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ও পরিবহনব্যবস্থা

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটাই নির্ভর করে যোগাযোগ ও পরিবহনব্যবস্থার উপর। সুতরাং নবাবি বাংলার অর্থনেতিক অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে তখনকার রাস্তাঘাট ও পরিবহনব্যবস্থার বিশদ বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। তৎকালীন বাংলার প্রায় সব বর্ণনাতেই পাওয়া যায় যে, আঠারো শতকের প্রথমার্ধে সুবা বাংলার সর্বত্রই ভাল রাস্তাঘাট এবং যোগাযোগব্যবস্থা ছিল। তার ফলে জোরালো অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ভূগোলবিদ জেমস রেনেল তাঁর বিখ্যাত *Description of the Roads in Bengal and Bihar* (১৭৮৮) গ্রন্থে আঠারো শতকের বাংলার প্রধান প্রধান সড়কের একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। বাংলার প্রধান শহরগুলি, যেমন মুর্শিদাবাদ, হুগলী, ঢাকা, পাটনা ও কলকাতার সঙ্গে পূর্বে নেপাল ও ভুটান, দক্ষিণে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা, দক্ষিণ-পশ্চিমে সিংভূম, পালামৌ ও ছোটনাগপুর এবং পশ্চিমে বেনারস ও গাজিপুর সড়কপথে সংযুক্ত ছিল। তা ছাড়া উত্তর-পশ্চিমে বিহারের বেতিয়া, উত্তর-পূর্বে সিলেট, জয়ন্তিয়া ও খাসপুর এবং দক্ষিণ-পূর্বে চট্টগ্রাম ও রাজঘাটের সঙ্গে সংযোগব্যবস্থা ছিল।[১২] এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, শুধু প্রধান প্রধান শহরই নয়, বর্ধমান ও নাগোরের মতো ছোট জায়গাতেও দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তা ছিল। বর্ধমান থেকে চন্দননগরের মধ্য দিয়ে কলকাতা পর্যন্ত দু'টি রাস্তা ছিল। তা ছাড়া বর্ধমান থেকে আরো অনেক রাস্তা ধনেখালি, তমলুক, বজবজ, নদীয়া, জলঙ্গী, রাজমহল, রাধানগর, চন্দ্রকোনা, ফারুকাবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন পণ্যউৎপাদন ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১৩] অনুরূপভাবে কাশিমবাজারও ভাল রাস্তার মাধ্যমে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। কাশিমবাজার থেকে ২৮১ মাইল দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক রাজমহল হয়ে পাটনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তা ছাড়া কাশিমবাজার থেকে বর্ধমান, জলঙ্গী, ঢাকা, রামপুর বোয়ালিয়া, মীনথোট, দিনাজপুর, বালিতুঙ্গী (জলঙ্গী নদীর উপর), বীরভূম, মালদা, রাঙ্গামাটি, গোয়ালপাড়া, কান্দি ও সুরুল (বীরভূম) পর্যন্ত নানা দিকে রাস্তা ছিল।[১৪] এ রকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেয়া যায়।

১১. N. K Sinha, *Economic History of Bengal*, 230

১২. James Rennell, *Description of the Roads in Bengal and Bihar*, (London 1778), 10-69.

১৩. James Rennell, *Journals*, (Calcutta 1910), 97-108

১৪. ঐ।

আমাদের কাছে যেসব তথ্য আছে সেগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার প্রধান প্রধান শহর ও উৎপাদনকেন্দ্রের সঙ্গে স্থলপথে উত্তর ভারতের সমতলভূমির প্রধান স্থানগুলির ভাল সংযোগ ছিল। একটি প্রধান সংযোগকারী ৫২২ মাইল দীর্ঘ সড়ক কলকাতা থেকে রাজমহল ও কাশিমবাজারের মধ্য দিয়ে পাটনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সেখান থেকে এলাহাবাদ ও মথুরা হয়ে দিল্লী ও আগ্রা যাওয়া যেতো। বাংলা থেকে মুগল সম্রাট ফররুখশিয়রের কাছে প্রেরিত ইংরেজ কোম্পানির 'সারমান দূত' এই রাস্তা ধরেই দিল্লী পৌঁছেছিল।[১৫] বাংলার রাস্তাঘাট শুধু যে একটি প্রধান কর্মকেন্দ্রের সঙ্গে সুবার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রকে সংযুক্ত করেছিল তা নয়, প্রতিটি জেলার মধ্যেই অনেকগুলি রাস্তা ঐ জেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রেনেল বীরভূম জেলার মধ্যেই নানা রাস্তার উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে প্রধান সড়ক নাগোর থেকে দেওঘর, কুমিরাবাদ, মালুতি ও মরাগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নাগোর থেকে সিউড়ি পর্যন্ত তিনটি রাস্তা ছিল। এছাড়া নাগোর থেকে কৃষ্ণনগর, ইলামবাজার, উখরা, দীর্ঘমেয়াদীত (রানীগঞ্জ) এবং সুপুর পর্যন্ত সড়ক ছিল। নবাবি বাংলায় যোগাযোগব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো দেশের অভ্যন্তরে সুদূরতম অংশের সঙ্গেও দূরবর্তী শহরের সড়কপথে সংযোগ। এই রাস্তাগুলি যে সর্বদা ব্যবহার করা হতো রেনেল তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন কলকাতা থেকে পাচওয়ারি (সাঁওতাল পরগনা) এবং পাকুড়ের মতো জায়গা পর্যন্ত রাস্তা ছিল। অবশ্য সব রাস্তাই ভাল ছিল না। বিশেষত বারাসত থেকে যশোরের রাস্তা খারাপ ছিল। রেনেল সে বিষয়ে লিখেন, "বারাসত ছাড়ার পর খুব কম রাস্তাই ভাল পেলাম।[১৬] রাস্তাগুলি অত্যন্ত সরু, এবড়োথেবড়ো এবং প্রায়ই ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে গেছে। ফলে হাল দেয়া হলে রাস্তার চিহ্ন আর খুঁজে পাওয়া যায় না।" তবু সমসাময়িক বর্ণনা থেকে সাধারণভাবে এই কথা বলা যায় যে, নবাবি আমলে বাংলার যোগাযোগব্যবস্থার মান "যন্ত্রশিল্প উদ্ভাবনের আগের মানদণ্ড অনুযায়ী মোটামুটি বেশ ভালই ছিল।"[১৭]

পূর্ব ও উত্তর বাংলার অভ্যন্তরে, বিশেষকরে ঢাকার পূর্বদিকে অবস্থিত অঞ্চলে বহু নদীনালা থাকায় পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অত ভাল রাস্তাঘাট ছিল না। তবে এ অঞ্চলের প্রধান স্থানগুলি চতুর্দিকের বড় বড় শহরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। যেমন কলকাতা থেকে ঢাকা পর্যন্ত দু'টি রাস্তা এবং আরো দু'টি রাস্তা বাখরগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত দু'টি রাস্তা ছিল এবং আরেকটি রাস্তা ছিল শ্রীহট্ট হয়ে ঢাকা পর্যন্ত। রেনেল লিখেছেন, পূর্বাঞ্চলের বেশিরভাগ রাস্তাই কাঁচা রাস্তা হওয়ায় যুক্তিসঙ্গত কারণে বর্ষাকালে তাদের অবস্থা বেশ খারাপ হতো। স্থলপথে বাংলা ও বিহারের মধ্যবর্তী মরিচা (ইংরেজ

১৫. K.K. Datta, *Studies in the History of Bengal Suba,* 1740-1770, Vol 1, Calcutta 1936). 391.

১৬. James Rennell, *Journcl,* 86-87.

১৭ P J Marshal, *Bengal The British Bridgehead,* (Cambridge 1987), 13.

কোম্পানির নথিপত্রে 'মিরচা' নামে অভিহিত) ছিল যোগাযোগ ও মাল পরিবহনের প্রধান কেন্দ্রস্থল। মরিচা গঙ্গার সঙ্গে জলঙ্গী ও ভাগীরথীর সংযোগকারী একটি খাড়ির উপর অবস্থিত ছিল। পাটনা থেকে কলকাতায় পণ্য সরবরাহের পথে এখানে বড় বড় নৌকা থেকে পণ্যদ্রব্য ছোট ছোট নৌকায় তোলা হতো। পাটনা ও ফুতুয়া থেকে রেশমবস্ত্র ও সোরাভর্তি নৌকা ভাগলপুর ও কলগং হয়ে মরিচা আসতো। সেখানে শুকনো ঋতুতে নৌকা বদলাতে হতো, কারণ নদীতে তখন খুব কম পানি থাকতো। নদীতে জলের গভীরতা বেশি থাকলে নৌকাগুলি নদীয়া হয়ে কলকাতা যেতো।[১৮] সোনারূপা ও মোটা কাপড় (বনাত) নিয়ে কলকাতা থেকে নৌকা এই পথেই পাটনা যেতো। বস্তুত বাংলা ও উত্তরাঞ্চলের মধ্যে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মরিচা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। বাংলার নবাবদের যখনই কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকতো বা কোন দাবি কোম্পানির উপর চাপানোর প্রয়োজন হতো, তখন নবাবরা সাধারণত যে উপায় অবলম্বন করতো তা হলো মরিচায় সৈন্য মোতায়েন করা, যাতে কোনদিকেই মাল যাতায়াত করতে না পারে।[১৯] কোম্পানিগুলি আরেকটি পথে মরিচা বাদ দিয়ে মাল পাঠানোর চেষ্টা করতো। সেটা হলো জলঙ্গীর মধ্য দিয়ে। কিন্তু মরিচা বা জলঙ্গীর মধ্য দিয়ে দু'টি জলপথের কোনটিই কার্যকরী না হলে কিছু পরিমাণ মালপত্র 'জঙ্গলের মধ্য দিয়ে' নিয়ে যাওয়া হতো।

বরাবরের মতো নবাবি আমলেও বাংলায় যোগাযোগের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় ছিল নদীপথ। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং তাদের অসংখ্য শাখানদী ও খাল দিয়ে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সহজে যাতায়াত করা যেতো। এ প্রসঙ্গে রেনেলের বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখাসহ বাংলাদেশকে বিভিন্ন দিকে এমনভাবে বিভক্ত করেছে যে তাতে সম্পূর্ণ ও সহজতম নৌযোগাযোগব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবা যায়। এই প্রাকৃতিক খালগুলি এমন সমান ও সুন্দরভাবে ছড়ানো আছে যে ... আমরা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি যে বীরভূম ও বর্ধমান সংলগ্ন অঞ্চল ছাড়া দেশের আর সব অংশেই শুকনো ঋতুতেও কমপক্ষে ২৫ মাইলের মধ্যে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার এক-তৃতীয়াংশ দূরত্বের মধ্যে নৌচলাচলযোগ্য নদীপথ আছে।[২০]

তিনি আরো বলেন যে, বাংলার অভ্যন্তরীণ জলপথে প্রায় ৩০,০০০ মাঝি সর্বদা নিযুক্ত থাকতো। সারা বাংলার ১০ লক্ষ লোকের প্রয়োজনীয় লবণ ও বেশিরভাগ খাদ্যশস্য এই জলপথে সরবরাহ করা হতো। এই অভ্যন্তরীণ জলপথই বাংলার রপ্তানি ও আমদানি

১৮. B. P. C, Vol 14, f 313, 21 Nov 1739

১৯. S. Bhattacharyya, *The East India Company and the Economy of Bengal*, (London 1954), 47.

২০. James Rennell, *Memoirs of the Map of Hindustan*, (London 1793), 245, 335.

বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন ছিল। এ পথে ২ লক্ষ পাউন্ড (প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা) মূল্যের ব্যবসা-বাণিজ্য হতো।[২১]

বাংলার প্রায় সব অঞ্চলের, বিশেষকরে পূর্ব বাংলার মধ্য দিয়ে বহুসংখ্যক শাখানদী, নালা, খাড়ি প্রবাহিত হতো এবং তাতে সহজ যোগাযোগ সম্ভব হতো। এর ফলে বাংলার অভ্যন্তরে সুদূরতম গ্রামেও বণিক ও পর্যটকরা সহজে যাতায়াত করতে পারতো। রেনেল লিখেছেন, "বাংলা, বিশেষকরে বাংলার পূর্বাঞ্চল স্বভাবতই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকেন্দ্র, কারণ নদীগুলি এমনভাবে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে যে জনগণ সব প্রধান স্থানেই জলপথে সহজে যাতায়াত করতে পারে।"[২২] ওলন্দাজ পর্যটক স্টাভোরিনাস আঠারো শতকের শেষদিকে বাংলায় এসেছিলেন। তিনি বলেন :

> বড় এবং প্রশস্ত খাল দিয়ে দেশটি সর্বত্রই বিভক্ত ...এই জলপথেই দেশের সব মালপত্র খুব সহজে এক জায়গা থেকে অন্যত্র পরিবহন করা হয়। নদীর প্রধান শাখাগুলিও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত... তাদের দুই ধারে শহর ও গ্রাম, মনোরম শস্যক্ষেত ও প্রান্তর দেশের শোভা বৃদ্ধি করেছে।[২৩]

আঠারো শতকে কলকাতা থেকে উত্তর ভারতে যাতায়াতের দু'টি নদীপথ ছিল। প্রথমটি জলঙ্গী এবং নদীয়ার মধ্য দিয়ে কোশী পর্যন্ত ও দ্বিতীয়টি ভাগীরথী ও সুতির মধ্য দিয়ে বিহারের মুঙ্গের ও পাটনা পর্যন্ত গিয়েছিল। শেষের পথটিই ব্যবহৃত হতো বেশি। কলকাতা থেকে ঢাকা পর্যন্ত নদীপথ জলঙ্গীর মধ্য দিয়ে পদ্মা এবং তারপর পাবনা এবং ইছামতি হয়ে জাফরগঞ্জ ও ধলেশ্বরী হয়ে ঢাকা পৌঁছায়। সমগ্র পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল নদী-নালা ও তাদের শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে এত সুন্দরভাবে সংযুক্ত ছিল যে পণ্যদ্রব্য পরিবহনের ব্যাপারে কোন অসুবিধাই হতো না। আলেকজান্ডার ডাও যথার্থই বলেছেন :

> জলপথে সহজ যোগাযোগব্যবস্থার ফলে বাসিন্দাদের মধ্যে বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের অনেক সুবিধা হয়েছে : প্রত্যেক গ্রামেই আছে খাল, প্রত্যেক পরগনাতে আছে নদী এবং সমস্ত দেশ জুড়ে রয়েছে গঙ্গা, যার বিভিন্ন মুখ বঙ্গোপসাগরে পড়ছে, ফলে সমুদ্রপথে পণ্যদ্রব্য রপ্তানির পথ হয়েছে প্রশস্ত।[২৪]

এই বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে, সুবিধাজনক প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার যোগাযোগব্যবস্থা যে যথেষ্ট ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সুতরাং নবাবি আমলে বাংলার গ্রামগুলি অর্থনৈতিকভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং স্বয়ম্ভর ছিল বলে যে

২১. ঐ।

২২. "An unpublished Letter of Major James Rennell, 31 August 1765", *Bengal Past and Present*, July-September 1933.

২৩. J. S. Stavorinus, *Voyage in the East Indies, trans* S. H. Wilcoke, Vol 1, (London 1798), 399.

২৪. Alexander Dow, *The History of Hindostan*, Vol III, 2nd reprint, (New Delhi 1985), lXII.

প্রচলিত ধারণা, তা সহজেই এখন খণ্ডন করা যায়। বস্তুত সুসংগঠিত যোগাযোগব্যবস্থার ফলে বাংলার সঙ্গে একদিকে যেমন বাইরের জগতের ক্রমাগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তেমনি অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে প্রধান উৎপাদনকেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছে। ফলে নবাবি যুগে বাংলার গ্রামগুলি অর্থনৈতিকভাবে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পরস্পরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করছিল বলে যে ধারণা রয়েছে তা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয় বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সে আমলে বাংলার বহু তাঁতী ও অন্যান্য কারিগর বহু দূরদেশের বাজারের জন্যও পণ্য উৎপাদন করতো। বাংলার চাষীরাও তুলা, আখ, গুটিপোকা, তৈলবীজ প্রভৃতি নগদ মূল্যে বিক্রি করা যায় এমন দ্রব্য উৎপাদন করতো। এমনকি নগদ মূল্যে বিক্রিযোগ্য ধান, বিশেষকরে শীতকালের আমন ধানের চাষ করা হতো যাতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে, এশিয়ার বিভিন্ন অংশে এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর পরিমাণে চাল রপ্তানি করা যায়। এ যুগে বাংলার অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অর্থনীতিতে মুদ্রার বহুল প্রচলন, যার ফলে সাধারণত রাজস্বও নগদ অর্থে মেটানো হতো। অবশ্য খুচরা বেচাকেনা বা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কড়ির ব্যবহারই বেশি হতো। সমাজের সব শ্রেণীই বাজারে টাকা ধার করতে পারতো, তবে সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে ঋণের শর্ত অপেক্ষাকৃত কঠিন ছিল। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত টাকা-পয়সা পাঠানোর উত্তম ব্যবস্থা ছিল। হুন্ডিরও ছিল বহুল প্রচলন। এই যুগে দেশীয় ব্যাঙ্কিং ও টাকা-পয়সা লেনদেনের ব্যবস্থা যথেষ্ট সুসংগঠিত ও উন্নত ছিল।[২৫]

সম্প্রতি জনৈক ঐতিহাসিক[২৬] প্রতিপাদন করেছেন যে, আঠারো শতকের মাঝামাঝি বাংলায় "বেশ কিছুটা উন্নত ও সুসংহত অথচ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থনীতির" উদ্ভব হয়েছিল। কোন কোন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ছিল খাদ্যশস্যের বাড়তি উৎপাদন। কোথাও আবার নগদ অর্থে বিক্রির যোগ্য ফসল, অন্য কোথাও বিশেষ ধরনের বস্ত্র ও রেশম উৎপাদন যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। নানা রকম বাজারের ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য বেচাকেনার সুবিধে হয়েছিল। তা ছাড়া বড় বড় পাইকারি বাজারগুলি বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গড়ে উঠেছিল। যেমন মুর্শিদাবাদের কাছে ভগবানগোলায় নবাবি আমলে বাংলার সবচেয়ে বড় শস্যের বাজার ছিল। ঢাকার কাছে নারায়ণগঞ্জে ছিল এই রকম আরেকটি বড় পাইকারি বাজার। তা ছাড়া গঞ্জ অর্থাৎ বড় আঞ্চলিক বাজার ছিল বাংলার সর্বত্র। ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো গ্রামের হাটে। হাট বসতো সাধারণত সপ্তাহে দু'দিন। নথিপত্রে দেখা যায়, ১৭৭০-এর দশকে মুর্শিদাবাদের একটি গ্রামের তেরোটি দোকানের মধ্যে তিনটি ছিল কড়ি বেচাকেনার আর দু'টি টাকা-পয়সা বদলাবার বা ভাঙানোর দোকান।[২৭]

২৫. Marshall, *Bengal*, 13.

২৬. ঐ।

২৭. ঐ, 13.

এই অর্থনৈতিক সংহতির মূলে ছিল জল ও স্থলপথে যোগাযোগব্যবস্থা, যা যেকোন প্রাক-আধুনিক মানদণ্ড অনুযায়ী যথেষ্ট সন্তোষজনক ছিল। মধ্য আঠারো শতকের বাংলার প্রধান কেন্দ্রগুলিতে মূল্যস্তর মোটামুটি এক রকম ছিল। এ থেকে অর্থনৈতিক সংহতির পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এ চিত্র শুধু বড় শহর ও নদীর কাছাকাছি অবস্থিত নৌপরিবহনকেন্দ্রগুলিতেই মেলে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা দূর গ্রামে শস্যের মূল্যে প্রচুর তারতম্য দেখা যেতো। সেসব জায়গায় অল্প দূরত্বের ব্যবধানেও মূল্যের যথেষ্ট পার্থক্য হতো। এই তারতম্য শুধু এক বছর থেকে অন্য বছরের নয়, একই বছর এক মাস থেকে অন্য মাসের মূল্যস্তরেও যথেষ্ট তারতম্য দেখা যেতো। আঠারো শতকের মাঝামাঝি কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ও হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের বিপুল উৎপাদনেও অর্থনৈতিক সংহতির প্রমাণ মেলে। এ ব্যাপারে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বণিককুল ও তাদের বিভিন্ন উদ্যোগের কর্মজাল একটি প্রধান ভূমিকা নেয়। এই বণিকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে ধনবান, তারা একাধারে ব্যাঙ্কার-মহাজন, জাহাজের মালিক ও বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী ছিল। তারা সাধারণত নিজেদের গোমস্তা বা কর্মচারির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অংশে কুঠি স্থাপন করে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতো।

বাজার, মূল্যস্তর ও মজুরি

ক. *বাজার*

নবাবি বাংলায় বাজার ছিল অসংখ্য। প্রতিটি প্রধান শহর বা গ্রামের নিজস্ব বাজার ছিল। আবার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র নয় এমন যেসব জায়গা, সেখানেও বাজার বা এর কাছাকাছি হাট ছিল। শহরের বাজারে শুধু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নয়, বিলাসদ্রব্যেরও দোকান ছিল। তখনকার সমসাময়িক কবি রামপ্রসাদ বর্ধমান শহরের বাজারের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। *সিয়ার-উল-মুতাখেরিনের* লেখক বর্ধমান শহর সম্বন্ধে লিখেন যে, "বিপুল জনসংখ্যা ও খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্যের জন্য বাংলার শহরগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।" তিনি লিখেন :

> এছাড়া কবি [সুন্দর] রাজার বাজারে হাজার হাজার বিদেশী বণিককে দেখেন। শত শত দোকানদার, অগণিত মণিমুক্তা, বিভিন্ন রকমের সূক্ষ্ম ও সুন্দর বস্ত্র বাজারের চতুর্দিকে।...বহু মূল্যবান ও রুচিসম্মত বিলাতী (বিদেশী) দ্রব্য ক্রেতার অভাবে স্তূপাকারে পড়ে আছে। বাজারে সবকিছুই সস্তা এবং সুলভ।[২৮]

এই বর্ণনা বর্ধমান বাজারের বস্ত্র ও অলঙ্কার বিভাগের। সাধারণভাবে শহরের বাজারে সব রকম জিনিসপত্রের নানা দোকান থাকতো। বিজয়রামের *তীর্থমঙ্গলে* তৎকালীন শহরের

---

২৮. Ghulam Husain Khan, *Seir-ul-Mutakherin*, (hereafter *Seir*) Vol II, (Calcutta 1902), 377.

বাজারের বিশেষ ধরনের জিনিসপত্রের নানা দোকানের বর্ণনা পাওয়া যায়।[২৯] ভগবানগোলার বাজার সম্বন্ধে কবি বলেন :

> নৌকা শীঘ্র ঘাটে পৌঁছে গেলে সবাই হরি হরি বলে ধ্বনি তুললো। বাজার দেখে তারা খুব খুশি, পায়ে হেঁটে সারা শহর ঘুরে এলো। চার ক্রোশ (৮ মাইল) জুড়ে বাজারটি দেখতে সুন্দর। অসংখ্য শাঁখারী (শাঁখের কারিগর), কাঁসারী (কাঁসার কারিগর) এবং তাঁতীর মেলা সেখানে। মুদির দোকান সর্বত্র। সবাই বাজারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শস্যের গোলা রয়েছে অসংখ্য।[৩০]

হলওয়েলও লিখেছেন যে, ভগবানগোলা "হিন্দুস্থানে এবং সম্ভবত পরিচিত বিশ্বে শস্য, তেল ও ঘি'র শ্রেষ্ঠ বাজার।" এই প্রধান বাজারটিতে কি পরিমাণ ব্যবসা চলতো তা অনুমান করা যায় যখন আমরা জানতে পারি যে, এখানে শস্যই শুধু বিক্রি হতো বছরে তিন লক্ষ টাকার।[৩১] হলওয়েল নাটোরের রাণী ভবানীর জমিদারিতে বিভিন্ন বাজারের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হলো ভবানীগঞ্জ, শিবগঞ্জ, স্বরূপগঞ্জ এবং জামালগঞ্জ। নাম থেকেই বোঝা যায় যে এগুলি প্রধানত শস্যের বাজার ছিল।[৩২] মধ্য আঠারো শতকের কলকাতায় প্রায় ১০/১১টা বাজার ছিল---শোভাবাজার, বাগবাজার, হাটখোলা বাজার, চার্লস বাজার, বেগমবাজার, জননগর, মন্ডিবাজার, নয়াবাজার ইত্যাদি।[৩৩]

নবাব বা জমিদারের কর্মচারিরা বাংলার সর্বত্র বাজারের সব ব্যাপার দেখাশোনা করতো। জিনিসপত্রের গুণগত মান, দাম, ওজন, মাপ সব তাদের এখতিয়ারে ছিল। এই কর্মচারিরা শহর ও গ্রামাঞ্চলের বাজার ও হাটে কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করতো। কোতোয়ালের একটি প্রধান কাজ ছিল বাজার রক্ষণাবেক্ষণ এবং যাতে কোন অন্যায় বা কারচুপি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। কর্মচারিরা নিয়মিত ওজন, বাটখারা ইত্যাদি পরীক্ষা করতো, জিনিসপত্রের মান এবং দাম নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতো। কেউ আইনভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তি বিধান করা হতো। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এর বহুল প্রমাণ মেলে। শমসের গাজীর পুঁথিতে বলা হয়েছে : "কেউ ওজনে ফাঁকি দিতে বা বেশি দামে বিক্রি করতে কিংবা ঠকাতে পারে না। আইনভঙ্গ করলে কাজি কঠোর শাস্তি দিতেন। ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই তাঁর কর্তৃত্বাধীন ছিল।"[৩৪]

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, জমিদার বা অন্য রাজকর্মচারিগণ বাজারগুলি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতো সেই এলাকায় নিযুক্ত তাঁদের কর্মচারির সাহায্যে। এই ব্যবস্থায় সাধারণ

২৯. Ramprasad, *Vidyasundar*, 6.

৩০. ঐ, 39-40.

৩১. J. Z. Holwell, *Interesting Historical Events*, (London 1765), 194

৩২. ঐ, 193.

৩৩. B. P. C. Range I, Vol 25, f, 234, *Consultations*, 9 October 1752.

৩৪. *Samser Gajir Punthi, Typical Selections etc., pt.* II, 1853.

মানুষের বিশেষ সুবিধা হতো। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, শুধু শহরই নয়, গ্রামাঞ্চলের বাজারও জমিদার বা নবাবের কর্মচারিদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। নইলে *শমসের গাজীর পুঁথিতে* গ্রামাঞ্চলের বাজার প্রসঙ্গে উল্লিখিত তথ্য এত স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হতো না। কলকাতার ইংরেজ কোম্পানি বাজারদর, ওজন ও বাটখারা বিষয়ে কড়া নজর রাখতো। কেউ আইনভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তি পেতো।[৩৫]

বাংলার নবাবরা, বিশেষকরে মুর্শিদকুলী খান বাজার ও বাজারদরের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর শাসনকাল সম্বন্ধে *রিয়াজ-উস-সালাতিন*-এর লেখক বলছেন :

> তিনি খাদ্যশস্যের দাম সস্তা রাখতে খুবই সচেষ্ট ছিলেন, ধনীদের খাদ্যশস্য মজুত করতে দিতেন না। প্রতি সপ্তাহেই খাদ্যশস্যের চলতি বাজারদরের বিবরণী তৈরি হতো এবং গরীব লোকরা সত্যিই কি দাম দিয়ে এসব জিনিসপত্র কিনছে তা তুলনা করে দেখা হতো। যদি দেখা যেতো যে এসব গরীব লোকের কাছ থেকে চলতি বাজারদরের চাইতে এক দামও [পয়সা] বেশি নেয়া হয়েছে, তাহলে তিনি সেই ব্যবসায়ী, মহলদার ও ওজনদারকে নানাভাবে শাস্তি দিতেন। তাদের গাধার পিঠে চাপিয়ে সারা শহরে ঘোরানো হতো।[৩৬]

প্রায় সমসাময়িক ফার্সি ইতিহাসগুলিতে বলা হয়েছে, শুজাউদ্দিনের রাজত্বকাল "শান্তি ও সমৃদ্ধির" দ্বারা চিহ্নিত এবং তিনি "তাঁর রাজ্য থেকে নিপীড়ন ও স্বৈরাচার নির্মূল করেছিলেন"। আলিবর্দীর রাজত্ব সম্বন্ধে এই গ্রন্থগুলির বক্তব্য এই যে, মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করার পর তিনি "অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁর প্রজাকুলের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি দিয়েছিলেন এবং কখনো সেই নীতি থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নি।"[৩৭] এসব বক্তব্য থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, শুজাউদ্দিন ও আলিবর্দী উভয়েই তাঁদের রাজ্যের বাজার ও বাজারদর সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।[৩৮]

খ. *বাজারদর / মূল্যস্তর*

আমাদের বর্তমান জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে আঠারো শতকের মধ্যভাগে বাজারদরের গতিবিধি সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন। যদিও ১৭৪০-এর দশকের প্রথমদিক থেকে বিশেষকরে খাদ্যদ্রব্যের কিছুটা মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল বলে মনে হয় এবং সেটা নেহাৎ সামান্যই, "১৭২০ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত তেমন লক্ষণীয় এবং উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি" কারো চোখে পড়ে না। অধুনা বিশেষ বিশেষ পণ্যদ্রব্য, যেমন বস্ত্র, কাঁচা রেশম এবং চাল ইত্যাদির মূল্য নিয়ে মূল্যস্তরের গতিবিধি পর্যালোচনা করা হয়েছে।[৩৯] যে পদ্ধতিতে এটা

৩৫. Letter of the Court of Drctors to Bengal , II February 1756. quoted in Datta, *Bengal Suba*, 462

৩৬. *Riyaz-us-Salatin*, 280-81

৩৭. উদাহরণস্বরূপ, J. N Sarkar (ed), *History of Bengal,* Vol II, (Dhaka 1948) 424, 434, 449, *Seir* Vol I, 325, *Riyaz,* 290-91

৩৮. *Calender of Persian Correspondence*, Vol. II, 191, 197, quoted in K K. Datta, *Alivardi and His Times*, 2nd ed (Calcutta, 1963), 140.

৩৯. K N Chaudhuri, *The Trading World of Asia and the English East India Company,* (Cambridge, 1978), 99-104.

করা হয়েছে, মনে হয় তা হলো খাদ্যদ্রবের মোট যোগফল দিয়ে সব পণ্যদ্রব্যের জন্য দেয় মূল্যকে সহজ নিয়মে ভাগ করে পণ্যদ্রব্যের একক মূল্য নির্ধারণ। কিন্তু এতে প্রয়োজনীয় অনেক চলক (variables) হিসাব থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে, যার ফলে ফলাফল বিভ্রান্তিকর হতে পারে। যেমন, বস্ত্রের ক্ষেত্রে অন্তত শ'খানেক নামের বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র ছিল আর তাদের মান বা ধরন অনুযায়ী দামের মধ্যে অনেক তারতম্য হতো। আবার কাপড়ের দাম, সূক্ষ্মতা, মাপ ও কোন্ আড়ং-এ প্রস্তুত তার উপর নির্ভর করা হতো বলে একই ধরনের কাপড়ের দাম ভিন্ন ভিন্ন হতে পারতো। কাঁচা রেশমের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে নানা প্রকারের রেশম ছিল। একই ধরনের রেশমের দাম আবার কোন্ ঋতুতে উৎপন্ন হয়েছে তার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন হতো। সুতরাং বস্ত্র কিংবা রেশমের সঠিক দাম নির্ধারণ করতে হলে কোন্ ধরনের বস্ত্র কি পরিমাণ এবং কোন্ ধরনের রেশম কি পরিমাণ সেটা নিশ্চিতভাবে জানা এবং হিসাব করার সময় প্রভৃতি বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা প্রয়োজন ছিল। চালের ক্ষেত্রেও তাই চালের উৎকর্ষের উপর দাম নির্ভর করতো, 'মোটা' চাল কতটা 'মোটা' এবং কোথায় কেনা হয়েছে, দামের তারতম্যের ক্ষেত্রে তাও খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[৪০]

বাংলায় পণ্যদ্রব্যের মূল্যস্তর, বিশেষকরে ১৭৪০ থেকে মূল্যের হঠাৎ ঊর্ধ্বগতি (আমরা পরে দেখাবো যে মোটেই সেটা সঠিক চিত্র নয়) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা সাধারণভাবে কয়েকটি জিনিসের উপর বড়ো বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।[৪১] সেগুলি হলো— (ক) ১৭২০ থেকে ১৭৬০ সালের মধ্যে "ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর বাংলা থেকে রপ্তানির পরিমাণ ও ফলে বাংলায় তাদের সোনারূপা আমদানির পরিমাণ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি", (খ) বাংলায় মারাঠা আক্রমণ ও তার ফলে অর্থনৈতিক দুর্দশা, (গ) ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে বাংলার পণ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, (ঘ) বাংলার নবাবদের উচ্চহারে শুল্ক ধার্যের নীতি এবং (ঙ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ। একথা অনস্বীকার্য যে, আঠারো শতকের প্রথমভাগে বাংলা থেকে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর রপ্তানিবাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল এবং তার ফলে দেশে সোনা-রূপার আমদানিও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সম্ভবত সে কারণেই এই সময় বাংলায় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিস্তারলাভ করে এবং বাজারে টাকা-পয়সার আমদানিও বাড়ে। তবে বাংলার সমগ্র অর্থনীতি (বা অর্থনৈতিক অবস্থা) ও মূল্যের গতিবিধির উপর এর প্রভাব এ আমলে কতটা, তা আরো নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি[৪২] যে, আঠারো শতকের মধ্যভাগেও বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্য বাংলার বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। সেসময়েও বাংলা থেকে এশীয় বণিকদের রপ্তানি-বাণিজ্যের পরিমাণ ইউরোপীয়দের চেয়েও অনেক বেশি ছিল। ফলে সোনা-রূপার আমদানি যে

৪০. এ রকম তারতম্যের জন্য দ্রষ্টব্য, Table 4, Price of Rice, 1729.

৪১. উদাহরণস্বরূপ Datta, *Bengal Suba*, 463-69; Chaudhuri, *Trading World*, 99-108.

৪২. এই সিরিজের প্রথম খণ্ডে আমার লিখিত অধ্যায় 'পলাশী যুদ্ধ ও সিরাজউদ্দৌলা' দ্রষ্টব্য।

কেবলমাত্র ইউরোপীয়রাই করতো তা নয় এবং তারাই আমদানি সবচেয়ে বেশি করতো তাও নয়। মারাঠা আক্রমণের ফলে বাংলার অবশ্যই অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু সেটা প্রধানত আঞ্চলিক ব্যাপার এবং তার প্রভাব নেহাৎ অল্প সময়ের জন্যই পড়েছিল। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল ঠিকই, কিন্তু তার ফলে পণ্যদ্রব্যের বাজারে সাধারণভাবে দামের বিশেষ তারতম্য ঘটে নি। বাংলার নবাব এবং জমিদারগণ এসময় আবওয়াব (বাড়তি কর) এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক বসিয়েছিলেন ঠিকই, তবে তার ফলাফলকে অতিরঞ্জিত করা সমীচীন নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগও বাজারদরকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু সেখানেও এ ঘটনা নেহাৎই আঞ্চলিক ছিল এবং অল্প সময়ের জন্য ঘটেছিল।

তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেয়া যায় যে, বস্ত্র ও রেশম জাতীয় রপ্তানিদ্রব্যের মূল্য এসময় বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাহলে সাম্প্রতিক এক ঐতিহাসিকের মতে একথা বলা যায় যে, এই ধরনের আংশিক বৃদ্ধি (sectoral rise) শুধু উপযুক্ত পণ্যদ্রব্যের চাহিদার তুলনায় সেসব পণ্যের সরবরাহের ঘাটতিকেই প্রকাশ করে, উপরোক্ত সাধারণ অর্থনীতিতে বাজারদরের ঊর্ধ্বগতিকে অনিবার্যভাবে নির্দেশ করে না। বাজারদরের বৃদ্ধি প্রমাণ করার জন্য যেসব জীবনধারণের সামগ্রী (wage goods) ছিল তাদের দামের গতিবিধি লক্ষ্য করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এদের মধ্যে প্রধান হলো মূল খাদ্যদ্রব্য, যেমন চাল, গম ইত্যাদি।[৪৩] তবে বর্তমানে জ্ঞাত তথ্য থেকে এরকম কিছু নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন, কারণ সঠিক তথ্যের অভাবে ভুল সিদ্ধান্তের খুবই আশঙ্কা আছে। প্রধান খাদ্যদ্রব্যেরও আবার নানা রকম মাত্রাভেদ আছে, বিশেষকরে চালের ক্ষেত্রে বহু মানের চাল লক্ষণীয়। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যের দাম থেকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলে সঠিক তথ্যের অভাবে মূল্যের গতিবিধি ভয়ানক এলোমেলো হবারই সম্ভাবনা। ১৬৫০ থেকে ১৭২০ সন পর্যন্ত বাংলায় চালের দামের এক সাম্প্রতিক নিরীক্ষা থেকে তা-ই দেখা গেছে।[৪৪] 'কোয়ানটিটি থিওরি অব মানি'কে ভিত্তি করে যে ব্যাখ্যা, তদনুযায়ী নগদ মূল্যে বিক্রীত রপ্তানিদ্রব্যের বৈদেশিক চাহিদার ফলে দেশেও খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে মূল্যস্তরে চাপ সৃষ্টি হয়। সে সম্বন্ধে সম্প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। একজন সাম্প্রতিক বিশেষজ্ঞ ব্যাপারটা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও ইউরোপীয় বাণিজ্যের ফলে অর্থ সঞ্চালনের গতিবৃদ্ধির সম্পূর্ণ চিত্র এখনো পাওয়া যায় নি, তবু একথা বলা যায় যে, ইউরোপীয় বাণিজ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে মোট বাণিজ্যিক লেনদেনের মধ্যে নগদ টাকা-পয়সা লেনদেনের পরিমাণ যথেষ্ট অনুপাতে বেড়েছিল। তা ছাড়া, আমাদের আলোচ্য

৪৩. Om Prakash, *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal*, (Princeton 1985), 250.
৪৪. ঐ, 251-53.

যুগের দীর্ঘ পরিসরে প্রাকৃতিক নিয়মে জনসংখ্যারও বৃদ্ধি হয়েছিল, যার ফলে উৎপাদন ও লেনদেনের পরিমাণও বাড়ছিল যাতে মাথাপিছু উৎপাদন ও প্রাপ্যের হার না কমে যায়। এসব কারণে সোনা-রূপার আমদানিতে অর্থাগমের গতি বৃদ্ধি পেলেও সাধারণভাবে বাজারদর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।[৪৫]

যাহোক, বাংলার সাধারণ মানুষ যে "উনিশ শতকের চেয়ে আঠারো শতকের প্রথমভাগে আরো অনেক বেশি খেতে পেতো এবং আরো অনেক বেশি ভাল অবস্থায় ছিল" সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[৪৬] সাধারণ মানুষের কাছে চালের দাম ছিল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভাতই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। মুর্শিদকুলীর শাসনামলে চালের দাম ছিল টাকায় ৫ থেকে ৬ মণ—এ তথ্য সর্বজনবিদিত। *রিয়াজ-উস-সালাতিন*-এর লেখক বলেন যে, চালের মতো অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের দামও এতো সস্তা ছিল যে, তখন মাসে এক টাকা খরচ করে "লোকে রোজ পোলাও-কালিয়া খেতে পারতো"। এটা অবশ্যই অত্যুক্তি, তবু আলঙ্কারিক উক্তি বাদ দিয়েও তাঁর বক্তব্য "ভোগ্যপণ্য সস্তা ও সুলভ হওয়ায় গরীব লোকও শান্তি এবং আরামে দিন কাটাতো" খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।[৪৭] বস্তুত প্রায় সমসাময়িক ফার্সি ইতিহাস ও ইউরোপীয় কোম্পানির নথিপত্রে দেখা যায় যে, মুর্শিদকুলী খান খাদ্যশস্যের দাম যথাসম্ভব সস্তা রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি খাদ্যশস্য মজুত করার উপর নিষেধাজ্ঞাই শুধু নয়, প্রয়োজন হলে খরা বা দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যশস্য রপ্তানি বন্ধ করে দেয়ার আদেশও দিতেন।[৪৮]

নবাব শুজাউদ্দিন খানের আমলে খাদ্যদ্রব্যের সুলভ মূল্য গল্পকথায় পরিণত হয়েছিল। *সিয়ার-উল-মুতাখেরিন* ও অন্যান্য ফার্সি ইতিহাসে শুজাউদ্দিনের রাজত্বকাল সুখ ও শান্তির কাল বলে চিহ্নিত হয়েছে। ১৭৮৯ সালে স্যার জন শোর এমন কথা পর্যন্ত বলেছেন যে, শুজাউদ্দিনের শাসনকাল ছিল "সতর্ক, দৃঢ় অথচ নরমপন্থী এবং সমগ্র নবাবি (মুর্শিদকুলী থেকে মীরকাশিম পর্যন্ত) আমলের মধ্যে সম্ভবত আলিবর্দীর শাসনকালের শেষ কয়েক বছর ছাড়া যেকোন দিক থেকে শাসনব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশের উন্নতি।"[৪৯] শুজার শাসনকালেই ঢাকা শহরের পশ্চিম দিকের তোরণ পুনরায় খোলা হয়েছিল—শায়েস্তা

৪৫. Chaudhuri, *Trading World*, 102, 108

৪৬. *Bhattacharyya, East India Company*, 206.

৪৭. *Riyaz*, 280-81.

৪৮. B. P. C Vol. 6, f. 297, *Consultations*, 12 June 1727; *Riyaz*, 208; Salimullah, *Tarikh-i-Bangla*, f 65 b, quoted in Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, (Dhaka 1963), 73.

৪৯. Shore's Minutes, 18 June 1789 in W K. Firminger, *Fifth Report*, Vol II, 9.

খান বাংলা থেকে চলে যাবার পর এটি বন্ধ করা হয়েছিল এবং চালের দাম যতোদিন না টাকায় আট মণ হবে ততোদিন এটা খোলা বারণ ছিল। তার মানে শুজার সময় চালের দাম টাকায় আট মণে নেমে এসেছিল।[৫০] তিনিও অনটনের সময় খাদ্যশস্যের রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।[৫১] গোলাম হোসেন ও করম আলি দুজনেই বলেছেন যে, আলিবর্দীর শাসনকালে সর্বাঙ্গীণ উদারতার পরিচয় মেলে এবং নবাব প্রজাদের কল্যাণ ও সুবিধার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।[৫২] আবওয়াব ধার্য করা সত্ত্বেও আলিবর্দীর শাসনকালের শেষভাগে বাংলার প্রজারা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। খাদ্যাভাবের সময় আলিবর্দীর সরকার বাখরগঞ্জ থেকে কলকাতায় চাল রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে দ্বিধা করে নি। কলকাতায় বছরে প্রায় ৪০০,০০০ মণ চাল আমদানি হতো শহরের চাহিদাপূরণ ও পুনঃরপ্তানির জন্য। কলকাতার জমিদার হলওয়েল ও চালব্যবসায়ীদের পরামর্শে কলকাতার ইংরেজ কাউন্সিল এই নিষেধাজ্ঞা বাতিল করানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।[৫৩] খাদ্যশস্যের যখনই কোন অভাব হয়েছে, তখন আলিবর্দী মুর্শিদাবাদে রপ্তানিকৃত চালের উপর শুল্ক মওকুফ করে দিয়েছেন এবং মুর্শিদাবাদে খাদ্যসরবরাহকারী নৌকা থেকে চৌকিগুলিতে কোন শুল্ক নিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।[৫৪]

আগেই বলা হয়েছে, মূল্যস্তরের গতিবিধি বিচার করতে হলে প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের দাম, যেমন বাংলায় চালের দাম যাচাই করা প্রয়োজন। বস্ত্র বা রেশমের মতো প্রধান প্রধান রপ্তানিপণ্যের মূল্য দিয়ে তা বিচার করা সম্ভব নয়, কারণ এশীয় বণিক ও ইউরোপীয়দের কাছে এসব পণ্যের প্রচণ্ড চাহিদা থাকায় যখনই পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাব হতো, তখন এসব পণ্যের দাম অনেক বেড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকগণও যেহেতু এসব পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারটিকে সাধারণভাবে মূল্যবৃদ্ধির নির্ণায়ক মনে করেন এবং এটাকে বাংলায় "লক্ষণীয় ও উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি"র প্রমাণ হিসেবে দেখান[৫৫], সেজন্য আঠারো শতকের প্রথমার্ধে এসব পণ্যের মূল্যের সাধারণভাবে ঊর্ধ্বগতি হয়েছিল কিনা এবং হলে কতটা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। এখানে

৫০. J N Sarkar (ed) *History of Bengal, 427.*

৫১. B. P C Range I, Vol. 13, 20 July 1738, Vol. 13 f. 298.

৫২. J. C. Sinha, *Economic Annals of Bengal* , (London 1927), 19

৫৩. B. P C. Range I Vol 26, ff 152-54, 24 May 1753; ff 336-36 vol, 19 November 1753; vol. 27, f 181, 10 June 1754

৫৪. ঐ, Vol 26 ff 336 vo, 19 November 1753.

৫৫. Chaudhuri, *Trading World,* 102.

মনে রাখা দরকার, পূর্বতন ঐতিহাসিকগণও (যেমন কালী কিঙ্কর দত্ত, ব্রিজেন গুপ্ত)[৫৬] আলোচ্য সময়ে বস্ত্র ও রেশমের মূল্য "অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল" বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং একথাও বলেছেন যে, ১৭৩৮ ও ১৭৫৪ সালের মধ্যে এসব পণ্যদ্রব্যের দাম অন্তত শতকরা ৩০ ভাগ বেড়ে গিয়েছিল। অতি সাম্প্রতিক গ্রন্থে পি. জে. মার্শালও পূর্বোক্ত ঐতিহাসিকদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে একই রকমের অভিমত প্রদান করেছেন।[৫৭]

বস্ত্র ও রেশমের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল বলে কালীকিঙ্কর দত্ত ও ব্রিজেন গুপ্তের যে অভিমত তার একমাত্র এবং অন্যতম ভিত্তি ১১ ডিসেম্বর, ১৭৫২ সালের 'বেঙ্গল পাবলিক কনসালটেশনস'-এ অন্তর্ভুক্ত একটি চিঠির অপ্রাসঙ্গিক অপব্যাখ্যা।[৫৮] উক্ত কনসালটেশনস-এ ঢাকা থেকে ৪ ডিসেম্বর, ১৭৫২ সালে লেখা একটি চিঠির উল্লেখ আছে, যাতে ঢাকার কুঠিয়ালরা তাদের পাঠানো কাপড়ের নিকৃষ্ট মান সম্বন্ধে কলকাতা থেকে প্রেরিত অভিযোগের উত্তর দিচ্ছে। ঢাকার বক্তব্য, ১৭৩৮ সালের নমুনা দিয়ে ঢাকা থেকে পাঠানো ১৭৫২ সালের কাপড়ের গুণাগুণ বিচার করা মোটেই সমীচীন নয়। ঢাকার কুঠিয়ালরা তাদের পাঠানো কাপড়ের মান কেন নিকৃষ্ট হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে উক্ত চিঠিতে লিখেন,

> কাপাস তুলো গত দু'বছর ধরে ৯ টাকা বা ১০ টাকার নিচে পাওয়া যাচ্ছে না। চালের দামও খুব বেশি। অথচ ১৭৩৮ সালে কাপাসের দাম দুই টাকা আড়াই টাকার বেশি ছিল না। চালও ছিল খুব সস্তা—টাকায় ২ মণ ২০ সের থেকে ৩ মণ। তার উপরে সবাই জানে, সব রকম কাপড়ের দাম ১৭৩৮ সালের তুলনায় শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরো বেশি বেড়ে গেছে। গত দু'বছর ধরে তারা (ঢাকার কুঠিয়ালরা) খুবই ঝামেলায় আছে, কারণ ওখানে (সদ্য প্রতিষ্ঠিত) ফরাসী কুঠির লোকেরা ক্রমাগত মহামান্য (ইংরেজ) কোম্পানির ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। এরকম করে তারা মোটা, মিহি সবরকম কাপড়ের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে তাদেরও (ঢাকার কুঠিয়ালদের) কাপড়ের দাম ঠিক করার সময় দালালদের প্রতি সদয় হতে বাধ্য হতে হয়েছে।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঢাকার কুঠিয়ালরা তাদের পাঠানো কাপড়ের নিকৃষ্ট মান ও বেশি দামের সপক্ষে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেছে। কোম্পানির কর্মচারীরা সর্বদা

৫৬. Datta, *Bengal Suba*, 464; Brijen K. Gupta, *Sirajuddaulla and the East India Company*, (Leiden 1962), 33.

৫৭. P. J. Marshall, *East India Fortunes*, (Oxford 1976), 35; *Bengal 73,*

৫৮. *Bengal and Madras Papers*, Vol. II; P. 34, *Fort William Consultations*, 11 December 1752; B. P. C., Vol. 26, f. 214; *Consultations*, 11 December 1752; James Long, *Unpublished Records of the Government*, (ed.) M. P. Saha, (Calcutta 1973), 40, document no. 103.

সততার পরিচয় দিত না তা সর্বজনবিদিত। কাপড়ের মান যেহেতু ১৭৩৮ সালের নমুনা অনুযায়ী হওয়ার নির্দেশ ছিল, একমাত্র সেকারণেই ১৭৩৮ সালকে লক্ষ্যমাত্রা করা হয়েছে, আর কোন কারণে নয়। শুধু সেজন্যই ১৭৩৮ এবং ১৭৫২ সালের মধ্যে কাপড়ের দাম শতকরা ৩০ ভাগ বেড়ে গেছে বলে এত জোর দিচ্ছে ঢাকার কুঠিয়ালরা। তা ছাড়া উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি ভালভাবে পরীক্ষা করলে গত দু'বছর দরের উপর যে জোর দেয়া হয়েছে তা বোঝা যায়। অর্থাৎ তাদের পাঠানো কাপড়ের মানের অবনতি শুধু এ দু'বছরই ঘটেছে, ১৭৩৮ থেকে ১৭৫২ সাল পর্যন্ত পুরো সময় ধরে ঘটে নি। এসময়ের মধ্যে কাপড়ের দাম প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়েছে বলে উল্লেখ আছে সন্দেহ নেই এবং তা যদি সত্যি হয়, তাহলেও শুধু ঢাকা সম্বন্ধে এটা প্রযোজ্য। এই স্থানীয় মূল্যবৃদ্ধিকে সারা বাংলার সাধারণ মূল্যবৃদ্ধির সপক্ষে তথ্য বলে মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। উপরন্তু এই তথ্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে, কারণ এ চিঠি দুর্নীতির অভিযোগ স্খালনের প্রচেষ্টায় আত্মপক্ষ সমর্থন ছাড়া আর কিছু নয়। যারা কোম্পানির এই সময়কার নথিপত্র মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন, তারা সবাই লক্ষ্য করেছেন যে, যখনই কোম্পানির জন্য কেনা পণ্যদ্রব্যের নিকৃষ্ট মান ও চড়াদাম নিয়ে অভিযোগ উঠেছে, তখনই কর্মচারিরা একই সুরে চাল ও তুলোর অগ্নিমূল্য, এশীয় বণিক ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সাধারণভাবে সকল রপ্তানিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদির উল্লেখ করে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেছে। এ ধরনের 'তথ্য' বা 'অজুহাত' সম্বন্ধে সাবধানতা প্রয়োজন।

বরং তার চেয়ে বাস্তব তথ্য—সেই যুগের বাংলার বস্ত্র ও রেশমের বাজার থেকে সংগ্রহের মূল্য বিশ্লেষণ করলে তখনকার দিনে এসব পণ্যমূল্যের গতিবিধি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাবে। সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকগণ যেহেতু ১৭৪০-এর দশকের প্রথমদিক থেকে বাংলায় বাজারদরের উর্ধ্বগতি দেখানোর চেষ্টা করেছেন (মারাঠা আক্রমণের সঙ্গে যার সমগামিতা লক্ষণীয়), সেহেতু আমরা ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি যেসব বস্ত্র রপ্তানি করতো তার প্রধান কয়েকটির ১৭৩০-এর দশকের প্রথমদিকের এবং ১৭৪০-এর দশকের প্রথমদিকের দামের তুলনামূলক নিরীক্ষা করবো। এগুলি ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ মূল্য অর্থাৎ দু'পক্ষের মধ্যে অনেক দরকষাকষির পর ভারতীয় বণিকরা যে নির্ধারিত মূল্যে কোম্পানিকে এসব রপ্তানিপণ্য সরবরাহ করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে সেটা। সুতরাং এই মূল্যতালিকা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। যদিও কোম্পানি কখনো কখনো কাপড় সরবরাহের পর পূর্বনির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্য নিতে বণিকদের বাধ্য করেছে, সেটা প্রায় সব সময়ই করেছে নিকৃষ্টতর মানের দোহাই দিয়ে। সাধারণত চুক্তিবদ্ধ মূল্যের পরিবর্তন কখনো করা হতো না।

সারণি ১ : ১৭৩২ ও ১৭৪৪ সালে কতগুলি বিশেষ কাপড়ের দাম

বাণকদের সঙ্গে চুক্তবদ্ধ মূল্য ১৭৩২

কাপড়ের সংখ্যা	কাপড়ের নাম	দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ	প্রতিটির দাম
৬০০	কোসা	৪০ কোঃ ভ ৩ কোঃ	১৫ টাকা আনা
২০০	” মিহি	৪০ ” ভ ৩ ”	১৮ ”
৪৫০	”	৪০ ” ভ ২ $\frac{৫}{৮}$ ”	১৩ ”
১৫০	”	৪০ ” ভ ” ”	১৬ ”
৭,০০০	” ”	৪০ ” ভ ২ $\frac{১}{৪}$ ”	১১ ”
৫০০	” ”	৪০ ” ভ ২ $\frac{১}{৪}$ ”	১৪ ”
৪,০০০	”	৪০ ” ভ ২ ”	৯ ” ১২
৬০০	”	৪০ ” ভ ১ $\frac{৩}{৪}$ ”	৮ ” ১০
৫০০	”	৪০ ” ভ ১ $\frac{১}{২}$ ”	৭ ৮
৮০০	খাসা নাদোনা	২৫ ” ভ ২ $\frac{১}{৪}$ ”	৩ ” ১৪
৪০০	মলমল	৪০ ” ভ ৩ ”	১৫ ”
১০০	মলমল মিহি	৪০ ” ভ ৩ ”	১৮ ”
৩০০	” ”	৪০ ” ভ ২ $\frac{৫}{৮}$ ”	১৩ ”
১০০	” ”	৪০ ” ভ ২ $\frac{৫}{৮}$ ”	১৬ ”
৩,৮০০	”	৪০ ” ভ ২ $\frac{১}{৪}$ ”	১১ ”
৪০০	” মিহি	৪০ ” ভ ২ $\frac{১}{৪}$ ”	১৪ ”
১,৬০০	”	৪০ ” ভ ২ ”	৯ ” ১২
৫০০	”	৪০ ” ভ ১ $\frac{৩}{৪}$ ”	৮ ” ১০
—	—	— —	
৮০০	”	৪০ ” ভ ১ $\frac{১}{২}$ ”	৭ ”

উপরের সারণি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে রপ্তানির জন্য চুক্তিবদ্ধ দু'টি প্রধান বস্ত্রপণ্যের দাম ১৭৩২ থেকে ১৭৪৪ সালের মধ্যে একেবারেই বাড়ে নি। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এগুলি মিহি ও সুতীবস্ত্রের দাম, যেখানে দাম বাড়াটা স্বাভাবিক নয়। আসলে দাম বাড়ছে কিনা সেটা মোটা ও সস্তা কাপড়ের তুলনামূলক দামে ধরা পড়বে। সুতরাং দেখা যাক, কোম্পানির রপ্তানিতালিকায় সস্তা ও

মোটা কাপড়ের মধ্যে যেগুলো বহুলভাবে রপ্তানি হতো, সেগুলোর দামের কতটা তারতম্য এ বছরে হয়েছিল। সারণি ২-এ এরকম কাপড়ের জন্য কোম্পানির সঙ্গে ভারতীয় বণিকদের চুক্তিবদ্ধ মূল্য দেয়া হলো।

বণিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ মূল্য ১৭৪৪

কাপড়ের সংখ্যা	কাপড়ের নাম	দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ	প্রতিটির দাম	
১,৫০০	খাসা	৪০ কোঃ × ৩ কোঃ	১৫ টাকা	আনা
-	-	- -		
১,০০০	খাসা	৪০ " × ২ ৮/৫ "	১৩ "	
-	-	- -		
৫,০০০	"	৪০ " × ২ ১/৪ "	১৯ "	
-	-	- -		
৩০০০	"	৪০ " × ২ "	৯ টাকা	১২
৮০০	"	৪০ " × ১ ৩/৪ "	৮ "	১০
৭০০	"	৪০ " × ১ ১/২ "	৭ "	৮
২,০০০	খাসা নাদোনা	২৫ " × ২ ১/৪ "	৩ "	১৪
৬০০	মলমল	৪০ " × ৩ "	১৫ "	
১০০	" মিহি	৪০ " × ৩ "	১৮ "	
২০০	"	৪০ " × ২ ৫/৮ "	১৩ "	
-	-	- -		
৩০০০	"	৪০ " × ২ ১/৪ "	১৯ "	
১৫০	" মিহি	৪০ " × ২ ১/৪ "	১৪ "	
১,২০০	"	৪০ " × ২ "	৯ "	১২
১,০০০	"	৪০ " × ১ ৩/৪ "	৮ "	১০
২০০	" মিহি	৪০ " × ১ ৩/৪ "	১০ "	৮
১,০০০	"	৪ " × ১ ১/২ "	৭ "	

১৭৪৪ সালের জন্য, V O C. 2629 (K.A, 2521), ff.199-218, হুগলী থেকে বাটাভিয়া, ৪ জানুয়ারি, ১৭৪৪

কোঃ = কোভিদ বা Covid, পর্তুগীজ শব্দ, যার বাংলা অর্থ হাত অর্থাৎ ৪০ কোঃ × ৩ কোঃ হচ্ছে ৪০ হাত ×৩ হাত।

সারণি ২ : মোটা ধরনের কাপড়ের দাম, ১৭৩২ ও ১৭৪৪

বাণকদের সঙ্গে চুাক্তবদ্ধ মূল্য ১৭৩২

কাপড়ের সংখ্যা	কাপড়ের নাম	দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ	প্রতিটির দাম
৮০০	সানু	২৪ কোঃ ভ ২ কোঃ	৪ টাকা ৮ আনা
৬,০০০	খড়িদারি বা চোরাদারি	১৮ " ভ ২ $\frac{১}{৪}$ "	৪ "
৫,০০০	ফোটা	২৪ " ভ ২ $\frac{১}{৪}$ "	৫০ টাকা প্রতি কর্জ
২০,০০০	রুমাল (সুতী)	১৫ '" ভ ১ "	৫০ " " "
৪,০০০	দিশী	৪ " ভ ১ $\frac{১}{২}$ "	১৩ " " "

বণিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ মূল্য ১৭৪৪

কাপড়ের সংখ্যা	কাপড়ের নাম	দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ	প্রতিটির দাম
১,০০০	সানু	২৪ কোঃ ভ ২ কোঃ	৪ টাকা ৮ আনা
২,০০০	খড়িদারি/ চোরাদারি	১৮ " ভ ২ $\frac{১}{৪}$ "	৪ "
৬,০০০	ফোটা	২৪ " ভ ২ $\frac{১}{৪}$ "	৫৭ টাকা প্রতি কর্জ
৫০,০০০	রুমাল (সুতী)	১৫ " ভ ১ "	৫০ " " "
১,০০০	দিশী	৪ " ভ ১ "	১৩ " " "

[সূত্র ১ নং সারণি দেখুন। কর্জ (×) হচ্ছে এক কুড়ি অর্থাৎ কুড়িটি]

এই সারণি থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মোটা ধরনের কাপড়ের ক্ষেত্রেও একমাত্র মোটা কাপড়ের দামে সামান্য বৃদ্ধির আভাস ছাড়া ১৭৩২ থেকে ১৭৪৪ সালের মধ্যে কাপড়ের দামে কোন তারতম্য হয় নি।

রেশমের ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা একটু ভিন্ন চিত্র পাই। নীচের সারণিতে রপ্তানি- পণ্যের মধ্যে অন্যতম এই পণ্যের ১৭৩৩ থেকে ১৭৫৩ পর্যন্ত কয়েক বছরের মূল্যের গতিবিধি পাওয়া যাবে।

সারণি ৩-এ রেশমের মূল্যে যে প্রবণতা দেখা যায়, তা এ যুগে মূল্যের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতি নির্দেশ করে না। ১৭৩৩ থেকে ১৭৪৫ সাল পর্যন্ত রেশমের দাম বেড়েছে যৎসামান্যই, সুতরাং ১৭৪০-এর দশকে প্রথম থেকে বাংলার মূল্যস্তর অস্বাভাবিকভাবে

সারণি ৩ : কাঁচা রেশমের দাম, ১৭৩৩-১৭৫৩

তারিখ		কোন্ রকমের রেশম	প্রতি সেরের দাম				সূত্র
মার্চ	১৭৩৩	নভেশ্বরবন্দ	৫	টাকা	১২	আনা	KFR, Vol. 5, Consult.7 March 1733
"	"	গুজরাট	৬	"	৬	"	" " " " "
"	"	কুমারখালী	৫	"	১২	"	" " " " "
জানুয়ারি	১৭৪৫	নভেশ্বরবন্দ	৫	"	১৪	"	KFR Vol.6, Consult. 19 Jan. 1745
"	"	গুজরাট	৬	"	৭	"	" " " " "
"	"	কুমারখালি	৫	"	১১	"	" " " " "
এপ্রিল	১৭৪৭	নভেশ্বরবন্দ	৯	"	8	"	B.P.C Range, 1, Vol. 19, f. 209 vo., Consult. 22 April 1747
"	"	গুজরাট	৯	"	১৩	"	" " " " "
"	"	কুমারখালি	৯	"	১	"	" " " " "
জানুয়ারি	১৭৪৮	নভেশ্বরবন্দ	৯	"	8	"	C & B. Abst. Vɔl 5, f 114, 10 Jan. 1748
"	"	গুজরাট	৯	"	১৩	"	" " " " "
"	"	কুমারখালি	৯	"	১	"	" " " " "
জুন	১৭৪৮	নভেশ্বরবন্দ	৭	"	৮	"	K. F. R., Vol. 7, Consult. 2 June 1748
"	"	গুজরাট	৮	"	১	"	" " " " "
"	"	কুমারখালি	৭	"	৫	"	" " " " "
অক্টোবর	১৭৪৯	নভেশ্বরবন্দ	৭	"	-	"	B. P. C Range 1, Vol 22. ff. 350-50vo., Consult. 31 Oct. 1749

সারণি ৩ : আগের পৃষ্ঠার পর

তারিখ		কোন্ রকমের রেশম	প্রতি সেরের দাম	সূত্র
”	”	গুজরাট	৭ ” ৯ ”	” ” ” ”
”	”	কুমারখালি	৬ ” ১৩ ”	” ” ” ”
ফেব্রুয়ারি	১৭৫১	নভেশ্বরবন্দ	৮ ” ॥ ”	K. F. R., Vol. 10, Consult. 22 Feb. 1751
”	”	গুজরাট	৮ ” ৯	” ” ” ”
”	”	কুমারখালি	৭ ” ১৩ ”	” ” ” ”
”	”	নভেশ্বরবন্দ	৭ ” ১২ ”	B. P. C., Range 1, Vol. 26, f. 114, Consult.
16				March 1752
”	”	গুজরাট	৮ ” ৭ ”	” ” ” ”
”	”	কুমারখালি	— — —	— — —
এপ্রিল	১৭৫৩	নভেশ্বরবন্দ	৭ ” ১২ ”	B. P.C. Range 1, Vol. 26, f. 114, Consult. 18 April 1753
মার্চ	১৭৫২	নভেশ্বরবন্দ	৭ ” ১৪ ”	B. P. C. Range 1, Vol-25, f-86 vo.. Consult. 18 April 1753
”	”	গুজরাট	৮ ” ৫ ”	” ” ”

সূত্র : K. F. R. = Kasimbazar Factory Records; B P.C. = Bengal Public Consultations; C & B Abst. = Coast of Bay Abstracts. All in India Office Library, London].

বাড়তে থাকে বলে যে ধারণা এতদিন করা হয়েছে তা মোটেও ঠিক নয়। উপরের সারণিতে দেখা যায়, ১৭৪৭ থেকে ১৭৪৮ সালের মধ্যে রেশমের দাম হঠাৎ অনেক বেড়ে গেছে। তবে এটা সাময়িক ব্যাপার, কারণ ১৭৪৮ সালের জুন মাস থেকে দাম আবার কমতে থাকে এবং ১৭৫১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সামান্য বৃদ্ধি ছাড়া মোটামুটি একই ছিল। অর্থাৎ রেশমের ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা যে অভিমত প্রদান করেছিলেন তা সঠিক নয় বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। রেশমের মূল্যের গতিবিধিতে যে কিছুটা এলোমেলো ভাব দেখা যায় তার প্রধান কারণ, রেশম একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধরনের পণ্য, গুটিপোকার চাষ থেকে শুরু করে প্রত্যেক স্তরে এর উৎপাদন নানা প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কোন একটি স্তরে কিছু ঝামেলা হলেই উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে, তাতে দামেরও হেরফের হয়। এতসব সত্ত্বেও রেশমের মূল্যের গতিপ্রকৃতিতে কোন স্থায়ী ঊর্ধ্বগতির প্রবণতা দেখা যায় না।

আগেই বলা হয়েছে, মূল্যের গতিবিধি সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য বাংলায় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন চালের মূল্য যাচাই করা, কারণ ভাত বাংলার প্রধান খাদ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অসুবিধে হলো চালের নানা প্রকারভেদ নিয়ে, যার উপর নির্ভর করে দামেরও বিস্তর তারতম্য দেখা যায়। সারণি ৪-এ একটি উদাহরণ দেয়া হলো, যা আমাদের বক্তব্য সমর্থন করছে।

সারণি ৪ : চালের দাম, ১৭২৯

কি ধরনের চাল	দাম	টাকা প্রতি	পরিমাণ	
সরু চাল :				
বাঁশফুল ঃ প্রথম শ্রেণী	"	" "	১ মণ	১০ সের
২য় শ্রেণী	"	" "	১ "	২৩ "
৩য় শ্রেণী	"	" "	১ "	৩৫ "
মোটা চাল :				
দেশনা	"	" "	৪ "	১৫ "
পূরবী	"	" "	৪ "	২৫ "
মুনসুরা	"	" "	৫ "	২৫ "
কুরকাসালী	"	" "	৭ "	২০ "

[সূত্র ঃ *Sixth Report*, Appendix 15]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চাল মোটা না সরু সেটা জানাই শুধু যথেষ্ট নয়, মোটা বা সরুর মধ্যেও আবার তারতম্য আছে। মোটা চালের দামই যখন টাকায় ৪ মণ ১৫ সের থেকে ৭ মণ ২০ সের পর্যন্ত হতে পারে (অর্থাৎ দামের তফাৎ ৭১%)[৫৯], তখন চালের প্রকৃত

৫৯. Chaudhuri, *Trading World*, 99; Marshall, *Bengal*, 73, 142, *Eas. India Fortunes*, 35.

মান কি সেটা নিশ্চিতভাবে না জেনে শুধু সরু বা মোটা চালের দাম থেকে সাধারণভাবে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিপন্ন করা একেবারে যুক্তিসঙ্গত নয়। তাতে বিরাট ভুলভ্রান্তির ঝুঁকি থেকে যায়। তবুও এধরনের তথ্য এবং অনেক সময় শুধু খণ্ড খণ্ড তথ্যের ভিত্তিতে সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকগণ উক্তি করেন যে, "১৭৩৮ সালে চালের দাম ছিল টাকায় ১০০ থেকে ১২০ সের আর ১৭৪০ সালের মাঝামাঝি টাকায় পাওয়া যেতো মাত্র ৩০ সের।" এটিকে তথ্য হিসেবে পেশ করে বলা হয়েছে যে, বাংলায় "উৎপাদন কমেছে ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে"[৬০] কিংবা ১৭৪০ থেকে "বাংলার সুবিধাজনক আর্থিক অবস্থা অন্তর্হিত।"[৬১] পূর্বতন ঐতিহাসিকের উপর নির্ভর করে সাম্প্রতিক বিশেষজ্ঞগণও বলেন যে, ১৭৩৮ থেকে ১৭৫৪ সালের মধ্যে "কলকাতায় চালের দাম তিন-চার গুণ বেড়ে গিয়েছিল"।[৬২] এই বিশেষজ্ঞদের সাম্প্রতিকতম গ্রন্থেও উক্ত বক্তব্যের পুনরুক্তি করা হয়েছে এভাবে—"স্থানীয় অভাব থেকে খাদ্যদ্রব্যের খুবই মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে।"[৬৩]

এখন দেখা যাক এই বক্তব্য কতটা তথ্যনির্ভর। ১৭৩৮ সালে চালের দাম কত ছিল তার জন্য কালীকিঙ্কর দত্ত এবং ব্রিজেন গুপ্ত[৬৪] উভয়েই নির্ভর করেছেন ঢাকা কুঠিয়ালদের ১৭৫২ সালে কলকাতা থেকে লেখা একটা চিঠির উপর। ঐ চিঠিতে নিম্নমানের কাপড় সরবরাহের অভিযোগের উত্তর দেয়া হয়েছে বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিটা যে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লেখা হয়েছে তাই নয়, আরো লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ১৭৫২ সালে ঢাকার কর্মচারিরা ১৭৩৮ সালে চালের দামের কথা লিখছে সম্ভবত অনেকটা কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করেই। তা ছাড়া নিজেদের দোষ ঢাকা দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় সত্যের উপর রং চড়ানোর সম্ভাবনাও বাদ দেয়া যায় না। আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, উক্ত চালের দামের উল্লেখ শুধু ঢাকার প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এ তথ্যটিও পূর্বে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ঢাকা ও কলকাতায় চালের দাম এক হবে এটা আশা করা ঠিক নয়। তা ছাড়া কোম্পানির নথিপত্রে বহুবার উল্লেখ আছে যে, কলকাতায় চালের দাম প্রায়ই বাখরগঞ্জ ও দৌলিয়া থেকে সরবরাহের উপর নির্ভর করতো। এ সরবরাহে ঘাটতি পড়লে বা তা বন্ধ হলে শহরে 'প্রচণ্ড অভাব-অনটন' দেখা দিত এবং শহরে ক্রমবর্ধমান 'শিথিল অবস্থার' সুযোগ নিয়ে কলকাতার চাল ব্যবসায়ীরা প্রায়ই কৃত্রিমভাবে চালের দাম বাড়িয়ে দিত।[৬৫] প্রকৃতপক্ষে সারণি ৫ থেকে দেখা যাবে, ১৭৩৮ সালে কলকাতায় চালের দাম ছিল মাদ্রাজী টাকায় ৩৮ সের। এই দামেই

৬০. Gupta, *Sirajuddaullah*, 33
৬১. Marshall, *East India Fortunes*, 35
৬২. ঐ।
৬৩. Marshall, *Bengal*, 73. আরো উল্লেখযোগ্য, মার্শাল বলছেন, "১৭৪০-এর দশকে জিনিসপত্র দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ও অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় মূল্য অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল।" তিনি অবশ্য প্রধানত কে. এন. চৌধুরীর উপর নির্ভর করেই এ সিদ্ধান্ত টেনেছেন।
৬৪. Datta, *Bengal Suba*, 463-64, Gupta, *Sirajuddaullah*, 33.
৬৫. B. P. C., Vol . 26, ff 56 vo-57, 19 February 1753; ff. 152-154, 24 May 1753; ff. 336-36 vol, 19 November 1753; Vol. 27, f, 181. 10 June 1754, ff 244vo-245, 12 August 1754, ff 378-78 vol, 5, December 1754.

সারণি ৫ : বাংলায় চালের দাম, ১৭৩৮-১৭৫৪

তারিখ	স্থান	টাকা প্রতি	মণ	সের	চালের মান	সূত্র
১২ জুন ১৭৩৮	কলকাতা	প্রতি মাদ্রাজ টাকায়	০ মণ	৩০ সের	মোটা (সৈন্যদের জন্য)	B.P.C, Vol. 13, f 262 Vol.
২৬ মার্চ ১৭৩৯	"	" "	১ মণ	৩০ সের	'খুব ভাল'	" " "
৩১ মে ১৭৩৯	ঢাকা	" দশম "	৯ 'পসারী'(?)		সরু	D. F. R, Vol. 2, Consult. 31 May 1739
"	"	" " "	১১ 'পসারী'(?)		'সাধারণ'	" "
৭ জানুয়ারি ১৭৪৪	কলকাতা	" মাদ্রাজ "	০ মণ	৩০ সের	'মোটা ধরনের'	B.P.C. Vol. 16, f. 40 1 Vol.
"	"	" আর্কট "	১ মণ	– "	মোটা	" " "
২০ সেপ্টেম্বর ১৭৫১	"	প্রতি টাকায়	০ "	৩৫ "	'ভাল'	B.P.C. Vol. 24. f. 323
"	"	" "	১ মণ	১০ "	'সাধারণ'	" " "
২ জানুয়ারি ১৭৫২	কলকাতা(?)	" "	-	৩৫ "	'ভাল'	Beng. Gen. Letters., Vol. 22
"	"	" "	১ "	১০ "	'সাধারণ'	" " "
১১ ফেব্রুয়ারি ১৭৫৩	"	" "	০ -	২৩ "	?	H.P., Vol. 3, f. 68, Consult. 11 Feb. 1753
১০ জুন ১৭৫৪	"	" "	০ -	৩২ $\frac{১}{২}$ "	'সরু'	B.P.C., Vol. 27, ff. 224 vo. 225
" "	"	" "	০-	৩৫ "	'মাঝারি'	" " "
" "	"	" "	১ "	- "	'মোটা'	" " "
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৭৫৬	"	" "	০ -	৩৭ "	?	H.P., Vol. 5. f. 712. Consult. 6 Feb. 1756

সূত্র : D.F.R.- Dhaka Factory Records, B.P.C- *Bengal Public Consultations;* Beng-Gen. Letters—Bengal General Letters, all received from India Office Library; H.P.— Home Public Series, National Archives of India, New Dellhi

ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল সৈন্যবাহিনীর জন্য চাল কেনা স্থির করে (এটা মোটা চাল ঠিকই, কিন্তু কি ধরনের মোটা চাল সেটাই প্রশ্ন), যেখানে ১৭৪৪ সালে 'মোটা গোছের' চালের দাম ছিল কলকাতায় মাদ্রাজী টাকায় ৩০ সের। চালের দাম 'প্রচণ্ড' বেড়ে যাওয়ার জন্য চালের আমদানিকারকদের দায়ী করে কাউন্সিল কলকাতার জমিদারকে আদেশ দেয় তিনি যেন প্রতি আর্কট টাকায় ১ মণের কম কাউকে চাল বিক্রি করতে অনুমতি না দেন।[৬৬] নীচের সারণি থেকে আরো দেখা যাবে যে, ১৭৫৪ সালে ভাল সরু চাল টাকায় মাত্র ৩২.৫ সের করে বিক্রি হয়েছে, যেখানে মোটা চাল পাওয়া যেতো আর্কট টাকায় ১ মণ। সুতরাং ১৭৩৮ থেকে ১৭৫৪ সালের মধ্যে চালের দাম তিন-চার গুণ বেড়েছিল বলে ঐতিহাসিকদের যে বক্তব্য তা মেনে নেয়া যায় না।

সারণি ৪ থেকে চালের দামের হ্রাস-বৃদ্ধির কোন স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠে না। তবে এই সারণি বিশ্লেষণ করতে গেলে একথা মনে রাখা দরকার যে, কতগুলি দাম অনটন ও দুর্ভিক্ষের সময়কার, স্বাভাবিক সময়কার নয়। যেমন ১৭৩৮ সালে চালের দাম। ১৭৩৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বাংলায় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি ও বন্যা হয়, যার ফলে ১৭৩৮ সালে চালের দাম বেড়ে যায়।[৬৭] আবার মারাঠা আক্রমণের পর এবং ভাল বৃষ্টি না হওয়ায় ১৭৫২ সালে দুর্ভিক্ষ হয়। ৬০ বছরের মধ্যে এমন খাদ্যাভাব কখনো হয় নি। ফলে চালের দাম ১৭৫৩ সালের প্রথমদিকে বেড়ে টাকায় ২৩ সের হয়েছিল। তবে মুর্শিদাবাদে চালের দাম আগের চেয়ে ৬ গুণ বেড়ে গেছে বলে ওরমের যে বক্তব্য[৬৮] তা অত্যুক্তি ভিন্ন কিছু নয়।[৬৯] ১৭৫৩ সালের প্রথম দিকে চালের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া যে নেহাৎই সাময়িক ব্যাপার সেটা ১৭৫৩ সালের শেষে এবং ১৭৫৪ সালে চালের দাম আবার স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ায় উপরের সারণি থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

এই পর্যায়ে সঠিক পরিসংখ্যানের অভাবে ও সীমিত তথ্যের জন্য চালের দাম থেকে সাধারণ দামের গতিবিধি নির্ণয় করা যে খুবই কঠিন তা নিম্নের সারণি থেকে বোঝা যাবে।

সারণি ৪-এ প্রদত্ত চালের দামের সঙ্গে সারণি ৫-এ প্রদত্ত চালের দাম মেলানো কঠিন ব্যাপার। তবে এতে আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, যদিও চালের দামই সাধারণ

৬৬. B. P C. *Range* I, Vol 16, f 401 vol, 7 January 1744.

৬৭. Bhattacharyya, *East India Company*, 214-15, ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টকে লেখা এক চিঠিতে হুগলীর ফৌজদার পীর খান অভিযোগ করেছিলেন যে, কলকাতা থেকে কোম্পানি এবং ব্যবসায়ীদের চাল রপ্তানির ফলে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। B P. C Range 1, Vol. 13,f, 298, Annexure to Consultations, 20 July 1738.

৬৮. Robert Orme, *Historical Fragments of the Mogul Empire*, (London 1905), 405.

৬৯. মার্শাল কিন্তু খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি দেখাতে গিয়ে এই তথ্য এবং হলওয়েলের কলকাতার দুর্ভিক্ষের বর্ণনার উপর নির্ভর করেছেন, Holwell, *India Tracts*, 2nd edn. (London 1764), 165; দ্রষ্টব্য, Marshal, *Bengal*, 18, 73.

সারণি ৬ : ওলন্দাজ নথিপত্রে খাদ্যদ্রব্যের দাম, ১৭৩০-৩২

খাদ্যদ্রব্য	জানুয়ারি ১৭৩০	মার্চ ১৭৩১	মার্চ ১৭৩২
সরু চাল	প্রতি সিক্কা টাকায় ৩০ সের	প্রতি সিক্কা টাকায় ২০ সের	প্রতি সিক্কা টাকায় ২০ সের
মোটা চাল	" " " ১ মণ ৫ সের	" " " ৩৫ "	" " " ৩৫ "
গম	" " " ২০ "	" " " ৩০ "	" " " ৩০ "
সর্ষের তেল	৬৮ পাউন্ডের দাম ৬ টাকা	৬৮ পাউন্ডের দাম ৬ টাকা	৬৮ পাউন্ডের দাম ৬ টাকা
মাখন	" " " ৮ টাকা ৮ আনা	" " " ১০ টাকা	-
কড়ি	প্রতি চলতি টাকায় ৩২ পণ	প্রতি চলতি টাকায় ৩২ পণ	প্রতি চলতি টাকায় ৩২ পণ

সূত্র : K.A. 2045, ff. 8074-74 vo, K A 2087, f 430; K.A 2133. ff 963-64 চলতি টাকা, যেটাকে বলা হতো 'কারেন্ট রুপি'।

মূল্যবৃদ্ধির প্রধান সূচক, তবু আমাদের আলোচ্য সময়ে সঠিক পরিসংখ্যানমূলক তথ্যের অভাবে চালের দামের উপর নির্ভর করা সমীচীন নয়। সুতরাং এ সময় বাংলায় মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল কি হয় নি এ বিষয়ে চালের দামের উপর নির্ভর করে সঠিক কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব নয়।

বাংলায় সাধারণভাবে মূল্যবৃদ্ধির কথা বলতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ এমনকি অধুনাতম গ্রন্থেও মারাঠা আক্রমণের ফলাফল ও ইউরোপীয় বাণিজ্যের উপর অযথা বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৭০] ১৭৪০-এর দশক থেকে বাংলায় মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে বক্তব্যে যুৎসই তথ্য হিসেবে ইংরেজ কোম্পানির গুদামঘরের দুই কর্মচারি ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড ও ম্যানিংহামের রিপোর্টকে ব্যবহার করা হয়েছে।[৭১] আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি যে, এই রিপোর্ট স্ববিরোধী, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ইংরেজদের পণ্যসরবরাহ দাদনি থেকে গোমস্তা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের জন্য উদ্দেশ্যমূলক অত্যুক্তি ছাড়া কিছু নয়।[৭২] সুতরাং এ রিপোর্টকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা প্রয়োজন। উপরন্তু এই দুই ইংরেজ কর্মকর্তা লিখেছেন যে, "জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুগুলির দাম 'গত দশ-বিশ বছরে' অত্যধিক বেড়ে গেছে।" এই উক্তি থেকে তাঁদের বক্তব্যের নমনীয় ভাবও লক্ষণীয়। যেহেতু তাঁরা ১৭৫৩ সালে লিখছেন, তাতে "গত দশ-বিশ বছরে" মূল্যবৃদ্ধি মানে ১৭৩৩ থেকে মূল্যবৃদ্ধি বোঝাতে পারে, আবার ১৭৪৪ থেকে মূল্যবৃদ্ধিও বোঝাতে পারে। এ একটা অদ্ভুত অবস্থা। অথচ আমাদের বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, ১৭৪০-এর দশকের প্রথমদিক থেকেই শুধু "লক্ষণীয় এবং উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি" হয়েছে। অর্থাৎ ১৭৩০ এবং ১৭৪০-এর দশকে মূল্যস্তরের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। সুতরাং এই দুই ইংরেজের বক্তব্যের একাংশ ("গত বিশ বছর ধরে") অবান্তর হয়ে পড়ছে। মূল্যবৃদ্ধি যদি ১৭৪০-এর দশকের প্রথমদিক থেকে হয়ে থাকে, তাহলে এই রিপোর্টের বক্তব্য আমাদের বিশেষজ্ঞদের মতের সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু আমরা আগেই দেখিয়েছি, ব্যাপারটি তা নয় অর্থাৎ ১৭৪০-এর দশকের প্রথমদিকে বাংলায় মোটেই লক্ষণীয় মূল্যবৃদ্ধি ঘটে নি। সুতরাং ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড ও ম্যানিংহামের রিপোর্টকে মূল্যবৃদ্ধির নির্ভরযোগ্য তথ্য হিসেবে মনে করার কোন কারণ নেই।

অনেক আধুনিক ঐতিহাসিকের মতো উক্ত দুই ইংরেজও তথাকথিত মূল্যবৃদ্ধির জন্য মারাঠা আক্রমণের ফলে সবকিছুর অভাব-অনটনকে দায়ী করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে, মারাঠা আক্রমণের ফলে বাংলার কোন কোন অঞ্চলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল। তবে এর ফলাফলকে প্রায়শই অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। মারাঠারা যে পথে

৭০. Datta, *Bengal Suba*, 465-68; Chaudhuri, *Trading World*, 99-108, P. J. Marshal, *Bengal*, 73, 142-43.

৭১. Frankland and Manningham's Report, B. P. C Range I, ff. 164-65, 7 June 1753. Both K. N. Chauduri and P.J. Marshall relied heavily on this report, Chaudhuri, *Trading World*, 99, 102; Marshall, *East India Fortunes*, 35

৭২. S Chaudhury, " Merchants, Companies and Rulers—Bengal in the Eighteenth Century", *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Leiden, XXXI (1988), 82-89.

এগিয়েছে, সাধারণত ক্ষয়ক্ষতি তার দু'পাশেই হয়েছে। দেশের অন্যান্য জায়গায় কিন্তু তেমন কিছু হয় নি। রিচার্ড বেচার দেখিয়েছেন যে, বর্ষা শুরু হলে আক্রান্ত জায়গাগুলি থেকে মারাঠারাও ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। ফলে ঐ এলাকাতেও জানুয়ারি পর্যন্ত কোন উপদ্রব ছিল না। মারাঠারা চলে যাওয়ার পর পরই সেখানকার অধিবাসীরা চাষবাস শুরু করে, ফসল তুলে পরের বছর আক্রমণ শুরু হওয়ার আগেই সেগুলি বিক্রি করার ব্যবস্থা করেছে।[৭৩] মারাঠা আক্রমণ সত্ত্বেও দেশের আর্থিক অবস্থা যে তেমন খারাপ হয় নি তার প্রমাণ, জমিদারগণ তাদের বার্ষিক খাজনা ছাড়াও যুদ্ধবিগ্রহের বাড়তি খরচ মেটানোর জন্য আলিবর্দীকে একবার এক কোটি টাকা ও আরেকবার ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছে।[৭৪] মারাঠা আক্রমণের ফলে বাংলার বহু বণিক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং নবাব ও জমিদারদের অতিরিক্ত অর্থচাহিদার জন্য সর্বস্বান্ত হয়েছিল বলে যে বক্তব্য তা কিন্তু ঠিক নয়। তেমনি বণিকদের আর্থিক অবস্থার অবনতির ফলে ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি ক্রমশ নিজস্ব গোমস্তার মাধ্যমে তাঁতী বা অন্যান্য কারিগরদের সঙ্গে সোজাসুজি পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করছিল বলে যে অভিমত সেটাও মেনে নেয়া যায় না। আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি[৭৫], ওলন্দাজ কোম্পানি ১৭৪৭ থেকে ১৭৪৯ সাল পর্যন্ত কয়েক বছর মাত্র পরীক্ষামূলকভাবে বিশেষ অঞ্চলে এই ধরনের চেষ্টা করেছিল এবং সেখানেও আবার ১৭৫০ থেকে দাদনি বণিকদের সঙ্গে চুক্তিতে ফিরে গিয়েছিল। আর ১৭৫৩ সালে ইংরেজ কোম্পানির দাদনি থেকে গোমস্তা পদ্ধতিতে বাণিজ্যরীতির পরিবর্তন বাংলার বণিকদের আর্থিক অবস্থার অবনতির জন্য ঘটে নি, ঘটেছিল অন্য কারণে। ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করতে গিয়ে দাদনি ব্যবস্থার পরিবর্তন করেছিল।

মারাঠা আক্রমণের ফলাফল যে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছিল তা প্রমাণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ আবার সমসাময়িক সাহিত্য ও ফার্সি ইতিহাসের উপর বড় বেশি নির্ভর করেছেন। এই তথ্যগুলি ভাল করে বিচার করলে বোঝা যায় যে এগুলি অতিরঞ্জিত। গঙ্গারাম লিখেছেন, "চাল, ডাল, তেল, ঘি, ময়দা, চিনি, লবণ সবকিছুই টাকায় এক সের দামে বিক্রি শুরু হয়েছে...। সমাজের নীচতলা থেকে উপরতলার সবাইকে, এমনকি নবাবকে পর্যন্ত কলাগাছের থোড় সেদ্ধ করে খেয়ে প্রাণধারণ করতে হয়েছে।"[৭৬] এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, চাল, ডাল, ঘি, তেল, লবণ সবকিছুরই দর এক টাকা। আরো অবিশ্বাস্য যে, নবাবকে পর্যন্ত কলাগাছের থোড়সেদ্ধ খেয়ে বাঁচতে হয়েছে। এ কথাকে কাব্যিক উচ্ছ্বাস বলে ধরে নিলেও একে ঐতিহাসিক তথ্য বলে মানা কঠিন। *রিয়াজ-উস-সালাতিন*-এর লেখকও ক্ষিধের জ্বালায় মানুষকে কলাগাছের থোড় খেয়ে বেঁচে থাকতে

৭৩. Richard Becher's Letter to Governor Verelst, 24 May 1769, quoted in W. K. Firminger, *Fifth Report*, 183-184

৭৪. ঐ।

৭৫. S Chaudhury, "Merchants, Companies and Rulers".

৭৬. Gangaram, *Maharastrupurana,* Lines 234-42.

হয়েছে বলে লিখেছেন। তবে সেটা মূলত বর্ধমান শহরের কথা, কারণ সেখানে ধানের গোলাগুলি মারাঠারা পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং অল্প কিছুদিন বাইরে থেকে খাদ্য সরবরাহও বন্ধ করে দিয়েছিল।[৭৭] ভারতচন্দ্র বর্ধমানে মালিনীর বাজার করার বর্ণনা দিয়েছেন, তবে সে জিনিসপত্র যে দামে কিনেছে তা 'অত্যন্ত বেশি' মনে হলেও সঠিক তথ্যের অভাবে আগের দামের সঙ্গে তুলনা করে সত্যিই তাই কিনা জানার উপায় নেই।[৭৮] মারাঠা আক্রমণের ফলে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর, বিশেষকরে ইংরেজ কোম্পানির বাংলা থেকে মোট রপ্তানির পরিমাণে তেমন হেরফের হয় নি। তা থেকেও বোঝা যায়, এই উপদ্রবের ফলে বাংলার সাধারণ আর্থিক অবস্থার সাংঘাতিক ক্ষতি কিছু হয় নি।[৭৯]

সম্প্রতি এক ঐতিহাসিক[৮০] বলেন, "পলাশী যুদ্ধের বছর দশেক আগে থেকে ইউরোপীয়দের বাণিজ্যবৃদ্ধি ও তার ফলে বাংলায় রূপার আমদানিবৃদ্ধিতে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে।" এই বক্তব্য যদিও ১৭৪০-এর দশক থেকে মারাঠা আক্রমণের কিছুদিন পর বাংলায় মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছিল বলে যে প্রচলিত অভিমত তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তবুও তা সমর্থন করা যায় না। এই যুগে ইউরোপীয়দের মধ্যে বাংলার পণ্য রপ্তানিকারী প্রধান দু'টি কোম্পানি হলো ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি। ১৭২০-এর দশকের শেষদিক থেকে ওলন্দাজরা ইংরেজদের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিল। আর ইংরেজ কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলা থেকে মোট রপ্তানির পরিমাণ ১৭৩০-এর দশকের তুলনায় ১৭৪০-এর দশকে তেমন বিপুল কিছু বাড়ে নি। নীচের সারণি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে :

সারাণ ৭ : হংরেজ কোম্পানর পঞ্চবাষক রপ্তানর পারমাণ, ১৭২৭-৫৫

বছর	মোটমূল্য	বাৎসরিক গড়মূল্য
১৭২৭-৩১	২,২৮৯,৩২৩ পাউন্ড	৪৫৭,৮৬৫ পাউন্ড
১৭৩২-৩৬	২,০৪৬,১৫০ "	৪০৯, ২৩০ "
১৭৪১-৪৫	২,৪০১,৭৮৫ "	৪৮০,৩৫৭ "
১৭৪৬-৫০	২,১৭৩,৫২৪ "	৪৩৪,৭০৫ "
১৭৫১-৫৫	২,০৩৩,২৩৫ "	৪০৬,৬৪৮ "

সূত্র : কে. এন. চৌধুরীর *দি ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড অব এশিয়া* (পৃ. ৫০৯-৫১০) থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে এই সারণি তৈরি করা হয়েছে। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে উপরোক্ত বছরগুলিতেই ইংরেজ কোম্পানির রপ্তানির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ছিল।

৭৭. *Riyaz*, 340

৭৮. K. K. Datta, *Bengal Suba*, 466.

৭৯. 'ইউরোপীয় কোম্পানি ও বাংলার রপ্তানিবাণিজ্য' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮০. P. J. Marshall, *Bengal*, 163-64.

উপরোক্ত তথ্য থেকে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, ১৭৩০-এর দশকে বাংলা থেকে ইউরোপীয় রপ্তানির পরিমাণ চল্লিশের দশক ও পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধের রপ্তানির প্রায় কাছাকাছি ছিল। সুতরাং ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে ক্রমবর্ধমান পণ্যক্রয়ের ফলে বাংলায় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল—এ কথা বলা যায় না। তা ছাড়া বাংলা থেকে ইউরোপীয় রপ্তানি সত্যিই যদি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাতে যে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেতোই একথা বলা যায় না। সম্প্রতি একজন ঐতিহাসিক[৮১] বলেছেন যে, রপ্তানিদ্রব্যের মোট পরিমাণ বৃদ্ধিতে এমন ক্ষেত্র তৈরি হবার সম্ভাবনা ছিল যাতে এসব রপ্তানিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সমুচিত ব্যবস্থা করা যেতো। একথা অবিসংবাদিতভাবে বলা যায় যে, মুগল ভারতে বাংলা ছিল সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলগুলির অন্যতম। শুধু ভারতের অন্যান্য অংশে নয়, প্রতিবেশী কয়েকটি দেশেও বাংলা থেকে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হতো। উক্ত ঐতিহাসিকের মতে, "খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অধিক হওয়ায় দরকার হলে পরিবর্তনশীল চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যশস্য উৎপাদন থেকে নগদ মূল্যের ফসল উৎপাদনের জন্য পরিবর্তিত ব্যবস্থা করতে খুব বেশি অসুবিধা হতো না।"[৮২]

১৭৫০-এর দশকের প্রথমদিক থেকে অবশ্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর রপ্তানিপণ্যের মধ্যে বিশেষ একটির লক্ষণীয় মূল্যবৃদ্ধি দেখা যায়। সেটি হলো বেশ মোটা ধরনের সুতী কাপড়। নিচের সারণি থেকে বোঝা যাবে যে, ১৭৪১ থেকে ১৭৫১ সালের মধ্যে এই ধরনের কাপড়ের চুক্তিমূল্যে লক্ষণীয় রকমের বৃদ্ধি ঘটেছে।

১৭৪১ সালের তুলনায় ১৭৫১ সালে বেশ মোটা ধরনের কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারটা সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। এই ধরনের কাপড় বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি তৈরি হতো এবং ঐসব অঞ্চলেই মারাঠা উপদ্রব সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছিল। তার ফলেই এসব মোটা কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখানে একটি ব্যাপার মনে রাখা দরকার, ১৭৪০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই দাদনি বণিকরা এসব মোটা কাপড় সরবরাহের জন্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে একেবারেই অনিচ্ছুক ছিল। অথচ ভাল মিহি কাপড় সরবরাহের জন্য চুক্তি করতে তারা খুবই আগ্রহী ছিল। তাই কোম্পানিগুলোকে প্রায়ই অনিচ্ছুক বণিকদের উপর মোটা কাপড় সরবরাহের চুক্তি চাপিয়ে দিতে হতো। বণিকদের অনাগ্রহের কারণ, প্রধানত এসব কাপড়ে লাভের পরিমাণ বেশি থাকতো না, অথচ মারাঠা উপদ্রুত অঞ্চলে এগুলি তৈরি হতো বলে এগুলি সংগ্রহ করতে অনেক ঝামেলা হতো এবং অনেক সময় তাঁতীরা আগাম নিয়েও মারাঠাদের ভয়ে পালিয়ে যেতো বলে বণিকদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতো।

---

৮১. Om Prakash, *Dutch East India Company*, 238, 250-51.

৮২. ঐ, 238

সারণি ৮ : বেশ মোটা ধরনের কাপড়ের দাম, ১৭৪১ ও ১৭৫১

১৭৪১ সালে বণিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ মূল্য					১৭৫১ সালে বণিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ মূল্য				
কাপড়ের সংখ্যা	কাপড়ের নাম	দৈর্ঘ্য ভ প্রস্থ	প্রতিটির দাম	মোট দাম	কাপড়ের সংখ্যা	কাপড়ের নাম	দৈর্ঘ্য ভ প্রস্থ	প্রতিটির দাম	মোট দাম
৬০,০০০	গিনি কাপড়	৭৫ কোঃ ভ ২$\frac{১}{৪}$ কোঃ	১২৯ টাঃ ৮ আঃ টাঃ	৩৬৪,৫০০	২০,০০০	গিনি কাপড়	৭৫ কোঃ ভ ২$\frac{১}{৪}$ কোঃ	১৭৫ টাঃ	টাঃ ১৭৫,০০০
-	-	-	-	-	২৫,০০০	গারা	৩৬ " ভ ২$\frac{১}{৪}$ "	৮৪ "	" ১০৫,০০০
৮০,০০০	গারা	৩০ " ভ ২$\frac{১}{৪}$ "	৪৮ " - " "	১৯৪,০০০	১২,০০০	"	৩০ " ভ ২$\frac{১}{৪}$ "	৭০ "	" ৪২,০০০
-	-	-	-	-	৫,০০০	" বুরাং	৩৬ " ভ ২$\frac{১}{৪}$ "	৫০ "	" ২৫,০০০
-	-	-	-	-	৬,০০০	"	২৪ " ভ ২$\frac{১}{৪}$ "	৭০ "	" ৪৬,৮০০
৫০,০০০	সালামপুরী	৩৭$\frac{১}{২}$ ভ ২$\frac{১}{৪}$ "	৬০ " ১২ " "	১৫১,৮৭৫	১০,০০০	সালামপুরী	৩৭$\frac{১}{২}$ " ভ ২$\frac{১}{৪}$ "	৮৭ " ৮আঃ	" ৪৩,৭৫০
১০,০০০	ডংগিরি	২৭ " ভ $\frac{১৩}{৪}$ "	৩১ " -	১৫,৫০০	১০,০০০	ডংগিরি	২৭ " ভ $\frac{১৩}{৪}$ "	৫০ " ॥	" ২৫,০০০

সূত্র : ১৭৪১ সালের জন্য ঃ V.O.C 2537 (K.A.2429), ff. 1427-1428, হুগলী থেকে বাটাভিয়া, ২৬ নভেম্বর ১৭৪১; ১৭৫১ সালের জন্য, V.O.C. 2783 (K.A. 2675), ff. 82-84, pt. I, হুগলী থেকে বাটাভিয়া, ২১ ডিসেম্বর ১৭৫১।

আবওয়াব ও অন্যান্য কর চাপানোর ব্যাপারটিকেও অত্যধিক গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন নেই। মুর্শিদকুলী খান প্রথমে আবওয়াব প্রচলন করেন, পরে অবশ্য শুজাউদ্দিন ও আলিবর্দী খানও তা অনুসরণ করেন। সন্দেহ নেই যে, এতে একটি বিপজ্জনক রীতি তৈরি হলো। এই কর দিতে হতো জমিদারদের, তবে তারা রায়তদের কাছ থেকে এটা আদায় করার অনুমতি পেয়েছিল। স্যার জন শোর মনে করেন, অতিরিক্ত এই কর আদায় করাতে কৃষকরা খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। তাঁর মতে, বাণিজ্যের উন্নতি ও সোনা-রূপার আমদানি বৃদ্ধিতে "এ যুগে দেশের আর্থিক অবস্থা এই অতিরিক্ত করের বোঝা সহজেই বহন করতে পেরেছিল।"[৮৩] অবশ্য শোরের বক্তব্য নেহাৎই ব্যক্তিগত অভিমত, তার পিছনে পরিসংখ্যানমূলক কোন ভিত্তি নেই। তবে শুজাউদ্দিন বা আলিবর্দীর শাসনকালে ব্যাপকভাবে আবওয়াব আদায় করা সত্ত্বেও[৮৪] তেমন লক্ষণীয় মূল্যবৃদ্ধি না হওয়ায় এটা বোঝা যাচ্ছে যে, আবওয়াব বা অন্যান্য কর চাপানোর প্রতিক্রিয়া তেমন কিছু হয় নি। আমরা আগেই দেখেছি, শুজাউদ্দিনের শাসনকাল খাদ্যদ্রব্যের সুলভ মূল্যের জন্য কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল এবং আলিবর্দীর শাসনের শেষদিক "অবিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির" কাল বলে চিহ্নিত হয়েছিল।[৮৫] বন্যা, দুর্ভিক্ষ, খরা জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মূল্যবৃদ্ধির ঘটনাও ছিল সাময়িক এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং এসবের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন নেই।

গ. *মজুরি*

নবাবি আমলে বাংলায় জিনিসপত্রের দাম যেমন কম ছিল তেমনি মজুরির পরিমাণও ছিল কম। ১৭৩৬ সালের ২৮ আগস্ট ঢাকার একটি চিঠিতে জানা যায়, "যেসব লোক তাঁতীদের কাজে সাহায্য করতো" তারা মজুরি বাবদ দিনে তাদের খোরাকি চাল ও এক পণ কড়ি" পেতো।[৮৬] টেইলরের মতে, আঠারো শতকের মধ্যভাগে ঢাকায় তাঁতীদের মজুরি ছিল মাসে ১ থেকে ১.৫ আর্কট টাকা এবং তাদের সহকারী পেতো ৮ আনা থেকে ১২ আনা।[৮৭] তিনি আরো জানান, যে প্রধান তাঁতী সুতা কেনে, যে তাঁতী কাপড় বোনে ও যে সহকারী তাঁতীকে কাপড় বোনার কাজে সাহায্য করে—এই তিনজন মলবুসখাসে একসঙ্গে ছ'মাস কাজ করে মোট ৪৭ টাকার মতো উপার্জন করতো।[৮৮] ঢাকায় সুতাকাটা কারিগরদের (spinners) মধ্যে (বেশির ভাগই মহিলা) যারা সবচেয়ে ভাল, তারা রোজ গড়ে তিন ঘণ্টা কাজ করে মাসে ১২ আনা থেকে ১৪ আনা রোজগার করতো।[৮৯] ১৭৫০-

৮৩ W. K Firminger, *Fifth Report*, Vol II, 120.
৮৪. বিস্তারিত, ঐ।
৮৫. J C Sinha, *Economic Annals of Bengal*, 19
৮৬. B P. C. Vol. II, ff. 288 vo-289, 28 August 1736
৮৭. Home Misc 456 F, f 205
৮৮. ঐ, f 145.
৮৯. ঐ, f. 129. টেইলর জানাচ্ছেন যে, একজন মহিলা মাসে এক সিকি সিক্কা ওজন পরিমাণ সুতা কাটতে পারতো এবং এ সুতার দাম ছিল প্রতি সিক্কা ওজন তিন থেকে সাড়ে তিন টাকা।

এর দশকে কলকাতায় সাধারণ শ্রমিকদের মজুরি সামান্য বেড়েছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল ১৭৫১ সালের মার্চ মাসে কুলিদের মজুরি বাড়িয়ে দিনে ২ পণ কড়ি করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ বছরেই নভেম্বরে চালের দাম বাড়ার জন্য এই মজুরি বেড়ে হয় দিনে ২ পণ ১০ গণ্ডা। পরের বছর জানুয়ারিতে মজুরি বেড়ে দাঁড়ায় দিনে ২ পণ ১২ গণ্ডা কড়ি।[৯০] কলকাতার মেয়রকোর্টের ১৭৫২ সালের নভেম্বর থেকে ১৭৫৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত খরচের হিসাবে দেখা যায়, পিওনের বেতন মাসে ২ টাকা ৪ আনা, দেশী সার্জেন্টের বেতন মাসে ২ টাকা ৪ আনা এবং ইউরোপীয় সার্জেন্টের বেতন মাসে ১০ টাকা। ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল কলকাতায় ১৭৫৭ সালের আগে ও ১৭৫৭ সালে বিভিন্ন মজুরির হারের একটি তালিকা তৈরি করে। সেটি নিচে দেয়া হলো :

সারণি ৯ : কলকাতায় মজুরির হার, ১৭৫৭ সালের আগে ও ১৭৫৭ সালে

	১৭৫৭ সালের আগে					জানুয়ারি ১৭৫৭				
ইটমিস্ত্রি	৩	পণ	১০	গণ্ডা	কড়ি	৪	পণ	০	গণ্ডা	কড়ি
কুলি	২	"	১০	"	"	৪	"	০	"	"
ছোট ছেলে	১	"	১৫	"	"	২	"	৫	"	"
স্ত্রীলোক	১	"	১৫	"	"	২	"	-	"	"
ছুতোর	৩	"	-	"	"	৩	"	১০	"	"
ছুতোর (খুব ভাল)	৪	"	-	"	"	৪	"	১০	"	"
ছুতোরের সর্দার	৭	"	-	"	"	৮	"	-	"	"
রংমিস্ত্রি	৩	"	-	"	"	৪	"	-	"	"

সূত্র : B. P. C., Range 1, Vol. 29, f. 26, Annex to Consults, 13 January 1757.

সুতরাং নবাবি আমলে বাংলায় সাধারণ মানুষের আয় যে খুবই কম ছিল তা সুস্পষ্ট। কিন্তু এ অল্প আয়েও সে বেশ স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারতো। টাকার ক্রয়ক্ষমতা এত বেশি ছিল যে মাসে কয়েক আনা খরচ করে একজন লোক প্রচুর খেতে পারতো। কোম্পানির আমল, আঠারো শতকের শেষদিক ও উনিশ শতকের প্রথমদিকের তুলনায় একজন সাধারণ মানুষ নবাবি আমলের বাংলায় অনেক বেশি খেতে পেতো এবং তার আর্থিক অবস্থাও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে অনেক বেশি ভাল ছিল।

৯০. B. P. C., Vol. 24, f 38, 22 March 1751; f 374, 15 November, 1751; Coast & Bay Abstracts, Vol. 5, f. 325, para 63, 2 January 1753,

সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা : কোম্পানি আমল

পিটার জে. মার্শাল*

নবাবি আমলে বাংলার সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সুশীল চৌধুরী যে উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেছেন, কোম্পানি আমলে তা অতিশয় ম্লান দেখতে পাই। বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে এখানে ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীর আনাগোনা হ্রাস পেয়েছে, বলা যায় প্রায় থেমে গেছে। ১৮১৩ সালের পর ভারত অবাধ বাণিজ্যজগতে প্রবেশ করেছে বটে, কিন্তু প্রায় অর্ধ শতকের বানিয়া সরকারের দুঃশাসন এবং বৃটিশ শিল্পবিপ্লবের ফলে বিশ্ববাজারে বাংলার বাণিজ্যিক অবস্থান পুরোপুরি পাল্টে যায়। বাংলার অর্থনীতিতে তখন যুগান্তর সাধিত হচ্ছে, দেশের অর্থনীতিতে তখন রপ্তানিকারক থেকে আমদানিকারকে রূপান্তরিত হবার প্রক্রিয়া চলছে। কোম্পানি-যুগ শেষ হবার বেশ আগেই এদেশ বৃটিশ শিল্পপণ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, রপ্তানির মধ্যে থাকে শুধু কিছু কৃষি-কাঁচামাল। এহেন পরিবর্তনের জন্য কারা দায়ী বা কিভাবে এই কালান্তর ঘটলো এ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা যায় এবং হয়েছেও। তবে বর্তমান অনুচ্ছেদে আমাদের আলোচনা শুধু সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

১৭৬৫ সালে কোম্পানির 'দীউয়ানি' প্রাপ্তির সময়ে বাংলার বেশিরভাগ মানুষ বাস করতো গ্রামাঞ্চলে এবং তারা নির্ভরশীল ছিল কৃষির উপর। কোন কোন এলাকা ছিল ঘনবসতিপূর্ণ, কিন্তু সমসাময়িক পর্যটকগণ বেশ কিছু অনাবাদি ভূমিও লক্ষ্য করেছেন। বিভিন্ন রকমের ধান ছিল প্রধান শস্য। অবশ্য প্রায় সব কৃষকই তৈলবীজ, কলাই ইত্যাদি কিছু সবজি ফলানোর চেষ্টা করতো। অনাবাদি ভূমিতে বিচরণ করতো গবাদি পশু। এমনকি একজন ক্ষুদ্র কৃষকও তার উৎপাদিত পণ্যের কিছু অংশ বিক্রি করে সরকারের খাজনা পরিশোধ করতে পারতো। অপরদিকে আখ, তুলা অথবা তামাকের মতো অর্থকরী

রোডস প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, কিংস কলেজ, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়।

ফসলেরও বেশ আবাদ হতো। গ্রামে বাস করতো কারিগর, যারা তৈরি করতো কাপড়, ধাতব পণ্য এবং মাটির পাত্র। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে বাস করতো এমন কিছু কারিগর, যারা রপ্তানির জন্য বয়ন করতো উন্নতমানের সুতী ও রেশমি কাপড়। আঠারো শতকের মাঝামাঝি বাংলার নগরগুলো ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য বা প্রশাসনের কেন্দ্র তথা পীঠস্থান। এই নগরগুলো গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল ঘনিষ্ঠভাবে, এমনকি বিশেষ অর্থে বলতে গেলে উভয়ের অস্তিত্ব ছিল পরস্পর নির্ভরশীল। নগরে বাস করতো অধিক সংখ্যক কারিগর, যাদের পাশে অবস্থান ছিল ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কারের। গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত এদের প্রভাব ছিল বিস্তৃত। বাংলার কৃষি ও অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন অনেকাংশে নির্ভর করতো মহাজন ও ব্যবসায়ীর ঋণের উপর। এই ব্যবসায়ীরা বাংলার অভ্যন্তরীণ রপ্তানিবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো। এদের মাধ্যমে বাংলার পণ্য ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে, পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপে চলে যেতো।

মধ্য আঠারো শতকে বাংলায় জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে গণদারিদ্র্যই ছিল এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সন্দেহ নেই যে, এমন ধারণার মূল কারণ ছিল সংস্কৃতিগত ব্যবধান। তবুও তথ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করে বলা যায়, বাংলার অধিকাংশ মানুষের জন্য জীবনধারণের উপকরণ পর্যাপ্ত ছিল না। শস্যের ফলন ভাল না হলে তাদের অবস্থা হতো শোচনীয়। সামাজিক স্তরবিন্যাস ছিল প্রকট। জমির সঙ্গে সংযোগ ছিলনা এমন মানুষের সংখ্যা ছিল নগণ্য। প্রচুর জমি অনাবাদি থাকলেও অনেক কৃষকের জমির পরিমাণ এমন ছিল যা দিয়ে তাদের পরিবারের ভরণপোষণ হতো না। ফলে কৃষকেরা অপরের জমিতে শ্রমিক বা ভাগচাষী হিসেবে কাজ করতো, অথবা বিভিন্ন খণ্ডকালীন কাজ খুঁজতো। কৃষিশ্রমিকের চাহিদা থেকে অনুমান করা যায় যে, এমন জমিও ছিল যা একটি পরিবারের পক্ষে চাষ করা সম্ভব ছিল না। এমন জমির অধিকারী ছিল জমিদার বা বড় জোতদার। কৃষক ও কারিগরের শ্রমের উপর নির্ভর করতো ব্যবসায়ী সমাজ। সমাজের সচ্ছল মানুষদের অধিকাংশের আয়ের উৎস ছিল রাজস্ব। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে এমনি সচ্ছল শ্রেণীর মানুষ ছিল জমিদার।

আঠারো শতকের বাংলার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ মধ্য-উনিশ শতকের বাংলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাংলার অর্থনীতি একশ' বছর পরেও প্রধানত কৃষিনির্ভর ছিল এবং মানুষ সনাতন পদ্ধতিতেই ধানের চাষ করতো। কিন্তু জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং প্রচুর জমি আবাদযোগ্য করে তোলা হয়। বিশেষকরে অর্থকরী ফসল উৎপাদনে আবাদি জমির পরিমাণ বেড়ে যায়। তবে অর্থকরী ফসলের মধ্যে প্রধান ছিল নীল এবং বাংলার অর্থনীতিতে পরবর্তীকালের গুরুত্বপূর্ণ ফসল পাট। গ্রামাঞ্চলের কারিগররা তাদের সনাতন

পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করতো। কিন্তু তারা বিভিন্ন আমদানিপণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। উন্নত মানের বস্ত্রবয়নকারী সম্প্রদায় বিদেশী ও স্বদেশী বাজার হারিয়ে দুর্দশায় পড়ে। অবশ্য তখনো নতুন প্রযুক্তি ও নতুন উৎপাদনপ্রক্রিয়ার প্রয়োগ তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। বাংলার যাতায়াতব্যবস্থা তখনো প্রধানত নির্ভরশীল ছিল মানুষের শ্রম ও পাল দ্বারা চালিত নৌকার উপর। কলকাতা বিশাল নগরী হিসেবে গড়ে উঠেছিল; কিন্তু বাংলার অন্যান্য স্থানে নগরায়ণ-প্রক্রিয়া লক্ষণীয় ছিল না। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি পায় এবং বাংলার আদি বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হয় বিদেশী, বিশেষকরে ইংরেজ বণিক।

আপামর জনগণের জীবনযাত্রার মান ১৭৬৫ সালে যা ছিল, তার তুলনায় এই সময়ে মৌলিক কোন পরিবর্তন সম্ভবত আসে নি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, জনজীবনে ভাল বা মন্দ কোন পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে নি। বিশেষকরে বেকার তাঁতী ছিল একটি অশুভ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত। জমির উপর জনসংখ্যার যে চাপ পরিলক্ষিত হয়েছিল, তার ফলে কৃষকের মাথাপিছু জমির পরিমাণ বাড়ে নি, বরং কমে গিয়েছিল বলা যায়। কৃষিপণ্যের বর্ধিত বাণিজ্যের কারণে লাভ হয়েছিল শুধুমাত্র কতিপয় অবস্থাপন্ন কৃষকের। কৃষিশ্রমিকের বর্ধিত চাহিদার ফলে কিছু সুবিধা ভোগ করেছিল দরিদ্র মানুষ। রাজস্বভিত্তিক আয় তখনো বিত্তবান সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি হিসেবে বিদ্যমান ছিল। তবে রাজস্বব্যবস্থায় প্রবর্তিত পরিবর্তনের মাধ্যমে এই সম্প্রদায়ের আয়ের তারতম্য হয়েছে, অবশ্য অন্যদিকে জনগণের উপর করের বোঝা বেড়েছে। একই সঙ্গে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আয়েরও তারতম্য হয়েছে এবং লাভবান হয়েছে ইংরেজ ব্যবসায়ী এবং তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগীবৃন্দ। নবাবি আমলে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে কিছু পেশাজীবীর জীবিকানির্বাহের সুযোগ ছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে এমন সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পায়।

বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের এই পর্যায়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয় প্রধানত ইংরেজ শাসনের প্রভাব বিশ্লেষণের উপর। কিন্তু যাবতীয় পরিবর্তনের দায়ভার ইংরেজ বিজয়ের উপর চাপিয়ে দেয়ার ফলে বাংলার অর্থনীতিতে আবহাওয়ার তারতম্য বা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের মতো মৌলিক কারণগুলোর প্রভাব উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু তবুও এটা অনস্বীকার্য যে, বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত অর্থনীতির দেশ থেকে আগত বণিক সম্প্রদায়ের শাসনাধীনে বাংলার অর্থনীতিতে পরিবর্তন সূচিত হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কাজেই ১৭৬৫ থেকে ১৮৫৮-এর মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার অর্থনীতি মূল্যায়ন করতে গেলে প্রাথমিক প্রয়োজন হলো এই প্রদেশে ইংরেজ শাসনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ।

আলোচ্য সময়ে বাংলায় শাসন পরিচালিত হয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে। ১৮১৩ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড-বাংলা বাণিজ্যে এই কোম্পানির ছিল একচেটিয়া অধিকার।

১৮৩৩ সাল পর্যন্ত কোম্পানি এই বাণিজ্যের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো। ১৮১৩ সাল থেকে ব্যক্তিমালিকানাধীন ইংরেজ প্রতিষ্ঠানগুলো শেকড় গেড়ে বসে বাংলার বাণিজ্য-অঙ্গনে। কিন্তু এর আগেও কোম্পানির পাশাপাশি এমনি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। এরা ছিল ইংরেজ ব্যবসায়ী এবং কলকাতাভিত্তিক যৌথ কারবারি, যাদেরকে বলা হতো 'হাউজেস অব এজেন্সি'।

কাজেই বাংলায় ইংরেজদের অবস্থান ছিল শাসক ও ব্যবসায়ী হিসেবে। যেহেতু শাসকবর্গ ছিল একটি বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের অংশ, সেহেতু ধারণা করা সঙ্গত হবে যে, বাণিজ্যের স্বার্থেই শাসন পরিচালিত হতো। বস্তুত, অতি সরলীকরণের ঝুঁকি নিয়েও যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, উল্টোটি ছিল সত্য। সর্বশেষ পন্থা হিসেবে সাধারণত শাসনের চেয়ে লাভজনকভাবে ব্যবসা পরিচালনাকেই অগ্রাধিকার দেয়া হতো। কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা এবং এর জন্য প্রয়োজন হতো একটি বিশাল সেনাবাহিনীর, যাদের বেতন আসতো ভূমিরাজস্ব থেকে। কোম্পানির স্বার্থে যারা নীতি নির্ধারণ করতো তাদের কাছে বাণিজ্যের চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছিল প্রতিরক্ষা ও রাজস্ব আদায়। সত্যি কথা বলতে কি, আর্থিক কারণে বাণিজ্য হতো। যেমন লবণ ও আফিমের একচেটিয়া ব্যবসার সূত্রে ভারত থেকে সরাসরি বা চীনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে সম্পদ পাচার হতো। রাজস্বস্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণে বাংলার অর্থনীতিতে কোম্পানির প্রভাব ব্যাপক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কারণ, কোম্পানি রাজস্ব সংগ্রহ করে যে সম্পদ আহরণ করতো তার বেশ কিছু অংশ আবার বাংলার প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনে ব্যয়ের মাধ্যমে পুনর্বন্টিত হতো। উপরন্তু ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থে বাংলার অর্থনীতিকে প্রয়োজনীয়ভাবে বিন্যস্ত করার প্রয়াস তো ছিলই। কিন্তু ঠিক এ কারণেই সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং কোম্পানি তার একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার হারিয়েছিল। সুদূরপ্রসারী ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলার অর্থনীতিতে এমনি বাণিজ্যের ভূমিকা গতিশীল হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত সময়ে বাস্তবে এমনটি ঘটেছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।'এজেন্সি হাউজ' এবং অন্যান্য ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানগুলোর এমন পুঁজি ও প্রযুক্তি ছিল না, যা দিয়ে তারা মৌল কিছু পরিবর্তনের সূচনা করতে পারতো। অবশ্য বাণিজ্যজাহাজের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা প্রধানত কৃষক-উৎপাদিত কিছু অর্থকরী ফসল নিয়েই ব্যবসা করতো। কিন্তু বাংলার বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকায় চা উৎপাদন শুরু না হওয়া পর্যন্ত ইউরোপীয় সম্প্রদায় কৃষিভিত্তিক উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত হয় নি। ১৮৫০-এর দশকে ইংরেজ পুঁজি ও প্রযুক্তির অধিক পরিমাণ বিনিয়োগ শুরু হয়।

ইংল্যান্ডপ্রভাবিত বিশ্বঅর্থনীতির পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সম্পৃক্ত হওয়ার গতি নিয়ে ঐতিহাসিকগণ যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে মন্তব্য করলেও এই প্রক্রিয়া যে চলছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি এর প্রমাণ। এ তথ্যাদি অবশ্য বিশেষ সতর্কতার সাথে ব্যাখ্যা করতে হবে। বাংলাদেশের উপর একটি বইয়ের একজন পাঠককে স্মরণ রাখতে হবে যে, সরকারি আমদানি-রপ্তানি হিসেবে যেসব পণ্যদ্রব্যের কথা উল্লেখিত হয়েছিল তা কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি করা হয়েছিল এবং শুধু বাংলাদেশ নয়, বরং অন্যান্য অঞ্চল থেকেও সেগুলো আহরিত হয়েছিল। এমনকি ১৭৬০-এর দশকেও কলকাতা বিহারের কাপড় ও আফিম রপ্তানি করেছিল। ১৭৯০-এর দশক থেকে কলকাতা পূর্ব ও মধ্য ভারতের পণ্যের রপ্তানিবন্দর হয়ে উঠে। কাজেই প্রকৃত অর্থে কলকাতা বন্দরের বাণিজ্যের বিবরণ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের বাণিজ্যের পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব নয়।

কিন্তু তবুও কলকাতা বন্দরের পরিসংখ্যান থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবাহ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সতেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশ চিনি, শস্য এবং কাপড়ের প্রধান রপ্তানিকারক হয়ে উঠেছিল। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কারণ সেসময় থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বর্ধিত হারে রেশমি ও অন্যান্য পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে বৃটেনে তাদের আয় পাচার করছিল। ফলে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে রপ্তানিকৃত কোম্পানির মালামালের খরচ ১৭৬০-এর দশকে ৫০ লক্ষ থেকে ১৭৯০-এর দশকে এক কোটি টাকায় দাঁড়ায়।[১] এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বেসরকারি ইংরেজ প্রতিষ্ঠান চীনসহ এশিয়ার বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে তাদের বাণিজ্যের পরিধি সম্প্রসারণ করেছিল। এ পর্যায়ে চা পরিবহন সংক্রান্ত ব্যবসার অর্থ যোগানো হতো বাংলাদেশের পণ্যরপ্তানি থেকে অর্জিত অর্থ হতে। ফলে এ সময়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও আমেরিকার অনেক সমুদ্র পরিবহন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ১৭৯৭-৯৮ থেকে ১৮০১-২ পর্যন্ত সময়ে কোম্পানিবহির্ভূত রপ্তানি থেকে আয়ের পরিমাণ গড়ে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ছিল।[২] কাপড় রপ্তানি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানির তালিকায় পরিবর্তন ঘটলেও বাংলাদেশের শস্য, চিনি, নীল ও রেশমজাত কাঁচামাল এবং দূরান্তরের তুলা ও আফিম রপ্তানি যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নিচের সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় :

---

১. K N. Chaudhuri, " Foreign Trade and Balance of Payments (1757-1947)". *Cambridge Economic History of India,* II, c 1757-1970, (ed), D Kumar (Cambridge 1983), 819; A S. Tripathi, *Trade and Finance in the Bengal Presidency* 1793-1833, 2nd edn., (Calcutta 1979), 4.

২. Chaudhuri, "Foreign Trade", *Cambrige Economic History,* II, 820.

কলকাতা থেকে রপ্তানি : পাঁচ বছরের গড় হিসাব[৩]

১৮০৮-৯	থেকে	১৮১২-১৩	টাকা	৩	কোটি	২০	লক্ষ
১৮১৩-১৪	"	১৮১৭-১৮	"	৪	"	৪৯	"
১৮১৮-১৯	"	১৮২২-২৩	"	৫	"	১০	"
১৮২৩-২৪	"	১৮২৭-২৮	"	৫	"	০৬	"
১৮২৮-২৯	"	১৮৩২-৩৩	"	৩	"	৫৯	"
১৮৩৩-৩৪	"	১৮৩৭-৩৮	"	৫	"	২৪	"
১৮৩৮-৩৯	"	১৮৪২-৪৩	"	৭	"	১৫	"
১৮৪৩-৪৪	"	১৮৪৭-৪৮	"	৮	"	৪৯	"
১৮৪৮-৪৯	"	১৮৫২-৫৩	"	১০	"	৪০	"
১৮৫৩-৫৪	"	১৮৫৬-৫৭	"	১০	"	৬৬	"

উপরের সারণিতে দেখা যায় যে, কলকাতা বন্দরের রপ্তানির পরিমাণ সমানভাবে বৃদ্ধি পায় নি। ১৮১৩ সালে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বিলুপ্ত হয়। এরপর থেকে ক্রমশ রপ্তানিবাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। তবে ১৮২০-এর দশকের শেষদিক এবং ১৮৩০-এর দশকের প্রথমদিকে ইউরোপে মন্দার কারণে ভারতীয় রপ্তানি হ্রাস পেয়েছিল।

কলকাতায় আমদানি : পাঁচ বছরের গড় হিসাব[৪]

১৮১৩-১৪	থেকে	১৮১৭-১৮	টাকা	১	কোটি	৪৭	লক্ষ
১৮১৮-১৯	,,	১৮২২-২৩	,,	২	,,	৪৪	,,
১৮২৩-২৪	,,	১৮২৭-২৮	,,	২	,,	৫২	,,
১৮২৮-২৯	,,	১৮৩২-৩৩	,,	২	,,	৪৬	,,
১৮৩৩-৩৪	,,	১৮৩৭-৩৮	,,	২	,,	৫৬	,,
১৮৩৮-৩৯	,,	১৮৪২-৪৩	,,	৩	,,	৯৬	,,
১৮৪৩-৪৪	,,	১৮৪৭-৪৮	,,	৪	,,	৯১	,,
১৮৪৮-৪৯	,,	১৮৫২-৫৩	,,	৫	,,	৪৪	,,
১৮৫৩-৫৪	,,	১৮৫৬-৫৭	,,	৬	,,	৭১	,,

---

৩. India Office Records, *Bengal Commercial Reports,* 174, 24; *Parliamentary Papers,* 1852-3, XXVIII, 331; 1857-8, XLII, 144-5.৪.

৪. *Parliamentary Papers,* 1852-3, XXVIII, 331; 1857-8, XLII, 144-5.

আঠারো শতকের বেশিরভাগ সময়ে বাংলাদেশে পণ্য আমদানির পরিমাণ রপ্তানির চেয়ে কম ছিল। ১৭৯৩ থেকে ১৮১২-এর মধ্যে এই পরিমাণ ছিল মাত্র এক-তৃতীয়াংশ।[৫] ১৮১৩-এর পরবর্তী সময়ে এই পরিমাণ বেশ বাড়লেও ১৮৪০-এর দশকের আগে শতকরা পঞ্চাশ ভাগের উপর যায় নি। নিচের সারণিতে দেখা যায় যে, কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের সমাপ্তির পর প্রধানত বৃটিশ পণ্যের আমদানি বেড়ে যায়, যা অবশ্য বেশিদিন বজায় থাকে নি। ১৮১৭ সাল থেকে ১৮১৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধির পর ১৮৪০-এর দশকের আগে আর কোন লক্ষণীয় পরিমাণ আমদানি বৃদ্ধি পায় নি। বাংলার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার এই যে, ভারতে বৃটিশ বস্ত্রপণ্যের আমদানি ১৮১৪ সালে শতকরা ৬ থেকে ১৮১৮ সালে ২০, ১৮২৮ সালে ৫০ এবং ১৮৩৮ সালে ৬৩ ভাগে উন্নীত হয়।[৬] কোম্পানিশাসনের শুরুতে তো বটেই, এমনকি উনিশ শতকের শেষেও আদমশুমারিতে জনসংখ্যার হিসাব অনুমাননির্ভর হতে বাধ্য। তবে ইউরোপীয়দের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তা হলো, কোম্পানিশাসনের শেষপ্রান্তে জনসংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। ১৭৭২ সালে জেমস রেনেল লিখেছিলেন :

> বাংলা প্রদেশে যথেষ্ট সংখ্যক বসতি ছিল না। যদিও দেশটি ইংল্যান্ডের চেয়ে তিনগুণ বড় ছিল, তবুও আমাদের মনে হয় , সেখানে ততো বেশি মানুষ ছিল না। বিশ্বের সবচেয়ে উর্বর ভূখণ্ড সবটাই অনাবাদি পড়ে আছে চাষ করার মানুষের অভাবে।[৭]

১৮২৮ সালে প্রকাশিত একটি গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয় যে, "এক থেকে পাঁচশ' লোক অধ্যুষিত গ্রামের সংখ্যা বহু। দেশের কোন কোন অংশে নদীর কূল ধরে মাইলের পর মাইল একটানা গ্রাম রয়েছে"।[৮] উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলার গ্রামীণ অবস্থান এমন দাঁড়ায় যে, ইউরোপীয়দের নজরে বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের সেরা গ্রামবসতি এলাকা। আঠারো শতকের শেষভাগে বাংলা ও বিহারের লোকসংখ্যা বিশ থেকে ত্রিশ মিলিয়ন হবে বলে অনুমান করা হয়।[৯] উনিশ শতকের গোড়া থেকে লোকসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায় বলে মনে করার কারণ রয়েছে। ১৮৭২ সালের লোকগণনায় বিহার ছাড়া শুধু বাংলার লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬,৭৬৯,৭৩৫।[১০] এই বৃদ্ধির হার সব সময় সমান ছিল না। ১৭৬৯-৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তবে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, এর ফলে বাংলার লোকসংখ্যা দারুণভাবে কমে যায়। পূর্ব বাংলা অবশ্য

৫. Chaudhuri, "Foreign Trade".

৬. D. A. Farnie, *The English Cotton Industry and the World Marke.,* 1815-96 (Oxford 1979), 98, 116-17

৭. Letter to G. Burrington, 6 April 1772, India Office Records, *Home Miscellaneous,* 815

৮. W. Hamilton, *The East India Gazetteer,* (London 1828), I, 191.

৯. H. Beverley, *Report on the Census of Bengal of 1872,* (Calcutta 1872) , 81.

১০. ঐ, Appendix 1

দুর্ভিক্ষের ক্ষয়ক্ষতি থেকে অনেকাংশে রক্ষা পায়।[১১] ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, বাংলার পশ্চিমাংশে দুর্ভিক্ষ আসে খরার ফলে, আর পূর্বাংশে দুর্ভিক্ষ আসে বন্যার ফলে। বন্যার ফলে পূর্ব বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ১৭৮৩, ১৭৮৬ ও ১৭৮৭ সালে। ফলে দেশের জনসংখ্যা হ্রাস পায়। তবে এই প্রবণতা ১৭৯০ থেকে দূরীভূত হয়। বিশ শতকের মাঝামাঝি অব্দি বড় ধরনের কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না ঘটায় দেশ দুর্ভিক্ষ থেকে অনেকটা মুক্ত ছিল। এর প্রভাব পড়ে জনসংখ্যার উপর। মৃত্যুহারের চেয়ে জন্মহার বেড়ে যাওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[১২]

গ্রামীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানে জমির উপর চাপ বৃদ্ধি। জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পতিত জমির আবাদ শুরু হয়।[১৩] তবে গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেতিবাচক দিক হচ্ছে এই যে, এর ফলে কৃষিভূমি বিভক্তির হার বেড়ে যায়। কৃষিভূমি খণ্ডবিখণ্ড হবার প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয় পশ্চিম বাংলায়। পশ্চিম বাংলার কৃষি অর্থনীতি আরো দুর্বল হয়ে পড়ে গঙ্গার প্রবাহ পূর্ব দিকে মোড় নেবার ফলে। কৃষিজমির উর্বরতা ক্রমশ হ্রাস পায়, কেননা গঙ্গা পূর্বমুখী গতি গ্রহণের ফলে বিপুল এলাকা বর্ষার পানিবহির্ভূত হয়। কিন্তু বহু নদীবিধৌত পূর্ব বাংলায় জলসেচের সমস্যা তেমন ছিল না। পূর্ববঙ্গ ছিল হালকাবসতি এলাকা। বিপুল এলাকা ছিল অনাবাদি। এসব অনাবাদি এলাকায় নতুন বসতি স্থাপিত হয়। একদিন যে অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ ও জনহীন তা শ্যামল ধান্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। সুন্দরবন এলাকায় আবাদকর্মকাণ্ড ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ব্যাপক আবাদকর্মকাণ্ডের ফলে উর্বর পূর্ব বাংলা কৃষিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে, অপরদিকে গঙ্গার গতিধারা পরিবর্তনের ফলে একদা সমৃদ্ধ পশ্চিম বাংলার অর্থনীতি ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে।

পূর্ব বাংলায় ব্যাপক আবাদকাজ চললেও এর ফলে কৃষিপ্রযুক্তিতে কোন পরিবর্তন আসে নি। নতুন আবাদএলাকার কৃষিপদ্ধতি ছিল পুরাতন বসতির কৃষিপদ্ধতিরই সম্প্রসারণ। তখনো ধান ছিল সর্বপ্রধান শস্য। খাদ্যশস্যের মধ্যে একটি মাত্র নতুন সংযোজন দেখা যায়—সেটি হচ্ছে গোল আলু। বিদেশের চাহিদায় সাড়া দিয়ে বেশ কিছু বাণিজ্যিক ফসলের সম্প্রসারণ ঘটে। ইক্ষু এর অন্যতম। বিশ্বে চিনির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি পায়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল হচ্ছে কাঁচা রেশম। বৃটিশ কারখানাগুলির চাহিদা অনুসারে কোম্পানি বাংলাদেশে প্রচলিত রেশম চাষে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৮৩২ সাল পর্যন্ত কোম্পানি এ দেশে রেশমচাষের

১১. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রজত দত্তের প্রকাশিতব্য লেখা দ্রষ্টব্য।

১২. I. Klein, " Malaria and Mortality in Bengal 1840-1921", *Indian Economic and Social History Review*, IX (1972), 132-60.

১৩. W. B. Bayley, "Statistical View of the Population of Burdwan", Asiatic Researches, XII (1816), 551.

প্রভূত প্রসার ঘটায়। রেশমগুটি উৎপাদন ও রেশমবাণিজ্যকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড পরবর্তীকালে হ্রাস পায় এবং এর প্রতিক্রিয়া পড়ে রেশম উৎপাদনকারী ও রেশম কারিগর-সওদাগরদের উপর। এদের এক বিরাট অংশ বেকার হয়ে পড়ে। বৃটিশ শাসনের প্রাথমিক পর্বের একটি অভিনব কৃষি হচ্ছে নীলচাষ। ১৭৯০-এর দশক থেকে· বাণিজ্যিক হারে নীলচাষ ও নীল প্রক্রিয়াজাতকরণ শুরু হয় এবং তা তুঙ্গে উঠে ১৮৪০-এর দশকে। নীল উৎপাদন সর্বোচ্চ শিখরে উঠে ১৮৪৭ সালে। নীলকুঠি ও নীলকারখানার মালিক ছিল বেশিরভাগই ইউরোপীয়। দেশী জমিদার ছিল অনেক কুঠি-কারখানার মালিক। নীলচাষে লিপ্ত রায়তেরা কুঠি থেকে দাদন বা আগাম গ্রহণ করতো। একবার নীলঋণ গ্রহণ করলে কুঠির কবল থেকে রায়তের বেরিয়ে আসা ছিল কঠিন। নীলচাষীর অর্থনীতি ছিল খুবই নড়বড়ে।

বাংলাদেশে উৎপাদিত নীল ছিল বৃটিশ টেক্সটাইল শিল্পের জন্য একটি মৌলিক কাঁচামাল। কিন্তু স্বদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দায় পরিশোধের জন্য ভারত থেকে বৃটেনে অর্থ স্থানান্তরের উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজনে নীলের চাহিদাকে কৃত্রিমভাবে, হয়তো কিছুটা বিপজ্জনকভাবেও, বাড়িয়ে দেয়া হয়।[১৪] উনিশ শতকের মাঝামাঝি বিশেষকরে পূর্ববঙ্গে পাটচাষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৪০-এর দশকে কলকাতা বন্দর দিয়ে রপ্তানিও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।[১৫]

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের বাংলার কৃষিকে কোন কোন দিক থেকে 'ধনতান্ত্রিক' বলে আখ্যায়িত করা যায়। বাজারের জন্য কৃষকদের শস্য উৎপাদন শস্য-ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত ঋণের উপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল। ধনী প্রতিবেশীরাও তাদের ঋণ সরবরাহ করতো। আখ উৎপাদন নির্ভর করতো চিনিব্যবসায়ীদের প্রদত্ত ঋণের উপর। মালবেরী চাষের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আগাম প্রদান করতো। নীল কারখানা মালিকেরা নীল উৎপাদনের জন্য চাষীদের আগাম প্রদান করতো। এতদসত্ত্বেও অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের কৃষির অন্যান্য সাধারণ ধনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোনটাই ছিল না। ব্যতিক্রম দেখা যেতো শুধু ব্যাপক উৎপাদনের ক্ষেত্রে। ভূমির উপর পুঁজিপতিদের সরাসরি কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না, ভূমি ছিল কৃষকদেরই হাতে। পুঁজিপতিরা শ্রমিকও নিয়োগ করতো না। এমনকি যারা অন্যের জমিতে শ্রম দিত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের নিজেদেরও জমি ছিল। চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় ছাড়া নব্য প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করা হতো না। ইউরোপীয়রা পদ্ধতিগত ত্রুটিবিচ্যুতির ব্যাপারে অভিযোগ করতো এবং প্রায়ই বড় বড় আবাদক্ষেত্র তৈরির মাধ্যমে তাদের ভাষায় 'যথার্থ

---

১৪. B. B. Kling, *Blue Mutiny: The Indigo Disturbance in Bengal 1859-62* (Philadelphia 1966); B. B Chowdhury, *The Growth of Commercial Agriculture in Bengal* (1757-1900), 1, (Calcutta 1964).

১৫. H C. Kerr, *Report on the Cultivation of Jute in Bengal*, (Calcutta 1873)

অর্থে' ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যাপারে বক্তব্য রাখতো। কিন্তু এ ধরনের পরিবর্তনের জন্য অবস্থা আদৌ অনুকূল ছিল না। ভারতীয় অর্থবাজারের যেটুকু ইউরোপীয়দের আয়ত্তের মধ্যে ছিল, তা ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং তারা কৃষিতে বিপুল মূলধন খাটিয়েছিল বলে এই বাজার ছিল তাদের জন্য পরিবর্তনশীল। এর স্থান গ্রহণ করার জন্য বৃটেন থেকে তখনো যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন সরবরাহ হচ্ছিল না। ইউরোপে ভারতে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা তখনো ব্যয়বহুল উদ্ভাবনের জন্য লাভজনক পর্যায়ে পৌঁছে নি। এছাড়াও ভারতে উৎপাদিত পণ্য আমেরিকায় উৎপাদিত পণ্যের তুলনায় ইউরোপে কার্যকরভাবে প্রতিযোগিতা-মূলক হওয়ার জন্য পরিবহনখরচ তখনো যথেষ্ট পরিমাণে কমানো সম্ভব হয় নি। সেজন্য বাংলাদেশে উৎপাদিত বিক্রয়যোগ্য কৃষিপণ্য ছিল ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণের বাইরে দেশীয় ব্যবসায়ীদের হাতে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বাস্তবসম্মতভাবে তারা সরাসরি ভূমি ও শ্রম নিয়ন্ত্রণে তাদের সম্পদ ব্যবহারে অগ্রাধিকার না দিয়ে ঋণদানে আগ্রহী ছিল। এর ফলে উৎপাদন সম্পর্কিত ঝুঁকি বর্তাতো উৎপাদকদের উপর। এজন্য দেখা যায় যে, ১৭৬৫ সালের তুলনায় ১৮৫৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশের কৃষি ছিল অনেক বেশি বাণিজ্যভিত্তিক, কারণ এ সময়ে অনেক বেশি পরিমাণ কৃষিপণ্যের বেচাকেনা হয়। কিন্তু উৎপাদনের সম্প্রসারণ অন্য তেমন কোন পরিবর্তনের সূচনা করে নি। এমনকি ১৭৬৫ সালেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কৃষিকে ভরণপোষণক্ষম বলে আখ্যায়িত করা যায় না এবং বাজারজাতকরণের জন্য বর্ধিত উৎপাদন অর্জন করা হয় নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ব্যতিরেকেই বা মূলধন, ভূমি এবং শ্রমের মধ্যে নতুন কোন সম্পর্ক সৃষ্টি না করেই।[১৬]

এরকম মনে করার কোন কারণ নেই যে, বাংলাদেশে কারুশিল্পেও কৃষি উৎপাদনের তুল্য ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছিল। অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে বরং এর উল্লেখযোগ্য সংকোচন হয়েছিল। প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবর্তন হয়েছিল সামান্যই। রেশম পাকানোতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিছু নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের সূচনা করেছিল। বাঙালিদের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে সুতা পাকানোর কৌশল শেখানো হয়েছিল। এ পদ্ধতিতে নিজের বাড়িতে কাজ না করে তারা বড় বড় ইউনিটে কাজ করতো। নিজস্ব উদ্যোগে কেউ কেউ প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের কয়লা এবং অন্যান্য খনিজ-দ্রব্যের উত্তোলন ও ব্যবহার শুরু করেছিল। ১৯২০-এর দশকে কলকাতায় এবং তার আশেপাশের নদীতে চলাচলকারী নৌকা-জাহাজে এবং কলকারখানায় বাষ্পশক্তির ব্যবহার শুরু হয়। একটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত হলো কলকাতার কাছে ফোর্ট গ্লস্টারের একটি বাষ্পশক্তিচালিত মিলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদনে সাফল্য। ১৮৫৪ সালে বাষ্পশক্তিচালিত প্রথম পাটকলের উদ্বোধন করা হয়। ১৮৫০-এর দশকে রেলওয়ে নির্মাণের বিরাট পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপগুলি গৃহীত হয়।

১৬. দ্রষ্টব্য, R and R. Ray, ' The Dynamics on Continuity in Rural Bengal under the British Imperium, *Indian Economic and Social History Review*, X (1973), 93-128.

উনিশ শতকের শেষদিকে এই পরিকল্পনা খুব দর্শনীয়ভাবে বর্ধিত হয়। ১৮৫৪ সালে রানীগঞ্জের কয়লাখনির সঙ্গে কলকাতার সংযোগ সাধিত হয়।[১৭] এগুলোর সবকটিই ছিল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাশূন্য। তথাপি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসানের সময়ে শিল্পোন্নত বৃটেন থেকে বাংলাদেশের প্রযুক্তিতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আমদানি হয় নি। জনসংখ্যার বৃহদংশের প্রয়োজন তখনো মেটাতো তাঁতী, কামার-কুমোর এবং অন্যান্য কারিগরেরা। তারা আগের মতোই একই যন্ত্রপাতি নিয়ে নিজেদের গ্রামে বা শহরের কর্মশালায় কাজ করতো।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এসব কারিগরের বৃহদংশের অবস্থা কেমন ছিল তা সামান্যই জানা যায়। শেষ পর্যন্ত ইউরোপ থেকে আমদানি করা সস্তা পণ্য তাদের জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, বহুল পরিমাণ আমদানি তখনো ছিল দূর ভবিষ্যতের ব্যাপার। সুতীবস্ত্র ইত্যাদি তৈরিতে যারা নিয়োজিত ছিল, তাদের অনেকেই অবশ্য ইতিমধ্যেই বিদেশী প্রতিযোগিতার পরিণামফল ভোগ করতে শুরু করেছিল। ভুক্তভোগীরা ছিল উন্নতমানের বস্ত্র উৎপাদনকারী তাঁতী এবং তাদের সহায়তাকারী যারা সুতা কাটতো তারা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা। ল্যাঙ্কাশায়ারের টেক্সটাইল শিল্পের সঙ্গেই ছিল প্রধান প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা দেখা দেয় ধীরে ধীরে। ল্যাঙ্কাশায়ারে এসব ঘটলেও বাংলাদেশের সুতায় তৈরি বস্ত্রসামগ্রীর বিশ্বজোড়া রপ্তানি ১৭৬৫ সাল থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৮১৫ সাল নাগাদ বৃটেনের বাজারের একটি বড় অংশ এসব পণ্যের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এর পরই বন্ধ হয়ে যায় ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকার বাজারসমূহ। ভারতের গ্রামের ভোক্তারা অবশ্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাপড়চোপড় পরিধান অব্যাহত রাখে। কিন্তু ১৮২০-এর দশক থেকে ১৮৪০-এর দশকের বছরগুলিতে ক্রমবর্ধমান গতিতে ল্যাঙ্কাশায়ারের সুতা ও কাপড় ভারতের বাজার এককভাবে দখল করতে শুরু করে। বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কিছু তাঁতীসম্প্রদায়ের জন্য রপ্তানিবাণিজ্যের অবলুপ্তি ছিল চূড়ান্ত। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ঢাকার এধরনের তাঁতীরা। ইংরেজ পর্যবেক্ষকগণ এদের দুঃখ-দুর্দশার কথা নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য অঞ্চলে তাঁতীদেব যেসব কারবার ছিল সেগুলিও বন্ধ হয়ে যায়। কারণ বৃটেন থেকে ক্রমাগত আমদানির ফলে ভারতের শহরে বাজার থেকে কেনাকাটার জন্য বড় ধরনের ফরমাশ বন্ধ হয়ে যায়।[১৮] লবণ উৎপাদনকারীদের জীবনও সঙ্কুচিত হতে শুরু করে, কারণ ১৮৫০-এর দশকে বৃটেন থেকে আমদানিকৃত লবণ বাংলাদেশের অর্ধেক বাজার দখল করে ফেলে।

১৭. B. B. Kling, *Partner in Empire Dwarkanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India*, (Berkeley 1976); R. S. Rungta, *The Rise of Business Corporations in India*, (Cambridge 1979), 59-64.

১৮. D. B. Mitra, *The Cotton Weavers of Bengal*, (Calcutta 1979).

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এমন ধরনের কোন পরিবর্তন হচ্ছিল না যা নগরায়ণে নতুন ধারার প্রবর্তন করতে পারে। জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি নতুন নতুন গ্রাম সৃষ্টি করে চলছিল অথবা সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছিল পুরনো গ্রামগুলির। সেই আদিকাল থেকেই নগরগুলি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন এবং ধর্মের কেন্দ্র। এসময়ে উৎপাদনের নতুন কেন্দ্র হিসেবে এগুলি বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করে নি। একটি নগর সমৃদ্ধিশালী হয়েছে নাকি ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়েছে তা নির্ভর করেছে নদীর গতিপথের পরিবর্তন বা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের উপর। একটি বড় জমিদারির পতন হলে রাজার প্রশাসনের কেন্দ্র ঘিরে যে শহর থাকতো তা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যেতো। কোম্পানি কোথাও সেনানিবাস তৈরি করলে তার আশেপাশে বসতি গড়ে উঠতো। কোম্পানির শাসনের প্রথমদিকে যে দু'টি শহর এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে দু'টি হলো মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা। তবে এই ক্ষতি হয় উনিশ শতকের অনেকগুলি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর। শহর দু'টির মধ্যে মুর্শিদাবাদ ছিল আঠারো শতকে নবাবদের রাজধানী। এতে অত্যন্ত লাভবান হয়েছে কলকাতা। বৃটিশদের বিজয়ের বহু পূর্বেই কলকাতা বাংলার প্রধান বন্দরে পরিণত হয়। গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য অংশে বৃটিশদের নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারিত হওয়ার পর কলকাতা হয়ে গেল এক বিশাল পশ্চাৎভূমির বহির্দ্বার। ১৭৭২ সালে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। কোম্পানিতে চাকুরিরত এবং চাকুরিবহির্ভূত ইউরোপীয়রা কলকাতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ব্যবসায়ী, শহরের বাড়িতে বসবাসরত জমিদার এবং পেশাগত জনগণের একটি অবস্থাপন্ন সম্প্রদায়ও কলকাতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সর্বোপরি কলকাতা হয়ে উঠতে থাকে শুধু বাংলাদেশেরই নয়, ভারতের পূর্বাঞ্চলের সব অংশেরও ভ্রাম্যমাণ শ্রমিকদের কেন্দ্রস্থল। ১৮৩৭ সালের হিসাব অনুযায়ী এই শহরে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের আনুপাতিক হার ছিল শতকরা ৬৩ ও ৩৭। এতে পরিষ্কার বোঝা যায় জনসংখ্যার বেশিরভাগই ছিল কত ক্ষণস্থায়ী।[১৯] সব পর্যবেক্ষকই বর্ণনা করেছেন কলকাতা কিভাবে শহরতলি আর গ্রামের মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে পল্লীঅঞ্চলের সঙ্গে মিশে গেছে। এই পল্লীঅঞ্চল ছিল মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। দিনের বেলায় দূরবর্তী গ্রামগুলি থেকে প্রায় সব লোকজনই শহরে কাজ করতে আসতো। এ ধরনের ভ্রমণশীল জনসংখ্যার হিসাব রাখা ছিল বেশ কঠিন ব্যাপার। ধারণা করা হয়েছিল, ১৮২০-এর দশকে কলকাতার স্থায়ী জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২০০,০০০। ১০০,০০০ লোকের একটি অতিরিক্ত জনসংখ্যা প্রতিদিন শহরে প্রবেশ করতো। ১৮৫০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা ৪০০,০০০-এর বেশি বলে ধরা হয়।[২০]

এতগুলি লোকের একত্র সমাবেশ বাংলাদেশের বাণিজ্যিক কৃষির জন্য ছিল একটি ব্যাপক উদ্দীপকবিশেষ। কলকাতার খাদ্যের চাহিদা কেবল আশেপাশের জেলাগুলোতে ব্যাপক উৎপাদনের দ্বারাই মেটানো হতো না, গঙ্গার পথে দূরদূরান্ত থেকে বাণিজ্যের

১৯. A Mitra, "Calcutta City", *Census of India, 1951*, VI, pt, iii (Calcutta 1954), 11-12.

২০. A K Ray, "A Short History of Calcutta", *Census of India*, 1901, VII (Calcutta 1902), 60.

মাধ্যমে এবং সর্বোপরি পূর্ববাংলা থেকেও মেটানো হতো। পূর্বের সম্প্রসারণশীল জনবসতিপূর্ণ এলাকাসমূহে যে অতিরিক্ত চাল উৎপাদিত হতো তার বেশিরভাগই জাহাজে করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়া হতো।

কলকাতা সন্দেহাতীতভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। যেকোন আকারের প্রতিটি স্থানীয় বাজারের নিজস্ব ব্যবসায়ী ছিল। মুর্শিদাবাদ এবং ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল উনিশ শতকের অনেক আগে থেকেই। ভারতের উত্তরাঞ্চলের শহরগুলি, বিশেষকরে বেনারস থেকে মহাজনেরা বাংলাদেশে বেশ ব্যবসা করেছে। তা সত্ত্বেও কলকাতার প্রাধান্য স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠে। এমনকি ১৭৬৫ সালের আগেও ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং মহাজনেরা কলকাতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আঠারো শতকের শেষদিকে কলকাতায় বসবাসরত ব্যবসায়ীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই মনে হয়। বেশির ভাগ ব্যবসায়ী নিজেরাই ইউরোপীয়রা যেটাকে তাচ্ছিল্যভরে বাজার বলে উল্লেখ করতো সেখানে ব্যবসা পরিচালনা করতো। অনেকেই আবার বৃটিশদের সঙ্গে সম্পর্কের সুবাদে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, বেসরকারি ব্যবসায়ী এবং পরবর্তীকালের এজেন্সি হাউজের সবাই ভারতীয়দের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করতো। শুরু থেকেই এক ধরনের অংশীদারিত্বের উদ্ভব হয়। এর কারণ হলো, ভারতীয়রা পৃথক পৃথকভাবে ইউরোপীয়দের ব্যবসার ব্যবস্থাপক বা 'বানিয়া' মুৎসুদ্দি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ইউরোপীয় প্রাইভেট সেক্টর বা বেসরকারি খাত যখন এজেন্সি হাউজে এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয়, তখন মুৎসুদ্দি এবং অন্যান্য এজেন্ট এবং দালালেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। কিছু কিছু ভারতীয় আবার সাহস করে এসব ব্যবসায়ে আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব স্থাপন করে। ১৮৩০-এর দশকে ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ ঠাকুর হলেন একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। এই পরিবারের নীল, কয়লা এবং চায়ের ব্যবসা ছিল এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অংশীদারিত্ব ছিল।[২১]

যদিও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ছিল একটি অপরিহার্য বাস্তবতা, তবুও বর্ণভিত্তিক সীমারেখাও প্রকট হয়ে উঠতে চাইতো। মৌল কৃষিতে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবসা, সর্বোপরি শস্যদানার বিশাল ব্যবসা ছিল প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের হাতে। কোম্পানির লবণ বিতরণের জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করা হতো। ইউরোপীয় এজেন্সি হাউজগুলি ছিল জাহাজের মালিক এবং তারা বৃটেন থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ব্যবসা করতো। যেসব ভারতীয় এসব ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নিত, দুর্বল হলে তারা অকৃতকার্য হতো, মার খেতো। ১৮২০-এর দশকের শেষের বছরগুলোতে এবং পুনরায় ১৮৪০-এর দশকে কলকাতার বেশ কয়েকটি এজেন্সি হাউজ ও ব্যাঙ্ক দর্শনীয়ভাবে দেউলিয়া হয়ে যায়

২১. Kling, *Partner in Empire*.

এবং ভারতীয় লগ্নিকারীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে যারা নতুন প্রজন্মের ছিলেন, তারা অনেক ব্যাপক এবং নিবিড়ভাবে খোদ বৃটেনের ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গেই জড়িত ছিলেন। এগুলিতে অবশ্য ভারতীয়দের ভূমিকা ছিল নগণ্য।[২২]

ইউরোপীয় হোক কিংবা ভারতীয় হোক, ব্যবসায়ীরা এমন একটা মুদ্রা এবং জমাব্যবস্থার মধ্যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতো, যা এসময়ে তুলনামূলকভাবে খুবই কম পরিবর্তিত হয়। বৃটিশরা উত্তরাধিকারসূত্রে এমন একটি মুদ্রাব্যবস্থা লাভ করে, যার ভিত্তি ছিল বিভিন্ন টাঁকশালে প্রস্তুত রৌপ্যটাকা। আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে চালু ছিল একটি বেশ জটিল বাটাব্যবস্থা, যাতে বিভিন্ন টাঁকশালে তৈরি টাকা বা বিভিন্ন বছরে তৈরি টাকা ব্যবহৃত হতো। এই জটিলতা এবং বিনিময়ের ক্ষেত্রে যে খরচ হতো তা ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখার ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হতো। বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে কোম্পানি ১৮৩৫ সালে টাকার একটি একক মানের প্রচলন করে। ভারতীয় মহাজনদের নামে প্রদেয় এবং হুন্ডি নামে অভিহিত বিল অব একচেঞ্জ, ইউরোপীয়দের নামে প্রদেয় বিলসমূহ এবং কোম্পানি কর্তৃক জারিকৃত কাগজের সার্টিফিকেটসমূহ বা বন্ডসমূহ রৌপ্যের ঘাটতি মেটায় এবং সম্পদের সরাসরি স্থানান্তর ছাড়াই বিরাট অঙ্কের টাকার স্থানান্তর সম্ভব করে তোলে। বিভিন্ন ধরনের কাগজে দলিলের ব্যবহারের ফলে বাটার মাধ্যমে জটিল ও ব্যয়বহুল বিনিময়ের সূত্রপাত হয়। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাঙ্কনোটের মাধ্যমে এ ধরনের সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে এবং ১৮০৯ সাল থেকে সরকারি মদদপুষ্ট ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল বাজারে নোট ছাড়তে শুরু করে। ইউরোপীয়দের মালিকানাধীন ব্যাঙ্কসমূহও একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে শুরু করে। কিন্তু এধরনের নোট বিতরণের ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। ১৮৩১ সালে এ কথা বলা হয় যে, "ব্যাঙ্কনোটের সাহায্যে বণিকেরা এবং কোম্পানি টাকা পাঠাবার সুবিধা লাভ করলেও দেশের অভ্যন্তরে কাগজের টাকা হিসেবে এব কোন অস্তিত্বই প্রায় ছিল না"। অন্যদিকে সরবরাহ কম হলেও 'দেশে চালু ধাতব মুদ্রা' 'দেশীয় ব্যবসায়ীরা' তখনো ব্যাপকহারে ব্যবহার করতো।[২৩]

প্রতিটি স্তরেই বাংলাদেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল ঋণপ্রাপ্তির উপর। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ ধরনের ব্যবস্থাকে সঙ্কটজনক বলে বিবেচনা করা হতো এবং টাকা ধার করার ব্যয় ছিল অত্যন্ত বেশি। বৃটিশদের বিজয়ের বহু পূর্বেই বাজারে বিক্রি করার জন্য কৃষকেরা যা উৎপাদন করতো, তা বণিকদের কাছে বা অন্যান্যদের কাছে বন্ধক থাকতো। এরা চড়া সুদে কৃষকদের টাকা আগাম দিত। চাল দায়বদ্ধ রেখে যে টাকা ধার দেয়া হতো, তার সুদ হিসেবে শতকরা ২৪ টাকা ন্যূনতম বলে বিবেচিত হতো।

২২. ঐ, 243-5.

২৩. Evidence of Holt Mackenzie, *Parliamentary Papers*, 1831-2 X, pt. i, 50; on banking and currency in general, দেখুন A. K. Bagchi, *The Evolution of the State Bank of India, The Roots 1806-76*, (2 Vols. (Bombay 1987), Vol. I.

শতকরা ৫০ টাকা বা তদূর্ধ হারের সুদ ছিল স্বাভাবিক।[২৪] আখের জন্য আগাম প্রদানের ক্ষেত্রে সুদের হার ছিল আরো চড়া। যারা মালবেরী উৎপন্ন করে বা তাঁতের কাপড় বুনে কোম্পানির জন্য কাজ করতো তারা বা ইউরোপীয় নীল কারখানায় যারা কাজ করতো তারা যে টাকা আগাম নিত তার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে কোন সুদ ধার্য করা হতো না। কিন্তু প্রায়ই বিশেষভাবে নীলচাষীদের পক্ষ থেকে এ অভিযোগ করা হতো যে, শেষ পর্যন্ত পণ্যের মূল্য অত্যন্ত কম দেয়ার কারণে বিরাট অঙ্কের সুদ কেটে রাখা হয়েছে। বাংলার সব বণিকেরই ব্যয়ের হিসাবে সুদ ছিল প্রধান খাত। ১৭৭৩ সাল থেকে কোম্পানির আদালতে বলবৎ করা যেতো এরকম সুদের সর্বোচ্চ হার ছিল ১২ শতাংশ। কিন্তু কলকাতার ভারতীয় বণিকেরা এর চেয়ে অনেক বেশি হারে সুদ প্রদান করতো বলে জানা যায়।[২৫] ১৮২০-এর দশকে নীলচাষীরা এজেন্সি হাউজের কাছ থেকে নেয়া ধারের জন্য ৮ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ হারে সুদ দিয়েছে বলে জানা যায়। এজেন্সি হাউজ আবার এ টাকা ধার করতো ইউরোপীয় বা ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে। তহবিলের স্বল্পতার কারণে অর্থপ্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতো এবং প্রতিযোগিতার ফলে সুদের হার বেড়ে যেতো ব্যাপকভাবে। ১৮২৬ সালে এজেন্সি হাউজগুলি অভিযোগ করে যে, বার্মা যুদ্ধের জন্য সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণের ফলে তারা ১৫ থেকে ১৮ শতাংশ পর্যন্ত হারে সুদ দিতে বাধ্য হচ্ছে।[২৬] বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রকৃত অর্থে মূলধনের ঘাটতি পড়েছিল কিনা বা বণিকদের স্বার্থের আলোকে অর্থবাজারে খুবই অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা ছিল কিনা তা পরিষ্কার নয়। উভয়ক্ষেত্রেই বৃটিশ ভাষ্যকারেরা বিশ্বাস করতেন যে, ঋণ সবররাহের মূল্য এবং অনিশ্চয়তা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ছিল একটি প্রধান বাধা। তারা বৃটেন থেকে মূলধন আসবে বলে আশা পোষণ করেছিল। কিন্তু প্রথমদিকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত বৃটেন থেকে রেলওয়ে বাবদ মূলধনের প্রবাহ ছিল অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ধারাবাহিকতার উপাদানসমূহ ছিল অত্যন্ত জোরালো, এবং শিল্পপুঁজিবাদের একক প্রতিভূ নয় এমন একটি উপাদান ছিল বৃটিশ শাসনামল থেকে উদ্ভূত পরিবর্তনের চাপসমূহ প্রতিহত করতে সমর্থ। ইতিমধ্যে ১৭৬৫ সালে বাংলাদেশের কৃষি কিছুটা বাণিজ্যিক হয়ে পড়েছিল। বৃটিশদের অধীনে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং নীলের মতো নতুন ফসলসমূহের ব্যাপক চাষ হতে থাকে। বণিকদের কাছ থেকে উচ্চহারে নেয়া ধারের সাহায্যে ক্ষুদ্র চাষীদের চাষাবাদ সম্প্রসারিত করা সম্ভবপর হয়। বাংলাদেশে উৎপন্ন চিনি ও নীল ইউরোপে ঢোকার প্রবেশপথ পায় এবং রেশম সহযোগে এগুলি ভারত থেকে সরকারি এবং বেসরকারি ফান্ড স্থানান্তরের উপায় হিসেবে সুতীর তৈরি পণ্যের স্থান দখল করে। কিন্তু বাংলাদেশে উৎপন্ন

২৪. R Datta, "Merchants and Peasants A Study of the Structure of Local Trade in Grain in Eighteenth Century Bengal", *Indian Economic and Social History Review,* XXIII (1986), 393-4.

২৫ P J. Marshall, *East Indian Fortunes. The British in Bengal in the Eighteenth Century,* (Oxford 1976), 42.

২৬. Tripathi, *Trade and Finance*. 164

পণ্য তখন পর্যন্ত গুণের দিক থেকে যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হয় নি, এত সস্তাও হয় নি যে তা বৃটেনের খাদ্য ও কাঁচামাল সরবরাহের প্রধান উৎস হবে। কোম্পানির শাসনামলের শেষ পর্যায়ে বাংলায় শিল্পপণ্যের উৎপাদন হয়তো যথার্থই কমে গিয়ে থাকবে। কিন্তু কোম্পানির শাসনের মাধ্যমে বৃটিশদের পক্ষ থেকে যে প্রতিযোগিতা চালু হয় তা কোন প্রভাব বিস্তার করার ক্ষেত্রে ছিল অত্যন্ত দুর্বল। নেপোলিয়নের আমলের যুদ্ধের পরই তা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ১৮৪০-এর দশকেই বৃটেন থেকে রপ্তানিকৃত পণ্য প্রবলভাবে ভারতের বাজার দখল করতে শুরু করে। বাংলায় ইউরোপীয়দের ব্যবসা প্রথমত কোন স্থানই পেতো না যদি না সেখানে মুদ্রা এবং ঋণের একটি জটিল পদ্ধতি এবং নৌকাযোগে সমগ্র প্রদেশে যাতায়াতের একটি বেশ উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা না থাকতো। এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার (অবকাঠামো) উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির সহায়ক ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমদিকের বছরগুলিতে আরো উন্নয়নের জন্য অধিকতর উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে অসুবিধার সৃষ্টি করছিল বলে মনে হচ্ছিল সে সম্পর্কে বৃটিশরা সচেতন ছিল। তারা অপর্যাপ্ত মুদ্রা, উচ্চ সুদের হার, সীমিত অর্থবাজার এবং অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। তখন উত্তরাধিকারসূত্রে তারা যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার পেয়েছিল, তাদের নিজেদের সৃষ্ট কোন ব্যবস্থাকে সেটির স্থলাভিষিক্ত করার সামর্থ্য তাদের ছিল না।

যদিও প্রায় একশ' বছরের ঔপনিবেশিক শাসন বাংলার অর্থনীতিতে মৌল কোন পুনর্বিন্যাসের ধারার সূত্রপাত করতে পারে নি, তবুও প্রতীয়মান হয় যে, এই সময়ে এ দেশের জনগণের একটি বিরাট অংশের জীবনমান তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়। আর যেসব পরিবর্তন সাধিত হয় সেগুলি ছিল ঔপনিবেশিক শাসনেরই ফল। এসব পরিবর্তন মূল্যায়ন করার প্রাক্কালে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, বাংলাদেশের জনগণ শুধুমাত্র উৎপাদনকারী, ভোক্তা, শ্রমবিক্রেতা, মূল্য এবং দৈনিক মজুরির উঠানামার দ্বারাই প্রভাবিত ছিল তা নয়, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাজস্বপ্রদানকারীও ছিল এবং তারা রাজস্ব আদায়ের পর্যায় দ্বারাও ছিল বেশ প্রভাবিত। বাংলার রাজস্বের ইতিহাস অন্য একটি অধ্যায়ে আলোচিত হবে, কিন্তু সে ইতিহাসের কিছু প্রতিক্রিয়া এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

কোম্পানি আমলে বাংলার সম্পদ এবং দারিদ্র্যের বিষয়টি দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাণবন্ত বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে আছে। এসব বিতর্ক আজও চলছে। বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের (যেমন জনসংখ্যার হিসাব বা উৎপাদনের পর্যায়) অভাবে এসব বিতর্কের চূড়ান্ত সমাধান সুদূরপরাহত। সমগ্র বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পরিমাণগতভাবে বিভাজন করার চেষ্টা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও, ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে শাসনযন্ত্র কায়েম করেছিল, তা এমন এক পর্যায়ে দেশের সম্পদ শোষণ করে যে, তা সমগ্র দেশের জনগণের জীবনের মানে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। এর আগে যেসব সারণি দেয়া

হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, ১৭৬৫ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত বাংলার সমগ্র প্রদেশ নয়, শুধু কলকাতা এবং তার পশ্চাৎভূমি থেকেই প্রধানত ইউরোপে এবং চীনে পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এ রপ্তানির পরিমাণ আমদানিকৃত পণ্য বা স্বর্ণ-রৌপ্যের আকারে প্রতিদানে বাংলাদেশ যা পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। আমদানির চেয়ে রপ্তানির এই আধিক্যের জন্য অর্থযোগান দেয়া হয়েছে বাংলা থেকে ট্যাক্স আদায় করে। ট্যাক্স আদায় করা হয়েছে কখনো সরাসরিভাবে আদায়কৃত রাজস্ব দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মালামাল ক্রয়ের মাধ্যমে, কখনো পরোক্ষভাবে ব্যক্তিবিশেষের সঞ্চয় এবং মুনাফা দিয়ে পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে। আর এই সঞ্চয় ও মুনাফার বেশিরভাগই পাওয়া যেতো বাংলার রাজস্ব থেকে। আঠারো শতকের শেষদিকে সমগ্র বৃটিশ ভারতের কিছু সময়ের রপ্তানিউদ্বৃত্ত হিসাব করা হয়েছে ১.৮ মিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা)।[২৭] উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বৃটেনের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্ক একটা কাঠামোতে স্থির হয়, যা বৃটিশ শাসনের যবনিকা পর্যন্ত টিকে যায়। কোম্পানি বাংলাদেশের পণ্য মুনাফায় বিক্রি করতে পারুক বা না পারুক, তাকে এমন একটা রপ্তানিউদ্বৃত্তের ব্যবস্থা করতে হতো, যা দেশীয় খরচ মেটানোর জন্য যথেষ্ট হতো বলা যায়। অর্থাৎ এই উদ্বৃত্ত দিয়ে বৃটেনে প্রধানত কোম্পানির দেনা পরিশোধ করা হতো, বৃটেনের যে খরচ তা মেটানো হতো, শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ দেয়া হতো অথবা অস্ত্র ক্রয় করা হতো বা ভাণ্ডারের অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করা হতো। ১৮১৪ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত কোম্পানি সমগ্র বৃটিশ ভারত থেকে বৃটেনে যে অর্থ পাঠিয়েছে তার বার্ষিক গড় হলো প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন পাউন্ড (আনুমানিক ৩.৫ কোটি টাকা)।[২৮] যে ব্যক্তিগত সঞ্চয় বা মুনাফা সমগ্র ভারত থেকে বৃটেনে পাচার করা হয়েছে, তার হিসাব হলো ১৮২২ সালে ১ মিলিয়ন পাউন্ড (এক কোটি টাকা) এবং ১৮৫০-এর দশকের প্রথমদিকে ১.৫ মিলিয়ন অথবা ২ মিলিয়ন পাউন্ড (১.৫ বা ২ কোটি টাকা)।[২৯]

বাংলাদেশের রপ্তানিউদ্বৃত্ত পরিমাণগতভাবে নির্ণয় করা গেলেও তা এই প্রদেশের মোট উৎপাদনের কতটুকু অংশ তা এখনো হিসাব করা অসম্ভব বলেই প্রতীয়মান হয় এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ কখনো নির্ণয় করা যাবে না। আঠারো শতকের শেষদিকে সমগ্র বৃটিশ ভারতের হিসাবকৃত উদ্বৃত্ত রপ্তানির এবং বৃটিশদের দ্বারা বাংলায় বাৎসরিক উৎপাদনের সমসাময়িক অনুমানের আলোকে এই পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা অবশ্য করা হয়েছে। এধরনের হিসাবনিকাশের মূল্য যাই হোক, পণ্ডিতেরা বাংলার বার্ষিক উৎপাদনের ৯ শতাংশ

২৭. H. Furber, *John Company at Work* (Cambrige Mass, 1948), 309-10.

২৮. K. N Chaudhuri, *The Economic Development of India Under the East India Company 1813-58*, (Cambridge 1971), 36

২৯. ঐ, ৬২; evidence of J C. Melvill, *Parliamentary Papers*, 1852-3, XXVIII.

বা ৪ শতাংশ পরিমাণ লোকসানের হিসাব দিয়েছেন।[৩০] বাংলাদেশের সম্পদ বাইরে স্থানান্তরের বিষয়টি হিসাবের মধ্যে ধরে এবং এই প্রদেশের উৎপাদনের যতোটুকু অংশই হোক না কেন, বৃটিশদের বিজয়ের ফলে যে রপ্তানিউদ্বৃত্ত হয়, তা উৎপাদনের ক্ষেত্রে গতির সঞ্চার করেছিল বলে প্রতীয়মান হয়। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে নিজেদের নৈপুণ্যের ফলে বাংলাদেশের বয়নশিল্পীরা বিশ্বজোড়া বাজার দখল করতে সমর্থ হয়েছিল। বৃটিশদের বিজয়ের ফলে টেক্সটাইল শিল্প ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বটে, তবে শেষ পর্যন্ত এই শিল্প যে এই রপ্তানিবাজার হারাতো তা মনে হয় অনিবার্য ছিল। এই প্রদেশের নতুন শাসনকর্তারা যদি রাজস্ব থেকে ব্যয় করে একে উৎসাহিত না করতেন, তাহলে যে পরিমাণে বিকল্প রপ্তানির উন্নয়ন হয়েছিল সে পরিমাণে তা হতো কিনা সন্দেহ। সরকারি এবং বেসরকারিভাবে অর্থ প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশ হতে বিশ্ববাজারের চাহিদার অতিরিক্ত সিল্ক, নীল বা চিনি রপ্তানি করা হতো।

সম্পদ পাচারের বিষয়টি অবশ্য শুধু ইউরোপ এবং চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলা প্রেসিডেন্সির (যা বাংলার সীমানার বাইরে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল) রাজস্বের ৪০ শতাংশের বেশি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেকোন এক বছরে সামরিক খাতে ব্যয় করতে পারতো।[৩১] সৈন্যদের বেতন এবং কাপড়চোপড় ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির জন্য ব্যয় পুনরায় স্থানীয় অর্থনীতিতে ফিরে যেতো। তবে এটা ঠিক যে, এ ধরনের ব্যয় থেকে বাংলা তাৎপর্যপূর্ণভাবে উপকৃত হয় নি। বাংলা সেনাবাহিনীর প্রায় সব সৈন্যই অযোধ্যা এবং বিহার থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং তাদের কর্মস্থল ছিল উত্তর ভারত। তাছাড়া তাদের সরঞ্জামাদির প্রায় সবই ছিল আমদানিকৃত। তদুপরি সামগ্রিকভাবে বাংলা প্রেসিডেন্সির রাজস্ব ব্যয় করা হতো অন্যান্য প্রেসিডেন্সির, এমনকি সম্পূর্ণরূপে ভারতের বাইরের যুদ্ধের ব্যয়-সহায়তার জন্যও।

বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার যাই হোক না কেন, স্পষ্টতই এটির উপর অনেক বোঝা চাপানো হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্বের একটি বিরাট অংশ ব্যবহার করা হতো রপ্তানিউদ্বৃত্ত বজায় রাখার জন্য এবং এমন একটি সেনাবাহিনীর খরচের জন্য, যা নিয়োজিত ছিল সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের দায়িত্বে এবং কখনো কখনো বিশালাকার বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বীয় সম্পদের এধরনের ব্যবহার থেকেও প্রদেশটি নিঃসন্দেহে কিছুটা লাভবান হয়েছিল। রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে এই প্রদেশে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল,

৩০ শতকরা ৯ ভাগ হারের জন্য, দেখুন, I. Habib, "Colonialisation of the Indian Economy", *Social Scientist*, III (pt vii) 28 ; for 4 percent, দেখুন, A. K. Bagchi, *The Political Economy of Underdevelopment*, (Cambrige 1982), 81

৩১. P. J Marshall, *Bengal the British Bridgehead: Eastern India 1740-1828*, (Cambridge 1988), 135.

রপ্তানি বৃদ্ধি না হলে তা হতো না। বাংলা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ হয়েছিল এবং প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে পেয়েছিল অভ্যন্তরীণ শান্তি। কিন্তু এই লাভগুলি হয়েছে সামগ্রিকভাবে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের বিনিময়ে।

রাজস্বপদ্ধতিই ছিল প্রধান কৌশল, যার মাধ্যমে এই প্রদেশের সম্পদ আহরণ করা হয়। কোম্পানির আহরণের পরিমাণ অবশ্য নির্ধারণ করা যায়। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায় যে, ১৭৬৫ সালের পরের বছরগুলিতে রাজস্বের সর্বমোট যে অঙ্ক দাবি করা হতো এবং মোট যে অঙ্ক বাস্তবিকই পাওয়া যেতো, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল। ১৭৮৯ সালে কোম্পানি বাধ্যতামূলকভাবে রাজস্বের অঙ্ক নির্ধারণ করে দেয় এবং ১৭৯৩ সালে তা-ই চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করে। সমগ্র বাংলাদেশের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তরাজস্ব নির্ধারণ করা হয় ২ কোটি ৬৮ লাখ টাকা।[৩২] বাংলাদেশের নবাবরা যা আদায় করতো তার তুলনায় এই কর নির্ধারণ কতগুণ বেশি হয়েছিল তা বিতর্কের বিষয়। অনেক ঐতিহাসিকই এই যুক্তি দেন যে, নবাবরা যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতো কোম্পানির আদায়ের পরিমাণ ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। অন্যান্য হিসাবনিকাশ থেকে দেখা যায় যে, ১৭৫০-এর দশকের তুলনায় ১৭৮৯ সালে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ কর বেশি নির্ধারণ করা হয়।[৩৩] ১৭৮৯ সালে এ ধরনের করবৃদ্ধির কষ্টকর প্রভাবের সম্ভবত কিছুটা উপশম হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রদেশটির উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বারা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং চাষাবাদ বৃদ্ধির ফলে সরকারনির্ধারিত নির্দিষ্ট রাজস্বদাবির মোট বোঝার ভার বহুলাংশে হ্রাস পায়। কোম্পানি এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে যে রাজস্ব নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল, তা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোম্পানির তেমন কিছু করার ছিল না। তবে কোম্পানি মাঝে মাঝে নিষ্কর ভূমির অধিকার পুনরায় গ্রহণ করার চেষ্টা করতো, অর্থাৎ পূর্বে যে ভূমি রাজস্ব আরোপ থেকে রেহাই পেয়েছিল তা থেকে রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করতো অথবা যেসব জমিতে নতুন বসতি স্থাপিত হয়েছিল সেসব জমির উপর করারোপ করার চেষ্টা করতো। এসব পদ্ধতিতে রাজস্বের মোট বৃদ্ধি তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না।

ভূমি থেকে যে রাজস্ব আদায় হতো, কোম্পানির রাজস্ব অবশ্য শুধু তাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কোম্পানি আমদানির উপর এবং ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর শুল্ক আরোপ করেছিল। সর্বোপরি কোম্পানি লবণ বিক্রি থেকে রাজস্ব পেতো এবং এর পরিমাণ ছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমগ্র বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে মোট যা পেতো তার শতকরা ২০ বা ৩০ ভাগ। লবণরাজস্ব আসতো বাংলা এবং উড়িষ্যার উপকূলে বাষ্পীভবনের দ্বারা লবণ উৎপাদন এবং বিক্রয়ের উপর কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার

---

৩২. ঐ, 123

৩৩. ঐ, 141

থেকে। ১৯৪০-এর দশকে বৃটেন থেকে আমদানিকৃত লবণ বিক্রয়ের উপর যে কর ধার্য করা হয় তাতে ক্রমবর্ধমান হারে এই রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে উৎপাদিত লবণ সাধারণত উৎপাদনব্যয়ের প্রায় চার গুণ বেশি মূল্যে বিক্রি করা হতো এবং আমদানিকৃত লবণের উপর কর তার তুল্য করে ধরা হতো। ভোক্তাদের কাছে পৌঁছার আগে লবণের দামের সঙ্গে যুক্ত হতো বণিক এবং খুচরা বিক্রেতাদের মুনাফা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, লবণের উপর থেকে রাজস্ব আদায় করার ফলে ভোগের একটি মৌলবস্তুর মূল্য বহুগুণ বেড়ে যায়।

স্থূলভাবে বলতে গেলে, বাংলার উপর বৃটিশরা যে রাজস্বচাহিদা আরোপ করেছিল তা দু'টি পর্যায় অতিক্রম করে। ১৭৬৫ সাল থেকে ১৭৮৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে বর্ধিত রাজস্ব আদায় করা হয় (এর অর্থ এই নয় যে এই চাহিদা মুগল বা অন্যান্যদের শাসনামলে বৃদ্ধি পেতো না)। ১৮৮৯ সালের পর ভূমির উপর রাষ্ট্রের সরাসরি চাহিদা স্থিতিশীল হয়। কিন্তু ১৮৩০-এর দশক পর্যন্ত প্রায় সমস্ত পরোক্ষ কর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে।

রাজস্বচাহিদার বোঝা যারা রাজস্ব দিত তাদের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে কিভাবে সমন্বিত হতো তা একটি জটিল বিষয়। এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। রাষ্ট্র কর্তৃক মোট যে রাজস্ব ধার্য করা হতো এবং প্রত্যেক স্বতন্ত্র চাষী যা সত্যিই প্রদান করতো, তার মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কিনা তা স্পষ্ট নয়। ধরে নেয়া হয় যে, রাষ্ট্রের চাহিদার যেকোন বৃদ্ধি কৃষকদের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে দালালেরা পৌঁছে দিত। এই বৃদ্ধিকে বলা হতো 'আবওয়াব' বা অতিরিক্ত কর। ব্যাপারটি যদি সাধারণত এমনই হয়ে থাকে, তবে এর বিপরীতটা মনে হয় কদাচিৎই ঘটতো। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী বছরগুলিতে রাষ্ট্রের চাহিদার মাত্রা তুলনামূলকভাবে কমে গেলেও কৃষকদের উপর চাপের বোঝা কমে গিয়েছিল এমন মনে করার কোন ভিত্তি নেই; বরং বলা যায় যে, বোঝা বেড়েই গিয়েছিল। এ গ্রন্থের অন্যত্র বলা হয়েছে যে, তত্ত্বগতভাবে হলেও বৃটিশদের ইচ্ছে ছিল রাজস্বদালাল এবং কৃষকদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে দালালদের প্রদত্ত নিরাপত্তার কিছুটা কৃষকেরা পায়। এ ধরনের প্রচেষ্টা ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিষ্ফল এবং বাস্তবে কোম্পানি রাজস্বের দাবি মেটানোর জন্য জমিদারদের অতিরিক্ত ক্ষমতা দিতে বাধ্য হয়। উনিশ শতকের শুরুতে বৃটিশ শাসকদের এই সর্বজনীন মত ছিল যে, চাষাবাদে নিয়োজিত জনগণের অবস্থা মোটের উপর অবনতির দিকে যাচ্ছে। বেশিরভাগ চাষীর পক্ষেই রাজস্ববৃদ্ধি প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। এই সুযোগে জমিদারেরা ভূমির উপর জনগণের ক্রমবর্ধমান চাপের সুবাদে ভূমিকর বাড়িয়ে দিচ্ছিল। অবস্থা এত সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল যে, ১৮৫৯ সালে বাংলার নতুন রাজপ্রশাসকেরা একটি আইন পাশ করে কয়েক শ্রেণীর চাষীকে রাজস্ববৃদ্ধির হাত থেকে রক্ষা করেন। আধুনিককালের গবেষণা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দরিদ্রতর চাষীদের উপর ঋণের

বোঝা বেড়ে যাচ্ছিল, যেমন বেড়ে যাচ্ছিল তাদের ঋণিতা। এ সময়ে যেসমস্ত গ্রামবাসী মাত্র ভরণপোষণের স্তরে জীবিকানির্বাহ করতো তাদের সংখ্যা (এবং সম্ভবত তাদের হারও), সে কয়েক বিঘার মালিক রায়ত হোক অথবা অন্যের জন্য সার্বক্ষণিক শ্রমিকই হোক, উনিশ শতকের মাঝামাঝি ভূমির উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায়।[৩৪] কোম্পানি আমলের শেষ পর্যায়ে চাষাবাদে নিয়োজিত জনগণের মধ্যে স্তরবিন্যাস কি পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তা সুস্পষ্ট নয়। অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী চাষীদের বিভিন্ন দল জমিদারদের রাজস্ববৃদ্ধির চাপকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করতে এবং বেশিরভাগ চাষীর সঙ্গে তুলনামূলকভাবে একটি সুবিধাভোগী অবস্থান বজায় রাখতে সফল হয়েছিল। ১৮৫৯ সালের আইনের দ্বারা এরাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়।[৩৫]

সম্ভবত ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত কোম্পানির বর্ধিত রাজস্বচাহিদার সময়ে দালালেরা এই বোঝার কিছুটা অন্তত কৃষকদের উপর চাপিয়ে দিতে পেরেছিল। যে সময়ে স্থিতিশীল রাজস্বচাহিদা বিদ্যমান ছিল, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং চাষাবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছিল, সে সময়ে খাজনা এবং রাজস্বের মাধ্যমে যেসমস্ত সুযোগ-সুবিধা বিতরিত হয়েছিল, তা রাষ্ট্রের কাছেও পৌঁছে নি, কৃষককুলের কাছেও পৌঁছে নি, পৌঁছেছে বিপুলভাবে ক্রমবর্ধমান দালাল শ্রেণীর কাছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তাৎক্ষণিক কারণে বড় বড় জমিদারির প্রায় সবগুলিই আঠারো শতকের প্রথমদিকে ভেঙে পড়ে।[৩৬] যেগুলি উনিশ শতক পর্যন্ত টিকেছিল সেগুলি এবং মাঝারি আকারের জমিদারিগুলি সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল বলে প্রতীয়মান হয়। এ সময়ে রায়তিস্বত্ব ভোগকারীদের সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। এদের সবারই আয়ের উৎস ছিল কৃষকদের কাছ থেকে সংগৃহীত রাজস্ব।

রাজস্বসংগ্রহ ছিল বাংলাদেশের সম্পদ বিতরণের একটি কৌশল। মূল্য এবং মজুরির উঠানামা ছিল অন্য একটি কৌশল। এতে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই যে, বিদেশী এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বর্ধিত পরিমাণ ছিল বাংলাদেশে বৃটিশ শাসনের একটি ফল। এই প্রদেশের জনগণের জীবনমানের ক্ষেত্রে এর কোন ভূমিকা ছিল কিনা তা তেমন সুস্পষ্ট নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সমগ্র জনগণকে প্রথমত ভোক্তা হিসেবে বিবেচনা করা হবে নাকি উৎপাদক হিসেবে তা ছিল অনিশ্চিত। যে বিপুল সংখ্যক কৃষক তাদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য পর্যাপ্ত জমির অধিকারী ছিল না, তারা যে খাদ্যদ্রব্য বাজার থেকে ক্রয় করতো তার কম মূল্য ভোক্তা হিসেবে তাদের জন্য সহায়ক ছিল। অন্যদিকে, উৎপাদক হিসেবে তাদের কাছে উচ্চমূল্যের এক তাৎপর্য ছিল : তারা তাদের উৎপাদিত শস্যকণা বা

৩৪. R Ray, *Change in Bengal Agrarian Society,* (New Delhi 1979), 290.

৩৫. C. Palit, *Tensions in Bengal Political Society: Landlords, Planters and Colonial Rule,* (Calcutta 1975), 201.

৩৬. S. Islam, *The Permanent Settlement in Bengal: A Study in its Operation 1790-1819,* (Dacca 1979), 76-143.

অন্য শস্যের যে অংশ খাজনা পরিশোধ করার জন্য বিক্রয় করতে বাধ্য হতো, উচ্চমূল্যের ফলে তারা তা থেকে ভাল মুনাফা করতো। সব মিলিয়ে যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, ১৭৬৫ সাল থেকে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে অনেক পণ্যেরই দাম খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল। ১৭৬৯ এবং ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের বছরগুলিতে দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত বেড়ে যায়। এরপর দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত কমে যায়। শেষ অবধি এমন একটা স্তরে এসে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল হয়, যা উনিশ শতকে বহু বছর পর্যন্ত বজায় থাকে। এ সময়ে মূল্য আর তেমন উঠানামা করে নি। বিশেষকরে প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রগুলিতে মূল্য স্থিতিশীল ছিল। অবশ্য অঞ্চলভেদে মূল্যের বেশ উঠানামা ছিল।[৩৭] উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বেশিরভাগ সময়ে দ্রব্যের উচ্চমূল্য, বিশেষকরে খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য বজায় না থাকার ফলে চাষাবাদের সম্প্রসারণ নিরুৎসাহিত হয় নি। মূল্য স্থিতিশীল হওয়ার ফলে বর্ধিত রাজস্বচাহিদার ক্ষেত্রে চাষী বিপদের মুখে ছিল, কিন্তু সস্তায় খাদ্যদ্রব্য পাওয়ায় অনেকেই নিঃস্ব হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

সাধারণত এ ধারণা করা হয় যে, রাজস্ব সংক্রান্ত দালালরা ছাড়া কৃষি সম্প্রসারণের ফলে আর যারা লাভবান হয়েছিল তারা হলো বণিকগোষ্ঠী। বণিকদের প্রদত্ত ধারের উপর কৃষকরা নির্ভরশীল ছিল। বণিকেরা বিপুলভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যবসা পরিচালনা করতো। এমনকি মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হলেও কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসা করে বিপুলসংখ্যক বণিক আরামপ্রদ জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েছিল। অবশ্য উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিভিন্ন রচনায় এ বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে যে, এই শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে স্থানীয় ব্যবসায়িক উদ্যোগ বিফল হয়। সাধারণত এ ধরনের বিফলতার যেসব কারণ দেখানো হয় তা হলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বয়নশিল্প, রেশম এবং লবণের উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ, ভারতীয়দের প্রতিযোগিতা সীমিত রাখার ক্ষেত্রে বেসরকারি বৃটিশ স্বার্থের নির্দয়তা, ১৮৩০-এর এবং ১৮৪০-এর দশকে ব্যাঙ্কসমূহ এবং এজেন্সি হাউজসমূহের ব্যর্থতার ফলে ভারতীয়দের বিপুল লোকসান।[৩৮] যদিও ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কিছু অংশের, বিশেষকরে কলকাতার সম্পদের ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, তথাপি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বৃটিশ স্বার্থ বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর কঠোরতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এরকমটি তারা ভারতের অন্য কোন অংশে, বিশেষকরে পশ্চিম উপকূলে করতে পারে নি।

বেশি ব্যবসা মানেই শ্রমের বর্ধিত চাহিদা। আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত বয়নশিল্পের সম্প্রসারিত উৎপাদনের সময়ে বয়নশিল্পীদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, কৃষি- শ্রমের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। আর কলকাতায় এই পুরো সময়ে শ্রমের বেশ চাহিদা ছিল। যারা শ্রম বিক্রয়

৩৭. A. S. M. Akhtar Hussain, "A Quantitative Study of Price Movements in Bengal during the Eighteenth and Nineteenth Centuries", London, Ph. D. thesis (1977).

৩৮. উদাহরণস্বরূপ, N. K. Sinha, *The Economic History of Bengal* 1793-1848, III , (Calcutta 1970), 105 27.

করতো তারা শ্রমের এই বর্ধিত চাহিদা থেকে যে পরিমাণে লাভবান হতে সমর্থ তা পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হয়। কোম্পানি পণ্যমূল্য এবং বয়নশিল্পীদের, যারা রেশমের সুতা বুনতো তাদের এবং যারা লবণ সেদ্ধ করতো তাদের যে যে মূল্য বা মজুরি দিত তা নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন গবেষণাকর্ম থেকে দেখা যায় যে, কোম্পানি অনেক ক্ষেত্রে মজুরি কৃত্রিমভাবে নিম্নপর্যায় পর্যন্ত কমিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে।[৩৯] কলকাতায় অবশ্য মজুরি বেঁধে দেয়ার চেষ্টা তেমন সফল হয় নি[৪০] এবং বেশিরভাগ ভাষ্যকারই মনে করেন যে, কৃষিকাজের জন্য মজুরি সাধারণভাবে বৃদ্ধি পায়। ঢাকায় মজুরির অঙ্ক থেকে দেখা যায় যে, ১৮০৩ সাল থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত কৃষি এবং সাধারণ শ্রমের পারিশ্রমিক দ্বিগুণের চেয়েও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।[৪১] মজুরির আকর্ষণে ছোট- নাগপুরের পাহাড়ী এলাকা থেকে দলে দলে উপজাতীয় লোক বাংলায় কাজ করতে আসে।

১৮৫৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসানে বহুক্ষেত্রে বাংলার অর্থনীতি ১৭৬৫ সালে যে রকম ছিল সে রকমই থাকে। কোম্পানি পরিবর্তন আনয়নে তেমন কোন আগ্রহ দেখায় নি। কোম্পানি বয়নশিল্পে এর প্রাচীন ব্যবসা যতোদিন সম্ভব ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। কোম্পানির প্রধান চেষ্টা ছিল রাজস্বের উপর তার যে সামরিক শক্তি নির্ভরশীল ছিল তা রক্ষা করা। কোম্পানি রাজস্ব-আয় নিরাপদ করার স্বার্থে যে পর্যায়ে ভূমি থেকে কর সংগ্রহ করতো, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তা চিরকালের জন্য সীমিত করার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। এর দ্বারা কোম্পানি শুধু নিজের সম্পদই সীমিত করে নি (এর ব্যয় কমানোর কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ না করে), বরং জনগণের সঙ্গে এর সংযোগও বিপুলভাবে কমিয়ে দেয় এবং জনগণের অবস্থা পরিবর্তনে এর যে সামর্থ্য ছিল তাও করে দেয় অনেক সীমিত। এর ফলে জনগণকে ছেড়ে দেয়া হয় রাজস্বদালালদের দয়ার উপর। যাদের রাজস্ব আদায়ের অধিকার ছিল তারা সে অধিকারের সুযোগ নিত, কোন ব্যবসাভিত্তিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা বা কৃষি উন্নয়নের কোন কাজের দ্বারা মুনাফা অর্জন করার চেষ্টা করতো না। আর কোম্পানির না ছিল এসব কাজ নিজে করার সামর্থ্য, না ছিল কোন আগ্রহ। অন্তত ১৮৫০ সাল পর্যন্ত বেসরকারি বৃটিশ স্বার্থ বা ভারতীয় বণিকেরা কেউই অর্থনীতিতে বিপুল পরিমাণে মূলধন নিয়োগ করতে আগ্রহী বা সমর্থ ছিল না। তারা শুধু নীলচাষীদের ধার দিত এবং কৃষকদের দিত আগাম এবং এই উভয় ক্ষেত্রেই সুদের হার ছিল অত্যন্ত উচ্চ। এর বেশি তারা আর কিছুই করতো না।

কোম্পানি, বেসরকারি ইংরেজ, জমিদার এবং ভারতীয় বণিকেরা সবাই ছিল এই পরিস্থিতির মুখোমুখি। বাংলার অর্থনীতি ইতিমধ্যে দক্ষতার এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত

৩৯. H. Hossain, *The Company Weavers of Bengal: The East India Company and the Organisation of Textile Production in Bengal 1750-1813*, (Delhi 1988)

৪০. P J Marshall, "The Company and the Coolies : Labour in Eighteenth Century Calcutta", *The Urban Experience Calcutta. (ed.)* P Sinha, (Calcutta 1987), 23-38.

৪১. J. Taylor, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, (Calcutta 1840), 306-9.

হয়েছিল যে, প্রচলিত পদ্ধতিতেই রাজস্ব আদায় এবং কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা যেতো। অন্যদিকে এসব পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য কোন উৎসাহই দেয়া হতো না। বাংলায় যা উৎপন্ন হতো বিশ্বে তার চাহিদা তখনো ছিল সীমিত বা বড়জোর অনিশ্চিত। যারা পরিবর্তনের জন্য বেশি আগ্রহী ছিল, তারা ইচ্ছুক ছিল বাংলাদেশে বৃটেনে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করতে। কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার অবসানের পর তারা দারিদ্র্যের দ্বারা ভীষণভাবে সঙ্কুচিত দাবির কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হলো। ১৮৩০ সাল নাগাদ বৃটেনে উৎপাদিত তুলাজাত পণ্যাদি উল্লেখযোগ্য লাভে বিক্রি হতে থাকে, কিন্তু শুরুতেই এই সাফল্যের মূল্য হয় তীব্রতর দারিদ্র্য। তুলা প্রস্তুতকারকেরা এই দারিদ্র্যের জন্য বেশ দুঃখপ্রকাশ করেছিল।

কৃষকদের এবং বয়নশিল্পীদের উৎপাদনের সহনীয় বৃত্তের মধ্যে অবশ্যই প্রবৃদ্ধি ঘটেছিল, অন্তত কৃষির ক্ষেত্রে তো বটেই। কিন্তু কোম্পানি যে পরিমাণে আদায়কৃত রাজস্ব রপ্তানিউদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে ব্যয় করতো তার দ্বারা এই প্রবৃদ্ধি সীমিত ছিল। এই রপ্তানিউদ্বৃত্ত দিয়ে বৃটেনে অর্থ স্থানান্তরিত হতো এবং বাংলাদেশের বাইরে সামরিক ব্যয় নির্বাহ হতো। এই প্রবৃদ্ধির যে লাভ ছিল তা অসমভাবে বিতরিত হয়েছে বলে মনে হয়। বৃটিশ সম্প্রদায়, রাজস্বদালাল, একশ্রেণীর বণিক এবং এক শ্রেণীর লোক, যারা টাকার কারবার করতো, তারাই এই লাভের সিংহভাগ করায়ত্ত করে। অধিকতর সম্পদশালী কৃষকরা সম্ভবত তাদের অবস্থান ঠিক রেখেছিল। এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, জনগণের একটা বিরাট অংশের কোন উন্নয়ন সাধিত হয় নি। ভূমির উপর চাপ যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি বৃদ্ধি পায় খাজনার চাহিদাও। বয়নশিল্পে চাকুরির সুবিধা ভীষণভাবে হ্রাস পায়। খাদ্যের কম দাম, শ্রমের উৎসাহজনক চাহিদা এবং দীর্ঘ সময় ধরে নিয়মিত মৌসুমি বৃষ্টি দুর্যোগের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কোম্পানি শাসনের অবসানে দুর্যোগ মোকাবেলার সামর্থ্য আঠারো শতকের সামর্থ্যের চেয়ে উন্নত হয় নি।

সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা, ১৮৫৭-১৯৪৭

সুগত বসু*

নবাবি ও কোম্পানি যুগের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকে মানুষের জীবনযাত্রার মান অবনতির দিকে মোড় নেয়। প্রাক-ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ভিত্তি ছিল বস্ত্রশিল্প, হস্তশিল্প, আফিম ও শর্করা। কোম্পানি শাসনের শেষ নাগাদ এই সব উপাদান গুরুত্ব হারায় এবং প্রাচীন অর্থব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের উপর আবির্ভাব ঘটে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির, যাতে যুক্ত হয় নতুন উপাদান, যেমন নীল, পাট, চা ও আধুনিক শিল্প। কিন্তু সাধারণ অর্থনীতি তখনো ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। উনিশ শতকের গোড়া থেকে জনসংখ্যাবৃদ্ধি একদিকে যেমন কৃষিসম্প্রসারণে সহায়ক হয়, অপরদিকে তা জমির উপর চাপ সৃষ্টি করে। পতিত জমি আবাদের ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রাথমিক চাপ ছিল অর্থনীতির অনুকূলে। কিন্তু অনাবাদি জমি ক্রমশ কমে আসার পর অতিরিক্ত জনসংখ্যা সাধারণ অর্থনীতির নিরিখে এক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আরেকটি সমস্যা হচ্ছে অর্থকরী ফসলেব প্রবর্তন। পাটের মাধ্যমে বাংলার কৃষি অর্থনীতি সরাসরি সম্পৃক্ত হয় বিশ্ববাজারের সঙ্গে। পাটচাষের সঙ্গে জড়িত ছিল ঋণ। কারণ পাটচাষ করতে নগদ অর্থের প্রয়োজন হতো। এর প্রধান যোগানদার ছিল স্থানীয় জোতদার ও মহাজন। বিশ্ববাজারের প্রবণতার প্রভাব থেকে এ সময়ে মুক্ত ছিল না বাংলার সাধারণ অর্থনীতি। এ পর্যায়ে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দ্বিতীয় শতকের বাংলার অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হবে এই অধ্যায়ে।

১৮৫০-এর দশক থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত সময়কাল বৃটিশ শিল্পজাত পণ্যের সঙ্গে ভারতীয় কৃষিপণ্যের বিনিময়ের অসম বাণিজ্যসম্পর্ক দ্বারা চিহ্নিত। এই সময়ে বস্ত্রশিল্পের মাধ্যমে এবং পৃথিবীর অপরাপর দেশে কাঁচামাল বিক্রির দ্বারা রপ্তানিউদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, টাফ্টস বিশ্ববিদ্যালয়, বোস্টন. যুক্তরাষ্ট্র।

একটি জটিল পরিশোধপদ্ধতির মাধ্যমে বৃটেনের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করা হয়।[১] ভারতের রপ্তানিতালিকায় কাঁচা তুলা, কাঁচা পাট, চা, কফি, গম, তৈলবীজ ও চামড়া ছিল উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে পাট ও চা ছিল বাংলার প্রাথমিক উৎপাদকদের বড়ো অবদান। প্রাচীন ঔপনিবেশিক বাণিজ্য ও পরিশোধপদ্ধতি অর্থনৈতিক সঙ্কট, যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক আলোড়ন এবং ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিদ্যমান মন্দার ফলে ধ্বসে পড়ে। অনিয়ন্ত্রণযোগ্য বাজার উঠানামার পরিপ্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক অর্থনীতি বৃটেন ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বার্থে সক্রিয় হওয়ায় যারা জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যায়নের উপায় অবলম্বন করেছে তাদের নাজুক অবস্থাটি প্রকট হয়ে উঠে। এই সময়ে অর্থকরী ফসলের একত্রিত বিন্যাসপ্রণালী ও বাজারের সাধারণ ঝোঁককে জীবনধারণের জন্য প্রধান শস্য চাউলের উৎপাদন ও বিপণন থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয় নি। অর্থ আয়ের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কেবল চাউলের কিয়দংশ খাদ্যবহির্ভূত বাণিজ্যিক শস্যের সাথে বাজারে যোগান দেওয়া হয় নি, এর সাথে উদ্বৃত্ত জমি, আপেক্ষিক ব্যয় ও মূল্য এবং সংশ্লিষ্ট ঋণকার্যক্রম এ নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, জীবিকা ও বাজার সংক্রান্ত বিষয়াদি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

জনসাধারণ, উৎপাদন ও দারিদ্র্য

১৯২১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় যে, বাংলার জনসংখ্যা ১৮৮১ সালে যে পর্যায়ে ছিল তার চাইতে ২৮.৬% বৃদ্ধি পায় এবং এই সময়ে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ০.৭%, যা বিগত চল্লিশ বছরে সর্বভারতীয় বৃদ্ধির চেয়ে কিছু বেশি ছিল এবং এই সময়ে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ০.৫%। বাংলায় ১৮৯১ সালে মোট জনসংখ্যার ৯৪% ও ১৯২১ সালে ৯৩% ছিল গ্রামীণ জনসংখ্যা। তা ২৭.৬% বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪.৭৭ থেকে ৪৪.৩৮ মিলিয়নে দাঁড়ায়।[২] যাহোক, এই মোট পরিমাণে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার অসঙ্গতি লক্ষণীয়। জনসংখ্যার এই ক্রমবৃদ্ধির জন্য পূর্ব বাংলাই প্রাথমিকভাবে দায়ী। মহামারি আকারে উপর্যুপরি ম্যালেরিয়ার প্রকোপে পশ্চিমাঞ্চলে জনসংখ্যাবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

১৯১৬ সালে সি. এ. বেন্টলি বলেন, পশ্চিম বাংলায় ১৮৬০ সাল থেকে সংক্রামক জ্বরের প্রকোপে পূর্ব বাংলার কোন কোন এলাকার মতো বর্ধমানেও স্বাস্থ্যকর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ে ব্যাপক আকারে ম্যালেরিয়া বিস্তারলাভ করে।[৩] এই অদ্ভুত জ্বরটি 'বর্ধমান জ্বর' নামে পরিচিতি লাভ করে এবং এই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে রোগীরা যেমন দুর্বল হতো, এর চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও তেমনি ব্যর্থ হতেন। যাহোক,

১ S. B Saul, *Studies in British Overseas Trade* (London 1970), 55-63.

২. Government of India, *Census of India* 1921, Vol. V, *Bengal*, Pt. 2, Tables; R.H. Cassen, *India. Population, Economy and Society*, (London 1978), Chapter 1.

৩. C A. Bentley, *Report on Malaria in Bengal*, (Calcutta 1916), 30-38.

১৮৩৬ সালে প্রথম যশোরে এই জ্বরের আবির্ভাব ঘটে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই জ্বর পুরনো পাললিক ভূমির প্রতি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৪৭-৪৮ ও ১৮৫৪-৫৬ সালে যশোর, ১৮৫৭-৬৪ ও ১৮৮০-৮১ সালে নদীয়া, ১৮৫৭-৬৪ ও ১৮৭৮ সালে হুগলী ও চব্বিশ পরগনা, ১৮৬৮-৭২ সালে বর্ধমান এবং ১৮৭০-৭২ সালে বীরভূম, মেদিনীপুর ও হাওড়ায় মারাত্মক মহামারিরূপে এই জ্বর দেখা দেয়। এমনকি, অঞ্চলবিশেষে সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমদিকে মাঝে মাঝে মহামারি আকারে এই জ্বর ছড়িয়ে পড়ে। পরিণামে ১৮৯০-এর দশকে ভারতের অন্যান্য এলাকায় দুর্ভিক্ষে মৃত্যু অথবা ১৯১৮-১৯ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জায় মৃত্যুজনিত ক্ষতির সাথে যদিও বাংলার ক্ষতি তুলনীয় নয়, তথাপি পশ্চিম বাংলায় পুনঃপুনঃ ম্যালেরিয়ার আক্রমণ নিশ্চিতভাবে প্রদেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধি কঠোরভাবে সংযত রাখে।

১৮৭০-এর দশকের প্রথমদিকে স্থানীয় কর্মকর্তারা বিশ্বাস করতেন যে, খাদ্য-শস্য উৎপাদনের উপর চাপ সৃষ্টিকারী জনসংখ্যার ম্যালথুসীয় হারে বৃদ্ধির ব্যাপারটি এখানে ঘটেছে, যদিও সাধারণ সাদৃশ্য ও কার্যকারণসূত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট সম্পর্ক চিহ্নিত করা তখন সম্ভব হয় নি।[৪] তবে এর সুস্পষ্ট ফল এই দাঁড়ায় যে, হ্রাসমান উর্বরতাবিশিষ্ট জমির উপর জনসংখ্যার চাপ নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায়। ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে বর্ধমান জেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৭০০ জনের অধিক থেকে ৫৫০ জনে হ্রাস পায়। ১৮৫০-এর দশকের শেষ থেকে ১৮৭০-এর দশকের শেষ নাগাদ হুগলীর জনসংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসে বলে অনুমান করা হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মেদিনীপুরের ম্যালেরিয়াকবলিত এলাকার জনসংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমে যায়। নদীয়া, যশোর, বর্ধমান, বীরভূম ও হুগলী জেলার নির্বাচিত গ্রামগুলিতে স্থানীয় অনুসন্ধানে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এসব অঞ্চলে মহামারির বছরগুলিতে জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ১৯২১ সাল থেকে ৫০ বছরের অধিক অতীতের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, বাংলার পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলের অধিকাংশ জেলায় গ্রামীণ জনসংখ্যা প্রায় স্থিব ছিল এবং এই সময়ে নদীয়া ও যশোরের জনসংখ্যা প্রকৃতপক্ষে ১০% কমে যায়।[৫]

যদি মানুষের হস্তক্ষেপজনিত দ্রুত পারিবেশিক অবনতির কারণে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে, তবে এর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়াগুলি কৃষিভিত্তিক সামাজিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৮৭৫ সালে ক্রমানুসারে দরিদ্র দিনমজুর, স্থায়ীভাবে বসবাসরত চাষী ও কারিগরদের মধ্যে মৃত্যুর হার ছিল সর্বোচ্চ। এক সমীক্ষা অনুযায়ী ১৮৭৪ সালে বীরভূমে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে ম্যালেরিয়াজনিত

৪. Burdwan Magistrate to Burdwan Commissioner, 7 March 1874, Bengal Gen. (Statistics, Head No.1) Progs , Sep 1875, Collection 4-7/8, উদ্ধৃত Binay Chaudhuri, "Agricultural Production in Bengal Co-existence of Decline and Growth", *Bengal Past and Present* (1969) , 156.

৫. Chaudhuri, "Agricultural Production", 160 ; GOI *Census of India* 1921, Vol. V. *Bengal,* pt 1, 48-55.

মৃত্যুর হার ছিল এমন : দিনমজুর ও ভিক্ষুকের মধ্যে মৃত্যুর হার ৩৭%, কৃষিজীবী রায়তের মধ্যে ৩১%, কর্মকার, কুমোর, ধোপা, স্বর্ণকার প্রভৃতি কারিগরদের মধ্যে ১৯% এবং অশ্রমজীবী উচ্চশ্রেণী, যেমন জমিদার, বণিক, যাজক ও কৃষকের মধ্যে ১২%।[৬] ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের ফলে কৃষিশ্রমিকের অভাব ঘটে এবং এর পরিণতিতে কৃষিভূমি অনাবাদি থাকে। ক্রমশ জঙ্গলবৃদ্ধির প্রভাবে আগুরি, সদগোপ, মাহিস্যা, বাগদী প্রভৃতি উপজাতির কৃষি-অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ এলাকার ভূমির নিঃশেষিত অবস্থা এবং ম্যালেরিয়া সংক্রমণের ফলে রোগাক্রান্ত হয়ে শ্রমিকদের মৃত্যুর কারণে পশ্চিম বাংলায় কৃষিকাজের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যশোর জেলার মাগুরা ও ঝিনাইদহ মহকুমায় ১৮৭৬ সালের এক জরিপে মোট জমির ৭৫% কৃষির অধীনে নিয়ে আসা হয় বলে জানা যায়: ১৯২০ সালের মধ্যে এ অনুপাত ৪০%-এর নীচে নেমে আসে। শ্রমিকের অভাব ছাড়াও ম্যালেরিয়াপীড়িত কৃষিজীবী মানুষ তাদের শারীরিক সামর্থ্য ও শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং জমিতে কঠোর পরিশ্রম করতে অক্ষম হয়ে পড়ে।[৭] জনসংখ্যা এবং মানুষের দৈহিক শক্তি হ্রাস পাওয়ার কারণেই ১৮৬০ ও ১৯২০ সালের মধ্যে পশ্চিম বাংলায় মোট উৎপাদনের পরিমাণ সম্ভবত হ্রাস পেয়েছিল। এই করুণ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে কেবল কতকগুলি ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির দরুন। ধীর ও নিশ্চিতভাবে সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে উদ্যোগী কৃষকদের অর্থ ও তদারকি এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের দৈহিক শ্রমের কল্যাণে এই এলাকায় চব্বিশ পরগনা, খুলনা ও মেদিনীপুরে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে ১৮৬০-এর দশকে মেদিনীপুরের কনটাই ও তমলুক মহকুমায় সরকারের একচেটিয়া লবণ ব্যবসা তুলে নেয়ার ফলে এই অঞ্চলটি ম্যালেরিয়ার কারণে পালিয়ে আসা মাহিস্যা কৃষকদের নিরাপদ স্বর্গে পরিণত হয়।

অপরদিকে পূর্ব বাংলায় উৎপাদনই ছিল স্বাভাবিক নিয়ম এবং উৎপাদন না হওয়া বা কম হওয়া ছিল নিয়মের ব্যতিক্রম। ১৮৬০ সালের আগে জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও কৃষির পুরনো ঝোঁক ষাট বছর ধরে বজায় ছিল এবং সেই ঝোঁক এই সময়কালের শেষেরদিকে কেবল ধীর গতিতে এবং ১৮৭৬ সালের বিরাট ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সংক্ষিপ্ত বিরতি দিয়ে চলতে থাকে। প্রায় জনবিরল ব-দ্বীপে যেহেতু জনসংখ্যা স্থির থাকে, সেহেতু জনঅধ্যুষিত ব-দ্বীপে এই জনসংখ্যা প্রায় ৬০% বৃদ্ধি পায়। সীমিত পরিমাণে এক অঞ্চলের লোক অন্য অঞ্চলে এবং এক জেলার লোক অন্য জেলায় চলে যাওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যুহারকে ছাড়িয়ে জন্মহার অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৯২১ সালের মধ্যে ঢাকা, ত্রিপুরা,

৬. GOB to GOI, 15 Sep. 1875, and Birbhum Collector to Burdwan Commissioner, 8 Jan. 1874, Bengal Gen. (Statistics, Head No 1) Progs., Sep. 1875, Collection, 4-13 cited in Chaudhuri, "Agricultural Production", 163.

৭. M. A Momen, *Jessore Settlement Report*, 1920-24. (1925), 20.

নোয়াখালী ও ফরিদপুরে প্রতি বর্গমাইলে ১০০-এর বেশি জনসংখ্যার ঘনত্ব দেখা যায় এবং বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, পাবনা ও বগুড়া এদের প্রায় কাছাকাছি চলে আসে। উনিশ শতকের শেষদিকে এই অঞ্চলের অনেকাংশে পুরোপুরি ঘাটতি জনসংখ্যা আপেক্ষিক ঘাটতি জনসংখ্যায় পরিণত হয়। সক্রিয় ব-দ্বীপে মুসলমান ও নমশূদ্র কৃষকদের মধ্যে চাষবাসের কাজ ছিল মোটামুটিভাবে অতি ক্ষুদ্র আকারের এবং এটি সাম্প্রদায়িক প্রকৃতির ছিল না। যে বাখরগঞ্জ জেলায় কৃষকরা কোন ভবিষ্যৎ গ্রামীণ সমাজের কথা না ভেবেই সার্বিকভাবে বসতিস্থাপন করেছিল[৮], সেই জেলায় ১৮০ বর্গমাইল নতুন পাললিক ভূমি জেগে উঠা সত্ত্বেও 'অনধ্যুষিত জনশূন্য এলাকা' ১৮৬০-এর দশকের প্রথমদিকে ৫২৬ বর্গমাইল থেকে ১৯৪৫ সালে ১৮৪ বর্গমাইলে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। আবাদকৃত এলাকায় চাষের জমির আয়তন ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।[৯] ময়মনসিংহ জেলায় ১৮৭২ ও ১৯১০ সালের মধ্যে কৃষিজমির আয়তন ৩৫৬২ বর্গমাইল থেকে ৪২৯২ বর্গমাইলে বৃদ্ধি পায় এবং এই কৃষিজমির মধ্যে ঢাকা জেলার মধুপুর জঙ্গলের শক্ত মাটির ৪৭০ বর্গমাইল এলাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। চাষবাস ব্যাপকভাবে এবং পূর্ণমাত্রায় বিস্তৃতিলাভ করে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে অধিকাংশ পূর্ববঙ্গীয় জেলায় প্রায় সকল চাষযোগ্য জমিতে চলতি প্রযুক্তির ভিত্তিতে কৃষিকাজ চলতে থাকে। নোয়াখালী জেলার চাষযোগ্য প্রতি ইঞ্চি জমিতে ফসল ও ফলের গাছের চাষ হতে থাকে। দ্রুত বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্য কাজের সংস্থান করতে আরো বিপুল জমির প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করে ঢাকার ভূমিপ্রশাসন অফিসার বিস্মিত হন।[১০]

জনসংখ্যার প্রবল চাপ দ্রুত অনুভূত হতো যদি না দু'টি কারণে জনসংখ্যা হ্রাস পেতো : প্রথমত আংশিক উচ্চমূল্য ও প্রচণ্ড শ্রমভিত্তিক অর্থকরী ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে ব্যাপক মাত্রায় শোষণ এবং দ্বিতীয়ত বসতিস্থাপনের জন্য বিশেষকরে নিকটবর্তী আসাম প্রদেশে ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যাসমভূমির দিকে জনগণের অভিগমন। ১৯২০ সালের দিকে পূর্ব বাংলার নীট ফসলি জমির ৩৪ শতাংশ ছিল দ্বি-ফসলি জমি, পশ্চিম বাংলায় অনুরূপ দ্বি-ফসলি জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ১৮ শতাংশ। অধিকন্তু সাধারণত দ্বিতীয় ফসলের মূল্য পূর্ব বাংলায় ছিল অনেক বেশি। যদিও ১৮৭০-এর দশকের গোড়া থেকেই পাট অর্থকরী ফসল হিসেবে গুরুত্ব অর্জন করে, তবে ১৯০৬-০৭ সালে পাটচাষের ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা যায়। তখন থেকে পূর্ব বাংলার সাতটি বৃহৎ পাট উৎপাদনকারী জেলায়

৮. J E. Gastrell, *Geographical and Statistical Report on the Districts of Jessore, Fureedpore and Backergunje,* (Calcutta 1868), উদ্ধৃত Ralph Nicholas, 'Villages of the Bengal Delta" (Unpublished D Phil dissertation, Chicago 1962), 67

৯. J C Jack *Bakarganj Settlement Report,* 1900-08 (1915), 10-11, On expansion of cultivation in Faridpur, দেখুন, J C. Jack, *Faridpur Settlement Report, 1904*-14 (1916), 5

১০. *Mymensingh District Gazetteer* (1919), 48 , F. A Sachse, *Mymensingh Settlement Report, 1908-19* (1919), 29, W H Thompson, *Noakhali Settlement Report. 1915-19* (1919), উদ্ধৃত Ganguli, *Trends of Agriculture,* 239 , F D. Ascoli, *Dacca Settlement Report, 1910-17* (1917) , 50.

চাষযোগ্য ১০ থেকে ২২ শতাংশ জমি পাটচাষের আওতায় আনা হয়।[১১] উনিশ শতকের শেষ নাগাদ জনতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলায় বাণিজ্যায়ন প্রক্রিয়ার গতি ও চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে পশ্চিম বাংলায় পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটে নি। এই শতকের প্রথম তিন দশকে পূর্ব বাংলার অতি জনাকীর্ণ জেলাগুলি থেকে আসামে পাটের জমির সন্ধানে প্রায় দশ লক্ষ কৃষকের অভিগমন ছিল একটি আনুষঙ্গিক ঘটনা।[১২] এই অভিগমন ছিল জাভা থেকে সুমাত্রায় কিংবা উত্তর ভিয়েতনাম থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে জনগণের অভিগমনের অনুরূপ। সাধারণত সেসব লোকের জন্য এটি ছিল একটি কষ্টকর পথপরিক্রমা, যারা পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার তীরে একখণ্ড ভূমির জন্য হন্যে হয়ে উঠতো।

উত্তর বাংলার সীমান্তগুলিতে উৎপাদনের যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠে সেটি পশ্চিম ও পূর্ব বাংলা থেকে এত স্পষ্টভাবে পৃথক যে, এই এলাকার মানুষের অন্যত্র গমনের চিত্র পৃথকভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। পুরনো পাললিক ভূমি তথা পশ্চিম দিনাজপুরের পশ্চিম প্রান্তের জন্ম ও মৃত্যুহারের প্রকৃতির সাথে পশ্চিম ও মধ্য বাংলার জন্ম ও মৃত্যুহারের প্রকৃতির মোটামুটি সাদৃশ্য রয়েছে। তিস্তা ও যমুনা দ্বারা সৃষ্ট উত্তর বাংলার জনঅধ্যুষিত ব-দ্বীপের পূর্ব অংশে (উদাহরণস্বরূপ পূর্ব রংপুর) এবং পূর্ব বাংলার অনুরূপ এলাকাগুলিতে জনসংখ্যার সঞ্চরণপ্রবণতার ক্ষেত্রেও একই সত্য বিদ্যমান ছিল। যাই হোক, ১৮৬০ ও ১৯২০ সালের মধ্যে বিহার থেকে অধিকাংশ সাঁওতাল, ওরাওঁ এবং মুন্ডা উপজাতীয় শ্রমিকদের অভিবাসন উত্তর বাংলার পশ্চিম অঞ্চলের জনসংখ্যাকে স্ফীত করে তোলে। ১৮৫৫ সালের উপজাতিক বিদ্রোহ দমনের পর এই অভিবাসনপ্রক্রিয়া দ্রুততর হয়ে উনিশ শতকের একেবারে শেষে গিয়ে প্রবল গতিবেগ লাভ করে।[১৩] এই সকল এলাকার জঙ্গল পরিষ্কারে উপজাতীয় শ্রমিকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং-এর চা-বাগানগুলিতেও প্রচুর পরিমাণে অভিবাসী শ্রমিক নিয়োগ করা হয় এবং এরা ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতির ক্ষতিপূরণের জন্য যথেষ্ট ছিল। ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে উল্লেখ করা হয় যে, এক দশকে জলপাইগুড়ির অভিবাসীর সংখ্যা ব্যাপকহারে অর্থাৎ ১৪৩৯২২ থেকে ১৮৮২২৩-এ বৃদ্ধি পায় এবং এই অভিবাসীদের প্রায় অর্ধাংশ ছিল ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনার চা-বাগানের কুলি। ১৯১১ সালে জলপাইগুড়িতে অবস্থানরত ১২৬২১৪ জন অভিবাসীর জন্ম বিহারের রাঁচী জেলায় এবং ১৯২১ সালে শ্রমিকদের মধ্যে অসংখ্য ওরাওঁ এবং মুন্ডা ছিল বলে জানা যায়।[১৪]

১১. Ganguli, *Trends of Agriculture,* 244 , M Azizul Huque, *The Man behind the Plough* (Calcutta 1939), 59

১২. GOI, *Census of India 1921,* Vol V, *Bengal,* pt 1, 32 - 33; Md. Abdul Hamid, *Pater Kabita* (verses on Jute, Juriya, Assam 1930)

১৩. Chaudhuri, " Agricultural Production", 172-3

১৪. C. A Bentley and S R Christophers, *The Causes of Blackwater Fever in the Duars* (Simla 1908), 22-5; GOI, *Census of India* 1921, Vol V, Bengal, pt. 1, 389.

বাংলায় ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কালকে মাথাপিছু উৎপাদনহ্রাসের পর্যায় বলে গণ্য করা হয়। পূর্ব বাংলায় বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার বিরামহীন অভিবাসন-প্রবণতায় দুই শতকের অধিক সময়কালব্যাপী জনসংখ্যাবৃদ্ধির কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯২০ সালের পর পশ্চিম বাংলায় মৃত্যুহারের নাটকীয় হ্রাসের ফলে এলাকাটি প্রদেশের বাকি অংশের জনসংখ্যাবৃদ্ধির সাথে আরো সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থায় চলে আসে। বর্তমানে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় গ্রামীণ জনসংখ্যাবৃদ্ধির আন্তশুমারি হারে উক্ত প্রবণতার মোটামুটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

গ্রামীণ জনসংখ্যার আন্তশুমারি বার্ষিক বৃদ্ধির হার[১৫]

অঞ্চল	১৯২১-৩১	১৯৩১-৪১	১৯৪১-৫১
পশ্চিম বাংলা	০.৭২%	১.৪৭%	০.৭৯%
পূর্ব বাংলা	০.৫৪%	১.৫৭%	-০.০৭%

১৯২০-এর দশকের গোড়া থেকে সারা বঙ্গদেশ জুড়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং ১৯৩০-এর দশকে এই বৃদ্ধির গতি তীব্র রূপ ধারণ করে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে ব্যাপক হারে মৃত্যুর ফলে ১৯৪০-এর দশকে এই গতি হঠাৎ থেমে যায়। ১৯৪৩ ও ১৯৪৬ সালের মধ্যে অন্ততপক্ষে ২.৭ থেকে ৩ মিলিয়ন অতিরিক্ত মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল এই দুর্ভিক্ষ।[১৬] ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে যে মৃত্যুর সংখ্যা দেখা যায় তার চাইতে বরং ১৯৪১-৪২ সালের গড় মৃত্যুর সংখ্যাকে যদি স্বাভাবিক মৃত্যুর সংখ্যা বলে গ্রহণ করা হয়, তবে দুর্ভিক্ষের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ৩.৫ থেকে ৩.৮ মিলিয়ন বৃদ্ধি পায়।[১৭] দুর্ভিক্ষের প্রকোপে উচ্চহারে মৃত্যু অঞ্চল ও শ্রেণীভেদে এক রকম ছিল না। ভূমিহীন দরিদ্র শ্রেণীই ব্যাপক হারে এই আকালের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিল।

এ পর্যায়ে উৎপাদন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রযুক্তিকৌশল উদ্ভাবনের জন্য জনসংখ্যাতাত্ত্বিক উদ্যোগ সুস্পষ্টরূপে সফল হতে পারে নি। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বোচ্চ আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী ১৯২০ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে মোট কৃষিউৎপাদন বার্ষিক মাত্র ০.৩% বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন স্থির থাকে। এই সময়ে জনসংখ্যা বার্ষিক ৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। গ্রামীণ পশ্চিম বাংলার হৃদয় হিসেবে পরিচিত বর্ধমান বিভাগে প্রকৃতপক্ষে ১.০ শতাংশ নেতিবাচক উৎপাদনহার দেখা যায়। প্রেসিডেন্সি বিভাগে অপেক্ষাকৃত বেশি উৎপাদনবৃদ্ধির হার ১.১ শতাংশ সম্ভবত খুলনার সুন্দরবন এলাকা ও

১৫. Boyce, *Agrarian Impasse*, 139-40

১৬. Sen, *Poverty and Famines*, 195-216

১৭. Paul Greenough, *Prosperity and Misery in Modern Bengal . the Famine of 1943-44*, (New York 1982), 299-315.

চব্বিশ পরগনায় অনাবাদি জমি আবাদের ফল। পূর্ব বাংলার ঢাকা বিভাগে বার্ষিক উৎপাদন ০.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ০.৭ শতাংশ হারে উৎপাদন হ্রাস পায়। উত্তর বাংলার জেলাসমূহ নিয়ে গঠিত রাজশাহী বিভাগের উৎপাদন বার্ষিক ০.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়।[১৮] অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মোটামুটি উৎপাদনশীল কৃষিএলাকাগুলিতেও মাথাপিছু উৎপাদন হ্রাস পায়।

ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ এবং পণ্যউৎপাদন

১৮৫০-এর দশক থেকে ১৯৪০-এর দশকের মধ্যে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো ও প্রবণতাকে কেবল পুঁজিবাদী বিশ্বঅর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকেই অর্থপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ১৮৫৪ সালে রেলপথে বৃটিশ পুঁজি বিনিয়োগ শুরু হওয়ায় ভারতে দ্রব্যমূল্য ও মজুরির বৃদ্ধিজনিত চাপ পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব ভারতের কৃষিঅর্থনীতির একটি ক্ষুদ্র অংশ মজুরিশ্রমিকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে এবং এর ফলেই মূল্যবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, যার প্রবল চাপ অধিকাংশ ক্ষুদ্র ভূমিচাষীদের উপর পড়ে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৪-৫৬) শুরু হওয়ার পর রাশিয়া থেকে ফ্লাক্স ও হেসের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং নতুন করে বাংলার পাটের চাহিদা সৃষ্টি হয়। বাংলার পাটরপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য ১৮৩৯-৪০ সালে ১১১২১৮ মণ ও ১,৫২,৯২৪ টাকা থেকে ১৮৫৫-৫৬ সালে ১১৯৪৪৭০ মণ ও ৩২,৭৪,৭৬৮ টাকায় বৃদ্ধি পায়।[১৯] ইউরোপ ও চীনের বাজারে চাউলের চাহিদা সৃষ্টিতে এবং পাট ও তৈলবীজের জমি ধানের জমি হিসেবে ব্যবহারের ফলে ১৮৫৫ সালের প্রথমদিকে চাউলের মূল্যে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব অনুভূত হয়। ১৮৫৫ ও ১৮৬০ সালের মধ্যে বাংলার জেলাগুলিতে চাউলের মূল্য স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পায় (পরের পৃষ্ঠায় সারণি দ্রষ্টব্য)। যখন বিদেশী মূলধনের অন্তঃপ্রবাহ এবং বিদেশের বাজারে চাহিদার ফলে ১৮৫৪ ও ১৮৫৭ সালের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধির কারণ ঘটে, তখন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ শুরুর পর মুদ্রাস্ফীতিপ্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান হিসেবে দেশে বিচ্ছিন্নতা ও দুষ্প্রাপ্যতা জেঁকে বসে। পণ্যদ্রব্য ও খাদ্যশস্যের স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ অলাভজনক নীলজাতীয় শস্যের বাধ্যতামূলক চাষের বিরুদ্ধে কৃষকদের পক্ষ থেকে আগের চাইতে প্রবলতর বাধা আসে। কৃষকেরা স্থানীয় ঋণদাতা জমিদারদের কাছ থেকে মূল কৌশলগত সমর্থন লাভ করে এবং ধানচাষের ক্ষেত্রে আরো বেশি লাভের সম্ভাবনা দেখতে পায়। কৃষকদের কাছে অনেক দিন ধরে ইউরোপীয় নীলচাষীরা ঘৃণার পাত্র ছিল। তাই তৎকালীন গ্রাম্য লোকগীতিতে বলা হতো, ওরা (ইউরোপীয় নীলচাষীরা) সুঁইয়ের মতো প্রবেশ করে, কিন্তু লাঙ্গলের ফলা হয়ে বেরিয়ে যায়। ইউরোপীয় নীলচাষীরা বাংলায় আর পেরে উঠে নি। কিন্তু তারা অন্য

১৮. Islam, *Bengal Agriculture*, 50-6.

১৯. *The Hindoo Patriot*, 25 December 1857.

সময়ে পার্শ্ববর্তী বিহারে তৎপরতা চালাবার জন্য পুনরায় দলবদ্ধ হয়। বাজারের জন্য শোষণমূলক উৎপাদনপ্রক্রিয়াকে অকেজো করে দেয়ার পদক্ষেপ কৃষক-শ্রমজীবীদের জীবিকার সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। বাজার এবং জীবিকার মধ্যেকার তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগে যে বিষয়টি নিশ্চিত হয় তা হলো, ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক অর্থনীতির নয়া কাঠামোতে ঋণদানকারী জমিদার ও ব্যবসায়ীদেরকে উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে নতুন বাণিজ্যায়নের পর্যায়ে কৃষক-উদ্বৃত্ত সৃষ্টির প্রধান দাবিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে হয়। পাট ছিল তখন একটি প্রধান পণ্য।

বাংলার জেলাগুলিতে প্রতি মণ ধানের মূল্য

জেলা	১৮৫৫	১৮৬০
যশোহর	১০ আনা	১ টাকা ৪ পয়সা
বর্ধমান	১০ আনা	১ টাকা ৭ আনা ৬ পয়সা
নদীয়া (শান্তিপুর)	১০ আনা	১ টাকা ৬ আনা
নদীয়া (কৃষ্ণনগর)	১০আনা ৬ পয়সা	১ টাকা ৪ আনা ৬ পয়সা
২৪পরগনা (বারাসাত)	১২ আনা	১ টাকা ১০ আনা
হুগলী	১ টাকা	২ টাকা ২ আনা

উৎস : *নীল কমিশন রিপোর্ট*, পরিশিষ্ট ৩।

এক সময়ে ইউরোপীয় বাজারে বিক্রীত আঁশ 'ভারতীয় পাট থেকে পাওয়া যেতো'। যদিও ১৮৩৮ সালে কফির বস্তা তৈরিতে পাট ব্যবহারের জন্য নেদারল্যান্ড সরকারের সিদ্ধান্তে এই পণ্যটিকে উচ্চমর্যাদা প্রদান করা হয়, প্রকৃতপক্ষে ক্রিমিয়ার যুদ্ধকালে পাট সম্পর্কে পূর্বেকার সংস্কার ও ধারণা অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে। অতি নিম্নপর্যায় থেকে পাটরপ্তানির পরিমাণ ১৮৩৮-৪৩ ও ১৮৬৮-৭৩ সালের মধ্যে চল্লিশ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৮৬০-এর দশকে কাঁচা পাটের রপ্তানিমূল্য ৪.১ মিলিয়ন থেকে ২০.৫ মিলিয়নে বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধি অবশ্য ১৮৭২-৭৩ সালের অর্থনৈতিক মন্দা চলাকালে বিশ্ববাজারে প্রথমবারের মতো কাঁচা পাটের মূল্যের ব্যাপক পৌনঃপুনিক নিম্নমুখী উঠানামার পূর্বে সংঘটিত হয় এবং এই মন্দার সময়ে কাঁচা পাটের মূল্য কোন কোন জায়গায় প্রায় অর্ধেক কমিয়ে আনা হয়।[২০] ১৮৭৩-৭৪ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষাবস্থার কারণে প্রাথমিক উৎপাদকরা

২০. Hem Chandra Kar, *Report on the Cultivation of and Trade in Jute* (Calcutta 1877); Binay Bhushan Chaudhuri, "Growth of Commercial Agriculture in Bengal: 1859-1885', *Indian Economic and Social History Review* (hereafter IESHR), Vol VII, No. 2 (1970), 240-1. Chaudhuri, "Foreign Trade", Kumar (ed.), *Cambridge Economic History*, Vol II, 851-2.

পাট থেকে ধান উৎপাদনে পুনরায় ফিরে আসতে প্রলুব্ধ হয়। উনিশ শতকের শেষপাদে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শস্যের ব্যবসা বিস্তৃতিলাভ করায় কাঁচা পাট উৎপাদনের উপযোগী জমি সৃষ্টি এবং পূর্ব ভারতে পাটকল প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেশ উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। ১৮৭০-এর দশকে বাংলা থেকে দুর্ভিক্ষকবলিত বোম্বে ও মাদ্রাজের এলাকাগুলিতে শস্যরপ্তানি করার জন্য প্রয়োজনীয় পাটজাত থলির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটখাতকে ১৮৭৩-৭৪ সালের চরম অবনতির পর্যায় থেকে তুলে আনার ব্যাপারে প্রভূত সহায়তা পাওয়া যায়।

পরবর্তী তিন দশক পর্যন্ত বাংলার পাট-অর্থনীতি স্বল্পকাল স্থায়ী মূল্যবৃদ্ধি ও কৃষিজমি সম্প্রসারণের নীতি অনুসরণ করে, যার ফলে অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। পাটচাষীদের উচ্চ আয় ও আশাবাদ ১৮৮২-৮৩ সালের শেষ পর্যায়ে ক্ষতি ও নিরাশায় পর্যবসিত হয় এবং এই সময়ে পাশ্চাত্যের বাজারে পাটের চাহিদা অপ্রত্যাশিতভাবে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ১৮৮০-এর দশকের শেষের দিকে আরেকটি সম্প্রসারণপর্যায় চরম পরিণতি লাভ করে। জেলায় জেলায় চাষের জমি সম্প্রসারিত হয় এবং সেগুলিতে আগে থেকেই পাটচাষের ব্যবস্থা ছিল। তবে এই সময়ে পাটের চাষ নোয়াখালীর মতো নতুন জেলাগুলিতে বিস্তারলাভ করে এবং তখন পর্যন্ত এসব জেলায় পাটের চাষ অজানা ছিল। কিন্তু ১৮৯০-৯১ সালের সঙ্কটকালে পাটের মূল্য প্রায় অর্ধেক কমে গেলে বিভিন্ন জেলা, যেমন দিনাজপুর, ত্রিপুরা ও পূর্ণিয়ায় পাটের এক বিরাট অংশ মাঠে পঁচতে দেখা যায়।[২১] ১৯০৬ সালে বাংলার পাট সবচেয়ে প্রবল ও স্থায়ী ক্রয়বিক্রয়পর্যায়ে প্রবেশ করে এবং এ অবস্থা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত চলে। ১৯০৭ সালে পাটচাষের জমির পরিমাণ ৩.৮৮ মিলিয়ন একর পর্যন্ত পৌঁছে।[২২] এর পরে কৃষকরা যদিও আপেক্ষিক মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাট ও শরৎকালীন ধানচাষের মধ্যে স্বল্পকাল অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে, তথাপি পাটচাষের জমির দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধির কোন ঝোঁক পরিলক্ষিত হয় নি। যাই হোক, ১৯৩০ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কা না লাগা পর্যন্ত বাংলার পাটের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে একটি দীর্ঘমেয়াদি মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা চলতে থাকে।

সম্পূর্ণরূপে পৃথক সামাজিক কাঠামোর আওতায় একটি প্রধান বাণিজ্যিক শস্য হিসেবে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের ঢালুতে চা উৎপাদনের প্রসারকে পূর্ব বাংলার নদী-অববাহিকাগুলিতে পাটচাষের প্রসারের সাথে মোটামুটি একই পর্যায়ের বলে গণ্য করা যেতে পারে। ১৮৫০ সালে দার্জিলিং-এ প্রথম চা-বাগানের উদ্বোধন করা হয় এবং ১৮৭৪ সালে জলপাইগুড়ি জেলায় পশ্চিম দুয়ার বলে পরিচিত পাহাড়ের ঢালু এলাকায় প্রথম চা-

২১. Chaudhuri, "Commercial Agriculture . 1859-85", IESHR , VII, 2(1970), 244.

২২. Rajat Ray. "'The Crisis of Bengal Agriculture— Dynamics of Immobility", IESHR. X, 3(1973) 261-2

বাগান তৈরি করা হয়। যদিও এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ দুয়ারসমূহে চা-বাগানের সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৩৫টিতে উন্নীত হওয়ার পর ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে, তথাপি ১৯৩০ সাল পর্যন্ত চা-চাষের জমি ও শ্রমিকশক্তির আয়তন ক্রমাগত বাড়তে থাকে (পরের পৃষ্ঠার সারণি দেখুন)। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রটি ইউরোপীয় চাষীদের কাছে অনুকূল শর্তে অনুদান হিসেবে চা-চাষের জন্য ভূমি সহজলভ্য করে তোলার মাধ্যমে চা-চাষের প্রাথমিক বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করে। ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে চা-এর রপ্তানিমূল্য ঘটনাক্রমে কাঁচা পাটের রপ্তানিমূল্যকে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু জীবনধারণের জন্য কৃষিবাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল উৎপাদকদের সংখ্যার নিরিখে পাটই এই এলাকায় জীবনধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রধান শস্য থেকে যায়।

জলপাইগুড়ির দুয়ারসমূহে চা-চাষের পরিমাণ[২৩]

সন	চা-বাগান	চাষের মোট জমি	স্থায়ী শ্রমিক	অস্থায়ী শ্রমিক	মোট শ্রমিক
১৯০১	২৩৫	৭৬৪০৩ একর	৪৭৩৬৫	২১২৫৪	৬৮৬১৯
১৯১১	১৯১	৯০৮৫৯	৫৬৬৯৩	১৮৬২২	৭৫৩১৫
১৯২১	১৩১	১১২৬৮৮	৮৬৬৯৩	১৮৭১	৮৮৫৬৪
১৯৩১	১৫১	১৩২০৭৪	১১২৫৯১	৪২৬২	১১৬৮৫৩

কৃষি এবং ক্ষুদ্র জোতের বাণিজ্যায়নপ্রক্রিয়ার সাথে কৃষকের জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার একটি নিকট-সম্পর্ক রয়েছে। গ্রামের প্রচণ্ড দারিদ্র্য উপজাতীয় শ্রমিককে তাদের স্বাভাবিক আবাসভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং সর্দারদের করুণার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে তোলে। এসব সর্দারি তাদেরকে চা-চাষের জন্য নিয়োগ করতো।[২৪] উচ্চ আয়ের জন্য এ ফসলের উৎপাদনবৃদ্ধি ক্ষুদ্র জোতজমির মালিকদের কাছে চাল উৎপাদন করার চাইতে অধিক কাম্য হয়ে উঠে। একেই তারা উনিশ শতকের প্রথমদিকে জীবিকার নিশ্চয়তা লাভের জন্য উত্তম ঝুঁকি বলে মনে করে।[২৫] ১৯৩০ সালে পাটউৎপাদনকারী জেলাগুলির প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা এক একর জমি কিংবা তার চেয়ে কম পরিমাণ জমির উপর জীবিকা নির্বাহ করতো এবং তাদের খাদ্যের অভাব পূরণ ও তাদের খাজনা আদায়ের উপায় হিসেবে পাটচাষের উপর নির্ভর করতো।[২৬] ১৯৩৭ সালে

২৩. A. Mitra, *Census of India*, 1951, Vol VI, part 1A (Calcutta 1953), 263, cited in Sharif Bhowmick, *Class Formation in the Plantation System*, (Delhi 1981), 53.

২৪. Bhowmick, *Class Formation*, 43-52.

২৫. Sugata Bose, *Agrarian Bengal : Economy, Social Structure and Politics, 1919-1947*, (Cambridge 1986), 46-58.

২৬. *Report of the Land Revenue Administration in Bengal, 1930-31*, (Calcutta annual), 5.

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটির সংগৃহীত তথ্য থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, পাটউৎপাদনকারী পরিবারগুলির ৮০ ভাগই ৩০ মণ তথা প্রায় ২ একর জমির পাটের চাইতে কম পাট উৎপাদন করে।[২৭]

যে কৌশল পাটকে গ্রাম থেকে কলকাতার নিকটবর্তী ডক ও কলগুলিতে নিয়ে আসে, তা রপ্তানি ও প্রস্তুতকারক পক্ষ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রক্রিয়ায় পরিকল্পিত ও পরিমার্জিত হয় এবং বিশ্ববাজার উঠানামার জরুরি অবস্থা অনুযায়ী সময় সময় পুনর্বিন্যস্ত হয়। উৎপাদন এবং ঋণবাজারের সংযোগের মাত্রা বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়। ১৮৫৫ সালে হুগলী নদীর তীরে প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদনপ্রবণতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ১৯২০-এর দশকের শেষ ও ১৯৩০-এর দশকের প্রথম দিককার চিত্র থেকে দেখা যায় যে, উৎপাদিত কাঁচা পাটের ৫০%-এরও বেশি পাটকলগুলিতে চলে যায়।[২৮] পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রাধান্য পশ্চিম ভারতীয় তুলা উৎপাদনের তুলনায় ব্যাপক ছিল। এটি বৃটিশ আমলাবর্গের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা না পেলেও পরোক্ষ সহযোগিতা পায়। তবে ভারতীয় পুঁজিপতিরা দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু প্রবেশাধিকার লাভের পথ উন্মুক্ত করে।[২৯] এছাড়া মফস্বল শহরে কতিপয় ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের শাখা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় দালাল, বাঙালি ও মাড়ওয়ারিদের জোট প্রাথমিক উৎপাদনকারীদের সাথে চূড়ান্ত ক্রেতাদের সংযোগ সাধন করে।

পাটবাজারের কাঠামো সম্পর্কিত অধিকাংশ সমীক্ষা থেকে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা হলো, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কৃষিউৎপাদনকারীরা একতাবদ্ধভাবে নিজেদের স্বার্থ অর্জনের বেলায় অধিকতর সংগঠিত ব্যবসায়ী ও উৎপাদকদের তুলনায় অনেক অসুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। উৎপাদনবাজারের গ্রন্থিল অবস্থা থেকে উৎসারিত প্রতিকূলতাকে কৃষিঅর্থনীতিতে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনকাঠামো এবং প্রক্রিয়ার সাথে দৃঢ়সংলগ্ন প্রতিকূলতা থেকে পৃথক করে দেখানো অবশ্য প্রয়োজন। পরবর্তী দু'টি অধ্যায়ে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উনিশ শতকের শেষদিকে স্বল্পমূল্যে শস্য পাওয়ার জন্য আগাম প্রদানের নিয়মটি খুব প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় না। ১৮৭৩ সালের বাংলা পাট কমিশন পাটচাষী ও ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে জানায় যে, সাধারণত আগামের জন্য চাহিদা ছিল না। অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, অবস্থাটি ছিল ঐ রকমই, কেননা পাটচাষীর সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত কম, প্রাথমিক আনুষঙ্গিক খরচাদি ছিল অল্প এবং কৃষকেরা শ্রম, বীজ ও সার নিজেরাই সরবরাহ

২৭. Cited in Omkar Goswami, "The Peasant Economy of East and North Bengal in the 1930s", IESHR 21. 3 (1984), 357-8.

২৮. *Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30*, Vol. I, 104-5; *Report of the Bengal Jute Enquiry (Finlow) Committee 1934*, 157.

২৯. Amiya Bagchi, *Private Investment in India* (Cambridge 1969).

করতো।[৩০] অপ্রত্যাশিতভাবে যখন মূল্য হ্রাস পায়, তখন কৃষকরা অনেক সময় পাট না কেটে মাঠেই রেখে দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে পাটক্রেতারা সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল থাকায় এবং চাহিদার পরিমাণ পূর্বাহ্নে জানতে না পারার কারণে তাদের কর্মকাণ্ডে নানা বাধার সম্মুখীন হতো। ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় পাটকল সমিতি যদিও স্বল্পকালীন কাজের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাথমিকভাবে কিছুটা সাফল্য অর্জন করে, তথাপি ১৮৯৫ ও ১৯০১ সালে তারা যে মূল্যনির্ধারণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল তা নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯০৬ সালে পাটচাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে পাটের বিপণনপদ্ধতি ও শ্রেণীবিভাগে একটি গুণগত পরিবর্তন দেখা যায়। ঝুঁকি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উৎপাদন-কারী ও রপ্তানিকারকগণ কৃষিউৎপাদন ও ব্যবসায়ে অর্থসংস্থানে গভীরভাবে জড়িত থেকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের চাইতে অনেক কম মূল্যে কাঁচামালের নিশ্চিত সরবরাহ বজায় রাখার চেষ্টা করতো। বৈদেশিক অর্থ এবং বাণিজ্যিক মূলধনের বার্ষিক অন্তর্প্রবাহ কেবল বাংলার বাণিজ্যিক কৃষিতেই একটি জটিল ব্যাপার হয়ে উঠে নি, সার্বিকভাবে শুধু বাংলার কৃষিঅর্থনীতিতে নয়, সামগ্রিক অর্থনীতিতে নানা জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। গ্রামীণ এলাকায় যে সুদী মূলধনের প্রচলন ছিল, তা বিশ্বের বাণিজ্যবাজারে আস্থা অর্জন করে হালে পানি পেয়েছিল। কুসিদজীবীদের অনেকেই ছিল ঋণদাতা জমিদার। যদিও তারা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনবাজারের সাথে জড়িত ছিল না এবং দাদন ও আগামপ্রদানকারী ব্যবসায়ীদের থেকে পৃথক ছিল, তথাপি বাজারগুলিকে ১৯০৬ এবং ১৯২৯ সালের মধ্যে রীতিবহির্ভূত উপায়ে হলেও কার্যকরভাবে সমন্বিত করা হয়। তখন পাউন্ড-টাকা বিনিময়হার ব্যবহার কিংবা ঋণগ্রহণ কার্যাবলীর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সরকারের মুদ্রা এবং ঋণবিষয়ক হস্তক্ষেপ রাষ্ট্র ও বাজারের মধ্যে সংযোগ সাধন করে।

যেসকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ফড়িয়া কিংবা বেপারি নামে পরিচিত, তারা চাষীদের বাড়ি কিংবা গ্রাম থেকে পাট সংগ্রহ করতো এবং বিশ শতকের প্রথমদিকে তারা মধ্যস্বত্বভোগী পর্যায়ের অন্যান্য কমিশনএজেন্টের চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিল না। এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীটি আবার চূড়ান্ত ক্রেতা-কোম্পানিগুলির কাছ থেকে অর্থগ্রাহকরূপে অবস্থান করতো। জেলাসমূহে বেইলার ও আড়তদার কিংবা গুদামরক্ষকের দালালরাই সাধারণত ব্যবসাকেন্দ্রগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে চিহ্নিত ছিল। ত্রিপুরা থেকে প্রাপ্ত ১৯২৬ সালের রিপোর্টে দেখা যায়, পাট ফসলের জন্য অর্থসংস্থানে বিরাট অঙ্কের মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং বেপারি, আড়তদার ও দালালরাই আংশিক মূলধন সরবরাহ করতো; কিন্তু মূলধনের বিরাট অংশ প্রদান করতো ক্রেতা-কোম্পানিগুলি, যারা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করতো।[৩১] সুদের হার ২৪ ও ৭৫ শতাংশের মধ্যে উঠানামা করতো এবং

৩০. Cited in Chaudhuri, "Commercial Agriculture : 1859-85", 228.

৩১. Collector of Tippera to Registrar of Cooperative Societies in *Report on the Marketing of Agricultural Produce in Bengal 1926,* (Calcutta 1928)

অনুরূপভাবে ঋণগ্রাহকরা বাজারদরের নীচে ১০% থেকে ২৫% পর্যন্ত কম মূল্যে পাট সরবরাহের ঝুঁকি গ্রহণ করতো। ১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে মধ্যস্বত্বভোগীর কমিশন অন্তত ২০% হ্রাস পায় বলে অনুমান করা হয়, যা প্রাথমিক উৎপাদকরা অন্যভাবে বাগিয়ে নিতে পারতো। জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, তথাপি ভারতীয়রা যেরকম অভিযোগ করে সেভাবে কৃষকরা প্রাথমিকভাবে বহুসংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগীর হস্তক্ষেপের কারণে ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয় নি, বরং বঞ্চিত হয়েছে প্রধানত পাটের ইউরোপীয় ক্রেতারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কারণে।[৩২] ক্রেতাদের মধ্যে কিছু কিছু বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ক্রেতাদের আর্থিক ও সাংগঠনিক শক্তি এবং উৎপাদকদের ভূসম্পত্তি ইজারা বা পাট্টা নেয়ার অক্ষমতার দরুন বাংলার জেলাসমূহে কলকাতার গড়মূল্য এবং ফসল কাটার সময়কালীন মূল্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ১৯১০, ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে এই মূল্য যথাক্রমে ৩২%, ৩১% এবং ৩৩% বলে হিসাব করা হয়েছিল।[৩৩] উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধির পদ্ধতি কৃষকদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই রকম একটি অধিক কার্যকর উপায় হলো গ্রেড অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের আঁশ চিহ্নিত করা। ১৯৩০-এর দশকের মন্দায় একচেটিয়াভাবে সংগঠিত পাটশিল্প কেবল প্রাথমিক উৎপাদকদের বদৌলতে নয়, বরং মধ্যস্থদের বদৌলতে বাজারকাঠামোর উপর তার নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করে। আর্থিক মূলধনের নিম্নগামী প্রবাহ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মধ্যস্থ শ্রেণী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। পরিণামে প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের দৃষ্টিকোণ থেকে অতি অপ্রয়োজনীয় দাদনের ব্য'পারটির অবনতি ঘটে। এতে শিল্পের এমন এক বেদনাদায়ক অথচ যুক্তিগ্রাহ্য পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়, যা সার্বিক বিবেচনায় একটি লাগামহীন বাজারকাঠামোর সৃষ্টি করে। তামিলনাড়ুর গ্রাম-এলাকা সংক্রান্ত এক গবেষণার নিরিখে একথা বলা যায় যে, ব্যাপকভাবে পণ্য তুলে নেয়ার ক্ষতিকর পরিণাম বৃহত্তর পরিসরে সকল গ্রামে একই হয়েছিল এবং কেবল বাংলায় যে এমন ঘটেছিল তা নয়।[৩৪]

আর একটি বড় রপ্তানিদ্রব্য চায়ের ক্ষেত্রে শ্রমমজুরির ভিত্তিতে উদ্ভূত উৎপাদনসম্পর্ক এবং উৎপাদন ও ব্যবসায়ের মধ্যেকার সম্পর্ক গুণগতভাবে পৃথক ছিল। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রাধান্যের বিষয়টি কোন অবস্থাতেই একটি বিশদ বাজারকাঠামোর ঝঞ্ঝাটপূর্ণ অভ্যুদয়ে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে নি। বৃটিশ নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানাধীন এবং এগুলির দ্বারা পরিচালিত চা-বাগানগুলি জাহাজে করে লন্ডনে পাঠানোর জন্য কলকাতা ও চট্টগ্রামে চা প্রেরণ করে এবং লন্ডনে নিলামে চা বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অন্য সব চা-বাগান

৩২. Ray, 'Crisis of Bengal Agriculture' 261-2 মধ্যস্বত্বভোগীদের কমিশন সম্পর্কে আরো জানার জন্য দেখুন, Evidence of R. S. Finlow and K. Mclean, Director and Assistant Director of Agriculture, in Evidence, *Report of the Royal Commission on Agriculture*, Vol. 4, 13 and Appendix, Vol. 14, 70.

৩৩. Bagchi, *Private Investment*, 287.

৩৪. দ্রষ্টব্য, C. J. Baker, *An Indian Rural Economy: the Tamilnad Countryside, 1880-1955* (Delhi 1984), Chapter 4

কলকাতাভিত্তিক চারটি ইউরোপীয় দালাল প্রতিষ্ঠানের একটিকে নিয়োগ করে এবং এই প্রতিষ্ঠান চা-বাগানগুলির পক্ষে নিলামকারী হিসেবে কাজ করে। খিদিরপুর ডকগুলির কাছে অবস্থিত গুদামে সীসার পাত দিয়ে তৈরি কাঠের চা-বাক্সগুলি রাখা হতো এবং এগুলি সপ্তাহে একবার এবং মাঝে মাঝে সপ্তাহে দু'বার বিক্রি করা হতো। তখন চা-বাগানমালিক ও চারটি ইউরোপীয় দালাল প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতাকারী কারোরই অস্তিত্ব ছিল না।[৩৫]

চাউল বাংলার কৃষকদের জীবনধারণের প্রধান শস্য হওয়ার সুবাদে যথেষ্ট বাণিজ্যিক গুরুত্ব অর্জন করে। ১৯৩০-এর দশকে অনুসন্ধান করে দেখা যায়, বার্ষিক উৎপাদনের পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ চাউল প্রদেশে বা প্রদেশের বাইরে আমদানি বা রপ্তানি করা হয়। তবে বার্মা থেকে চাউল আমদানি করার ফলে এ মূল্যের উপর একটি অনানুপাতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।[৩৬] ১৯৪১ সালে উৎপাদনের ৪৪ শতাংশ অন্তত গ্রাম পর্যায়ে পণ্যবিনিময়ের পরিসরে নিয়ে আসা যেতো।[৩৭] চাউল ব্যবসার অধিকাংশ ছিল আন্তঃজেলাভিত্তিক। বাহ্যত এর বাজারকাঠামো ছিল পাটের বাজারকাঠামোর সাথে কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, যদিও ইউরোপীয়রা এতে প্রাধান্যবিস্তার করতো না। বিশ-এর দশকে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীটি ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির এবং দাদনের ব্যবহার খুব একটা ব্যাপক ছিল না। দু'টি প্রধান অর্থকরী শস্য এবং খাদ্যশস্যের মূল্য ছিল অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কিত এবং বাংলার কৃষককুলের জীবিকার নিরাপত্তার উপর এ দু'টির সংযুক্ত বাজারের আপেক্ষিক প্রবণতার প্রভাব ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলার একজন লোককবি আবেদ আলী মিয়া হতাশার সুরে বলেছিলেন যে, কৃষকরা চাউল ত্যাগ করে লাভের আশায় পাটের ঝুঁকি নিয়েছিল, তাদের এমন একদিন আসবে যখন তাদের সেই পাটগাছের কাঠি খেতে হবে।[৩৮] তথাপি এটি ক্ষুদ্র ক্ষেতমালিকদের একটি অবিবেচনাপ্রসূত ঝুঁকি ছিল না, যার মাধ্যমে তাদের জীবিকার বার্ষিক চাহিদা পূরণ

৩৫. *Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30*, Vol. I, 104.
৩৬. Bose, *Agraian Bengal*, Chapter 3
৩৭. *Report on The Marketing of Rice in India and Burma* (Delhi 1941)
৩৮. বুঝলি না তুই বুড়ার বেটা, আবেদের কথা নয়কো ঝুটা!
খেতে হবে পাটের গোড়া ঠিক জানিস মোর ভাষা
মনে করেছো নিব টাকা
সে আশা তোর যাবে ফাঁকা
পঁচিশের পয়া হবে তোর, ঋণে পড়বি ঠাসা
নিবি বটে টাকা ঘরে
পেটের দায়ে যাবে ফুরে
হিসেব করে দেখিস খাতা, যতো খরচের পাশা।
আবেদ আলী মিয়া, দেশ শান্তি (গনতিপাড়া, রংপুর ১৯২৫)।

করতে তারা ছিল উৎকণ্ঠিত। ১৮৯০ ও ১৯১২ সালের মধ্যে দত্ত কমিটির মূল্যসংক্রান্ত বিস্তৃত অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির তুলনায় কৃষিভিত্তিক আয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল মন্থর। যেখানে জনগণের মাথাপিছু কৃষি-উৎপাদন বা আয় ছিল ১৮৯০-৯৪ সালের চেয়ে ১৯০৯-১৩ সালে ১৭ শতাংশের বেশি, সেখানে একজন কৃষকের স্বাভাবিক ক্রয়ের গড় খুচরা মূল্য ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। যাহোক, পূর্ব ও উত্তর বাংলায় যেসকল কৃষক শুধু পাটচাষ অবলম্বন করেছিল তারা লাভবান হয়েছিল এবং আগের চেয়ে অনেক সচ্ছল হয়ে উঠেছিল।[৩৯] সাধারণ গ্রাম্য লোকগীতিতেও ১৯৬০ সালে সূচিত সমৃদ্ধির বিবরণ পাওয়া যায়।[৪০] যাহোক, এর ভিত্তি শক্ত কাঠের খুঁটির মতো সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল না, যার উপর পাটের দালালরা তাদের নতুন চারতলা বাসভবন নির্মাণ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে হঠাৎ মূল্য হ্রাস পাওয়ার পর পরই এসব লোকগীতির সৃষ্টি হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে একদিকে ইউরোপীয় ব্যবসায়িক করপোরেশনগুলির সঙ্গে বৃটিশ সরকারের, অন্যদিকে দেশীয় বাণিজ্যিক শ্রেণীগুলির সঙ্গে কৃষককুলের স্বার্থের প্রকাশ্য সংঘাত দেখা দেয়[৪১] এবং এতে প্রাথমিক উৎপাদকরা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। চটের ব্যাগ ও কাপড়ের রপ্তানিমূল্য এবং ১৯১৬ ও ১৯২১ সালের মধ্যে গ্রাম থেকে কলকাতায় আনীত পাটের আমদানিমূল্যের মধ্যেকার প্রসারমান পার্থক্য থেকে দেখা যায় যে, কৃষকদের স্বার্থের বিনিময়ে উৎপাদক ও রপ্তানিকারক প্রতি-ষ্ঠানগুলি যুক্ত হয়ে বিপুল মুনাফা অর্জন করে।[৪২] ঔপনিবেশিক সরকারের বিনিময়-হারনীতি ও সরকারি ব্যয়ের প্রসার কৃষিখাতের বিরুদ্ধে বাণিজ্যশর্তগুলিকে দৃঢ় রূপ দেয় এবং মুদ্রাস্ফীতির ইন্ধন যোগায়। ১৯১৯ সালের সংক্ষিপ্ত আর্থিক পুনরুদ্ধার এবং ১৯২০-২২ সালের আর্থিক অবনতির পর গ্রামীণ পূর্ববাংলার পাট অর্থনীতি আরেকটি ব্যাপক উন্নয়নের যুগে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয়।

১৯২০-এর দশকে ক্রয়-বিক্রয়ে বাহ্যত আকস্মিক বৃদ্ধি দৃশ্যমান হলেও তা প্রকৃত বৃদ্ধি ছিল না। তখন পাট ও চাউলের মূল্য সঙ্গতিপূর্ণভাবে সকল দ্রব্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতির পিছনে পড়ে থাকে।[৪৩] পাটচাষের পশ্চাতে যদিও স্থূল আয়ের বৃদ্ধিই ছিল প্রধান নীতি, তবে এই পর্যায়ে অর্থকরী ফসলের চাষে আয় কমে আসছিল। এক হিসাবে দেখা যায়, পূর্ব এবং

৩৯. উদ্ধৃত, Chaudhuri, "Agrarian Relations : Eastern India", Kumar (ed.), *Cambridge Economic History*, Vol. 2, 147.

৪০. একটি কবিতায় বলা হয় :
নায়লা বেপারী, সাতখানা বাড়ী
জোয়ানশাইয়া ঠুনি দিয়া বাঁধছে চৌআরী।
দ্রষ্টব্য, *Bose, Agrarian Bengal*, 80

৪১. Ray, " Crisis of Bengal Agriculture", 264.

৪২. Saugata Mukherji, "Imperialism in Action through a Mercantilist Function", Barun De (ed.), *Essays in Honour of Professor Suso bhan Sarkar*, (Calcutta 1974), 741; 'Some Aspects of Commercialisation of Agriculture in Eastern India, 1891-1938' in Asok Sen et al., *Perspectives in Social Sciences 2: Three Studies in the Agrarian Structure in Bengal 1850-1947* (Calcutta 1982), 234-6.

৪৩. Bose, *Agrarian Bengal*, chapter 3.

উত্তর বাংলার জেলাগুলিতে পাট এবং আমন ধান থেকে প্রকৃত স্থূল আয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৯২০-এর দশকে ২ শতাংশের নীচে, যেটি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের চৌদ্দ বছরে গড় প্রবৃদ্ধির হারের প্রায় অর্ধেক।[৪৪] যদি জনসংখ্যাবৃদ্ধির কথা ধরা হয়, তবে সর্বোচ্চ বৃদ্ধির কাল হিসেবে ১৯২০-এর দশকের ছবিটি বাস্তবিকই অত্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে উঠবে। তথাপি ১৯৩০-এর দশকের শূন্য-বিবর্ণ পরিবেশ পূর্ববর্তী দশককে পরিপূর্ণ আলোতে দৃশ্যমান করে তুলেছে।

বাংলার কৃষকদের জীবনে এই সময়ে বিশ্ববাজারের উঠানামা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল না। পর্যায়ক্রমিক সঙ্কটের অভিজ্ঞতাসহ অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বাংলার কৃষকরা ১৯৩০-এর দশকের মন্দার আঘাত সামলাবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে নি। এই মন্দাটি গভীরতা ও ব্যাপকতার দিক থেকে ছিল একটি নজিরবিহীন ঘটনা। পাশ্চাত্যের শিল্পের জন্য কাঁচামালের ক্রমহ্রাসমান চাহিদা থেকে এই মহামন্দার উৎপত্তি, যা দ্রব্যসম্ভারের ভারে জর্জরিত কৃষিবিশ্বে আরো তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯২৯ সালের মন্দার মোকাবেলা করতে শিল্পায়িত পশ্চিমা দেশগুলো আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর শুল্ক আরোপ করায় স্থানীয় অর্থনীতিতে আরো মন্দাভাব দেখা দেয়। ১৯২৫-২৬ সালে বাংলার যে রপ্তানি ১৬৬০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়, তার মূল্য ১৯৩০-৩১ সালে ৮১১ মিলিয়ন টাকায় অবনমিত হয় এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে তা আরো কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৬১২ মিলিয়ন টাকায়। ১৯৩০ ও ১৯৩৩ সালের মধ্যে রপ্তানির পরিমাণ সাময়িকভাবে প্রায় ১৫ শতাংশ হ্রাস পায়। কাঁচা পাটের মূল্য নিম্নাভিমুখী হয়, কিন্তু কোন রপ্তানিদ্রব্য বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায় নি। মহাজনি মূলধনের প্রবাহে সৃষ্ট নিশ্চলতা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ঋণসীমার মধ্যে এমন একটি লিকুইডিটি সমস্যার সৃষ্টি করে, যা রপ্তানিমূল্যের প্রায় সমপরিমাণে দেশীয় মূল্যকে কমিয়ে দেয়। ১৯৩২ ও ১৯৩৪ সালের মধ্যে পাট ও চাউলের মূল্য ১৯২০-এর দশকের শেষদিকের মূল্যের চাইতে ৬০ শতাংশেরও বেশি নিম্নমুখী করা হয় এবং ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত পাট ও চাউলের মূল্য আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।[৪৫] একটি হিসাবে দেখা যায় যে, পূর্ব ও উত্তর বাংলায় অর্থআয় ১৯২৬-২৯ সালের বার্ষিক গড় ৯৭৮ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৯৩০-৩৪ সালের ৪৮৬ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত ৫০ শতাংশের বেশি কমে আসে এবং প্রকৃত আয় কমপক্ষে ২৫ শতাংশ হ্রাস পায়।[৪৬]

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ১৯৩০-৩১ এবং ১৯৩৪-৩৫ সালের মধ্যে যখন কাঁচা পাটের মূল্য একেবারে নীচে নেমে আসে, তখন ফসল তোলাকালীন মূল্য এবং চট ও থলি জাতীয় উৎপন্নদ্রব্যের মূল্যের পার্থক্য সর্বোচ্চ মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। মধ্যস্থ ব্যবসায়ী ও অর্থসংস্থানকারী কিংবা প্রাথমিক উৎপাদকদের মধ্যে কেউই পাটের মূল্যহ্রাসজনিত পরিস্থিতির প্রভাব থেকে রেহাই পায় নি।[৪৭] ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রধানত আর্থিক ক্ষেত্রে

---

৪৪. Goswami, " Peasant Economy", 340.
৪৫. Sugata Bose, *Agrarian Bengal*, 79-87.
৪৬. Goswami, " Peasant Economy", 344.
৪৭. Report of the Jute Enquiry (Finlow) Committee 1934, 146.

কতিপয় নীতিনির্ধারণমূলক প্রয়াসের মাধ্যমে এই সঙ্কট তীব্র করে তুলতে ইন্ধন যোগায়। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে লন্ডনে স্বর্ণমান থেকে স্টার্লিং সরিয়ে আনার এবং টাকাকে অবমূল্যায়িত পাউন্ড-এর সাথে বেঁধে রাখার সিদ্ধান্তে ভারতীয় গ্রামসমূহে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ মজুদ না করার প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক ভারতের গ্রামীণ বাংলার সঞ্চিত ধনভাণ্ডার থেকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনকে প্রথমবারের মতো মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদান করা হয়। এই অর্থ প্রদান করা হয় ভারতের কৃষিপণ্য রপ্তানি বাবদ উদ্বৃত্ত থেকে বিপুল খেসারত দিয়ে।[৪৮]

পাটের বাণিজ্যিকীকরণের পিছনে যে প্রাথমিক যুক্তি কাজ করেছে তা হলো এ থেকে পর্যাপ্ত অর্থাগমের ব্যবস্থা করা, যা দিয়ে খোরাকিপণ্য, বিশেষত চাউল ক্রয়ের সামর্থ্য অর্জন করা যায়। মন্দার সময়ে চাউলের মূল্যাবনতিতে অভাবজনিত দুর্ভিক্ষাবস্থা ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার অনুষঙ্গী অর্থনৈতিক বিকলতা পাটবাজারের মাধ্যমে জীবিকার নিশ্চয়তা দানের কৌশলের সাথে জড়িত ঝুঁকিকে মারাত্মক করে তোলে। সরকারের যুদ্ধকালীন বিপুল ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি চক্রটিকে পুষ্ট করে এবং এক্ষেত্রে বিশেষকরে ১৯৪২ সালের শরৎ থেকে ফটকামূলক ক্রয় ও মজুদ খাদ্যের আতঙ্কজনক মূল্যবৃদ্ধির উৎসাহ সৃষ্টি করে। যদিও অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর প্রাদেশিক সরকার পাটচাষের জমি বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এগিয়ে আসে, তথাপি এই অর্থকরী ফসলের আপেক্ষিক মূল্য চাউল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ থাকে। ফলে পাটের উপর নির্ভরশীল বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র জমির অধিকারী কৃষক ধানচাষের জন্য জমি বিনিময়ের ক্ষেত্রে নাটকীয়ভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ১৯৪৩ সালের মার্চে বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সূচনায় প্রধান পাট আইন নিয়ন্ত্রক মূল পাট উৎপাদনকারী জেলাসমূহের অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেন : "বেশি পাট বলতে বোঝায় কম ধান এবং এই মুহূর্তে ধানের মূল্য পাটের মূল্যের চাইতে প্রায় দেড় গুণ বেশি"।[৪৯] সুতরাং গ্রাম্য কবিদের ভবিষ্যদ্বাণী নিদারুণ সত্যে পরিণত হয়। সর্বগ্রাসী মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত অনেকগুলো নিষ্ফল ও পরস্পরবিরোধী ব্যবস্থার একটি ছিল ১৯৪৩ সালে পাটের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের প্রয়াস। যুদ্ধের ঠিক পরবর্তী বছরগুলিতে মূল্যের সিলিং নির্ধারণের ফলে উৎপাদক ও রপ্তানিকারকগণ পারস্পরিক সুবিধালাভের সুযোগ পায় এবং আমলাদের সহযোগিতায় এরাই ১৯৪৬ সালের ফসল কাটার সময়ে পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে এর বিরোধিতা করে।[৫০]

স্বাধীন ভারত, পাকিস্তান ও ১৯৭১ সালের পরবর্তী বাংলাদেশে পাটবাজারের কাঠামো ও ঝোঁক সম্পর্কিত ঔপনিবেশিক ধারা পরিত্যক্ত হয়। বঙ্গবিভাগ অবশ্য কাঁচামাল উৎপাদনকারী পশ্চাৎভূমি থেকে শিল্পকে পৃথক করার মাধ্যমে একটি বিচ্ছিন্ন বা অস্বস্তিকর

৪৮. Bose, *Agrarian Bengal*, 65-7, cf. Baker, *Indian Rural Economy*, chapter 2

৪৯. Note by Chief Controller, Jute Regulation, cited in Bose, *Agrarian Bengal*, 91.

৫০. *Millat*, 12 July ,1946.

অবস্থার জন্ম দেয়। ভারত সরকার ১৯৫৬ সাল থেকে কতিপয় নিয়ন্ত্রণমূলক ও আইনগত ব্যবস্থার অধীনে ব্যবস্থাপনা-দালালদের নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস পায় এবং অবশেষে ১৯৬৭ সালে একটি সংসদীয় আইনের মাধ্যমে ১৯৭০ সাল থেকে যুগপ্রাচীন পদ্ধতির বিলোপসাধন করে। যাই হোক, আই. জে. এম. এ টিকেছিল যদিও তা এখন তার পূর্বতন আকারের ছায়ামাত্র। পাকিস্তান সরকার ১৯৫০-এর দশকে পাটসামগ্রী উৎপাদন কারখানা প্রতিষ্ঠায় পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের সাহায্য প্রদান করে এবং এতে পূর্ব বাংলার কৃষকদের প্রতি অবিচারের ঐতিহ্যবাহী ধারা বহাল থাকে।[৫১]

উপসংহার

বাংলার কৃষকগণ ১৮৪০ এবং ১৯৫০ এর দশকের মধ্যে বিশ্বঅর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত সুপ্রশস্ত, পরস্পর সংযুক্ত সোপানের নীচের ধাপে স্থান পায়। যখন ভূমি ও শ্রমবাজারকে পশ্চাতে রেখে উৎপন্নদ্রব্যের বাণিজ্য ও মূলধনবাজার সম্প্রসারণে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়, তখনও এই গ্রামীণ উৎপাদকশ্রেণী তাদের স্বতন্ত্র সম্পর্ক ও সংস্কৃতির পরিচয়বাহী গিলাফে আচ্ছাদিত একটি প্রকৃত কৃষিজীবী সমাজই রয়ে যায়। অবশ্য নীল ও পাটের মতো পণ্য তাদের মনোজগৎকে রঙিন করে তুলেছিল, যেভাবে তাদের চারপাশের পরিবেশকেও তারা নতুন রূপে গড়ে তুলেছিল। অর্থকরী ফসল উৎপাদনে হাড়ভাঙা শ্রম বিনিয়োগ করেও কৃষকেরা জানতো না বিনিময়ে এ থেকে তারা বর্ধিত আয় তুলে আনতে সক্ষম হবে কিনা। অবশ্য তাদের এই উদ্যোগ ছিল সেসব ঔপনিবেশিক পুঁজিপতির আর্থিক ঝুঁকি গ্রহণের চেয়ে কম কল্পনাবিলাস, যারা পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি থেকে প্রচুর আয় নিশ্চিত করার সুযোগ খুঁজছিল।

আবদুল সামাদ মিয়া তাই একটি লোককবিতায় বলেন :

পাট আসিয়া যখন দেশেতে পৌছিল
পশ্চিমা এসে তখন দখল করিল
এখন তাদের হাতে দেখ পয়সা হইল
বাঙ্গালীরে তারা দেখ কিছু না বুঝিল
না পাইত খাইতে যারা ছাতুয়ার গুঁড়া
বালামের ভাত খায় বুঝে দেখ তারা
না মিলে বাঙ্গালীর রেঙ্গুনের ভাত
বোবা হয়ে গেল দেখ বাঙ্গালীর জাত।[৫২]

---

৫১. দ্রষ্টব্য, Ayesha Jalal, *The State of Martial Rule : the Origins of Pakistan's Political Economy of Defence,* chapters 3,4 and 5

৫২. আবদুস সামাদ মিয়া, *কৃষক বোকা,* আহারা, ময়মনসিংহ, ১৯২১, ৬-৮।

সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা : পাকিস্তান আমল

এম. এম. আকাশ*

নবাবি যুগ হতে বিভিন্ন পর্বে সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচিত হয়েছে। আলোচনার সূত্রপাত করে সুশীল চৌধুরী নবাবি আমলে বাংলার সাধারণ অর্থনীতির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেন। তিনি দাবি করেন যে, তৎকালীন বিশ্বঅর্থনীতিতে বাংলাদেশ ছিল উন্নত দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। চাল-ডাল-কাপড়সহ সকল ভোগ্যপণ্যের মূল্য ছিল খুবই কম। আকাল-দুর্ভিক্ষ ছিল বিরল। বাংলার কৃষি ও শিল্পপণ্যসম্ভার ব্যাপকহারে বিশ্ববাজারে রপ্তানি হতো। এদেশের লাভজনক রপ্তানিবাণিজ্যে যোগদান করেছে ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, দিনেমার, আরমেনীয়, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, তামিল ও আরো অনেক দেশী-বিদেশী বণিক জাতি। কৃষি ও শিল্প ছিল সুসমন্বিত এবং সাধারণ মানুষ ছিল অনাহার-অর্ধাহার থেকে মুক্ত। বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের বাংলার সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করেছেন পিটার মার্শাল এবং সুগত বসু। তাঁরা দেখিয়েছেন কিভাবে সনাতন অর্থনীতি ঔপনিবেশিক শাসন ও আধুনিক পুঁজিবাদের অভিঘাতে ভেঙে পড়েছে এবং কিভাবে এর ধ্বংসস্তূপের উপর নির্মিত হয়েছে এক বিকৃত ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্থবিরতা, বৈষম্য, দারিদ্র্য, ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও পুষ্টিহীনতা। এই অর্থনীতিই ছিল পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার উত্তরাধিকার। পাকিস্তান পর্বের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচিত হয়েছে বর্তমান অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে আলোচনার ক্রমপরম্পরা হবে নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশের অর্থনীতি : '৪৭-এর অর্জিত উত্তরাধিকার

২. '৫০-এর দশকের অন্তিম পর্ব ও '৬০-এর দশকের অর্থনৈতিক গতিপ্রবণতা

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভূমিকা

সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১. বাংলাদেশের অর্থনীতি : '৪৭-এর অর্জিত উত্তরাধিকার

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট রক্তক্ষয়ী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পটভূমিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই রাষ্ট্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ভৌগোলিক ব্যবধান। এর পূর্বাঞ্চল তথা পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিমাঞ্চল তথা পশ্চিম পাকিস্তান শুধু যে একই রাষ্ট্রের দুটি পৃথক প্রদেশ ছিল তাই নয়, এই দুই প্রদেশের মধ্যে ছিল সহস্র মাইলের ব্যবধান এবং এর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করছিল 'বৈরী' ভারত। ফলে দুই প্রদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন অর্থনৈতিক যোগাযোগ ভৌগোলিক কারণেই সম্ভব ছিল না। শুধু সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ব্যবধান নয়, মৌলিক সম্পদের বিন্যাস এবং মৌলিক অর্থনৈতিক ধ্রুবকগুলির নিরিখেও 'পূর্ব বাংলা' (এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্থলে পূর্ব বাংলা) তার জন্মলগ্ন থেকেই একটি 'পৃথক উৎপাদনকারী ও ভোগকারী' অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সমগ্র পাকিস্তানের আয়তন ছিল ৩৬৫ হাজার ৫২৯ বর্গমাইল এবং মোট জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৫৬ লক্ষ। এর মধ্যে মাত্র ৫৫ হাজার ১২৬ বর্গমাইল এলাকা অর্থাৎ পুরো পাকিস্তানের মাত্র শতকরা পনেরো ভাগ এলাকা নিয়ে গঠিত হয়েছিল পূর্ব বাংলা। অথচ পূর্ব বাংলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১৯ লক্ষ অর্থাৎ পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ।[১]

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ-পূর্বে সামান্য এলাকায় মায়ানমার (বার্মা) ছাড়া পূর্ব বাংলার বাকি সবদিকে বিশাল সীমান্ত এলাকা জুড়ে অবস্থান করছে ভারত। ভারত থেকে প্রবাহিত বিভিন্ন বৃহৎ নদীর পলিমাটি দিয়েই পূর্ব বাংলার অধিকাংশ এলাকা গড়ে উঠেছে। এটি মূলত একটি সমতল নিম্নভূমি, যাকে মালার মতো অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, নালা-ডোবা, জলাভূমি বেষ্টিত বা অলঙ্কৃত করে রেখেছে। সমুদ্র থেকে এর উচ্চতা খুব বেশি নয়। সমুদ্র থেকে ১০০ মাইল ভিতরের এলাকাও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৩০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। উত্তর থেকে দক্ষিণে (কিছু পাহাড়অঞ্চলের ব্যতিক্রম বাদ দিলে) সারা দেশটি ক্রমশ ঢালু হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। তবে এই ঢালের পরিমাণ খুবই মৃদু, মাইলপ্রতি মাত্র পাঁচ ইঞ্চিরও কম।[২] ভূতত্ত্ববিদদের মতে, পলিগঠিত এরকম সুবৃহৎ বদ্বীপ পৃথিবীতে খুব কমই আছে এবং এর গঠন অনেক দিন পর্যন্ত চলতে থাকবে। অর্থাৎ নতুন নতুন দ্বীপাঞ্চল গঠন অথবা পুরনো দ্বীপের সমুদ্রগর্ভে অবলুপ্তি এই দুই বিপরীত প্রক্রিয়ার চলমানতায় পূর্ব বাংলার গঠন ও আয়তন পরিবর্তনশীল। এর আবহাওয়া চরম প্রকৃতির নয়। যদিও মৌসুমভেদে ব্যাপক উঠানামা রয়েছে এবং সর্বনিম্ন গড় উষ্ণতার মাত্রা ৪৯

---

১. ১৯৫১ সালের আদমশুমারির তথ্যানুসারে।

২. রফিউজ্জামান (সম্পাদিত), *Pakistan Year Book 1970*, (Karachi, Dhaka 1970), 2.

ডিগ্রি ফারেনহাইট (জানুয়ারি মাসে) এবং সর্বোচ্চ উষ্ণতা হচ্ছে ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট (এপ্রিল-মে মাসে)। সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাতহার হচ্ছে ৪৭.৯ ইঞ্চি (রাজশাহী অঞ্চলে) এবং সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতহার হচ্ছে ২২৫.৮ ইঞ্চি (সিলেট অঞ্চলে)। এছাড়া অক্টোবর-নভেম্বর মাসে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস হয়ে থাকে।[৩] বাংলাদেশের এসব প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য থেকে একথা সহজেই অনুমেয় যে, মূলত বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল নদীনির্ভর কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। বস্তুত মৌসুমি জলবায়ুর খামখেয়ালির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল একটি দুর্বল কৃষিভিত্তিক পশ্চাৎপদ অর্থনীতি নিয়েই ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলার যাত্রা শুরু হয়েছিল।

পূর্ব বাংলার জন্মলগ্নে অর্থনীতির প্রাথমিক গতিপ্রবণতা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে তথ্যের অপ্রতুলতা। বস্তুত পূর্ব বাংলার জন্মলাভের চার বছর পর ১৯৫১ সালে যে আদমশুমারি পরিচালিত হয় তা থেকেই প্রথমবারের মতো কিছু বৈজ্ঞানিক পন্থায় আহরিত তথ্য প্রণয়ন সম্ভব হয়। তবুও বিভিন্ন জায়গায় এর আগে বা অব্যবহিত পরে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে মোটা দাগে আঁকা নিচের অর্থনৈতিক চালচিত্রটি তুলে ধরা হলো। এসব তথ্য চরম মাত্রা (absolute level) সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে না পারলেও গতিপ্রবণতা (dynamic trends) সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দিতে পারে।

১নং সারণিতে তদানীন্তন পূর্ব বাংলায় ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত ছয় বছরের জন্য মোট প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন, মোট জনসংখ্যা এবং মোট প্রকৃত মাথাপিছু আয় এই তিনটি চলকের গতিপ্রবণতা তুলে ধরা হয়েছে।[৪] এই সারণি থেকে প্রথমদিকে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে নিম্নের সিদ্ধান্তগুলি বিবেচ্য :

১. প্রথমদিকে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও এই বৃদ্ধির হার ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সমান। শেষদিকে এমনকি তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে নিচে নেমে যায়।

২. ফলে আলোচ্য কালপর্বে গড় মাথাপিছু আয় ছিল প্রায় স্থবির। ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব বাংলার একজন নাগরিকের গড়পড়তা বার্ষিক আয় ছিল ২৬৭ টাকা (১৯৫৯-৬০ সালের বাজারদামে) এবং ৬ বছর পর তা মাত্র চার টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৭১ টাকা।

এই মন্থর বা অবনতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য দ্বিগুণ বঞ্চনাকর মনে হয়েছিল, কারণ এর সঙ্গে একই সময়ে যুক্ত হয়েছিল পাকিস্তানেরই পশ্চিম অংশ তথা পশ্চিম পাকিস্তানের চোখধাঁধানো অগ্রগতির বিপরীত বাস্তবতা। ১৯৪৯-৫০

৩. প্রাগুক্ত, ১-৪ থেকে সংগৃহীত।

৪. এখানে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর সরকারিভাবে সর্বপ্রথম একটি ছয় বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, যার কালপর্বও ছিল ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত।

সারণি ১ : পূর্ব বাংলায় মোট জাতীয় উৎপাদন, মোট জনসংখ্যা, মাথাপিছু উৎপাদন ইত্যাদি চলকের গতিপ্রবণতা, ১৯৪৯-৫০-১৯৫৪-৫৫

বিষয়	বছর					
	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩	১০৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫
মোট জাতীয় উৎপাদন (মিলিয়ন টাকা)	১১৫৬৯	১২২৯৫	১২৭৪৯	১৩১১৪	১৩৫১৫	১৩২৮৮
মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৪২.২৫	৪৩.২৯	৪৪.৩৬	৪৫.৪৫	৪৬.৫৭	৪৭.৭২
মাথাপিছু জাতীয় আয়	২৬৭	২৭৫	২৭৭	২৭৯	২৮৪	২৭১
জাতীয় উৎপাদনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার	-	৬	৩	২	৩	(-) ২
মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার	-	৩.৭২	.৭২	১.৭	১.৭	(-)৫

টীকা : ১. এখানে মোট জাতীয় উৎপাদন ১৯৫৯-৬০ সালের স্থির বাজারদামে (At Constant Market Price, 1959-60) পরিমাপ করা হয়েছে।

২. উৎস : মহিউদ্দীন আলমগীর এবং লডউইজ্‌ক জে. জে. বি. বার্লেজ, *বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনকাম এ্যান্ড এক্সপেনডিচার : ১৯৪৯-৫০-১৯৬৯-৭০*, বি. আই. ডি. এস. ১৯৭৪, ঢাকা, ১৬২।

সালেই পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পাকিস্তানের পূর্বাংশের তুলনায় ৮ শতাংশ বেশি ছিল। কিন্তু ১৯৫৪-৫৫তে এই ব্যবধানের হার আরো বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯.৪৬ শতাংশ।[৫] আর এই বৈষম্যমূলক প্রবৃদ্ধির পেছনে শুধু প্রাকবিভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চতর অর্থনৈতিক বিকাশস্তরই দায়ী ছিল না, পরবর্তীকালে অনুসৃত নানারকম বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক নীতিও এই ব্যবধান বা বৈষম্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সক্রিয় অবদান রেখেছিল। এই সময় সচেতনভাবে পূর্ব বাংলার স্বর্ণসূত্র পাটের বহির্বাণিজ্যের উদ্বৃত্তকে

৫. আতিউর রহমান, "ভাষা আন্দোলনের অর্থনৈতিক পটভূমি : অঞ্চলভিত্তিক একটি সামগ্রিক চিত্র", *একুশের প্রবন্ধ*, বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, ৯২। এই রচনায় প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৩০৫ ও ৩৩০ টাকা (১৯৬৯-৭০ বাজারদামে) এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে তা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৯৮ এবং ৩৫৬ টাকা।

পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি পূরণে ব্যবহার করা হয়েছিল। উন্নয়নখাতে বরাদ্দ, অবকাঠামো নির্মাণ, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানির লাইসেন্স বিতরণ, প্রশাসনিক পদ বণ্টন, উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি ইত্যাদি সকল খাতেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম থেকেই পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে এক ধরনের বিমাতাসুলভ নীতি পরিগ্রহণ করে আসছিল। বস্তুত এরকম একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের বৈষম্য প্রথমদিকের নয়, বরং ষাটের দশকের ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের প্রাথমিক যুগের পরিসংখ্যান একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই। এই প্রক্রিয়ারই একটি ঘনীভূত রাজনৈতিক পরিণতি হচ্ছে পাকিস্তানের জন্মের মাত্র সাড়ে চার বছরের মাথায় অনুষ্ঠিত ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন[৬], যা সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিমূলে প্রথম কুঠারাঘাত হানে।

এই প্রসঙ্গে শুধু পশ্চিম পাকিস্তান নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নমাত্রা কোন্ স্তরে অবস্থিত ছিল সেটিও আন্তর্জাতিকভাবে তুলনা করে দেখা যেতে পারে। সৌভাগ্যবশত আমাদের হাতে ১৯৪৯-৫০ সালের জন্য সারা বিশ্বের ৭০টি দেশের মাথাপিছু আয়ের একটি আন্তর্জাতিক তুলনামূলক তালিকা রয়েছে। তাতে দেখা যায়, পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল তখন ৫১ ডলার এবং ঐ ৭০টি দেশের মধ্যে পাকিস্তানের অবস্থান ছিল ৫৭তম। পক্ষান্তরে 'পূর্ব পাকিস্তানের' মাথাপিছু আয় ছিল তখন ৪৬ ডলার এবং সেই হিসেবে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থান দাঁড়ায় ঐ ৭০টি দেশের মধ্যে ৫৯তম। পাঠকের সুবিধার্থে ৭০টি দেশের মধ্যে নির্বাচিত ১২টি দেশের তুলনামূলক মাথাপিছু আয়ের তথ্য ২ নং সারণিতে প্রদান করা হলো।

এই সারণি থেকে পূর্ব বাংলার নিম্ন অর্থনৈতিক অবস্থান (৫৯তম) সম্পর্কে যেমন কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না, তেমনি এটাও আমরা দেখতে পাই যে, অন্তত ১৯৪৯-৫০ সালে মাথাপিছু আয়ের নিরিখে পূর্ব বাংলার অবস্থান ছিল এমনকি ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার উপরে।

বৃটিশ ভারতে দশ বছর পর পর আদমশুমারি পরিচালনার যে রীতি ছিল সেই রীতি অনুসারে পূর্ব বাংলায় ১৯৩১, ১৯৪১ এবং ১৯৫১ সালে (পাকিস্তান সৃষ্টির পর) বিস্তৃত আদমশুমারি পরিচালিত হয়েছিল। এই আদমশুমারির তথ্যাবলী ১৯৫১ সালে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করে। তদুপরি এই পরিপ্রেক্ষিতে নিকট অতীতের সঙ্গে একটি তুলনামূলক বিচারও করা যায়।

১৯৫১ সালের আদমশুমারির পরিসংখ্যান অনুসারে পূর্ববঙ্গের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১৯ লক্ষ ৩২ হাজার। এর মধ্যে ৬৪টি মহকুমাশহরে শহরবাসীর সংখ্যা ছিল মাত্র

৬. এই বিষয়ে বিস্তৃত পরিসংখ্যান তথ্য ও যুক্তির জন্য দেখুন, আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন : অর্থনৈতিক পটভূমি*, (ঢাকা ১৯৯০)।

সারণি ২ : ১২টি নির্বাচিত দেশের জনসংখ্যা,মাথাপিছু আয় এবং ক্রমিক অবস্থানের চিত্র ১৯৪৯

দেশের নাম	জনসংখ্যা (হাজারে)	মাথাপিছু আয় ১৯৪৯ (ডলারে)	মাথাপিছু আয়ের মানদণ্ডে ৭১টি দেশের মধ্যে ক্রমিক অবস্থান
১. আমেরিকা	১৪৯২১৫	১৪৫৩	১
২. বৃটেন	৫০৩৬৩	৭৭৩	৬
৩. সোভিয়েত ইউনিয়ন	১৯৩০০০	৩০৮	২৩
৪. জাপান	৮২৬৩৩৬	১০০	৪৫
৫. শ্রীলংকা	৭২৯৭	৬৭	৫৪
৬. ভারত	৩৪৬০০	৫৭	৫৫
৭. আফগানিস্তান	১২০০০	৫০	৫৮
৮. পাকিস্তান (সমগ্র)	৭৩৮৫৫	৫১	৫৭
৯. পূর্ব পাকিস্তান	৪২২৫০	৪৬	৫৯
১০. ফিলিপাইন	১৯৩৫৬	৪৪	৬০
১১. দক্ষিণ কোরিয়া	২০১৮৯	৩৫	৬৯
১২. ইন্দোনেশিয়া	৭৯২৬০	২৫	৭১

টীকা : ১. ১৯৪৯-৫০ সালে জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অফিসের অর্থনৈতিক শাখা কর্তৃক প্রকাশিত "ন্যাশনাল এ্যান্ড পার ক্যাপিটা ইনকাম অব সেভেন্টি কান্ট্রিজ, এক্সপ্রেসড ইন ইউ. এস. ডলার, নিউইয়র্ক, অক্টোবর ১৯৫০ : ১৪-১৬ নং থেকে সংকলিত।

২. পূর্ব বাংলার মাথাপিছু ডলার আয়ের হিসাব নির্ণয়ের জন্য তৎকালীন সরকারি বিনিময়হার (১ ডলার= ৩.৩০ টাকা) ব্যবহার করা হয়েছে এবং চলতি দামে ১৯৪৯ সালের মাথাপিছু আয় ২১৭ টাকা ধরা হয়েছে যেহেতু ১৯৫৯-৬০ সালের বাজারদামের তুলনায় ১৯৪৯-৫০ সালের বাজারদাম প্রায় ২০ শতাংশ কম ছিল।

৩. 'পূর্ব পাকিস্তান'কে তালিকাভুক্ত করায় তুলনীয় দেশের সংখ্যা ৭১-এ দাঁড়ায়।

উৎস : ডব্লিউ. এন. পীচ, এম. উজির এবং জি. ডব্লিউ. রাকার *বেসিক ডাটা অফ দ্য ইকনমি অব পাকিস্তান,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, (করাচী ১৯৫৯), ২৯-এ উদ্ধৃত ১৫ নং সারণি দ্রষ্টব্য।

১৮ লক্ষ ২০ হাজার। অর্থাৎ শহরের জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪.৩ শতাংশ। সুতরাং সর্বপ্রথমে সহজেই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা হচ্ছে, তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ ছিল মূলত গ্রামীণ। এই গ্রামসর্বস্বতার পাশাপাশি লক্ষণীয় যে, জনগণের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সক্রিয়তার মাত্রাও ছিল খুব অল্প। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী

'সিভিলিয়ান লেবার ফোর্স' বা সক্রিয় জনশক্তির মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৮৬ হাজার (মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩১ শতাংশ) জন। জনসংখ্যার অবশিষ্ট ৬৯ শতাংশকে 'পরনির্ভর' আখ্যা দেয়া হয়েছিল। বস্তুত এদের মধ্যে বৃদ্ধ, গৃহবধূ, শিশু (যাদের বয়স ১২ বছরের কম), বেকার ইত্যাদি সকল পরনির্ভর ব্যক্তিকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সেইদিক থেকে হিসাব করলে দেখা যায় যে, পূর্ববঙ্গে তখন প্রতি একজন অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় লোকের উপর ২.২২ জন নিষ্ক্রিয় লোকের বোঝা চেপে বসেছিল। একদিকে শ্রমের নিম্ন উৎপাদনশীলতা অপরদিকে অনুৎপাদনশীল পরনির্ভরতার চাপ। তদুপরি গ্রামাঞ্চলে যেখানে দারিদ্র্য বেশি সেখানে নির্ভরতার হার ছিল আরো বেশি।

১৯৫১ সালে সক্রিয় জনশক্তির পেশাগত বিন্যাস ছিল সর্বতোভাবে কৃষিমুখী। লক্ষণীয় যে, ১৯৩১-১৯৫১ সময়কালে এই কৃষিমুখিনতা হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল। ৩ নং সারণিতে প্রদত্ত তথ্য থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হওয়া যায় :

ক. পূর্ববঙ্গে কৃষি পেশাভুক্ত ব্যক্তির আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৯৩১-৫১ সময়কালে ৭৭.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪.১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

খ. ম্যানুফেকচারিং খাতে নিয়োজিত অর্থনৈতিক গোষ্ঠীটির আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭.৬ শতাংশ থেকে আরো হ্রাস পেয়ে ৬.৬ শতাংশে পরিণত হয়েছে।

গ. ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত অর্থনৈতিক গোষ্ঠীটির গুরুত্ব ৬.১ শতাংশ থেকে প্রচণ্ড হারে হ্রাস পেয়ে মাত্র ৩.৯ শতাংশে পরিণত হয়েছে।

ঘ. সরকারি চাকুরি, পেশাদারি ও কারুশিল্পের সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর গুরুত্ব ৩.৫ শতাংশ থেকে তীব্রভাবে হ্রাস পেয়ে ১.৫ শতাংশে পরিণত হয়েছে।

পেশাকাঠামোর এই দীর্ঘমেয়াদী কৃষিকেন্দ্রিকতা বিভাগোত্তর মুহূর্তটিতে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, কারণ পূর্ববঙ্গ থেকে যারা ভারতে পাড়ি জমিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু, যাদের পেশা ছিল মূলত অকৃষিভিত্তিক।[৭] এই বর্ধিত কৃষিকেন্দ্রিকতার ফলে গ্রাম ও কৃষির উপর সক্রিয় জনশক্তির যে অতিরিক্ত ভর তথা চাপ পড়েছিল তার প্রতিফলন দেখা যায় তুলনামূলকভাবে গ্রামীণ মাথাপিছু আয়ের নিম্নমাত্রার মাঝে। ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত গ্রামীণ মাথাপিছু আয় বেড়েছিল মাত্র দুই টাকা। আর এই সময় গ্রামীণ মাথাপিছু আয় শহরের মাথাপিছু আয়ের চুয়াল্লিশ শতাংশের

৭. ১৯৪৭ সালে এক দফা এবং ১৯৫০-এর দাঙ্গার সময় আরেক দফা পূর্ববঙ্গ থেকে ব্যাপক হারে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় ভারতে পাড়ি জমিয়েছিলেন। ডঃ ওয়াকিল প্রদত্ত হিসাবানুযায়ী সেই সময় যারা পশ্চিমবঙ্গে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কৃষক ছিলেন মাত্র ৪ শতাংশ। বাদবাকিদের মধ্যে প্রধান অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য (৩৮ শতাংশ), চাকুরিজীবী (২৮ শতাংশ), ভূস্বামী বা জোতদার (১২ শতাংশ), ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল ইত্যাদি (১২ শতাংশ), দর্জি, কারিগর ও অন্যান্য পেশাজীবী (৭ শতাংশ) এবং কারখানার শ্রমিক (১.৫ শতাংশ)।

বেশি কখনোই হয় নি। (৪নং সারণি দ্র.)। সারণিতে প্রদত্ত তথ্যাবলী থেকে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিরাজমান তীব্র আয়বৈষম্যের বিষয়টিও এই সময় সুপরিস্ফুট হয়ে উঠে। এই ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের প্রত্যক্ষ কারণ হচ্ছে শহরের মাথাপিছু আয়ের তুলনামূলকভাবে দ্রুততর প্রবৃদ্ধি।

সারণি ৩ : সক্রিয় জনশক্তির পেশাগত বিন্যাসের আপেক্ষিক হার (১৯৩১-৫১)

অর্থনৈতিক গোষ্ঠী	পূর্ববঙ্গ	
	১৯৩১	১৯৫১
মোট সক্রিয় শ্রমিক (মিলিয়ন)	৭.৮	১২.৯
মোট সক্রিয (শতাংশ)	১০০	১০০
কৃষি	৭৭.৮	৮৪.১
খনি ও উত্তোলন	-	-
শিল্প	৭.৬	৬.৬
ব্যবসা-বাণিজ্য	৬.১	৩.৯
সরকারি প্রশাসন, পেশাদারি ও কারুশিল্প	২.৬	২.০
গৃহভৃত্য ও ব্যক্তিগত সেবা	৩.৫	১.৫
অন্যান্য	২.২	০.৮

টীকা : ক .১৯৩১ সালের মিলিয়নের অঙ্কটি মোট উপার্জনকারী এবং সক্রিয় পরনির্ভরদের সংখ্যা থেকে সেনাবাহিনী ও অর্থনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে হিসাব করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গের বিভাগোত্তর পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনা করাব জন্য কিছুটা পরিবর্তন করে এটি পরিমাপ করা হয়েছে। ১৯৫১ সালের অঙ্কটি ১৯৫১ সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে।

খ. কৃষি বলতে এখানে চাষাবাদ, পশুপালন, বনভিত্তিক পেশা এবং মৎস্যশিকার ইত্যাদি সকল পেশাকে একত্রে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

গ. শিল্প বলতে ম্যানুফেকচারিং, গৃহনির্মাণ, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, পরিবহন, ডাক এবং টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে।

উৎস : "Census of Pakistan", 1951, Vol. 1, 107.

১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত ছয় বছরে শহরবাসীর প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৭ টাকা এবং শতাংশের হিসাবে ২.৮৫ শতাংশ। পক্ষান্তরে, গ্রামবাসীর প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র দুই টাকা এবং শতাংশের হিসাবে মাত্র ০.৭৯ শতাংশ।

সারণি ৪ : গ্রাম ও শহরের মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য ঃ ১৯৪৯-৫০-১৯৫৪-৫৫

[মাথাপিছু আয় (১৯৫৯-৬০-এর উৎপাদন উপকরণ ব্যয় অনুসারে)]

সন	গ্রাম	শহর	গ্রাম/শহরের শতাংশ হিসাবে
১৯৪৯-৫০	২৫৩	৫৯৬	৪২
১৯৫০-৫১	২৬০	৬০৯	৪৩
১৯৫১-৫২	২৬২	৬১৬	৪৩
১৯৫২-৫৩	২৬৩	৬১৩	৪৩
১৯৫৩-৫৪	২৬৯	৬১৪	৪৪
১৯৫৪-৫৫	২৫৫	৬১৩	৪২

উৎস : Mohiuddin Alamgir and Berlage, *Bangladesh*, 65-66.

প্রাথমিক লগ্নে এবং পরবর্তীকালেও বহুদিন পর্যন্ত গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি। প্রথমদিকে কৃষির প্রধান দুটি সমস্যা ছিল—(১) জমির উপর বিপুল জনসংখ্যার চাপ এবং (২) নিম্ন উৎপাদনশীলতা। তদানীন্তন পূর্ব বাংলায় মোট ৩৪.৯৩৬ মিলিয়ন একর জমি ছিল। এর মধ্যে ৫৭.৫২ শতাংশ অর্থাৎ ২০.০৯ মিলিয়ন একর জমি ১৯৪৯-৫০ সালের মধ্যেই আবাদের অধীনে এসে গিয়েছিল। বাকি ১৪.৮৪ মিলিয়ন একর জমির মধ্যে আবাদযোগ্য কিন্তু তখনো আবাদের অধীনে আনা হয় নি এরকম জমির পরিমাণ ছিল ৬.২৭ মিলিয়ন একর অর্থাৎ মোট জমির প্রায় ১৮ শতাংশ। সুতরাং সামগ্রিকভাবে আবাদযোগ্য জমি ছিল মোট জমির ৭৫.৫২ শতাংশ, যার মধ্যে ৫৭.৫২ শতাংশ (দশ ভাগের আট ভাগ) ইতিমধ্যেই আবাদের অধীনে চলে এসেছিল।[৮] অর্থাৎ সেই সময় পূর্ব বাংলার গ্রামীণ জনসংখ্যা ও কৃষিকর্মে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় লোকসংখ্যা যেহেতু ছিল যথাক্রমে ৪০.১১ মিলিয়ন এবং ১০.৮৪ মিলিয়ন, সেহেতু গ্রামীণ মাথাপিছু এবং কৃষি শ্রমজীবীর মাথাপিছু নীট আবাদি জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ০.৫০ একর এবং ১.৮৫ একর। তবে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় জনসংখ্যার ঘনত্বের (density of population) তারতম্য থাকায় জেলাভেদে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণেও প্রচুর তারতম্য ছিল। বিশেষত ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রামে

আবাদযোগ্য জমি বলতে আমরা বুঝাচ্ছি নীট আবাদকৃত জমি (net area sown) + চলতি ফেলে রাখা জমি (current fellow) + আবাদযোগ্য খিল জমি (cultivable waste)। আর আবাদের অযোগ্য জমি বলতে বোঝানো হচ্ছে বনাঞ্চল + আবাদ-অযোগ্য খিল জমি (uncultivable waste) এবং অশ্রেণীভুক্ত জমি (area not classified)। এই সংজ্ঞানুসারে ১৯৪৯-৫০ সনে আবাদ-অযোগ্য জমির মোট পরিমাণ ছিল (২.৯২ + ৫.০১ + .৬৩) = ৮.৫৬ মিঃ একর বা মোট জমির ২৪.৪৫ শতাংশ। এসব হিসাবের উৎসের জন্য দেখুন, J. R. Andrus and Azizali F. Mohammad, The *Economy of Pakistan* (Karachi and Dhaka 1958), 37.

কৃষিশ্রমিকপ্রতি জমির পরিমাণ গড়ের চেয়ে নিচে ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তদানীন্তন কৃষিবিশেষজ্ঞদের মতে একটি কৃষিজীবী পরিবারের ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন ছিল ৫ একর জমি (চট্টগ্রামে এই পরিমাণ ছিল মাত্র ০.৭২ একর অর্থাৎ গড়ের তুলনায় অর্ধেকেরও কম)।[৯] সুতরাং গড়ে প্রতিটি পরিবারের হাতে মাত্র ২×১.৮৫= ৩.৭০ একর জমি ছিল, যা তখনকার উৎপাদনশীলতার নিরিখে মোটেও পর্যাপ্ত ছিল না

সারণি ৫ : চাষীদের শ্রেণীবিভাগ (১৯৫১)

শ্রেণী	মোট সংখ্যা (মিঃ)	শতাংশ
১. মালিক চাষী	৩.৭৪৩	৩৫
২. মালিক ও বর্গাচাষী	৪.৩৩৪	৪১
৩. বর্গাচাষী	০.৬২১	৫.৮৩
৪. বর্গাচাষী ও ক্ষেতমজুর	০.৪১০	৩.৮৪
৫. ভূমিহীন ক্ষেতমজুর	১.৫১৩	১৪.২০
৬. ফসলবহির্ভূত কৃষিখাতে নিয়োজিত মজুর	০.০২৫	০.১৩
সর্বপ্রকার মোট কৃষিশ্রমিক	১০.৬৫	১০০

টীকা : ক. মালিক চাষী বলতে শুধু কৃষিখাতে সেসব শ্রমদাতাদের বোঝানো হয়েছে যারা সম্পূর্ণভাবে শুধু নিজেদের মালিকানাধীন জমি চাষ করছে।

খ. মালিক ও বর্গাচাষী বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা অংশত নিজের জমি এবং অংশত ভাড়া কবা অন্যের জমি (যা বর্গা বা অন্য যেকোন চুক্তির অধীনে হতে পারে) আবাদ করছে।

গ. বর্গাচাষী বলতে ভূমিমালিকানাহীন ভাড়াটে চাষীকে বোঝানো হচ্ছে।

ঘ. বর্গাচাষী ও ক্ষেতমজুর বলতে তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে যারা অংশত ভাড়া জমিতে শ্রম দেয় এবং অংশত বাইরে শ্রম বিক্রয় করে। এরাও ভূমিহীন।

ঙ. ভূমিহীন ক্ষেতমজুর প্রধানত ক্ষেতমজুরির মাধ্যমেই জীবিকা অর্জন করে এবং তাদের অধীনে কোন আবাদি জমিই নেই।

চ. ফসলবহির্ভূত কৃষিখাতে নিয়োজিত মজুর বলতে যে দুটি বিশেষ গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে তারা হচ্ছে গোচারণ ও দুগ্ধ দোহনের কাজে নিয়োজিত রাখাল এবং গোয়ালা (herdsmen and dairymen)।

উৎস : J. R. Andrus and Azizali F. Mohammad,"The Economy of Pakistan," (Oxford 1958),79.

৯. এখানে গড়ে পরিবারের সদস্যসংখ্যা ছয় জন ধরা হয়েছে, যাদের মধ্যে দুজন বা এক-তৃতীয়াংশ পরিপূর্ণভাবে কৃষিকর্মে নিয়োজিত রয়েছেন। বিস্তৃত তথ্যের জন্য দেখুন, Nur Ahmed, *East Pakistan as it is now and some of its urgent needs*, (Chittagong 1956), 31-32.

(প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ৭৫ শতাংশ)। কিন্তু এসব গড় হিসাব থেকে প্রকৃত চিত্র ধরা পড়বে না। বস্তুত জমির মালিকানাকাঠামো ছিল প্রচণ্ড রকমের বৈষম্যমূলক। ফলে জমির প্রকৃত ব্যবহারকারীর হাতে এমনকি ৫ একর জমি থাকলেও মধ্যস্বত্বভোগী মালিকদের খাজনা ইত্যাদি প্রদান করার পর প্রকৃত চাষীর হাতে যা থাকতো তা দিয়ে সংসার চালানো কঠিন ছিল। তাই বাস্তবে জমির স্বল্প প্রাপ্যতা সমস্যার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল জমির বৈষম্যমূলক বণ্টনের সমস্যা। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা ব্যবহার করে কৃষিখাতে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় ১০.৬৫ মিলিয়ন ব্যক্তির ভূমির উপর স্বত্বাধিকার সম্পর্কে একটি ধারণা প্রণয়ন করা সম্ভব। ৫ নং সারণিতে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী প্রদান করা হলো।

৫ নং সারণি থেকে দেখা যায়, ভূমির মালিকানা ছিল কৃষিতে নিয়োজিত শ্রম-শক্তির ৭৬ শতাংশের হাতে (অর্থাৎ এক এবং দুই নং শ্রেণী)। পক্ষান্তরে ভূমিহীনদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ছিল প্রায় ২৪ শতাংশ। অবশ্য যদি আমরা নিখাদ বর্গাচাষীকে (pure tenant) ভূমিহীন হিসেবে না ধরে হিসাব করি, তাহলে ভূমিহীনের (অর্থাৎ ৪র্থ, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী) আপেক্ষিক গুরুত্ব দাঁড়ায় প্রায় ১৮ শতাংশ। এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, মালিক ও বর্গাচাষী মিলিয়ে যারা জমি চাষ করছিল তাদের সবার হাতে সমান জমি কখনই ছিল না। তবে ১৯৫১ সালের খামার আয়তন বিন্যাস বিষয়ক তথ্য আমাদের হাতে না থাকায় এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে আলোকপাত করা সম্ভব নয়। তবে ১১ বছর আগে প্রণীত 'বেঙ্গল ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন রিপোর্ট (১৯৪০)' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে স্যার ম্যালকম ডারলিং পরে উল্লেখ করে গেছেন—"বাংলার খামারসমূহের প্রায় অর্ধেকই তাদের মালিকদের পরিবারের জীবিকানির্বাহের জন্য আয়তনের দিক থেকে যথেষ্ট নয় .... কৃষিভিত্তিক জনসংখ্যার জন্য মাথাপিছু আবাদকৃত জমির পরিমাণ এখন এক একরের সামান্য কিছু কম।"[১০] সুতরাং ১৯৪০ সালেই যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে ১৯৫১ সালে এসে এই অবস্থার যে আরো অবনতি হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৯৫০ সালে 'ইস্ট বেঙ্গল স্টেট একুইজিশন এ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে পাকিস্তানের রাষ্ট্রশক্তি মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারি প্রথা বিলোপের যে অভিযান চালায় তা বিরাজমান অবস্থার মৌলিক সংস্কার সাধনে সক্ষম হয় নি। একথা ঠিক যে, শহরে বসবাসকারী অতি বৃহৎ হিন্দু ভূস্বামী এবং তাদের সঙ্গে জড়িত তালুকদার, পত্তনিদার, দর পত্তনিদার ইত্যাদি বহু রকমের যেসমস্ত মধ্যস্বত্বভোগী তখনো ছিল, সংস্কারের মাধ্যমে তাদের অধিকারের বিলুপ্তি

১০. স্যার ম্যালকম ডারলিং-এর এই উদ্ধৃতি ১৯৪০ সালের অবস্থা নির্দেশ করছে। জমির চরম অভাব এবং জমি বণ্টনে আপেক্ষিক বৈষম্য দুটি দিকই এই উদ্ধৃতিতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। পরবর্তীকালে অবস্থার অবনতি বই উন্নতি হয় নি। আবাদকৃত জমির প্রাপ্যতা মাথাপিছু আধা একরের নিচে নেমে গিয়েছিল (১৯৫১ সালে) এবং আপেক্ষিক বৈষম্যের খুব একটা হেরফের হয় নি। দেখুন, Sir Malcolm Darling, *Report on Labour Conditions In Agriculture In East Pakistan*, (Karachi 1955)

ঘটানো হয়েছিল। কিন্তু তাদের স্থলে 'চাষী' নাম ধারণ করে গ্রামাঞ্চলে অচিরেই একটি মুসলিম জোতদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল এবং ভূমিহীন ও বর্গাচাষীর জমির উপর নিয়ন্ত্রণ বা নিরাপত্তা কিছুই এই আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হয় নি। বাস্তবে আইনের সংজ্ঞার ফাঁক দিয়ে 'জোতদার' হয়ে গেলেন চাষী প্রজা (cultivating tenant) এবং বর্গাচাষী হয়ে গেলেন জোতদারের জমিতে নিয়োজিত নিছক কৃষিশ্রমিক।[১১] তদুপরি আইনে প্রথমে ১০০ বিঘা ভূমিমালিকানা সিলিং-এর পদক্ষেপ গৃহীত হলেও পরে চাপের মুখে সেখান থেকেও পিছিয়ে আসা হয় এবং সিলিং নীতিটি নিছক বাগাড়ম্বরে পরিণত হয়।

তৎকালে পূর্ব বাংলায় কৃষির উৎপাদনশীলতা মূলত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করতো। প্রথম, জলসেচের ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়, কৃষি-উপকরণ কেনার জন্য কৃষকের হাতে পর্যাপ্ত নগদ টাকা বা ঋণের ব্যবস্থা। বাস্তবে এই দুই দিক থেকেই সেই সময় কৃষি ছিল নিদারুণভাবে অবহেলিত। ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব বাংলায় জলসেচের বিভিন্ন উৎসভেদে জমির বিভিন্ন পরিমাণের একটি হিসাব নিম্নোক্ত সারণিতে তুলে ধরা হলো :

সারণি ৬ : পূর্ব বাংলায় সেচের অধীন জমির উৎসসমূহের বিন্যাস, ১৯৪৯-৫০

সেচের উৎস	জমির পরিমাণ (হাজার একরে)	সেচের অধীন মোট জমির পরিমাণ (শতাংশ)
১. সরকারি খাল	০৬	১.৪৮
২. বেসরকারি খাল	৪৭	১১.৬৩
৩. পুকুর	১৫	৩.৭১
৪. কূপ	১২	২.৯৭
৫. অন্যান্য উৎস	৩২৪	৮০.১৯
মোট	৪০৪	১০০

উৎস : J. R. Andrus, and others প্রাগুক্ত, 79.

সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব বাংলায় সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ৪ লক্ষ ৪ হাজার একর। সেই হিসেবে বলা যায়, মোট আবাদি জমির (২০.০৯ মিঃ একর) মাত্র ১.৮২ শতাংশ ছিল সেচের আওতাধীন। যেহেতু চাষতীব্রতা ছিল তখন মাত্র ১.২৮ শতাংশ, সুতরাং চাষকৃত জমির পরিমাণ (cropped land) ছিল

১১. ১৯৫০ সালের সংস্কার আইনে 'চাষীব' সংজ্ঞা দেয়া হয়েছিল ইংরেজিতে 'tenure holder who cultivated with the help of bargadars' এবং এভাবে 'জোতদারিকে' অনুপস্থিত বৃহৎ জমিদারি থেকে পৃথক দেখিয়ে আইনের দৃষ্টিতে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। এই ফাঁকির বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যের জন্য দেখুন, J. R. Andrus, *The Economy of Pakistan*, 120-122.

২৫.৭১ মিলিয়ন একর। আরেকটি হিসাব থেকে জানা যায় যে, মোট চাষকৃত জমির মধ্যে ২৫.২৫ মিলিয়ন একরই ছিল সেচসুবিধাহীন। মাত্র ০.৪৫৮ মিলিয়ন একর ছিল সেচের সুবিধাসহ চাষের অধীনে অর্থাৎ চাষকৃত জমির মাত্র ১.৭৮ শতাংশ ছিল সেচের অধীন।[১২] সুতরাং আবাদযোগ্য জমি এবং চাষকৃত জমি উভয় বিচারেই জলসেচের মাত্রা ছিল খুবই নগণ্য। সেই সময় কৃষিতে পুঁজি সরবরাহেরও তেমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল না। সারা পূর্ব বাংলায় মাত্র ৩০,০০০টি সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হতো। প্রাক্কলিত হিসাব অনুসারে এরা মোট ঋণচাহিদার মাত্র ১২ শতাংশ পূরণ করতে সক্ষম হতো। বাকি ৮৮ শতাংশ ঋণচাহিদা পূরণ হতো মহাজনদের দ্বারা।[১৩]

অপর্যাপ্ত ঋণ এবং জলসেচের প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে স্বল্প উৎপাদনশীলতা। দুটি প্রধান ফসল ধান ও পাটের ফলন ও তাদের চাষের জন্য জমি ব্যবহারের তুলনামূলক মূল্যায়ন থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। ৭ নং সারণিতে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। সারণিতে দেখা যায়, ১৯৪৭—১৯৫১-৫২ পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য গড়ে ধানী জমির পরিমাণ ছিল ১৯.৬৫ মিলিয়ন একর অর্থাৎ মোট আবাদি জমির প্রায় ৮৬ শতাংশ। এই পরিমাণ জমিতে ধানের মোট ফলন ছিল গড়ে ৭.২৩৩ মিলিয়ন টন। অতএব একরপ্রতি ফলন ছিল মাত্র ০.৩৬ টন বা মাত্র ৯.৫ মণ। আরো উদ্বেগজনক ব্যাপার হচ্ছে, স্বল্পকালের ব্যবধানে ধানী জমি যে হারে বেড়েছিল ধানের মোট ফলন সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নি। ১৯৪৭—৫১-৫২ সালের তুলনায় ১৯৫৪-৫৫ সাল নাগাদ ধানী জমির পরিমাণ ৮.৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে মোট ফলন বৃদ্ধি পায় মাত্র ৪.৯৩ শতাংশ। এর অনিবার্য ফল হচ্ছে একরপ্রতি ফলন হ্রাস। এই সময়ে একরপ্রতি ফলন ০.৩৬ টন থেকে কমে ০.৩৫ টনে পরিণত হয়। অবশ্য পাটের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক এরকম হয় নি। যেহেতু এই সময় ধানী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং কৃষি আরো একমুখী ও আত্মপোষণশীল (mono cropped subsistence oriented agriculture) আকৃতি ধারণ করেছিল, সেহেতু অনিবার্যভাবে পাটচাষের জমি ও মোট ফলন দুই-ই তখন হ্রাস পেয়েছিল। উল্লিখিত কালপর্বে পাটচাষের জমি হ্রাস পেয়েছে প্রায় ২৮ শতাংশ, পক্ষান্তরে মোট ফলন হ্রাস পেয়েছে প্রায় ২২ শতাংশ। ফলে একরপ্রতি ফলন ০.৫৫ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০.৬৭ টন হয়েছে। যাই হোক, সামগ্রিক বিচারে দেখা যায়, আমাদের কৃষিতে প্রধানতম ফসল ধানের ক্ষেত্রে উৎপাদন ও জমির ব্যবহার বাড়লেও একরপ্রতি ফলন কমেছে আর দ্বিতীয় প্রধান ও নগদ অর্থ আদায়কারী ফসল পাটের ক্ষেত্রে একরপ্রতি ফলন বাড়লেও মোট উৎপাদন ও জমির ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমসাময়িক অন্যান্য দেশের ফলনের হারের সঙ্গে পূর্ব বাংলার প্রধান ফসল ধানের ফলনের হার তুলনা করলে

---

১২. প্রাগুক্ত, ৭৯।

১৩. দেখুন, Nur Ahmed, *East Pakistan as it is.*

উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাৎপদতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে (সারণি ৮ দ্রষ্টব্য)। দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৭-৪৮—১৯৫১-৫২ কালপর্বে গড়ে আমাদের ধান উৎপাদনশীলতার তুলনায় জাপানে উৎপাদনশীলতা ছিল ৪ গুণেরও বেশি, গ্রেট বৃটেন ও চীনে ছিল প্রায় ৩ গুণ বেশি, মিশরে প্রায় দ্বিগুণ বেশি, ভারতে ২৮ শতাংশ এবং আমেরিকায় ২৬ শতাংশ বেশি।

সারণি ৭ : ধান ও পাটের অধীনে জমি ও মোট উৎপাদন : ১৯৪৭-৫২ থেকে ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত

	বছর							
	গড়		গড়		গড়		গড়	
ফসল	১৯৪৭ -১৯৫২		১৯৫২-৫৩		১৯৫৩-৫৪		১৯৫৪-৫৫	
	জমি (হাজার একর)	ফলন (হাজার টন)	জমি	ফলন	জমি	ফলন	জমি	ফলন
ধান	১৯৬৫৩	৭২৩৩	২০৭৭৮	৭৩৩৫	২২০১০	৮২৪৫	২১৩৩৬	৭৫৯০
পাট	১৭০৫	৯৪৪	১৯০৭	১২১৮	৯৬৫	৬৪৫	১২৪৩	৮৩৩

উৎস ঃ J. R. Andrus, and others প্রাগুক্ত, 32, 57..

সারণি ৮ : ধানের একরপ্রতি ফলন (১৯৪৭-৫১/৫২) ঃ আন্তর্জাতিক তুলনা

দেশের নাম	একর প্রতি ফলন (পাউন্ড/একর)	সূচক
পূর্ব বাংলা	৮১৫	১০০
যুক্তরাষ্ট্র	১০২৬	১২৬
ভারত	১০৪৪	১২৮
বৃটেন	২১৬৬	২৬৫
চীন	২২৪৬	২৭৫
মিশর	১৬২০	১৯৯
জাপান	৩৩৬১	৪১২

উৎস ঃ J. R. Andrus, and others প্রাগুক্ত, 40.

কৃষির পরে শিল্পের দিকে যদি আমরা এখন মনোযোগ দেই তাহলে দেখবো, পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিল্প-উত্তরাধিকারটি ছিল খুবই দুর্বল। তুলনামূলক বিচারে তা অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্বতঃপ্রতীয়মান। ১৯৪৭-৪৮ সালে অবিভক্ত ভারতে যৌথ মূলধনভিত্তিক বড় ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান ছিল মোট পঁচিশ হাজার। এসব প্রতিষ্ঠানের মোট আদায়কৃত

মূলধনের (paid up capital) পরিমাণ ছিল ৫৮৫ কোটি টাকা। পাকিস্তান সৃষ্টির পর সমগ্র পাকিস্তানের ভাগে পড়ে মাত্র ২.৮ হাজার প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ভারতের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাত্র শতকরা ১১ ভাগ। তবে এই শতকরা ১১ ভাগ প্রতিষ্ঠানের আদায়কৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট মূলধনের শতকরা মাত্র ২.৫ ভাগ। আবার পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব বাংলার অবস্থা ছিল আরো করুণ। পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১.৩ হাজার অর্থাৎ পাকিস্তানের মোট প্রতিষ্ঠানের ৪৬ শতাংশ এবং আদায়কৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি টাকা অর্থাৎ পাকিস্তানের মোট মূলধনের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ।[১৪] স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই সময় পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ পূর্ব বাংলায় বসবাস করতো।

বস্তুত ভারতবর্ষে যেটুকু শিল্পায়ন বৃটিশ আমলে হয়েছিল তা ঔপনিবেশিক বিশেষ স্বার্থের কারণে প্রধানত কেন্দ্রীভূত ছিল বন্দরনগরীর মধ্যে আর বাংলাদেশের বন্দরনগরী হিসেবে গড়ে উঠেছিল তদানীন্তন কলকাতা নগরী। তাই 'পূর্ব বাংলা' বরাববই কাঁচামাল সরবরাহকারী প্রান্তিক এলাকা হিসেবেই গড়ে উঠেছিল। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, প্রধান পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব বাংলায় কোন পাটকল ছিল না। নারায়ণগঞ্জ ও আশেপাশে কিছু 'জুট বেলিং ও প্রেসিং'-এর কাজ হতো এবং প্রক্রিয়াকৃত শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের জন্য পাট চলে যেতো কলকাতায়। পূর্ব বাংলা তাই ছিল প্রধানত কাঁচা পাট রপ্তানিকারক। অবশ্য পরবর্তীকালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভারতে যখন কাঁচা পাট রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়, তখন এ অঞ্চলে পাটশিল্প গড়ে উঠার চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। তবে সে সুযোগ প্রধানত ব্যবহার করেছিল অবাঙালি উদ্যোক্তা-মালিকগণ। শুধু পাটকল নয়, তখন পযন্ত পূর্ব বাংলায় কোন লৌহ কারখানা বা সিগারেট কারখানা ছিল না। সাকুল্যে কয়েকটি বৃহৎ কাপড়ের কল, দু'একটি চিনিকল, কয়েকটি চা-বাগান, একটি সিমেন্ট কারখানা, কিছু 'রাইস মিল', ময়দার কল—এই ছিল পূর্ব বাংলার মোট শিল্পসম্পদ।[১৫] কিন্তু এসবেরও মালিক ছিলেন মূলত হিন্দু উদ্যোক্তাবৃন্দ। দেশবিভাগের পর তাদের ব্যাপকহারে বহির্গমনের ফলে এসব ক্ষেত্রেও শূন্যতা ও নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল।

১৪. তথ্যের উৎস : আবদুল্লাহ ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস,* (ঢাকা ১৯৮৩), ৮৪।

১৫. প্রাগুক্ত, মূল উৎস হচ্ছে— C. N. Vakil, *Economic Consequences of Divided India,* (Bombay 1950), 78। এছাড়া আরেকটি গ্রন্থে ১৯৫১ সালে 'পূর্ব বাংলায়' অবস্থিত মোট শিল্প কারখানার (রেজিস্ট্রিকৃত) সংখ্যা মাত্র ৩২৭টি বলে উল্লেখ করা হয়। এসব কারখানার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১১৬টি চা-কারখানা, ৮৩টি চালকল, ৬৪টি জুটপ্রেস, ১৫টি বস্ত্রকল এবং ১০টি চিনিকল। এসব রেজিস্ট্রিকৃত কারখানায় ১৯৫১ সালে শ্রমিকসংখ্যা ছিল মাত্র ৪৩৫০৪ জন অর্থাৎ মোট জনংখ্যার এক হাজার ভাগের এক ভাগেরও কম। দেখুন, Nur Ahmed, *East Pakistan as it is* (Chittagong 1956), 32-33.

১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় শিল্প-উৎপাদন একেবারে নগণ্য মাত্রা থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। লক্ষণীয় যে, এই ছয় বছরে কৃষি-উৎপাদন ও জাতীয় উৎপাদন যথাক্রমে মাত্র ১১ শতাংশ এবং ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, পক্ষান্তরে শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় ৬১ শতাংশ। অর্থাৎ কৃষিখাতে গড়ে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ২.২ শতাংশ হারে, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩ শতাংশ হারে এবং শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ১০ শতাংশ হারে। এর ফলে জাতীয় উৎপাদনকাঠামোতে কিছুটা অনুকূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। ১৯৪৯-৫০ সালে জাতীয় উৎপাদনে কৃষি ও শিল্পের অংশ ছিল যথাক্রমে ৬৫ এবং ৩ শতাংশ। ১৯৫৪-৫৫ সালে সামান্য হলেও তা পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৩ এবং ৪.২০ শতাংশ।[১৬]

এই সময় শিল্পখাতে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক উপখাত ছিল। একটি ছিল নেতৃত্বদানকারী, সদ্য গড়ে উঠা ও দ্রুত বর্ধমান আধুনিক বৃহদায়তন ম্যানুফেকচার, অপরটি ছিল চলে আসা অবিকশিত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পখাত। উন্নত কুটিরশিল্পও দ্বিতীয় উপখাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলোচ্য কালপর্বে যদিও সমগ্র শিল্প-উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০ শতাংশ, কিন্তু বৃহদায়তন শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার ছিল গড় হারের দ্বিগুণেরও বেশি অর্থাৎ ২৩ শতাংশ।[১৭] পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে প্রবৃদ্ধির হার ছিল গড় হারের অর্ধেক অর্থাৎ ৫ শতাংশ। তবে মনে রাখা ভাল যে, এর পরেও ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৫৪-৫৫তে ছিল ৩৪.৫ কোটি টাকা (১৯৫৯-৬০), স্থির দামে যা ছিল বৃহদায়তন শিল্প-উৎপাদনের তুলনায় প্রায় ৭৩ শতাংশ বেশি। সুতরাং সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাথমিক লগ্নে পূর্ব বাংলায় শিল্পখাতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। নগণ্য ভিত্তি (base) থেকে এরকম দ্রুত বৃদ্ধি কোন অস্বাভাবিক বিষয় নয়। তবে এর পরেও শিল্পোৎপাদনে প্রথাগত ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের আধিপত্য তখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণই থেকে গিয়েছিল।

এতক্ষণ আমরা অর্থনীতির বিভিন্ন সামষ্টিক চলক (যেমন জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, গ্রাম-শহর আয়বৈষম্য, কৃষি-উৎপাদন, শিল্প-উৎপাদন ইত্যাদি) নিয়ে যে আলোচনা করেছি তাতে ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত 'পূর্ব বাংলার' অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি নৈরাশ্যজনক স্থবির চিত্রই ফুটে উঠেছে। কিন্তু সামষ্টিক চলকের গতিপ্রবণতা থেকে ব্যষ্টিক স্তরে জীবনযাত্রামানের গতিপ্রবণতা সম্পর্কে পরোক্ষ ধারণা পাওয়া গেলেও গভীরতর ধারণার জন্য তা খাত ও শ্রেণী অনুযায়ী আরো ভেঙে ভেঙে খতিয়ে দেখা দরকার। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এখানে শুধু এই সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রকৃত আয় ও জীবনযাত্রার মানের যে উঠানামা হয়েছিল সে বিষয়ে সামান্য কিছু তথ্য প্রদান করা হবে।

১৬. Mohiuddin Alamgir and others, *Bangladesh National Income and Expenditure*, (Dhaka 1974), 167

১৭. ঐ, 39.

প্রথমেই গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী ২৪ শতাংশ ভূমিহীন মজুরদের প্রকৃত মজুরির উঠানামার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা যাক। ৯ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৯-৫০ সালকে ভিত্তিবছর ধরলে এই সময়কালে কৃষিমজুরদের প্রকৃত মজুরি মূলত হ্রাস পেয়েছে এবং হ্রাসের হার ছিল ২৩ শতাংশ (অর্থাৎ ১০০ থেকে ৭৭)। তবে চালের হিসাবে এই সময় মজুরি মোটামুটি স্থির ছিল। ১৯৫০ সালে একজন কৃষিমজুর ১.৬২ টাকা মজুরি পেতো এবং তা দিয়ে ৩.২৪ কে. জি. চাল ক্রয় করা যেতো। ১৯৫৫ সালে তার মজুরি ১.৩২ টাকায় নেমে আসে, তবে তা দিয়ে তখনও তার পক্ষে ৩.২২ কে. জি. চাল ক্রয় করা সম্ভব ছিল। আজকের তুলনায় এ মজুরির মাত্রা খারাপ নয়; কিন্তু যেটি লক্ষণীয় তা হচ্ছে এর নিম্নগামী প্রবণতা, যা পরবর্তীতেও অটুট ছিল। এই সঙ্গে আরো মনে রাখতে হবে যে, এই মজুরি হচ্ছে গড় মজুরি, কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে গ্রামাঞ্চলে যখন কাজের অভাব দেখা দিত তখন মজুরি এর চেয়ে অনেক নিচেও নেমে যেতো। স্যার ম্যালকম ডারলিং এই সময়কালে (১৯৫২-৫৩) আই. এল. ও'র পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন গ্রামে কৃষিশ্রমিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য এসেছিলেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে কৃষিমজুরদের মজুরি এমনকি ০.৫০ টাকায়ও নেমে যায়। এমনকি তাঁর ভাষায় মজুর অনেক সময় শুধু পেটে-ভাতে কাজ করতে বাধ্য হতো।[১৮]

সারণি ৯ : পুরুষ কৃষি-শ্রমিকদের মজুরির গতিপ্রবণতা : ১৯৪৯-১৯৫৫

সন	দৈনিক মজুরি (টাকায়)	মোটা চালে রূপান্তরিত দৈনিক মজুরি (কে. জি.)	প্রকৃত মজুরি (১৯৭২-৭৪ সালের দামে) (সূচক)
১৯৪৯	১.৯২	-	১১.৯২ (১০০)
১৯৫০	১.৬২	৩.২৪	১০.১৭ (৮৫)
১৯৫১	১.৫৬	৩.০৬	৯.৫৫ (৮০)
১৯৫২	১.৫২	২.৭১	৯.৪২ (৭৯)
১৯৫৩	১.৩৮	২.৭১	৮.১৯ (৬৯)
১৯৫৫	১.৩২	৩.২২	৯.২১ (৭৭)

উৎস : Mahabub Hossain and A. R. Khan, The Strategy of Development in Bangladesh, (London 1989), 159.

আলোচ্য পর্বে সমগ্র গ্রামবাসীদের আয় ও ভোগের মানও যে খুব নিচু ছিল তা গ্রামবাসীর গড় মাথাপিছু আয়ের নিম্নমান (১৯৫৯-৬০ সালে মাসিক প্রায় ২২ টাকা)

---

১৮. Sir Malcolm Darling, *Report on Labour Condition*, (Karachi 1955).

থেকেই প্রতীয়মান হয়। যেহেতু ১৯৫৯-৬০ সালে চালের দাম ছিল প্রায় ৩০.১৯ টাকা মণ, সেহেতু চালের হিসাবে গড় মাসিক আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ১.৩৯ মণ। এটা কৃষিমজুরের মাসিক আয়ের চেয়ে আপাতদৃষ্টিতে কম মনে হলেও এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, একজন মজুরের আয়ের উপর নির্ভর করতো ৪-৫ জন লোক এবং প্রতিদিন মজুরের কর্মসংস্থানের সুযোগও ছিল না। পক্ষান্তরে উপরে বর্ণিত অঙ্কটি গ্রামীণ গড় মাথাপিছু আয় নির্দেশক। ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গ্রামীণ জনগণের আয় ও ভোগ সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলে এক জরিপ চালানো হয়েছিল। সেই জরিপে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, সেই সময়ে গ্রামে দৈনিক মাত্র এক বেলা বা তার চেয়েও কম আহারের সুযোগ পায় এরকম পরিবারের সংখ্যা ছিল শতকরা পাঁচ ভাগ। আরো শতকরা ৪৫ ভাগ পরিবার ছিল, যারা দৈনিক এক বেলার বেশি কিন্তু সপ্তাহে ১০ বারের কম (অর্থাৎ দৈনিক দেড় বেলার কম) আহার করতো। এই দুই শ্রেণীর লোককে আমরা ঘাটতি দরিদ্র পরিবার হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি এবং তদনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, ১৯৫৬ সালে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পরিবারের আপেক্ষিক হার ছিল ৫০ শতাংশ। ঔপনিবেশিক আমলে ১৯১৬ সালে বাংলাদেশে মেজর জে. সি, জ্যাক হুবহু একই পদ্ধতিতে অনুরূপ একটি জরিপ চালিয়েছিলেন। তাঁর তথ্যের সঙ্গে ১৯৫৬ সালের তথ্য মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, ৪০ বছর পরেও বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার প্রায় একই রকম রয়ে গেছে।[১৯]

কৃষিখাতের তুলনায় শিল্পখাতে যদিও শ্রমিকসংখ্যা খুবই নগণ্য, তবুও এই সময়কালে শিল্পখাতে যে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল (গড়ে ১০ শতাংশ বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হারে), তার ফলাফল শ্রমিকরা কতটুকু পেয়েছিল সে বিষয়ে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ১০ নং সারণিতে ১৯৫১-৫৩ কালপর্বে পূর্ব বাংলার অপেক্ষাকৃত স্থায়ী শিল্পসমূহে (perennial industries) শিল্পশ্রমিকদের বার্ষিক আয়ের উঠানামা দেখানো হয়েছে। এ থেকে দেখা যায়, টাকার অঙ্কে আয় প্রথম বছরে তথা ১৯৫১-৫২ সালে ১.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও ঐ সময় শ্রমিকদের (নারায়ণগঞ্জে) জীবনযাত্রার ব্যয়সূচক ৬.৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অতএব ধরে নেয়া যায় যে, প্রকৃত আয় প্রায় ৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫২ থেকে ১৯৫৩-এর মধ্যে টাকার অঙ্কে আয় হ্রাস পেয়েছিল ৫.২ শতাংশ আর ঐ একই সময়ে শ্রমিকদের (নারায়ণগঞ্জে) জীবনযাত্রাব্যয়সূচক হ্রাসের হার ছিল মাত্র ১.৮০ শতাংশ। অর্থাৎ এর পরের বছরও প্রকৃত আয় প্রায় ৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। সুতরাং অন্তত ১৯৫১-৫৩ কালপর্বে শ্রমিকদের গড় বার্ষিক প্রকৃত আয় বৃদ্ধি তো পায়ইনি, বরং ৩ শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছিল। এ. আর. খান প্রদত্ত আরেকটি হিসাব থেকে জানা যায় যে, ১৯৫৪ সালকে ভিত্তিবছর (১০০) ধরলে শহুরে শিল্পশ্রমিকদের প্রকৃত গড় মজুরিসূচকটি ১৯৫৫ সালে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৮৮ অর্থাৎ প্রকৃত

১৯. Dr Abdullah Farouk et al., *Rural Credit and Unemployment In East Pakistan,* (Dhaka 1958), 43-45

মজুরি সেই বছর প্রায় ২২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।[২০] সুতরাং সামগ্রিক বিচারে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আলোচ্য কালপর্বে পূর্ব বাংলার শ্রমিকরা সাধারণভাবে বর্ধিত শিল্পোৎপাদনের কোন সুফল লাভ করে নি। বরং কৃষিমজুরদের মতোই তাদের প্রকৃত মজুরি বা আয় স্থবির বা নিম্নগামী ছিল।[২১]

সারণি ১০ : স্থায়ী শিল্পকারখানাসমূহের শ্রমিকদের গড় বার্ষিক আয় : ১৯৫১-৫৩

সন	সকল শিল্পের জন্য শ্রমিকদের আয় (টাকায়)	শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়সূচক
১৯৫১	৭৭১.৭০	১০৪
১৯৫২	৮৩৩.০০	১১১
১৯৫৩	৭৯৮.০০	১০৯

টীকা: ক. এখানে সকল শিল্প বলতে পূর্ব বাংলার পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, কাগজ ও মুদ্রণশিল্প , কাঠ, পাথর ও কাঁচশিল্প, চামড়াশিল্প ও অন্যান্য স্থায়ী রেজিস্ট্রিকৃত কারখানা বোঝানো হয়েছে।

খ. শ্রমিক বলতে শুধু সেসমস্ত কর্মচারীকে বোঝানো হয়েছে যারা 'মজুরি অধ্যাদেশের' অধীনে মাসিক ২০০ টাকার কম মজুরি পেয়ে থাকেন।

গ. শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়সূচকটি নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকদের জন্য প্রণীত এবং ভিত্তিবছর হচ্ছে ১৯৪৮-৪৯=১০০।

উৎস : J. R. Andrus, et. al , The Economy of Pakistan, (London 1958), 418, 440.

পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুমৃত্যুর হার ইত্যাদি সূচকগুলিও মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুসারে 'সাক্ষরতার হার' ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ২১.১১ শতাংশ। তবে এর মধ্যে এমন ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি শুধুমাত্র আরবি ভাষায় লিখিত কুরআন শরিফ পড়তে পারতেন (অর্থ না বুঝে)। যদি এদেরকে বাদ দিয়ে আমরা শুধু তাদেরকেই 'সাক্ষর ব্যক্তি' বলি, যারা অন্তত মাতৃভাষায় পড়তে, লিখতে ও বুঝতে পারেন, তা হলে ১৯৫১ সালে

২০. A. R. Khan, *Bangladesh*, 19.

২১. আরেকটি প্রবন্ধে অর্থনীতিবিদ এ. আর. খান দেখিয়েছেন যে, পূর্ব বাংলায় ১৯৫৪ সালে সমগ্র শিল্পখাতে মোট সংযোজিত মূল্যের মাত্র ৪৬ শতাংশ শ্রমিকদের ভাগে জুটেছিল এবং এর পর থেকে তা ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ১৯৬২-৬৩ সাল নাগাদ শ্রমিকদের হিস্যার পরিমাণ মাত্র ২৬ থেকে ২৮ শতাংশ দাঁড়ায়। বিশেষ শিল্প পাটের ক্ষেত্রেও ১৯৫৪ সালে সংযোজিত মূল্যে (value added) শ্রমিকদের হিস্যা ছিল মাত্র ৪৫ শতাংশ এবং ১৯৬২-৬৩ সালে তা দাঁড়ায় ২৯ থেকে ৪১ শতাংশে। দেখুন, A. R. Khan,"What has been happening to Real Wages In Pakistan?" *P. D. R. Autumn*, No. 3, Karachi, 336.

প্রকৃত সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়াবে মাত্র ৫৯ লক্ষ ৪৫ হাজার জন তথা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৪ শতাংশ। লক্ষণীয় যে, এই একই সংজ্ঞানুযায়ী ১৯৪১ সালে এই অঞ্চলে সাক্ষর ব্যক্তির হার ছিল ১৩.৮৮ শতাংশ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত অর্থে ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত এই দশ বছরে এই অঞ্চলে সাক্ষরতার হারে কার্যত কোন অগ্রগতি হয় নি। ভবিষ্যতেও এক্ষেত্রে অগ্রগতির সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। কারণ ১৯৫১ সালে ৫ থেকে ৯ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মাত্র ১৭ শতাংশ স্কুলে যাওয়া-আসা করতো। ১২ বছরের নিচে শিশুর সংখ্যা ছিল ৮৮ লাখ। তার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই কোন রকম বিদ্যালয়ের ছায়া মাড়াতো না।[২২]

স্বাস্থ্যখাতেও পরিস্থিতি ছিল রীতিমতো উদ্বেগজনক। সারা পূর্ব বাংলার প্রায় সারে চার কোটি লোকের জন্য ১৯৫১ সালে পাশ করা ডাক্তার ও সার্জেনের সংখ্যা ছিল সর্বমোট মাত্র ৬৪৬০ জন। অর্থাৎ গড়ে প্রতি ৬৯৬৫ জনের জন্য একজন ডাক্তার। আর মোট স্বাস্থ্যকর্মচারী (ডাক্তারসহ) ছিল ২৭০২০ জন অর্থাৎ প্রতি ১৬৬৫ জনে একজন। প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে ১৬০ জন এক বছরে পা দেয়ার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। পক্ষান্তরে সেই সময় বৃটেনে শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজারে মাত্র ২০ থেকে ৩০ জন।[২৩]

সুতরাং সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জীবনের মান (quality of life) উভয়দিক থেকেই পূর্ব বাংলার প্রাথমিক পর্বের অবস্থাটা আনন্দদায়ক ছিল না। অধিকাংশ অর্থনৈতিক চলকের (variables) গতিপ্রবণতা ছিল (শিল্প বাদে) স্থবির বা নিম্নগামী। আর যেখানে যেটুকু প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল তার মাত্রা ছিল জনগণের আশার তুলনায় অনেক নিচে, তার বণ্টনপ্রণালীও ছিল প্রচণ্ডভাবে বৈষম্যমূলক এবং শুধু শ্রেণীবৈষম্য নয়, আঞ্চলিক বৈষম্যের মাত্রাও ছিল শুরু থেকেই ক্রমবর্ধমান।

২. '৫০-এর দশকের অন্তিম পর্ব ও '৬০-এর দশকের অর্থনৈতিক গতিপ্রবণতা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত সাধারণ অর্থনৈতিক গতিধারার যে চিত্র তুলে ধরেছি তা কি পরবর্তীতে একই ধারায় অগ্রসর হয়েছিল ? নিম্নে ১১ নং সারণিতে প্রদত্ত তথ্য থেকে এ বিষয়ে কিছু ধারণা পাওয়া যাবে :

১১ নং সারণিতে প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯৫৪-৫৫ সালের পরবর্তী পাঁচ বছর বা পঞ্চাশের দশকের অন্তিম পর্বে পূর্ব বাংলার প্রকৃত মাথাপিছু আয় আগের মতো শুধু স্থবির থাকে নি, বরং ২৭১ টাকা থেকে ২৬২ টাকায় নেমে গেছে অর্থাৎ পাঁচ বছরে প্রায় ৩.৪৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। যদিও এই সময়ে মোট জাতীয় আয় প্রায় ৯ শতাংশ

২২. Nur Ahmed, *East Pakistan as it is* (Chittagong 1956), 27.
২৩. ঐ, 39.

বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু তাকে অতিক্রম করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় ১৩ শতাংশ সেজন্যই মাথাপিছু আয়ের এই অবনতি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

সারণি ১১ : জাতীয় উৎপাদন, মোট জনসংখ্যা, মাথাপিছু উৎপাদন ইত্যাদি চলকের গতিপ্রবণতা : ১৯৫৪-৫৫-১৯৬৯-৭০

বিষয়	সন ১৯৫৪-৫৫	সন ১৯৫৯-৬০	সন ১৯৬৯-৭০
মোট জাতীয় উৎপাদন (মিলিয়ন টাকা)	১৩২৮৮	১৪৪৮৯	২১৯৪২
মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৪৭.৭২	৫৩.৯০	৭২.৪০
মাথাপিছু উৎপাদন (টাকা)	২৭১	২৬২	২৯৭

টীকা : ক. এখানে মোট জাতীয় উৎপাদন ১৯৫৯-৬০ সালের স্থির দামে পরিমাপ করা হয়েছে।

উৎস : Mohiuddin Alamgir and Berlage,"Bangladesh", 162.

অবশ্য পরবর্তী দশ বছরে বা ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৫১.৪৩ শতাংশ। পক্ষান্তরে একই সময়ে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ৩৪.৩২ শতাংশ। সুতরাং এই কালপর্বে অর্থাৎ ১০ বছরে মাথাপিছু আয়ের ঊর্ধ্বগতির হার ছিল প্রায় ১৩ শতাংশ। সেই হিসেবে বলা যায় যে, ষাটের দশকে এসে পূর্ব বাংলার অর্থনীতিতে পূর্বেকার স্থবিরতা বা নিম্নগামিতার পরিবর্তে কিছুটা ঊর্ধ্বগামিতা ও সচলতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। মহিউদ্দীন খান আলমগীর ও বার্লেজ বিভিন্ন কালপর্বের জন্য বার্ষিক প্রবৃদ্ধির গড় চক্রবৃদ্ধিহারও (average annual compound rate of growth) পরিমাপ করেছেন। তাঁদের প্রাক্কলিত হিসাব থেকে জানা যায় যে, ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৯-৭০ কালপর্বে তথা বিশ বছরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির গড় বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিহার ছিল ৩.৩ শতাংশ। পক্ষান্তরে এই সময়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধির গড় আনুমানিক হার ছিল শতকরা ২.৫ ভাগ। অতএব সমগ্র পাকিস্তান আমলে মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল ০.৭০ অর্থাৎ এক শতাংশেরও কম।[২৪]

২৪. পাকিস্তান আমলের দুই দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার নিয়ে মতভেদ আছে। প্রথম দশকে দ্বিতীয় দশকের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম ছিল এটাই সাধারণভাবে মনে করা হয়। আমরা এখানে যে ২.৪ শতাংশ হারের কথা উল্লেখ করেছি সেটি এ বিষয়ে মাহবুব হোসেন ও এ. আর. খানের সর্বশেষ 'স্টাডি' থেকে নেয়া হয়েছে। দেখুন, Mahabub Hossain and A. R. Khan, *The Strategy of Development in Bangladesh*, (London 1987), 23.

এটা মোটেও কোন লক্ষণীয় প্রবৃদ্ধির হার ছিল না। তবে মনে রাখতে হবে, বিশ বছরের এই গড় হার দুটি দশকের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, প্রথম দশ বছর অর্থাৎ ১৯৪৯-৫০—১৯৫৯-৬০ কালপর্বে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ছিল নিম্নাভিমুখী। মহিউদ্দীন আলমগীর প্রমুখের হিসাব অনুসারে এই সময়ে মোট জাতীয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির চক্রবৃদ্ধিহার ছিল মাত্র ২.৩ শতাংশ, যা জনসংখ্যাবৃদ্ধির গড় হারের চেয়ে সামান্য কম ছিল।[২৫] পক্ষান্তরে, ষাটের দশকে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৩ শতাংশ, যা গড় জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের চেয়ে ১.৩ শতাংশ বেশি। এসব তথ্য থেকেই ধারণা করা হয় যে, ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার অর্থনীতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত বর্ধমান ছিল। কিন্তু ষাটের দশকের এই বর্ধিত প্রবৃদ্ধির হারও তদানীন্তন অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের অর্জিত হারের তুলনায় মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। ১২ নং সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার বর্ধিত প্রবৃদ্ধির হারটি সমগ্র পাকিস্তানের হারের মাত্র অর্ধেকের চেয়ে সামান্য বেশি। পাকিস্তানের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারও ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার তুলনায় ছিল ০.১ শতাংশ কম। সুতরাং বলা যায়, এই সময় পাকিস্তানের গড় মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ৩.৯ শতাংশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য তা ছিল নিশ্চিতভাবেই আরো বেশি। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের হারটি ছিল প্রায় ৫ গুণ বেশি বা ততোধিক। ১২ নং সারণিতে প্রদত্ত অন্যান্য দেশগুলির পরিসংখ্যানও দেখাচ্ছে যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পূর্ব বাংলা অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। যেখানে জাতীয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনবৃদ্ধির হার পিছিয়ে নেই (যেমন ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও যুক্তরাজ্য), সেখানে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার এত এগিয়ে আছে যে দুয়ে মিলে মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধি আবার পিছিয়ে গেছে। বস্তুত ষাটের দশকে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রস্তুতকৃত তালিকা অনুযায়ী ৩৭টি দেশ ছিল নিম্নআয়ের দেশ (low income countries)। তাদের মধ্যে পূর্ব বাংলার স্থান ছিল নিচের দিক থেকে তৃতীয়।[২৬] ষাটের দশকে সবগুলি নিম্নআয়ের দেশের গড় গুরুত্বসম্পন্ন প্রবৃদ্ধির হার (average weighted growth rate) ছিল ৩.৯ শতাংশ, যা পূর্ব বাংলার তুলনায় ছিল ০.৩ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ পূর্ব বাংলা তার সমগোত্রীয় নিম্নআয়ের দেশগুলির মধ্যেও নিম্নতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অধিকারী ছিল। এভাবে সামগ্রিকভাবে দেখলে ষাটের দশকে 'চাকচিক্যময় প্রবৃদ্ধির' বিষয়টি অপেক্ষাকৃত ম্লান এবং প্রকৃত রূপ নিয়ে আমাদের সামনে ধরা পড়ে এবং আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই কেন পঞ্চাশের দশকের তুলনায় ষাটের দশকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও পূর্ব বাংলার জনগণ শেষাবধি ১৯৭১ সালে অসন্তুষ্ট, বিক্ষুব্ধ এবং এমনকি সশস্ত্র সংগ্রামী হয়ে উঠেছিল।

---

২৫. এই তথ্য আমাদের আলোচনার সত্যতাকে (validity) পঞ্চাশের দশকের অন্তিম পর্বেও প্রলম্বিত করেছে।

২৬. পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে যে, ১৯৪৯-৫০ সালে আমাদের স্থান ছিল ৭০টি দেশের মধ্যে ৫৯ তম। অর্থাৎ নিচের দিক থেকে একাদশ।

সারণি ১২ : পূর্ব বাংলার প্রবৃদ্ধির হারের সঙ্গে কতিপয় নির্বাচিত দেশের প্রবৃদ্ধির হারের তুলনা : ১৯৬০-৭০

দেশের নাম	মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির শতকরা হার (১৯৬০-৭০)	জনসংখ্যাবৃদ্ধির শতকরা হার (১৯৬০-৭০)
পূর্ব বাংলা	৩ ৬	২.৯
সমগ্র পাকিস্তান	৬.৭	২.৮
শ্রীলংকা	৪.৬	২.৪
ভারত	৩.৬	২.৩
ন্দানেশিয়া	৩.৫	২.২
থাইল্যান্ড	৮.২	৩.১
ফিলিপাইন	৫.১	৩.০
দঃ কোরিয়া	৮.৫	২.৪
চীন (সমাজতান্ত্রিক)	৬.৬	১.৯
রাষ্ট্র	৪.৩	১.৩
যুক্তরাজ্য	২.৯	০.৫
জাপান	১০.৫	১.০

টীকা : এই তালিকায় প্রদত্ত হিসাব আমাদের আগের দেশীয় তালিকাসমূহের হিসাব থেকে সামান্য পৃথক। সম্ভবত আন্তর্জাতিক তুলনার জন্য যেসব 'এ্যাডজাস্টমেন্ট' করা হয়েছিল তাতেই এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

উৎস : "World Bank Deve!opment Report," 1979, 128, 158.

পূর্ব বাংলায় এই সময়ে ষাটের দশকে যে প্রবৃদ্ধিহার লক্ষ্য করা যায় তার পশ্চাতে নেতৃত্বদানকারী খাত ছিল ম্যানুফেকচারিং খাত। ফলে এই সময়ে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষির অবদান দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে এবং সেই স্থানটুকু শিল্প ও সার্ভিস সেক্টর দ্রুত দখল করে নেয়। পঞ্চাশের দশকের শেষে মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অংশ ছিল ৬০.৩৪ শতাংশ। কিন্তু ১৯৬৯-৭০ সালে সেই অংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫৩.৩৩ শতাংশ। পক্ষান্তরে, শিল্পখাতের অবদান ১৯৫৯-৬০ সালের ৫.৯৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৯-৭০ সালে ৭.৭৭ শতাংশে পরিণত হয়। সার্ভিস ও অন্যান্য সেক্টরের অবদানও ৩৩.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮.৯০ শতাংশে পরিণত হয়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ১৯৩১-৪৭ কালপর্বে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক কালপর্বে উৎপাদনকাঠামো যেমন কৃষিকেন্দ্রিক ও কৃষি অভিমুখে পরিবর্তনশীল ছিল, '৪৭-এর পর থেকে তা আর তেমনটি থাকে নি। সর্বভারতীয় শিল্পএলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে পূর্ব বাংলায় প্রথম

থেকেই এক বাধ্যতামূলক শিল্পায়নপ্রক্রিয়া সূচিত হয়েছিল এবং তা ষাটেব দশকেও অব্যাহত থাকে, যা উৎপাদনকাঠামোতে শিল্পের অনুকূলে কিছু পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়। তবে লক্ষণীয় যে, শিল্পায়নের গতিবেগ সর্বদা সমান ছিল না। ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত বিশ বছরে সমগ্র ম্যানুফেকচারিং খাতে উৎপাদনবৃদ্ধির বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিহার ছিল ৮.৩ শতাংশ। এর মধ্যে বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক ১২.৯ শতাংশ, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ৬.১ শতাংশ হারে। কিন্তু এই বিশ বছরের প্রথম ১০ বছরে সমগ্র ম্যানুফেকচারিং উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধির চক্রবৃদ্ধিহার ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি তথা ৯.৬ শতাংশ। পক্ষান্তরে, ষাটের দশকে এই হার ছিল ৭ শতাংশ। তবে ষাটের দশকে প্রবৃদ্ধির ভিত্তি (base) যেহেতু ১৯৪৯-৫০-এর তুলনায় অনেক বড় ছিল, সেহেতু ষাটের দশকে প্রবৃদ্ধির হার নিম্নতর হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনবৃদ্ধির চরম মাত্রা (absolute level) তাৎপর্যপূর্ণভাবে উচ্চতর ছিল। পঞ্চাশের দশকে বৃহদায়তন শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রবৃদ্ধির তুলনায় প্রায় চার গুণ বেশি (অর্থাৎ যথাক্রমে ১৯.৩ শতাংশ এবং মাত্র ৫ শতাংশ)। কিন্তু ষাটের দশকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার ছিল বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় সামান্য বেশি (অর্থাৎ যথাক্রমে ৭.২ শতাংশ এবং ৬.৮ শতাংশ)।[২৭] ধীরগতিতে প্রবহমান এসব কাঠামোগত পরিবর্তন সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে পঞ্চাশের দশক এবং ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার জাতীয় উৎপাদনের সিংহভাগ কৃষি থেকেই উৎসারিত হচ্ছিল। ১৯৬৯-৭০ সালে অর্থাৎ সর্বশেষ বছরেও মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে ছিল ৫৫.৭ শতাংশ, যদিও পশ্চিম পাকিস্তানে ততোদিনে দ্রুততর শিল্পায়নের কারণে কৃষির অবদান ৪১.৬ শতাংশে নেমে গিয়েছিল। কাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার তুলনামূলক শ্লথগতি এবং তুলনামূলকভাবে অথবা চরম মাত্রা (absolute level) বিচারে উভয় দিক থেকেই এই অঞ্চলে কৃষির প্রাধান্যের বিষয়টি 'খাতওয়ারী কর্মনিয়োজনের বিন্যাসের' বিবর্তন থেকে আরো সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। ১৩ নং সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৬৬-৬৭ সালেও পূর্ব বাংলায় মোট কর্মনিয়োজনের ৭৭.৮ শতাংশই কৃষিখাতে নিয়োজিত, যদিও সেই সময় মোট উৎপাদনের ৫৫.৭ (১৯৬৯-৭০) শতাংশ আসতো কৃষিখাত থেকে। পক্ষান্তরে, একই সময়ে পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানে কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম-৪১.৬ শতাংশ (১৯৬৯-৭০) এবং কর্মনিয়োজনে কৃষির অংশও ছিল অপেক্ষাকৃত কম—৫৩.৪ শতাংশ (১৯৬৬-৬৭)। ১৩ নং সারণিতে একটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য হচ্ছে, পঞ্চাশের দশকে কর্মনিয়োজনে কৃষির অংশ পূর্ব বাংলায় হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ এই সময়ে পূর্ব বাংলায় জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান, আমরা জানি, সামান্য হলেও হ্রাস পেয়েছিল। এ থেকে মনে হয়, পঞ্চাশের দশকে

২৭. প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের উৎসের জন্য দেখুন, Mohiuddin Alamgir and Berlage, প্রাগুক্ত, ৩৬

শিল্পোৎপাদন মূলত বৃদ্ধি পেয়েছিল অত্যন্ত পুঁজিঘন বৃহদায়তন কতিপয় শিল্পের মাধ্যমে এবং এদের দ্বারা কৃষির উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাতের হার (absorptive rate) ছিল তুলনামূলকভাবে খুবই কম। আমাদের প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যও অনুরূপ সাক্ষ্যই প্রদান করে। পঞ্চাশের দশকে বৃহদায়তন ম্যানুফেকচারিং-এর প্রবৃদ্ধির হার ছিল যেখানে ১৯ শতাংশ, সেখানে শ্রমঘন ক্ষুদ্রায়তন ম্যানুফেকচারিং-এর প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ৫ শতাংশ।

বৃহদায়তন শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এই গতিধারা পঞ্চাশের দশকের অন্তিম পর্বে এবং সমগ্র ষাটের দশকে শহর এবং গ্রামের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে

সারণি ১৩ : পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে কর্মনিয়োজনের বিন্যাস

		সন	সন	সন
ক.	পূর্ব বাংলা			
		১৯৫১	১৯৬১	১৯৬৬-৬৭
	কৃষি	৮৪.৭	৮৫.৩	৭৭.৮
	শিল্প	৬.৬	৬.০	৯.৬
	সেবা	৮.৭	৮.৭	১২.৬
খ.	পশ্চিম পাকিস্তান	১৯৫১	১৯৬১	১৯৬৬-৬৭
	কৃষি	৬৫.৩	৫৯.৩	৫৩.৪
	শিল্প	১১.৬	২৯.২	২৫.৪
	সেবা	২৩.১	১০.৫	২১.২

উৎস : Keith Griffin and A. R. Khan (eds.), *Growth and Inequality in Pakistan*, (London), 4.

ব্যবধান ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এসময় যেটুকু শিল্পায়ন পূর্ব বাংলায় হয়েছে তা শুধু যে পুঁজিঘন ছিল তাই নয়, এটি কেন্দ্রীভূত ছিল শহরাঞ্চলে। ফলে শিল্পায়ন ও সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির সুফল শহরবাসীর মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ১৪নং সারণির হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত এই দীর্ঘ বিশ বছরে গ্রাম ও শহরের মাথাপিছু আয়ের অনুপাত ২ঃ ১.৫৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১ঃ ২.৭৩-এ পরিণত হয়েছে। তবে লক্ষণীয় যে, পঞ্চাশের দশকে এই বৈষম্য শুধু আপেক্ষিক অর্থে নয়, চরম অর্থেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে গ্রামীণ মাথাপিছু আয় ২৫৩ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২৪৪ টাকায় পরিণত হয়েছিল। পক্ষান্তরে ঐ একই সময়ে শহরের মাথাপিছু আয় ৫৯৬ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬২৫ টাকায় পরিণত হয়েছিল। ষাটের দশকে অবশ্য গ্রামীণ ও শহুরে মাথাপিছু আয় উভয়ই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তবু আপেক্ষিক বৈষম্য এই সময়েও বৃদ্ধি

পেয়েছে, কারণ গ্রামীণ মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হার শহুরে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হারের তুলনায় কম ছিল। প্রসঙ্গক্রমে সমসাময়িককালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে গ্রাম-শহর বৈষম্যের মাত্রা সংক্রান্ত চিত্রটি তুলনার সুবিধার জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতে এই বৈষম্য ছিল ১ : ১.৭৫, (১৯৬১-৬২), ইন্দোনেশিয়ায় ছিল ১ : ১.৩৬ (১৯৬৪-৬৫), শ্রীলংকায় ছিল ১ : ১.৮৮ (১৯৬৩) অর্থাৎ সব ক্ষেত্রেই দুয়ের কম। অথচ পূর্ব বাংলায় ন্যূনতম বৈষম্যমাত্রাটিই ছিল ১ : ২.৫৩ (১৯৪৯-৫০)।

পঞ্চাশের দশকের অন্তিম পর্ব ও ষাটের দশকের শিল্পায়ন শুধু যে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান বৃদ্ধি করেছিল তাই নয়, তা সমগ্র পাকিস্তানে কয়েকটি একচেটিয়া পুঁজিপতি পরিবারেরও জন্ম দিয়েছিল। এরা ছিল একই সঙ্গে ব্যাঙ্কপুঁজি, শিল্পপুঁজি ও বাণিজ্যপুঁজির প্রধান নিয়ন্ত্রক। গবেষক লরেন্স জে. হোয়াইটের গবেষণা থেকে জানা যায়, ১৯৬২ সাল নাগাদ সারা পাকিস্তানে ব্যক্তিমালিকানাধীন ফার্মের অধীনে মোট যতো সম্পদ ছিল তার ৭৩ শতাংশ ছিল মাত্র ৪৩টি পরিবারের করায়ত্ত। ম্যানুফেকচারিং খাতে ৭৭ শতাংশ সম্পদও ছিল এই ৪৩টি পরিবারের দখলে। এই ৪৩টি পরিবারের মধ্যে অবশ্য বাঙালি পরিবার ছিল মাত্র একটি—জনাব এ. কে. খানের পরিবার। এই ৪৩টি পরিবার পাকিস্তানের ব্যাঙ্ক ও ইন্স্যুরেন্সের সিংহভাগ সম্পত্তির মালিক ছিল। এক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইন্স্যুরেন্সসম্পদের প্রায় ৭৬ শতাংশের মালিক ছিল তারা। লরেন্স আরো উল্লেখ করেছেন যে, মাত্র ৭ জন পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি সকল ব্যাঙ্কজামানতের ৬০ শতাংশের মালিক ছিলেন এবং প্রায় ৪৯ শতাংশ ব্যাঙ্কসম্পদ তাঁদের করায়ত্ত ছিল।[২৮] বস্তুত সর্বশেষ হিসাব অনুসারে ষাটের দশকের শেষে পূর্ব বাংলায় যেসব শিল্পপতি ছিলেন তাঁদের মধ্যে বাঙালিদের অধীনে শিল্পসম্পদের পরিমাণ ছিল মোট শিল্পসম্পদের মাত্র ১৮ শতাংশ। পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদের দখলে ছিল ৪৭ শতাংশ এবং রাষ্ট্রের অধীনে ছিল বাকি ৩৫ শতাংশ। এ থেকেই বোঝা যায় যে, ষাটের দশকে শিল্পায়-নের কোন সুবিধা সাধারণ মানুষ এবং বিশেষভাবে বাঙালিরা উপভোগ করতে সক্ষম হয় নি।[২৯]

পূর্ব বাংলায় ষাটের দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অসংখ্য দুর্বলতার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এর বিদেশনির্ভর চরিত্র। ১৯৫৯-৬০ সালে পূর্ব বাংলায় বিনিয়োগের হার ছিল মাত্র ৬.৭ শতাংশ এবং পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়হারও ছিল মাত্র ৬.৪ শতাংশ। অর্থাৎ মোট বিনিয়োগের ৯৫.৭ শতাংশই আসতো দেশীয় সঞ্চয় থেকে। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছর যেতে না যেতেই বিনিয়োগহার বৃদ্ধি পেয়ে ১১ শতাংশ হলেও সঞ্চয়হার ৬.৩ শতাংশেই আটকে থাকলো। তাই ১৯৬৪-৬৫ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, মোট বিনিয়োগে দেশী সঞ্চয়ের

২৮. এম. এম. আকাশ, *বাংলাদেশের উন্নয়ন : ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা,* (ঢাকা ১৯৯০), ৭৭

২৯. Mahabub Hossain and A. R Khan, *The Tragedy*, (London 1989), 81.

পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫৮ শতাংশ। বাকি ৪২ শতাংশ আসছে বিদেশী সাহায্য থেকে। অবশ্য ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়।

সারণি ১৪ : মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য : গ্রাম বনাম শহর

সন	মাথাপিছু আয়		গ্রাম/শহর অনুপাত
	গ্রাম	শহর	
১৯৪৯-৫০	২৫৩	৫৯৬	১ঃ ২.৫৩
১৯৫৯-৬০	২৪৪	৬২৫	১ঃ ২.৫৬
১৯৬৯-৭০	২৭৯	৭৬১	১ঃ ২.৭৩

টীকা : মাথাপিছু আয় হিসাব করা হয়েছে ১৯৫৯-৬০ ফ্যাক্টর কস্টে।

উৎস : Mohiuddin Alamgir and Berlage, Bangladesh, 65-66.

সেই সময়ে মোট বিনিয়োগহার বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৩.৫ শতাংশ এবং তাতে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের অংশও বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৭৫ ভাগ হয়। তবে পূর্ব বাংলার অর্থনীতিবিদরা তখন এই বলে অভিযোগ করছিলেন যে, 'বর্ধিত স্বনির্ভরতার' কারণ শুধু অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়হারের বৃদ্ধিই ছিল না, বরং মুখ্য কারণ ছিল পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক বিদেশী সাহায্য ও বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আত্মসাৎ-করণ। আর সেজন্যই হয়তো পূর্ব বাংলাকে মাত্র ১৩.৫ শতাংশ বিনিয়োগহার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল। যদি বিদেশী সাহায্যের ন্যায্য অংশ পূর্ব বাংলা লাভ করতো, তাহলে বর্ধিত বিনিয়োগ সম্ভব হতো এবং পূর্ব বাংলার স্বনির্ভরতার হার হ্রাস পেলেও প্রবৃদ্ধির হার নিশ্চিতভাবে আরো বৃদ্ধি পেতো। এই সময়ে পূর্ব বাংলাকে যে শুধু তার ন্যায্য বৈদেশিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাই নয়, বৈদেশিক সাহায্য বাবদ যে ক্রমবর্ধমান ডেট-সার্ভিসিং-এর বোঝা সমগ্র পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর চেপে বসেছিল তার একটা বড় অংশ পূর্ব বাংলার রপ্তানিলব্ধ আয় দিয়েই মেটানো হয়েছে।[৩০]

শিল্পের তুলনায় কৃষিতে এবং গ্রামে আলোচ্য কালপর্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অনেক নিচে নেমে গিয়েছিল। আলমগীর ও বার্লেজ-এর হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৯-৫০-১৯৬৯-৭০ এই দীর্ঘ বিশ বছরে কৃষির বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ২.২ শতাংশ, যা জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের চেয়ে কম। অর্থাৎ সমগ্র পাকিস্তান কালপর্বেই কৃষি-উৎপাদনের

৩০. ১৯৫৫-৬০ সালে পাকিস্তানের মোট রপ্তানি-আয়ের মাত্র ১.৮ শতাংশ 'ডেট-সার্ভিসিং' বাবদ দিতে হতো। ১৯৬০-৬৫ সালে তা গড়ে ৭.২ শতাংশে পরিণত হয়। ১৯৬৫-৭০ সালে তা হয় গড়ে ১৪ শতাংশ। দেখুন, Keith Griffin and A R. Khan (ed.), *Growth and Inequality in Pakistan*, (London 1972), 47

মাথাপিছু লভ্যতা পূর্ব বাংলায় ক্রমশ হ্রাস পেয়েছিল। এই গড় অবনতির হার অবশ্য প্রথম ১০ বছরের জন্য (১৯৪৯-৫০-১৯৫৯-৬০) অপেক্ষাকৃত ভয়াবহ ছিল। সেই সময় কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার ছিল মাত্র ১.৫ শতাংশ। পরবর্তী ষাটের দশকে অবশ্য বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৩ শতাংশ অর্থাৎ সেই দশকের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের ঠিক সমান সমান। অবশ্য পাশাপাশি এই ষাটের দশকেই পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পের মতোই কৃষিতেও পূর্ব বাংলার তুলনায় অপেক্ষাকৃত অগ্রসর একটি নিবিড় সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। ষাটের দশকে স্বদেশ রঞ্জন বোসের হিসাবানুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল পূর্ব বাংলার চেয়ে ১.৬ শতাংশ বেশি অর্থাৎ ৪.৬ শতাংশ এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারও ছিল ৩ শতাংশের কম।[৩১]

এই সময় কুমিল্লা একাডেমিকে কেন্দ্র করে তথাকথিত 'উফশী' প্রযুক্তিভিত্তিক একটি নতুন গ্রাম উন্নয়ন মডেল পূর্ব বাংলায় চালু করার উদ্যোগ নেয়া হলেও সেটি ব্যর্থ হয়। প্রধানত তিনটি কারণে এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রথমত, এর জন্য যে উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার ও যথাযথ পানি সরবরাহের প্রয়োজন ছিল সেগুলি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তখন পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষকের দ্বারে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয়ত, যেহেতু গ্রামীণ সমাজে আর্থিক ক্ষমতার (financial ability) বিন্যাস ছিল প্রচণ্ড রকমের বৈষম্যমূলক, সেহেতু অধিকাংশ কৃষকের পক্ষে বাজার থেকে উল্লিখিত উপকরণ অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা সম্ভব ছিল না।[৩২] তৃতীয়ত, বন্যানিয়ন্ত্রণের কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় কৃষকরা, বিশেষত ব্যাপক সংখ্যক ক্ষুদ্র চাষী কোন রকম ঝুঁকি নিতে আগ্রহী ছিল না। অথচ সবুজ বিপ্লবের প্রকৃতিই ছিল অধিকতর ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ।

৩১. দেখুন, S. R. Bose, "East-West Contrast in Pakistan's Agricultural Development", in Keith Griffin and A R. Khan (ed.), ঐ, 70.

৩২. গ্রামসমাজে বিরাজমান আর্থিক ক্ষমতার বৈষম্যের চিত্রটি ধরা পড়বে ১৯৬৩-৬৪ সালের গ্রামীণ আয় বন্টনের চিত্রে। সেই সময় গ্রামীণ পরিবারের সর্বনিম্ন ২০ শতাংশের হাতে ছিল মোট গ্রামীণ আয়ের মাত্র ৮.৫ শতাংশ। অথচ উপরের ২০ শতাংশ পরিবারের হাতে ছিল গ্রামীণ মোট আয়ের ৪২ শতাংশ। মাহবুব হোসেন ও এ. আর. খানের হিসাব অনুযায়ী সেই সময় গ্রামীণ আয়বৈষম্যের গিণি-সহগ (goini coefficient) ছিল ০.৩৩। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শহরে এই আয়বৈষম্য-সহগটি ছিল আরো বেশি (০.৪১)। দেখুন, এ. আর. খান ও মাহবুব হোসেন, *দ্য স্ট্র্যাটেজি*, (লন্ডন ১৯৮৯), ১৪৯। ১৯৬০ সালের আদমশুমারি ও ১৯৬৮ সালের মাস্টার সার্ভের তথ্য থেকে এসময় ভূমি ব্যবহারে বৈষম্যের বিষয়টিও প্রকটভাবে ধরা পড়ে। ১৯৬০ সালে বড় খামার (৭.৫ একরের উপব)-এর সংখ্যা ছিল মোট খামারের মাত্র ১১ শতাংশ। অথচ তাদের নিয়ন্ত্রণে জমির পরিমাণ ছিল ৩৮ শতাংশ। ১৯৬৮ সালে এই সংখ্যাগুলি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮ শতাংশ এবং ৩১ শতাংশ। ১৯৬০ সালে ক্ষুদ্র খামার (২.৫ একরের নিচে)-এর সংখ্যা ছিল মোট খামারসংখ্যার ৫২ শতাংশ অথচ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ১৬ শতাংশ। ১৯৬৮ সালে এই সংখ্যাগুলি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৭ শতাংশ এবং ২১ শতাংশ । অতএব দেখা যাচ্ছে, পুরো ষাটের দশকেই ভূমি ব্যবহারে বৈষম্য অটুট ছিল। দেখুন, A R Khan, প্রাগুক্ত, (London 1972) 39

ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় কৃষিতে সবুজ বিপ্লবেব যে প্রচার তখন করা হয়েছিল তা নিতান্তই কুমিল্লা ও আশেপাশের 'পকেটেই' সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৬৬-৬৭—১৯৬৮-৬৯ এই তিন বছরের জন্য গড় চাষতীব্রতা দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১৩৪ অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে ১২৮-এর তুলনায় মাত্র ৪.৬৮ শতাংশ বেশি। এ. আর. খানের হিসাব অনুযায়ী ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ সেচের আওতাধীন মোট জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৯২৭ হাজার একর অর্থাৎ মোট আবাদি জমির মাত্র ৪ শতাংশ।[৩৩] অর্থাৎ ২০ বছরে ১ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশে উন্নয়ন ! আন্তর্জাতিকভাবে কৃষির উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে আমরা পঞ্চাশের দশকে যেমন অনেক পিছিয়ে ছিলাম, ষাটের দশকের শেষে সামান্য উন্নতি সত্ত্বেও মূলত আমরা তাই রয়ে গেলাম। ১৫ নং সারণিতে ষাটের দশকের প্রধান ফসল ধানের (১৯৬৬-৬৭—১৯৬৮-৬৯ কালপর্বে গড়ে আবাদি জমির ৭৮.১৮ শতাংশই ধানচাষের জন্য ব্যবহৃত হতো) একরপ্রতি উৎপাদনশীলতার সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ফলনের হারের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

সারণি ১৫ : একরপ্রতি ধানের গড় উৎপাদনশীলতা (১৯৬৫-৬৭) : তুলনামূলক চিত্র

দেশ	একর প্রতি ফলনের সূচক
বাংলাদেশ	১০০
জাপান	৩১৯
চীন	১৫২
ভারত	৯৬
মিশর	২৯৮
আমেবিকা	১৯৭

উৎস : A. R. Khan, প্রাগুক্ত, 44.

৩৩. এ. আর. খান সেচায়িত জমির নিম্নোক্ত বিন্যাসটি তুলে ধরেছেন (১৯৬৯-৭০ সালের জন্য) ঃ

১.পানি ও শক্তি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক সেচায়িত		৯০,০০০ একর
২. কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক সেচায়িত		৭৪২,০০০ "
	ক) পাম্পচালিত	৭২০,০০০ "
	খ) টিউবওয়েল	২২,০০০ "
৩. কুমিল্লা সমবায় ধরনের সমবায়ের অধীনে		৮,০০০ "
	সর্বমোট	= ১৫,৮২,০০০ একর

লক্ষণীয় যে, সরকার বৃহদায়তন বন্যানিয়ন্ত্রণভিত্তিক সেচপ্রকল্পের দিকে জোর না দিয়ে (মোট সেচায়িত জমির মাত্র ৯.৭ শতাংশ) জোর দিয়েছেন অপেক্ষাকৃত সহজ শীতকালীন পাম্প ও টিউবওয়েলভিত্তিক সেচের উপর (মোট সেচায়িত জমির প্রায় ৮০ শতাংশ)। এটা পূর্ব বাংলার সবচেয়ে জরুরি দাবি বন্যানিয়ন্ত্রণকে অবহেলা করে পশ্চিম পাকিস্তানে তা কার্যকরী করার বিমাতাসুলভ নীতির অন্যতম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। দেখুন, A R Khan, প্রাগুক্ত, (London 1972), 49

ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় কৃষির বিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনায় সবশেষে যে কথা বলা দরকার তা হচ্ছে, প্রকৃত বিচারে এই সময়ে পূর্ব বাংলার কৃষিখাতকে শহরের শিল্পখাত তার প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়নের (primitive accumulation) পীঠস্থান হিসেবে ব্যবহার করেছে। বস্তুত এই সময়ে তুলনামূলকভাবে পূর্ব বাংলার কৃষিখাতকে শিল্পখাতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিনিময়হারের তুলনায় এক অত্যন্ত অসম বিনিময়হারে বিনিময় চালাতে বাধ্য করা হয়েছিল। কৃষির প্রতি এই বিমাতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও সত্য বটে, তবে সেখানে আন্তর্জাতিক বিনিময়হারের তুলনায় ঘাটতির পরিমাণ পূর্ব বাংলার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম ছিল। এ বিষয়ে চমৎকার তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে স্টেফেন লিউয়িস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নিম্নের সারণিতে। সারণিতে দেখা যাচ্ছে, পূর্ব বাংলার কৃষি ১৯৫১-৬৪ কালপর্বে আন্তর্জাতিকভাবে যা পেতে পারতো, তার সর্বনিম্ন ২৮ শতাংশ (১৯৫৩-৫৬ কালপর্বে) এবং সর্বোচ্চ মাত্র ৫৯ শতাংশ (১৯৬১-৬৪ কালপর্বে) বাস্তবে লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। পক্ষান্তরে, ঐ একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বনিম্ন পাওনার হার ছিল ৪২ শতাংশ (১৯৫৩-৫৬ কালপর্বে) এবং সর্বোচ্চ পাওনার হার ছিল ৬৪ শতাংশ (১৯৬১-৬৪ কালপর্বে)। পুরো বিষয়টি আরো সরলভাবে ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, ১৯৭০ সাল নাগাদ কাঁচা পাট রপ্তানি করে পূর্ব বাংলার কৃষক যদি এক ডলার আয় করতো, তবে তার জন্য দেশীয় টাকায় তাকে দেয়া হতো মাত্র ৪.৭৫ টাকা। আর যেকোন শিল্পপণ্য রপ্তানি করে শিল্পপতি যে ১ ডলার আয় করতেন সেজন্য তাঁকে দেশীয় টাকায় দেয়া হতো ৮ টাকা। এভাবে বাংলার পাটচাষী গোপন শোষণের তথা অসম বিনিময়হারের শিকার হয়েছিল।[৩৪]

পঞ্চাশের দশকের অন্তিম পর্বে এবং ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার জনগণের জীবন-যাত্রার মানও খুব একটা উন্নত হতে পারে নি। যদিও ষাটের দশকে গড় মাথাপিছু আয় ২৬২ টাকা থেকে ২৯৭ টাকায় উন্নীত হয়েছিল এবং যদিও এই সময়ে শিল্পখাতে উৎপাদন বার্ষিক ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তথাপি এসবের সুফল জনগণের দ্বারে পৌঁছায় নি। পূর্ব বাংলার জনগণ আঞ্চলিক এবং শ্রেণীগত উভয় প্রকার বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। বিশেষত কৃষিখাতে শোষণ এবং ভূমিহীনতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছিল (১৭ নং সারণি দ্রঃ)। এর প্রতিফলন হিসেবে গ্রামে গড়ে উঠেছিল ক্রমবর্ধমান হারে সর্বাধিক বঞ্চিত বিশাল ক্ষেতমজুর গোষ্ঠী। সারা বছর তাদের কাজের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। উপরন্তু, উদ্বৃত্ত শ্রমের বাজারে তাদের মজুরির প্রকৃত হার ক্রমাগত হ্রাস পায়। শিল্পায়নের পুঁজিঘন প্রকৃতির ফলে সেখানে ব্যাপক আকারে কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ ছিল না। মালিক কৃষকের উপর শিল্প ও শহর কর্তৃক নির্মম আদিম শোষণ চালানোর কারণে তাদের

৩৪. এই ধরনের শোষণকে অর্থনীতির পরিভাষায় "কৃষিখাতের উপর লুক্কায়িত করারোপ" (concealed taxation of agriculture) হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন ঐ. ৪৭।

সারণি ১৬ : কৃষি ও শিল্পের মধ্যে বিদ্যমান দেশীয় বিনিময়হার (Terms of Trade) এবং আন্তর্জাতিক বাজারের বিনিময়হারের অনুপাত :

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান

৩ বছরের গড়	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫১-৫৪	০.৩২	০.৪৫
১৯৫২-৫৫	০.২৮	০.৪৩
১৯৫৩-৫৬	০.২৮	০.৪২
১৯৫৪-৫৭	০.৩৮	০.৪৬
১৯৫৫-৫৮	০.৪৫	০.৫১
১৯৫৬-৫৯	০.৫১	০.৫৫
১৯৫৭-৬০	০.৫১	০.৫৬
১৯৫৮-৬১	০.৫৫	০.৫৯
১৯৫৯-৬২	০.৫৭	০.৬০
১৯৬০-৬৩	০.৫৯	০.৬৪
১৯৬১-৬৪	০.৫৯	০.৬৪

উৎস: Computed from Lewis, "Effects of Trade Policy on Domestic Relative prices : Pakistan 1951-64", *American Economic Review*, March 1968, Table 1.

পক্ষেও গ্রামে সবুজ বিপ্লবের প্রসার ঘটিয়ে উপযুক্ত কর্মসংস্থান ও মজুরি প্রদানের দ্বারা এই শ্রেণীটিকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। এরই সার্বিক প্রতিফলন দেখা যায় এদের মজুরিহারের ক্রমাগত নিম্নাভিমুখী গতিতে (১৮ নং সারণি দ্রঃ)। শহরাঞ্চলের শিল্পশ্রমিকরা এদের চেয়ে সচ্ছল থাকলেও উৎপাদনে অবদান অনুযায়ী ফল লাভে তারাও সক্ষম হয় নি। শিল্পখাতে প্রকৃত উৎপাদন ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেলেও তাদের প্রকৃত মজুরিসূচক এই সময়ে ১৯৫৪ সালের স্তরেই স্থির থাকে (১৮ নং সারণি দ্রঃ)। অবশ্য এই শ্রমিকশোষণের ব্যাপারটি শুধু পূর্ব বাংলা নয়, সমগ্র পাকিস্তানের জন্যই সত্য ছিল। লিউয়িস দেখিয়েছেন, ১৯৫৪-৬৩ কালপর্বে সমগ্র পাকিস্তানের শিল্পশ্রমিকদের প্রকৃত মজুরিসূচক ১০০ থেকে মাত্র ১০২-এ উন্নীত হয়েছিল। পক্ষান্তরে এই সময়ে গড়ে শ্রমিকপিছু সংযোজিত মূল্য বা ভ্যালুএ্যাডেড-এর প্রকৃত সূচক ১০০ থেকে ১১৬-তে উপনীত হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শ্রমিকশ্রেণীর উৎপাদনশীলতা গড়ে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছিল গড়ে মাত্র ২ শতাংশ।[৩৫]

৩৫. এম. এম. আকাশ, *বাংলাদেশের উন্নয়ন*, (ঢাকা ১৯৯০), ৭৭।

সারণি ১৭ : ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকদের সংখ্যা

সন	সংখ্যা (মিলিয়নে)	মোট কৃষিশ্রমে তাদের অংশ %	মোট গ্রামীণ পরিবারে তাদের অংশ %
১৯৫১	১.৫১	১৪.৩	-
১৯৬১	২.৪৭	১৭.৫	-
১৯৬৬	-	-	৬.৯৭
১৯৬৭-৮৬	৩.৪০	১৯.৮	৬.৯৭

উৎস : Mahabub Hossain and A. R. Khan,"Bangladesh", 168.

যদিও আলোচ্য কালপর্বে 'দারিদ্র্যের' পরিমাণ সম্পর্কে কালানুক্রমিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না, তথাপি নমুনা জরিপসমূহ থেকে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা যেতে পারে। ১৯৬২-৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনকল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে সমগ্র পূর্ব বাংলায় একটি 'পুষ্টি জরিপ' (nutrition survey) চালানো হয়েছিল। উক্ত জরিপলব্ধ তথ্য থেকে জানা যায়, গ্রাম ও শহরে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ক্যালোরি সংগ্রহে অক্ষম এরকম বঞ্চিত দরিদ্রের সংখ্যা ছিল তখন যথাক্রমে ৪৬ ও ৭৭ শতাংশ। এই তথ্য কিছুটা পুরনো হলেও পরবর্তীকালে দারিদ্র্যের মাত্রা আরো বৃদ্ধিই পেয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। আর মনে রাখতে হবে, অনুকূল কৃষিমৌসুমে জরিপ চালানোর দরুন এই পরিমাণের মধ্যে ঊর্ধ্বমুখী পক্ষপাতিত্বও (bias) কিছুটা থাকবে। বিশেষত শহরে তুলনামূলকভাবে উচ্চতর দারিদ্র্যহারের ব্যাপারটিও প্রশ্নসাপেক্ষ।[৩৬] যদি খাদ্য ও পুষ্টি ছেড়ে বস্ত্রের দিকে তাকাই, তা হলে দেখা যায় যে, ১৯৬৬-৬৭ সালে পূর্ব বাংলায় মাথাপিছু বস্ত্রের প্রাপ্যতা ছিল সারা বছরের জন্য গ্রামে সাড়ে সাত গজ এবং শহরে সাড়ে বারো গজ। তবে অধিকাংশ লোকের বস্ত্রপ্রাপ্যতা নিশ্চয়ই এই গড়ের চেয়ে নিচেই ছিল এবং সেই হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, বছরের একটি বড় সময় এ অঞ্চলের অধিবাসীরা 'লেংটি' পরেই কাটিয়ে দিতে বাধ্য হতো।

গৃহসংস্থানেরও নিদারুণ অভাব ছিল পূর্ব বাংলায়। গ্রামীণ জনগণের অধিকাংশের পর্ণকুটিরকে গৃহ না বলাই সমীচীন। ১৯৬৮ সালের জরিপ থেকে এও জানা যায় যে, শহরে প্রতি ৫.৬ জন লোকের জন্য ১.৫টি কক্ষবিশিষ্ট একটি বাড়ি বরাদ্দ ছিল। ৭১ শতাংশ শহুরে পরিবার তখন অস্থায়ী কাঁচা বাড়িতে থাকতো এবং ৫৬ শতাংশ শহুরে পরিবারের জন্য বরাদ্দ ছিল শুধু ১ কক্ষবিশিষ্ট একটি বাড়ি! ৯৭ শতাংশ শহুরে পরিবারের জন্য তখন কোন বিদ্যুৎসুবিধা ছিল না এবং ৫৬ শতাংশের জন্য এমনকি বিশুদ্ধ পানির সুবিধাও ছিল না। ১৯৬৮ সালেই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে আগে অবস্থা আরো

৩৬. প্রাগুক্ত, 4.

সারণি ১৮ : গ্রামীণ ও শহুরে মজুরদের প্রকৃত মজুরি

সন	শহরের শিল্পখাতে মজুরি সূচক (সকল শিল্প)	পাটশিল্প	বস্ত্রশিল্প	সন	গ্রামীণ মজুরি সূচক
১৯৫৪	১০০	১০০	১০০	১৯৪৯	১০০
১৯৫৫	৮৮.৪	-	১০৩.২	১৯৫০	৯৪.৮
১৯৫৭	৯১.৪	-	৮৪.৯	১৯৫৫	৯২.৮
১৯৫৮	৯৩.৬	-	৮৮.৫	১৯৫৯	৮৮.৫
১৯৫৯/৬০	৯২.৮	-	৯৪.৬	১৯৬০	৮৮.০
১৯৬২/৬৩	৯৬.৪	-	১০১.৮	১৯৬১	১০০.৫
				১৯৬৫	৯৬.৯
১৯৬৭/৬৮	১০১.১	৯৪.৬	৮১.৭	১৯৬৬	৮২.৩

উৎস : A. R. Khan,"Bangladesh", 19.

কতো অনুন্নত ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। এ সমুদয় তথ্য উদ্ধৃত করার পর অধ্‌
এ. আর. খান মন্তব্য করেন :

> জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অনাহারে থাকে, প্রায় ৯০ শতাংশ কোন না কোন খাদ্যের অভাবে থাকে এবং বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জীর্ণবেশে ও নিরাশ্রয় অবস্থায় দিন কাটায়।[৩৭]

বস্তুত পূর্ব বাংলার অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন জনগণের জীবনের গড় আয়ুও স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এ সময় হ্রাস পেয়েছিল। পুরুষের গড় আয়ু ছিল মাত্র ৪৯.২ বছর এবং মহিলাদের গড় আয়ু ছিল মাত্র ৪৭ বছর। অথচ সেই সময়ে উন্নত পশ্চিমা দেশগুলিতে গড় আয়ু ছিল ৬৯ বছর। শিশুমৃত্যুর হার পূর্ব বাংলায় ছিল পুরুষ শিশুদের ক্ষেত্রে হাজারে ১৫৩ এবং মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে হাজারে ১২৮ জন। পক্ষান্তরে উন্নত দেশগুলিতে এই হার ছিল হাজারে মাত্র ২০ জন বা তার চেয়ে কম।[৩৮] সাক্ষরতার হার ১৯৬৮ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ছিল মাত্র ২৫.৭ শতাংশ। বস্তুত সাক্ষরতার সংজ্ঞা আরো সঠিকভাবে প্রণয়ন করলে তা আরো কমে যাবে এবং ১৯৬১ সালের সাক্ষরতাহারের (১৮ শতাংশ) চেয়ে খুব বেশি হবে না।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, পঞ্চাশের দশকের অন্তিম পর্বে পূর্ব বাংলার স্থবির অর্থনীতি নিচের দিকেই ধাবিত হয়েছিল। তবে ষাটের দশকে তা ভারসাম্যহীনভাবে

৩৭. A. R Khan, প্রাগুক্ত, (London 1972), 27.
৩৮. প্রাগুক্ত, লক্ষণীয় যে ১৯৫১ সনে শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজারে ১৬০ জন, অর্থাৎ ১৭ বছরে এই মৃত্যুর হারে মাত্র ৭ জন হ্রাস পেয়েছে।

কিছুটা সামনে এগিয়েছিল। প্রবৃদ্ধির এই চরিত্রগত ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়েছিল শ্রেণীতে শ্রেণীতে, অঞ্চলে অঞ্চলে এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে, যেমন কৃষি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে। এ ধরনের ভারসাম্যহীন প্রবৃদ্ধি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনে কোন ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয় নি। বিশেষত গ্রামীণ ও শহুরে মজুরদের এবং সাধারণভাবে গ্রামের কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচ্য কালপর্বে উত্তরোত্তর অবনতির দিকেই ধাবিত হয়েছিল।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভূমিকা

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এ আইন অনুসারে পাকিস্তান যেসব অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেসব অঞ্চলে অতীত থেকে বিরাজমান গণপরিষদের (Constituent Assembly) উপরই ঔপনিবেশিক শাসকরা নতুন রাষ্ট্রের শাসনভার অর্পণ করে। সেই হিসেবে পাকিস্তান ১৯৪৭ সালে উত্তরাধিকারসূত্রে যে 'ফেডারেল এসেমব্লিটি' পেয়েছিল তার মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৬৯, যার মধ্যে ৪৯ জন মুসলিম লীগ, ১৬ জন কংগ্রেস এবং বাকি ৪ জন অন্যান্য বিভিন্ন দলভুক্ত সদস্য ছিলেন। ১৯৫৩ সাল নাগাদ এর সদস্যসংখ্যা ৭৯তে উন্নীত হয়। এর মধ্যে ষাট জন মুসলিম লীগ দলভুক্ত, ১১ জন কংগ্রেস দলভুক্ত এবং ৩ জন অন্যান্য বিভিন্ন দলভুক্ত ছিলেন (বাকি ৫টি পদ শূন্য ছিল)। এসব তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা প্রথম থেকেই মুসলিম লীগের একচেটিয়া কর্তৃত্বের অধীনে ছিল। আরো যেটা লক্ষণীয় তা হচ্ছে, ৭৯টি সদস্যপদের মধ্যে ৪৪টিই ছিল পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত সদস্যের পদ এবং বাকি ৩৫টি আসনের মধ্যে ছিল ২২টি পাঞ্জাব, ৫টি সিন্ধু, ৪টি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ১টি করে বেলুচিস্তান, ভাওয়ালপুর এবং খয়েরপুরের আসন। এ থেকে বোঝা যায়, পাকিস্তানের 'ফেডারেল এসেমব্লিতে' প্রথমদিকে পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত সাংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু এ থেকে এই সিদ্ধান্ত টানলে খুবই ভুল হবে যে, তাঁরা সর্বদা পূর্ব বাংলার স্বার্থেই সংসদে সরব ছিলেন। বরঞ্চ মূল শাসকদল মুসলিম লীগের সদস্য হিসেবে তাঁরা প্রধানত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় অবাঙালি 'কম্যান্ডের' নির্দেশেই নিজেদের পরিচালনা করতেন। এঁদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বিদ্রোহী অংশ ছিল, কিন্তু তাঁরা শাসকদলে বা শাসকদল অনুসৃত মূল অর্থনৈতিক নীতিমালায় বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তারে সক্ষম ছিলেন না। শ্রেণীগত দিক থেকেও এঁদের চরিত্র ছিল প্রতিকূল। এ সম্পর্কে গবেষক মুশতাক আহমেদ লিখেছেন :

> পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত ও সামন্ত শ্রেণী জনপ্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে প্রায় একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করেছে। উভয় প্রদেশে কৃষক শ্রেণীর বলতে গেলে কোন প্রতিনিধিত্বই ছিল না। এবং শ্রমিক

শ্রেণী ও শিল্পখাত এখনও দেশের অর্থনৈতিক মানচিত্রে এমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, যেজন্য এরা রাজনৈতিক স্বীকৃতির দাবি করতে পারে।[৩৯]

এসব তথ্য থেকে এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের নীতি প্রণয়নকারী রাজনৈতিক মূল কর্তৃত্বের সঙ্গে কৃষক-শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতা ছিল শুরু থেকেই একটি বাস্তব ব্যাপার। আর পূর্ব বাংলার আসনসংখ্যা গণপরিষদে বেশি হলেও রাষ্ট্রীয় নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য যে রাষ্ট্রযন্ত্রটি তখন গড়ে উঠেছিল সেখানে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদেরই একাধিপত্য। এছাড়া শাসকদলেও পশ্চিম পাকিস্তানীরাই ছিল মূল নেতৃত্বের অধিকারী। ১৯৫৫ সালের এক হিসাব থেকে জানা যায়, পাকিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে ১৯ জন সচিবের মধ্যে সব ক'জনই ছিলেন অবাঙালি, ৪১ জন যুগ্ম-সচিবের মধ্যে মাত্র ৩ জন ছিলেন বাঙালি, ১৩৩ জন উপ-সচিবের মধ্যে মাত্র ১০ জন ছিলেন বাঙালি এবং ৫৪৮ জন অধস্তন সচিবের (Under Secretary) মধ্যে মাত্র ৩৮ জন ছিলেন বাঙালি।[৪০] এসব তথ্য থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রশাসন উভয়েই পূর্ব বাংলায় শুরু থেকে যেসব অর্থনৈতিক নীতিমালা কার্যকরী করেছিল তাতে তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ও শ্রেণীগত পক্ষপাতিত্বের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছিল।

তবে এখানে বলে রাখা ভাল যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্র তথা আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনী বেশিদিন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাকিস্তানের শাসন পরিচালনা সহ্য করে নি। যে গণবিচ্ছিন্ন গণপরিষদের কথা উপরে উল্লেখ করলাম, এমনকি তাকেও বেশিদিন সক্রিয় থাকতে দেয়া হয় নি। পাকিস্তানের জন্মের পর ঐ গণপরিষদের প্রায় ৯ বছর লেগেছিল একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে। কিন্তু ১৯৫৬ সালের ২ মার্চ গৃহীত ঐ সংবিধান টিকেছিল মাত্র আড়াই বছর এবং ১৯৫৮-এর অক্টোবর মাসেই পাকিস্তানে কায়েম হয়েছিল সেনাশাসন। গণপরিষদ ভেঙে দিয়ে সংবিধান বাতিল ঘোষণা করা হয়েছিল এবং ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছিল। এর পর দীর্ঘ প্রায় দশ বছর

---

৩৯. দেখুন, Mushtaq Ahmed, *Government and Politics in Pakistan*, (Karachi 1959), 97 এই গ্রন্থে পাকিস্তানের ৭৯ জন কেন্দ্রীয় গণপরিষদ সদস্যের যে অর্থনৈতিক পেশাগত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছিল তা নিম্নরূপ :

১.	ভূস্বামী	২৭ জন
২.	ব্যবসায়ী	৯ জন
৩.	উকিল	৩১ জন
৪.	অন্যান্য পেশাজীবী	১২ জন
	মোট	৭৯ জন

৪০. Rounaq Jahan, *Pakistan . Failure in National Integration*, (Dhaka 1977), 26.

আইয়ুব খানই পাকিস্তানের শাসনকাজ পরিচালনা করেন। ১৯৬২ সালে তিনি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করেন, যার চরিত্র ছিল খুবই অগণতান্ত্রিক। ঐ সংবিধানে প্রত্যক্ষ নির্বাচনপদ্ধতির বদলে পরোক্ষ নির্বাচনপদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট এবং প্রাদেশিক গভর্নরদেরকে গণপরিষদ বা মন্ত্রীদের কাছে জবাবদিহিতার উর্ধ্বে রাখা হয়েছিল। প্রেসিডেন্টকে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের মন্ত্রী মনোনয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল এবং সর্বোপরি সংবিধানের প্রাথমিক খসড়ায় মৌলিক অধিকারসমূহের কোন স্বীকৃতি ছিল না। এমতাবস্থায় সমগ্র ষাটের দশকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূল পরিচালক ছিলেন কার্যত কেন্দ্রীয় বেসামরিক আমলা এবং সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবৃন্দ। আর ষাটের দশকে সামরিক বাহিনী এবং বেসামরিক প্রশাসনে মূল কর্তৃত্বভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি প্রণীত এক হিসাবে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবালয়ে উর্ধ্বতন কর্মচারীদের মধ্যে বাঙালিদের অংশ ছিল পরিকল্পনা বিভাগে ২৩.৭ শতাংশ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিদপ্তরে ২৩.৪ শতাংশ, শিল্প বিভাগে ৩৬.৩ শতাংশ এবং কৃষি বিভাগে ১৪.২ শতাংশ[৪১] আর সামরিক বাহিনীতে ঐতিহ্যগতভাবেই বাঙালিরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ।[৪২]

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবয়বের অতি সংক্ষিপ্ত এই রূপরেখা বর্ণনার পর আমরা এখন রাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক নীতিমালা সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত করবো। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর প্রথম যে সমস্যা রাষ্ট্রকে আঘাত করে তা হচ্ছে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বাণিজ্যসংঘাতের সমস্যা। বিশেষত ১৯৪৯ সালে ভারত ও বৃটিশ সরকার যুগপৎ তাদের মুদ্রার মানের অবমূল্যায়ন ঘটায়। এর ফলে ভারতীয় দ্রব্যাদির দাম পাকিস্তানী টাকার হিসাবে হ্রাস পেলো এবং ভারত থেকে পাকিস্তানে দ্রব্য আমদানি উৎসাহিত হলো। অন্যদিকে যেহেতু পাকিস্তানী দ্রব্যের দাম ভারতীয় মুদ্রায় বৃদ্ধি পেলো, সেজন্য এর ফলে পাকিস্তান থেকে ভারতে দ্রব্যরপ্তানি অনুৎসাহিত হলো। অথচ এই সময়ে পাকিস্তান সরকার চাইছিল ভারতে উচ্চদামে পাট ও তুলা রপ্তানি করতে, কারণ তখন পর্যন্ত সব কৃষিজাত কাঁচামালের প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (processing industries) ভারতেই অবস্থিত ছিল। এছাড়া যাবতীয় ভোগ্য শিল্পপণ্যের জন্যও পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান তখন পর্যন্ত ভারতের উপরেই ছিল প্রবলভাবে নির্ভরশীল। বস্তুত ১৯৪৯ সালের শুরুর দিকে পাকিস্তানের শতকরা আশি ভাগ বহির্বাণিজ্যই পরিচালিত হচ্ছিল ভারতের

৪১. দেখুন, S S. Baranov, *পূর্ব বাংলা : অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য : ১৯৪৭-১৯৭১,* (ঢাকা ১৯৮৬), ১৬৮।

৪২. তালুকার মনিরুজ্জামান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হিসাব অনুযায়ী ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে 'মেজর' পদের উপরে মোট ৮৯৭ জন অফিসারের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩ জন। জেনারেল, লেঃ জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার এবং কর্নেল পদে তখন কোন বাঙালি অফিসারই ছিলেন না। দেখুন, Talukder Moniruzzaman, *The Politics of Development,* (Dhaka 1971) 40

সঙ্গে। কিন্তু ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের মুদ্রা অবমূল্যায়ন নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাকিস্তান সরকার সরাসরি ভারতের সঙ্গে সকল বাণিজ্য সহসা বেআইনী ঘোষণা করলেন। এর ফলে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বাণিজ্য শূন্যে নেমে আসে এবং পরে তা শুরু হলেও ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত কখনো তা ৭ শতাংশের মাত্রা অতিক্রম করে নি। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এই বাণিজ্য পুনরায় স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু ভারতের সঙ্গে সাধারণ বাণিজ্যছেদের কারণে পাকিস্তানের অর্থনীতিতে তখন দুটি বিশেষ ধরনের প্রয়োজনীয়তার সৃষ্টি হয়েছিল : ১. ভারত থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যগুলি অন্য জায়গা থেকে আমদানির ব্যবস্থা করা এবং ২. ভারতে পাঠানো কৃষি কাঁচামালগুলি যাতে দেশের অভ্যন্তরেই প্রক্রিয়াজাত করা যায় সেই লক্ষ্যে আধুনিক পাট ও বস্ত্র কারখানার প্রসার ঘটানো।

১৯৫০ সালে পাকিস্তান সরকার তাই অবাধ আমদানিকে উৎসাহিত করার জন্য ও. জি. এল. (open general license policy) পদ্ধতি চালু করে। কিন্তু আমদানির জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর নগদ বৈদেশিক মুদ্রা। সৌভাগ্যের বিষয়, ১৯৫০ সালে কোরীয় যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটের থলের চাহিদা ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই সময় পাকিস্তান পাট রপ্তানি করে প্রয়োজনীয় প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানের অর্থনীতির ইতিহাসে ১৯৫০-৫১ সালটি তাই 'কোরীয় স্ফীতি' (Korean boom) নামে খ্যাত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এটা ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। যুদ্ধ প্রশমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৫২ সাল নাগাদ রপ্তানি হ্রাস পেতে থাকে এবং আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি দেখা দেয়। এ অবস্থায় পাকিস্তান সরকার আমদানি নিয়ন্ত্রণ, উচ্চ মুদ্রাবিনিময়হার ইত্যাদি পদক্ষেপ নতুনভাবে গ্রহণ করে। বস্তুত কোরীয় স্ফীতির সময় যেসব রপ্তানিকারক ও আমদানিকারক প্রচুর পয়সা উপার্জন করেছিলেন তারাই এখন দেখলেন যে, এসময় আমদানি না করে বরং আমদানিযোগ্য পণ্যগুলি দেশে প্রস্তুত করলে দেশের সংরক্ষিত বাজারে অতি উচ্চহারে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে। ফলে ১৯৫০ সালের পর থেকে এদেশে ধীরে ধীরে বহু আমদানি প্রতিস্থাপক শিল্প গড়ে উঠে। বাণিজ্যিক পুঁজি শিল্পপুঁজিতে রূপান্তরিত হওয়ায় পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামোতেও তখন এ সময় অনুকূল পরিবর্তনের সূচনা হয়। কিন্তু যদিও ১৯৫১-৫৭ কালপর্বে শিল্পোৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তথাপি কৃষি এবং কৃষিসংশ্লিষ্ট উপখাতগুলির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই রয়ে গেল খুবই পিছিয়ে। আর যেহেতু তখনো কৃষিই ছিল অর্থনীতির প্রধান খাত, সেহেতু কৃষির এই স্থবিরতা সমগ্র অর্থনীতিরই স্থবিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যার ইতিহাস আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

তবে এই শিল্পনির্ভর ভারসাম্যহীন প্রাথমিক প্রবৃদ্ধির ফলে বিশেষভাবে বঞ্চিত হয়েছিল পূর্ব বাংলা। কারণ শিল্পখাতে যেটুকু প্রবৃদ্ধি হয়েছিল তার একটা বড় অংশ ছিল বস্ত্রশিল্পকে কেন্দ্র করে এবং সেটি মূলত পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল। পাটশিল্পের যেটুকু উন্নতি তখন হয় তার বেশিরভাগ সুফলও বাংলার পাটচাষী পায় নি, পেয়েছিল

পাটশিল্পের উদীয়মান মালিকরা, যারা আবার অধিকাংশই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী।

এ ছাড়া বিভিন্ন রকম রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলাকে সচেতনভাবে তার ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করা হয়।[৪৩] যদিও প্রায় সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রাই উপার্জিত হয়েছিল পাট রপ্তানির মাধ্যমে, কিন্তু তা আমদানিকারকদের মধ্যে বণ্টনের সময় নিয়ম করা হয় যে, একমাত্র তাদেরকেই আমদানির সুযোগ দেয়া হবে, যারা অন্তত আড়াই বছর বা ততোধিক কালব্যাপী আমদানি করে আসছেন। আর শিল্প গড়ার জন্য সস্তায় বৈদেশিক মুদ্রা প্রদানের প্রধান দফতরটিও অবস্থিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে। এ ছাড়া কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানির অধিকার শুরুতে শুধু তাঁদেরকেই দেয়া হয়েছিল, যাঁরা প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি ছিলেন। এসব কারণে শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে প্রাগ্রসর পশ্চিম পাকিস্তানীরাই সকল সুযোগ-সুবিধা পেয়ে নিজেদের পুরনো অর্থনৈতিক ক্ষমতাকেই আরো পাকাপোক্ত করে তুলেছিল। এটা ছিল 'তেলা মাথায় তেল ঢালা' নীতির এক সার্থক দৃষ্টান্ত।

এ সময় ১৯৫০ সালে মুসলিম লীগ সরকার পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কৃষিখাতে জমিদারি উচ্ছেদের যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল সেটিও গণপরিষদের ভূস্বামী-জোতদার সদস্যদের চাপের মুখে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। প্রথমত মুসলিম লীগ সরকারের পূর্বপ্রতিশ্রুতি ছিল বিনা খেসারতে জমিদারি বাজেয়াপ্তের। কিন্তু আইন করার সময় 'খেসারত' (compensation) দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। আর এই ব্যবস্থার সুযোগে 'খেসারতের পরিমাণ' হিসাব করা নিয়ে দিনের পর দিন তালবাহানা চলতে থাকে এবং বড় ও হিন্দু মালিকদের গুটিকয়েক ব্যতিক্রম ছাড়া বাকি সকলের ক্ষেত্রেই জমি অধিগ্রহণ দিনের পর দিন পিছিয়ে যেতে থাকে। ছোট ও মাঝারি জোতদাররা সরকারি 'খেসারত পরিমাণের' বিপরীতে নতুন পরিমাণ উল্লেখ করে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন এবং সেসব অসংখ্য অভিযোগের দ্রুত মীমাংসা করাটা প্রশাসনের পক্ষে তখন ছিল একেবারেই অসম্ভব।[৪৪] এভাবে পঞ্চাশের ভূমিসংস্কার ভূমিহীন মজুর ও বর্গাচাষীর কোন কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ হয়। পূর্ব ও পশ্চিম দুই প্রদেশের জন্যই একথা সত্য।

৪৩. উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৪-৫৫ কালপর্বে পূর্ব বাংলার ভাগ্যে জুটেছিল মাত্র ১৮.৮ কোটি টাকার সরকারি উন্নয়নখরচ, যা ছিল মোট খরচের মাত্র শতকরা ৩১ ভাগ। পূর্ব বাংলার ভাগ্যে এসময় জুটেছিল মোট আমদানির মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ, যদিও পাকিস্তানের রপ্তানিআয়ের অর্ধেকেরও বেশি আসতো পূর্ব বাংলার রপ্তানি থেকে। সারা পাকিস্তানের রাস্তাঘাট তৈরির জন্য ১৯৪৯-৫০ সালে ৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে পূর্ব বাংলা পেয়েছিল মাত্র ১৭ লক্ষ টাকা (অর্থাৎ মাত্র ১৯ শতাংশ)। এছাড়া বাণিজ্য লাইসেন্স বন্টনের মাধ্যমে ১৯৫৩ সনের জানুয়ারি-জুন নাগাদ মোট যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল তার শতকরা ৯০ ভাগই পেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা। দেখুন, আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, *অর্থনৈতিক পটভূমি* (ঢাকা ১৯৮৬), ৯৯-১০০।

৪৪. একমাত্র পটুয়াখালী মহকুমাতেই এ ধরনের অভিযোগের সংখ্যা ছিল ২০০,০০০ টি। এগুলো মীমাংসার জন্য ছিল মাত্র ২৫ জন অফিসার ও ১৮টি কেন্দ্র। স্বভাবতই তাদের আন্তরিকতা থাকলেও ন্যূনতম কয়েকবছর সময় ছাড়া এসব অভিযোগের মীমাংসা বাস্তবে সম্ভব ছিল না। দেখুন, ম্যালকম ডারলিং, প্রাগুক্ত, (করাচী ১৯৫৫)।

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক নীতিপ্রণেতাদের শুরু থেকেই 'প্রবৃদ্ধির জন্য প্রবৃদ্ধি' (growth for growth's sake) এবং 'ব্যক্তিগত খাতের' প্রতি ছিল এক দুর্নিবার পক্ষপাতিত্ব। ধারণা করা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের ধনিক গোষ্ঠীকে যদি বাড়তি সুবিধা দেয়া হয়, তাহলে তারাই অধিক সঞ্চয় ও অধিক বিনিয়োগের মাধ্যমে পাকিস্তানে অর্থনৈতিক উল্লম্ফন সংগঠিত করবেন। তাদেরকে পরিকল্পনাদলিলগুলিতে entrepreneur বা captain of industry হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল। পাকিস্তানের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী দলিলের মূল উন্নয়ননীতি এই অনুমিতির উপরে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এই উদীয়মান পুঁজিপতিদের বর্ধিত হারে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলি হচ্ছে :

১. নামমাত্র মূল্যে সরকারি খাতের কারখানা ব্যক্তিমালিকের কাছে হস্তান্তর;

২. উদার শিল্প ও বাণিজ্যঋণ নীতি;

৩. উদার করনীতি;

৪. সংরক্ষিত বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্থানীয় মুদ্রার কৃত্রিম উচ্চতর বিনিময়হার ও নানাপ্রকার আমদানি নিয়ন্ত্রণ;

৫. বিশেষত ষাটের দশকে শিল্পজাত পণ্য রপ্তানিকে উৎসাহিত করার জন্য বোনাস ভাউচার স্কীম প্রথা চালু করা এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়হার বহুমুখীকরণ;

৬. শ্রমঘন শিল্পখাত ও কৃষিখাতের প্রতি সচেতনভাবে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ;

৭. বৈদেশিক পুঁজি ও বিদেশী ব্যক্তিগত পুঁজিকে উদার আমন্ত্রণ।

এসব নীতির ফলে সমগ্র পাকিস্তানে কিভাবে সম্পদ ও আয়ের কেন্দ্রীভবন ঘটেছিল এবং ৪৩ পরিবারের উদ্ভব হয়েছিল তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। বস্তুত পাকিস্তানে ষাটের দশকে যে শিল্পায়ন ঘটেছিল তার চরিত্রগত দুর্বলতা ইতিমধ্যেই বহু গবেষণায় প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৪৫] এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত তথ্য প্রদান ও আলোচনার পর অর্থনীতিবিদ এ. আর. খান যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন সেটি উল্লেখ করে এ আলোচনার ইতি টানবো। এ. আর. খান বলেন, "সকল যোগ-বিয়োগ ও গুণ-ভাগই দেখায় যে, প্রাইভেট ক্যাপিটালিস্টরা অধিক সঞ্চয়ী (high savers) ছিলেন না এবং খুব সম্ভবত শুধু উৎপাদনোপকরণ সস্তায় আমদানি করার সুযোগের মাধ্যমে তাঁরা যে পরোক্ষ 'নীট সাবসিডি' পেয়েছিলেন তার পরিমাণই ছিল তাঁদের মোট ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের চেয়ে বেশি। entrepreneurship সংক্রান্ত যুক্তিটিও ধোপে টেকে না, যেহেতু একজন বৃহৎ পুঁজিপতিকে বিপুল পরিমাণ সাহায্য প্রদান করলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্য অনেক ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোক্তার জন্য তা ব্যাপক অনুৎসাহ সৃষ্টি করে এবং চূড়ান্ত বিচারে এমনকি তাদের

---

৪৫. দেখুন, Ian Little Skitvoski and Morris Scot, *Industry and Trade in Some Developing Countries A Comparative Study*, (London 1970).

উৎখাতসাধন করে। এসব নীতির ফলে আসলে দেশ যা পেয়েছিল তা হচ্ছে একটি অত্যন্ত অদক্ষ বৃহদায়তন ম্যানুফেকচারিং শিল্প। বিকৃত ও যথেচ্ছ দাম নির্ধারণের কারণে প্রাইভেট ক্যাপিটালিস্টদের জন্য তা যথেষ্ট লাভজনক হলেও সমাজের কাছে তার মূল্য ছিল নগণ্য অর্থাৎ অলাভজনক, যদিও সমস্ত মূল্যায়ন আপেক্ষিক সামাজিক দুষ্প্রাপ্যতা বা relative social scarcity অনুযায়ী করা হয়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, কুটিরশিল্প ও কৃষির জন্য সৃষ্টি হয়েছিল অত্যন্ত শক্তিশালী অপ্রণোদনা (disincentive), যার পরিণতিতে এরা স্থবির হয়ে পড়েছিল এবং আয় বণ্টনে এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিকূল প্রভাব পড়েছিল।[৪৬]

সমগ্র পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যে বিশেষ ধনিকগোষ্ঠীকে টার্গেট করে অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন করেছিলেন, ঐতিহাসিকভাবে তাদের অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দা ছিলেন বলে এই নীতির আরেকটি মারাত্মক কুফল প্রতিফলিত হয়েছিল ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক বৈষম্যের মধ্যে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে ১৯৫০—১৯৫৪-৫৫ কালপর্বে পরিকল্পিত মোট উন্নয়নব্যয়বরাদ্দের শতকরা আশি ভাগই ব্যয় করা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এবং মাত্র ২০ ভাগ ব্যয় করা হয়েছিল পূর্ব বাংলায়। পরবর্তী ১৯৫৫-৬০ কালপর্বে তথা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাকালে পূর্ব বাংলার জন্য বরাদ্দকৃত অংশ সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ২৬ ভাগ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৩২ ভাগ। অখণ্ড পাকিস্তানের সর্বশেষ পরিকল্পনা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৬৫-১৯৬৯-৭০) ব্যয়ের হার ছিল সর্বাধিক মাত্র ৩৬ শতাংশ। অথচ পূর্ব বাংলায় এই সমগ্র কালপর্বে সর্বদাই পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি বসবাস করতো। শুধু ব্যয়ের ক্ষেত্রেই এই বৈষম্য সীমাবদ্ধ ছিল না, পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদপাচার অব্যাহত ছিল। ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত দুই দশকে মোট সম্পদপাচারের হিসাব করেছেন পূর্ব বাংলার তদানীন্তন নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদগণ এবং তাঁদের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, এর মোট পরিমাণ ছিল ৩১১২ কোটি টাকা অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছর পূর্ব বাংলার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১০ শতাংশ এসময় পশ্চিমে পাচার হয়ে যাচ্ছিল। এসব বিবিধ কারণে ১৯৭০ সালের পর পরই পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ভেঙে যায় এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব বাংলা স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৪৭]

৪৬ A R Khan, প্রাগুক্ত, (London 1972), 151.

৪৭. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় 'পূর্ব পাকিস্তানের' প্যানেল অব ইকনমিস্টদের পৃথক রিপোর্ট দ্রষ্টব্য। এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তৃত জানার জন্য দেখুন, এই গ্রন্থের ২১ অধ্যায়ে রেহমান সোবহান রচিত প্রবন্ধ *বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি*।

সোনার বাংলা : কিংবদন্তি ও বাস্তব

আকবর আলি খান*

বিদেশী পর্যটকরা ও ঐতিহাসিকরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাকে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যে উচ্ছলিত অমরাবতী রূপে বর্ণনা করেছেন। সোনার বাংলার কিংবদন্তি সম্পর্কে যেসব কাহিনী প্রচলিত রয়েছে তা বাস্তব।[১] কিন্তু বাংলার নিরবচ্ছিন্ন সমৃদ্ধি সম্পর্কে যে ব্যাপক সরলীকৃত বক্তব্য রয়েছে তা বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। স্কট গর্ডন যথার্থই বলেছেন, " ... তত্ত্ববিহীন বর্ণনা অন্তঃসারশূন্য। যেসব বিজ্ঞানী এ ধরনের কাজ করেন তারা ভিন্ন ধরনের মোহে বিভ্রান্ত, তারা বিশ্বাস করেন যে তারা কোন তত্ত্ব ব্যবহার করছেন না, কেননা অন্তর্নিহিত যে তত্ত্ব তারা ব্যবহার করেছেন সে সম্পর্কে তারা নিজেরাই সজাগ নন"।[২] তাই বাংলার আর্থিক বিবর্তন সম্পর্কে সনাতন ব্যাখ্যার অন্তর্নিহিত অনুমানসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করা অত্যাবশ্যক।

---

* সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১. বর্তমান খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুশীল চৌধুরী প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে,বাংলা কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যে এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে এবং এর ফলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা এত উন্নত হয় যে বাংলাকে আলঙ্কারিক ভাষায় "স্বর্গরাজ্য", "ভারতের বেহেশত", "বিশ্বের জান্নাত" ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। শুধু স্থানীয় ভদ্র লোকরাই এ ধরনের ধারণার জন্ম দেন নি, এতে সমকালীন বৈদেশিক পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের অবদান রয়েছে। এই স্বর্গরাজ্য তত্ত্ব আরো জোরদার হয় ঔপনিবেশিক সমাজে সনাতন অর্থনীতির অবক্ষয় এবং পরবর্তীকালে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে। এই পর্যায়ে আমরা প্রামাণ্য অর্থনৈতিক তত্ত্বের আলোকে এই স্বর্গরাজ্য তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করবো। তবে এই বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার তুলানামূলক সমৃদ্ধি সম্পর্কে সুশীল চৌধুরীর বক্তব্য অস্বীকার করা নয় (সম্পাদকের নোট)।

২. Scott Gordon. *The History and Philosophy of Social Science* (London and New York 1993), 10.

সোনার বাংলা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতবাদ অর্থনীতির প্রামাণ্য তত্ত্বের সঙ্গে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অর্থনীতিবিদদের মধ্যে তাত্ত্বিক মতভেদ সত্ত্বেও সকল ধরনের অর্থনীতিবিদই সোনালী যুগ তত্ত্বকে কিংবদন্তি হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, সোনার বাংলার ব্যাখ্যা অকাট্য তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সোনার বাংলা সম্পর্কে ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যায় সোনার বাংলা তত্ত্বের চারটি অনুসিদ্ধান্ত রয়েছে। প্রথমত, ঐতিহাসিকগণ বিশ্বাস করেন যে, বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলা অব্যাহত সমৃদ্ধি উপভোগ করেছে। এর অর্থ হলো, বাংলায় কখনো দুর্ভিক্ষ ঘটে নি এবং সমসাময়িক সমাজে অর্থনৈতিক চক্রের ফলে যে ধরনের উঠানামা দেখা যেতো তা ছিল বাংলায় অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, বৃটিশ শাসনের পূর্বে বাংলা ছিল 'প্রাচুর্য ও সস্তা দামের দেশ'[৩]। তৃতীয়ত, বাংলার আপামর জনগণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সুফল ভোগ করেছে। ফলে বাংলার জনগণের কাছে দারিদ্র্য ছিল অপরিচিত। চতুর্থত, সমসাময়িক সমাজের তুলনায় প্রাক-বৃটিশ বাংলা ছিল সমৃদ্ধতর।

এই অধ্যায়ের লক্ষ্য হলো 'সোনার বাংলা' তত্ত্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহ পরীক্ষা করা। এটি চারটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে প্রাক-বৃটিশ বাংলাতে কথিত অব্যাহত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে সোনার বাংলায় সুলভ দ্রব্যমূল্যের অর্থনৈতিক তাৎপর্য আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অংশে প্রাক-বৃটিশ বাংলাতে দারিদ্র্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষ অংশে রয়েছে এ প্রবন্ধের মূল বক্তব্যসমূহের সারসংক্ষেপ এবং বাংলার অতীত ইতিহাসের ব্যাখ্যায় উপরোক্ত বক্তব্যসমূহের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা।

নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্পর্কে কিংবদন্তি

'সোনার বাংলা' তত্ত্বের প্রবক্তারা বিশ্বাস করেন যে, বৃটিশ শাসনের পূর্বে বাংলায় নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিরাজ করতো। এ তত্ত্বের দু'টি স্পষ্ট অনুসিদ্ধান্ত রয়েছে। প্রথমত, প্রাক-বৃটিশ আমলে কখনো দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নি। দ্বিতীয়ত, এ ধরনের কৃষিপ্রধান সমাজে মাঝে মাঝে অর্থনীতিতে যে ধরনের উঠানামা দেখা যেতো তা ছিল অনুপস্থিত।

প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজ সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা প্রামাণ্য অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের স্বীকৃত ধারণার সাথে মোটেও মেলে না। তাত্ত্বিক মতবিরোধ সত্ত্বেও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজ সম্পর্কে বিস্ময়কর মতের মিল রয়েছে। এ ধরনের সমাজ সম্পর্কে ধ্রুপদী, নব্য-ধ্রুপদী, কেইনসীয় (Keynesian) ও মার্কসীয় অর্থনীতিবিদদের ধারণায় কোন মতবিরোধ নেই। ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের মতে প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজ ছিল

৩. Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Vol. I, (Karachi 1963), 404.

ম্যালথুসীয় (Malthusian) ফাঁদে বন্দী। এ ধরনের সমাজে বেশিরভাগ লোক কোন রকমে বেঁচে থাকতো। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল নিয়ন্ত্রক ছিল জনসংখ্যা। ম্যালথুসের পূর্বসূরি এডাম স্মিথ বিশ্বাস করতেন যে, "অন্যান্য পণ্যের মতো মানুষের উৎপাদন তার চাহিদা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।"[৪] ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের মতে, মজুরির হার বেড়ে গেলে শ্রমের চাহিদা বেড়ে যেতো। রিকার্ডোর মজুরি সম্পর্কে অমোঘ নিয়মের (iron law) বক্তব্য হলো, দীর্ঘদিন ধরে মজুরির হার বেঁচে থাকার জন্য যে ন্যূনতম মজুরি প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি থাকতে পারে না। মজুরি বাড়লে জনসংখ্যা বাড়বে; জনসংখ্যা বাড়লে মজুরি আবার কমে যাবে। কাজেই প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজের অর্থনীতিতে উঠানামা ছিল, কিন্তু কোন দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব ছিল না। ম্যালথুসীয় বিশ্লেষণে প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতো দুর্ভিক্ষ। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মজুরির চেয়ে মজুরি বেড়ে গেলেই জনসংখ্যার অতিসরবরাহ দেখা যেতো। এর পরিণামে শুরু হতো মজুরি হ্রাস আর সবশেষে দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষে জনসংখ্যা কমে গেলে আবার মজুরির হার বেড়ে যেতো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হতো জনসংখ্যা বৃদ্ধির ও দুর্ভিক্ষের পরবর্তী চক্র।

যদিও নব্য-ধ্রুপদী ও কেইনসীয় অর্থনীতিবিদরা শিল্পপ্রধান সমাজে ধ্রুপদী মডেলের প্রয়োগ যথার্থ মনে করেন না, তবু প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজের ক্ষেত্রে ধ্রুপদী বিশ্লেষণ সম্পর্কে তাদের কোন আপত্তি নেই। তাই নব্য-ধ্রুপদী ধারার দু'জন ইতিহাসবেত্তা এ ধরনের সমাজ সম্পর্কে লিখেছেন :

> যদি আমরা মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসের চিত্র তুলে ধরি এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের অর্থনৈতিক জীবন আধুনিক মানদণ্ডে বিচার করি, তা হলে দেখতে পাবো যে জীবন ছিল বিরামহীন দুর্দশা। . . . দুর্দশার যুগকে কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং সেসব যুগকে গ্রাম্য সারল্যের স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু সেসব যুগ স্বর্ণযুগ ছিল না।[৫]

অনুরূপ মত কেইনস্‌ও ব্যক্ত করেছেন। কেইনস্ লিখেছেন :

> প্রাচীনতম সময় যখন থেকে লিখিত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, ধরুন খৃষ্টজন্মের দু'হাজার বছর আগে থেকে আঠারো শতকের শুরু পর্যন্ত পৃথিবীর সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের কোন বড় পরিবর্তন হয় নি। উঠানামা হয়েছে নিশ্চয়ই। প্লেগ, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধও দেখা দিয়েছে। কখনো এসেছে সোনালী বিরতি। কিন্তু অগ্রগতিশীল কোন পরিবর্তন দেখা যায় নি।[৬]

প্রাক-বৃটিশ ভারতের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে কার্ল মার্কসের ধারণাও ছিল অনুরূপ। তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, হিন্দুস্থানের সোনালী যুগে যারা বিশ্বাস করে তিনি তাদের দলে

৪. Quoted in Robert L. Heilbroner, *The Worldly Philosophers,* (New York 1986), 65

৫. Nathan Rosenberg and L.E. Birdzwell, Jr., *How the West Grew Rich,* (New York 1986), 1.

৬. J. M. Keynes, "Economic Possibilities of Our Grand Children", *Essays in Persuasion* ,(London 1931), 360

নন।[৭] তিনি প্রাক-বৃটিশ ভারতের জীবনকে "মর্যাদাহানিকর, স্থবির ও প্রগতিহীন" বলে চিহ্নিত করেছেন এবং গ্রাম্য সমাজকে "ক্ষুদ্র, আধা-বর্বর, আধা-সভ্য সমাজ" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৮]

"কৃষকরা সর্বত্র একই ধরনের"।[৯] ম্যাক্সিম গোর্কীর এ স্মরণীয় উক্তি প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজের রূঢ় বাস্তবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ঐতিহাসিকদের স্বাভাবিক অনুমান হওয়া উচিত যে, প্রাক-বৃটিশ বাংলায় বিরামহীন দারিদ্র্য বিরাজ করতো। ঐতিহাসিকগণ পক্ষান্তরে বলেন যে, প্রাপ্ত ঐতিহাসিক আকরসমূহ হতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাক-বৃটিশ যুগে বাংলাতে আদৌ কোন দুর্ভিক্ষ হয় নি। মধ্যযুগের বাংলা সম্পর্কে একজন ঐতিহাসিক দাবি করেছেন, "দেশে সব সময় প্রচুর খাদ্য থাকতো। এর ফলে উত্তর ভারতের অন্যত্র মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষের খবর পাওয়া গেলেও সমগ্র মুসলমান শাসনামলের ঐতিহাসিক উপাদানসমূহে একটি দুর্ভিক্ষেরও উল্লেখ নেই।"[১০]

ঐতিহাসিক আকরসমূহ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, প্রাক-বৃটিশ বাংলায় অন্তত তিনটি দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কৌতূহলের বিষয় এই যে, বাংলার প্রাচীনতম লিপিতে রয়েছে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ। মহাস্থানলিপি সম্ভবত খৃস্টের জন্মের তিন শত বছর আগে রচিত হয়েছিল। লিপিটিতে দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণকে রাজার ভাণ্ডার হতে খাদ্যশস্য প্রদানের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। লিপিতে পুণ্ড্রনগরের মহাজাতককে দুর্ভিক্ষের ত্রাণব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।[১১] আনুমানিক নবম শতকে রচিত *মঞ্জুশ্রী মূলকল্প* গ্রন্থে গৌড়ের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহে 'মহা দুর্ভিক্ষের' উল্লেখ রয়েছে।[১২] নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন যে, দুর্ভিক্ষটি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বিরাজমান অরাজকতাকালে (৬৫০-৭৫০ খৃ.) দেখা দেয়।[১৩] আরেকজন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল গুপ্ত শাসনের প্রথম পর্বে অর্থাৎ আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীতে।[১৪] তৃতীয় দুর্ভিক্ষের উল্লেখ রয়েছে *ফতিয়া ইবরিয়া* গ্রন্থে, যাতে ১৬৬১-১৬৬৩ সালের দুর্ভিক্ষ বর্ণিত হয়েছে।[১৫] প্রথমোক্ত দুর্ভিক্ষটি ঘটেছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে। তৃতীয় দুর্ভিক্ষটি ছিল মনুষ্যসৃষ্ট।

৭. Karl Marx, "The Future Results of British Rule in India", in Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works*, Vol I, (Moscow 1962), 345.

৮. ঐ, 350.

৯. Quoted from Fernard Braudel, *The Wheels of Commerce Civilization and Capitalism of 15th-18th Century*, Vol. II, translated by Sian Reynolds, (New York 1982), 253

১০. Mohammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal*, Vol 1B, (Riyadh 1985), 960.

১১. Radha Krishna Chaudhury, *Inscriptions of Ancient India*, (New Delhi 1983), 91.

১২. K P. Jayaswal, *An Imperial History of India in a Sanskrit Text*, (Lahore 1934), 32

১৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, আদি পর্ব (সংক্ষেপিত), (কলিকাতা ১৩৮২ বা. স.), ২৪১।

১৪. K P Jayaswal, *Imperial History*, 52

১৫. Quoted from Jadu Nath Sarkar (ed.), *The History of Bengal*, Vol II, (Patna 1973), 343-344

এ দুর্ভিক্ষে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ ছিল অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাহীনতার জন্য খাদ্যদ্রব্য চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং গ্রাম্য চৌকিদার ও অভ্যন্তরীণ শুল্কের কর্মকর্তাদের অত্যাচার। দুর্ভিক্ষের ফলে দুর্দশা ছিল তীব্র। তালিশ লিখেছেন, "রুটির চেয়ে জীবনের দাম ছিল সস্তা আর রুটি পাওয়াই যাচ্ছিল না।"[১৬]

যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, দু'হাজার বছরে মাত্র তিনটি দুর্ভিক্ষের উল্লেখ এ কথাই প্রমাণ করে যে, বাংলায় কদাচিৎ দুর্ভিক্ষ হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক আকরসমূহে যতো দুর্ভিক্ষ হয়েছে তার চেয়ে অনেক কম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের অনুমানের পক্ষে জোরালো যুক্তি রয়েছে। প্রথমত, বাংলার ইতিহাসের উপাদানসমূহ রচনা করেছেন বিদেশী সভাসদগণ ও বিদেশী পর্যটকগণ। সভাসদদের মূল লক্ষ্য ছিল তাদের প্রভুদের গুণকীর্তন। যেহেতু পর্যটকরা সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের সাথে মেলামেশা করেছেন, সেহেতু এ দেশের সাধারণ লোকদের জীবন সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল ভাসা-ভাসা ও অস্পষ্ট। দ্বিতীয়ত, রোজেনবার্গ ও বার্ডজেল যথার্থই উল্লেখ করেছেন,

> সাহিত্য, কবিতা, রোমান্স ও কিংবদন্তির কল্যাণে আমরা অনেক সময় অতীতে দুর্দশার প্রাধান্যের কথা ভুলে যাই। এসব উপাদানে যারা ভাল করে বেঁচেছিল তাদেরই স্মরণ করা হয়েছে আর নীরব দারিদ্র্যে যারা কালাতিপাত করেছে তাদের ভুলে যাওয়া হয়েছে।[১৭]

তৃতীয়ত ঐতিহাসিক উপাদানে উল্লেখ না থাকলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলায় বন্যা, খরা ও ঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্বিপাক বারবার আঘাত হেনেছে। এসব দুর্বিপাকের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে সময় সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত প্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপাদানসমূহে অধিকাংশ প্রাকৃতিক দুর্বিপাকই উল্লেখিত হয় নি।

সাহিত্যিক উপাদানসমূহও বাংলায় মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ হওয়ার অনুমান সমর্থন করে। তেরো শতকের প্রথমদিকে শ্রীধর দাস সংকলিত *সদুক্তিকর্ণাত* গ্রন্থে ক্ষুধার্ত সন্তানকে খাদ্যদানে অক্ষম মায়ের আর্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[১৮] ষোল শতকের কবি জয়ানন্দ তাঁর *চৈতন্যমঙ্গল* গ্রন্থে একটি দুর্ভিক্ষের নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন :

> শ্রীহট্ট দেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ জন্মিল
> ডাকা-চুরি অনাবৃষ্টি মড়ক লাগিল।
> উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিয়া
> নানা দেশে সর্ব্বলোক গেল পালাইয়া।[১৯]

---

১৬. ঐ, 344.

১৭. Nathan Rosenberg and L.E. Birdzwell, Jr., *How the West Grew Rich*, I.

১৮. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, ১৯৭।

১৯. জয়ানন্দ, *চৈতন্যমঙ্গল*, সম্পাদনা বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায়, (কলিকাতা ১৯৭১), নদীয়া খণ্ড।

জয়ানন্দের পূর্বপুরুষরা এর ফলে সিলেট হতে নবদ্বীপে বসতি স্থানান্তর করেন। জয়ানন্দের বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অনাবৃষ্টির ফলে মড়ক ও নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে। ষোল শতকের অন্য এক কবি চন্দ্রাবতী তাঁর *মলুয়া* আখ্যানে আরেকটি দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিয়েছেন।[২০] এক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষের কারণ হলো বন্যা। আখ্যানটিতে বন্যায় উদ্ভূত নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আশ্বিনের বন্যায় চাঁদ বিনোদের জমির ফসল ভেসে যায়। ধানের দাম বেড়ে টাকায় ছয় মণে দাঁড়ায়। ধান ক্রয়ের ক্ষমতা চাঁদবিনোদের নেই। প্রথমে তার হালের বলদ বিক্রি হয়, তারপর মহাজনের কাছে জমিজমা বন্ধক দেয়া হয়। সবশেষে খাদ্য ও অর্থের সন্ধানে চাঁদবিনোদ গ্রাম ছেড়ে চলে আসে। ষোড়শ শতকের আরেকজন কবি বৃন্দাবন দাস রচিত *চৈতন্যভাগবতে*ও দুর্ভিক্ষের উল্লেখ রয়েছে।[২১]

উল্লিখিত সাক্ষ্যসমূহ প্রাক-বৃটিশ বাংলায় দুর্ভিক্ষের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির অনুমান অগ্রাহ্য করে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলায় ঘনঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। বাংলায় অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ও নিবিড়তা কম ছিল। এ অনুমানের পক্ষে দু'টি যুক্তি রয়েছে। প্রথমত বাংলায় প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের মধ্যে বন্যা সবচেয়ে ঘনঘন হতো। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে সবচেয়ে মারাত্মক বিপর্যয় ছিল খরা। উপদ্রুত অঞ্চলে খরার ফলে সব ফসল নষ্ট হয়ে যেতো; বন্যার ফলে ক্ষতি কম হতো। একই গ্রামের ভিতরে ও একই অঞ্চলে সব জমির উচ্চতা সমান ছিল না। এর ফলে সব জমিতে বন্যার ফলে সমান ক্ষতি হতো না। উচ্চতর জমিতে বন্যায় আদৌ কোন ক্ষতি হতো না, কখনো কখনো যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের জন্য বন্যাপরবর্তী ফলন ভাল হতো। পক্ষান্তরে নিচু জমিতে সকল ফসল তলিয়ে যেতো। এর ফলে সচ্ছল কৃষকরা, যারা সাধারণত উঁচু ও ভাল জমির মালিক, তারা বন্যায় ফসলের দাম বেড়ে গেলে লাভবান হতো। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা, যারা বন্যাপ্রবণ জমির মালিক, বন্যার ফলে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়তো। বন্যা তাই সমাজে মেরুকরণ প্রক্রিয়াকে জোরদার করে। সাহিত্যিক উপাদানসমূহেও উপরোক্ত প্রবণতাসমূহ লক্ষ্য করা যায়। জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গলে* দেখা যায় যে, খরার ফলে দুর্ভিক্ষ হলে নীলাম্বর চক্রবর্তীকে দেশান্তরে যেতে হয়। স্পষ্টতই খরার ফলে তার পূর্বতন বাসস্থান বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। চন্দ্রাবতীর *মলুয়াতে* দেখতে পাই যে, যদিও বন্যায় শস্যহানির দরুন চাঁদবিনোদের গ্রামে দুর্দশা বিরাজ করছে, তথাপি মহুয়ার গ্রাম বা চাঁদবিনোদের ভগ্নির গ্রামে খাদ্যাভাব নেই। বাংলায় বন্যার ফলে বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে দরিদ্র লোকদের মধ্যে খাদ্যাভাব দেখা যেত। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে খরার ফলে ব্যাপক দুর্দশা দেখা দিত।

২০. চন্দ্রাবতী, 'মলুয়া', *ময়মনসিংহ গীতিকা*, সম্পাদনা সুখময় মুখোপাধ্যায়, (কলিকাতা ১৯৭০), ৪৪-৬।

২১. Quoted in Momtazur Rahman Tarafder, *Husain Shahi Bengal : A Socio Political Study* (Dhaka 1965), 161-162

দ্বিতীয়ত দক্ষিণ এশিয়াতে দুর্ভিক্ষ অত্যন্ত ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকতো। বৃটিশ প্রশাসনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, যেখানে পরিবহনব্যবস্থা উন্নত ছিল সেখানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ততো কম ছিল। কার্ল মার্কস যথার্থই বলেছেন :

> ভারতের মতো অন্য কোথাও পরিবহনের অভাবে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের মধ্যে সামাজিক দুর্দশা দেখা যায় না। বৃটিশ হাউজ অব কমন্সের একটি কমিটির কাছে ১৮৪৮ সালে প্রমাণ করা হয় যে, যখন খান্দেশে ৮ বুশেল খাদ্যের দাম ছিল ৬ থেকে ৮ শিলিং, তখন পুনাতে এর দাম ছিল ৬৪ থেকে ৭০ শিলিং। পুনার রাস্তায় লোক মরছিল, কিন্তু কাদার রাস্তাতে খান্দেশ থেকে খাদ্য নিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না।[২২]

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলায় একটি কার্যকর অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনব্যবস্থা ছিল। এর ফলে বাংলার এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে খাদ্য পাঠানো সহজ ছিল। তাই বাংলায় দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা ও নিবিড়তা কম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে সহজ যোগাযোগব্যবস্থা দুর্ভিক্ষ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় হলেও যথেষ্ট ছিল না। প্রাকৃতিক বাধা ছাড়াও মানুষের সৃষ্ট বাধা (যার উল্লেখ তালিশ করেছেন) খাদ্যশস্য চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়া উপদ্রুত এলাকাতে খাদ্যশস্য পাঠানো যথেষ্ট নয়, খাদ্যশস্য কেনার জন্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতা থাকতে হবে। দৃশ্যতই ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ক্রয়ক্ষমতা সীমিত ছিল। এর ফলে এরা ছিলেন খাদ্যাভাবের প্রধান শিকার। কাজেই বাংলায় দুর্ভিক্ষের নিবিড়তা কম হলেও বাংলায় দুর্ভিক্ষ অজানা ছিল একথা বলা ঠিক হবে না। কয়েকজন ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেছেন যে, বাংলায় স্থানীয় খাদ্যাভাব ঘটতো, দুর্ভিক্ষ নয়।[২৩] দুর্ভিক্ষ ও স্থানীয় খাদ্যাভাবের মধ্যে মাত্রার তফাৎ রয়েছে, কিন্তু এদের প্রকৃতি অভিন্ন। উপরন্তু প্রাক-বৃটিশ বাংলায় কোন জাতীয় বাজার ছিল না, সকল বাজারই ছিল খণ্ডিত ও স্থানীয়। এ ধরনের পরিবেশে স্থানীয় খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে অর্থবহ পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না।

উপরের আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও দুর্দশা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে বারবার ব্যাহত করেছে। কৃষিতে এ ধরনের অস্থায়ী উঠানামা ছাড়াও বাংলার অর্থনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী উঠানামা দেখা গেছে। বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করেছে দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অবস্থা, বাণিজ্যিক সড়কে রাজনৈতিক অবস্থা ও বৈদেশিক চাহিদা। বিভিন্ন সময়ে বাংলায় প্রাপ্ত মুদ্রা বিশ্লেষণ করলে বাংলার অর্থনৈতিক উঠানামার আভাস পাওয়া যায়। পাঁচ ও ছয় শতকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। কিন্তু সাত শতক হতে বারো শতক পর্যন্ত যখন পাল ও সেন রাজারা রাজত্ব করতেন তখন কোন স্বর্ণমুদ্রা চালু করা হয় নি। তেরো শতকে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর আবার স্বর্ণমুদ্রা চালু হয়।

২২. Karl Marx, "The Future Results of British Rule in India", 354.

২৩. Mohar Ali, *Muslims of Bengal,* 925

উপরোক্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন যে, সাত শতক হতে বারো শতক এই পাঁচশত বছর ধরে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে স্থবিরতা বিরাজ করে।[২৪] এই স্থবিরতার কারণ দু'টি। প্রথমত, রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় এবং এর ফলে বাংলার পণ্যের চাহিদা দ্রুত কমে যায়। দ্বিতীয়ত, ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য আরব বণিকদের একচেটিয়া বাণিজ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং এ বাণিজ্য থেকে ভারতীয় বণিকদের উচ্ছেদ করা হয়। এর ফলে বাণিজ্যে মুনাফা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মন্দার সাক্ষ্য ও পঞ্চম থেকে বারো শতক পর্যন্ত স্বর্ণমুদ্রার অনুপস্থিতি বাংলায় অব্যাহত সমৃদ্ধির অনুমান মোটেও সমর্থন করে না। এমনকি, মুসলিম শাসনামলে যখন যথেষ্ট স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করা হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুনরায় চালু করা হয়, তখনো বাংলার অর্থনীতিতে অবশ্যই উঠানামা ছিল। নিশ্চয়ই রাজনৈতিক পরিস্থিতি বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছে। কাজেই চৌদ্দ শতক হতে আঠারো শতক পর্যন্ত পাঁচ শত বছর ধরে একই ধরনের সমৃদ্ধি বিরাজ করছিল।[২৫] এ ধরনের দাবি মেনে নেয়া কঠিন। একথা বিশ্বাস করা শক্ত যে, হাবশী ক্রান্তিকালের (১৪৮৭-১৪৯৩) মতো রাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে নি। সম্ভবত অর্থনৈতিক উঠানামা ও রাজনৈতিক উঠানামা একই সাথে ঘটেছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বাংলায় অব্যাহত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিরাজ করে নি। প্রথমত, অর্থনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী উঠানামা ছিল। বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যেও উল্লেখযোগ্য উঠানামা দেখা গেছে। দ্বিতীয়ত, খাদ্যশস্যের মূল্যে স্বল্পস্থায়ী উঠানামা ছিল। প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ও মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতার জন্য খাদ্যশস্যের দাম বেড়েছে। দুর্ভিক্ষ এবং আকাল বারবার প্রাচুর্যের ধারাবাহিকতা রূঢ়ভাবে ছিন্ন করেছে।

সুলভ দ্রব্যমূল্যের অর্থনৈতিক তাৎপর্য

মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম অবিশ্বাস্যভাবে সুলভ ছিল।[২৬] চৌদ্দ শতকে মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা লিখেছেন, "পৃথিবীর আর কোথাও এত সস্তা দাম দেখি নি"।[২৭] চীনা পরিব্রাজক ওয়াং তু ওয়ান, যিনি চৌদ্দ শতকে

---

২৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, ৯৩-৯৭।

২৫. Mohar Ali, *Muslims of Bengal*, 925.

২৬. ঐ, 960.

২৭. Ibn Batuta, *Travels in Asia and Africa, 1325-1354*, translated by H.A.R Gibb. (New York 1969), 267

বাংলায় এসেছিলেন, তিনি লিখেছেন, বাংলায় দ্রব্যমূল্য মোটামুটি সস্তা ছিল।[২৮] ১৬২৮ থেকে ১৬৪১ সাল পর্যন্ত ভারত ভ্রমণ করেছিলেন সেবাস্তিয়ান ম্যানরিক। তাঁর সাক্ষ্য অনুসারে বাংলায় খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের দাম ছিল অত্যন্ত সস্তা।[২৯] সতেরো শতকের পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের বাংলায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সস্তামূল্য লক্ষ্য করেছেন।[৩০] বাংলায় দ্রব্যমূল্যের সুলভতার কারণ হিসেবে কৃষি ও শিল্পে বাংলার অসাধারণ উৎপাদনশীলতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালের একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন:

> কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্যের কারণ হচ্ছে ভূমির উর্বরতা, শিল্পের বিকাশ এবং জনগণের শ্রম ও কারিগরি নৈপুণ্য। বাংলায় দ্রব্যাদি এত প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো যে দেশের লোকের চাহিদা মেটানোর পরও সমৃদ্ধিশালী বহির্বাণিজ্যের জন্য যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকতো। এ উদ্বৃত্তের বিনিময়ে বিদেশ হতে সোনা-রূপা এসে এ প্রদেশকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলে।[৩১]

সস্তাদাম একটি আপেক্ষিক ধারণা। প্রথমত, একটি দেশের দ্রব্যমূল্য অন্য দেশের তুলনায় সস্তা হতে পারে। কিন্তু এ উপাত্তের ভিত্তিতে দু'টি দেশের জীবনযাত্রার মানের তুলনা সম্ভব নয়, কারণ জীবনযাত্রার মান শুধু দ্রব্যমূল্যের উপর নির্ভর করে না, আয়ের স্তর ও বণ্টনের উপরও নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত, একটি দেশের লোকের আয়ের তুলনায় সে দেশের দ্রব্যমূল্য সস্তা হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত বাংলার ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে এ দু'টি স্বতন্ত্র ধারণাকে অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে, মধ্যযুগের বাংলা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন :

> তবু একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে শতাব্দীর পর শতাব্দী খাদ্যসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম ছিল এবং তার ফলে স্বল্প আয়ে একজন লোক তার নিজের ও তার পরিবারের ভরণপোষণের সংস্থান করতে পারতো।[৩২]

এ ধরনের যুক্তির মূল ত্রুটি এই যে, দ্রব্যমূল্যের সুলভতা দেশের লোকের আয়ের তুলনায় নির্ণয় না করে বিদেশী দামের তুলনায় নির্ণয় করা হয়। স্পষ্টতই বস্ত্রের মূল্য সস্তা হলে তাঁতির মজুরি বেশি হতে পারে না, কৃষিপণ্যের মূল্য সস্তা হলে খামার-শ্রমিকের মজুরি কম হবে। তাই দ্রব্যমূল্যের সুলভতা জীবনযাত্রার উচ্চমানের জন্য প্রয়োজনীয় কিংবা যথেষ্ট নয়।

---

২৮. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল*, (কলিকাতা ১৯৮০), ৩১৮-৩১৯।

২৯. Mohar Ali, *Muslims of Bengal*, 962.

৩০. Francois Bernier, *Travels in the Moghal Empire, trans* Archibald Constable, (Lahore 1976), 438-439.

৩১. Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, 404.

৩২. Mohar Ali, *Muslims of Bengal*, 963.

ভ্রমণবৃত্তান্তসমূহে দ্রব্যমূল্যের সুলভতার উল্লেখ বিক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত। এসব বৃত্তান্তে শুধু বাংলার দ্রব্যমূল্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু এগুলো বাংলার জনগণের আয় ও মজুরি সম্পর্কে নীরব। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও ইবনে বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্তে দ্রব্যমূল্যের সুলভতার তাৎপর্য সম্পর্কে অর্থবহ ইঙ্গিত রয়েছে। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত হতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলার তুলনায় দিল্লীতে আয় ও দ্রব্যমূল্য বেশি ছিল। বাংলায় সবচেয়ে উত্তম ক্রীতদাসী এক দিনারে বিক্রি হতো, একটি দাস বালকের মূল্য ছিল দুই দিনার।[৩৩] দিল্লীতে ইবনে বতুতা একজন তুর্কীর কাছে একটি ক্রীতদাস একশ' দিনারে বিক্রয় করেন।[৩৪] এ সময়ে দিল্লীতে দাসী বালিকার দাম ছিল আট দিনার, উপপত্নীর দাম ছিল ১৫ টঙ্কা।[৩৫] ইবনে বতুতা বাংলার লোকদের আয় সম্পর্কে কিছু বলেন নি। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত হতে দেখা যায় যে, দিল্লীর আমিরদের আয় ছিল অনেক বেশি। তিনি লিখেছেন যে, দিল্লীর উজির তাঁর প্রতিটি ক্রীতদাসকে পঁয়ষট্টি রৌপ্যদিনার (৬.৫ স্বর্ণদিনারের সমান) বখশিস দিয়েছিলেন। অথচ বাংলায় দুই দিনারে একজন ক্রীতদাস ক্রয় করা যেতো।[৩৬] বাংলায় দ্রব্যমূল্যের তুলনায় ইবনে বতুতার আয় ছিল প্রচুর। সুলতান বছরে ইবনে বতুতাকে সতেরো হাজার দিনার ভাতা দিতেন।[৩৭] ঋণ শোধ করার জন্য সুলতান তাঁকে পঞ্চান্ন হাজার দিনার দেন।[৩৮] প্রথমবার সালাম জানাতে গেলে দিল্লীর উজির তাঁকে দুই হাজার রৌপ্যমুদ্রা (দুশ' স্বর্ণমুদ্রার সমান) উপহার দেন।[৩৯] সুতরাং ইবনে বতুতা যে বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য সস্তা বিবেচনা করবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

বাংলায় লোকের আয়ের তুলনায় দ্রব্যমূল্য সস্তা ছিল না এ ধরনের ইঙ্গিত ইবনে বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্তেই রয়েছে। প্রথমত ইবনে বতুতা লিখেছেন, বাংলায় করের হার খুব বেশি ছিল। পূর্ব বাংলা সফরের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, "এখানকার প্রজারা মুসলমান রাজার বিধর্মী প্রজা। এদের ফসলের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ নিয়ে নেয়া হয়। তার উপরে তাদের কর দিতে হয়।"[৪০] যেহেতু আদায়কৃত কর জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হতো না, বরং দিল্লীকে নজরানা প্রদান এবং যুদ্ধের জন্য ব্যয় করা হতো, সেহেতু করের উচ্চহার জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বিশেষভাবে হ্রাস করে। এ ধরনের করব্যবস্থা চালু থাকলে

৩৩. Ibn Batuta, *Travels*, 267.

৩৪. ঐ, ১৯৬।

৩৫. Irfan Habib, "Non Agricultural Production and Urban Economy", *The Cambridge Economic History of India*, Vol. I, (ed),Tapan Ray Chaudhuri and Irfan Habib, (New York 1982). 92.

৩৬. Ibn Batuta, *Travels*, 210

৩৭. ঐ, 206-207.

৩৮. ঐ, 210

৩৯. ঐ।

৪০. ঐ, 271

দ্রব্যমূল্য কম হতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত, ইবনে বতুতা বলেছেন, "আমি তাদের বলতে শুনেছি যে এ দামও তাদের জন্য বেশি"।[৪১] এ উক্তি জনগণের সীমিত ক্রয়ক্ষয়তা সম্পর্কে অনুমান সমর্থন করে। বাংলায় জনগণের আয়ের তুলনায় দ্রব্যের মূল্য সস্তা ছিল না। তৃতীয়ত, দাসদের স্বল্পমূল্য প্রমাণ করে যে, বাংলায় মজুরির হার কম ছিল। একজন দাস সারা জীবনে যা আয় করতো তার উপর নির্ভর করে দাসের দাম। যদি মজুরির হার বেড়ে যেতো তবে দাসের দামও বাড়তো। বস্তুত দিল্লীতে ঘোড়ার দাম বাংলায় দাসের দামের চেয়ে বেশি ছিল। ঐতিহাসিক বারানী লিখেছেন যে, দিল্লীতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘোড়ার দাম ছিল দশ থেকে বারো টঙ্কা।[৪২] ইবনে বতুতা লিখেছেন, মুলতানে ঘোড়ার জন্য সাত দিনার শুল্ক দিতে হতো।[৪৩] এসব থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাংলায় দাসদের উৎপাদনশীলতা ছিল অত্যন্ত সীমিত।

ইবনে বতুতা বাংলায় দ্রব্যমূল্য তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, বাংলার জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। ইবনে বতুতা বাংলায় দ্রব্যমূল্য নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন :

> আমি আট দিবহামে আটটি তাজা মোরগ বিক্রয় হতে দেখেছি, এক দিরহামে পনেরোটি কচি কবুতর পাওয়া যেতো, দুই দিরহামে পাওয়া যেতো একটি মোটাসোটা ভেড়া। আমি আরো দেখেছি, ত্রিশ হাত লম্বা সর্বোত্তম মানের মিহি তুলার কাপড় দু'দিনারে বিক্রয় হয়েছে, সুন্দরী ক্রীতদাসী বিক্রয় হয়েছে এক দিনারে, যা মরক্কোর মুদ্রায় আড়াই দিনারের সমান।[৪৪]

ইবনে বতুতা বাংলাদেশে দ্রব্যাদির দাম সোনার দিনার এবং দিরহামে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সময়ে বাংলায় স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা বিনিময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল না, কড়ি ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম। তিনি নিজে তা জানতেন এবং কড়ি সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন :

> এসব দ্বীপের (মালদ্বীপের) অধিবাসীরা কড়ির খোলস মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করে। কড়ি হচ্ছে এক ধরনের প্রাণী যা সমুদ্র থেকে সংগৃহীত হয়। এগুলি গর্তে রেখে দিলে বাইরের খোল থেকে যায় আর মাংস শুকিয়ে যায়। কেনাবেচার জন্য এক স্বর্ণদিনারের বদলে এক হাজার কড়ি দেয়া হয়। চালের বদলে কড়ি বাংলার এবং ইয়ামনের সাথে বিনিময় করা হয়। বাংলায় কড়ি মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ইয়ামনের লোকেরা বালির বদলে (ভার হিসেবে) জাহাজে কড়ি ব্যবহার করে। নিগ্রোরা তাদের দেশে কড়ি ব্যবহার করে। মল্লি এবং গ্যগ্যতে আমি এক স্বর্ণদিনারের বদলে ১১৫০টি কড়ির বিনিময় দেখেছি।[৪৫]

৪১. উদ্ধৃতি দেখুন, Mohar Ali, *Muslims of Bengal*, IA, 130.

৪২. Irfan Habib, "Non Agricultural Production", 92.

৪৩. Ibn Batuta, *Travels* , 186.

৪৪. ঐ, 267.

৪৫. ঐ, 243.

ইবনে বতুতা মোরগ বা কবুতরের দাম কড়িতে উল্লেখ করেন নি। এতে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, ইবনে বতুতা যারা দিনারে আয় করে তাদের দৃষ্টিকোণ হতে দ্রব্যমূল্যের কথা চিন্তা করেছিলেন, যারা কড়িতে আয় করতেন তাদের দৃষ্টিকোণ হতে নয়।

ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক উপাদানসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বাংলায় দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে কড়ি ছিল বিনিময়ের মাধ্যম। স্পষ্টতই যারা কড়িতে বেচাকেনা করতো তারা আয়ও কড়িতেই করতো, সোনা বা রূপার মুদ্রায় নয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক কড়ির ব্যাপক ব্যবহার বিভ্রান্তিকর মনে করেন। প্রাক-মুসলিম বাংলাতে ব্যাপক কড়ির ব্যবহারের কারণ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা। ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যে আরবদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দক্ষিণ এশিয়ার বহির্বাণিজ্য ব্যাহত হয়। ফলে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরও কড়ির ব্যবহার কেন চালু ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। একটি ব্যাখ্যা অনুসারে, মধ্যযুগের বাংলায় সোনা ও রূপার পর্যাপ্ত সরবরাহ পুনরায় শুরু হলেও বাঙালিরা অন্ধ আনুগত্যের জন্য কড়ির ব্যবহার চালু রাখে।[৪৬] এটি একটি জটিল বিষয়ের অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। একথা সত্য যে, মধ্যযুগের জাঁকালো বহির্বাণিজ্যের ফলে বাংলায় প্রচুর পরিমাণ সোনা ও রূপা আমদানি করা হয়। কিন্তু এসব মূল্যবান ধাতু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি। স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা হতে দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণের জন্য। আবুল ফজল লিখেছেন যে, বাংলার লোকেরা মোহর ও টঙ্কা খাজনা দেয়ার জন্য নির্ধারিত স্থানে নিয়ে আসতো।[৪৭] যেহেতু রাষ্ট্রের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার ছিল সীমাহীন, সেহেতু অনেক সময় স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা সম্পদ লুকিয়ে রাখার জন্য ব্যবহৃত হতো। এজন্য দৈনন্দিন ক্রিয়াকাণ্ড এবং ছোটখাটো বিনিময়ের জন্য স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহৃত হতো না। একজন ঐতিহাসিক ঠিকই বলেছেন যে, বাংলায় স্বর্ণমুদ্রা ছিল সখের মুদ্রা[৪৮] এবং এ মুদ্রা বাদশাহ-আমিরদের নজরানা দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো। তাই বাংলার জাঁকালো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাইরে থেকে যে সোনা ও রূপা নিয়ে আসতো তা ব্যবহৃত হতো দিল্লীতে রাজস্ব পাঠানোর জন্য।

বাংলা থেকে দিল্লীতে অর্থ পাচারের ফলে বাংলার লোক আরো দরিদ্র হতো। রাজস্ব প্রশাসন অধিকতর কার্যকর হলে বাংলা হতে অধিকতর সম্পদ চলে যেতো। কাজেই দিল্লীর প্রতিনিধিদের আদায়ের পরিমাণ বেড়ে গেলে বাংলার জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেলে স্বভাবতই দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাবে। এক্ষেত্রে সুলভ মূল্যের তাৎপর্য হচ্ছে জনগণের দুর্দশা, সমৃদ্ধি নয়।

৪৬. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস*, ৩৫৫-৩৫৬।

৪৭. উদ্ধৃত, Mohar Ali, *Muslims of Bengal*, 928.

৪৮. Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, (Dhaka 1963). 93.

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে শায়েস্তা খানের সুবাদারিকালের (১৬৬৪-১৬৮৮) সমৃদ্ধি সম্পর্কে কিংবদন্তি পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। ক্যাপ্টেন চার্লস স্টুয়ার্ট শায়েস্তা খান সম্পর্কে নিম্নলিখিত কিংবদন্তি লিপিবদ্ধ করেছেন :

> বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর শাসনামলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এত সস্তা ছিল যে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেতো। এ ঘটনার স্মৃতি রক্ষা করার জন্য তিনি যখন ঢাকা ছেড়ে চলে যান তখন ঢাকার পশ্চিম তোরণ, যার মধ্য দিয়ে তিনি শহর ছেড়ে যান, তা বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। তোরণটিতে একটি লিপি খোদাই করা হয়, যাতে লেখা হয় যে ভবিষ্যতে কোন সুবাদার যদি চালের দাম অনুরূপ পর্যায়ে কমাতে পারে তবেই এ তোরণ খোলা হবে। এ নিষেধাজ্ঞার ফলে নবাব সরফরাজ খানের প্রশাসন পর্যন্ত এ তোরণ বন্ধ ছিল।[৪৯]

একজন সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক শায়েস্তা খানের সময় চালের দামের নাটকীয় হ্রাসের দু'টি কারণ চিহ্নিত করেছেন : (১) পর্তুগীজ-আরাকানী জলদস্যুদের হুগলীস্থ আখড়া ১৬৩২ সালে ভাঙ্গার পর নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ফলে বাণিজ্যে তেজীভাব এবং (২) আরাকানীদের হাত থেকে ১৬৬৭ সালে চট্টগ্রাম দখল।[৫০]

এ ব্যাখ্যার তিনটি স্পষ্ট ত্রুটি রয়েছে। প্রথমত, শায়েস্তা খান বাংলাদেশে ১৬৬৪ হতে ১৬৭৭ এবং ১৬৭৯ হতে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছেন। ১৬৩২ সালে পর্তুগীজ-আরাকানীদের দমন করা হলে শায়েস্তা খানের শাসনামলে দ্রব্যমূল্যের উপর তার প্রভাব কেন পড়বে তা বোঝা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রাম জয়ের ফলে চালের মূল্য কমে যাবে যদি চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে চালের বড় রপ্তানিকারক হয়। এ অনুমানের সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। সবশেষে উপরোক্ত ব্যাখ্যায় চালের চাহিদার কথা একেবারে উপেক্ষা করা হয়েছে। যখন চালের চাহিদা কমে যায় তখন চালের দামও কমে যাবে। চালের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে, চালের দাম কমে যাওয়ার জন্য এক্ষেত্রে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। শায়েস্তা খান একজন যোগ্য ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। বাদশাহকে খুশি করার জন্য ও নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তিনি জনগণের কাছ থেকে যতোটুকু সম্ভব অর্থ আদায় করতেন। সারণি ১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শায়েস্তা খান গড়ে প্রতি বছর জনগণের কাছ থেকে রাজস্বের অতিরিক্ত যে অর্থ আদায় করতেন তার পরিমাণ ৮০ লক্ষ থেকে প্রায় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টঙ্কা পর্যন্ত উঠানামা করতো।

শায়েস্তা খানের সময় সরকারিভাবে আদায়কৃত রাজস্বের কোন নির্ভরযোগ্য হিসাব নেই। তবে শায়েস্তা খানের আগে ও পরে যে রাজস্ব আদায় হয়েছে তা থেকে শায়েস্তা খানের শাসনামলে রাজস্বের পরিমাণ অনুমান করা যেতে পারে। ১৬৫৮ ও ১৭০০ সালের রাজস্বের গড়ের ভিত্তিতে শায়েস্তা খানের শাসনামলে বাংলায় ভূমিরাজস্বের পরিমাণ ১২৫ লাখ টঙ্কা নির্ধারণ করা যেতে পারে (সারণি ২ দেখুন)। আবুল ফজল জানাচ্ছেন যে, মুগল

৪৯. উদ্ধৃত, Jadunath Sarkar, *History of Bengal*, 386-87.

৫০. Mohar Ali, *Muslims of Bengal*, 748.

আমলে ভূমির উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসেবে আদায় হতো।[৫১] এ দু'টি তথ্যের ভিত্তিতে বাংলায় তৎকালীন কৃষিউৎপাদনের মূল্য ৩৭৫ লাখ টঙ্কা নির্ধারণ করা যেতে পারে। কৃষিখাতে জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ উৎপন্ন হতো অনুমান করলে শায়েস্তা খানের আমলে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) সম্ভবত ৪৬৮ লাখ টঙ্কার কাছাকাছি ছিল। মোট রাজস্ব ও শায়েস্তা খানের অতিরিক্ত আদায়ের মোট পরিমাণ ২০৫ লাখ টঙ্কা (১২৫ লাখ রাজস্ব+ ৮০ লাখ জোরজবরদস্তি করে আদায়) হতে ৩০০ লাখ টঙ্কা (১২৫ লাখ রাজস্ব + ১৭৫ লাখ জোরজবরদস্তি করে আদায়) হতে পারে। এ হিসাব থেকে মনে হয় যে, তাঁর শাসনামলে রাষ্ট্র মোট জাতীয় উৎপাদনের কমপক্ষে ৪৩.৮% আদায় করেছে এবং এই আদায়ের পরিমাণ মোট জাতীয় উৎপাদনের ৬৪% পর্যন্ত হতে পারে।

সারণি ১ : শায়েস্তা খানের জোরজবরদস্তিমূলক আদায়

	সূত্র	প্রাক্কলন-১	সূত্র	প্রাক্কলন-২
১.	মাস্টার-এর হিসাবে শায়েস্তা খানের ধন-দৌলতের পরিমাণ	৩০০০ লাখ	১. আসামের ঐতিহ্যগত ইতিহাসে শায়েস্তা খানের ধন-দৌলতের পরিমাণ	১৭০০ লাখ
২.	১৬৮০ সালে বাদশাহকে প্রদত্ত ঋণ, যা মাফ করে দেয়া হয়	৭ লাখ	২.১৬০০ সালে বাদশাহকে প্রদত্ত ঋণ, যা মাফ করে দেয়া হয়	৭ লাখ
৩.	পাঁচ লাখ টাকা করে চার বছর (১৬৮২-১৬৮৫) বাদশাহকে প্রদত্ত অতিরিক্ত রাজস্ব	২০ লাখ	৩.পাঁচ লাখ টাকা করে চার বছর (১৬৮২-১৬৮৫) বাদশাহকে প্রদত্ত অতিরিক্ত রাজস্ব	২০ লাখ
৪.	১৬৮২ সালে দিল্লীকে প্রদত্ত জিজিয়া	১লাখ	৪.১৬৮২ সালে দিল্লীকে প্রদত্ত জিজিয়া	১ লাখ
৫.	১৬৭৮ সালে বাদশাহকে প্রদত্ত নজরানা	৩৪ লাখ	৫.১৬৭৮ সালে বাদশাহকে প্রদত্ত নজরানা	৩৪ লাখ
	২২ বছরে মোট জবরদস্তিমূলক আদায়ের পরিমাণ	৩০৬২ লাখ	২২ বছরে মোট জবরদস্তি-মূলক আদায়ের পরিমাণ	১,৭৬২ লাখ
	গড়ে বার্ষিক আদায়ের পরিমাণ	১৭৫.৫ লাখ	গড়ে বার্ষিক আদায়ের পরিমাণ	৮০.০৯ লাখ

উৎস : Jadunath Sarkar, *History of Bengal*, Vol. II, (Patna : 1973), 373-374

৫১. উদ্ধৃত, Mohar Ali, *Muslims of Bengal*, 748.

সারণি ২ : বাংলায় ভূমিরাজস্বের পরিমাণ, ১৫৮২-১৭৫৬

সাল	মোট রাজস্ব (টাকাতে)
১৫৮২	৬৩,৪৪,২০০
১৬৫৮	১৩১,১৫,৯০৭
১৭০০	১১৭,২৮,৫৪১
১৭০৭	১২৬,৭৬,৬৪৭
১৭১২	১৩৪,২৬,৯৩৮
১৭১৬	১৩৯,৩৯,৪০১
১৭২৮	১৪২,৪৫,৫৬১
১৭৫৬	১৪২,৪৫,৫৬১

উৎস : ১. ১৫৮২ ও ১৬৫৮ সালের উপাত্তের জন্য, মোহাম্মদ মোহর আলী, *History of The Muslims of Bengal*, Vol. IB (Riyadh 1985), 748.

২. ১৭০০ হতে ১৭৫৬ সালের উপাত্তের জন্য, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাঙলা*, (কলিকাতা ১৯৮২), ৬৯।

তর্কের অবতারণা করে বলা যেতে পারে যে, উপরোক্ত হিসাবে বাংলার মোট জাতীয় উৎপাদনের মূল্য কম ধরা হয়েছে, কারণ যোগাযোগব্যবস্থার অসুবিধার জন্য সম্ভবত সকল স্থান হতে নির্ধারিত হারে কর আদায় করা সম্ভব হয় নি। যদি ধরেও নেয়া যায় যে, মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ উপরোক্ত হিসাবে বেশি ছিল, তবু মোট জাতীয় উৎপাদনের কর ও জবরদস্তিমূলক আদায়ের হার সম্ভবত পূর্বোক্ত হিসাবের খুব কম হবে না, কারণ উপর্যুক্ত হিসাবে অধস্তন কর্মকর্তা এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা জোরজবরদস্তি করে যে অর্থ আদায় করতো তা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। বাংলা সাহিত্যে অধস্তন কর্মচারীদের ব্যাপক অত্যাচারের বর্ণনা রয়েছে। মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে রাজস্ব ও পুলিশ কর্মকর্তাদের ও বণিক এবং স্বর্ণকারদের জোরজবরদস্তিমূলক আদায়ের চমৎকার চিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন।[৫২] বিভিন্ন বর্ণনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসেবে কর ও জোরজবরদস্তিমূলক আদায়ের পরিমাণ ছিল যথেষ্ট বেশি। এ ধরনের পরিবেশে যেখানে রাষ্ট্র সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যেতো, সেখানে সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতা সীমিত হতে বাধ্য। কাজেই মধ্যযুগের বাংলায় অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য দ্রব্যমূল্য কম ছিল না, দ্রব্যমূল্য কম থাকার বড় কারণ ছিল জনগণের ক্রয়ক্ষমতার অভাব।

৫২. উদ্ধৃত, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, (ঢাকা ১৯৬৫), ১১৮-১১৯।

প্রাক-বৃটিশ বাংলায় দারিদ্র্য

অর্থনৈতিক দিক থেকে কোন দেশ সমৃদ্ধ হলেই দারিদ্র্য পুরোপুরি দূর হয়ে যায় না। যদি সম্পদের সুষম বণ্টন না হয়, তবে ধনী দেশেও দারিদ্র্যের সুযোগ থাকে। বাংলার ইতিহাসের প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তকসমূহের বক্তব্য এই যে, বাংলা শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়েই সমৃদ্ধ ছিল না, সব দিক দিয়েই বাংলায় দারিদ্র্য ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ সম্পর্কিত গ্রন্থে বারবার জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রাক-বৃটিশ আমলে বাংলায় সাধারণ লোকের খাওয়া-পরার কোন সমস্যা ছিল না। যুক্তি দেখানো হয় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলায় জনসংখ্যা ছিল কম, কিন্তু প্রচুর পরিমাণ অনাবাদি উর্বর জমি ছিল। কাজেই সাধারণ লোকের খাদ্যাভাবের প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু এই বক্তব্য আয়-বন্টনের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছে। যদি আয়ের সুষম বণ্টন না হয়, তবে দেশে অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের উৎপাদন সত্ত্বেও কিছু লোক দরিদ্র থেকে যাবে। বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের চিরাচরিত ব্যাখ্যার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ দু'ধরনের ঐতিহাসিক উপাত্ত রয়েছে। প্রথমত, প্রাক-বৃটিশ আমলের বাংলায় দাসপ্রথা চালু ছিল। সকল লোক সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকলে দাসপ্রথা চালু থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের আকরসমূহে বারবার তাঁতিদের 'সর্বজনীন' এবং 'প্রচণ্ড' দারিদ্র্যের কথা বলা হয়েছে।[৫৩] প্রাক-বৃটিশ আমলে তাঁতিরা ছিল সবচেয়ে দক্ষ শ্রমিক। এদের মজুরি কম হলে স্বভাবতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, বাংলায় অকৃষি শ্রমিকরা অর্থনৈতিক দিক থেকে সচ্ছল ছিল না।

বাংলায় দাসপ্রথা প্রাচীনকাল হতে চালু ছিল। বাৎসায়নের *কামসূত্রে* দাসপ্রথার উল্লেখ রয়েছে। আইনজ্ঞ জীমূতবাহন (আনুমানিক খৃঃ ১২/১৩ শতক) দাসত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ লিপিবদ্ধ করেছেন। জীমূতবাহনের *দায়ভাগ* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যদি উত্তরাধিকারসূত্রে একাধিক ব্যক্তি একজন ক্রীতদাসী লাভ করে, তবে মালিকদের সম্পত্তিতে ভাগ অনুসারে দাসীকে পর্যায়ক্রমে সকল মালিকের কাজ করতে হবে।[৫৪] বিদেশী পর্যটকরা দাসপ্রথার উল্লেখ করেছেন। চৌদ্দ শতকের চতুর্থ দশকে বাংলা ভ্রমণ করে ইবনে বতুতা লিখেছেন, "আমি 'শয্যাভূষণ' ক্রীতদাসীদের এক দিনার অর্থাৎ মরক্কোর আড়াই দিনারে বিক্রয় হতে দেখেছি। আমি ঐ দামে আশুরা নামে একজন ক্রীতদাসী ক্রয় করেছিলাম। মেয়েটি ছিল অপরূপ সুন্দরী। আমার একজন সহযাত্রী দুই দিনার দিয়ে লুলু নামে একজন দাস বালক ক্রয় করেছিল।"[৫৫] পর্তুগীজ ব্যবসায়ী বারবোসা ষোল শতকে বাংলায় দাস ব্যবসার নিম্নরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন :

৫৩. K. N. Chaudhuri, *The Trading World of Asia and the English East India Company*, (Cambridge 1978), 268-270.

৫৪. R.C. Majumdar (ed), *History of Bengal*, Vol. I, (Dhaka 1943), 618.

৫৫. উদ্ধৃত, Mohar Ali, *Muslims of Bengal*, 131.

> এই শহরের (বাঙ্গালায়) মুরিশ (মুসলমান) বণিকরা দেশের ভিতরে গিয়ে বহু পৌত্তলিক বালককে তাদের পিতামাতার অথবা যারা তাদের চুরি করে, তাদের কাছ থেকে ক্রয় করে এবং তাদের নপুংসক বানায়। তাদের (ঐ বালকদের) মধ্যে কেউ কেউ এতে মারা যায়। যারা বেঁচে যায়, তাদের এরা খুব ভালোভাবে মানুষ করে এবং পণ্য হিসেবে ইরানীদের কাছে জনপ্রতি কুড়ি বা ত্রিশ ডুকাট দামে বিক্রি করে, তারা (ইরানীরা) তাদের স্ত্রীদের এবং ঘরবাড়ির রক্ষক হিসেবে এদের খুব মূল্যবান জ্ঞান করে।[৫৬]

আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন যে, সিলেট ও ঘোড়াঘাট অঞ্চল অনেক খোজা সরবরাহ করতো।[৫৭] জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে বাংলার দাসপ্রথা সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণনা রয়েছে :

> হিন্দুস্থানে, বিশেষ করে বাংলার উপনিবেশ সিলেট প্রদেশে লোকদের মধ্যে একটি প্রথা ছিল যে তারা তাদের ছেলেদের খোজা করে সুবাদারকে রাজস্বের বদলে খোজা দিত। ক্রমে এই প্রথা অন্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতি বছর কিছু কিছু ছেলের জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং তারা প্রজননক্ষমতা হারাচ্ছে। এই প্রথা সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। এ পর্যায়ে আমি আদেশ জারি করলাম যে, এরপর আর কেউ এ প্রথা অনুসরণ করবে না এবং ছোট ছোট ছেলেদের খোজা করে বিক্রি করার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়।[৫৮]

কোন কোন ঐতিহাসিক বাংলায় দাসপ্রথার প্রচলন সম্পর্কে উপরোক্ত সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট নন।[৫৯] তাঁরা বলেন, যদিও বাংলায় দাসপ্রথা চালু ছিল তবু বাংলার বাজারে যে- সব দাসদাসী বেচাকেনা হতো তাদের বাইরে থেকে আমদানি করা হয়েছিল, তারা বাঙালি নয়। তাঁরা বলেন যে, বাংলায় শ্রমিকের অভাব থাকায় বাইরে থেকে দাস আমদানি করা হতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ইলিয়াস শাহী শাসকরা আবিসিনীয় দাস আমদানি করেছিলেন। তাঁরা অবশ্য স্বীকার করেন যে, পর্তুগীজ জলদস্যুরা কখনো কখনো স্থানীয় লোকদের জোর করে দাসে পরিণত করেছে। একজন ঐতিহাসিক জোর দিয়ে বলেছেন, "বাংলাতে কোন স্থানীয় লোককে অন্য স্থানীয় লোকের কাছে দাস হিসেবে বিক্রয় করার নজির কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।"[৬০] বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দাস বিক্রয়ের যেসব দলিল পাওয়া গেছে তা প্রত্যক্ষভাবে উপরোক্ত উক্তির পরিপন্থী।

মিত্র জানাচ্ছেন যে, চন্দননগরে ফরাসী শাসকদের মহাফেজখানায় দাস বিক্রয়ের কমপক্ষে একশ'টি দলিল রয়েছে।[৬১] দাস বিক্রয়ের দলিল পাওয়া গেছে সিলেটে[৬২],

---

৫৬. উদ্ধৃত, সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস*, ৩৪৫-৩৪৬।

৫৭. উদ্ধৃত, Abdur Rahim, *History of Bengal*, 299

৫৮. Emperor Nur-Al-Din Muhammad Jahangir, *The Tuzuk-i Jahangiri*, translated by Alexander Rogers , (Delhi 1968), 150.

৫৯. Mohar Ali, *Muslims of Bengal*, 964.

৬০. ঐ।

৬১. সুধীরকুমার মিত্র, *হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ*, (কলিকাতা ১৯৬২), ২৯২।

৬২. Siva Ratan Mitra, *Types of Early Bengali Prose*, (Calcutta 1922), 87.

হুগলী[৬৩] জেলায় এবং ত্রিপুরা রাজ্যে।[৬৪] কলকাতা যাদুঘরে রক্ষিত একটি দলিল হতে দেখা যাচ্ছে যে, কায়স্থপাড়া গ্রামের জনৈক গোপীনাথ মজুমদার ১০৭৪ বঙ্গাব্দের ২৯ শ্রাবণ (অর্থাৎ ১৬৬৮ খৃস্টাব্দ) তারিখে নিজেকে ইসিদ্দর খানের কাছে বিক্রয় করে।[৬৫] বলা হয়েছে যে, আর্থিক দুরবস্থার জন্য গোপীনাথ নিজেকে বিক্রয় করেছে। শায়েস্তা খানের শাসনামলকে বাংলার স্বর্ণযুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। অথচ গোপীনাথের আত্মবিক্রয় শায়েস্তা খানের শাসনামলের চতুর্থ বছরে ঘটেছে।

সারণি ৩-এ দশটি দাসবিক্রয় দলিলের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৬৪৯ হতে ১৭৫৪ সালে বাঙালিদের দাস হিসেবে বিক্রয় করা হয়েছে। দশটি মনুষ্যবিক্রয় দলিলের মধ্যে তিনটি মাতাপিতা কর্তৃক শিশুসন্তান বিক্রয়ের দলিল। ১৭১৯ সালে এগারো বছরের শিশুকন্যা এবং ১৭২১ সালে ছয় বছরের মেয়ে বিক্রয় করা হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলায় পিতামাতার দ্বারা কন্যাসন্তান বিক্রয় ছিল অতি মামুলি ঘটনা। উদাহরণস্বরূপ *চৈতন্য চরিতামৃত*-এর নিম্নোক্ত শ্লোক স্মরণ করা যেতে পারে :

নাহা লুহা লবণ বেচিবে ব্রাহ্মণে
কন্যা বেচিবেক যে সর্ব শাস্ত্রে জানে।[৬৬]

আসামের ঐতিহাসিক আকর হতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাক-বৃটিশ আমলে স্বামীরা স্ত্রী বিক্রয় করতো।[৬৭] উনিশ শতকে বাংলায় অনুরূপভাবে স্ত্রী বিক্রয়ের খবর পাওয়া যাচ্ছে।[৬৮]

সারণি ৩-এ চারটি আত্মবিক্রয়ের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দলিলে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, দুর্দশা, অনাহার ও ঋণের কারণে দলিলদাতারা নিজেদের বিক্রয় করেছে। এ ধরনের লেনদেনের জন্য লিখিত দলিল কেন সম্পাদন করা হতো তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। যদি পরবর্তী পর্যায়ে দাসদের পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে পলাতক দাসদের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য এ ধরনের দলিলের প্রয়োজন হতে পারে। ১৭৭০ সালের একটি দাস বিক্রয়ের দলিল উপরোক্ত অনুমান সমর্থন করে। দলিলটিতে শর্ত রয়েছে যে, যদি দাস পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তবে মালিক তাকে শাস্তি দিতে পারবেন।[৬৯] সারণি

৬৩. সুধীরকুমার মিত্র, *হুগলী জেলার ইতিহাস*, ২৮৩-২৯৬।

৬৪. আনিসুজ্জামান, *পুরোনো বাংলা গদ্য*, (ঢাকা ১৯৮৪), ১২৮।

৬৫. সুধীরকুমার মিত্র, *হুগলী জেলার ইতিহাস*, ২৮৬।

৬৬. জয়ানন্দ, *চৈতন্যমঙ্গল*, ২১৬।

৬৭. Amalendu Guha, "The Mediaeval Economy of Assam", *The Cambridge Economic History of India*, Vol. I, 503.

৬৮. সুধীরকুমার মিত্র, *হুগলী জেলার ইতিহাস*, ২৮৬।

৬৯. Siva Ratan Mitra, *Bengali Prose*, 90.

৩-এ উল্লেখিত দাসরা অধিকাংশই হলো নিম্নবর্ণের শূদ্র। তবে উচ্চবর্ণের হিন্দু বা মুসলমানদের বিক্রয়ের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। গোপীনাথ মজুমদার, যে নিজেকে শায়েস্তা খানের শাসনামলে বিক্রয় করেছিল, সম্ভবত সে একজন কায়স্থ ছিল, কারণ অনেক কায়স্থ মধ্যযুগের বাংলায় মজুমদার উপাধি ধারণ করতো।[৭০] উপরন্তু ইবনে বতুতার কেনা ক্রীতদাসীর নাম ছিল আশুরা। নামটি মুসলমানের মনে হয়। যেহেতু শুধু পুরুষ দাসদের বাইরে থেকে আনা হতো, তাই আশুরা সম্ভবত স্থানীয় মুসলমান ছিল।

দশটি দাসবিক্রয় দলিলের মধ্যে চারটিতে অনাহার, ঋণ ও দুর্ভিক্ষকে মানুষ বিক্রয়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ছয়টি দলিলে কোন কারণ উল্লেখ করা হয় নি। অবশ্য দু'টি দলিল নাবালক সন্তান বিক্রয়ের। সম্ভবত মনে করা হতো যে, পিতা-মাতার নাবালক সন্তান বিক্রয়ের অধিকার ছিল। এ কারণে হয়তো এসব দলিলে বিক্রয়ের কারণ উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৭৫৪ সালের একটি দাসবিক্রয় দলিলে 'মহা দুর্ভিক্ষের' উল্লেখ আছে। অন্যান্য ঐতিহাসিক দলিলে এ দুর্ভিক্ষের উল্লেখ দেখা যায় না। সম্ভবত দুর্ভিক্ষটি ছিল স্থানীয় এবং শহরে বসবাসরত ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাকে উপেক্ষা করেছেন।

উপরোক্ত দলিল থেকে বাংলায় দাসপ্রথা চালু থাকার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে দাসত্বের বিস্তার ও প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন রয়ে গেছে। প্রথমত, দাসত্ব কি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল ? দ্বিতীয়ত, এ দাসত্বের প্রকৃতি কি ছিল ?

প্রাক-বৃটিশ আমলে বাংলার জনসংখ্যার কত শতাংশ লোক দাস ছিল তার কোন হিসাব পাওয়া যায় না, তবে প্রতিবেশী আসামে দাস, ভূমিদাস ও বন্ধকিদাসরা জনসংখ্যার ৫ শতাংশ হতে ৯ শতাংশ ছিল বলে অনুমান করা হয়।[৭১]

আসামে আনুপাতিক হারে বাংলার চেয়ে দাস বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। সিলেট জেলায় চাকরান ও নানকার ব্যবস্থা দাসব্যবস্থার স্মারক হিসেবে পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলা জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এতে মনে হয় যে, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সিলেটে দাসব্যবস্থা অনেক বেশি শিকড় গজিয়েছিল। তবে বাংলার জনসংখ্যায় দাসের সংখ্যার হার নেহায়েত নগণ্য ছিল অনুমান করা ঠিক হবে না। সতেরো ও আঠারো শতক হতে দাস বিক্রয়ের যেসব দলিল এখনো রয়ে গেছে সেসব দেখলে মনে হয় না যে বাংলাদেশে নেহায়েত কালেভদ্রে দাস বিক্রয় হতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাগজপত্রে দেখা যায় যে, প্রাক-বৃটিশ বাংলায় অনেকগুলো দাস ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার ছিল।[৭২]

৭০. Abdur Rahim, *History of Bengal*, 309.

৭১. *Amalendu Guha, "Mediaeval Eco*nomy," 503.

৭২. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাংলা*, (কলিকাতা ১৯৮২), ২৭।

সারণি ৩ : মনুষ্য বিক্রয় দলিল বিশ্লেষণ, ১৬৪৯-১৭৫৪

বিক্রয়ের বছর	বিক্রেতার নাম	বিক্রিত দাসের নাম	বিক্রয়মূল্য	বিক্রয়ের কারণ
১৬৪৯	শ্রী দৈবাকি শূদ্র	আত্ম ও পুত্র	-	বলা হয় নি
১৬৭১	শ্রী রতি নন্দন	দাস	২.৫ রুপিয়া	বলা হয় নি
১৬৯৫	শ্রী সনাতন দত্ত	আত্মবিক্রয়	৯ রুপিয়া	অনাহার ও ঋণ
১৬৯৬	শ্রী রাম ভদ্র চক্রবর্তী	আত্মবিক্রয়	৩.৫ রুপিয়া	বলা হয় নি
১৭১৯	শ্রী বোদাইর স্ত্রী	১১ বছর বয়স্ক কন্যা	৩ রুপিয়া	বলা হয় নি
১৭২১	শ্রী পার্বতী দাসী	কন্যা শ্রীমনি দাসী, বয়স-৬	৩ রুপিয়া	অনাহার
১৭২৮	শ্রী মুচিরাম চঙ্গ	আত্মবিক্রয়	১১ রুপিয়া	অনাহার
	শ্রীমতি তপী	-	-	-
	শ্রী পঞ্চা চঁঙ্গ	-	-	-
	শ্রী বারু চঙ্গ	-	-	-
	শ্রী রঞ্জিত চঙ্গ	-	-	-
	শ্রীমতি কালি চঙ্গ	-	-	-
১৭৩৫	শ্রী আত্মারাম বাগদী	শ্রীশ্যাম বাগদী ৮ বছর	৭ টঙ্কা	বলা হয় নি
১৭৩৭	শ্রী নন্দ রাম চন্দ্র	দাসের কন্যা	১ রুপিয়া	বলা হয় নি
১৭৫৪	শ্রী সদারাম শূদ্র	আত্মবিক্রয়	২১ রুপিয়া	দুর্ভিক্ষের
	শ্রী বামধন শূদ্র	-	-	ফলে
	শ্রীমতি মাধবী	-	-	অনাহার
	শ্রী বলিরাম শূদ্র	-	-	-
	শ্রীমতি রতনি	-	-	-

উৎস : (১) শিবরতন মিত্র, *Types of Early Bengali Prose*, (University of Calcutta 1922), 29-90.

(২) [illegible]
প্রকাশন ১৯৬৪), ২৮৬-২৮৭।

(৩) তরিকুল আলম খান বাংলাদেশে দাস প্রথা; কতিপয় অপ্রকাশিত দলিল, Journal of Asiatic Society of Bangladesh Vol. III December 1985.

চিরাচরিত দাসত্বের তুলনায় বাংলায় দাসত্বের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। এইচ. এ. আর. গীব যথার্থই বলেছেন :

এ কথা মনে রাখতে হবে যে দাসরা ছিল প্রভুদের দেহরক্ষী অথবা ব্যক্তিগত ভৃত্য এবং দাসত্ব কোন অর্থেই মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল না। রোমান ভূস্বামীদের সাথে দাসদের যে সম্পর্ক ছিল অথবা আমেরিকায় খামারমালিকদের সাথে দাসদের যে সম্পর্ক ছিল তার চেয়ে মুসলমান মনিব ও ভৃত্যের সম্পর্ক ছিল অনেক বেশি মনুষ্যত্বপূর্ণ। এর ফলে দাসত্ব ছিল অনেক কম কলঙ্কময়।[৭৩]

মুসলমান শাসিত বাংলায় উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন দাসের পক্ষে অভিজাত সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে কোন বাধা ছিল না। এর ফলে দাসরা সিংহাসনও দখল করতে পেরেছে। হান্টার বাংলার দাসদের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক (bonded labour) হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৭৪] বেশিরভাগ দাসদের গার্হস্থ্য কাজে ব্যবহার করা হতো যদিও এদের মাঝে মাঝে কৃষিউৎপাদনেও কাজে লাগানো হতো। যেহেতু বড় খামারের পরিবেশে তারা কাজ করতো না, সেহেতু বাংলায় দাসদের সাথে সদয় ব্যবহার করা হতো। ধ্রুপদী ধরনের অমানুষিক দাসত্ব বাংলায় ছিল অজানা। ক্রীতদাসীদেরকে বাড়িতে গৃহপরিচারিকা ও কখনো কখনো উপপত্নী হিসেবে সেবা করতে হয়েছে। ক্রীতদাসীদের যৌনদাসত্ব ছিল দাসত্বের একটি কালিমাময় দিক।

সারণি ৩-এ দেখা যাচ্ছে যে, দাসের দাম ছিল খুবই কম। এক্ষেত্রে দাসের মূল্য হলো একজন দাস সারাজীবন ধরে যে আয় করবে তার বর্তমান মূল্য। ইবনে বতুতার বিবরণ ও সারণি ৩ ইঙ্গিত দেয় যে, বাংলায় দাসদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ছিল খুবই কম। এর অর্থ হলো, বাংলায় শ্রমিকের মজুরিও ছিল কম।

বাংলায় প্রকৃত মজুরি সম্পর্কে উপাত্ত অপ্রতুল। বাংলায় মজুরির হার সম্পর্কে তথ্যের অভাবে কোন কোন ঐতিহাসিক দিল্লীর মজুরিহারের ভিত্তিতে বাংলায় মজুরি অনুমান করার চেষ্টা করেছিলেন।[৭৫] প্রকৃত মজুরির হার হিসাব করার জন্য দিল্লীর মজুরিকে বাংলার দ্রব্যমূল্যের ভিত্তিতে সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, বাংলার তুলনায় দিল্লীতে আয় ও দ্রব্যমূল্য দু'টিই ছিল বেশি। ফলে দিল্লীর মজুরির হার ও বাংলার দ্রব্যমূল্য ব্যবহার করে এসব ঐতিহাসিক বাংলায় মজুরিহার দু'ভাবে বাড়িয়ে দেখিয়েছেন।

কিংবদন্তিখ্যাত মসলিনতাঁতিদের জীবন সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে তা অত্যন্ত করুণ। মসলিন ব্যবসায়ে তাঁতিরা লাভবান হতো না, লাভ করতো মূলত বিদেশী ব্যবসায়ীরা, তাদের দালালরা এবং সরকারি কর্মকর্তারা। আঠারো শতকের শেষদিকে জন টেইলর ঢাকায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, মসলিনের

৭৩. H. A. R. Gibb's "Introduction" in Ibn Batuta, *Travels,* 39.

৭৪. উদ্ধৃতি দেখুন, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাংলা*, ২৭।

৭৫. Abdur Rahim, *History of Bengal,* 410-411 and Mohar Ali, *Muslims of Bengal,* 963.

দামের কমপক্ষে শতকরা বিশ ভাগ মুগল শাসকদের তত্ত্বাবধায়কদের কমিশন হিসেবে দিতে হতো।[৭৬] কারখানায় অবস্থানরত মুকিমরা মসলিন ব্যবসায়ীদের নিয়ত তত্ত্বাবধান করতো। কম দামে মসলিন তৈরি করার জন্য মুগল শাসকরা সবচেয়ে দক্ষ কারিগরদের বেঁচে থাকার মতো মজুরি দিয়ে কাজ করতে বাধ্য করতেন। ফরাসী লেখক আবে রায়নাল বলেছেন যে, বাংলায় দক্ষ তাঁতি হওয়া দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ছিল, কারণ তাদের নগণ্য মজুরির বদলে কাজ করতে বাধ্য করা হতো।[৭৭] কাজেই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, হিন্দু তাঁতিদের সবচেয়ে নিচু বর্ণে স্থান দেয়া হয়েছে। মুসলমান তাঁতিদের অবজ্ঞাভরে বলা হতো জোলা (যার অর্থ হচ্ছে বোকা)।

বাংলায় কাপড়ের মূল্য সম্পর্কে যেসব বিক্ষিপ্ত প্রমাণ রয়েছে, তা থেকে তাঁতিদের আয় সম্পর্কে কিছু অনুমান করা সম্ভব। ইবনে বতুতা লিখেছেন যে, সবচেয়ে ভালো কাপড়, যা প্রায় ত্রিশ হাত লম্বা হতো, তা মাত্র দু'দিনারে বিক্রি হতো। বাংলায় বস্ত্রের উৎপাদনব্যয়ের কাঠামোর প্রাক্কলন থেকে দেখা যায় যে, শ্রমের মজুরি কাপড়ের দামের শতকরা ১৭ হতে ৬০ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো (সারণি ৪ দেখুন)। তাঁতিরা মসলিনের সম্পূর্ণ দাম পেতো ও কোন কমিশন দিত না এবং শ্রমিকরা মসলিনের দাম শতকরা ৫০ ভাগ পেতো এ দু'টি অনুমান (দু'টি অনুমানে মজুরির হার বাড়িয়ে ধরা হয়েছে) প্রয়োগ করলে একখণ্ড মসলিন তৈরির মজুরি বড়জোর এক দিনার হবে। জন টেইলরের মতে, একখণ্ড সূক্ষ্ম মসলিন তৈরির জন্য একজন ওস্তাদ তাঁতি, একজন সহকারী ও একজন শিক্ষানবিসের এক বছর সময় লাগতো।[৭৮] শিক্ষানবিস কোন মজুরি পেতো না। সহকারী তাঁতি ওস্তাদ তাঁতির আয়ের ২৫ হতে ৫০ শতাংশ পেতো। ইবনে বতুতার সময় এক দিনারে ৮৭.৫ মণ চাল বিক্রয় হতো। ওস্তাদ তাঁতির বার্ষিক মজুরি খুব বেশি হলে ৫৭.৮ মণ হতে ৭০ মণ চাল হবে। সহকারী বছরে পেতো ১৭.৫ হতে ২৯.৭ মণ চাল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুসারে ১৯৮৭-৮৮ সালে একজন দক্ষ বস্ত্রকারিগর ৪৫.৭ মণ চাল আয় করেছে।[৭৯]

চৌদ্দ শতকে বাংলার ওস্তাদ কারিগররা খুব বেশি হলে আজকের তাঁতিদের চেয়ে ২৬ থেকে ৫৩ শতাংশ বেশি আয় করতো। তবে খুব সম্ভবত চৌদ্দ শতকের ওস্তাদ কারিগরদের আয় আজকের দক্ষ তাঁতিদের মজুরির চেয়ে খুব বেশি হবে না।

৭৬. আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন,* (ঢাকা ১৯৬৫), ১০৫।

৭৭. ঐ, ১০৬।

৭৮. ঐ, ১১০।

৭৯. চালের বাজারদাম চারটি শহরের দামের গড়ের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়েছে এবং বস্ত্রশিল্পের দক্ষ কারিগরদের দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে মজুরি হিসাব করা হয়। দেখুন, *Statistical Pocket Book of Bangladesh,* 1989, (Dhaka 1989), 223-244.

সারণি ৪ : বাংলার বস্ত্রের খরচের কাঠামো

সন	প্রাক্কলনের উৎস	সুতার খরচ শতকরা হিসেবে	শ্রমের খরচ শতকরা হিসেবে
১৭৮৯ সালের পূর্বে	কে. এন. চৌধুরী	৬৩-৬৯	৩৭-৩০
১৭৮৯ সাল	কে. এন. চৌধুরী	৭০-৮৩	৩০-১৭
১৮০০ "	আবদুল করিম	৫০-৪০	৫০-৬০

উৎস : ১. প্রথম দু'লাইনের জন্য K. N. Chaudhuri, *The Trading World of Asia and the English East India Company*, (Cambridge, Cambridge University Press 1978), 267.

২. তৃতীয় লাইনের জন্য, আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৬৫), ১১০-১১১।

আঠারো শতকের মধ্যভাগে যখন মসলিনের চড়া চাহিদা ছিল তখনো তাঁতিদের মজুরি ছিল খুবই কম। জন টেইলরের হিসেবে ১৭৬০ সালের দিকে একজন তাঁতি বছরে ১২ হতে ১৮ টাকা আয় করতো।[৮০] ১৭৫১-৫২ সালে টাকাপ্রতি চালের দাম ছিল ১.৪ হতে ১.৮ মণ।[৮১] চালের হিসাবে ঐ সময়ে একজন তাঁতি ১৩.৬ হতে ৩২.৪ মণ চাল বছরে উপার্জন করতো। এটি ইবনে বতুতার আমলে একজন তাঁতির সহকারীর আয়ের সমান। আরেকটি হিসাবে ১৭৬০ সালের দিকে সুতা কাটুনি ১৫ থেকে ৩০ টাকা (২১ হতে ৫৪ মণ চাল) বছরে আয় করতো।[৮২]

বাংলাদেশে মজুরির স্বল্পতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষও লক্ষ্য করেছেন। সতেরো শতক হতে মসলিনের দামের সাথে খাদ্যসামগ্রীর মূল্যের খুবই নিবিড় ধনাত্মক সহগমন (correlation) লক্ষ্য করা গেছে। এর কারণ হিসেবে কোম্পানির কর্মচারীরা বলেছেন যে, তাঁতিরা কোনমতে বেঁচে আছে এবং খাদ্যের দাম বেড়ে গেলে মসলিনের দাম না বাড়িয়ে ওদের বেঁচে থাকা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে যখনি খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ে তখনি মসলিনের দাম বাড়ে।[৮৩] ফরাসী ও বাঙালি শ্রমিকের মজুরিহারের সরাসরি তুলনা করে ১৭৩৫ সালে কোর্ট অব ডিরেক্টরস লিখেছেন যে, ফরাসী শ্রমিকের মজুরির হার ভারতীয় শ্রমিকের মজুরির চেয়ে ছয়গুণ বেশি ছিল।[৮৪] অকৃষিমজুরদের মজুরিহারের স্বল্পতার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বাংলার অর্থনীতিতে লক্ষ্য করা গেছে। ব্রুঁদেল মনে করেন যে,

৮০. দেখুন, আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, ১১১।

৮১. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাংলা*, ৯০।

৮২. আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, ১১২।

৮৩. K. N. Chaudhuri, *Trading World*, 112

৮৪. ঐ, 273.

"সতেরো ও আঠারো শতকে ভারতীয় পণ্যসমূহ ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ পণ্যের চেয়ে শুধু মান ও সৌন্দর্যের জন্যই নয়, মূল্যের জন্যও আকর্ষণীয় ছিল। আজকে একই কারণে হংকং ও কোরিয়ায় তৈরি বস্ত্র বিশ্বের বাজার ছেয়ে ফেলেছে।"[৮৫] শ্রমের নিম্নমজুরি থাকায় শ্রম বাঁচানোর জন্য কারিগরি পরিবর্তনের প্রয়োজন বাংলায় আদৌ অনুভূত হয় নি। পক্ষান্তরে বাংলার পণ্যের প্রতিযোগিতা বিলাতে কারিগরি পরিবর্তনের তাগিদ সৃষ্টি করে। কাজেই শিল্পবিপ্লব ছিল অংশত বাংলার সস্তা শ্রমিকদের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া।

উপসংহার

প্রাক-বৃটিশ আমলের বাংলা শাংগ্রিলার মতো স্বপ্নরাজ্য ছিল না। এ সমাজে সাধারণ প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজের বেশিরভাগ লক্ষণই প্রকাশ পায়। এখানে জীবন ছিল দার্শনিক হবসের বর্ণিত নরকের মতো দরিদ্র, নোংরা, পাশবিক এবং হ্রস্ব। এ সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল ক্ষণভঙ্গুর এবং প্রকৃতির খেয়ালখুশিতে পরিচালিত। স্বাভাবিকভাবে অনুমান করা যায় যে, এ সমাজে মাঝে মাঝে সাময়িক দুর্দশা দেখা গেছে। তথাকথিত সোনার বাংলায় তাই দুর্ভিক্ষ অজানা ছিল না। কিন্তু প্রাক-বৃটিশ বাংলায় দারিদ্র্য ক্ষণস্থায়ী ছিল না। এ সমাজে দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্যের গহ্বর ছিল। দাসপ্রথার প্রচলন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ সমাজে অনেক জনগোষ্ঠী ছিল অর্থনৈতিকভাবে অসুবিধাজনক অবস্থায়। তারা বার বার দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে।

প্রশ্ন থেকে যায় যে, প্রাক-বৃটিশ বাংলার অর্থনীতির সুস্পষ্ট সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কেন সোনার বাংলার কিংবদন্তি এতদিন চালু রয়েছে ? ঐতিহাসিকগণ বলবেন যে, সোনার বাংলা তাঁরা আবিষ্কার করেন নি। ইতিহাসের আকরসমূহে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার সমৃদ্ধি সম্বন্ধে ঐকমত্য রয়েছে। বাংলার প্রাচুর্য সম্বন্ধে কিংবদন্তি প্রচার করেছেন বিদেশী পর্যটকরা। এঁরা ছিলেন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও ওয়াকিবহাল। চৌদ্দ শতকের ইবনে বতুতা হতে সতেরো শতকের ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের। মরক্কো, চীন, ইতালি, পর্তুগাল ও ফ্রান্সের পর্যটকরা সকলে একই ধরনের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। ইবনে বতুতার আমলে বাংলা 'উপহারে পূর্ণ নরক' (দোজখ-পুরে-নিয়ামত) বলে পরিচিত ছিল।[৮৬] নরক এজন্য যে, উত্তরের লোকেরা বাংলার আর্দ্র আবহাওয়াকে ঘৃণা করতো। বাংলা উপহারে পূর্ণ ছিল বাংলার অভূতপূর্ব প্রাচুর্যের জন্য। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের সতেরো শতকে বাংলায় দু'বার এসেছিলেন। তাঁর মতে, বাংলা মিশরের চেয়ে সমৃদ্ধ ছিল, অথচ মিশরকে প্রতিযুগে সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে উৎপাদনশীল দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বার্নিয়ের

---

৮৫. Francis Braudel, *The Perspective of the World, Civilization and Capitalism, 15th-18th Century*, Vol 3, translated by Sian Reynolds, (New York 1982), 521

৮৬. Ibn Batuta, *Travels*, 267

লিখেছেন, "বাংলার অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের সমৃদ্ধি এবং বাংলার ললনাদের সৌন্দর্য ও শান্ত স্বভাব পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকদের মধ্যে কিংবদন্তির জন্ম দেয় যে, "বাংলায় আগমনের জন্য শত শত তোরণ আছে, কিন্তু নির্গমনের জন্য একটি তোরণও নেই।"[৮৭] বাংলার সমৃদ্ধি সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা লিপিবদ্ধ করেছেন চৌদ্দ ও পনেরো শতকের চৈনিক পর্যটকরা এবং সতেরো শতকের ভেনিসীয় পর্যটকরা।

স্বাভাবিকভাবেই এতগুলো অকাট্য সাক্ষ্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে না। তবু দু'টি কারণে এসব বিবরণের ব্যাখ্যা পুনর্মূল্যায়নের অবকাশ রয়েছে। প্রথমত, একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দু'ভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে : অনাপেক্ষিক সমৃদ্ধি ও আপেক্ষিক সমৃদ্ধি। এক্ষেত্রে আপেক্ষিক সমৃদ্ধির তাৎপর্য এই যে, সমসাময়িক অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলা সমৃদ্ধতর ছিল। অনাপেক্ষিক সমৃদ্ধির অর্থ এই যে, এ সমাজে দুর্দশা, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য অনুপস্থিত ছিল। কোন প্রকার সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই শুধু যুক্তির ভিত্তিতে একথা সুস্পষ্ট যে, কোন প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজে অবাধ সমৃদ্ধি বিরাজ করতে পারে না। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ পাঠ করলে দেখা যাবে যে, তাঁরা বাংলার আপেক্ষিক সমৃদ্ধির কথা বলেছেন, অনাপেক্ষিক সমৃদ্ধির কথা বলেন নি। এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাংলা সমৃদ্ধ ছিল এ ধারণা সমর্থন করার কারণ রয়েছে। বাংলায় জলের প্রাচুর্য ছিল। এখানে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে খরা অনেক কম ধ্বংসাত্মক ছিল। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে, বৃটিশ শাসনামলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলায় দুর্ভিক্ষ কম হয়েছে।[৮৮] দ্বিতীয়ত, এ কথা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নয় যে, ঐতিহাসিক আকরসমূহে দারিদ্র্যের সঠিক প্রতিফলন পাওয়া যাবে। রবার্ট চেম্বারস যথার্থই বলেছেন, সাম্প্রতিক সময়েও গ্রামীণ দারিদ্র্যকে রীতিমত কম করে দেখানো হচ্ছে।[৮৯] "দরিদ্র পরিবারগুলো কেন্দ্র হতে দূরে থাকে, থাকে শহর থেকে দূরে, গ্রামের এক প্রান্তে অথবা বড় রাস্তা থেকে দূরে।"[৯০] চেম্বার্সের বক্তব্য তাই যথার্থ যে, পক্ষপাত দূর করার সচেতন প্রয়াস না থাকলে 'পল্লীউন্নয়ন পর্যটনে'র ফলে দারিদ্র্যের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়।[৯১] পর্যটকরা শুকনো মওসুমে যখন মওসুমি দারিদ্র্য সবচেয়ে কম থাকে, তখন বড় বড় রাস্তা দিয়ে পৌরকেন্দ্রসমূহে চলাফেরা করেন। এর ফলে গ্রামীণ দারিদ্র্য কম করে দেখানো হয়। এটা আশা করা অযৌক্তিক যে, আজকের পেশাদার পল্লীউন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা যা করতে পারেন না তা মধ্য ও প্রাচীন যুগের পর্যটকরা করতে পারতেন।

৮৭. Francois Bernier, *Travels*, 439.

৮৮. উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ১৭৫০-১৯৫৭ সালে বাংলায় পাঁচটি দুর্ভিক্ষ হয়েছে, কিন্তু বোম্বে প্রদেশে এ সময়ে দশটি দুর্ভিক্ষ হয়েছে। দেখুন, D. Kumar (ed.), *The Cambridge Economic History of India*. Vol. II, (Cambridge 1983), 528-530.

৮৯. Robert Chambers, *Rural Poverty Unperceived: Problems and Remedies*, (Mimeo), World Bank Staff Working Paper No. 400, 1980, 2.

৯০. ঐ, 6

৯১. ঐ।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার অর্থনীতির দুর্বলতাসমূহ বিশ্লেষিত হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, প্রাক-বৃটিশ বাংলায় শুধু নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্র্য বিরাজমান ছিল। এ সমাজে দারিদ্র্য ও সমৃদ্ধি পাশাপাশি দেখা যেতো। প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজে যারা সচরাচর প্রাপ্ত ফসলে ভালভাবে জীবন কাটাতে পারতো তারাই প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিলে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়তো।

ঐতিহাসিক এবং পর্যটকদের বিবরণের তুলনায় সাহিত্যে প্রাক-বৃটিশ বাংলার জীবন অনেক বাস্তবভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যে দেখা যায় যে, দারিদ্র্য ও সমৃদ্ধি পাশাপাশি বিরাজ করতো। *সদুক্তিকর্ণামৃত*-তে যেমন রয়েছে নিদারুণ দারিদ্র্যের বর্ণনা, তেমনি রয়েছে কৃষকের জীবনের অপরিমেয় আনন্দের কথা। *সদুক্তিকর্ণামৃতের* দু'টি পরস্পরবিরোধী শ্লোক নিম্নরূপ :

> "শিশুরা ক্ষুধায় পীড়িত, তাদের দেহ শবের মতো শীর্ণ, আত্মীয়-স্বজনেরা মন্দোদর, পুরাতন ভগ্ন জলপাত্রে এক ফোটা জল ধরে, গৃহিণীর পরিধানে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র।"

> "বর্ষার প্রচুর জল পাইয়া ধান চমৎকার গজাইয়া উঠিয়াছে। ইক্ষুর সমৃদ্ধিও দেখা যাইতেছে। অন্য কোন ভাবনা আর নাই। ঘরে গৃহিণী সারাদিন প্রসাধনরতা। বাহিরে আকাশ হইতে জল ঝরিতেছে প্রচুর। গ্রাম্য যুবক সুখে নিদ্রা যাইতেছে।"[৯২]

অনুরূপ পরস্পরবিরোধী চিত্র চন্দ্রাবতীর *মলুয়াতে* দেখা যায়। দুর্ভিক্ষের সময় চাঁদবিনোদের ঘরে খাদ্য ছিল না। মলুয়ার বাড়িতে এধরনের কোন অভাব দেখা যায় না, সেখানে চাঁদবিনোদের সম্মানে বড় ভোজের ব্যবস্থা করা হয়।[৯৩]

এ কথা সত্য যে, প্রাক-বৃটিশ বাংলার সমাজ আদৌ সমতাবাদী ছিল না। ধনবৈষম্যের ফলে সৃষ্ট পরিবেশে দাসত্ব টিকে থেকেছে। প্রাক-বৃটিশ বাংলার দাসত্বকে মূলধারাবহির্ভূত প্রবণতা বলে আখ্যায়িত করা ঠিক হবে না। দাসত্ব শুধু বাইরে থেকে আমদানিকৃত দাস বা জলদস্যুদের অভিযানের শিকারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সতেরো ও আঠারো শতকের দাসবিক্রয়ের দলিলসমূহ প্রমাণ করে যে, দাসপ্রথা সমাজের মূলধারায় প্রোথিত ছিল। এ কথা সত্য যে, বাংলায় দাসদের প্রধানত ঘরের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, ক্রীতদাসীরা পরিচারিকা ও উপপত্নী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেসব সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল দাসত্ব, সেসব সমাজের তুলনায় বাংলায় দাসদের সঙ্গে অনেক বেশি মানবিক ব্যবহার করা হতো। তবু প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় দাসত্বের অস্তিত্ব এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ সমাজে অনেক দরিদ্র লোক ছিল, যারা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষায় অক্ষম ছিল।

৯২. উদ্ধৃত, নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙলার ইতিহাস*, ১৯৭।

৯৩. চন্দ্রাবতী, "মলুয়া" *ময়মনসিংহ গীতিকা*, ৪২-৪৬ এবং ৫৬-৫৭।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে মনে হয় যে, প্রাক-বৃটিশ বাংলায় মজুরির হার ছিল খুবই কম। তাঁতিদের দারিদ্র্য সম্পর্কে যেসব পরিমাণগত ও বর্ণনামূলক বিবরণ পাওয়া যায় সেসব এ অনুমানই সমর্থন করে। তবে নিম্নহারে মজুরি শুধু তাঁতিদের মধ্যেই চালু ছিল না। সম্ভবত এ ধরনের অর্থনীতি, যেখানে জীবনধারণের সর্বনিম্ন পর্যায়ের আয় ছিল, সেখানে সকল শ্রমিকেরই মজুরি ছিল কম। এর অর্থ হলো, বাংলার জাঁকালো বহির্বাণিজ্যের সুফল ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

দু'টি কারণে বাংলার বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে চিরাচরিত ব্যাখ্যা পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। প্রথমত দেখা যাচ্ছে যে, তাঁতিরা তাদের কাপড়ের পুরো দাম পেতো না। কাপড়ের দামের একটা বড় অংশ আদায় করতো মধ্যস্বত্বভোগীরা, সরকারের তত্ত্বাবধায়করা ও বিদেশী বণিকের দালালরা। মধ্যস্বত্বভোগীরা ও বিদেশী বণিকরাই প্রধানত বাংলার বহির্বাণিজ্যের মুনাফা লুটেছে। দ্বিতীয়ত তারা কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের বিনিময়ে সোনা-রূপা আমদানি করতো। বেশিরভাগ আমদানিকৃত সোনা-রূপা দিল্লীতে রাজস্ব হিসেবে পাঠানো হতো, অবশিষ্ট গোপনে মজুদ করা হতো। প্রাক-বৃটিশ বাংলার বহির্বাণিজ্য তাই প্রবৃদ্ধির যন্ত্র ছিল না, এ বাণিজ্যই ছিল সম্পদপাচারের মাধ্যম।

তথাকথিত সোনার বাংলায় দৈনন্দিন কাজে স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহার করা হতো না। সাধারণ লোক বাড়িতে আয় করতো, ক্রয় করতো এবং বিক্রয় করতো। স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রায় খাজনা দেয়া হতো। কিংবদন্তির সুলভ মূল্য পণ্যের অতিরিক্ত সরবরাহ থেকে হয় নি, হয়েছে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে প্রাক-বৃটিশ বাংলায় সুলভ মূল্য সমৃদ্ধির নয়, দুর্দশার নিদর্শন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, সোনার বাংলা আপেক্ষিক অর্থে 'সোনালী' ছিল না। প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজের সকল দুর্বলতাই প্রাক-বৃটিশ বাংলাতে উপস্থিত ছিল। প্রাক-বৃটিশ বাংলা সমসাময়িক অন্যান্য সমাজের তুলনায় সচ্ছল ছিল—এ অনুমান প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা যায় না। অবশ্য এ সম্পর্কে প্রাপ্ত সাক্ষ্য বর্ণনামূলক ও দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট নয়। তাই প্রাক-বৃটিশ ভারত শিল্পবিপ্লবের পূর্বকালে পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহের তুলনায় সচ্ছল ছিল কিনা এ সম্পর্কে বিতর্ক চলছে।[৯৪] উপাত্তের অপ্রতুলতা ছাড়াও এ ধরনের তুলনায় প্রণালীগত জটিলতা রয়েছে।[৯৫] সোনার বাংলার আপেক্ষিক ভাষ্য সম্পর্কে তাই আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

৯৪. উপরোক্ত বিষয়ে বিতর্ক সম্পর্কে দেখুন, Morris D. Morris,"Towards a Reinterpretation of Nineteenth Century Indian Economic History", *Journal of Economic History*, XXIII: 4 (1963), 607-618 এবং Tapan Ray Chaudhri, "A Reinterpretation of Nineteenth Century Indian Economic History", *Indian Economic and Social History Review*, V (1958), 77-100.

৯৫. প্রণালী সংক্রান্ত সমস্যাবলীর আলোচনার জন্য দেখুন, J. D. Gould, *Economic Growth in History*, (London 1972), 14-21.

মুগল রাজস্বব্যবস্থা

আবদুল করিম*

মুগল রাজস্বনীতি প্রণীত হয়েছিল দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে—যতোটুকু সম্ভব বেশি রাজস্ব আদায় করা এবং একই সঙ্গে চাষীদের সুখে রাখা যেন তারা আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করতে পারে এবং বেশি পরিমাণে চাষাবাদে সক্ষম হয়। চাষীদের মঙ্গলের উপরেই সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি নির্ভর করে—এই প্রত্যয় মুগল সম্রাটের স্বীকৃতি লাভ করে। মুগল সম্রাটদের মধ্যে আকবর সর্বপ্রথম এই নীতি গ্রহণ করেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরাও এই নীতি অনুসরণ করেন। *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে আমলগুজার বা রাজস্বসংগ্রাহক কর্মকর্তা সম্পর্কে একটি পৃথক আইন লিপিবদ্ধ আছে। এতে আমলগুজারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অন্যান্য নির্দেশের মধ্যে একস্থানে বলা হয়েছে :

> আমলগুজার হবেন চাষীদের বন্ধু ; সত্যবাদিতা এবং চাষীদের প্রতি সহানুভূতি ও তাদের সাহায্য করার আগ্রহই হবে তাঁর কর্মপদ্ধতির আদর্শ। তিনি নিজেকে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে গণ্য করবেন এবং তিনি এমন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হবেন (অফিস বা দপ্তর স্থাপন করবেন) যেখানে সকলে সহজে প্রবেশ করতে পারে এবং কৃষককে কোন মধ্যস্থের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না হয়।[১]

সমসাময়িক ইতিহাস-গ্রন্থেও চাষীদের কল্যাণের কথা সর্বত্র পাওয়া যায়। আওরঙ্গজেবের ফরমানেও এই একই নীতির বক্তব্য পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে যে, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে, তাদের চাষাবাদে সাহায্য করতে হবে এবং উৎসাহ

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাক্তন উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১. *আইন-ই-আকবরী*, ২য় খণ্ড, জেরেট এবং সরকার কর্তৃক অনূদিত ও সংশোধিত, দিল্লীর পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৮, অতঃপর '*আইন ২য়*' রূপে উল্লেখিত, ৪৬।

দিতে হবে।[২] আকবরের অনুসৃত মূলনীতির মধ্যে ছিল (ক) ভূমি জরিপ করা এবং জমির পরিমাণ নির্ধারণ, (খ) কর্ষিত এবং চারণভূমির পার্থক্য নিরূপণ এবং সেই হিসেবে নথিভুক্তকরণ, (গ) উর্বরতার ভিত্তিতে কর্ষিত ভূমির প্রকারভেদ নিরূপণ এবং সেই অনুপাতে উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব নির্ধারণ এবং নির্ধারিত রাজস্ব নগদ টাকা বা শস্যে আদায়ের ব্যবস্থাগ্রহণ। এই নীতিমালা অনুযায়ী ভূমিকে আবার খালিসা ও জাগিরে বিভক্ত করা হয়; খালিসা থাকতো সরকারের এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং জাগিরভূমি পদস্থ কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতার বিনিময়ে তাঁদের অধীনে দেয়া হতো। মোটামুটিভাবে এই মূলনীতিগুলি আকবরের পরবর্তী শাসকদের সময়েও প্রচলিত ছিল; কিন্তু বাস্তবে এই নীতিগুলি সর্বত্র বা সকল সময়ে পালিত হতো কিনা বা পালিত হলেও সর্বক্ষেত্রে অনুরূপ ছিল কিনা বলা কঠিন।

সুবা বাংলায় মুগল রাজস্বব্যবস্থাও আকবরের সময়ে প্রবর্তিত হয়, কিন্তু এই ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। *আইন-ই-আকবরীতে* রাজস্বব্যবস্থার একটি কাঠামো পাওয়া যায়। আবুল ফজল এতে সুবা বাংলাকে কয়েকটি সরকারে এবং প্রত্যেক সরকারকে কয়েকটি পরগনা বা মহালে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক পরগনা বা মহালের রাজস্ব 'দাম'[৩] -এ উল্লেখ করা হয়েছে। এই রাজস্বকাঠামো টোডর মল্লের বন্দোবস্ত নামে ১৫৮২ খৃস্টাব্দে প্রবর্তিত হয়। আবল ফজল বলেন, সুবা বাংলায় ২৪টি সরকার ও ৭৮৭টি মহাল আছে। এই সুবার রাজস্বের পরিমাণ ৫৯,৮৪,৫৯,৩১৯ দাম (বা ১,৪৯,৬২,০০ টাকা)।[৪]

উপরোক্ত হিসাবের মধ্যে উড়িষ্যাও অন্তর্ভুক্ত, কারণ ঐ সময়ে উড়িষ্যাও সুবা বাংলার অঙ্গীভূত ছিল। উড়িষ্যায় ছিল ৫টি সরকার এবং ৯৯টি মহাল এবং এর রাজস্ব ছিল ১২,৫৭,৩২,৬৩৮ দাম। অতএব উড়িষ্যা বাদ দিলে বাংলায় ছিল ১৯টি সরকার এবং ৬৮৮টি মহাল এবং রাজস্ব ছিল ১,১৮,১৮,১৬৭ টাকা। ১৫৮২ সালে টোডর মল্লের বন্দোবস্তের সময় সারা বাংলায় মুগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি, শুধু পশ্চিম অঞ্চলের কিছু অংশে মুগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ টোডর মল্লের বন্দোবস্ত নামে কথিত এবং *আইন-ই-আকবরীতে* বিধৃত রাজস্বব্যবস্থা সারা সুবা বাংলার জন্যই প্রণীত হয়। তাই আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, টোডর মল্লের বন্দোবস্ত একটি সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত সম্পাদিত দলিল। এটা আসলে প্রাক-মুগল যুগের দলিলপত্র অবলম্বনে রচিত এবং এতে

২. *জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ১৯০৬, ২৩৩-২৫৬।

৩. 'দাম' এক ধরনের তাম্রমুদ্রা, ৪০ টির মূল্য এক টাকা হতো।

৪. *আইন, ২য়*, ১৪১।

প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত হয় না।[৫] *আইন-ই-আকবরীর* রাজস্বসারণি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, রাজস্ব ছিল দুই প্রকার—মাল এবং সায়ের।[৬] মাল অর্থ ভূমিরাজস্ব, কিন্তু সায়ের ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতো। সায়ের দ্বারা ভূমিরাজস্ব ছাড়া অন্য সব রকম করকে বোঝায়। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দোকানপাট বা কেনা-বেচার উপর আরোপিত কর, নদী, খাল, বিল, পুকুরের উপর বা মৎস্যসম্পদের উপর আরোপিত কর, লবণ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ এবং হাতির উপর নির্ধারিত কর। *আইন-ই-আকবরীতে* কোন কোন মহালে জাকাতেরও উল্লেখ আছে। আরো গভীরভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, লবণকর শুধু সরকার ফতেহাবাদ এবং সরকার চট্টগ্রামেই আরোপিত, কিন্তু এই সরকারদ্বয়ের কোনটিই টোডর মল্লের বন্দোবস্তের সময় মুগল অধিকারে ছিল না। অন্যান্য

৫. উদাহরণস্বরূপ দেখুন, W. H Moreland, *Agrarian system of Modern India*, (Allahabad 1929), 196.

৬. ব্লখম্যান সম্পাদিত ও জেরেট কর্তৃক অনূদিত এবং যদুনাথ সরকারের সংশোধিত গ্রন্থে এই শব্দের উল্লেখ নেই। ইরফান হাবিব বলেন : "...ব্লখম্যানকৃত 'আইন'-এর প্রামাণ্য সংস্করণের একটি ভুল কারও নজরে পড়ে নি। এই ভুলের দরুন পরিসংখ্যানগত তথ্যের মারাত্মক ভুল উপস্থাপিত হয়েছে। সবচেয়ে ভাল পাণ্ডুলিপিগুলিতে 'বারোটি প্রদেশের বিবরণ'-এ প্রদত্ত পরিসংখ্যান মূলে সারণির আকারে দেওয়া ছিল। ব্লখম্যানের সংস্করণে, সম্ভবত ছাপার সুবিধার জন্য, সেটি হুবহু সেইভাবে দেয়া হয় নি। ব্লখম্যান শুধু মূল সারণির স্তম্ভগুলিকেই বাদ দেন নি, বিনা ব্যাখ্যায় স্তম্ভশীর্ষকও বাদ দিয়েছেন। তাই তাঁর পাঠকদের জানার কোন উপায় নেই যে প্রতি পরগনার পাশে যেসব 'কওম' (গোষ্ঠী, জাত)-এর নাম দেয়া আছে সেগুলি আসলে জমিদার (পাণ্ডুলিপিতে কখনও কখনও 'বুমী') শীর্ষক একটি স্তম্ভের। কার্যত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, বেরার ও খান্দেশ—এই পাঁচটি প্রান্তিক ছাড়া, সরাসরি প্রশাসনভুক্ত অঞ্চলের প্রত্যেক পরগনা সম্বন্ধেই এই স্তম্ভের নিচে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। শুধু এই পাঁচটি প্রদেশ এবং অন্যান্য প্রদেশের করদপ্রধানশাসিত অঞ্চলে 'পরগনার' পাশে কিছু লেখা নেই। সাধারণত, গোটা 'সরকার'-এর ক্ষেত্রেই জমিদারদের বিভিন্ন 'কওম' নির্দিষ্ট করা আছে।" (ইরফান হাবিব, *মুগল ভারতের কৃষিব্যবস্থা*, কলকাতা ১৯৮৫, ১৪৮)। টীকায় ইরফান হাবিব আরো বলেন : "মূল সারণিগুলিতে আটটি স্তম্ভ আছে, শীর্ষকগুলি এই : 'পরগনাত' (পরগনা), 'কিলা' (দুর্গ) 'নগদী' (নগদ টাকায় নির্দিষ্ট রাজস্ব), 'সুয়ুরগাল' (রাজস্ব ও নগদ অনুদান), 'জমিদার' (বুমী), 'সওয়ার' (ঘোড়সওয়ার বাহিনী) এবং 'পিয়াদা' (পদাতিক) ব্লখম্যানের সংস্করণে 'সুয়ুরগাল', 'সওয়ার' এবং 'পিয়াদা' ছাড়া বাকি সবই বাদ গেছে। সংক্ষেপে এগুলির শুধুমাত্র আদ্যক্ষর এবং প্রতি পরগনার নামের পাশে সেই পরগনার অঙ্কগুলি দেয়া আছে। মূল সারণিগুলির ক্ষেত্রে ব্লখম্যানের হাতে যে বিভ্রান্তির সূচনা, জ্যারেটের অনুবাদে তা আরো বেড়েছে (২য় খণ্ড, সম্পা. যদুনাথ সরকার, ১২৯)। তিনি আরও খামখেয়ালিভাবে স্তম্ভ ও শীর্ষকগুলির পুনর্বিন্যাস করেছেন। 'জমিদার' শীর্ষকটির জায়গায় তিনি বসিয়েছেন 'কাস্টস' (বর্ণ) এবং মূল সারণির স্তম্ভের ষষ্ঠ স্থান থেকে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন একেবারে শেষে; আর ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক স্তম্ভ দু;টির অঙ্কগুলিকে বসিয়েছেন 'রাজস্ব' স্তম্ভের ঠিক পরে।" ঐ, টীকা নং ৪।

উপকূলীয় সরকারে, যেমন খলিফতাবাদ এবং বাকলায়ও নিশ্চয়ই লবণ উৎপন্ন হতো, কিন্তু এই সরকারগুলির রাজস্ববিবরণে লবণের উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে জাকাতের উল্লেখ আছে শুধু সরকার তাজপুর, ঘোড়াঘাট এবং সোনারগাঁয়ে। কিন্তু মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে মুসলিম সমাজ সারা বাংলায় বিস্তৃতি লাভ করে এবং জাকাতও সকল সরকারে নির্ধারিত হওয়ার কথা। ব্যবসা-বাণিজ্য, বাজার, দোকানপাট, নদী, খাল-বিলের কর অর্থাৎ সায়ের সকল সরকারে উল্লেখিত নেই। এতেও মনে করা যায় যে, টোডর মল্লের বন্দোবস্তে বেশ ফাঁক রয়েছে এবং আগেই বলা হয়েছে যে, এই বন্দোবস্ত বাস্তব অবস্থার নিরিখে নির্ণীত হয় নি, বরং প্রাপ্ত পুরাতন দলিলপত্রের ভিত্তিতেই সম্পাদিত হয়।

কিন্তু টোডর মল্লের বন্দোবস্ত পরবর্তীকালে রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তাদের এবং সম্রাটদের কাছে দিশারীরূপে গণ্য হয়, কারণ রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে এটিই ছিল একমাত্র দলিল। সারা বাংলা বিজিত হওয়ার পরেও এই বন্দোবস্ত পরবর্তী পদক্ষেপের ভিত্তিরূপে কাজ করে। রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে আধুনিককালে আলোচনার জন্যও টোডর মল্লের বন্দোবস্ত মূল ভিত্তিরূপে গণ্য হয়। *আইন-ই-আকবরীতে* বন্দোবস্তের যে রূপরেখা পাওয়া যায়, তাতে বন্দোবস্তের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না।

প্রশ্ন উঠে, বন্দোবস্ত কি জমিদারদের সঙ্গে করা হয়, নাকি রায়তদের সঙ্গে করা হয়? *আইন-ই-আকবরীতে* প্রাপ্ত মহালগুলি এভাবে বিভক্ত ছিল—(ক) কতকগুলি মহাল শুধু স্থানের নাম বোঝায়, (খ) কতকগুলি মহাল ব্যক্তির নামে তালুক হিসেবে চিহ্নিত, (গ) কতকগুলি মহাল সায়ের নামে উল্লেখিত, (ঘ) কতকগুলি মহাল রায়তি নামে চিহ্নিত এবং (ঙ) কতকগুলি আবার জাকাতমহাল। কিন্তু *আইন-ই-আকবরীর* সরকার ইউনিটের সারণির শিরোনামে জমিদার (ভূমি বা ভৌমিক বা ভূঁইঞা) এবং তাঁদের গোত্রের নাম লিখিত আছে এবং আবুল ফজল বলেন যে, বাংলার জমিদারদের অধিকাংশই কায়স্থ গোত্রভুক্ত।[৭] সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, যেসব মহালে তালুকদারি বা রায়তি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত নেই, সেসব মহালে সায়ের ও জাকাত মহালগুলি বাদ দিয়ে বাকি মহালগুলি জমিদারদের সঙ্গেই বন্দোবস্ত হয়। *আইন-ই-আকবরীর* জমিদাররা ছিলেন অনেকেই সামন্ত প্রভু; এই সামন্তরা প্রাক-মুসলিম এবং প্রাক-মুগল যুগ থেকে বংশপরম্পরায় জমিদারিস্বত্ব ভোগ করেছেন। তালুকদারেরাও ভূমির মালিকানা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবে তারা সামন্ত নৃপতি ছিলেন না। জমিদারি ও তালুকদারি মালিকানাস্বত্বের পার্থক্য পরে আলোচনা করা হবে। *আইন-ই-আকবরীতে* সরকার সোনারগাঁ এবং সরকার সিলেটে মাত্র তিনটি রায়তি মহাল দেখানো হয়েছে। এই রায়তি মহালগুলি অবশ্যই রায়তদেরকে প্রত্যক্ষভাবে বন্দোবস্ত দেয়া হয়। টোডর মল্লের বন্দোবস্তে সোনারগাঁ এবং সিলেটে রায়তি

৭. *আইন, ২য়,* ১৪১

মহালের অবস্থিতি এও প্রমাণ করে যে, এই বন্দোবস্ত পুরাতন দলিলের সাহায্যে তৈরি হয়। কেননা এ দু'টি সরকার ১৫৮২ সালে মুগল অধিকারে আসে নি। সুতরাং *আইন-ই-আকবরীতে* প্রাপ্ত মহালগুলি, জমিদারি, তালুকদারি বা রায়তি যাই হোক না কেন, প্রাক-মুগল সরকারের অধীনে বর্তমান ছিল—এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

টোডর মল্লের বন্দোবস্তে প্রদত্ত রাজস্বের অঙ্ক কি রাজস্বের মূল্যমান (valuation) বোঝায়, না রাজস্বের দাবি (demand) বোঝায় এই প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠতে পারে। এই প্রশ্নে আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যেও মতভেদ দেখা যায়। জেমস গ্রান্ট এই বন্দোবস্তাধীন রাজস্বের অঙ্ককে রাজস্বদাবি মনে করেন এবং সুবা বাংলার মুগল রাজস্বের আনুপূর্বিক ধারা নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করেন :

১. ১৫৮২ সালে টোডর মল্ল কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্বদাবি বিস্তারিতভাবে নির্ধারণ করেন এবং তাঁর দেয়া রাজস্বের অঙ্ক (revenue figures) গড়পড়তা উৎপন্নশস্যের এক-চতুর্থাংশ নির্ধারিত হয়। টোডর মল্ল রাজস্বদাবির মান নির্ধারণ করেন এবং সেই হিসাবে জমিদারেরা কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করেন। জমিদারেরা ছিলেন বার্ষিক হিসাবে মধ্যস্বত্বভোগী (annual contracting farmers), তাঁরা রাজস্ব আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট হারে কমিশন বা ভাতা পেতেন, তাঁদের এই কমিশন বা ভাতা কোন সময়েই রাজস্বদাবির এক-দশমাংশের বেশি হতো না।

২. ১৬৫৮ সালে শাহ শুজা টোডর মল্লের রাজস্বদাবি পুনর্নির্ধারণ করেন। কিন্তু এই পুনর্নির্ধারণে টোডর মল্লের মূল ভিত্তি পরিবর্তন করা হয় নি, কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয় যার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, ইতিমধ্যে বিজিত কিছু এলাকার রাজস্বদাবি সংযোজন করা হয়, অথবা অন্য সুবার কিছু অংশ সুবা বাংলায় স্থানান্তর করা হয়।

৩. ১৭২২ সালে মুর্শিদকুলী খান রাজস্বদাবি পুনর্নির্ধারণ করেন।

৪. মুর্শিদকুলী খানেব উত্তবসূরিগণ জমিদারদের উপর অতিরিক্ত কর আবওয়াব বা সেসের আকারে আরোপ করেন, কিন্তু মূল রাজস্বদাবি অপরিবর্তিত থাকে।[৮]

সুতরাং জেমস গ্রান্ট টোডর মল্লের বন্দোবস্ত বা *আইন-ই-আকবরীতে* প্রাপ্ত রাজস্ব-অঙ্ককে রাজস্বদাবিরূপে গণ্য করেন। কিন্তু আমরা উপরে বলেছি যে, টোডর মল্লের বন্দোবস্ত প্রাক-মুগল যুগের দলিল-দস্তাবেজের ভিত্তিতে রচিত একটি সংক্ষিপ্ত রাজস্বব্যবস্থা। সুতরাং তা রাজস্বদাবি না হয়ে রাজস্বমান হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মোরল্যান্ডও মনে করেন যে, টোডর মল্লের বন্দোবস্তে রাজস্বের অঙ্কগুলি আসলে রাজস্বমান (valuation), রাজস্বদাবি (demand) নয়। তিনি বলেন[৯] :

> আমার মতে গ্রান্টপ্রদত্ত প্রথমদিকের রাজস্ব-অঙ্কগুলির সম্ভাব্য পাঠ হবে রাজস্বমান; তিনি যে দলিলগুলি ব্যবহার করেন সেগুলিতে রাজস্বমান দেয়া ছিল, রাজস্বদাবি নয়।...বাংলা ও অন্যান্য

---

৮. মোরল্যান্ডের সারসংক্ষেপ মত, দেখুন, Moreland, *Agrarian System*, 195.

৯. ঐ, ১৯৬-৯৭।

প্রদেশের জন্য *আইন-ই-আকবরীতে* প্রদত্ত পরিসংখ্যানগুলি রাজস্বমান, রাজস্বদাবি নয়। দলিলগুলি প্রণয়নের সময় টোডর মল্ল রাজস্বমানই পান, রাজস্বদাবি পান নি। বাংলা তখন মাত্র বিজিত হচ্ছে, এই সময়ে টোডর মল্ল রাজস্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পান। সুতরাং এই সময়ে টোডর মল্ল বা তাঁর অধস্তন কর্মকর্তারা যা কিছু পুরনো দলিলপত্র পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে রাজস্বের পরিসংখ্যান বা অঙ্ক লিপিবদ্ধ করেন। এই দলিলগুলি খুব সম্ভব প্রাক-মুগল সরকারের ছিল। এমন সম্ভাবনা এই কারণে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় যে, যেসকল এলাকা আকবর কর্তৃক অধিকৃত হয় নি সেসকল এলাকা, বিশেষকরে পূর্ববঙ্গের এলাকাসমূহে টোডর মল্লের পক্ষে রাজস্ব নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না। উদাহরণস্বরূপ চট্টগ্রামের কথা উল্লেখ করা যায়। চট্টগ্রামের রাজস্ব নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং বিজিত হবে এই আশায় প্রাক-মুগল যুগের সরকারের নথিপত্রের সাহায্যে এই রাজস্বমান নির্ধারণ করা হয়। গ্রান্ট যেভাবে মনে করেন যে টোডর মল্ল বিস্তারিতভাবে রাজস্বনির্ধারণ করেছিলেন, সেইরূপ করা টোডর মল্লের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর ছিল না।[১০]

মির্জা নাথন রচিত *বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে* জাহাঙ্গীরের আমলের মুগল নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ ইহতিমাম খানের জাগির সম্পর্কে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। এই তথ্যে রাজস্ব সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া না গেলেও এতে বোধ হয় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, টোডর মল্লের বন্দোবস্তে রাজস্বসূচক সংখ্যাগুলি রাজস্বদাবি নয়, বরং রাজস্বমান। ইহতিমাম খান নৌবাহিনী পরিচালনার জন্য তাঁর নাবিকদের বেতনের পরিবর্তে জাগির লাভ করেন। এই জাগির হলো পরগনা জাহানাবাদ, তনবুলক (তমলুক) ও উড়িষ্যা এবং বর্ধমান ও মেদিনীপুরের নিকটবর্তী আরো কয়েকটি পরগনা। এ ছাড়া সোনা বাজু, ভাতুরিয়া বাজু ও কলাবরী পরগনা এবং ভাটী ও ঘোড়াঘাটের আরো কয়েকটি স্থান তিনি জাগির হিসেবে পান। তাঁর জাগিরে মোট মহালের সংখ্যা ছিল ২২টি।[১১] এই মহালগুলির মধ্যে কয়েকটিতে মুগল কর্তৃত্ব ছিল তখনও খুব ক্ষীণ। ভাটীতে মুগল কর্তৃত্ব তখনও

১০. টোডর মল্লের দলিলগুলি প্রাক্-মুগল সরকারের। তিনি এইগুলি দাউদ কররানীর মন্ত্রী শ্রীহরি (বিক্রমাদিত্য) এবং তাঁর ভাই বসন্ত রায় ও শিবানন্দের কাছ থেকে লাভ করেন। বসন্ত রায় ছিলেন দাউদ কররানীর খালিসা বিভাগের কর্তা এবং শিবানন্দ ছিলেন কানুনগো বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। রাম রাম বসুর *প্রতাপাদিত্য চরিত*-এ এই বিষয়ে সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। বসুর বইখানি যোগাড় করতে অসমর্থ হওয়ায় আমরা এখানে নলিনীকান্ত ভট্টশালীর ইংরেজি অনুবাদের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

From *Pratapaditya Charita* it would appear that when Daud entrenched himself at Rajmahal, Srihari and his brother concealed themselves as *Sanyasis* and remained in hiding somewhere in North Bengal. Todar Mal and Khan Jahan (called Omrao Sing by Basu) in the meantime encamped at Rajmahal. Thence they advanced on Gaur which was plundered but failed to yield a rich booty. Then they proclaimed that anyone giving any important state information would be rewarded and would be re-instated in the post he used to hold in the government of Daud. Srihari and his brother thereupon went to Rajmahal and sent a secret agent to Todar Mal and Khan Jahan and met them on assurance of safety The brothers surrenderd all state papers and necessary information on condition that their rights and possessions in the Kingdom of Jessore between the Brahmaputra on the east and the Bhagirathi on the west would not be disturbed. "Bengal Chief's Struggle for Independence" in *Bengal : Past and Present*, XXVI: part I (1928), 16.

১১. Mirza Nathan, *Baharistan-i-Ghaybi* (hereafter referred to as *Baharistan)*, Government of Assam, 1936, Vol. I, 12-13.

স্থাপিত হয় নি। ইহতিমাম খানের লোকজন (পরগনার রাজস্ব আদায়কারী কর্মকর্তাবৃন্দ) বিস্তর যুদ্ধের পর সোনা বাজু পরগনার কর্তৃত্ব লাভ করেন। এই ঘটনা *বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে* লিপিবদ্ধ আছে।[১২] সুতরাং ইহতিমাম খানকে জাগির প্রদানের সময় এই মহালগুলি জরিপ করা সম্ভব হয় নি এবং এর রাজস্বদাবিও নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না। অতএব বলা যেতে পারে যে, এই মহালগুলি টোডর মল্লের বন্দোবস্তের ভিত্তিতেই ইহতিমাম খানকে জাগির হিসেবে দেয়া হয়। মির্জা নাথন আরো বলেন :

> এক রাত্রে ইহতিমাম খানের নৌবহরের নাবিকেরা পালিয়ে যায়,কারণ তারা অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে দিন যাপন করছিল। কেননা দীউয়ান ইতিকাদ খান তাদের পাওনা পরিশোধ করে নি এবং সুবাদার ইসলাম খানও দীউয়ানকে নাবিকদের পাওনা পরিশোধ করতে নির্দেশ দেন নি। সকালে দেখা যায় যে, যুদ্ধ ও পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত মোট ৩০০ নৌকার জন্য মাত্র ৭০০ নাবিক উপস্থিত ছিল।[১৩]

উপরোক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, যুদ্ধ ও পরিবহনের জন্য ইহতিমাম খানের মোট ৩০০টি নৌকা ছিল। কিন্তু বলা হয় যে, দীউয়ান নাবিকদের পাওনা পরিশোধ না করায় আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে নাবিকরা পালিয়ে যায়। এই উক্তিটির তাৎপর্য অনুধাবন করা সহজ নয়। ইহতিমাম খানকে তাঁর নৌবহর পরিচালনার জন্য ২২টি মহাল জাগির দেয়া হয়। *বাহরিস্তানে* বলা হয়েছে, এই জাগির তাঁর লোকদের (অর্থাৎ নাবিকদের) বেতনের পরিবর্তে দেয়া হয়। তাহলে প্রশ্ন উঠে, দীউয়ান কেন তাদের পাওনা পরিশোধ করবেন ? পাওনা পরিশোধ করার দায়িত্ব ইহতিমাম খানেরই। এই একই বিষয়ে আলোচনার জের টেনে মির্জা নাথন বলেন যে, ইহতিমাম খান দীউয়ান এবং সুবাদারের কাছে তাঁর নাবিকদের জন্য রসদ দাবি করেন। রসদ দাবি করার বিষয়টিও বোধগম্য নয়। আগেই বলা হয়েছে যে, নৌবাহিনী পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ইহতিমাম খানের নিজের। যাই হোক, রসদ দাবি করায় সুবাদার ইসলাম খান ইহতিমাম খানের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তিনি বাজ বাহাদুর কলমককে ইউসুফ শাহী ওরফে শাহজাদপুর পরগনা জাগির দান করেন এবং বিনিময়ে বাজ বাহাদুর ৫০টি নৌকা পরিচালনার জন্য স্বীকৃত হন। অতঃপর সুবাদার ইসলাম খান ইহতিমাম খানকে বলেন :

> ইহতিমাম খান,আপনি সম্রাটের দরবার থেকে এসেছেন। আপনার দায়িত্ব নৌবাহিনী ও গোলন্দাজ বাহিনী সঠিকভাবে পরিচালনা করা। সুতরাং সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের খাতিরে প্রাক্তন অসাধু কর্মকর্তারা যেখানে প্রতি নৌকা ৪০০ টাকায় পরিচালনা করতো, সেখানে আপনার উচিত ৩৫০ টাকায় প্রতি নৌকা পরিচালনা করা। কিন্তু বাজ বাহাদুর যেখানে প্রতি নৌকা ৪০০ টাকায় পরিচালনা করতে রাজি, সেখানে আপনি প্রতি নৌকার জন্য ১২০০ টাকা দাবি করছেন। এটা কি অযৌক্তিক নয় ?[১৪]

---

১২. ঐ, 16-17
১৩. ঐ, 29-30
১৪. ঐ, 34

সুতরাং ইহতিমাম খান প্রতি নৌকা ৪০০ টাকায় পরিচালনা করতে বাধ্য হন। মির্জা নাথন আরো বলেন :

> ৩০০ নৌকার জন্য ইহতিমাম খানের যেখানে (৪০০ টাকা হিসাবে) ১,২০,০০০ টাকা প্রয়োজন, সেখানে তাঁর ছিল (তাঁর জাগিরের আয় ছিল) ৮০,০০০ টাকা। সুতরাং বাকি ৪০,০০০ টাকা আয় বৃদ্ধির জন্য ইহতিমাম খান কাহাল ও আরো ৯টি মহাল জাগির লাভ করেন।[১৫]

মির্জা নাথনের উপরোক্ত বক্তব্যসমূহে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমত, মির্জা নাথন বলেছেন যে, দীউয়ান নাবিকদের পাওনা পরিশোধ না করায় নাবিকরা পালিয়ে যায় এবং ইহতিমাম খান নাবিকদের রসদ দাবি করেন। নাথনের বক্তব্যে বোঝা যায় যে, ইহতিমাম খানকে ইতিপূর্বে যে পরিমাণ জাগির দেয়া হয় সেই জাগির হতে প্রাপ্ত অর্থে তিনি নৌবাহিনী পরিচালনা করতে অসমর্থ হন। এর কারণ পরবর্তী বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইহতিমাম খান প্রতিটি নৌকার জন্য ১২০০ টাকা দাবি করেন, কিন্তু সুবাদার বা দীউয়ান এই দাবি অযৌক্তিক মনে করেন এবং প্রতি নৌকার জন্য আরো অনেক কম দিতে চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী কর্মকর্তারা ৪০০ টাকায় প্রতি নৌকা পরিচালনা করতেন। তৃতীয়ত, বাজ বাহাদুর ৪০০ টাকায় প্রতি নৌকা পরিচালনা করতে রাজি হন এবং ৫০টি নৌকার জন্য ইউসুফ শাহী পরগনা জাগির লাভ করেন। অবশেষে ইহতিমাম খানকে প্রতি নৌকা ৪০০ টাকা হিসাে, ৩০০টি নৌকার জন্য আরো ১০টি মহাল জাগির দেয়া হয় অর্থাৎ আগের ২২টি সহ তিনি মোট ৩২টি মহাল লাভ করেন। ইহতিমাম খানকে প্রদত্ত সকল মহালের নাম পাওয়া যায় না। তাই এই মহালগুলির রাজস্বের পরিমাণ টোডর মল্লের বন্দোবস্তের সঙ্গে তুলনা করে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। তবে এটা সত্য যে, এই ৩২টি মহালের রাজস্ব সর্বমোট এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার বেশি ছিল না। বাজ বাহাদুর প্রতিটি নৌকা ৪০০ টাকা করে ৫০টি নৌকা পরিচালনার জন্য ইউসুফ শাহী পরগনা লাভ করেন। প্রতিটি নৌকা ৪০০ টাকা করে ৫০টি নৌকার ব্যয় আসে ২০,০০০ টাকা। কিন্তু টোডর মল্লের বন্দোবস্তে ইউসুফ শাহী পরগনার রাজস্ব দেখানো হয়েছে ১৬,৭০,৯০০ দাম বা প্রায় ৪১,৭৭৭ টাকা। সুতরাং ইউসুফ শাহী পরগনার রাজস্বদাবি হবে ২০,০০০ টাকা এবং টোডর মল্লের বন্দোবস্তের ৪১,৭৭৭-৮-০ টাকা হবে রাজস্বমান। এটা আর একটি প্রমাণ যে, টোডর মল্লের বন্দোবস্ত রাজস্বমান (valuation), রাজস্বদাবি (demand) নয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, অন্য কোন তথ্য বা সমসাময়িক দলিলের অভাবে টোডর মল্লের বন্দোবস্তই পরবর্তী রাজস্বকর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিরূপে পরিগণিত হয়। জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলা বিজিত হওয়ার এবং মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে রাজস্ব

---

১৫. ঐ, 35.

বিভাগীয় কর্মকর্তারা স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে টোডর মল্লের বন্দোবস্ত এবং এই বন্দোবস্তের রাজস্বমানের সমন্বয় সাধন করে। পরগনা ইউসুফ শাহীর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এর রাজস্বদাবি এইরূপ সমন্বয় সাধনের একটি উদাহরণ। এই পরগনার রাজস্বদাবি টোডর মল্লের বন্দোবস্তে রাজস্বমানের প্রায় অর্ধেকেরও কম। যদিও জাহাঙ্গীরের সময়ে সুবা বাংলায় মুগল রাজস্বব্যবস্থা প্রকৃত প্রস্তাবে পুরোপুরি কার্যকর হয়, তথাপি এই সময়ের রাজস্ব নির্ধারণ (রাজস্বমান বা রাজস্বদাবি যাই হোক) সম্পর্কে কিছু জানা যায় না, কারণ এই সময়ের কোন দলিল এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নি। জাহাঙ্গীরের কর্মকর্তারা টোডর মল্লের বন্দোবস্তের কতোটুকু উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছিল তাও জানার উপায় নেই। যতোটুকু জানা যায় তা এই যে, এই সময়ে ভূমি খালসা এবং জাগির এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অর্থাৎ খালসা ভূমি সরকারের রাজস্বকর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছিল, সরকার প্রত্যক্ষভাবেই খালসা ভূমির রাজস্ব আদায় করতো। অপরদিকে, জাগির ভূমি পদস্থ কর্মকর্তাদের বেতনের বিনিময়ে বা যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠানের (যেমন নৌ-বাহিনী) ব্যয় বহনের জন্য কর্মকর্তাদের কাছে বরাদ্দ করা হতো। এই প্রদেশ বিজিত হওয়ার সময় যেসকল ভূঁইঞা, জমিদার বা সামন্ত মুগল বশ্যতা স্বীকার করে, তাদের ভূমিরাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা বহাল রাখা হয়। এইরূপ জমিদারদের ভূমি জরিপ না করে তাদের নিকট থেকে পেশকাশ (নজর) বা থোক রাজস্ব গ্রহণ করা হতো। কোন কোন সামন্ত কর্তৃক ভূমিরাজস্বের পরিবর্তে স্বীয় সৈন্যবাহিনী বা নাবিক এবং নৌকাসহ মুগলদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। খালিসা ও জাগির ভূমিতে হয়তো কোন কোন স্থানে জমির মাপের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারিত হতো। কিন্তু জমির মাপ নেয়া সম্ভব না হলে উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ নির্ধারণের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ করা হতো। কিন্তু জমিদারদের অধীনস্থ ভূমি জরিপ করা হতো বলে মনে হয় না। কারণ যেভাবে জমিদারদের সামরিক কাজে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা ছিল, তাতে জমি মাপের প্রশ্ন উঠে না। মির্জা নাথনের *বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে* সামন্তদের মুগল বাহিনীর সঙ্গে সামরিক কাজে নিযুক্তির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূমিরাজস্ব ছাড়াও কতগুলি অতিরিক্ত কর আরোপিত হতো। এই করগুলিকে সাধারণভাবে সায়ের বলা হতো। এই করগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য, বাজার, দোকানপাট ইত্যাদির উপর ধার্য হতো।[১৬] তাছাড়াও ছিল জাকাত। ইসলামী শরীয়তের বিধানমতে জাকাত আদায় করা হতো। যদিও টোডর মল্লের বন্দোবস্তের কয়েকটি মহালে জাকাতের উল্লেখ পাওয়া যায়, পরবর্তীকালের দলিলসমূহে জাকাত সম্পর্কে তথ্য বিরল। অবশ্য জাকাত ভূমিরাজস্বের আওতায় পড়ে না।

---

১৬. T. K. Ray Chaudhuri, *Bengal under Akbar and Jahangir*, 24 ff.

জেমস গ্রান্ট ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে শাহ্ শুজার এক বন্দোবস্তের বিবরণ দিয়েছেন।[১৭] এই বন্দোবস্ত সম্পর্কে তিনি নিম্নরূপ পরিসংখ্যান দেন :

আকবরের সময়ের রাজস্ব হিসাব বা ১৫৮২ সালের টোডর মল্লের বন্দোবস্ত-এর উপরে প্রবৃদ্ধি	টা. ৬৩,৪৪,২৬০ টা. ৯,৮৭,১৬২
নতুন এলাকা বিজয় বা রাজস্বের নতুন উৎস	টা. ১৪,৩৫,৫৯৩
	টা. ৮৭,৬৭,০১৫
জাগির ভূমির রাজস্ব	টা. ৪৩,৪৮,৮৯২
মোট	টা. ১,৩১,১৫,৯০৭

উপরোক্ত পরিসংখ্যানে টোডর মল্লের বন্দোবস্তের উপরে ১৫.৫০% প্রবৃদ্ধি দেখা যায়। এই প্রবৃদ্ধি হয় অন্তবর্তীকালীন ৭৬ বছরে। প্রবৃদ্ধির কারণ নতুন এলাকা বিজয় এবং নতুন চাষাবাদ। টোডর মল্লের বন্দোবস্তের মতো শাহ্ শুজার বন্দোবস্তেও ভূমিকে খালিসা এবং জাগিররূপে বিভক্ত করা হয়েছে। সায়ের কর আলাদাভাবে দেখানো হয় নি, তা খালিসা বা জাগিরের পরিসংখ্যানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সরকার মন্দারণের পশ্চিমে তিনটি জঙ্গলাকীর্ণ এবং দুর্গম সামন্ত রাজ্য ছিল—বিষ্ণুপুর, পাচেট এবং চন্দ্রকোণা। এগুলি ঝাড়খণ্ডের অংশবিশেষ। দুর্গম হওয়ায় এগুলিকে জরিপ না করে এদের সামন্ত জমিদারদের উপর থোক রাজস্ব বা পেশকাশ নির্ধারিত হয়। জাহাঙ্গীরের অধীনে আরো অনেকগুলি সামন্ত জমিদার ছিলেন, যেমন ভূষণার রাজা স্বত্রাজিত এবং ঈশা খানের পুত্র-পৌত্ররা। সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে এঁদের জমিদারি বহাল রাখা হয়। শাহ শুজার বন্দোবস্তে এঁদের সম্বন্ধে পৃথক কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু এঁদের কয়েকজন যে শুজার বন্দোবস্তের সময়ে, এমনকি আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেও মুগল বাহিনীকে সামরিক সাহায্য প্রদান করতেন বা মুগলদের পক্ষ হয়ে অংশ নিতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয়ের সময়ে ঈশা খানের প্রপৌত্র মুনওর খান স্বীয় নৌবহরসহ মুগলদের পক্ষে আরাকানী নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মীর জুমলা এক জমিদার ও তাঁর শরিকদের জমা বা রাজস্ব বৃদ্ধি করেছিলেন। এই রাজস্ব নগদ টাকায় দেয়া হতো না, নৌকা সরবরাহ করে দেয়া হতো। তাদের ২০টি নৌকা সরবরাহ করার কথা ছিল। মীর জুমলা তা বাড়িয়ে ২৯টি করেন।[১৮] সুতরাং দেখা যায় যে, জাহাঙ্গীরের আমলের সামন্ত

১৭. James Grant, *Analysis of the Finances of Bengal in Fifth Report,* ed. by W. K Firminger, Appendix 4, (hereafter referred to as *Fifth-Report),* 182-186.

১৮. J. N. Sarkar (ed.), *History of Bengal* , Vol. II, (Dacca 1948), (hereafter referred to as *HB II*), 38; ইরফান হাবিব, *মুগল ভারতের কৃষিব্যবস্থা ১৫৫৬-১৭০৭,* ১৮৮ এবং টীকা ৩৮।

জমিদারদের সকলের অস্তিত্ব শুজা বা আওরঙ্গজেবের সময়ে না থাকলেও সতেরো শতকের শেষ অবধি কোন কোন সামন্ত জমিদারের অস্তিত্ব ছিল। শাহ সুজার পরে সতেরো শতকে আর কোন বন্দোবস্তের তথ্য পাওয়া যায় না।

১৭২২ খৃস্টাব্দে একটি নতুন বন্দোবস্ত হয়। তা মুর্শিদকুলী খানের (বা জাফর খানের) বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই বন্দোবস্ত সম্পর্কেও বিস্তারিত কিছু জানা যায় না, যদিও সলিমুল্লাহর *তওয়ারীখ-ই-বঙ্গালা,* গোলাম হোসেন সলিমের *রিয়াজ-উস-সালাতীন* এবং জেমস গ্রান্টের *Analysis of the Finances of Bengal*-এ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সূত্রগুলির কোনটিই সমসাময়িক নয়। কিন্তু তবুও অধিকতর নির্ভরশীল তথ্যের অভাবে এই সূত্রগুলিকে আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা যায়। প্রথমোক্ত দু'টি সূত্রে ভূমি জরিপ এবং রাজস্ব সংগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা আছে। কিন্তু তাতে পরিসংখ্যান তেমন নেই। শুধু থোকভাবে দুই একটি অঙ্কের উল্লেখ আছে। জেমস গ্রান্ট রাজস্বের পরিসংখ্যান দিয়েছেন এবং বলেন যে, প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতেই এই পরিসংখ্যান তৈরি। কিন্তু গ্রান্ট যে দলিলের সাহায্যে পরিসংখ্যান তৈরির দাবি করেছেন, সেগুলির অস্তিত্ব এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই গ্রান্টের পরিসংখ্যানও পুনঃনিরীক্ষণের অবকাশ নেই।

মুর্শিদকুলী খানের রাজস্বব্যবস্থা সম্পর্কে সলিমুল্লাহর বক্তব্য নিম্নরূপ :

(ক) চাকলা মেদিনীপুরকে উড়িষ্যা থেকে কেটে নিয়ে সুবা বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। মুর্শিদকুলী খান জমিদারদের ডেকে নিয়ে বন্দী করে রাখেন। (বিশ্বস্ততা) পরীক্ষা করে এবং চুক্তিতে সই নিয়ে তিনি বিশ্বাসী এবং পারদর্শী বাঙালি আমিলদেরকে হাল এবং বকেয়া রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করেন। এভাবে নিযুক্ত আমিলদের প্রত্যেক মহাল এবং প্রত্যেক চাকলায় নিয়োগ করা হয় এবং রাজস্ব সংগ্রহ এবং আদানপ্রদানে জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়। উপরোক্ত আমিলরা প্রত্যেক পরগনায় শিকদার, আমিন এবং করণিক পাঠান এবং তাদের সাহায্যে কৃষি এবং পতিত জমি জরিপ সম্পাদন করেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক খণ্ড জমিতে এবং প্রত্যেক রায়তের জমিতে এইরূপ জরিপ করা হয় এবং এভাবে সমগ্র সুবা বাংলার জরিপ সম্পন্ন করা হয়। তাঁরা দরিদ্র কৃষকদের বীজের জন্য তকবি বা কৃষিঋণও দেন। অনেক চেষ্টার পরে চাষাবাদকৃত জমি এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেক মহালের রাজস্বও বৃদ্ধি পায়। বকেয়া এবং হাল রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করে রাজস্বআয়ের একটি খসড়া দলিল তৈরি করা হয়। জমিদারদের অতিরিক্ত ব্যয় (অর্থাৎ জমিদার কর্তৃক রাজস্ব সংগ্রহ করার অতিরিক্ত ব্যয়) কমাবার ফলে ব্যয়সঙ্কোচন হয় এবং জমিদারদের জন্য জীবিকাভাতা বা নানকরের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যয়সঙ্কোচনের ফলে ভূমিরাজস্ব এবং সায়ের করের প্রবৃদ্ধি সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্বের হিসাবে যোগ করা হয়।[১৯]

(খ) মুর্শিদকুলী খান নিজে দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করে বালাম বই-এ প্রত্যেক দিন সই করতেন। তিনি প্রত্যেক মাসে নির্ধারিত হারে রাজস্ব আদায় করতেন। সরকারি রাজস্বে

১৯. *তওয়ারীখ-ই-বঙ্গালা,* ইন্ডিয়া অফিস পাণ্ডুলিপি নং ২৯৯৫, (অতঃপর তঃবাঃ রূপে উল্লেখিত), ফলিও ৩১ এ।

ঘাটতি দেখা দিলে খেলাপি জমিদার, আমিল, কানুনগো এবং মুৎসুদ্দিদের দীউয়ানি দপ্তরে আটক থাকতে হতো। খেলাপিদের খাদ্য দেয়া হতো না, পানি পান করতে দেয়া হতো না এবং এমনকি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতেও দেয়া হতো না। তাদের এভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বন্দী করে রাখা হতো এবং কোন কোন সময় তাদের মাথা নীচের দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হতো, বেত্রাঘাত করা হতো। এইরূপ শাস্তি প্রদানের পরেও যারা সরকারি পাওনা পরিশোধ করতো না, তাদের স্ত্রীপুত্রসহ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হতো। মুর্শিদকুলী খান বাঙালি হিন্দু ছাড়া অন্য কাউকে ভূমি এবং সায়ের রাজস্বের দায়িত্বে নিযুক্ত করতেন না, কারণ তাদের কাছ থেকে পাওনা আদায় করা সহজতর ছিল।[২০]

(গ) চৈত্র মাসে রাজস্বআদায় শেষ হতো এবং বৈশাখ মাসের প্রথম তারিখে মুর্শিদকুলী খান পুণ্যাহ[২১] উৎসব পালন করতেন। তারপরে ১,০৩,০০,০০০ (এক কোটি তিন লক্ষ) টাকা সরকারি রাজস্ব দিল্লীতে সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দেয়া হতো। *আবওয়াব-ই-খাসনবিশীরূপে* কথিত সেস-এর টাকা ভিন্নভাবে পাঠানো হতো।[২২]

(ঘ) দর্পনারায়ণ কানুনগোর কর্মক্ষমতার প্রশংসা করে সলীমুল্লাহ বলেন যে, এই কানুনগো খালিসা রাজস্ব এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করেন।[২৩]

(ঙ) ত্রিপুরা, কোচবিহার এবং আসামের রাজাদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তাঁরা মুর্শিদকুলী খানের নিকট থোক কর (tribute) পাঠাতেন, অর্থাৎ তাঁদের অধিকৃত ভূমি জরিপ না করে তাঁরা চুক্তিমতো নির্দিষ্ট অঙ্কের কর দিতেন।[২৪]

(চ) বীরভূম এবং বিষ্ণুপুর সম্পর্কে সলীমুল্লাহ বলেন যে, এই দু'টি জমিদারিও জরিপ করা হয় নি। কারণ বীরভূমের জমিদার আসাদউল্লাহ ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ লোক এবং তিনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির জন্য দান করেন। বিষ্ণুপুর ছিল জঙ্গলাকীর্ণ এবং দুর্গম, তাই এই জমিদারিও জরিপ করা হয় নি।[২৫]

গোলাম হোসেন সলিম সলিমুল্লাহর ২৪ বছর পরে বই লিখে সলিমুল্লাহর উপরোক্ত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক বাংলা থেকে উড়িষ্যায় জাগির স্থানান্তর সম্পর্কে তিনি আরো বলেন :

খালিসা এবং সায়ের রাজস্ব সঠিকভাবে নির্ধারণ করে মুর্শিদকুলী খান সম্রাটের দরবারে এক কোটি টাকা পাঠিয়ে দিতেন এবং খালিসা জাগির ভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ রাজস্বতালিকা তৈরি করেন। আগের দিনে সুবা বাংলার প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুণ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা (মনসবদাররা) এই

২০. ঐ, ফলিও ৩৬-৩৭।
২১. সালতামামী উৎসব।
২২. তঃ বাঃ ফলিও ৩৮ এ। আবওয়াব-ই- খাসনবিশী অর্থ দীউয়ানি দপ্তরের কেরানিদের জন্য একটি বিশেষ কমিশন বা ভাতা। মুর্শিদকুলী খান এই সেস্ প্রবর্তন করেন, এর উদ্দেশ্য ছিল শুধু রাজস্ববৃদ্ধি।
২৩. ঐ, ফলিও ৪২ বি।
২৪. ঐ, ফলিও ৩৬ এ।
২৫. ঐ, ফলিও ৩১ বি।

প্রদেশে চাকুরি করতে অনীহা প্রকাশ করতেন। কারণ তাঁরা মনে করতেন যে, এই প্রদেশে যে মৃত্যু অনিবার্য শুধু তাই নয়, এখানে দৈত্য-দানবও বাস করে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের দীউয়ান মনসবদারদের এই প্রদেশে চাকুরি করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বাংলায় অনেক জাগির প্রদান করেন। এই নীতির ফলে সুবা বাংলায় খালিসা মহালের সংখ্যা কমে যায়। ফলে কম সংখ্যক খালিসা মহালের দ্বারা নগদী (নগদ বেতনে নিযুক্ত) এবং অন্যান্য নিয়মিত সৈন্যের বেতন দেয়া সম্ভব হতো না।[২৬] তাই অন্য প্রদেশের রাজস্ব দ্বারা এই অভাব পূরণ করা হতো। মুর্শিদকুলী খান সম্রাটের কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। এতে তিনি প্রস্তাব করেন যে, বাংলার মনসবদারদের উড়িষ্যায় জাগির দেয়া হোক। সম্রাট এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। অতঃপর মুর্শিদকুলী খান বাংলার জাগিরগুলি সায়ের সহ খালিসায় স্থানান্তর করেন এবং পরিবর্তে এই জাগিরগুলি উড়িষ্যায় দেয়া হয়। শুধু বাংলার নিজামত এবং দীউয়ানি জাগিরগুলি এই পরিকল্পনা থেকে বাদ দেয়া হয়। উড়িষ্যার ভূমি ছিল নিম্নমানের এবং অপেক্ষাকৃত কম উর্বর। এই নীতির ফলে মুর্শিদকুলী খান জমিদার এবং জাগিরদারদের আয় সঙ্কোচন করে সম্রাটের রাজস্বআয় অনেক বৃদ্ধি করেন।[২৭]

জেমস গ্রান্ট ১৭২২ সালের বন্দোবস্তের নিম্নরূপ পরিসংখ্যান দিয়েছেন[২৮] :

শাহ শুজার বন্দোবস্তে খালিসা রাজস্ব	টা. ৮৭,৬৭,০১৫
তার উপর প্রবৃদ্ধি	টা. ১১,৭২,২৭৯
	টা. ৯৯,৩৯,২৯৪
জাগির থেকে খালিসায় স্থানান্তর	টা. ১০,২১,৪১৫
	১,০৯,৬০,৭০৯
জাগির ভূমি	টা. ৩৩,২৭,৪৭৭
মোট	টা. ১,৪২,৮৮,১৮৬

জেমস গ্রান্টের বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, এই বন্দোবস্তে সুবা বাংলাকে ১৩টি চাকলায় এবং ১৬৬০টি পরগনায় বিভক্ত করা হয়। চাকলাগুলি হচ্ছে—(১) বন্দর বালেশ্বর, (২) হিজলী, (৩) মুর্শিদাবাদ, (৪) বর্ধমান, (৫) হুগলী বা সাতগাঁও, (৬) ভূষণা, (৭) যশোহর, (৮) আকবরনগর (রাজমহল), (৯) ঘোড়াঘাট, (১০) কুরিবারি, (১১) জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা), (১২) সিলেট এবং (১৩) ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম)।

জেমস গ্রান্ট ১৭২৮ সালে শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের আরো একটি বন্দোবস্তের কথা উল্লেখ করেন। তবে এটি ঠিক বন্দোবস্ত নয়, বরং ১৭২২ সালের বন্দোবস্তকে দীউয়ানি

২৬. গোলাম হোসেন সলিম, *রিয়াজ-উস-সালাতীন,* আবদুস সালামের ইংরেজি অনুবাদ, দিল্লী পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৫ (অতঃপর *রিয়াজ* রূপে উল্লেখিত), ২৪৮-৪৯।

২৭. নিয়মিত সৈন্যরা স্থায়ী এবং নগদী সৈন্যরা অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত হতো।

২৮. *Fifth Report*, Appendix 4, 189-91.

অফিসে শুদ্ধিকরণ বা সুসমকরণ। এতে খালিসা মহালগুলিকে ২৫টি বড় জমিদারি এবং অনেকগুলি ছোট ছোট জমিদারিতে ভাগ করা হয়েছে। বড় জমিদারিকে ইহতিমাম এবং ছোট জমিদারিকে মজকুরি বলা হয়েছে। বোঝা যায় যে, মুর্শিদকুলী খানের চাকলাওয়ারি রাজস্ব হিসাবকে সহজতর করার জন্য দীউয়ানি দপ্তরে একে জমিদারওয়ারি রাজস্বে পরিণত করা হয়েছে। শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের এই সুষমকরণ পর্যায়ে জাগির মহালগুলিকে নিম্নরূপে ভাগ করা হয়েছে :

১. জাগির-ই-সরকার-ই-আলি বা সুবাদারের (নাজিমের) জাগির।

২. জাগির-ই-বন্দা-ই-আলি দরগাহ বা দীউয়ানের জাগির।

৩. জাগির-ই-আমির-উল-উমারা বখশি বা বখশির জাগির।

৪. ফৌজদারদের জাগির।

৫. মনসবদারদের জাগির।

৬. মদদ-ই-মাআশ বা জীবিকাভাতা। (আলিম, শিক্ষক, পণ্ডিত ব্যক্তি প্রমুখকে এইরূপ ভাতা দেয়া হতো। ভূসম্পত্তি দান করলে তা লাখেরাজ সম্পত্তি রূপে দেয়া হতো।)

৭. সালিয়ানা দারান (ছোট জমিদারি ভাতা)।

৮. আল-তমঘা (ওয়াক্‌ফ্‌ সম্পত্তি)।

৯. রোজিনা দারান (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সম্পত্তি)।

১০. নওয়ারা বা নৌবহরের জন্য নির্দিষ্ট জাগির।

১১. আমলা-ই-আসাম বা পূর্ব সীমান্ত প্রতিরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট জাগির।

১২. জমিদারদের জাগির অর্থাৎ চারটি সীমান্তবর্তী জমিদারদের জন্য মঞ্জুর করা জাগির— যেমন ত্রিপুরা।

১৩. খেদা বা হাতি ধরার প্রতিষ্ঠানের জন্য জাগির।

এখন সলিমুল্লাহ, গোলাম হোসেন সলিম এবং জেমস গ্রান্টের তথ্যগুলিকে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা যাক। দেখা যায় যে, বিস্তারিত বিবরণে তাঁদের মধ্যে মিল না থাকলেও গরমিল খুব বেশি নেই। সলিমুল্লাহ এবং গোলাম হোসেন সলিম মোটামুটি পূর্ণ সংখ্যায় রাজস্বের হিসাব দিয়েছেন, কারণ রাজস্ব সংক্রান্ত কোন দলিল তাঁদের হস্তগত হয়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু গ্রান্ট রাজস্ব-অঙ্ক কোটি, লাখ, হাজার এবং শতক, এমনকি দশক ও একক হিসেবেও দিয়েছেন এবং বলেন যে, তাঁর প্রদত্ত রাজস্ব-অঙ্ক ফার্সি দলিলের ভিত্তিতে নির্ধারিত। সলিমুল্লাহ এক স্থানে বলেছেন যে, দর্পনারায়ণ কানুনগো খালিসা রাজস্ব বৃদ্ধি করে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় উন্নীত করেন। এটা অবশ্যই অত্যুক্তি বা লিপিকারের প্রমাদ, কারণ সলীমুল্লাহ নিজেই আবার বলেছেন যে, মুর্শিদকুলী খান প্রত্যেক বছর ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা দিল্লীতে সম্রাটের দরবারে পাঠাতেন। খালিসা রাজস্ব সম্পূর্ণটাই সম্রাটের প্রাপ্য এবং দিল্লীতে প্রেরিতব্য। প্রশাসনব্যয় সুবাদার,

দীউয়ান, বখশি ইত্যাদি কর্মকর্তাদের জাগিরের আয় দ্বারা মিটানো হতো। অতএব, বোঝা যায় যে, সলীমুল্লাহ দর্পনারায়ণ কানুনগো কর্তৃক রাজস্ব ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করার কথা বলে সম্পূর্ণ খালিসা এবং জাগির রাজস্বের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন, শুধু খালিসা রাজস্ব নয়। সুতরাং সলিমুল্লাহপ্রদত্ত হিসাবে সম্পূর্ণ রাজস্বের পরিমাণ জেমস গ্রান্টপ্রদত্ত হিসাবের সম্পূর্ণ রাজস্বের প্রায় কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। কারণ সলিমুল্লাহর মতে সম্পূর্ণ রাজস্ব ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং গ্রান্টের মতে তা প্রায় ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। যদুনাথ সরকার সলিমুল্লাহর এক পাণ্ডুলিপিতে লক্ষ্য করেন যে, মুর্শিদকুলী খান বাংলার রাজস্ব ১ কোটি ৩০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ১ কোটি ৫০ লক্ষে উন্নীত করেন।[২৯] এর অর্থ এই যে, সলিমুল্লাহ এবং জেমস গ্রান্টের রাজস্ব-অঙ্ক প্রায় মিলে যায়। গ্রান্টের মতে রাজস্ব ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪২,৮৮,১৮৫ টাকা হয়। গ্রান্টের প্রদত্ত খালিসা রাজস্বের অঙ্কও সলিমুল্লাহর খালিসা রাজস্বের অঙ্কের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। গ্রান্ট খালিসা রাজস্বের হিসাব দেন ১,০৯,৬০,৭০৯ টাকা এবং সলিমুল্লাহ বলেন যে, মুর্শিদকুলী খান বছরে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা খালিসা রাজস্ব সম্রাটের কাছে পাঠাতেন। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, সলিমুল্লাহ গ্রান্টের চেয়ে কোন প্রকারে অধিকতর নির্ভরযোগ্য নন। সলিমুল্লাহ লিখেন ১৭৬৩ সালে, তখন মুগল শাসন প্রায় অবলুপ্ত। তাছাড়া সলিমুল্লাহ কোন রাজস্বদলিল সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু গ্রান্ট তা হস্তগত করেছিলেন বলে দাবি করেন। *দস্তুর-উল-আমল* এবং *চাহার গুলশান* নামক পাণ্ডুলিপিতেও গ্রান্টের প্রায় অনুরূপ রাজস্ব-অঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ একটি *দস্তুর-উল-আমলে* রাজস্ব-অঙ্ক পাওয়া যায় ৫২,৪৬,৩৬,২৪০ দাম বা ১,৩১,১৫,৯০৬ টাকা।[৩০] এডওয়ার্ড টমাস তিনটি *দস্তুর-উল-আমল* পরীক্ষা করেছিলেন। দুইটিতে তিনি রাজস্ব-অঙ্ক পান ১,৩১,১৫,৯০৬ টাকা এবং তৃতীয়টিতে পান ১,৩১,১৫,৯০৩ টাকা।[৩১] ইউরোপীয় পরিব্রাজকদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে জন হ্যারিস আওরঙ্গজেবের সময়ের রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। এ রাজস্বের পরিমাণ ১,৩১,১৫,৯০৬ টাকা।[৩২] *চাহার গুলশান*-এ ১৭২০ খৃষ্টাব্দ বা সমকালীন সময়ের রাজস্বের অঙ্ক পাওয়া যায় ১,৪০,৭২,৭২৫ টাকা।[৩৩] এই সকল সূত্রেই দেখা যায় যে, রাজস্ব-অঙ্কে প্রায় মিল আছে। প্রথমোক্ত অঙ্কগুলি আওরঙ্গজেবের সময়ের বা শাহ্ শুজার বন্দোবস্তের ভিত্তিতে নির্ধারিত, কিন্তু *চাহার গুলশানের* অঙ্ক মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তের ভিত্তিতে নির্ধারিত বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। নিম্নের সারণি থেকে এ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে :

২৯. *HB* II, 412
৩০. ইন্ডিয়া অফিস পাণ্ডুলিপি নং ১৩৮৭, ফলিও ৭-এ।
৩১. Edward Thomas, *The Revenue Resources of the Mughal Empire in India*, 42-43.
৩২. John Harris, *Navigatinn atque Itinerantium Bibliotheca : Or A Complete Collection of Voyages and Travels*, Vol I, 651
৩৩. *Chahar Gulshan*, translated by Jadunath Sarkar in *India of Aurangzib*, XXXII, 133.

উৎস	আওরঙ্গজেবের সময়ের বা শাহ শুজার বন্দোবস্ত	মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্ত
(ক) জেমস গ্রান্ট	টা. ১,৩১,১৫, ৯০৭	টাঃ ১,৪২,৮৮, ১৮৫
(খ) *দস্তুর-উল-আমল* টমাসের 'এ' পাণ্ডুলিপি	টা. ১,৩১,১৫,৯০৬	-
(গ) *দস্তুর-উল আমল* টমাসের ' বি' পাণ্ডুলিপি	টা. ১,৩১,১৫,৯০৬	-
(ঘ) *দস্তুর-উল-আমল* টমাসের 'সি' পাণ্ডুলপি	টা. ১,৩১,১৫,৯০৩	-
(ঙ) *চাহার গুলশান* ১৭২০?	-	টা. ১.৪০,৭২,৭২৫
(চ) জন হ্যারিস	টা. ১,৩১,১৫,৯০৬	-

ইরফান হাবিব বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে বাংলার রাজস্বের একটি সারণি প্রকাশ করেছেন। সারণিটি নিচে দেয়া হলো[৩৪] :

উৎস	সন	রাজস্ব (টাকা)[৩৫]
আইন-ই-আকবরী[৩৬]	১৫৯৫-৯৬	১,০৫, ১৮, ১৪২ -৮-০[৩৭]
ম্যানরিক	১৬৩২	৯০,০০,০০০
বয়াজ-ই-খুশবুই	১৬২৮-৩৬	১,০০,৬৩,০০০
ফরহঙ্গ-ই-করদানী	১৬৩৩-৩৮	১,০৬,৭৯,৭৭৫
অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি নং ১৬,৮৬৩	১৬৪৬-৪৭	১,১১,৮৪,৭৫০
পাদশাহনামা, ২য়	"	১,২৫,০০,০০০
সাদিক খান	"	১, ২৫,০০,০০০
Or. 1840	১৬৩৮-৫৬	১,০৬,৭৯,৭৭৫
দস্তুর-উল-আমল-ই-ইলম-ই-নভিসন্দিগী		১,০৬,৭৯,৭৭৫(!)
Bodl. 0. 390	"	১,০৬,৭৯,৭৭৫
সুজন রায়	"	১,১৫,৭২,৫০০

৩৪. ইরফান হাবিব, *মুগল ভারতের কৃষিব্যবস্থা,* (কলকাতা ১৯৮৫), ৪২৯।
৩৫. ইরফান হাবিবের 'দাম'-এ দেয়া রাজস্ব টাকায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।
৩৬. উৎসের সম্পূর্ণ বিবরণ ইরফান হাবিবের বইতে দেয়া আছে, তাই পুনরুল্লেখ করা হলো না।
৩৭. এই সংখ্যায় উড়িষ্যার রাজস্বও সংযুক্ত

উৎস	সন	রাজস্ব (টাকা)
মানুচি	"	১,০০,৫০ ,০০০
ফরহঙ্গ-ই-করদানী ও *কার-আমোজী*	"	১,০৬,৭৯,৭৭৫
সিয়াকনামা	"	১,১০,০০,০০০
দস্তুর-উল-আমল-ই আলমগিরী	আনু. ১৬৫৬	১,১৪,৪৬,৪৫০
মিরাৎ-উল-আলম	আনু. ১৬৬৭	১,৩০,৩৯,৪৭৭-১২-০
জওয়ারিত-ই-আলমগিরী	১৬৮৭ আনু. ১৬৯১	১,৩১,১৩,৪০৬
ফ্রেজার ১৬৮৭	আনু. ১৬৯৫	১,৩১,১৩,৪০৬
ইন্তেখাব-ই-দস্তুর-উল-আমল-ই-পাদশাহী	১৬৮৭?	১,৩১,১৩,৪০৬
জগজীবন দাস : মুন্তখব-উত-তওয়ারীখ	আনু. ১৭০৯	১,৩১,১৩,৪০৬
Add. ৬৫৮৬	১৭২০	১, ৪১,১৫,৩৬৯

এই সারণিতে প্রাপ্ত অঙ্কগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। তা গ্রান্ট এবং সলিমুল্লাহর রাজস্ব-অঙ্ককে সমর্থন করে। ১৬৫৬ খৃস্টাব্দের পরের রাজস্ব-অঙ্কগুলি ১ কোটি ৩০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৩১ লক্ষের মধ্যেই আছে। গ্রান্টের মতে ১৬৫৮ খৃস্টাব্দে শাহ শুজার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হয়। অতএব ১৬৫৮ থেকে ১৭২০ খৃস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত রাজস্বের হিসাব শাহ শুজার বন্দোবস্তের রাজস্ব-অঙ্কের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। ১৭২০ খৃস্টাব্দের পরে রাজস্ব-অঙ্ক ছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার উপরে। এই অঙ্কগুলি মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তের ভিত্তিতে এবং গ্রান্ট ও সলিমুল্লাহর রাজস্ব-অঙ্কের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। অতএব গ্রান্টের রাজস্বপরিসংখ্যান গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। এই পরিসংখ্যানমতে মুগল রাজস্বের পরিমাণের হিসাব নিম্নরূপ :

বন্দোবস্ত	খালিসা	জাগির	মোট
টোডর মল্লের বন্দোবস্ত	টা ৬৩,৪৪, ২৬০	৪৩,৪৮,৮৯২	১,০৬,৯৩,১৫২
শুজার বন্দোবস্ত	টা. ৮৭, ৬৭,০১৫	৪৩, ৪৮, ৮৯২	১,৩১,১৫,৯০৭
মুর্শিদকুলীর বন্দোবস্ত	টা. ১,০৯, ৬০,৭০৯	৩৩, ২৭, ৪৭৭	১,৪২,৮৮,১৮৬

উপরোক্ত সূত্রগুলিতে বিভিন্ন বছরে রাজস্ব-অঙ্কের যে তারতম্য দেখা যায়, তার কারণ বোধ হয় এই যে, উপরোক্ত সূত্রগুলিতে বিভিন্ন বছরে আদায় বা সংগ্রহের পরিমাণ দেয়া হয়েছে। যেমন মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে খালিসা রাজস্বের পরিমাণ দেখা যায় এক

কোটি নয় লক্ষ টাকারও উপরে। কিন্তু সলিমুল্লাহর সাক্ষ্যে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুর্শিদকুলী খান প্রতি বছর এক কোটি তিন লক্ষ টাকা সম্রাটের কাছে পাঠান।

মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্ত সম্পর্কে জেমস গ্রান্টের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বেশ কিছু সংখ্যক জাগির খালিসায় স্থানান্তরিত করা হয়। ফলে জাগির ভূমির রাজস্ব হ্রাস পায় এবং আনুপাতিক হারে খালিসা রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় উজির নিযাম-উল-মুলক এই সময়ে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনায় জাগির পুনর্বণ্টন করা হয় এবং কর্মকর্তাদের বেতন কমিয়ে সম্রাটের রাজস্বআয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়। সম্রাট উজিরের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন, কিন্তু এর কার্যকারিতা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন।[৩৮] মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক জাগির কমিয়ে খালিসা রাজস্ব বৃদ্ধি করার নীতি উজির নিযাম-উল-মুলকের এই পরিকল্পনার অংশবিশেষ কিনা বলা যায় না। ইংরেজ কোম্পানির কাউন্সিল কাশিমবাজার থেকে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে বলেন : "তারা শুনতে পাচ্ছে যে উজির সম্রাটের দরবারস্থ সকল আমির-ওমরাহের বেতন কমিয়ে দিয়েছেন। জাফর খানের (মুর্শিদকুলী খানের) বেতন শত হাজার থেকে কমিয়ে পাঁচ হাজার করা হয়েছে, দীউয়ানের বেতনও আনুপাতিক হারে কমিয়ে দেয়া হয়েছে"।[৩৯] নিযাম-উল-মুলকের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা বলা যায় না। কিন্তু জেমস গ্রান্ট জাগির ভূমির রাজস্বের যে পরিমাণ উল্লেখ করেছেন তাতে দেখা যায়, মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে জাগির অনেক হ্রাস করা হয়েছে। সলিমুল্লাহ এর অন্যরূপ ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন যে, মুর্শিদকুলী খান নিজেই একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং সম্রাটের অনুমোদন নিয়ে বাংলায় নিযুক্ত কর্মকর্তাদের জাগির বাংলার পরিবর্তে উড়িষ্যায় দেয়া হয়। উজির নিযাম-উল-মুলকের পরিকল্পনা বা মুর্শিদকুলী খানের নিজস্ব পরিকল্পনার যেকোন একটি নিশ্চয়ই বাস্তবায়িত হয় এবং ফলে বাংলায় জাগিরভূমি হ্রাস পাওয়ার একটি সঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, মুর্শিদকুলী খান ভূমি জরিপ করেন এবং একটি নতুন বন্দোবস্ত করেন, যা ১৭২২ সালে সমাপ্ত হয় এবং পূর্ণাঙ্গ রূপলাভ করে। একই বছর ইংরেজ কোম্পানির কাউন্সিলের কার্যবিবরণীতে বলা হয়, জাফর খান অর্থের জন্য দেশকে ক্ষতবিক্ষত করছেন।[৪০] এও বলা যায় যে, জেমস গ্রান্ট রাজস্বের পরিসংখ্যান ও মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তের সঠিক চিত্র তুলে ধরেছেন। অবশ্য মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তের খুঁটিনাটি বিষয়ে আরো কিছু প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্ত কি রায়তওয়ারি ছিল নাকি জমিদারওয়ারি ছিল? সলিমুল্লাহর মতে, মুর্শিদকুলী খানের জরিপ এমন বিস্তারিতভাবে

৩৮. Shatish Chandra, *Parties and Politics at the Mughal Court* 1707-1740, 174-75.

৩৯. India Office Records, *Bengal Public Consultations*, 16 April, 1722.

৪০. ঐ।

করা হয় যে, সরকার প্রত্যেক কৃষকের রাজস্ব প্রদানের ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হয়। এইরূপ বিস্তারিত তথ্য লাভ করার উদ্দেশ্যে জমিদারদের আটক রাখা হয় যাতে সরকারের বিশ্বস্ত রাজস্বকর্মকর্তারা কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়া জরিপকাজ সমাধা করতে পারে। সলিমুল্লাহ আরো বলেন যে, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক ভূমিখণ্ডে, প্রত্যেক রায়তের জমিতে এবং প্রত্যেক চাকলায় কৃষি এবং পতিত জমি জরিপ করা হয়। সুতরাং সলিমুল্লাহ ভূমির মাপসহ একটি বিস্তারিত জরিপের কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেন যে, বীরভূম এবং বিষ্ণুপুরে জরিপ করা হয় নি, কারণ বীরভূমের জমিদার আসাদউল্লাহ ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ লোক, তিনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক দান করেন। অন্যদিকে বিষ্ণুপুর জঙ্গলাকীর্ণ এবং দুর্গম হওয়ায় সেখানে জরিপ করা সম্ভব ছিল না। ত্রিপুরা, কুচবিহার এবং আসাম সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই রাজ্যগুলি নির্দিষ্ট হারে কর (tribute) দিত, সুতরাং এগুলির ভূমি জরিপ করার প্রয়োজন ছিল না। ইংরেজ কোম্পানির অধীনস্থ কলকাতা শহর (সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা) জরিপ করার কোন প্রমাণ নেই। অবশ্য কলকাতা শহরের অবস্থা ছিল ভিন্ন। ইংরেজদের অধিকার এবং শহরগুলির রাজস্ব ফররুখশিয়রের ১৭১৭ সালের ফরমান দ্বারা স্থিরীকৃত ছিল। গ্রান্টের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্ত ছিল জমিদারওয়ারি, রায়তওয়ারি নয়। গ্রান্টের বিবরণে এই বন্দোবস্ত ১৩টি চাকলায় বিভক্ত দেখা যায়। কিন্তু ১৭২৮ সালে শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের সময় এর যে সুষমকরণ করা হয়, তাতে জমিদারওয়ারিভাবে রাজস্ব দেখানো হয়েছে। শুজাউদ্দিন যে কোন নতুন জরিপ বা বন্দোবস্ত করেন তার কোন প্রমাণ নেই, অন্ততপক্ষে কোন সূত্রে এরূপ বক্তব্য পাওয়া যায় না। সুতরাং বলা যায়, শুজাউদ্দিন মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তকেই গ্রহণ করেন। এতে জমিদারওয়ারি রাজস্ব উল্লেখিত হওয়ায় ধরে নেয়া যায় যে, মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তও জমিদারওয়ারি ছিল। চাকলাগুলি ছিল ভৌগোলিক বিভাগ। কোন জমিদারের জমিদারি এক বা একাধিক চাকলায় বিস্তৃত ছিল। বড় জমিদারিকে ইহতিমাম এবং ছোট জমিদারিকে মজকুরি বলা হয়েছে। এই জমিদারিগুলি জাগিরভূমি থেকে স্বতন্ত্র। সলিমুল্লাহও জমিদারের অস্তিত্ব সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, বিশ্বস্ত এবং অনুগত জমিদারদের সরকারের পক্ষে তাঁদের নির্দিষ্ট জমিদারি থেকে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য বহাল রাখা হয়। বোঝা যায় যে, জমিদার নতুন বন্দোবস্ত স্বীকার করে নিলে এবং নানকর বা জীবিকাভাতা গ্রহণ করতে রাজি হলে জমিদারি স্থিতিশীল রাখা হতো। এটা মুর্শিদকুলী খানের প্রশাসনব্যয় সঙ্কোচনের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে, জমিদারি বহাল রাখায় এটাও বোঝা যায় যে, জমিদারি সম্পূর্ণ বাতিল করা যে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক তা মুর্শিদকুলী খান বুঝেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে যে, সলিমুল্লাহ এবং তাঁকে অনুসরণ করে গোলাম হোসেন সলিম প্রতি চাকলায়, প্রতি গ্রামে প্রত্যেক রায়তের জমি জরিপ করার কথা বলেছেন। এই বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়। অবশ্য ইংরেজ কোম্পানির কাউন্সিলও বোধ হয় এই বক্তব্য সমর্থন করে

বলেছেন যে, মুর্শিদকুলী খান অর্থের জন্য দেশকে ক্ষতবিক্ষত করছেন। দেশে যে ব্যাপক জরিপকাজ চলছিল, তা নিশ্চয়ই ইংরেজদের দৃষ্টি এড়ায় নি। যদিও কাউন্সিলের এই বক্তব্য খুব পরিষ্কার নয়, কাউন্সিল বোধ হয় এই কথা বলে মুর্শিদকুলী খানের জরিপ এবং বন্দোবস্তের দিকে ঈঙ্গিত করেছেন।

আওরঙ্গজেবের সময়ে ভূমি জরিপের যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ[৪১] :

মোট গ্রামের সংখ্যা	জরিপ করা গ্রাম	জরিপ না করা গ্রাম	জরিপ জমি (বিঘায়)
১,১২,৭৮৮	১,৫৩৮	১,১১,২৫০	৩,৩৪,৭৭৫

এতে দেখা যায় যে, আওরঙ্গজেবের সময়েও বাংলায় ভূমি জরিপ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সুবা বাংলায় ভূমি জরিপের এটাই প্রথম প্রমাণ। মনে করা যেতে পারে যে, মুর্শিদকুলী খান এই প্রদেশের দীউয়ানরূপে যোগদানের পরে এই জরিপ শুরু করেন। সলিমুল্লাহ এবং গোলাম হোসেন সলিমের বক্তব্য সত্য হলে বলতে হয় যে, মুর্শিদকুলী খান তাঁর জরিপকাজ চালিয়ে যান এবং ধীরে ধীরে অধিক থেকে অধিকতর গ্রাম জরিপের আওতায় আনেন, যদিও প্রকৃত জরিপ করে ভূমির পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুর্শিদকুলী খান তাঁর বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় ভূমির উৎপাদনক্ষমতা নির্ধারণ করতে সমর্থ হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি জমিদারদের আটক করে রাখেন যাতে তাঁর বিশ্বস্ত রাজস্বকর্মকর্তারা বিনা বাধায় ইপ্সিত ফল লাভ করতে পারেন।

টোডর মল্লের বন্দোবস্তে জমিদার, তালুকদার এবং রায়তের উল্লেখ আছে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, টোডর মল্লের বন্দোবস্ত পুরাতন রেকর্ডের ভিত্তিতে তৈরি, অর্থাৎ প্রাক-মুগল সরকারের ভূমি ও রাজস্বব্যবস্থায় জমিদারি, তালুকদারি এবং রায়তি স্বত্বের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু জেমস গ্রান্ট মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তের যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে তালুকদারি এবং রায়তি স্বত্বের উল্লেখ নেই। তাই বলে এই স্বত্বগুলি যে ছিল না তা বলা যায় না। তবে এগুলি জমিদারি স্বত্বের অধীনস্থ ছিল বলে মনে হয়। জমিদারেরা ছিলেন সামন্ত প্রভু। *বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে* প্রচুর প্রমাণ আছে, যাতে দেখা যায় যে পরাভূত সামন্ত প্রধান বা ভূস্বামীদেরকে তাদের ভূমির উপর কর্তৃত্ব ছেড়ে দেয়া হয়, বিনিময়ে তাঁরা নির্দিষ্ট অঙ্কের রাজস্ব দিতেন বা রাজস্বের বিনিময়ে স্বীয় লোকলস্কর, নৌকা ইত্যাদি নিয়ে মুগল বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতেন। ইরফান হাবিব বলেন :

> বাংলার ব্যবস্থা ছিল সত্যই অন্য রকম। মনে হয়, সেখানকার জমিদাররা দীর্ঘ, কিন্তু অনির্দিষ্ট সময় ধরে প্রশাসনের নির্দিষ্ট এক বাঁধা অঙ্কেই ভূমিরাজস্ব দিতেন। এই ব্যবস্থার নজির মেলে *আইন-ই-আকবরীতে*, সেখানে বলা হয়েছে, বাংলার 'জমা' ছিল 'পুরোটাই নগদী'। এখন 'নগদ' মানে

৪১. ইরফান হাবিব, *মুগল ভারতের কৃষিব্যবস্থা*, ৪, সারণি নং ১

টাকাকড়ি, অতএব আলাদা করে ধরলে এর সরল অর্থ এই হতে পারে যে, বাংলার রাজস্ব আদায় হতো নগদ টাকায়।[৪২]

আবুল ফজল পরিষ্কার বলেছেন যে, বাংলার রাজস্ব নগদে সংগ্রহ করা হতো। কিন্তু সেই প্রশ্ন পরে আলোচিত হবে। তালুকদার ছিলেন এক প্রকার ছোটখাটো জমিদার। ইরফান হাবিব দু'য়ের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন :

মনে হয় ১৭ শতকের শেষভাগে ভূমিরাজস্বদাতা হিসেবে জমিদারকে বোঝাতে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছিল। 'তাল্লুকদার' মানে 'তাল্লুক'-এর অধিকারী। 'তাল্লুক' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'সংযোগ', কিন্তু ব্যবহারিক অর্থ দাঁড়িয়েছিল : যে জমি বা এলাকার উপর কোন ধরনের স্বত্ব দাবি করা হয়। ১৮ শতকে 'তাল্লুকদার'-এর সংজ্ঞায় দু'টি আলাদা বক্তব্য পাওয়া যায়। প্রথমটি অনুযায়ী তিনি ছিলেন নেহাৎই এক ধরনের ইজারাদার। আর দ্বিতীয়টি অনুসারে তিনি ছিলেন ক্ষুদে জমিদার। এ থেকে শুধু যে ১৮ শতকের ঐ সংজ্ঞায় 'তাল্লুকদার'-এর একজন ক্ষুদে জমিদার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাই নয়, 'ফথিয়া ইব্রিয়ার' একটি জায়গায়ও পরিষ্কার বোঝা যায়, আরাকান সিংহাসনের দাবিদাররা শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম অভিযানের সময় মুগলদের পক্ষে ছিল। বলা হয়েছে, তাদের আশা ছিল অন্তত "রাজা না হলে জমিদার, জমিদার না হলে তালুকদার হবে"। অবশ্য একথার উপরেই জোর দিতে হয় যে, তাল্লুকদার ছিল এক বিশেষ ধরনের জমিদার মাত্র; দু'টি শব্দের কোনটিকে ব্যবহার করা হলো বহু ক্ষেত্রেই তাতে কিছু এসে যেতো না।[৪৩]

এই প্রসঙ্গে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতার উপর কোম্পানির স্বত্বের উল্লেখ করা যায়। এই তিনটি গ্রাম, যা কোম্পানির রেকর্ডপত্রে সর্বত্র শহররূপে উল্লেখিত, মূলত বসাকদের অধিকারে ছিল। হুগলী নদীর তীরে এই গ্রামগুলি ছিল পতিত, জলা এবং জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি। ১৬৯৮ খৃস্টাব্দে সুবাদার আজিম-উশ-শানের আমলে কোম্পানি বসাকদের কাছ থেকে এই তিনটি গ্রাম ক্রয় করে। বিক্রিকবলায় বিক্রেতাদের অর্থাৎ বসাকদের জমিদার বলা হয়েছে এবং ইংরেজরা মনে করে যে, তারা জমিদারি স্বত্বই ক্রয় করেছে। কিন্তু বসাকরা সামন্তপ্রধান ছিল না, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা জমির স্বত্ব লাভ করে নি, উত্তরাধিকারসূত্রে স্বত্ব পেয়েছে এরূপ কোন প্রমাণও নেই। মোরল্যান্ড বলেন :

এই বেচাকেনায় জমিদারের অর্থ দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : সাধারণভাবে একে ভূমির মালিক বলা যায় যাতে জমির উপর যেকোনরূপ অধিকার বোঝায়, কিন্তু এতে জমিদারি বা অন্য কোনরূপ স্বত্ব বোঝায় না এবং সম্ভবত এই অর্থেই তা ঐ এলাকায় তখন ব্যবহৃত হতো। অন্যপক্ষে এর দ্বারা যেকোন প্রকার স্বত্বও বোঝাতে পারে (স্বত্ব যাই হোক না কেন), এই স্বত্ব মুসলমান শাসকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত। এই দুইটির কোন অর্থই উত্তর ভারতে জমিদার শব্দের উপর আরোপিত অর্থের সঙ্গে মিলে না। উত্তর ভারতে চৌদ্দ থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত জমিদার দ্বারা প্রাক-মুসলিম যুগ থেকে স্বত্ববান হওয়ার কথা বোঝায়।[৪৪]

---

৪২. ঐ, ১৮৭।

৪৩. ঐ, ১৮৩-১৮৪।

৪৪. Moreland, *Agrarian System*, 191

যাই হোক, সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতার বসাকদের সামন্তপ্রধান বলা যায় না এবং দিল্লীর কেন্দ্রীয় দীউয়ানি দপ্তরও কোম্পানি যা ক্রয় করেছে তাকে জমিদারিস্বত্ব বলে নি। কোম্পানিকে দেয়া ফররুখশিয়রের ১৭১৭ সালের ফরমানে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার গ্রামগুলির উপর কোম্পানির স্বত্ব স্বীকৃত হয় এবং একই শর্তে পার্শ্ববর্তী আরো গ্রাম ক্রয় করার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু ফরমানে কোম্পানির স্বত্বকে জমিদারি বলা হয় নি, তালুকদারি বলা হয়েছে। অন্য কথায় এই গ্রামগুলি খরিদ করে কোম্পানি এগুলির তালুকদারে পরিণত হয়। কিন্তু কোম্পানি তাদের নথিপত্রে সর্বত্র এবং সর্বদা তাদের স্বত্বকে জমিদারিরূপে দাবি করেছে। এই গ্রামগুলির তত্ত্বাবধানে কাউন্সিলের যে সদস্য নিয়োজিত হন তাঁকে কোম্পানির রেকর্ডে জমিদার এবং তাঁর অধীনস্থ স্থানীয় কর্মচারীদের 'ব্ল্যাক জমিদার' বলা হয়।

মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে রাজস্বের অঙ্ক কি রাজস্বমান না রাজস্বদাবি[৪৫] সেই প্রশ্নে আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। জেমস গ্রান্ট মনে করেন যে, তা রাজস্বদাবি এবং রাজস্ব-অঙ্কের সম্পূর্ণ পরিমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে সংগৃহীত হতো। কিন্তু মোরল্যান্ড একে রাজস্বমান বলে মনে করেন এবং টোডর মল্লের বন্দোবস্তের ভিত্তিতে তাঁর যুক্তি খাড়া করেন। টোডর মল্ল সারা বাংলার রাজস্ব নির্ধারণ করেন, যদিও তখন পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশে মুগল অধিকার স্থাপিত হয় নি। শাহ শুজা এবং মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে 'জমা' শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং মোরল্যান্ড বলেন যে, 'জমা' শব্দ দ্বারা রাজস্বমান বোঝায়, রাজস্বদাবি নয়। মুর্শিদকুলী খান যে অঙ্কের রাজস্বের জন্য বন্দোবস্ত করেন এবং যে পরিমাণ অর্থ সম্রাটের কাছে পাঠাতেন, তার তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে, উভয় অঙ্কের মধ্যে মিল নেই। জেমস গ্রান্ট কোষাগারের যে স্মারক প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, ফররুখশিয়রের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষ থেকে মুহাম্মদ শাহের রাজত্বের নবম বর্ষ পর্যন্ত মোট ১৫ বছর ৯ মাস ৫ দিনে মুর্শিদকুলী খান সম্রাটের কাছে ১৪,০৭,৩৮, ১৩৬-১-৮ খালিসা রাজস্ব পাঠান।[৪৬] এই স্মারক মতে মুর্শিদকুলী খান গড়পড়তা প্রতি বছর ৯৪ লক্ষ টাকা দিল্লীতে পাঠান। কিন্তু বন্দোবস্তের পরিসংখ্যানে খালিসা রাজস্বের পরিমাণ ১০৯ লক্ষ টাকারও বেশি। অতএব গড়পড়তা প্রতি বছর ১৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখা যায়।[৪৭] সুতরাং বন্দোবস্তের রাজস্ব-অঙ্কের চেয়ে সংগৃহীত রাজস্ব

৪৫. এখানে valuation-এর জন্য রাজস্বমান এবং demand-এর জন্য রাজস্বদাবি ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দগুলি মোরল্যান্ডের ব্যাখ্যামতো ব্যবহৃত। দেখুন,মোরল্যান্ড, পরিশিষ্ট A, 209-215.

৪৬. *Fifth Report*, Appendix 4, 213.

৪৭. কোষাগারের স্মারক মতে মুর্শিদকুলী খান মোট ১৬,৫১,৩০,৩০৬-১০-০ পাঠান। এর মধ্যে বাংলার খালিসা রাজস্ব ছাড়াও উড়িষ্যা এবং ভাগলপুরের রাজস্ব, জাগিরদারদের নযর, আবওয়াব এবং মৃত কামাল উদ্দিন খানের অর্থসম্পদও ছিল। এফ. ডি. আসকলী (*Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report*, 47) এই সমুদয় অর্থ খালিসা বলে মনে করেন, কিন্তু জাগিরদারদের নযর এবং কামাল উদ্দিন খানের সম্পদ খালিসা রাজস্বে যুক্ত করা যায় না।

কম পড়ে। সলিমুল্লাহ এবং গোলাম হোসেন সলিমের মতে, মুর্শিদকুলী খান রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন এবং খেলাপকারীদের অমানুষিক অত্যাচার করতেন। সুতরাং রাজস্বে ঘাটতির জন্য সংগ্রহে শিথিলতাকে দায়ী করা যায় না। গ্রান্ট এই ঘাটতির জন্য মুর্শিদকুলী খানকে দায়ী করেন এবং বলেন যে, মুর্শিদকুলী খান তহবিল তসরুপ বা আত্মসাৎ করেছিলেন।[৪৮] কিন্তু কোষাগারের স্মারকপত্রে আরো দেখা যায় যে, মুর্শিদকুলী খানের পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ তাঁর মৃত্যুর পরে শুজাউদ্দিন খান দিল্লীতে পাঠান, এই অর্থ-সম্পদের পরিমাণ ছিল ৬১ লক্ষ টাকা। অথচ মুর্শিদকুলী খান বছরে ১৫ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করলে ১৫ বছরে তাঁর সম্পদের পরিমাণ হতো প্রায় সোয়া দুই কোটি টাকা। তাছাড়া মুর্শিদকুলী খান ১৭০৪ সাল থেকে প্রায় ২৩ বছর বাংলার রাজস্বসংগ্রহের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এই হিসাবে মুর্শিদকুলী খানের বার্ষিক সঞ্চয় আড়াই লক্ষ টাকার বেশি হয় না। সুতরাং মনে হয় না যে, মুর্শিদকুলী খান তহবিল তসরুপ করেছিলেন। মুর্শিদকুলী খানের চরিত্র এবং সম্রাটের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ আনুগত্যের কথা বিচার করলেও বলা যায় না, মুর্শিদকুলী খান এইরূপ ঘৃণ্য কাজ করতে পারতেন। যদিও উপরের আলোচনা মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্ত রাজস্বমান বা রাজস্বদাবি ছিল কিনা সেই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য বিশেষ সহায়ক নয়, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বন্দোবস্তের রাজস্ব কোন সময়েই সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয় নি। তাই বন্দোবস্তকৃত রাজস্ব রাজস্বমান হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে রাজস্ব নির্ধারণের হার কি ছিল তাও বলা শক্ত। শের শাহ এবং আকবরের সময়ে রাজস্বহার ছিল উৎপাদিত শস্যের বা উৎপাদনক্ষমতার এক-তৃতীয়াংশ[৪৯] এবং দাবি করা হয় যে, আওরঙ্গজেবের সময়ে এই হার বৃদ্ধি করে অর্ধেক করা হয়।[৫০] এই হিসেবে টোডর মল্লের বন্দোবস্তে রাজস্বের হার এক-তৃতীয়াংশ ধরে নেয়া যায়। কিন্তু টোডর মল্লের বন্দোবস্তে রাজস্বের হার এক-তৃতীয়াংশ হলে অঙ্কের সোজা হিসাবে মুর্শিদকুলী খানের রাজস্বহারকে অর্ধেক বলা যায় না। কারণ টোডর মল্লের ৭৬ বছর পরে শাহ শুজার রাজস্ব বৃদ্ধি পায় ১৫.৫০% এবং শাহ শুজার ৬৪ বছর পরে মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে রাজস্ব বৃদ্ধি পায় আরো ১৩.৫০%। শাহ শুজার বন্দোবস্তে নতুন বিজিত ভূমির রাজস্বও ১৪ লক্ষ টাকার বেশি ছিল। মধ্যবর্তী প্রায় দেড়শো বছরে চাষাবাদও অনেক বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী সময়ের রাজস্বহার আলোচনা করে প্রশ্নটির কিছু মীমাংসা করা যায়। মুর্শিদকুলী খান থেকে মীর কাশিম পর্যন্ত সকল সুবাদার আবওয়াব বা সেস বা অতিরিক্ত কর আরোপ করেন। এই সেস্‌গুলি ভূমিরাজস্বের অতিরিক্ত এবং ১৭২২ সালের বন্দোবস্তের পরে আরোপিত। স্যার জন শোর এবং জেমস গ্রান্ট সঠিক বলেছেন যে, সেস্-এর পরিমাণ সামান্য হলেও মুর্শিদকুলী খান একবার সেস্ আরোপ করার পরে

৪৮. *Fifth Report*, Appendix 4, 214

৪৯. Moreland, *Agrarian System*, 76, 91.

৫০. ঐ, 135.

পরবর্তী সুবাদারেরা এর সুযোগ গ্রহণ করেন এবং মীর কাশিমের সময়ে শুধু সেস্ খাতেই ১,১৭,৯১,৮৫৩ টাকা সংগৃহীত হয়, যা ছিল ভূমিরাজস্বের প্রায় সমপরিমাণ। সেস্ জমিদারের উপর আরোপিত হয় এবং জমিদারের কাছ থেকেই সংগৃহীত হয়, যদিও নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, শেষ পর্যন্ত সেস্-এর বোঝা কৃষকদেরই বহন করতে হয়েছিল। মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর ৩৬ বছরের মধ্যে ১৭৬৩ সালে সেস্ সহ সম্পূর্ণ রাজস্ব প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে রাজস্বহার যদি উৎপাদনের অর্ধেক হয়, তাহলে ১৭৬৩ সালে কৃষকদের সম্পূর্ণ উৎপাদিত পণ্যই রাজস্ব মিটাতে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। অবশ্য ইতিমধ্যে চাষাবাদ বৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির তথা অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে পণ্যসামগ্রীর মূল্যও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজস্ববৃদ্ধি অভাবনীয় এবং অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়। ইংরেজ কোম্পানির রেকর্ডের ভিত্তিতে এই বিষয়ে কিছু তথ্য বিশ্লেষণ করা যায়। ১৭৫৭ সালে সিরাজউদ্দৌলা ২৪টি পরগনা কোম্পানির অধিকারে দিলে কোম্পানি এই পরগনাগুলি পরিচালনার পদক্ষেপ নেয়। কলকাতা কাউন্সিল তাদের এই অর্জিত সম্পত্তির আর্থিক মুনাফা সম্পর্কে এক চিঠি লিখে কোর্ট অব ডাইরেক্টরসকে অবহিত করে। এই চিঠিতে বলা হয় যে, এই পরগনাগুলির ৮,১৬,৪৪৬ বিঘার মধ্যে জমিদারেরা শুধু ৪,৫৪,৮০৪ বিঘার রাজস্ব সংগ্রহ করে, বাকি ভূমি পতিত বা অকর্ষিত বা ওয়াকফ্ বা দেবোত্তর সম্পত্তি। এই পরগনাগুলির জন্য নবাবের প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ ২,১৫,০০০ টাকা বা তার কাছাকাছি।[৫১] পরে কানুনগোদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য পেয়ে কাউন্সিল জানতে পারে যে, সেস্ বাদ দিয়ে নবাবের কাছে দেয় রাজস্ব ২,২২,৯৫৮-১০-১১।[৫২] জমিদারদের সেস্ দিতে হতো, কিন্তু কোম্পানিকে সেস্ দিতে হতো না। স্পষ্টতই এই পরিমাণ রাজস্ব মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তের ভিত্তিতেই নির্ণীত হয় এবং একথা বলা ভুল হবে না যে, এই হিসাবে প্রতি বিঘা ভূমির রাজস্ব আট আনারও (এক টাকার অর্ধেক) কম হয়। কোম্পানির ২৪ পরগনার কর্তৃত্ব লাভের পরে অবশ্য রাজস্ব নিলামদাররা প্রস্তাব নিয়ে আসে যে, রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব পেলে তারা কোম্পানিকে বিগত বছরের সম্পূর্ণ রাজস্ব এবং তদুপরি আরো ১ লক্ষ এক টাকা দেবে।[৫৩] কিন্তু কোম্পানি নিলামে ৭,৬৫,৭০০ টাকা রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা দিয়ে দেয়।[৫৪] এই নিলামের টাকাকে ভূমির প্রকৃত রাজস্বরূপে গণ্য করা যায় না, কেননা নিলাম ডাককারী কৃষকদের শোষণ করে এই অর্থ সংগ্রহ করে। ১৭৬৭ সালে নিলাম ডাককারীরা পরগনাগুলির রাজস্ব সংগ্রহের বিনিময়ে ১০,০০,০০১ টাকা প্রদানের প্রস্তাব করে। কিন্তু কোম্পানি এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করে, কারণ কোম্পানির মতে পরগনাগুলির রাজস্বপ্রদানক্ষমতা আরো বেশি।[৫৫] এই সময়ে কাউন্সিলের

৫১. India Office Records: *Letters Received from Bengal*, Vol. IV, 101ff; *Fifth Report*, Vol I, XCVIII.
৫২. James Long, *Selections from Records of the Government of India*, Vol. I, No. 442.
৫৩. *Fifth Report*, Vol. I, C.
৫৪. James Long, *Selections*, No. 443.
৫৫. ঐ, No. 912.

প্রেসিডেন্ট (লর্ড ক্লাইভ) মন্তব্য করেন যে, নিলাম ডাককারীরা কৃষকদের কাছ থেকে প্রতি বিঘায় ২-৮-০ থেকে ২-১২-০ আনা সংগ্রহ করে থাকে, কিন্তু তারা নিজেদের আবাদ জমির রাজস্ব দেয় আট আনা থেকে বারো আনা।[৫৬] সুতরাং আট আনা থেকে বারো আনাই বিঘাপ্রতি নবাবের নিকট দেয় রাজস্ব, দুই টাকা আট আনা থেকে দুই টাকা বারো আনা ছিল শোষণ। শোষণ করেই নিলাম ডাককারীরা তাদের নিলামের দাবি শোধ করতো। অনুরূপভাবে ১৭৬১ সালে চট্টগ্রামে প্রেরিত কোম্পানির কর্মকর্তারা জানায় যে, চট্টগ্রামে আবাদ ভূমির পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ কানি। তারা আরো জানায় যে, ১৭১৩ সালে চট্টগ্রামের ফৌজদার মীর হাদী ১,৭৫,৪৫৮ টাকা রাজস্ব আদায় করেন, কিন্তু তিনি নবাবের কাছে ৬৮,৪২২-১০-৭.৫০ প্রদান করেন।[৫৭] গ্রান্টপ্রদত্ত হিসাবমতে মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে চাকলা চট্টগ্রামে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,৭৬,৭৯৫ টাকা। মীর হাদী কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ এই অঙ্কের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রতি কানি ভূমির রাজস্ব আট আনার চেয়েও কম। উল্লিখিত সংখ্যাগুলি ধারণা দেয় যে, ১৭২২ সালে মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে প্রতি বিঘা বা প্রতি কানি ভূমির রাজস্ব আট আনা থেকে বারো আনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[৫৮] মুর্শিদকুলী খানের সময়ে টাকায় গড়পড়তা চার মণ চাল বিক্রি হতো[৫৯] । সুতরাং বিঘাপ্রতি বা কানিপ্রতি রাজস্ব দুই থেকে আড়াই মণ চালের বেশি নয় এবং তা এক-তৃতীয়াংশের বেশি ছিল বলে মনে হয় না।

রাজস্ব সংগ্রহের নীতি সম্পর্কে সলিমুল্লাহর বিবরণে দেখা যায় যে, জমিদার ও আমিল (রাজস্ব সংগ্রহকারী সরকারি কর্মকর্তা) উভয়ের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করা হতো। রাজস্ব সংক্রান্ত আলোচনার সময় সলিমুল্লাহ জমিদার ও আমিলের কথা সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, মুর্শিদকুলী খান জমিদার, আমিল ও অন্যান্য রাজস্বসংগ্রাহকের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হারে[৬০] রাজস্ব আদায় করতেন। এতে বোঝা যায় যে, জমিদার ও আমিল সকলেই জরিপের পরে স্থিরীকৃত রাজস্বনথি বা খতিয়ানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন। সুবা বাংলায় কৃষকেরা বা রায়তেরা নগদ টাকায় রাজস্ব আদায় করতো, এখানে শস্যের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি চালু ছিল না। আবুল ফজল বলেন :

৫৬. *Fifth Report*, Vol. I. CVII.

৫৭. ঐ, CXX - CXXI

৫৮. ৩৫ ডেসিমেল-এ এক বিঘা। চট্টগ্রামের কানি মঘী কানি, প্রতি কানি ৪০ ডেসিমেল, নোয়াখালী-কুমিল্লায় শাহী কানি ব্যবহৃত হয়, প্রতি শাহী কানি ১৬০ ডেসিমেল। মঘী কানি এবং বিঘার মধ্যে তফাৎ খুব কম। সুতরাং আট আনা থেকে বারো আনা রাজস্ব বিঘা এবং কানি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৫৯. ত.বা. ফলিও ৬৫ বি; S. Bhattacharyya, *East India Company and the Economy of Bengal*, 205, 213 note, "Murshid Quli Khan's Regulations regarding price and supply of Rice", in *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, June 1984.

৬০. ত. বা. ফলিও ৩৬ বি।

জনগণ অনুগত, তারা তাদের রাজস্ব সময়মতো আদায় করে, প্রত্যেক বছরের রাজস্বদাবি আট মাসে কিস্তিতে পরিশোধ করে, রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে তারা নিজেরাই মোহর বা টাকা নিয়ে আসে। সরকার ও রায়তদের মধ্যে শস্য ভাগাভাগি এই প্রদেশে চালু নেই। এখানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়, ভূমির মাপের উপর জোর দেয়া হয় না, এবং উৎপন্নশস্যের আনুমানিক অনুপাত ঠিক করে রাজস্বের হার নির্ধারণ করা হয়। সম্রাট তাঁর ঔদার্যে এই প্রথা অনুমোদন করেন।[৬১]

সুবা বাংলা যখন বিজিত হচ্ছিল, তখন সামরিক চাকুরির বিনিময়ে সামন্তপ্রধানদের নিজ নিজ রাজ্য বহাল রাখা হয়। এইভাবে ইসলাম খান চিশতী ভূষণার রাজা সত্রাজিৎ এবং অন্যদের নিজ নিজ রাজ্য ফিরিয়ে দেন। বিনিময়ে এঁরা নিজ লোকলস্কর, নৌকাসহ মুগলদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ঈশা খানের পৌত্র মাসুম খান এবং প্রপৌত্র মুনওয়ার খান নিজস্ব সৈন্য, নাবিক এবং নৌকা নিয়ে মুগল বাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করেন। এটা জমিদারদের নগদ রাজস্বের বিনিময়ে রাজস্ব প্রদানের মতো একরূপ নিয়ম। কিন্তু কৃষক বা রায়তদের ক্ষেত্রে নগদ টাকা রাজস্ব দেয়ার পদ্ধতি চালু ছিল। মুর্শিদকুলী খানের সময়ে জমিদারদের সামরিক চাকুরির প্রয়োজন ছিল না, কারণ ইতিপূর্বেই সারা বাংলা বিজয় সম্পূর্ণ হয় এবং দেশে মোটামুটিভাবে স্থিতাবস্থা বিরাজ করছিল। হয়তো এই কারণে রাজস্বের পরিবর্তে সামরিক চাকুরির ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। ১৭২২ সালের বন্দোবস্তে এবং ১৭২৮ সালে এই বন্দোবস্তের সুষমকরণে জমিদার কর্তৃক সামরিক চাকুরির কোন উল্লেখ নেই, এর পরিবর্তে কতকগুলি সামরিক প্রতিষ্ঠানের (নওয়ারা, আমলা-ই-আসাম ইত্যাদি) উল্লেখ আছে, যার জন্য জাগির নির্দিষ্ট করা হয়।

এখন মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তের প্রধান প্রধান দিক সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়। এই বন্দোবস্তের মূলকথা ছিল একটি সার্বিক রাজস্বতালিকা তৈরি করা, ভূমির উৎপাদনক্ষমতা এবং রায়তদের রাজস্ব প্রদানের ক্ষমতার তথ্য সংগ্রহ করা এবং তালিকা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা। যতোদিন পর্যন্ত জমিদারেরা যথাযথভাবে রাজস্ব সরকারের কাছে আদায় করতো, ততোদিন তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমিদারি স্বত্ব বহাল রাখা হতো। পুণ্যাহ উৎসব[৬২] মুর্শিদকুলী খানের একটি নতুন সংস্কার বা সংযোজন। এটা ছিল সালতামামী উৎসব, যখন রাজস্বসংগ্রহ সম্পূর্ণ করা হতো এবং স্থিতিপত্র (balancesheet) তৈরি করা হতো। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বা অন্য কোন কারণে ফসলহানি হলে রেয়াত দেয়ার প্রশ্ন ঐ দিনই বিবেচনা এবং চূড়ান্ত মীমাংসা করা হতো। এতেও বোঝা যায় যে, মুর্শিদকুলী খানের এবং তাঁর পূর্বের বন্দোবস্তে প্রদত্ত রাজস্বের অঙ্ক রাজস্বমান, রাজস্বদাবি নয় এবং জেমস গ্রান্ট প্রদত্ত রাজস্বের অঙ্ক পরীক্ষা করেও দেখা যায় যে,

৬১. *আইন, ২য়*, ১৩৪।

৬২. ত. বা. ফলিও ৩৮ এ। হান্টার (*Statistical Account of Bengal*, Vol IX, 133) মনে করেন যে, মুর্শিদকুলী খান পুণ্যাহ উৎসব প্রবর্তন করেন। যদুনাথ সরকার (*Mughal Administration*, 7, note) মনে করেন যে, পুণ্যাহ মূলত হিন্দু আমলের রাজস্ব বিভাগীয় উৎসব। এটা হিন্দু আমল থেকে মুসলমান আমলে এবং বৃটিশ আমল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এটা একটি প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য বলেই মনে হয়, কিন্তু মুর্শিদকুলী খানের আগে এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইংরেজ আমলে জমিদারেরা পুণ্যাহ উৎসব পালন করতো।

নির্ধারিত রাজস্ব কোন সময়েই সম্পূর্ণ সংগৃহীত হতো না। রাজস্বের হারও ছিল মধ্যম (moderate) বা অনতিরিক্ত, খুব সম্ভব উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশের বেশি নয়। কৃষকদের বীজ সংগ্রহের জন্য তকবি ঋণ দান, অনতিরিক্ত রাজস্বহার নির্ধারণ, ভূমির উৎপাদনক্ষমতা এবং রায়তদের রাজস্ব প্রদানের ক্ষমতার ভিত্তিতে রাজস্বহার নির্ধারণ, রাজস্ব আদায়ে কঠোরতা অবলম্বন এবং সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব নিয়মিত প্রদান সবকিছুই এই ধারণা দেয় যে, মুর্শিদকুলী খানের রাজস্বসংস্কার নীতি দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়। প্রথমত যতো বেশি সম্ভব রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং দ্বিতীয়ত রায়তদের সুখ-শান্তি বৃদ্ধি করা। মুগল আমলে মুর্শিদকুলী খানের পরে আর কোন বন্দোবস্ত হয় নি। কিন্তু পরবর্তী সুবাদারেরা আবওয়াব বা সেস্ প্রবর্তন করে রাজস্ব বৃদ্ধি করেন।

মুর্শিদকুলী খান জমিদারদের উপর আবওয়াব বা সেস্ প্রবর্তন শুরু করেন। তাঁর প্রবর্তিত সেস্‌কে আবওয়াব-ই-খাসনবিশি বলা হতো। শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান কয়েকটি সেস্ প্রবর্তন করেন, যেমন নযরানা মুকররি, যর মা-তাহুত, মা-তাহুত ফীলখানা এবং ফৌজদারি আবওয়াব। আলিবর্দী খানও কয়েকটি সেস্ প্রবর্তন করেন, যেমন চৌথ মারাঠা, আহুক, নযরানা মনসুরগঞ্জ, এবং মীর কাশিম কিফায়েৎ হস্তবুদ, সরফসিক্কা, কিফায়েৎ ফৌজদারান এবং তৌফের জাগিরদারান নামক সেস্ প্রবর্তন করেন। মুর্শিদকুলী খান থেকে মীর কাশিম পর্যন্ত সকলে যে সেস্ প্রবর্তন করেন তার মোট অঙ্কের পরিমাণ ১,১৭,৯১,৮৫৩ টাকা।[৬৩] আঠারো শতকের প্রথম থেকে সুবা বাংলায় আর্থিক উন্নতি সূচিত হয়। দেশের বহির্বাণিজ্য অভাবিতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পায় এবং বিদেশ থেকে বিদেশী বণিক ও বণিককোম্পানি মারফত অভাবিত পরিমাণ অর্থ দেশে প্রবেশ করে। ফলে কৃষিপণ্যসহ সকল পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং সম্ভবত চাষাবাদও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই আর্থিক প্রবৃদ্ধির সুফল কাজে লাগিয়ে নতুনভাবে ভূমি বন্দোবস্ত করা শুজাউদ্দিন থেকে মীর কাশিম পর্যন্ত কোন নবাবের পক্ষে সম্ভব হয় নি। হয়তো তাঁদের সেই প্রবৃত্তি বা সময় ছিল না। তাই তাঁরা নতুন বন্দোবস্ত না করে সেস্ প্রবর্তন করে এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল ভোগ করেন। (স্মরণীয় যে, সেস্-এর এই অতিরিক্ত অর্থ সম্রাটের কাছে পাঠানো হতো না।) কিন্তু জমিদার বা রায়তের দেয় রাজস্ব প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। মোরল্যান্ড বলেন : "যদিও মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর দাবিকৃত রাজস্বের কোন পরিবর্তন হয় নি, বাণিজ্যবৃদ্ধির সুফল তাদের একা ভোগ করতে দেয়া হয় নি। আবওয়াব প্রবর্তন করে রাজস্বদাবি বৃদ্ধি করা হয়, মাঝে মাঝেই নতুন আবওয়াব প্রবর্তন করা হয় এবং ফলে দেশের আর্থিক উন্নতির সুফল নবাব-সরকারের কাজে লাগানো হয়।"[৬৪]

৬৩. *Fifth Report*, Vol II. 239. এই সেসগুলির ব্যাখ্যা জেমস গ্রান্ট দিয়েছেন সুতরাং পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

৬৪. Moreland. *Agrarian System*, 199-200

মুগল আমলে ব্যাঙ্কিং

কে. এম. মহসীন*

মুগল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে তীর্থযাত্রী, পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের নিরাপদে যাতায়াতের সুবিধা হয় এবং শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নতি ঘটে। বাংলার ক্রমসম্প্রসারণশীল রপ্তানিবাণিজ্য ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে টাকা-পয়সা লেনদেনের চাহিদাবৃদ্ধি ব্যাঙ্কব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।[১] ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ব্যবসায়ীরা রাস্তাঘাটে ডাকাতি এবং ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি এড়িয়ে নিরাপদে ব্যাপকভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করতে পারতো। আঠারো শতকের এই সব ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও দেশের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে ব্যাঙ্কারদের ভূমিকা আলোচনা করাই এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।[২]

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. শাসক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা, স্থানীয়ভাবে কাঁচামাল ও কারিগরি দক্ষতা প্রাপ্তি এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারের ফলে বাংলায় বস্ত্রশিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদসহ বাংলার বিভিন্ন স্থান উপমহাদেশীয় এবং বিদেশী ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুর্শিদাবাদের ব্যাঙ্ক সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল স্থানীয় পরিবার, বিশেষকরে জগৎশেঠ পরিবারের প্রভাব। বিস্তারিত আলোচনার জন্য ১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত ঢাকা যাদুঘর বার্ষিক সম্মেলনে এম. এ. রহিম কর্তৃক পঠিত 'Banking in Muslim India' (প্রকাশিত), ১৯৭৩ সালে ভারতীয় ইতিহাস সম্মেলনে Gautam Bhadra পঠিত 'Some aspects of the social position and functions of Merchants at Murshidabad, (1765-93)' শীর্ষক প্রবন্ধ (অপ্রকাশিত) এবং K.M. Mohsin-এর *A Bengal District in Transition. Murshidabad 1765-1793* (Dhaka 1973) দ্রষ্টব্য।

২. বর্তমান প্রবন্ধের জন্য লেখকের *A Bengal District in Transition : Murshidabad 1765-1793* গ্রন্থ থেকে অবাধে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত এবং আব্বাসীয় যুগে আরবদের প্রবর্তিত ব্যাঙ্কব্যবস্থার সমন্বয়েই বাংলার ব্যাঙ্কব্যবস্থা গড়ে উঠে। এ থেকে অনুমিত হয় যে, মুসলিম ব্যবসায়ীরা বাগদাদ থেকে তাদের ব্যাঙ্কব্যবস্থার ধারণা ও ঐতিহ্য এদেশে প্রচলন করে।[৩]

ব্যাপক ও সুসংগঠিতভাবে না হলেও প্রাচীন ভারতে ব্যাঙ্কব্যবস্থার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা বর্তমান ছিল। সে সময়ের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা সাধারণত ঋণদাতা, পোদ্দার, মহাজন এবং দোকানদার হিসেবেই পরিচিত ছিল। গুপ্ত লিপিতে বর্ণিত আছে, গিল্ড অথবা ব্যবসায়ী সমিতির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হতো।[৪]

মুসলিম আমলে স্থানীয় ব্যাঙ্কাররা শাসকদের আর্থিক অসুবিধার সময় টাকা ধার দিত। দেশের ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছু নগদ, কিছু বিলের মাধ্যমে এই সব ব্যাঙ্কার টাকা আদান-প্রদান করতো। এসব আদান-প্রদান পদ্ধতি সাধারণত হুন্ডি নামে পরিচিত ছিল। হুন্ডি দূরবর্তী স্থানের ব্যবসায়ীদের টাকা প্রদান এবং গ্রহীতা কর্তৃক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা স্থানান্তরে সহায়ক ছিল। এরকম নগদ লেনদেনের জন্য ব্যাঙ্কাররা গ্রাহকের কাছ থেকে বেশ উচ্চহারে কমিশন আদায় করতো।[৫]

এসব ব্যাঙ্কার সচরাচর নিজস্ব মূলধন খাটিয়েই ব্যবসা করতো। সেকালের অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থায় জনগণ সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্কারদের কাছে জমা রাখতে আগ্রহী হতো না, কারণ ব্যাঙ্কাররাই সাধারণত রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার প্রধান শিকার হতো। ১৭৪২ সালে মারাঠা নেতা মীর হাবিব মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে সবচেয়ে ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যাঙ্কার জগৎশেঠের বাসভবন থেকে তিন লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করেন।[৬] বিশ বছর পর নবাব মীর কাশিম অতীতের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে শেঠদের প্রভাব লক্ষ্য করে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হন। তিনি শেঠ পরিবারের দু'জন প্রধান সদস্যকে মুঙ্গেরে আনেন এবং সেখানে তাদের প্রাণদণ্ড দেন।[৭]

---

৩. M. Rashid Akhtar Nadvi, 'Industry and Commerce Under the Abbasids' in *Journal of the Pakistan Historical Society*, I: iii (1953). 260-61.

৪. Quoted in Mohsin, *Murshidabad*, 112.

৫. এম. এ. রহিম, পূর্বোক্ত, 8। ইংরেজ কোম্পানির রেকর্ডপত্রে দেশীয় ব্যাঙ্কারদের প্রদত্ত এ ধরনের হুন্ডি বা Bill of Exchange-এর উল্লেখ আছে। K.N. Chaudhury, *The East India Company*, (London 1965), 121-22.

৬. Ghulam Husain Tabatabai, *Siyar-ul-Mutakherin*.Tr. by Haji Mostafa Vol. II, (Calcutta 1926), 457-58

৭. ঐ, 455.

অর্থনীতিতে টাকার ব্যবহারেই বোঝা যায় এ সময়ে ব্যাঙ্কব্যবস্থা কোন পর্যায়ে ছিল। নগদ টাকায় ভূমিরাজস্ব এবং অন্যান্য শুল্ক সংগ্রহের অর্থ হচ্ছে, গ্রামসমূহকেও মুদ্রাব্যবস্থার আওতাধীনে আনা হয়েছিল।[৮] 'সারাফ' নামে অভিহিত টাকা বিনিয়োগকারী প্রতিটি শহরের, এমনকি গ্রামের বাজারেও মুদ্রা বিনিময়ের কাজে নিয়োজিত থাকতো। টাকা বিনিময় ও সরবরাহের ক্ষেত্রে এসব সারাফ ছিল খুবই প্রভাবশালী।[৯] আঠারো শতকে বাংলার প্রায় সর্বত্র লেনদেনের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী শেঠ, সারাফ, মহাজন ও পোদ্দারদের হাতে টাকা আদান-প্রদান কেন্দ্রীভূত ছিল। শেঠ এবং সারাফরা ছিল ব্যাঙ্কের মালিক। টাকা বিনিময়কারী হিসেবেও তারা পরিচিত ছিল। মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার মানিকচাঁদকে শেঠ উপাধি প্রদান করা হলে অন্যান্য অর্থ লেনদেনকারী সারাফদের থেকে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং জগৎশেঠ পরিবারের এ নেতৃত্ব বহুদিন পর্যন্ত বহাল ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলার মুদ্রাব্যবস্থার উপর তাদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, তখন জগৎশেঠের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের ব্যাঙ্কাররা শহরের টাঁকশাল পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য গভর্নর জেনারেলের কাছে আবেদন জানিয়েছিল।[১০] বস্তুত সে সময়ের জটিল মুদ্রাব্যবস্থার জন্য অর্থনৈতিক লেনদেনে সারাফদের বিশেষ ভূমিকা অনেকখানি দায়ী ছিল।

মুগল টাঁকশালে জনসাধারণ অল্পখরচে তাদের সোনা-রূপা মুদ্রায় রূপান্তরিত করতে পারতো। মুদ্রার মান ঐ মুদ্রার ধাতুর পরিমাণ ও ওজনের উপর নির্ভর করতো। সুতরাং আদান-প্রদানের সময় কেবল মুদ্রা জাল কিনা যাচাই করা ছাড়াও এর ওজন ঠিক আছে কিনা তাও পরীক্ষা করা হতো।[১১]

মুদ্রা পরীক্ষা করা তাই সারাফদের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল। মুদ্রার খাদ, ওজন এবং মুদ্রণের সময় নিরূপণ করার ব্যাপারে তারা ছিল দক্ষ। বস্তুত সারাফদের অভিজ্ঞতা ও কাজের উপর মুগল টাঁকশালের সাফল্য নির্ভর করতো, কেননা সারাফরাই মুদ্রার

৮. Irfan Habib, *Banking in Mughal India in Contributions to Indian Economic History*, edited by Tapan Ray Chaudhuri, (Calcutta 1960), Vol. 2.

৯. J.B. Tavernier, *Travels in India*, (edited by W. Crook), Vl. 1,4. See also Mohsin, *Murshidabad*, 114.

১০. *Bengal Public Consultations*, Range 3, Vol. 9. 25 December 1784 and 24 January 1785.

১১. "The longer time that a rupee of silver has been coined the less is it worth than those coined at the time or which have been coined a short time, because the old ones having often passed by hand, it wears them and they are in consequence lighter"—quoted in J.C. Sinha, *Economic Annals of Bengal*, 65.

বিশুদ্ধতার মান নির্ণয় করতো। তারা মুদ্রা নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে অচল মুদ্রা বাজার থেকে তুলে নেয়ার ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করতো।[১২]

সারাফরা এই ব্যবসা থেকে প্রচুর লাভ করতো। যেহেতু টাকার আসল মূল্য সব সময়ই পরিবর্তিত হতো, সেহেতু সারাফদের পক্ষে ইচ্ছামত কমিশন/বাটা ধার্য করাও স্বাভাবিক ছিল। এ ব্যাপারে তাদের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না বা এ থেকে অর্থাগমও হতো না। ফিলিপ ফ্রান্সিস ১৭৭৫ সালে এ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, ধনী লোকেরা এটা মোটেও অনুভব করতো না যে, দক্ষ লোকেরা অতিরিক্ত বাটা আরোপে বাধা দিতে পারতো; কিন্তু জনসাধারণ, যাদের অধিকাংশই ছিল অনভিজ্ঞ তারা কোন প্রতিকার ছাড়াই আরোপিত কমিশন দিতে বাধ্য হতো এবং অনেক সময় সারাফরা তাদেরকে প্রতারিত করতেও দ্বিধা করতো না।[১৩]

যদিও যেকোন ব্যক্তির জন্য টাঁকশাল ব্যবহারে কোন বাধা ছিল না, তথাপি সারাফরাই টাঁকশালের যাবতীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করতো। সারাফরা পুরনো ও খাদ- মেশানো মুদ্রা আবার নতুন করে তৈরি করার জন্য টাঁকশালে নিয়ে আসতো এবং একই উদ্দেশ্যে তারা নিজেরা পুরনো মুদ্রাও কিনতো।[১৪] সরকারের রাজস্বসংগ্রাহক, টাকা বিনিময় ও সরবরাহকারী হিসেবে প্রভাবশালী এবং সম্পদশালী ব্যাঙ্কারদের নিয়োগ করার রীতিও ছিল। জগৎশেঠ পরিবারের ইতিহাসে দেখা যায়, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই ব্যাঙ্কারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[১৫] দেশের বিভিন্ন স্থানে টাঁকশাল থাকায় এবং সেসব টাঁকশাল থেকে মুদ্রিত বিভিন্ন মানের মুদ্রা বাজারে চালু থাকায় দেশীয় ব্যাঙ্কারদের ব্যবসা বেশ লাভজনক হয়ে উঠে। ব্যাঙ্কারদের কার্যাবলীর সঙ্গে তৎকালীন মুদ্রাব্যবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকায় এই মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন।

---

১২. Irfan Habib, 'Banking', 3. ১৭৭৫ সালে বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস সারাফদের কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং কোন বিকল্প মুদ্রাব্যবস্থা চালু না করা পর্যন্ত সারাফদের কার্যকারিতা অক্ষুণ্ণ রাখার সুপারিশ করেন। *Murshidabad Factory Record* Vol. XII, 4 October, 1776

১৩. *Home Miscellaneous Series* , Vol. 125, (Francis Minute, 13 March 1775), 429-62. আরো দেখুন, Harry Verelst, *View of the Rise, Progress and Present State of the English Government in Bengal*, (London 1772), 84-95.

১৪. Irfan Habib, "Banking", 4 (note 20).

১৫. H. Sinha, *Early European Banking in India*, (London 1927), 1. জগৎশেঠ গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের জন্য দেখুন, J. H. little, 'House of Jagat Seth' In *Bengal Past and Present*, XX and XXII (1920-1924), W. W. Hunter, *Statistical Account of Bengal*, Vol. IX, 252-65; A.Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, (Dacca 1963), 97.

আঠারো শতকের প্রারম্ভে সুবা বাংলায় ঢাকা, পাটনা ও রাজমহলে তিনটি টাঁকশাল ছিল। ১৭০৫ সালে মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক মুর্শিদাবাদে টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাজমহল টাঁকশালের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।[১৬] মুর্শিদকুলী খানের সময় ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল থেকে মুদ্রা তৈরি হতো। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে সন্ধির ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় মুদ্রা তৈরি করার অধিকার লাভ করে। আঠারো শতকের শেষদিকে এদেশে ইংরেজ শাসন সুদৃঢ় হওয়ার পর থেকে কলকাতা টাঁকশাল পুরোপুরি কাজ করতে থাকে।

ব্যাপক লেনদেনের জন্য যে মুদ্রা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হতো, তা ছিল রৌপ্য- মুদ্রা, যা সিক্কা টাকা নামে পরিচিত ছিল। স্বর্ণমুদ্রা ছিল শখের মুদ্রা। এগুলো সম্রাট অথবা উচ্চপদস্থ অফিসারদের উপহার অথবা কর প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হতো। ছোটখাটো লেনদেনের জন্য বাংলার জনগণ কড়ি ব্যবহার করতো। মাঝে মাঝে এই কড়ি সরকারের রাজস্ব প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হতো। উদাহরণস্বরূপ, ১৭৯১ সালের শেষদিকে সিলেট জেলার রাজস্ব কড়িতে প্রদান করা হয়।[১৭] পর্যটক এবং সমসাময়িক লেখকরা মফস্বলে কড়ির বহুল প্রচলনের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৭৭০ সালে ডাচ পর্যটক স্টাভোরিনাস দৈনন্দিন কাজকারবারে কড়ির ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেন।[১৮] সাধারণ শ্রমিক তাদের পারিশ্রমিক কড়িতে গ্রহণ করতো। পোদ্দাররা শহরের একটি বড় হাটে সাধারণত এক অথবা একের বেশি কড়ির দোকান স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করে থাকতো।

---

১৬. Mohsin, *Murshidabad*, 118.

১৭. চারটি কড়িতে ১ গণ্ডা এবং আশি কড়িতে ১ পণ ধরা হতো এবং ৮০ পণ অথবা ৫০০০ কড়ি ১ টাকার সমান ছিল। (দ্রষ্টব্য, W. Harmilton, *Geographical, Statistical and Historical Description of Hindostan*, Vol. 1, 40-41. সিলেট জেলায় কড়িতে রাজস্ব প্রদানের কারণ ব্যাখ্যা করে ১৭৬৯ সালে নায়েব দীউয়ান রেজা খান বলেছেন : পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় এ অঞ্চল দরিদ্র ছিল এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা প্রয়োজন অনুযায়ী রূপা আমদানি করতে পারতো না। তাই জনসাধারণ বাধ্য হয়ে তাদের উৎপন্ন ফসল স্থানীয় বাজারে কড়ির বদলে বিক্রি করে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র কিনতো এবং বাধ্য হয়ে কড়ির মাধ্যমেই তাদের রাজস্ব প্রদান করতে হতো। Quoted from Fort William, *India House Correspondence*, Vol. V, 600.

১৮. J.S. Tavorinus, *Voyages to the East Indies*, (Translated by S. H. Wilcocke), Vol 1, 462. পোদ্দাররা বিভিন্ন হাট-বাজারে খোলা জায়গায় বিপুল পরিমাণ কড়ি নিয়ে বসে থাকতো। সকালে তারা রূপার বিনিময়ে কড়ি বিক্রি করতো এবং সন্ধ্যায় খুচরা ক্রেতা-বিক্রেতারা তাদের কাছ থেকে কড়ির বদলে রূপা গ্রহণ করতো। যখন হাট-বাজার বসতো তখন পোদ্দাররা একটি মুদ্রার সঙ্গে ৫৭৬০ টি কড়ি বিনিময় করতো আবার হাট-বাজার শেষে তারা একটি মুদ্রার বদলে ৫৯২০টি কড়ি গ্রহণ করতো। এভাবে পোদ্দাররা ১৬০টি কড়ি প্রত্যেক মুদ্রার বিনিময়ে লাভ করতো। দেখুন, Hamilton, *Hindostan*, quoted in Mohsin, *Murshidabad*, 119.

মুদ্রার মূল্য এর ধাতুর ওজনের উপর নির্ভর করতো এবং সরকার মুদ্রার প্রকৃত মূল্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকতো, যার ফলে মুদ্রাপদ্ধতি জটিল হয়ে উঠে। 'সিক্কা' টাকা বাংলার হিসাবের টাকা ছিল না, হিসাবের টাকা ছিল 'চলতি' টাকা। এই টাকা ছিল কল্পিত মুদ্রা এবং রৌপ্যমুদ্রায় সকল লেনদেনের হিসাব রাখার জন্য চলতি টাকায় তা সমন্বয় করতে হতো। ১৭৭২ সালে সিক্কা টাকার সাথে চলতি টাকার সম্বন্ধ ছিল নিম্নরূপ : মুদ্রণের প্রথম বছর সিক্কা টাকা চলতি টাকার চেয়ে ১৬ ভাগ উৎকৃষ্ট ধরা হতো, অর্থাৎ ১০০ সিক্কা টাকা ১১৬ চলতি টাকার সমান। দ্বিতীয় বছরে সিক্কা টাকা চলতি টাকার চেয়ে ১৩ ভাগ উৎকৃষ্ট ছিল। অর্থাৎ ১০০ সিক্কা ছিল ১১৩ চলতি টাকার সমান। মুদ্রণের তৃতীয় বছরে সিক্কা 'সানওয়াত' টাকা হিসেবে গণ্য হতো, যার আসল মূল্য চলতি টাকার চেয়ে শতকরা ১১ ভাগ বেশি। মাদ্রাজ, সুরাট ইত্যাদি জায়গায় যেসব মুদ্রা মুদ্রিত হতো তা চলতি টাকার চেয়ে শতকরা দশ ভাগ উৎকৃষ্ট ধরা হতো যদিও ওজন এবং গুণগত মানে তা ছিল সানওয়াত টাকার চেয়ে উৎকৃষ্ট।[১৯]

চলতি টাকাকে প্রামাণ্য টাকায় পরিণত করার কারণ, এটা ছিল কল্পিত। এটিকে খাদমেশানো বা জাল করা যেতো না। প্রত্যেক বছর পুরনো টাকা নতুনভাবে মুদ্রিত করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হতো না। ফলে বিপুল সংখ্যক পুরনো মুদ্রা বাজারে চালু থাকতো। বাটা অথবা ডিসকাউন্টের মাধ্যমে এইসব মুদ্রার সমন্বয় করা হতো এবং এভাবে মুদ্রার প্রকৃত মূল্য বজায় রাখা হতো।

কেবল একটি টাঁকশাল থেকে মুদ্রিত সিক্কা টাকাই যদি সারা দেশব্যাপী চালু থাকতো, তাহলে মুদ্রাব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সহজ হতো। কিন্তু বিভিন্ন টাঁকশালের সরবরাহকৃত মুদ্রা এবং সুরাট ও মাদ্রাজে ইংরেজ কর্তৃক সরবরাহকৃত মুদ্রাও ব্যাপকভাবে বাংলায় প্রচলিত ছিল।[২০] বিভিন্ন টাঁকশালের মুদ্রাগুলি ছিল বিভিন্ন মানের। বিভিন্ন ওজন ও নিখুঁত অবস্থার মুদ্রা এবং একটি নির্দিষ্ট ও অভিন্ন নামে পরিচিত মুদ্রার হ্রাস-বৃদ্ধিরও অভ্যন্তরীণ মূল্য ছিল। প্রাচীন রীতিতে প্রতিষ্ঠিত বহু টাঁকশাল ছিল, যেখানে মুদ্রার নিখুঁত

১৯. James Stewart, *The Principles of Money Applied to the Present State of the Coin of Bengal* (1772), 16; আরো দেখুন, Karim, *Murshid Quli Khan*, 94 and J.C. Sinha, *Economic Annals*, 112-113.

২০. ঢাকা শহরে ১৭৮৭ সালে সাত রকমের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। দ্রষ্টব্য, Sirajul Islam, "Social Life in Dhaka, 1763-1800", Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future* (Dhaka 1991), 80. আরো দেখুন, S. Islam (ed.) *Bangladesh District Records: Dacca District*, Vol. 1, 1784-87 418-419.

অবস্থা এবং ওজন সংক্রান্ত নিয়ম ছিল ভিন্নতর, যদিও তাদের নাম অভিন্ন ছিল।[২১] বিভিন্ন প্রদেশের টাকা বা মুদ্রা বিভিন্ন প্রকারের মূল্যে প্রচলিত ছিল। মুর্শিদাবাদ এবং পাটনার সিক্কা টাকার মানেরও পার্থক্য ছিল। বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন টাঁকশাল থেকে তৈরি এ ধরনের বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা থাকার ফলেই মুদ্রাপদ্ধতির জটিলতা এবং জনসাধারণের ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়। এতে এক শ্রেণীর লোক অথবা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়, যারা মুদ্রাবিশেষজ্ঞ হয়ে উঠে এবং বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রায় অর্থগ্রহণ এবং এক প্রকারের মুদ্রার সাথে অন্য প্রকারের মুদ্রার বিনিময় করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ।

প্রকৃত চালু টাকা এবং চলতি টাকার মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল তাতে দু'টি মুদ্রার মাঝে ডিসকাউন্টের হার নিরূপণ করার ক্ষমতা ছিল একমাত্র সারাফদের। যখন কিছু মুদ্রা কোন সারাফের কাছে আনা হয়, তখন সে পৃথক পৃথকভাবে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখে এবং ঐসব মুদ্রার নিখুঁত অবস্থা ও ওজন অনুসারে সেগুলিকে বিন্যস্ত করে, তারপর সিক্কা এবং সানওয়াতের উপর বিভিন্ন আইনগত বাটা ধার্য করে এবং এরপর চলতি টাকার সাহায্যে সেগুলির মূল্য নির্ধারণ করে।[২২]

এই পদ্ধতিতে মুদ্রার মান নিশ্চিত করা হলেও জনগণের কাছে এটি অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল। জেমস স্টুয়ার্ট বলেন, "কোন ব্যক্তি সারাফের কাছে না যাওয়া পর্যন্ত তার নিজস্ব মুদ্রার মান বলতে পারতো না।" মুগল সুবাদার মুদ্রানিয়ন্ত্রণ করতে চাইতেন না। মুর্শিদকুলী খানের সময় বাংলার মুদ্রাব্যবস্থার উপর শেঠদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। মুর্শিদকুলী খান শেঠদের সরকারি টাঁকশালে মুদ্রা তৈরি করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[২৩] এর ফলে সরকার মুদ্রার উপর তার নিয়ন্ত্রণ হারায়। শেঠদের সাথে সরকারের এই মৌন সহযোগিতা সম্পূর্ণ অবিবেচনাপ্রসূত ছিল। এর ফলে শেঠরা নিজেদের প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের এই কর্তৃত্ব নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও বিস্তারলাভ করে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুদ্রাপদ্ধতির উপর এইসব ব্যাঙ্কারের প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত ছিল এবং বাংলায় তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্থায়ী এবং একই ধরনের মুদ্রা প্রচলনের একটি প্রয়াস চালায়। ১৭৬৫ সালে কোর্ট অব ডিরেক্টরস আদেশ দেন যে, বাংলায়

২১. James Stewart, *The Principles of Money Applied to the Present Sate of the Coin of Bengal (1772)*, 17. ১৭৭৬ সালে টাকা ক্রয় এবং টাকার অংশ লাভের উপর সরাফদের আদায়কৃত বাটা অথবা ডিসকাউন্টের হার জানার জন্য দেখুন, *Murshidabad Factory Records*, Vol. 12, 4 October, 1776.

২২. James Stewart, *Coin of Bengal*, 24; See also Hunter, *Annals of Rural Bengal*, 300.

২৩. S. Bhattacharya, *The East India Company and the Economy of Bengal*, 107.

প্রচলিত সকল প্রকারের মুদ্রা পুনর্বার তৈরি ও সিক্কা টাকার উপর বার্ষিক ডিসকাউন্ট বন্ধ করার মাধ্যমে সিক্কাকে মানসম্পন্ন করে তৈরি করতে হবে। কলকাতা টাঁকশালের অধ্যক্ষ আলেকজান্ডার ক্যাম্পবেল এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। তিনি যুক্তি দেন যে, সারাফরা নতুন সিক্কা পরিমাপে ব্যর্থ হবেন এবং এভাবে বাজারে এসব মুদ্রার কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি হবে।[২৪] মুহম্মদ রেজা খান এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, কারণ তিনি মনে করেন, দেশীয় ব্যাঙ্কাররা এতে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি প্রস্তাব দেন যে, প্রদেশের চারটি টাঁকশালে একই ওজন ও মানের মুদ্রা তৈরি করা যেতে পারে।[২৫] কাউন্সিলের কিছু সদস্যের বিরোধিতা সত্ত্বেও কোর্ট অব ডিরেক্টরস ১৭৭১ সালে সানওয়াত টাকার উপর বাটা উচ্ছেদের জন্য পূর্ববর্তী আদেশ পুনরায় ঘোষণা করে।

ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল ঘোষণা করে যে, সম্রাট শাহ আলমের রাজত্বকালের অর্থাৎ ১৭৭১ সালের দ্বাদশ বছর থেকে কোম্পানির টাঁকশালে সিক্কা টাকা তৈরি করা হবে এবং এই সকল সিক্কা টাকা ১৬ শতাংশ বাটায় আদান-প্রদান করা হবে। প্রবিধানে আরো ঘোষণা করা হয় যে, নতুন সিক্কাগুলি একাদশ সালের সিক্কাকে মূল্যমান হ্রাসে বাধ্য করবে না। অর্থাৎ যে সিক্কাগুলি ১৭৭০ সালে তৈরি হয়েছিল সেগুলি টাঁকশাল থেকে আসার সময় প্রথমে তাদের যে মান ছিল তা অক্ষুণ্ন থাকবে এবং সেহেতু পরবর্তী বছরগুলোতে যেসব সিক্কা প্রচলন করা হয়েছিল সেগুলি তাদের পূর্ণমান রক্ষা করবে, যার মাধ্যমে সিক্কা টাকার উপর তাদের সানওয়াত সময়কালের আগে প্রতিষ্ঠিত ক্রমমূল্যহ্রাসকরণের বিধান বিলোপ করা যায়।[২৬] এই প্রবিধানের উদ্দেশ্য ছিল সিক্কা টাকাকে ধার্য করে দেওয়া এবং সিক্কা টাকার একটি অভিন্ন মান অর্জন করা। কিন্তু সে সময়ে বিভিন্ন টাঁকশাল থেকে প্রচলিত মুদ্রার নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত মান বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। তাই ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭৩ সালের শেষদিকে ঢাকা ও পাটনার টাঁকশালগুলো বন্ধ করে দেন। এর মধ্যে স্যার জেমস স্টুয়ার্টের প্রস্তাবনা তাঁর বইয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন প্রকারের টাকা প্রচলিত থাকায় এবং একই টাকা সকল দ্রব্যের জন্য যেকোন জেলায় ব্যবহার করা সম্ভব না হওয়ায় সিক্কা টাকা স্থায়ী করার ব্যবস্থা হিসেবে প্রচুর মুদ্রা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[২৭]

---

২৪. J. C. Sinha, *Economic Annals*, 117; আরো দেখুন, Mohsin, *Murshidabad*, 123-124.

২৫. *Murshidabad Factory Records*, Vol. 3, 330, (May, 1771).

২৬. *Bengal Public Consultation*, 26 August 1771.

২৭. বিষয়টি চূড়ান্তভাবে স্থির করার আগে গভর্নর জেনারেল সিক্কা টাকার সর্বজনীন প্রতিষ্ঠা থেকে যে সুযোগ-সুবিধা আশা করা যেতে পারে সে ব্যাপারে প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলোর মতামত চেয়ে পাঠান। প্রাদেশিক কাউন্সিল সিক্কা টাকা স্থায়ী করার ব্যবস্থা হিসেবে প্রচুর মুদ্রা তৈরি করার সিদ্ধান্তটি সরকার ও জনসাধারণের উপকারে আসবে চিন্তা করে সমর্থন জানান। দেখুন, J. C. Sinha, *Economic Annals*, 136 and Mohsin, *Murshidabad*, 124-125.

অতএব, হেস্টিংস সরকার ১৭৭৭ সালের মে মাসে একটি প্রবিধানের দ্বারা ঘোষণা করে যে, কেবল কলকাতার টাঁকশালে প্রদেশে ব্যবহারের জন্য মুদ্রা তৈরি করার অনুমতি দেওয়া হবে। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ভবিষ্যতে যে সিক্কা টাকা তৈরি করা হবে সেগুলি ছাড়া প্রাদেশিক কাউন্সিল ও কালেক্টরগণ তাদের ট্রেজারি থেকে সকল টাকা কলকাতায় প্রেরণ করবেন। টাঁকশালে স্বর্ণ আনার জন্য লোকদেরকে উৎসাহপ্রদান করার উদ্দেশ্যে পুনর্মুদ্রণের জন্য আড়াই শতাংশ শুল্ক ধার্য করা হয়।[২৮]

বাংলায় এধরনের মুদ্রা প্রবর্তনে এটি ছিল প্রথম প্রচেষ্টা। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। সরকার মুদ্রা তৈরিতে অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য অত্যন্ত শঙ্কিত ছিল। অন্যদিকে টাঁকশালের খরচ হিসেবে মুদ্রিত মুদ্রার একটি নির্দিষ্ট অংশ টাঁকশালের অফিসারদের দেওয়া হতো এবং দূরের জেলাগুলি থেকে পুরনো মুদ্রা কলকাতায় আনার ব্যাপারে পরিবহনখরচ, পথের ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয়ও এতে জড়িত ছিল। ফলে প্রদেশে সিক্কা টাকার যথেষ্ট পরিমাণ সরবরাহ দেখা যায় নি। পরে চালু অবস্থা থেকে পুরনো এবং খাদযুক্ত মুদ্রাগুলি তুলে নেওয়ার বিষয়টি একটি বিরাট সমস্যারূপে কর্নওয়ালিস সরকারের নীতির অন্তর্ভুক্ত হয়। পনেরো বছরের কিছু সময় পরে বিভিন্ন শহরের কালেক্টরগণ মুদ্রাব্যবস্থার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন, প্রদেশের প্রায় প্রতিটি শহর এবং পরগনায় বিভিন্ন বছরের এবং মূল্যের ১১, ১২ অথবা ১৫ সানওয়াত টাকা মূল্যমানের প্রধানত পুরনো আমলের একটি আলাদা সিক্কা মুদ্রা চালু ছিল। ঢাকা, পাটনা এবং মুর্শিদাবাদে প্রতিষ্ঠিত টাঁকশালে কিছু মুদ্রা তৈরি হতো এবং অন্যগুলি ব্যক্তিগতভাবে গোপনে তৈরি হতো।[২৯]

কর্নওয়ালিস সিক্কা টাকা থেকে উদ্ভূত অসুবিধাগুলি দূরীকরণে পরবর্তী সময়ে জোর প্রয়াস চালান এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা, পাটনা এবং মুর্শিদাবাদের টাঁকশালগুলি পুনরায় চালু করার নির্দেশ দেন।[৩০] দেশের এ মুদ্রাসঙ্কটের সময় ব্যাঙ্কার ও সারাফরা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুদ্রাব্যবস্থার এই জটিলতার সুযোগে তারা প্রদেশের মুদ্রা সরবরাহ যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়।

২৮. *Murshidabad Factory Records*, Vol. 6, 20 March 1772.

২৯. J. C. Sinha, *Economic Annals*, 142 and N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, Vol. 1, 124-127.

৩০. ১৭৯২ সালের দিকে এসব টাঁকশাল পুনরায় চালু করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তবে অল্পকাল পরই একে একে এ টাঁকশালগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়—মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল ১৭৯৫ সালে, পাটনা টাকশাল ৩১ ডিসেম্বর, ১৭৯৬, ঢাকা টাকশাল ৩১ জানুয়ারি ১৭৯৭ বন্ধ করা হয়। E. Thurston, "Note on the History of the East India Company's Coinage from 1753-1835," in The *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, LXII: I (1893), 54, 59-60.

এই সময়ের মুদ্রাব্যবস্থার অদ্ভুত অবস্থার সাথে সারাফদের কাজও ছিল বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। তবে সারাফদের এইসব কাজ পরবর্তীকালে আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থা গড়ে উঠার পর আর লক্ষ্য করা যায় নি।

মুদ্রাবিনিময় অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ব্যাঙ্কব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকায় মুদ্রা পরীক্ষা ও বিনিময় করা ছাড়াও দেশীয় ব্যাঙ্কাররা হুন্ডির মাধ্যমে টাকাপয়সা আদান-প্রদান করতো। সুতরাং সারাফদের দ্বিতীয় কাজ ছিল হুন্ডির ব্যবসা। হুন্ডি অথবা ব্যাঙ্কারদের ড্রাফট এবং বিনিময়পত্রের বহুল প্রচলন ছিল। হুন্ডিপদ্ধতি প্রচলনের ফলে দূরবর্তী স্থানে মুদ্রা বহন করে নিয়ে যাওয়ার কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কারণ তৎকালীন পরিবহন ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রাবহন বিপজ্জনক ও ব্যয়বহুল ছিল। ইংরেজদের দলিলপত্র থেকে জানা যায় যে, ১৭২৮ সাল থেকে জগৎশেঠ ব্যাঙ্কপরিবার মুর্শিদাবাদ থেকে দিল্লীতে হুন্ডি অথবা বিনিময়পত্রের মাধ্যমে বাংলার রাজস্ব প্রেরণের ব্যবস্থা করে।[৩১]

ঢাকা থেকে দিল্লী পর্যন্ত উত্তর ভারতের সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরে জগৎশেঠ পরিবারের বহু শাখাপ্রতিষ্ঠান ছিল। এই পরিবার বিভিন্ন শাখা থেকে টাকা তোলার জন্য বিনিময়পত্র প্রদান করতো। জগৎশেঠ পরিবার এর ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠানের সকল শাখা, দালাল এবং বার্তাবাহকদের মাধ্যমে বিস্তৃত একটি বিলিব্যবস্থার কাঠামো গড়ে তোলে। সমগ্র উপমহাদেশে তাদের সমকক্ষ কোন ব্যাঙ্কার অথবা ধনী ব্যবসায়ী ছিল না। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলায় তাদের সমসাময়িক অন্যান্য ব্যাঙ্কার, তাদের প্রতিনিধি নতুবা তাঁদের পরিবারের কেউ ছিল।[৩২] ঢাকা এবং ত্রিপুরার রাজস্ব প্রেরণে বিলম্বের জন্য মুর্শিদাবাদ কাউন্সিল ঢাকা কাউন্সিলকে জগৎশেঠ পরিবারের বিনিময়পত্রের মাধ্যমে রাজস্ব প্রেরণের নির্দেশ দেয়। ১৭৭১ ও ১৭৭২ সালে পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, রাজমহল প্রভৃতি স্থানের সুপারভাইজাররা জগৎশেঠ পরিবার থেকে বিনিময়পত্রের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদে রাজস্ব প্রেরণ করেছিল।[৩৩]

দেশী ব্যাঙ্কারদের দ্বারা প্রচলিত সবচেয়ে সাধারণ মুদ্রা বিনিময়পদ্ধতি ছিল হুন্ডি। হুন্ডিকে এভাবে বর্ণনা করা হয় যে এটি একটি লিখিত, সাধারণত শর্তহীন আবেদনপত্র, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের পরে চাওয়ামাত্র এতে উল্লিখিত ব্যক্তির কাছ থেকে নির্দিষ্ট

৩১. N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, 222. আঠারো শতকে হুন্ডি ব্যবসায়ের জন্য দ্রষ্টব্য, Irfan Habib, "Banking", 8-14; A. Rahim, 1-6; L.C. Jain, *Indigenous Banking in India*, (London 1924), 70-83; Mohsin, *Murshidabad*, 128-132.
৩২. *Siyar*, Vol. II, 457-58.
৩৩. *Proceedings of the Council of Revenue*, 1771-1772, quoted in Mohsin, *Murshidabad*, 129.

পরিমাণ টাকা নেওয়া যেতো। এটি ছিল কোন বণিককে প্রদানের জন্য স্বল্পমেয়াদি ঋণপদ্ধতি এবং অন্য যেকোন স্থানে পুনঃপরিশোধযোগ্য। এটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা প্রেরণের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। হুন্ডির কাজ বা ভূমিকা বর্তমানকালে ডাক, মানিঅর্ডার, চেক ও ব্যাঙ্কড্রাফটে রূপান্তরিত হয়েছে। আঠারো শতকে হুন্ডি ব্যবসা খুব জনপ্রিয় ছিল। কেউ টাকা পাঠাতে চাইলে তিনি ব্যাঙ্কারের কাছে টাকা জমা রেখে পরিবর্তে অন্য স্থানের ব্যাঙ্কারের প্রতিনিধির ঠিকানাযুক্ত হুন্ডি গ্রহণ করতেন। বস্তুত এই হুন্ডি হচ্ছে জমাকৃত অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য যিনি হুন্ডি প্রদান করেন তাঁর দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি আদেশপত্র। যদিও এতে অন্য কোনভাবে নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা ছিল না, তবুও একে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা হতো এবং যার নামে হুন্ডি কাটা হতো তাকে যথাসময়ে অর্থ পরিশোধ করা হতো।

আঠারো শতকে এইসব হুন্ডি বা বিনিময়পত্র থেকে ব্যাঙ্কাররা ডিসকাউন্ট বা কমিশন গ্রহণ করতো। টাভার্নিয়ার সুরাটে প্রচলিত বিভিন্ন বিনিময়পত্রের উপর ডিসকাউন্টের হারের একটি তালিকা দেন। তিনি বলেন, এইসব শহরে একজন ব্যবসায়ীর কিছু ক্রয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে স্থানীয় ব্যাঙ্কাররা তাদেরকে চড়া সুদে বিনিময়পত্র দিত। এ ছাড়া অনাদায়ের ঝুঁকিস্বরূপ অতিরিক্ত টাকাও আদায় করা হতো। তবে এ হার সময় এবং অবস্থার নিরিখে বিবেচনা করা হতো।[৩৪]

১৭৮৬ সালে মুর্শিদাবাদ কাস্টমস-এর কালেক্টর বলেন যে, বিনিময়পত্রের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় টাকা প্রেরণ করার জন্য দেশীয় ব্যাঙ্কাররা কোম্পানির কাছ থেকে অর্ধ শতাংশ হারে ডিসকাউন্ট দাবি করে।[৩৫] উনিশ শতকের প্রথমদিকে বুকানন লিখেন যে, জগৎশেঠ পরিবার এদেশের বিভিন্ন স্থানে বিনিময়পত্র সরবরাহ করতো এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কারের সরবরাহ কেবল কলকাতা, পাটনা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ শহরে সীমাবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের বিনিময়হার নির্দিষ্ট ছিল এবং দূরত্ব অনুসারে এ হার নির্ধারিত হতো।[৩৬] ব্যবসা-বাণিজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে, সাধারণভাবে ব্যাঙ্কারদের দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠিত ইনস্যুরেন্সব্যবস্থা দেশে বিদ্যমান ছিল। এ. সি. লায়াল বলেন, আঠারো শতকে ভারতের সর্বত্র একটি উদ্যমী ব্যবসায়িক সম্প্রদায় বিনিময়ব্যবস্থা পরিচালনা করতো।

---

৩৪. *Bengal Revenue Council*, Range 49, Vol. 39, 13 April 1773, quoted in Mohsin, *Murshidabad*, 131-323.

৩৫. *Bengal Board of Revenue Proceedings*, Range 70, Vol. 16, 23 June 1786.

৩৬. Mohsin, *Murshidabad*, 132.

আধুনিককালের মতো জীবনবীমা পদ্ধতি মুগল আমলে বিদ্যমান ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে সাধারণত মালামাল এবং জাহাজ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরের জন্য বীমা করা হতো। জানা যায় যে, পথের নিরাপত্তাহীনতার কারণে ব্যবসায়ীরা তাদের মালামাল, জিনিসপত্র ও অন্যান্য সম্পদ স্থানীয় ব্যাঙ্কে জমা দিত এবং এইসব ব্যাঙ্ক যথাসময়ে মালিকের কাছে মালামাল পৌঁছে দিত।[৩৭] ইংরেজদের আঠারো শতকের রেকর্ডপত্রে ইনস্যুরেন্সের বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবত এই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে জল ও স্থলপথে মালামাল বহন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় সারাফরা নিজেদের অন্য কাজে নিয়োজিত করে।

দেশীয় ব্যাঙ্কারদের পরবর্তী দায়িত্ব ছিল সরকারের সাথে বিভিন্ন আর্থিক বিষয়ে লেনদেন করা। এর প্রধান দিক ছিল রাজস্ব গ্রহণ ও প্রেরণ, রাজস্ব আদায় ও সরকারকে ঋণ প্রদান। জগৎশেঠ পরিবারের সমৃদ্ধির ইতিহাস এবং মুগল সম্রাট কর্তৃক ফতেহ চাঁদকে 'জগৎশেঠ' উপাধি প্রদান থেকে বোঝা যায়, ব্যাঙ্কারদের সাথে শাসকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ফলে সরকারি স্থানীয় কর্মকর্তা এবং জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে রাজধানীতে পাঠানোর দায়িত্বও ব্যাঙ্কারদের হাতে অর্পণ করা হয়।[৩৮]

জগৎশেঠ পরিবার বাংলায় সরকারি রাজস্ব গ্রহণকারী এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করতো। মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে জগৎশেঠ ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ রাজস্বের জামিনদার হিসেবে স্থান করে নেন। জমিদাররাও অনাদায়ী রাজস্ব পরিশোধের জন্য জগৎশেঠের শরণাপন্ন হতেন। জগৎশেঠের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান রাজস্ব গ্রহণ এবং সরকারি লেনদেন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা সিক্কামানে রূপান্তরিত করার জন্য পরীক্ষা, বিন্যস্তকরণ ও ওজন করার অধিকার ভোগ করতো। অর্থবছরের প্রথম দিন 'পুন্যাহ' অনুষ্ঠানে জগৎশেঠ জমিদার-কৃষকদের পূর্ববর্তী বছরের বকেয়া খাজনার জন্য জামিনদার হওয়ার এবং তার পক্ষ থেকে সরকারকে সমস্ত পাওনা পরিশোধ করার অঙ্গীকারপত্র প্রদান করতেন। এজন্য জমিদারদের কাছ থেকে তিনি শতকরা দশ ভাগ কমিশন লাভ করতেন। এ পদ্ধতিতে সরকারের সুবিধা ছিল এই যে, অনাদায়ী খাজনার জন্য তাদের আর কোন মাথাব্যথা ছিল না। ১৭৭৩ থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন শহরের জমিদার ও কৃষকদের বিপুল অনাদায়ী খাজনা এমন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিশোধ করা হতো। এতে জমিদাররাও তাদের সুবিধামতো রাজস্ব পরিশোধ করতে সক্ষম হতো।

যেকোন ধরনের রাজস্বসংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে আর্থিক দিক দিয়ে বাংলার ব্যাঙ্কগুলির যথেষ্ট সামর্থ্য ছিল এবং সরকারকে ঋণ প্রদান করার ব্যাপারে এগুলো বেশ নির্ভরশীল ছিল। এসব ঋণ ছিল উপায়-উপকরণের সংস্থান অথবা সামরিক অভিযান অথবা ঝুঁকির

---

৩৭. Irfan Habib, "Banking", 15-16.
৩৮. Mohsin, *Murshidabad*, 134.

ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদি অর্থযোগান সম্পর্কিত। সরকারকে ঋণ প্রদান করার বদৌলতে এসব ব্যাঙ্ক বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করতো এবং কোন কোন এলাকায় রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা অর্জন করতো। এই বিশেষ সুবিধার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সুবিধাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জগৎশেঠ পরিবার তাদের ব্যবসার জন্য মাত্র ৫ শতাংশ শুল্ক প্রদান করতো এবং শুল্ক অফিসে তাদের মালামাল পরীক্ষা করা হতো না।[৩৯] ১৭৭৩ সালে সম্রাট শাহ্ আলম এই মর্মে মুহম্মদ রেজা খানকে চিঠি লিখেন যে, তিনি যেন জগৎশেঠকে দিল্লীতে পুনরায় ব্যাঙ্ক ব্যবসা চালু করার জন্য প্রভাবিত করেন। সম্রাট প্রতিজ্ঞা করেন, এ ব্যাপারে সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে।[৪০] সরকারের অর্থব্যবস্থার সাথে জড়িত নয় এমন ব্যাঙ্কপরিবার ও বণিকদেরকে সরকার সব সময় ঋণ প্রদানের অনুরোধ জানাতো। ১৭৮৯ সালে মুর্শিদাবাদের কালেক্টর বোর্ড অব রেভিনিউকে জানান যে, ১৭৮৮ সালের রাজস্ব প্রদানের জন্য তিনি মুর্শিদাবাদের ব্যাঙ্কারদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত পরিমাণ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন[৪১]:

গোপাল দাস	-	১৭,৪৮৪	টাকা
জগৎশেঠ	-	১০,০০০	”
কিশোরী মোহন	-	৪,৮৪৯	”
জগবন্ধু রায়	-	৩, ৯৯৬	”
বাহাদুর সিংহ	-	১, ৯৯৯	”
বিজয়রাম রায়	-	১,৮৯৬	”
কাশীনাথ	-	৯৯৮	”
মোট	-	৪১, ২২২	টাকা

ইংরেজ কোম্পানির রেকর্ডপত্র থেকে জানা যায় যে, জগৎশেঠ পলাশী যুদ্ধের পর মীর জাফরকে তাঁর প্রতিশ্রুত অর্থ ইংরেজদের প্রদানের সুবিধার্থে এবং অন্যান্য ব্যয় বহনের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিলেন।[৪২]

৩৯. *Board of Revenue Misc. Proceedings*, R. 98. Vol. 4, 21 April 1773.

৪০. ঐ, 12 February to 13 September 1773, quoted in Mohsin, *Murshidabad*, 135.

৪১. *Bengal Revenue Consultations*, R. 51, Vol. 37, 6 June 1789.

৪২. হিসাব অনুসারে জগৎশেঠ ১৭৬৬ সালে নবাবের কাছে ২১ লাখ টাকা দাবি করেন। এ ব্যাপারে কোম্পানি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, উক্ত টাকার অর্ধেক অর্থাৎ দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দশ বছরের মধ্যে ১ লাখ ৫ হাজার টাকা বাৎসরিক কিস্তিতে নবাবের ভাতা থেকে পরিশোধ করা হবে। কিন্তু নবাব ১৫ বছরেও তাঁর ঋণ পরিশোধ করতে অসমর্থ হন। ১৭৯০ সালে জগৎশেঠ গভর্নর জেনারেলকে জানান যে, নবাব তার কাছে ঋণী। *Bengal Public Consultation*, R.3 Vol. 51, 29 March 1790.

সরকারি ঋণের সুদের পরিমাণের সঠিক হার বলা সম্ভব নয়। কিন্তু বলা হয়, এই হার জমিদারদের সাথে ব্যাঙ্কারদের আরোপকৃত হারের চেয়ে কম ছিল। আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকে তারা জমিদারদের উপর বছরে দশ থেকে বারো শতাংশ সুদের হার ধার্য করেছে।[৪৩]

এইসব ব্যাঙ্ক পরিবার সরকারের সাথে তাদের অর্থনৈতিক লেনদেন ছাড়াও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদান করতো। বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য ইউরোপীয় বণিকরা স্থানীয় বণিকদের কাছ থেকে টাকা ঋণ নিত। ইংরেজ বণিকদের নথিপত্রে জগৎশেঠ পরিবারকে তাদের মূলধনের স্থানীয় উৎস হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে।[৪৪]

প্রদেশব্যাপী তাদের ব্যবসা বিস্তৃত হওয়ায় এ সম্পর্কে কোন সঠিক বা বিস্তারিত তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। যাহোক, প্রকৃতপক্ষে ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে সরকার, জমিদার ও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর সাথে আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি গুটিকয়েক ব্যাঙ্কপরিবারের মধ্যে, বিশেষকরে জগৎশেঠ পরিবার এবং পরবর্তী সময়ে মনোহর দাস ও গোপাল দাস পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে নিম্ন পর্যায়ে বহু ব্যাঙ্ক ছিল, যাদের ব্যবসা প্রদেশের সব এলাকায় বিস্তৃত ছিল।[৪৫] বুকাননের ভাষ্য অনুযায়ী উনিশ শতকের প্রারম্ভে 'কুঠিওয়ালা' বলে অভিহিত মুর্শিদাবাদের সাতজন ধনী ব্যাঙ্কার তাদের প্রতিনিধি এবং গ্রামীণ ঋণদাতাদের মাধ্যমে গ্রামের কারিগর ও সাধারণ লোকদের ঋণ প্রদান করতো। এই ব্যাঙ্কাররা সীমিতভাবে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা করতো। তবে তাদের প্রধান ব্যবসা ছিল টাকার লেনদেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিভিন্ন গ্রহীতার জন্য টাকার যোগানদানকারী দেশী প্রতিষ্ঠানসমূহ শহরের ধনী ব্যাঙ্কার থেকে শুরু করে কারিগরদেরকে ক্ষুদ্র পরিমাণের অর্থ ঋণ প্রদানকারী গ্রামীণ ঋণদাতা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাদের ব্যবসার প্রকৃতি, বিস্তার এবং কি পরিমাণ মূলধন তারা নিয়োগ করতো সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়। যদিও বেশিরভাগ মহাজন নিজ এলাকায় ব্যবসা করতো, তবু তাদের সমগ্র ব্যবসা থেকে মোটা অঙ্কের লাভ হতো। কাজের দিক থেকে ব্যাঙ্কাররা মহাজনদের থেকে আলাদা ছিল। মহাজনরা প্রধানত অর্থ ধার দেওয়ার ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। আধুনিক ব্যাঙ্কব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের ফলে দেশীয় ব্যাঙ্কারদের কাজ সীমিত হয়ে পড়ে, তবে মহাজনদের ব্যবসা অক্ষুণ্ন থাকে। এই ব্যবসার পদ্ধতি এবং মহাজনরা কি নিয়ম অনুসরণ করতো এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব আছে। সাধারণত এই ঋণ কোন

৪৩. Mohsin, *Murshidabad*, Vol. I. 137

৪৪. O. H Little, 19-33.

৪৫. ঢাকার প্রভাবশালী ব্যাঙ্কারদের নামের জন্য দেখুন, S. Islam, 'Social life', 5-6. অন্যান্য ব্যাঙ্কারদের তালিকার জন্য দেখুন, *Bengal Public Consultation*, 1 August 1778 and Gautam Bhadra, 'Merchants at Murshidabad', 12-14.

প্রমাণপত্র বা সাক্ষী ছাড়াই পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে দেওয়া হতো। জমি, সোনার অলঙ্কার এবং অন্যান্য সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ দেওয়া হতো।

বুকাননের বর্ণনা থেকে উনিশ শতকের প্রারম্ভে এই সুদের হার সম্পর্কে জানা যায়। তিনি বলেন যে, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলীয় শহরে সুদের গড় হার ছিল বারো থেকে আঠারো শতাংশ, কিন্তু তারা মুনাফার উপর আরো সুদ ধার্য করতো।[৪৬]

অনেক সময় মহাজনেরা শস্যের মরসুম আসার আগে চাষীদেরকে অর্থঋণ প্রদান করতো। এই ঋণের পরিবর্তে চাষীর কাছ থেকে তারা শস্য গ্রহণ করতো এবং বাজারে অধিক মুনাফালাভের জন্য শস্য গুদামজাত করতো। বিভিন্ন জেলায় জগৎশেঠরা যে সুদ আদায় করতো তা প্রতি মাসে দুই থেকে চার শতাংশ পর্যন্ত উঠানামা করতো। তবে ব্যক্তিগত ঋণের জন্য মহাজনরা আরো অধিক হারে সুদ আদায় করতো।[৪৭]

ধনী ব্যাঙ্কাররা প্রধানত আর্থিক লেনদেনের কাজেই নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতো। তবে তাদের সকলেই মূলত ব্যবসা ও ব্যাঙ্কের কাজ এ দু'টি একত্রে পরিচালনা করতো। আঠারো শতকের শেষভাগে অধিকাংশ ব্যাঙ্কারের ক্ষেত্রে এটি সত্য ছিল। তিন ধরনের দেশীয় ব্যাঙ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়, প্রধানত যাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল ব্যাঙ্কসংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করা, যারা মূলত শেঠ ও সারাফ বলে পরিচিত ছিল; দ্বিতীয়ত যারা ছিল প্রধানত ব্যবসায়ী বা বণিক এবং যারা ব্যাঙ্কের কাজে কিছু কিছু মূলধন নিয়োগ করতো; শেষত তারা ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসা দুটিই সমানভাবে পরিচালনা করতো, যাদের ব্যাঙ্কার অথবা ব্যবসায়ী হিসেবে সহজে চিহ্নিত করা দুরূহ ছিল।

আঠারো শতকে বাংলার নবাবদের সময়ে দেশীয় ব্যাঙ্কাররা মুদ্রা এবং সরকারি অর্থের উপর যে প্রভাব অর্জন করেছিল তা বৃটিশ প্রশাসনের প্রথমদিকেও অটুট ছিল। কিন্তু তারা তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি শেষপর্যন্ত বজায় রাখতে পারে নি। তবে ইংরেজদের দীউয়ানি লাভের পরও গ্রামাঞ্চলে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনগণ বিশ্বাস করতো, তাদের মাধ্যমে জমিদাররা সহজেই সরকারের খাজনা মেটাতো এবং টাকা স্থানান্তরের সুযোগ-সুবিধা যুগিয়ে, টাকা সরবরাহে উৎসাহিত করে তারা আর্থিক লেনদেনে সহায়তা করতো। কিন্তু ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে অধিকাংশ ব্যাঙ্কপরিবারের আয়ের উৎস সীমিত হয়ে যাওয়ার ফলে সেগুলো ধ্বংসমুখী হয়ে পড়ে। যে জগৎশেঠ পরিবার দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো, ১৭৬৫ সালের পর সে পরিবারের প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে।[৪৮]

---

৪৬. Buchanan, *Dinajpur*, 211.

৪৭. *Murshidabad Factory Records*, Vol. 5, 18 February 1772.

৪৮. Gautam Bhadra, 'Merchants at Murshidabad', 9-11.

জগৎশেঠ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মানিক চাঁদ আঠারো শতকের প্রথমদিকে পাটনা থেকে ঢাকায় এসে একটি ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করেন। মুর্শিদকুলী খান ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করলে মানিক চাঁদও মুর্শিদাবাদে চলে যান। তিনি নবাবের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন এবং নবাবের ব্যাঙ্কার ও উপদেষ্টার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭১২ সালে সম্রাট ফররুখশিয়র সিংহাসনে আরোহণ করার পর পরই মানিক চাঁদকে 'নগরশেঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৭১৪ সালে মানিক চাঁদের মৃত্যুর আগেই এ পরিবার প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর উত্তরাধিকারী ফতেহ চাঁদ ১৭২৩ সালে সম্রাট মাহমুদ শাহের কাছ থেকে 'জগৎশেঠ' উপাধি লাভের পর তাদের পরিবারের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সমসাময়িক রেকর্ডপত্রে উল্লেখ আছে যে, ঋণগ্রহণ, সোনারূপা বেচাকেনা এবং অন্যান্য লেনদেনের মাধ্যমে জগৎশেঠ পরিবারের সঙ্গে কোম্পানির বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই পরিবারের আয়ের উৎস ছিল অনেক। এরা সরকারি রাজস্বের তত্ত্বাবধায়ক এবং কোষাধ্যক্ষ ছিল। জমিদারের প্রদত্ত অর্থ এবং সংগৃহীত রাজস্ব এই পরিবারের কাছে জমা থাকতো এবং বাংলার রাজস্ব তাদের মাধ্যমেই দিল্লীতে পাঠানো হতো। এসব লেনদেনে তারা শতকরা দশ ভাগ কমিশন পেতো এবং এই উৎসগুলি থেকে তারা বছরে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করতো। দেশের টাঁকশালে তাদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, কলকাতায় টাঁকশাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উঠলে জগৎশেঠ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে এবং ইংরেজদের সপক্ষে জগৎশেঠ পরিবারের ভূমিকা সর্বজনবিদিত।

১৭৫৭ সালের পর থেকেই এ পরিবারের পতন শুরু হয়। মুগল সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিলে জগৎশেঠ বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রে তাদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন। নবাব মীর কাশিম এই পরিবারের দু'জন প্রভাবশালী সদস্যকে হত্যা করলে এদের পতন আরো ত্বরান্বিত হয়। শেঠদের বিশ্বাস যে, খুশাল চাঁদ বিপুল পরিমাণ অর্থ মাটির নিচে পুঁতে রাখেন। মৃত্যুর আগে তিনি কাউকে এ গুপ্ত খবর বলে যেতে পারেন নি[৪৯], তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজ কোম্পানির ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ফলে শেঠদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিদেশী এবং দেশী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাদের আর ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হতো না এবং রাজস্ব সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবেও তারা আর বহাল রইলো না।[৫০]

৪৯. Mohsin, *Murshidabad*, 143

৫০. H.R. Ghosal, *Economic Transition in the Bengal Presidency*, 284-285; Hamilton, *Hindostan*, Vol. 1, 40-41.

সম্ভবত কোম্পানির সাথে এই পরিবারের অতীত বাণিজ্যের প্রতিদানে কোম্পানি জগৎশেঠকে বেশ কিছুকাল নিজস্ব ব্যাঙ্কার হিসেবে নিয়োজিত রাখে। কিন্তু ১৭৭২ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে সরকারি কোষাগার কলকাতায় স্থানান্তরিত হলে কোম্পানির ব্যাঙ্কার হিসেবে তাদের কাজ শেষ হয়ে যায়। তাদের ব্যবসা ছোট ছোট সারাফদের হাতে চলে যায়। ১৭৭৩ সালে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হলে কলকাতার বাণিজ্যিক সার্কেলে নবাগত হিসেবে পরিচিত হাজারী মল ও দয়াল মল এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হন। তখন পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ টাঁকশালে এ পরিবারের অর্থ মুদ্রণের বিশেষ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অর্থাভাবে তাঁরা এ সুবিধা কাজে লাগাতে পারে নি। ১৭৬১ সালে মীর কাশিম মুর্শিদাবাদে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। সরকারের সাথে আর্থিক লেনদেনের জন্য মনোহর দাস ও দ্বারকা দাসের একটি ফার্ম ১৭৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যে লেনদেনের কাজ আগে জগৎশেঠ পরিবারের দ্বারা সম্পাদিত হতো।[৫১] সঙ্কীর্ণ পরিসীমায় ব্যাঙ্কের কাজ ব্যবসানিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হলেও এসব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের ক্রমাগত সংগঠনজনিত সমস্যার কারণে একটি সমন্বিত ব্যাঙ্কব্যবস্থা পুনরায় গড়ে তোলার ব্যাপারে কোন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় নি।

স্থানীয় ব্যাঙ্কারদের এই সংগঠনজনিত সমস্যা এবং ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রশাসনিক ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেশ উৎসাহ পায়। ফলে দেখা যায়, সরকারি ট্রেজারি ও পাশ্চাত্য ধাঁচে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হতে শুরু করে। এতে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি আরো অসুবিধায় পড়ে।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন একটি সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং তৎপরতা শুরু করে, তখন এসব দেশীয় ব্যাঙ্ক বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ১৭৭৩ সালের ১৩ এপ্রিল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ওয়ারেন হেস্টিংসের পরিকল্পনার ফলে বাংলা ও বিহারে সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাধারণ ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কলকাতায় বিলের মাধ্যমে রাজস্ব প্রেরণ করে বাংলার গ্রামাঞ্চলে মুদ্রার প্রচলন অটুট রাখা। এই প্রক্রিয়ায় খাজনা প্রদানের মাধ্যমে যে অর্থ গ্রহণ করা হতো, তার পূর্ণমান বজায় রাখার ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এই ব্যাঙ্কের অন্য উদ্দেশ্য ছিল এর বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে আড়ংসমূহে ব্যবসায়ীদের জন্য টাকা প্রেরণের সহজ ও সস্তা উপায় সৃষ্টি করে দেশের বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষা করা।[৫২]

---

৫১. N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, Vol 1. 143-145 (note 3).

৫২. J. C. Price, *Notes on the History of Midnapore*, Vol. 1, 201-206; *Bengal Revenue Consultation*, Range 49, Vol 39, 13 April, 1773

যাহোক, বিভিন্ন জেলায় শাখাসহ দুই দেশীয় ব্যাঙ্কারের ব্যবস্থাপনায় সকল প্রকার টাকা-পয়সা প্রেরণের উদ্দেশ্যে কলকাতায় একটি প্রিন্সিপ্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাঙ্কের পক্ষে কমিশন পথের দূরত্ব, ঝুঁকি ও পরিবহনব্যয় অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। সকল সাধারণ বণিক নির্ধারিত হারে আড়ংগুলিতে টাকা প্রেরণ করতো। কিছুকাল পরে বাংলার জেলাগুলিতে প্রতিমাসে দুই শতাংশ হারে এবং কলকাতায় প্রতিমাসে এক শতাংশ হারে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য কৃষকদের অর্থ আগাম দিতে প্রধান শাখাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। সাধারণ ব্যাঙ্কারদের জগৎশেঠপ্রদত্ত হারে মুর্শিদাবাদে মুদ্রা তৈরি করতে অনুমতি দেওয়া হয়।[৫৩]

এই পরিকল্পনা অনুমোদন লাভ করার পর ব্যাঙ্ক কাজ শুরু করে। প্রথম তিন চার মাসে লাভ হয়েছিল ৩০,০০০ টাকা। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেন যে, এই লাভের অর্ধাংশ পাবেন ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপকরা এবং বাকি অর্ধেক সরকারি এ্যাকাউন্টে জমা হবে।[৫৪]

অতএব, ডিরেক্টরবৃন্দ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রবিধানগুলি অনুমোদন করতে অস্বীকার করেন। পরে বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে কাউন্সিলে আলোচিত হয়। ফ্রান্সিস এর ক্রটিগুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, এই ব্যাঙ্ক থেকে যেসব সুবিধা আশা করা হচ্ছে এটা তা মেটাতে পারবে না। যাহোক হেস্টিংস এই ব্যাঙ্কের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন, কিন্তু কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে ১৭৭৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই ব্যাঙ্ক বিলোপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৫৫]

জেনারেল ব্যাঙ্ক প্রায় এক বছর আট মাস কাজ করেছিল। এই সময়কালে জেনারেল ব্যাঙ্কের প্রায় দুই লাখ টাকা লাভ হয় এবং এই লাভের অর্ধাংশ সরকারি কোষাগারে জমা হয়। ১৭৭৩ সালের এই পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ স্বল্পকাল স্থায়ী ছিল। তথাপি বাংলার ব্যাঙ্কব্যবস্থার ইতিহাসে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সরকারি রাজস্বের জিম্মাদার হয়ে বিভিন্ন স্থানে অর্থ প্রেরণের উপায় সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারকারী এবং সিক্কা মুদ্রাকে প্রমাণ মুদ্রায় উন্নীত করার লক্ষ্যে ভারতে এ ধরনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় এটি ছিল প্রথম পদক্ষেপ।

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এর ফলে স্থানীয় ব্যাঙ্কাররা আরো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। সরকারি সমর্থন ও সহযোগিতায় সৃষ্ট এই বৃহৎ

---

৫৩. *Bengal Revenue Consultations*, R. 49, Vol. 53, 24 December 1773.

৫৪. *Bengal Revenue Consultations*, R. 49, Vol. 39, 13 April 1773.

৫৫. *Bengal Revenue Consultations*, R. 49, Vol. 53, 15 February and 29 May, 1775.

ব্যাঙ্ক ছোট ব্যাঙ্ক পরিবারগুলিকে দুর্বল হতে সহায়তা করে। এই ব্যাঙ্কটি সারাফদের ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে, কিন্তু বিভিন্ন ব্যাঙ্কারের মধ্যে কোন ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার সুবিধা গ্রহণ করার পরিবর্তে এটি দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেয়।[৫৬]

সাধারণ ব্যাঙ্কের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলো স্থানীয় ব্যাঙ্কারদের অবস্থার একটি করুণ চিত্র তুলে ধরে। মুর্শিদাবাদ কাউন্সিল থেকে খবর পাওয়া যায় যে, জেলার ব্যাঙ্কগুলি হ্রাস পাচ্ছে এবং মুর্শিদাবাদের ব্যাঙ্কাররা সরকারি ব্যাঙ্কের নীতির বিরোধিতা করে। মনে হয়, স্থানীয় ব্যাঙ্কারদের বিরোধিতা সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংস সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন এবং সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করতে প্রস্তুত ছিলেন।[৫৭]

মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য স্থানের টাকশাল বিলোপ এবং পরবর্তী সময়ে সোনারূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর অভাবের ফলে মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য স্থানের ব্যাঙ্কারদের অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। ১৭৮১ সাল থেকে তাদের দুঃখ-দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে। এ সময়ে মুর্শিদাবাদের সব প্রভাবশালী ব্যাঙ্কার জগৎশেঠের নেতৃত্বাধীনে মুর্শিদাবাদ শহরে টাঁকশাল পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করে যাতে তারা তাদের পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে যেতে পারে এবং সার্বিকভাবে জনগণের উপকারে আসতে পারে। স্থানীয় ব্যাঙ্কারদের আবেদন কলকাতা কাউন্সিলে প্রেরণ করা হয়।[৫৮] এসব ব্যাঙ্কারের অবস্থা এত করুণ ছিল যে, মুর্শিদাবাদে অবস্থিত ইংরেজ রেসিডেন্ট ১৭৮৪ সালে কলকাতায় লিখে পাঠান যে, বাংলার নবাবও স্থানীয় ব্যাঙ্কারদের কাছ থেকে টাকা ধার পাচ্ছেন না।[৫৯] ১৭৮৮ সালে মুর্শিদাবাদের কালেক্টরকে শহরে সেনাবাহিনী, বিপুল পরিমাণ বকেয়া, ফৌজদারি আদালতের বেতন এবং কাশিমবাজার ও জঙ্গিপুরের কারখানার জন্য আগাম প্রদান করতে টাকা ধার নিতে বলা হয়। কিন্তু কালেক্টর তাঁর চেষ্টা সত্ত্বেও মাত্র ৪১,২২২ টাকার বেশি ধার সংগ্রহ করতে পারেন নি।[৬০]

---

৫৬. Mohsin, *Murshidabad*, 148, quoted from Francis Minute, 20 January 1775, 211.
৫৭. ঐ, 165.
৫৮. *Bengal Public Consultation*, R. 3, Vol. 9, 24 January 1785.
৫৯. ঐ।
৬০. *Board of Revenue Proceedings*, R. 71, Vol. 16, 2 November 1979.

আঠারো শতকে ইউরোপীয় কোম্পানি ও বাংলার রপ্তানিবাণিজ্য

সুশীল চৌধুরী*

মধ্যযুগে বাংলার সম্পদের কাহিনী প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। এখানকার উন্নত উৎপাদনশিল্প এবং উৎপন্নদ্রব্যের, বিশেষকরে কাঁচা রেশম, সুতীবস্ত্র ও খাদ্যশস্যের সুলভ মূল্য শুধু এশিয়ার বণিকদের নয়, দূর সমুদ্রপারের বিদেশী বণিকদেরও আকৃষ্ট করেছিল। তাই আমাদের আলোচ্য সময়কালে দেখি, ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, অস্টেন্ড, দিনেমার প্রভৃতি ইউরোপীয় কোম্পানি সুবা বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কুঠি স্থাপন করেছিল। এসব বিদেশী কোম্পানির মধ্যে ওলন্দাজ ও ইংরেজরাই সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি প্রধানত বাংলার সুলভ পণ্য—নানা রকম বস্ত্র, কাঁচা রেশম ও সোরা ইউরোপে রপ্তানি করতো। বাংলা থেকে এসব রপ্তানিপণ্য ক্রয়ের জন্য কোম্পানিগুলিকে ইউরোপ থেকে প্রধানত সোনা-রূপা আমদানি করতে হতো, কারণ তাদের দেশজ দ্রব্যের কোন চাহিদাই এখানে ছিল না। প্রথম থেকে শুরু করে আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যে ওলন্দাজ কোম্পানির প্রাধান্য সন্দেহাতীত। তবে এই শতকের তৃতীয় দশক থেকে ইংরেজ কোম্পানি ওলন্দাজদের পিছনে ফেলে রপ্তানিবাণিজ্যে অনেকটা এগিয়ে যায় এবং ক্রমশ ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির মধ্যে বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ফরাসীরা সতেরো শতকের শেষভাগে বাংলার বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করলেও ১৭২০-এর দশকের শেষদিক থেকে তাদের বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এবং ১৭৩০-এর দশকে ডুপ্লের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ফরাসী বাণিজ্য

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

উন্নতির শীর্ষে পৌঁছায়। কিন্তু পরে ক্রমশ তার অবনতি ঘটতে থাকে। একমাত্র ডুপ্লের সময় ছাড়া অন্য সময়ে ফরাসী কোম্পানির বাণিজ্য ওলন্দাজ কিংবা ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে নি। বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যে অস্টেন্ড ও দিনেমার কোম্পানির ভূমিকা ওলন্দাজ ও ইংরেজ কোম্পানির ভূমিকার তুলনায় অত্যন্ত সীমিত ছিল।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের গোড়াপত্তন

রাজকীয় সনদের মাধ্যমে ১৬০০ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পত্তন হলেও তাদের প্রথম বাণিজ্যতরী ক্যাপ্টেন হকিন্সের নেতৃত্বে সুরাটে এসে পৌঁছায় ১৬০৮ সালে। মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের ফরমান পাওয়ার পর ১৬১৩ সালে সুরাটে প্রথম ইংরেজ কুঠি স্থাপিত হয়। ভারতে ইংরেজ বাণিজ্য শুরু হওয়ার পরও প্রথম দিকে বাংলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ নৌ-বাণিজ্যের কোন ইচ্ছা ইংরেজদের ছিল না।

এর কারণ ছিল দু'টি। প্রথমত, কোম্পানির তখনো শৈশবাবস্থা—ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য খুব ক্ষুদ্র আকারে থাকায় অনেকগুলি কুঠি স্থাপনের প্রয়োজন তার ছিল না। দ্বিতীয়ত, বাংলার বন্দরে পর্তুগীজদের একচ্ছত্র আধিপত্য ইংরেজদের পক্ষে বাংলায় বাণিজ্য শুরু করার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাদের বাংলার সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য করার অভিপ্রায় প্রথম প্রকাশ পায় কোম্পানিকে লেখা স্যার টমাস রোর চিঠিতে (২৪ নভেম্বর ১৬১৫)।[১] রো সাহেব বাংলার ধনসম্পদের কথা এবং উৎপন্নদ্রব্যের, বিশেষকরে বস্ত্র ও রেশমের প্রাচুর্য ও সুলভ মূল্যের কাহিনী শুনে বাংলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও বাংলার সঙ্গে সরাসরি সমুদ্রবাণিজ্য শুরু করতে ভরসা পান নি। সুরাটের কুঠিয়ালের কাছে তিনি লিখেন, বাংলার সঙ্গে স্থলপথে বাণিজ্য শুরু করার চেষ্টা করা উচিত।

প্রথমদিকে সুরাট কাউন্সিল এ ব্যাপারে অনিচ্ছুক থাকলেও ক্রমশ উপলব্ধি করলো যে, ভারতে একমাত্র বাংলাই সবচেয়ে সস্তায় ও পর্যাপ্ত পরিমাণে বস্ত্র ও রেশম সরবরাহ করতে পারবে এবং এতে এসব পণ্যের জন্য ইংল্যান্ডের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। তাই সুরাট থেকে ১৬২০ সালে আগ্রার ইংরেজ কুঠিতে নির্দেশ পাঠানো হয় যেন রবার্ট হিউজেস্‌কে পাটনায় কুঠি স্থাপন করার জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু নানা কারণে এই অভিযান ব্যর্থ হয়।[২] বারো বছর পরে একই উদ্দেশ্যে পিটার মান্ডিকে পাঠানো হয়

১. British Museum, Addl. Mss. (এখন থেকে B. M. Addl. Mss), 6115. f. 63vo, British Museum, London; W. Foster (ed.), *The Embassy of Sir Thomas Roe to India*, (London 1926), 76.

২. বিস্তারিত বিবরণ দেখুন, Sushil Chaudhuri, *Trade and Commercial Organization in Bengal, 1650-1720* (Calcutta 1975), 14-16.

পাটনায়, সে যাত্রাও সফল হয় নি।[৩] ইতিমধ্যে কোম্পানি বাংলার পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করেছিল মসুলিপত্তমে। ১৬৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনার কারণে কোম্পানি বাংলায় স্থায়ী কুঠি স্থাপনের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। ১৬৩০ সালে করোমন্ডলে দুর্ভিক্ষের ফলে জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। কোম্পানির কর্মচারীরা লক্ষ্য করে যে, বাংলা থেকে মসুলিপত্তমে চাল, ঘি, চিনি ইত্যাদি আমদানি করলে প্রচুর লাভে বিক্রি করা যাবে। তাছাড়া দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে করোমন্ডলে বহু তাঁতী ও অন্যান্য কারিগরের মৃত্যু ঘটায় কাপড়ের দাম অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। তাই কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলার সুলভ সুতীবস্ত্র ও রেশমের দিকে আকৃষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় লাভজনক ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্যও তারা প্রলুব্ধ হয়। এদিকে ১৬৩২ সালে মুগল সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে সুবাদার কাসিম খাঁ হুগলী থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করায় ইংরেজরা বাংলায় বাণিজ্যপত্তনে উৎসাহিত হয়। এভাবে ১৬৩৩ সাল নাগাদ ইংরেজরা হরিহরপুর ও বালেশ্বরে কুঠি স্থাপন করে। তবে এরপর প্রায় এক দশক বাংলার সঙ্গে ইংরেজদের বাণিজ্য মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। এমনকি ১৬৪১ সালে ইংরেজ কোম্পানি বাংলা থেকে বাণিজ্য গুটিয়ে নেবার কথা ভেবেছিল। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসার স্বার্থে কোম্পানির সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে অনিচ্ছুক ছিল। ১৬৪৪ সালে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যে বিনিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৬,০০০ টাকা। কিন্তু এই সময় কয়েকটি ঘটনার কারণে ইংরেজদের কাছে বাংলার বাণিজ্য অপরিহার্য হয়ে উঠে। মসুলিপত্তম ও মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব এবং পুরো করোমন্ডল উপকূলে রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে ঐসব এলাকায় কোম্পানির বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় বাংলার পণ্যের, বিশেষকরে সুতীবস্ত্রের বাণিজ্য আরো অধিক হারে শুরু করা ছাড়া কোম্পানির গত্যন্তর ছিল না। অতএব ক্যাপ্টেন ব্রুকহেভেনের নেতৃত্বে কোম্পানির চারজন কর্মচারী লায়জেস নামক জাহাজে চড়ে হুগলী অভিমুখে রওনা হন। বালেশ্বর পৌঁছে ব্রুকহেভেন জেমস্ ব্রিজম্যান এবং আরো দুজন কর্মচারীকে প্রিন্সেস নামক স্লুপে হুগলীতে পাঠান। এভাবে ইংরেজরা ১৭৫১ সালের প্রথমদিকে হুগলীতে তাদের প্রথম স্থায়ী কুঠি পত্তন করে।[৪]

বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা ও স্থানীয় শাসকের সঙ্গে সম্পর্ক

বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্যের প্রথম অধ্যায় সম্বন্ধে বেশিরভাগ ঐতিহাসিকদের মত এই যে, ইংরেজরা বার্ষিক ৩,০০০ টাকা দিয়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করেছে। কিন্তু কোম্পানির মহাফেজখানায় অধুনা কিছু নতুন নথিপত্র আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে

---

৩. ঐ, 18-20.

৪. প্রাগুক্ত, 20-26.

ইংরেজদের শুল্কমুক্ত বাণিজ্যিক সুবিধার যে তত্ত্ব দাঁড় করানো হয় তা মেনে নেয়া যায় না। বস্তুত ১৭১৭ সালের আগে কোম্পানি কখনোই কোন বাদশাহী ফরমানের বলে বাংলায় এই রকম কোন সুবিধা আইনত ভোগ করে নি। এই রকম সুবিধাভোগ সম্পর্কে ইংরেজদের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন—তার পিছনে কোন আইনগত বা বৈধ বাদশাহী সনদ ছিল না।

প্রথম থেকেই ইংরেজ কোম্পানি অন্যায়ভাবে শুধু অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানি নয়, এমনকি স্থানীয় বণিকদের চেয়েও বেশি বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টায় ছিল যাতে অন্যান্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। কোম্পানি দাবি করে যে, তারা এসব বৈষম্যমূলক সুবিধা পেয়েছে নানা ফরমান, নিশান ও পরোয়ানার মাধ্যমে এবং আমাদের আলোচ্য সময়কালে কোম্পানি সর্বদাই এসব বিশেষ সুবিধা রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে। এতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোম্পানির প্রায়ই বিবাদ-বিসংবাদ হয়েছে। এরা কোম্পানির এসব বিশেষ সুবিধাভোগের বৈধতা নিয়ে বার বার প্রশ্ন তুলেছে এবং এগুলো যথার্থ আদেশপ্রসূত কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছে। আমলাতান্ত্রিক শোষণ যখন মাত্রা ছাড়িয়েছে ,তখন ইংরেজরাও অস্ত্রের সাহায্যে তার মোকাবেলা করতে চেয়েছে। এভাবে এই বিরোধের এক পর্যায়ে ১৬৮৬ সালে মুগলদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বেধে যায়; যুদ্ধের পর যে মিটমাট হলো (১৬৯০ সালে) তাতে বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারপর ইংরেজ বাণিজ্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

ইংরেজ কোম্পানি বাংলায় বিনা শুল্কে যে বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করেছে সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন মাত্রায় একই গল্পের পুনরাবৃত্তি করেন। এঁদের মতে, ইংরেজদের জন্য এই বিশেষ সুবিধা আদায়ের মূলে আছে গ্যাব্রিয়েল বাউটন নামে এক ইংরেজ চিকিৎসকের মহানুভবতা। বাউটন ছিলেন বাংলার সুবাদার যুবরাজ শাহ্ শুজার খুবই প্রিয়পাত্র। তাঁর চিকিৎসায় খুশি হয়ে শাহ শুজা তাঁকে পুরস্কৃত করতে চাইলে তিনি নাকি কোন ব্যক্তিগত পুরস্কার নিতে অস্বীকৃতি জানান, তার বদলে তিনি চাইলেন বাংলায় ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি। এই কাহিনীর নানারকম ভাষ্য আছে। এগুলির মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকলেও এগুলি সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বোঝা যায় যে, বাউটন বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সুবিধা শুধু নিজের জন্যই আদায় করেছিল, সাধারণভাবে ইংরেজদের বা ইংরেজ কোম্পানির জন্য নয়।[৫] কোম্পানির জন্য ১৬৫১ সালের আগস্টে প্রথম নিশান শাহ্ শুজার কাছ থেকে আদায় করেছিলেন জেমস ব্রিজম্যান। এর বছর খানেক আগে

৫. প্রাগুক্ত, 28-30.

মুগল সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে ডেভিজ যে ফরমান পেয়েছিলেন তার ভিত্তিতেই এই নিশান দেয়া হয়। ঐ ফরমানের[৬] মূল উদ্দেশ্য ছিল অযোধ্যা, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত যেসব পণ্য পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরগুলিতে রপ্তানির জন্য পাঠানো হতো, সেগুলিকে রাহাদারি বা পথকর থেকে রেহাই দেয়া। দিল্লী থেকে প্রদত্ত ঐ ফরমানের যতো উদার ব্যাখ্যাই করা হোক না কেন, এটা কোনমতেই ইংরেজদের বাংলার রপ্তানি-বাণিজ্যের প্রচলিত শুল্ক থেকে অব্যাহতি দেয় নি। যাই হোক, ব্রিজম্যান ৩,০০০ টাকা উপঢৌকন দিয়ে শাহ্ শুজার কাছ থেকে নিশান লাভ করেছিলেন, যার ফলে ইংরেজরা বলতে শুরু করলো যে বাদশাহী ফরমান তাদের বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার দিয়েছে।[৭]

কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক উৎপীড়ন থেকে নিষ্কৃতিলাভের উপায় হিসেবে কেবলমাত্র ইংরেজদের জন্য বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়। তাই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই ধরনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভ এবং সেগুলি যেকোনভাবে রক্ষা করা যাতে স্থানীয় পণ্যের বাজারের উপর তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় থাকে। কিন্তু স্থানীয় শাসকবর্গ কোম্পানির বিশেষ সুবিধাভোগের পথে নানাভাবে বাধা দিয়েছে। তবে তারা বিদেশী বণিকদের 'কামধেনু'র মতো দোহন করেছে বলে যে মত প্রচলিত আছে তা পুরোপুরি মেনে নেয়া যায় না। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, নবাবের কর্মচারীরা শাসনের নামে শোষণ করতো না। কোম্পানির বিশেষ সুবিধাভোগের প্রশ্নটির নানা জটিল দিক আছে। যতোদিন ইংরেজ বাণিজ্যের পরিমাণ সামান্য ছিল ততোদিন মুগল কর্মচারীরা শুল্করেহাই-এর ব্যাপারটি নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় নি। এ নিয়ে কখনো কোন অসুবিধা দেখা দিলে ইংরেজরা উপহার-উৎকোচ দিয়ে তা দূর করার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি ভিন্ন রূপ নেয়, বিশেষকরে ইংরেজদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত জাহাজের সংখ্যাবৃদ্ধিতে অবস্থার পরিবর্তন হয়। ব্যাপারটি আরো জটিল হয়ে উঠে যখন এশীয় বণিকরা নিজেদের বাণিজ্যপণ্যকেও কোম্পানির দস্তকের মাধ্যমে অবৈধভাবে শুল্কমুক্ত করতে শুরু করে। তার উপর অনেক স্থানীয় মুগল কর্মচারী তখন বাংলায় অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল, যার ফলে কোম্পানির সঙ্গে বিবাদের একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ালো বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এসব কর্মচারীর পিছনে

---

৬. B. M. Addl Mss., 24, 039, f. 5; W. Foster (ed.), *The English Factories in India*, (এখন থেকে *E.F. I.*), 1655-1660, (Oxford 1927), 414 15.

৭. B. M. Addl. Mss., 24,039, f.6; W Foster (ed.), *English Factories*, 111.

রাজনৈতিক মদদ থাকায় কোম্পানির সঙ্গে সংঘাতের ক্ষেত্র আরো ব্যাপ্ত হলো। তবে কোম্পানির সঙ্গে বাংলার শাসকগোষ্ঠীর বিবাদ-বিসংবাদের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে কোম্পানির বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারগুলির অস্পষ্টতা, যার সুযোগে উভয় পক্ষ নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতো।

এসব কারণে কোম্পানি মুগল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলায় বাণিজ্যের জন্য বাদশাহী ফরমান লাভ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ১৭১৭ সালে সারম্যান-এর দূতালির মাধ্যমে কোম্পানি বছরে তিন হাজার টাকা পেশকাস্‌ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুগল সম্রাট ফররুখশিয়রের কাছ থেকে বাংলায় শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের অধিকার লাভ করলো। ১৭১৭ সালের এই ফরমান বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্যের 'ম্যাগ্‌না কার্টা' বলে যে অভিমত[৮] তা মেনে না নিলেও এটা অনস্বীকার্য যে, এই ফরমানের ফলে অন্তত কাগজপত্রে বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্যের পথে বহু বাধা দূর হলো। বৈধ ফরমান না থাকায় স্থানীয় শাসকরা এতদিন ইংরেজদের বিশেষ সুবিধাভোগের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি তুলতো, তার সুযোগ আর রইলো না। ইংরেজদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাভ হলো, তারা এই প্রথম বাদশাহী ফরমানের বলে বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের অধিকার পেলো। এর আগে কোন বাদশাহী ফরমান তাদের এই অধিকার দেয় নি, যদিও তারা উপহার-উৎকোচ দিয়ে বিভিন্ন সুবাদারের কাছ থেকে নিশান ও পরোয়ানা জোগাড় করে তাদের বাণিজ্য শুল্কমুক্ত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ১৭১৭ সালের ফরমান ইংরেজদের যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে সেগুলি সুস্পষ্ট নয়, যেমন শুধু ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যই শুল্কমুক্ত না কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যও শুল্কমুক্ত এ প্রশ্নের জবাব ফরমান থেকে পাওয়া যায় না। তবে এই ফরমানের পটভূমিকা এবং যে উদ্দেশ্যে ফরমান চাওয়া হয়েছে ও দেয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে অনুধাবন করলে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, কোম্পানির বাণিজ্যকেই শুধু আমদানি-রপ্তানির জন্য শুল্ক থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে, অন্তর্বাণিজ্য বা কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই বিশেষ সুবিধা কোনভাবেই প্রযোজ্য নয়। ১৭১৭ সালের ফরমানে যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে তার ব্যাখ্যা নিয়ে কোম্পানি এবং বাংলার নবাবদের মধ্যে যে বিবাদ-বিতর্কের সূচনা হয় তার জের চলেছে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) পর্যন্ত। কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা এই চল্লিশ বছর ধরে বরাবর দাবি করেছে যে, এই ফরমান শুধু কোম্পানির বাণিজ্য নয়, তার কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যকেও শুল্ক থেকে রেহাই দিয়েছে। অন্যদিকে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী,

---

৮. S. Bhattacharyya, *The East India Company and the Economy of Bengal, 1704-40*, (London 1954), 29.

শুজাউদ্দিন ও আলিবর্দী কোনদিনই ইংরেজদের দাবি মেনে নেন নি। সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আরো গুরুতর অথচ সত্য অভিযোগ তোলেন যে, কোম্পানির কর্মচারীরা শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য দস্তকের মাধ্যমে শুল্কমুক্ত করে নি, তারা এশীয় বণিকদের কাছে দস্তক বিক্রি করেছে, যার ফলে এশীয় বণিকরাও নিজেদের বাণিজ্যপণ্যের জন্য শুল্ক না দিয়ে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে, এতে বাংলার নবাব তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই কারণেই তাঁকে নবাবের পদ থেকে সত্বর অপসারণ করা হয় যাতে ইংরেজ কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য নির্বিঘ্নে চলতে পারে।[৯]

ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

বাংলায় বাণিজ্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা লক্ষ্য করে ওলন্দাজ বণিকরা এ অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রথমদিকে তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত হল্যান্ড এবং কিছুটা ইন্দোনেশিয়ার জন্য কাপড়, হল্যান্ড ও পারস্যের জন্য চিনি এবং হল্যান্ডের জন্য সোরা রপ্তানি করা। তাছাড়া বাংলার সস্তা চাল ও ঘি বাটাভিয়ায় ওলন্দাজ কোম্পানির ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হতো এবং ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ উপনিবেশগুলির উন্নয়নমূলক কাজ ও সুরক্ষার জন্য বাংলা থেকে ক্রীতদাস সংগ্রহ করা হতো। বাংলায় কুঠি স্থাপনের আগে ওলন্দাজরা করোমন্ডল উপকূল থেকে বাংলার পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতো। কিন্তু এতে দু'টি অসুবিধা হতো। প্রথমত, পণ্যদ্রব্যের মূল্য হতো বেশ-কিছুটা বেশি এবং দ্বিতীয়ত, সব সময় এসব পণ্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়াও যেতো না।

ওলন্দাজরা বাংলার সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য প্রথম চেষ্টা করে ১৬১৫ সালে মসুলিপত্তম থেকে। তাদের এ প্রচেষ্টা সফল হয় নি।[১০] ১৬৩০-এর দশকের প্রথম দিকে বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণ রেশম সংগ্রহের আশায় এবং ১৬৩২ সালে হুগলী থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়নের ফলে নতুন উৎসাহে ওলন্দাজরা বাংলার সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করার জন্য সচেষ্ট হয়। তারা লক্ষ্য করে যে, বাংলার সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারলে নতুন নতুন সুবিধালাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের গভর্নর জেনারেল ১৬৩৪ সালে লিখলেন যে, উত্তর ভারতের সঙ্গে এতদিন কোম্পানির যে বাণিজ্য সুরাট থেকে পরিচালিত হতো, তা বাংলা থেকে করা গেলে অনেক সহজ ও লাভজনক হবে, কারণ নদীপথে আগ্রা ও উত্তর ভারতের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগব্যবস্থা ভাল। ওলন্দাজদের এমনও ধারণা

৯. প্রথম খণ্ডে Nawab Sirajuddaula and Battle of Palashi নামক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১০. বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, Om Prakash, *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal*, 1630-1727, (Princeton 1985), 35-38.

হয়েছিল যে, গঙ্গার মাধ্যমে বাংলার সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র ক্যাথের (চীন) সংযোগ আছে।

উড়িষ্যার হরিহরপুরে প্রথম ওলন্দাজ কুঠি স্থাপিত হয় এবং ১৬৩৪ সালে করোমন্ডলের কুঠিয়ালরা হরিহরপুরে একটি জাহাজ পাঠিয়ে হুগলী অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দেয়। এই সময় নাগাদ ওলন্দাজরা বাংলার সুবাদার আজম খানের কাছ থেকে হুগলীতে কুঠি স্থাপন এবং বাংলার যেকোন জায়গায় বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে।[১১] ২৩ অক্টোবর সান্তভুরট নামক জাহাজ মসুলিপত্তম থেকে হুগলী পৌঁছায়। নতুন সুবাদার ইসলাম খান ওলন্দাজ কোম্পানিকে হুগলীতে কুঠি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি দেন। অল্পদিনের মধ্যেই সম্রাট শাহজাহানের ১৬৩৫ সালের বিখ্যাত ফরমান এসে পৌঁছায়। এতে বাংলায় ওলন্দাজদের বাণিজ্য করার বাদশাহী অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু হুগলীর স্থানীয় কর্মচারীরা ওলন্দাজদের প্রতি মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না। ফলে ১৬৩৬ সালে হুগলীতে ওলন্দাজ কুঠির প্রধান জ্যাকব মাহুইজেনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কুঠি লুণ্ঠিত হয়। এদিকে বাংলায় বাণিজ্যের জন্য ওলন্দাজ কোম্পানি সুরাটে ১৬৩৬ সালে দু'টি এবং ১৬৩৮ সালে একটি ফরমান পায়, যাতে কোম্পানিকে এই অঞ্চলে অবাধে বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়া হয়। তবে ফরমানগুলিতে বাণিজ্যশুল্কের হার সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু বলা ছিল না। জ্যাকব মাহুইজেন কিন্তু হুগলীতে ওলন্দাজ বাণিজ্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁরই পরামর্শে ১৬৩৬ সালের ডিসেম্বরে ওলন্দাজরা হুগলী কুঠি পরিত্যাগ করে উড়িষ্যার পিপ্‌লিতে চলে যায়।[১২] ইতিমধ্যে ওলন্দাজ কোম্পানি পিপ্‌লিতে ভালই গোড়াপত্তন করেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই কাছাকাছি বালেশ্বরে একটি ছোট কুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হরিহরপুরের কুঠি ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেয়া হয়। পাটনাতেও একটি কুঠি স্থাপিত হয় ১৬৩৮ সালে। কিন্তু সে বছরই খরচ কমানোর জন্য ওটা বন্ধ করে দেয়া হয়। কোম্পানি আবার হুগলী কুঠি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ১৬৪৫ থেকে ১৬৪৭ সালের মধ্যবর্তী কোন সময়ে।[১৩] পাটনা কুঠিও পুনরায় স্থাপিত হয় ১৬৪৫ সালের মধ্যে এবং নতুন একটি কুঠির পত্তন হয় কাশিমবাজারে।

বাংলায় বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব অনুধাবন করে বাটাভিয়া কাউন্সিল ১৬৫৩ সালে জোহান ভেরপুরটেনকে এই অঞ্চলে কোম্পানির বাণিজ্যের উন্নতির ব্যবস্থাদি করার জন্য বিশেষ কমিশনার পদে নিযুক্ত করে। ভেরপুরটেন সুপারিশ করেন যে, বাংলার কুঠিগুলিকে

---

১১. প্রাগুক্ত, 37.

১২. ঐ, 38.

১৩. ঐ, 39.

এমনভাবে পুনর্গঠিত করা হোক যাতে এগুলি পুলিকটের অধীন হয়ে আর না থাকে এবং হুগলী কুঠিকে বাংলা অঞ্চলের প্রধান কুঠিতে পরিণত করা হোক। বাটাভিয়া কাউন্সিল ১৬৫৫ সালে বাংলার কুঠিগুলিকে অন্য কোন অঞ্চলের ওলন্দাজ প্রতিষ্ঠানের অধীন নয় বলে ঘোষণা করলো এবং পিটার স্টারথেমিয়াসকে বাংলার কুঠিগুলির প্রথম ওলন্দাজ ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করলো। তাঁকে কাশিমবাজার বা হুগলীর কুঠির মধ্যে যেকোন একটিকে ওলন্দাজ কোম্পানির প্রধান কুঠি হিসেবে বেছে নিতে বলা হলো। ১৬৫৬ সালের প্রথমদিকে কাশিমবাজার কুঠিকে তখনকার মতো প্রধান কুঠি হিসেবে ঠিক করলেও পরে ওলন্দাজরা হুগলী কুঠিকেই কোম্পানির প্রধান কুঠি হিসেবে বেছে নেয় এবং পরবর্তী দেড়শ' বছরের মতো হুগলীই বাংলায় ওলন্দাজ কোম্পানির প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। চুঁচুড়া, বরানগর ও বাজার মির্জাপুর গ্রাম কোম্পানি বছরে ১৫৭৪ টাকা খাজনার বিনিময়ে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। পরে হুগলী থেকে চুঁচুড়ায় কুঠি সরিয়ে নিয়ে আসা হলেও নথিপত্রে বরাবর তাকে হুগলী কুঠি বলেই উল্লেখ করা হতো।[১৪]

বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা

ইংরেজ কোম্পানির মতো ওলন্দাজরা কোন বাদশাহী ফরমানের বলে কোন সময়েই শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের সুবিধা পায় নি। সতেরো শতকের শেষ দুই দশক এবং আঠারো শতকের প্রথমার্ধে তারা শতকরা ৩.৫০ ভাগ হারে বাণিজ্যশুল্ক দিত।[১৫] তবে শাহজাহান, আওরঙ্গজেব, শাহ্ আলম ও জাহান্দার শাহ্ প্রদত্ত নানা ফরমানের ভিত্তিতে ওলন্দাজ কোম্পানি বাংলায় বাণিজ্যের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পণ্যদ্রব্য চলাচলের উপর কর থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পেয়েছিল।[১৬] ১৬৪২ সালের নভেম্বর মাসে শাহজাহানের ফরমান প্রথম কোম্পানিকে এই সুবিধা দেয়।[১৭] এই কর থেকে অব্যাহতি বেশ গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা ছিল, কারণ তাতে কোম্পানি এই অঞ্চলের সবচেয়ে সস্তা বাজারে জিনিস কিনে সবচেয়ে চড়া বাজারে বিক্রি করতে পারতো। মুগল রাষ্ট্র ওলন্দাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের এই সুবিধা দিয়েছিল যাতে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বাণিজ্যশুল্ক থেকে রাজ্যের রাজস্বআয় বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বাণিজ্য বৃদ্ধি পেলে রাজ্যে সোনা-রূপার আমদানিও বৃদ্ধি পায়। কোম্পানির কুঠির প্রধান কর্মচারী দস্তক নামক এক অনুমতিপত্র পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে পাঠাতো, যার বলে রাহাদারি বা পথকর থেকে অব্যাহতি

---

১৪. প্রাগুক্ত, 39-40.

১৫. ঐ, 42

১৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ঐ, 37, 38, 41, 42.

১৭. ঐ, 38.

পাওয়া যেতো। যেখান থেকে পণ্য পাঠানো হতো, সেখানকার রাজস্ববিভাগের কর্মচারী রওয়ানা বা ছাড়পত্র দিত, যার ফলে এসব পণ্যের উপর পথকর দিতে হতো না। কিন্তু স্থানীয় রাজকর্মচারীরা পথকর থেকে রেহাই দেয়ার ব্যাপারটি সুনজরে দেখতো না এবং প্রায়ই কোম্পানির এই সুবিধাভোগে বাধা দিত। তার কারণ হলো, কোম্পানি প্রায়ই এই সুযোগের অপব্যবহার করে এশীয় বণিকদের পণ্যও শুল্কমুক্ত করে দিত। তাছাড়া কোম্পানির কর্মচারীরা প্রায়ই এশীয় বণিকদের কাছে দস্তক বিক্রি করতো, যার ফলে এশীয় বণিকরা তাদের পণ্যেরও কোন শুল্ক দিত না। তাতে রাজ্যের ন্যায্য প্রাপ্য রাজস্ব থেকে সরকার বঞ্চিত হতো। তার উপর কোম্পানি জিনিসপত্রের দাম কম দেখিয়ে সঠিক মূল্যের উপর যে শুল্ক হতো তা ফাঁকি নিত। ১৬৭১ সালের একটা হিসাবে দেখা গেছে যে, পূর্বের ১৬ বছরে ওলন্দাজ কোম্পানি মোট দেয় করের ১৪ শতাংশ কম দিয়েছে। আর কোম্পানি যে বছর খুব ভাল বাণিজ্য করেছে সে বছর এই শুল্কফাঁকির পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত হতো।[১৮]

ফরাসী কোম্পানি ও অন্যান্য ইউরোপীয়গণ

বাংলার বাণিজ্যজগতে ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আবির্ভাব ঘটে সতেরো শতকের শেষভাগে। তার মূলে রয়েছে সমসাময়িক ইউরোপে 'ভারতীয়' জিনিসের প্রতি অস্বাভাবিক ঝোঁক। বাংলার কাপড়ের সন্ধানেই প্রধানত ফরাসীরা এখানে আসে। ১৬৮১ থেকে ১৬৮৭ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক অনুসন্ধানে উৎসাহিত হয়ে পন্ডিচেরীর সুচতুর গভর্নর ফ্রাঁসোয়া মার্তে তাঁর জামাতা দ্যেলন্দেকে বাংলায় পাঠান স্থায়ী কুঠি স্থাপনের জন্য। এভাবে ১৬৯১ সালে ফরাসীরা চন্দননগরে নিজেদের কুঠি স্থাপন করে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করতে সক্ষম হয়।[১৯] ডুপ্লের নেতৃত্বে অল্পকাল ছাড়া ফরাসীরা বাংলার বাণিজ্যজগতে কখনোই তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে নি। বাংলায় বাণিজ্য শুরু করার পর প্রথম তিন দশক তাদের পক্ষে সময় খুব কঠিন ছিল। মুগল সম্রাট আওরঙ্গজেব ও ফররুখশিয়রের কাছ থেকে প্রাপ্ত দু'টি বাদশাহী ফরমানের বলে তারা ওলন্দাজদের মতো বাণিজ্যিক সুবিধা এখানে পেয়েছিল।[২০] কিন্তু এক্ষেত্রেও স্থানীয় শাসকগোষ্ঠী প্রায়ই এসব সুবিধাভোগে বাধার সৃষ্টি করেছে। ১৭৩০-এর দশকের প্রথমদিকে ডুপ্লে চন্দননগরে পৌঁছে দেখেন, এসব বাধার সম্মুখীন হয়ে ফরাসী বাণিজ্য প্রায় বন্ধ। কিন্তু তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে

১৮. প্রাগুক্ত, 46.

১৯. Indrani Roy, "The French Company and the Merchants of Bengal, 1680-1730", *Indian Economic and Social History Review*. (এখন থেকে *IESHR*), VIII: 1 (1971), 41-42.

২০. Indrani Roy, "Some Aspects of French Presence in Bengal", *Calcutta Historical Journal*. (এখন থেকে *CHJ*), 1: 1 (1976) ,91,97.

একদিকে ফরাসী কোম্পানির বাণিজ্য এবং অন্যদিকে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা পরবর্তী দশ বছরে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। চন্দননগরের গভর্নর হিসেবে ডুপ্লের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফরাসীদের বাণিজ্যিক অগ্রগতি, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল নয়। ১৭৩১ থেকে ১৭৪২ সালের মধ্যে তিনি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের জন্য ৯০টি সমুদ্রঅভিযানের ব্যবস্থা করেছিলেন।[২১] তাঁর নেতৃত্বে ফরাসীরা বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্যের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলো। ফরাসী বাণিজ্যের, বিশেষকরে ফরাসীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের হঠাৎ বিপুল বিস্তারে ইংরেজরা শঙ্কিত হয়ে পড়লো।[২২] চন্দননগরের গভর্নর হিসেবে ডুপ্লের শাসনকাল সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তিকে মিথ্যে অহঙ্কার বলে মনে হয় না :

> আমি ইংরেজদের প্রচণ্ড ভয় পাইয়ে দিয়েছি, কারণ (এই কয়েক বছরের মধ্যে) তারা দেখলো যে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে গেছে এবং তাদের বণিকগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকে নিজেদের দেউলিয়া বলে ঘোষণা করেছে। মাত্র ৯ বছরে আমি এই কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি।[২৩]

ডুপ্লের প্রস্থানের পর ফরাসী বাণিজ্যের ব্যাপক অবনতি লক্ষ্য করা যায়। তবে ১৭৪০ সালের শেষ দিক থেকে ১৭৫০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ফরাসীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের বেশ কিছুটা পুনরুত্থান ঘটে।

অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানির মধ্যে এই সময় বাংলায় বাণিজ্য করতে এসেছিল দিনেমার ও অসটেন্ড কোম্পানি। ১৭৭৬ সালে দিনেমাররা বাংলার সুবাদার নবাব শায়েস্তা খানের কাছ থেকে হুগলী নদীর তীরে কুঠি স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। তারা বাংলায় শুল্কমুক্ত বাণিজ্য করার জন্য ফরমান জোগাড় করার চেষ্টাও করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। এদিকে কিছুদিন পর বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খানের বিরাগভাজন হওয়ার ফলে তাদের হুগলী থেকে বিদায় নিতে হয়। এর বেশ কিছুদিন পরে ১৭৫৫ সালে নবাব আলিবর্দী খানের অনুমতি লাভ করে তারা শ্রীরামপুরে নিজেদের আবার প্রতিষ্ঠিত করে।[২৪] ফ্লেমিশ বণিকদের দ্বারা গঠিত অসটেন্ড কোম্পানির পিছনে অস্ট্রিয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের মদদ ছিল। বাংলার নবাবের অনুমতি নিয়ে খুব সহজেই তারা বাঁকিবাজারে কুঠি স্থাপন করে।

---

২১. Dupleix's trade দেখুন, Indrani Roy, "Dupleix's Trade at Chandernagore", *Indian Historical Review*, এখন থেকে *IHR*), 2 (1974), 279-94.

২২. Sushil Chaudhuri, *Trade, Bullion and Conquest : Bengal in the Eighteenth Century*, Presidential Address, Medieval India Section, Golden Jubilee Session, Indian History Congress, December, 1989.

২৩. Virginia M Thompson, *Dupleix and his Letters*, 1742-54, (New York 1933), 723.

২৪. S. Bhattacharyya, *East India Company*, 78-79.

ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী কোম্পানির সমবেত বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা কিছুদিন ভালই ব্যবসা-বাণিজ্য করে। আলেকজান্ডার হিউম নামের এক পলাতক ইংরেজ অভিযাত্রী বাংলায় অস্টেন্ড কোম্পানির কর্ণধার হন এবং তাঁর পরিচালনায় কোম্পানি কিছুদিন বেশ উন্নতিলাভ করে। কিন্তু ১৭৩০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে অস্টেন্ড কোম্পানি বাংলার বাণিজ্যে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় এবং অবশেষে ১৭৪৪ সালে সরকারি আদেশে বাঁকিবাজারের কুঠি ভেঙে ফেলা হলে বাংলায় তাদের ব্যবসায়িক কাজকর্মের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে।[২৫]

রপ্তানিবাণিজ্যের কাঠামো ও সংগঠন

বাংলায় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির পণ্যসংগ্রহ (investment)[২৬] অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী চাহিদা ও সরবরাহের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল ছিল না। ভারতীয় অবস্থার বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানিগুলিকে নানা সমস্যার মধ্যে রপ্তানিপণ্য সংগ্রহ করতে হতো। তাদের কর্মচারীরা এখানকার বাজারের হালচাল সম্বন্ধে খুব বেশি ওয়াকেবহাল ছিল না এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা স্থানীয় ভাষাও বুঝতো না। এই অবস্থায় রপ্তানিপণ্য সংগ্রহের জন্য তাদের নির্ভর করতে হতো একশ্রেণীর মধ্যস্থ বণিকদের উপর। এইসব বণিক আবার কোম্পানির প্রধান বণিকের তত্ত্বাবধানে কাজ করতো। সাধারণত এই প্রধান বণিককে কোম্পানির নথিপত্রে ব্রোকার বা দালাল আখ্যা দেয়া হতো। এভাবে কোম্পানিগুলি বেশিরভাগ কুঠিতেই স্থানীয় দালাল নিযুক্ত করতো এবং পণ্যসংগ্রহের জন্য সম্পূর্ণভাবে তাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। কোম্পানির প্রধান বণিক অন্যান্য মধ্যস্থ বণিকদের সঙ্গে কোম্পানির পণ্যসংগ্রহের জন্য চুক্তি সম্পাদন করতে সাহায্য করতো। বস্তুত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রধান বণিক অন্য মধ্যস্থ বণিকদের নাম কোম্পানির কাছে সুপারিশ করতো। তারাই কোম্পানির ইউরোপগামী জাহাজের জন্য পণ্যসংগ্রহ করতো। কোম্পানিকে এইসব বণিকের পণ্যসংগ্রহের চুক্তির পরিমাণ অনুযায়ী দাদন বা অগ্রিম টাকা দিতে হতো। এজন্য এইসব বণিককে দাদনি বণিক নামে অভিহিত করা হতো। দাদনি বণিকেরা আবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তাদের গোমস্তাদের মাধ্যমে তাঁতী, কারিগর ও অন্যান্য প্রাথমিক উৎপাদকদের তাদের উৎপন্নদ্রব্যের জন্য অগ্রিম দিত। এই গোমস্তারা বিভিন্ন আড়ং বা উৎপাদনকেন্দ্রে ঠিকমতো পণ্য সরবরাহ ও চাহিদামতো গুণগত মান রক্ষা করা হচ্ছে কিনা তার তদারকিও করতো। তাঁতী ও অন্যান্য হস্তশিল্পী বা উৎপাদকরা অগ্রিম টাকার বিনিময়ে সময়মতো সঠিক মানের পণ্য সরবরাহ

---

২৫. ঐ, 79-95.

২৬. Investment বলতে এখানে কোম্পানির রপ্তানিপণ্য সংগ্রহ বোঝানো হয়েছে।

করতে না পারলে আর্থিক দায় দাদনি বণিকদেরই বহন করতে হতো। বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে অগ্রিম টাকার পরিমাণ শতকরা ৫০ থেকে ৮০ টাকা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।[২৭] ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির এই ধরনের রপ্তানিপণ্য সংগ্রহের রীতি 'দাদনি ব্যবস্থা' নামে পরিচিত ছিল। কলকাতার দুই বিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী ব্যবসায়ী পরিবার—শেঠ ও বসাকরা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান বণিকের কাজ করেছে বরাবর; চন্দননগরে ফরাসীদের প্রধান বণিক ছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী আর চুঁচুড়াতে ওলন্দাজদের প্রধান বণিক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন হরিকৃষ্ণ রায়।[২৮]

মূলধনের দীর্ঘস্থায়ী অভাব

রপ্তানিপণ্য সংগ্রহের ব্যাপারে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে প্রধান যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা হলো প্রয়োজনীয় মূলধনের দীর্ঘস্থায়ী অভাব। এটা আরো তীব্র আকার ধারণ করার কারণ হলো, বাংলায় ইউরোপ থেকে আমদানি করা পণ্যের তেমন চাহিদা ছিল না। কোম্পানিগুলি যে পণ্য আমদানি করতো তার পরিমাণ খুব বেশি ছিল না। তবু এই স্বল্পপরিমাণ পণ্যের বাজার ছিল সীমিত। একমাত্র যে জিনিসের নিয়মিত চাহিদা ছিল তা হলো সোনা-রূপা। কিন্তু যেহেতু এগুলির সরবরাহ হতো বিশেষ মরশুমে এবং সীমিত পরিমাণে, সেহেতু কোম্পানিগুলিকে বাংলায় পণ্যসংগ্রহের জন্য বাড়তি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হতো। তাছাড়া ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত সোনা-রূপা স্থানীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করার ব্যাপারে কোম্পানিকে অদ্ভুত সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। আর এক সমস্যা ছিল ভাল মরশুমে পণ্যসংগ্রহের জন্য অর্থের জোগাড় করা। এই মরশুম সাধারণত শুরু হতো ইউরোপগামী জাহাজগুলি বাংলা ছেড়ে যাবার পর। ঠিক সময়ে পণ্যসরবরাহের চুক্তি করতে না পারলে এবং পণ্যসংগ্রহে দেরি হয়ে গেলে রপ্তানিপণ্যের দাম কখনো কখনো শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ পর্যন্ত চড়ে যেতো।[২৯] তাই ইউরোপগামী জাহাজ ছাড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানিগুলিকে তাদের দাদনি বণিকদের সঙ্গে পরবর্তী বছরের পণ্য সরবরাহের চুক্তি করতে হতো। সাধারণত এরকম চুক্তি ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে করা হতো। ফলে আগের বছরের পণ্য সরবরাহের জন্য পাওনা টাকা পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গেই

---

২৭. Sushil Chaudhuri, "Merchants, Companies and Rulers, Bengal in the 18th Century", *Journal of the Economic and Social History of the Orient* (এখন থেকে *JESHO*), XXXI : pt. 1 (1988), 75-85 ; Sushil Chaudhuri, *Trade and Commercial Organization*, 158-59; Om Prakash, *Dutch East India Company*, 102-107.

২৮ দ্রষ্টব্য, Sushil Chaudhuri, "European Companies and Pre-modern South Asian Commercial System—A Study of Bengal in the Eighteenth Century", *Calcutta Historical Journal*, XI : 1-2 (1986-1987) (এখন থেকে *CHJ*), 120-33.

২৯. Despatch Book (এখন থেকে DB), Vol. 84, f. 411, 28 January 1659, India Office Library (এখন থেকে *IOL*), London.

আবার পরবর্তী বছরের পণ্য সংগ্রহের জন্য দাদনি বণিকদের আগাম দেয়ার জন্য কোম্পানির টাকার প্রয়োজন হতো। সব ইউরোপীয় কোম্পানিরই অবস্থা প্রায়শ খুব হতাশাব্যঞ্জক হয়ে পড়তো। ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের একটি আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয় :

> গত বছরের [পণ্যসরবরাহের] খাতে [দাদনি] বণিকদের কাছে আমাদের দেয় অনেক টাকা বাকি পড়ে আছে। আমাদের কাছে কোন টাকা নেই যাতে এই পাওনা মেটানো যায় বা এই বছরের চুক্তির জন্য আগাম দিতে পারি। নগদ টাকা বা সুদসহ (with interest) তমশুকের (bill) জন্য তারা চেঁচামেচি করছে—অনুযোগ করছে, তা না হলে বাধ্য হয়ে বাজার থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করে নতুন চুক্তির পণ্য সংগ্রহের জন্য তাদের আড়ং-এ পাঠাতে হবে।[৩০]

স্থানীয় ঋণবাজার

সুতরাং স্থানীয় মহাজনদের বা শরাফদের (Saraf বা Shroff) কাছ থেকে টাকা ধার করা ছাড়া ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির সামনে অর্থাভাব মেটানোর আর কোন পথ খোলা ছিল না। তবে তাদের সৌভাগ্যক্রমে বাংলার ঋণবাজার অত্যন্ত সুদক্ষ ও সুসংগঠিত ছিল। বস্তুতপক্ষে এসময় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপযোগী ঋণব্যবস্থা ও বিনিময়ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। বিশেষকরে শরাফ বলে পরিচিত এক শ্রেণীর বণিকদের কাজকর্ম অর্থনৈতিক দক্ষতার পরিচয় বহন করে। এসব থেকে এটা অবিসংবাদিত যে, ষোল শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় বাণিজ্যিক মূলধন ও ব্যবসায়িক সংগঠন যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত ছিল। ফলে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি বাংলার বাজার থেকে প্রচুর ঋণ সংগ্রহ করে তাদের মূলধনের তীব্র অভাব মেটাবার চেষ্টা করেছে। অবশ্য বিভিন্ন কোম্পানি বছরে কি পরিমাণ ঋণ করেছে তার কোন সুসংবদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানা বিবরণী থেকে বিভিন্ন সময়ে ইউরোপীয়দের ঋণের পরিমাণ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৩১]

১৭২০-২১ সালে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির ঋণের পরিমাণ ছিল ২৪ লক্ষ টাকা। আর ১৭৪৭-৪৮ সালে সুদের পরিমাণ ছাড়াই ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৫.৫০ লক্ষ টাকা।[৩২] ওলন্দাজ কোম্পানিও স্থানীয় ঋণবাজার থেকে ধার নিয়েছে প্রয়োজনমতো। ১৭২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাশিমবাজারের বণিক/মহাজনদের কাছে ওলন্দাজ কোম্পানির ঋণের

৩০. Bengal Public Consultations (এখন থেকে B.P.C.) Range 1, Vol 4, ff. 404vo-405, 29 May 1751, IOL.

৩১. বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, Sushil Chauduri, "European Companies and Pre-modern South Asian Commercial System", *CHJ* ,135-47.

৩২. D.B., Vol. 101 ,f. 372, para 32, 21, December 1722; Coast and Bay Abstracts (এখন থেকে C&B Abstr.) Vol. 5, f. 117, para 261, 10 January 1748, IOL .

পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ টাকা।[৩৩] ১৭৫৪ সালের মার্চ মাসে বাংলায় ওলন্দাজ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ফ্লোরিন ৪২৪৬৯০২-১০-৮ বা টাকা ২৮,৩১,২৬৮।[৩৪] ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির উত্তমর্ণতালিকায় প্রধানতম ছিল জগৎশেঠ পরিবার। এর পরে প্রথমে কাশিমবাজার ও পরে কলকাতাবাসী কাট্‌মাদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।[৩৫] ফরাসী ও অস্‌টেন্ড কোম্পানিও স্থানীয় বাজার থেকে প্রায়ই ধার নিয়েছে। স্থানীয় শরাফ/মহাজন ও বণিকরা অস্‌টেন্ড কোম্পানিকে ঋণ দিয়েছে। ১৭৩০ সালে আলেকজান্ডার হিউম জানাচ্ছেন যে, অন্যান্য মহাজনদের মধ্যে জগৎশেঠ ফতেহচাঁদের নিকটাত্মীয় নয়নসুখ বাবু কোম্পানিকে প্রচুর টাকা ধার দিয়েছেন।[৩৬] পণ্যসংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন জোগাড় করতে ফরাসীরাও একইভাবে টাকার জন্য স্থানীয় বাজারের উপর নির্ভর করতো। তাদের কাছেও প্রধান উত্তমর্ণ হিসেবে জগৎশেঠ ছিলেন অপরিহার্য। ডুপ্লে ফতেহচাঁদকে 'ইহুদীদেরও অধম' এবং 'আমাদের কসাই' ইত্যাদি বলে অভিহিত করলেও তাঁকে প্রায়ই ফতেহচাঁদদের কাছ থেকে এক থেকে তিন লক্ষ টাকা ধার করতে হয়েছে।[৩৭] কাশিমবাজারের ধনী ও ক্ষমতাশালী বণিক/মহাজন পরিবার কাট্‌মাদের কাছ থেকেও তাঁকে ঋণ নিতে হয়েছে।[৩৮] তবে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির কাছে এ যুগের সবচেয়ে প্রধান উত্তমর্ণ জগৎশেঠ পরিবার। ১৭৫৫ থেকে ১৭৫৭ সাল এই তিন বছরে জগৎশেঠদের কাছ থেকে ওলন্দাজ কোম্পানির ঋণের পরিমাণ ছিল ২৩,৮৫,৮০৩ টাকা।[৩৯] ১৭৫৭ সালের মার্চে চন্দননগরের পতনের সময় তাদের কাছ থেকে ফরাসী ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ টাকা।[৪০] কলকাতার বাসিন্দা ক্যাপ্টেন ফেন্‌উইক ১৭৪৭-৪৮ সালে ফরাসী ঋণের পরিমাপ করেছে ১৭ লক্ষ টাকারও বেশি আর উইলিয়ম ওয়াটস্‌ ১৭৫৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ক্লাইভকে লিখেন যে, "শেঠদের কাছ থেকে ফরাসী ঋণের পরিমাণ ১৩ লক্ষ টাকার মতো।"[৪১]

৩৩. Vereenighde Oost Indische Compagnie (এখন থেকে V. O. C.), 2030, ff. 156, 58, Hughli to Batavia (এখন থেকে HB), 16 March 1725.

৩৪. V.O. C., 2829 (earlier Kolonial Archief, এখন থেকে K. A. 2721), ff. 126-27.

৩৫. Sushil Chaudhuri, "European Companies", *CHJ*, 136-42.

৩৬. Alexander Hume's "Memorie", Stadsarchief Antwerpen, 5769, Antwerp. কে. এন. চৌধুরীর কপি থেকে আমি এটা কপি করেছি।

৩৭. Indrani Roy, " Some Aspects of French Presence in Bengal", *CHJ*, 99.

৩৮. ঐ, 100-101.

৩৯. Computed and Compiled from V.O. C. 2874.

৪০. J. H. Little, *The House of Jagat Seth*, Introduction by N.K. Sinha, (Calcutta 1967), XI.

৪১. Orme Mss., *India* VI, f. 1525, IOL, Watts' Letter to Clive, 18 February 1757.

বাংলার মূলধনের বাজার ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির অর্থাভাবের নিয়ত সমস্যাকে বেশ কিছুটা সহজ করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু স্থানীয় মহাজন/ বণিকদের কাছ থেকে সব সময় ঋণ সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে খুব সহজসাধ্য কাজ ছিল না। এক্ষেত্রে একটি প্রধান সমস্যা ছিল, ঋণ পাওয়া যেতো সাধারণত খুব অল্প সময়ের জন্য, দীর্ঘমেয়াদি ঋণের প্রচলন প্রায় ছিল না, ঋণ পাওয়া যেতো সাধারণভাবে শুধু কয়েক মাসের জন্য। সুদের পরিমাণ মাসিক হারে নির্ধারিত হতো আর কোন ক্ষেত্রেই ঋণের মেয়াদ খুব বেশি হলে এক বছরের বেশি হতো না।[৪২] তার ফলে শরাফ ও বণিক/মহাজনরা, এমনকি প্রতাপশালী ব্যাঙ্ক এবং মহাজন জগৎশেঠ পরিবারও ইউরোপ থেকে সোনা-রূপা নিয়ে জাহাজ আসা মাত্রই তাদের টাকা দাবি করে বসতো। জগৎশেঠরা পর্যন্ত কোম্পানিকে শাসাতো যে, নির্ধারিত সময়ে তাদের ঋণ শোধ না করলে তারা বাংলায় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেবে। ঋণ শোধ করতে ইউরোপীয়দের দেরি হলে তাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা হতো তার পরিচয় পাওয়া যায় ঢাকার ইংরেজ কুঠিয়ালদের ১৭৪৯ সালের নভেম্বরের চিঠি থেকে। চিঠিতে তারা জানাচ্ছে, জগৎশেঠ মাহতাব রায়ের গোমস্তা তার মনিবের পাওনা টাকা ফেরত দেয়ার জন্য "প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে, এমনকি এই বলে শাসাচ্ছে যে টাকা ফেরত না পেলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেয়া হবে।"[৪৩]

বাংলার ঋণবাজারে কখনো কখনো বিভিন্ন কারণে যথেষ্ট টাকার অভাব দেখা দিত বলে ইউরোপীয়দের পক্ষে মূলধন সংগ্রহ করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়তো। এরকম সাময়িক অভাবের একটি প্রধান কারণ হলো, শরাফ ও বণিক/মহাজনরা তাদের অর্থসম্পদ দেখাতে অনিচ্ছুক ও ভীত ছিল. পাছে নবাব বা তাঁর কর্মচারী জোর করে কিছু আদায় করে বসে। যদিও সাধারণভাবে আলোচ্য সময়কালের পুরোটাতেই এটা সত্য, তবু চল্লিশের দশক ও পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে মারাঠা আক্রমণের সময় এই অবস্থা চরমে উঠে। জগৎশেঠদের মতো বিখ্যাত ও প্রতাপশালী মহাজন পরিবারেও এই ভীতি সঞ্চারিত হয়। ১৭৪৬ সালে লেখা কাশিমবাজারের চিঠিতে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে :

> তাদের [কাশিমবাজারের] ধার পাবার আর কোন আশাই নেই, কারণ অর্থাভাব এত বেশি যে এমনকি ফতেহচাঁদের পরিবারও বহু কষ্টে (তাদের কাছ থেকে কেনা) সোনা-রূপার দাম দিতে

৪২. Sushil Chaudhuri," European Companies and Pre-modern South Asian Commercial System", *CHJ*, 143-44.

৪৩. *Factory Records*, Dacca, Vol. 3, 9 November 1749; B. P.C., Range 1, Vol. 22, f. 420 vo. 15 November 1749, IOL.

> পেরেছে…অন্তত আমাদের মনে হয়, যদি তাদের (শেঠদের) টাকা থাকেও, নবাবের ভয়ে তারা সে টাকা বার করতে ভরসা পাচ্ছে না।[৪৪]

বাংলায় মূলধনের বাজারে অর্থাভাবের আরেকটি প্রধান কারণ, বাজারে টাকা পাওয়া না পাওয়া বহুল পরিমাণে নির্ভর করতো আগ্রায় টাকার বিনিময়হারের উপর। যদি সেখানে বিনিময়ের হার চড়া থাকতো, তাহলে বাংলায় টাকা পাওয়া দুর্লভ হতো, কারণ শরাফ ও বণিক/মহাজনরা তখন তাদের টাকা আগ্রায় পাঠিয়ে দিত এবং এভাবে টাকা খাটানো বাংলায় শতকরা ১২ টাকা হারে সুদে ধার দেয়ার চাইতেও অনেক বেশি লাভজনক ছিল। সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও আঠারো শতকের প্রথমদিকে বাংলায় আর্থিক বাজারের এই ছিল সাধারণ চিত্র। ১৭০০ সালে কাশিমবাজার কাউন্সিলের লেখা চিঠিতে অনুরূপ বক্তব্য প্রকাশ পায় :

> এখানে সুদে কোন টাকা আমরা ধার করতে পারছি না, কারণ দেশে নগদ টাকার খুবই অনটন। এখান থেকে দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে চলতি বিনিময়দর শতকরা ৬ এবং শ্রফরা (শরাফ বা স্রফ বা বণিক/মহাজন) হাতের নগদ টাকা সবটাই এই বিনিময়বাজারে খাটাচ্ছে।[৪৫]

১৭৪০ সাল পর্যন্ত বাংলায় সুদের হার ছিল চড়া। তাই ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির স্থানীয় বাজার থেকে টাকা ধার করার সমস্যাও ছিল। ইংরেজ কোম্পানির কর্তৃপক্ষ লন্ডন থেকে বারংবার লিখে পাঠাচ্ছিল শতকরা ১২ টাকা সুদে যেন বাজার থেকে টাকা ধার করা না হয়—এই সুদের হার তারা অত্যধিক বেশি মনে করতো এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে 'বিষবৎ' ক্ষতিকর গণ্য করে কর্মচারীদের ধার নিতে নিরুৎসাহিত করতো। বিভিন্ন কুঠিতে পাঠানো চিঠিতে তারা ধার না করে কাজ চালাতে পরামর্শ দিত, কারণ এই ধারের সুদ শোধ করতে গিয়ে কোম্পানির লাভ অনেক কমে যেতো।[৪৬] জগৎশেঠরা এবং তাদের অনুকরণে অন্যান্য শরাফরা অবশ্য ১৭৪০ সাল থেকে সুদের হার কমিয়ে শতকরা ৯ টাকা করে দেয়। তা সত্ত্বেও কোম্পানিগুলির পক্ষে সব সময় বাজারে টাকা ধার করা সম্ভব হতো না।[৪৭] ফরাসী কোম্পানির কর্মচারীরা লিখছে : "এখানে বেশি লোক পাওয়া যাবে না, যারা টাকা ধার দেবে বা অনেক সুদ নিয়েও বেশি দিনের জন্য টাকা ধার দেবে।"[৪৮] এসব সত্ত্বেও কিন্তু একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, ইউরোপীয়

৪৪. *Factory Records*, Kasimbazar, Vol. 7, 22 January 1746; B. P. C., Range 1, Vol. 18, f 265vo, 30 June 1746, IOL.

৪৫. *Factory Records*, Calcutta, Vol. 10, pt. II, f. 92, IOL.

৪৬. D. B., Vol 95, f. 519, 18 January 1705.

৪৭. Sushil Chaudhuri, " European Companies and Pre-modern South Asian Commercial System", *CHJ*, 146.

৪৮. Indrani Roy, " The French Company and the Merchants of Bengal", *IESHR*, 51.

কোম্পানিগুলির দীর্ঘস্থায়ী মূলধনের অভাব বাংলার স্থানীয় ঋণবাজার অনেকাংশেই মেটাতে সক্ষম হয়েছে।

টাঁকশাল ও বাজারে সোনা-রূপা বিক্রি

ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির পক্ষে তাদের পণ্যক্রয়ের জন্য নগদ টাকার সমস্যার অনেকখানিই লাঘব হতো যদি তারা ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত সোনা-রূপা টাঁকশালে পাঠিয়ে সোজা দেশীয় মুদ্রা তৈরির অবাধ অধিকার পেতো। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তারা বাংলায় টাঁকশাল নিয়মিত ব্যবহারের কোন অনুমতি বাংলার নবাবদের কাছ থেকে আদায় করতে পারে নি। এ পথে তাদের সবচেয়ে বড় বাধা ছিল জগৎশেঠ পরিবার। আঠারো শতকের ত্রিশের দশকের প্রথমদিক থেকে জগৎশেঠরা টাঁকশালে মুদ্রাকরণের প্রায় একচেটিয়া অধিকার ভোগ করতে শুরু করে। টাঁকশালে সোনা-রূপা পাঠিয়ে দেশীয় মুদ্রাকরণ যেহেতু একটি প্রধান সুবিধা এবং কোম্পানিগুলির বাণিজ্যের পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক, তাই বিভিন্ন কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ইউরোপ থেকে এদেশে তাদের কর্মচারীদের এই সুবিধা আদায় করার জন্য বার বার নির্দেশ দিয়েছে। লন্ডন থেকে ইংরেজ কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরস এই মর্মে তাদের একটি চিঠিতে লিখে :

> আমরা আশা করি যে আমাদের নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিল তাদের দক্ষতা ও উদ্যমের পবিচয় দিয়ে অন্যান্য কার্যকলাপের সঙ্গে মুদ্রাকরণের সুবিধাও আদায় করতে সক্ষম হবে। আমরা বহুবার একান্তভাবে আপনাদের তাগিদ দিয়েছি এ সুবিধা আদায়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে। আপনাদের বহুবার জানিয়েছি টাঁকশালের সুবিধা না পাওয়াতে আমাদের কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে। বাজারে রূপা বিক্রি করে ও আমাদের মাদ্রাজ টাকায় বাট্টা দিয়ে এবং আরো কতোভাবে যে আমাদের লোকসান হচ্ছে তা বলে শেষ করা যায় না।[৪৯]

কিন্তু ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অস্টেন্ড কোম্পানির প্রধান আলেকজান্ডার হিউম ১৭৩০ সালে লিখছেন যে, টাঁকশালে মুদ্রাকরণের বিশেষ চেষ্টা তিনি করেন নি পাছে "ফতেহচাঁদের মতো বন্ধু হারাতে হয়, কারণ টাঁকশালের কারবারের প্রায় সবটাই একচেটিয়া ফতেহচাঁদের হাতে।"[৫০] এমনকি ১৭৫৫ সালে কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়াল উইলিয়ম ওয়াটস্ জানাচ্ছেন যে, কলকাতায় টাঁকশাল তৈরির প্রস্তাব নবাবের কাছে অগ্রাহ্য হবে, "কারণ জগৎশেঠরা তাতে একেবারেই রাজী হবে না। ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত সব সোনা-রূপার তারাই একমাত্র ক্রেতা—ফলে এই লাভজনক ব্যবসা তারা (জগৎশেঠরা) হাতছাড়া হতে দেবে না।"[৫১]

৪৯. D. B. Vol. 101. f. 162, para 56, 15 February 1722.

৫০. Hume's "Memorie".

৫১. C & B Abstr., Vol., 5 f 399, 12 February 1753; Bengal Letters Received, Vol. 22, ff. 384-85, 8 Februray 1753, IOL.

বাংলার খোলা বাজারে সোনা-রূপা বিক্রি করতে পারলেও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির অবস্থা অনেক ভাল হতো। কিন্তু টাঁকশালের কারবার জগৎশেঠদের প্রায় একচেটিয়া হওয়ায় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে সোনা-রূপা জগৎশেঠদের কাছেই বিক্রি করতে হতো এবং জগৎশেঠরা যে দাম দেবে সে দামেই। বলাবাহুল্য, এই দাম খোলা বাজারের দামের চাইতে কম। ফলে কোম্পানিগুলির প্রচুর ক্ষতি হতো। রূপার দাম নিয়ে কোম্পানিগুলির সঙ্গে প্রায়ই জগৎশেঠদের দরকষাকষি হতো। কোম্পানিগুলি চেষ্টা করতো একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ নিয়ে যাতে জগৎশেঠরা সোনা-রূপার জন্য তাদের কাছে বাজারের চাইতে কম দাম গছাতে না পারে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রায়ই সফল হতো না। ১৭৪৩ সালে রূপার দাম নিয়ে এরকম দরকষাকষির সময় কলকাতা কাউন্সিল কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়ালদের লিখে, দাম নিয়ে ফতেহচাঁদের কাছে দরবার করেও "যদি ফল পাওয়া না যায়", তাহলে জগৎশেঠদের দামেই যেন রূপা তাদের কাছে বিক্রি করা হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে একথা যেন "তাদের জানিয়ে দেয়া হয় যে, এরকম করলে ভবিষ্যতে আমরা এদেশে সোনা-রূপা আমদানি করা বন্ধ করে দেব।"[৫২] শেঠরা অবশ্য ভাল করেই জানতো যে, বাংলায় রপ্তানিপণ্য সংগ্রহের জন্য কোম্পানির পক্ষে এদেশে সোনা-রূপা আমদানি না করে উপায় নেই। ফলে ইংরেজদের হুমকিতে তারা কর্ণপাতও করে নি। ফরাসী ও ওলন্দাজ কোম্পানিকেও একই ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ১৭৪৩ সালের ১৮ নভেম্বরের কনসালটেশনস্ থেকে তা সুস্পষ্ট :

> আমাদের মতো ফরাসীরাও দারুণ দ্বিধায় পড়েছে। সোনা-রূপা তাদের কুঠিতে পড়ে আছে, কিন্তু তার দরদাম নিয়ে এখনও জগৎশেঠ ফতেহচাঁদের সঙ্গে কোন বোঝাপড়া হয় নি। ওলন্দাজদেরও অবস্থা একই রকম—একটা টাকাও এখনো তারা টাঁকশাল থেকে পায় নি, কারণ নবাবের সঙ্গে বিবাদের কোন নিষ্পত্তি এখনো হয় নি।[৫৩]

ফরাসীরা অভিযোগ করে যে, প্রচণ্ড প্রতাপশালী 'হিন্দু' ফতেহচাঁদের অর্থলিপ্সার জন্যই তাদের টাঁকশালে রূপা পাঠিয়ে মুদ্রা তৈরির সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বাধ্য হয়ে তারা তাদের আমদানিকৃত সব সোনা-রূপা জগৎশেঠদের কাছে বিক্রি করেছে শেঠদের স্থির করা দামে—এতে তাদের শতকরা ৪ ভাগ ক্ষতিস্বীকার করতে হয়েছে।[৫৪]

রপ্তানিপণ্য

বাংলা থেকে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির প্রধান রপ্তানিদ্রব্য ছিল বস্ত্র, কাঁচা রেশম ও সোরা। ছোটখাটো রকমারিদ্রব্যও অবশ্য রপ্তানিতালিকায় ছিল। তার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ছিল

৫২. B. P. C., Range 1, Vol. 16, f. 333, 9 November 1743.
৫৩. *Factory Records*, Kasimbazar, Vol. 6, Consultations, 18 November 1743.
৫৪. Indrani Roy, " Some Aspects of the French Presence in Bengal", *CHJ*, 97.

চিনি, চাল, গম, ঘি ও সরষের তেল। তাছাড়া মোম, বোরাক্স (borax), গালা, কড়ি ও চটের থলিও রপ্তানি হতো। প্রধান তিনটি রপ্তানিদ্রব্যের মধ্যে প্রথমদিকে সোরাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সতেরো শতকের সত্তরের দশক থেকে কাঁচা রেশম রপ্তানি যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে এবং আশির দশকে রেশমরপ্তানি অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। তেমনিভাবে সত্তরের দশক পর্যন্ত বস্ত্ররপ্তানির পরিমাণ ছিল নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু আশির দশক থেকে ইউরোপে বাংলার বস্ত্ররপ্তানি আশ্চর্য রকমে বৃদ্ধি পায়। এর কারণ, ঐসময় ইংল্যান্ড এবং ইউরোপে বাংলার সস্তা কাপড় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং এর চাহিদাও খুব বেড়ে যায়। তারপর থেকে ইউরোপের বাজারে যেমন বাংলার কাপড়ের চাহিদা ক্রমশ বাড়তে থাকে, তেমনি বাংলা থেকে কোম্পানিগুলির রপ্তানির পরিমাণও আনুপাতিকভাবে বেড়ে চলে। ফলে আমাদের আলোচ্য সময়ের শেষ অবধি বাংলা থেকে ইউরোপীয় বিভিন্ন কোম্পানির রপ্তানিপণ্যতালিকায় বস্ত্রই সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করেছিল। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির রপ্তানিদ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন পণ্যের আনুপাতিক অংশ নিম্নোক্ত সারণি থেকে জানা যাবে :

সারণি ১ : বাংলা থেকে ইংরেজ-ওলন্দাজ রপ্তানিপণ্যের আনুপাতিক হার (শতকরা)

পণ্য	ইংরেজ		ওলন্দাজ	
	বছর ১৬৭৫-৭৬	বছর ১৭০১-১৭০২	বছর ১৬৭৫-৭৬	বছর ১৭০১-১৭০২
বস্ত্র	৭১	৭১	২১.৯৩	৫৪.১৯
কাঁচা রেশম	১২	২২	৩৯.৫৭	২৯.৪৪
সোরা	১১	১	১২.১১	৫.৭১
আফিম	x	x	৬.৬৪	৭.০৮
অন্যান্য	৬	৬	১৯.৭৫	৩.৫০
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০

[সূত্র : সুশীল চৌধুরী, *ট্রেড এ্যান্ড কমার্শিয়াল অরগানাইজেশন ইন বেঙ্গল*, ২৫৩-২৫৪; ওম প্রকাশ, *দি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ্যান্ড দি ইকনমি অব বেঙ্গল*, ৭২]

যদিও ওলন্দাজ কোম্পানির রপ্তানিবাণিজ্যের সঠিক পরিমাণ সম্বন্ধে তথ্য এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই, তবু আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশকে ইংরেজ কোম্পানির রপ্তানিবাণিজ্যের যে তথ্য আমরা পাই, তা থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোম্পানিগুলির রপ্তানিপণ্যের আনুপাতিক হার প্রায় একই রকমের ছিল—সর্বপ্রধান স্থান বস্ত্রের, তারপর যথাক্রমে কাঁচা রেশম ও সোরার স্থান।

সারণি ২ : বাংলা থেকে ইংরেজ রপ্তানিপণ্যের আনুপাতিক হার (শতকরা)

পণ্য	বছর ১৭১২-১৩	বছর ১৭১৪-১৫	বছর ১৭১৬-১৭	বছর ১৭১৯-২০
বস্ত্র	৮৩	৮৩	৭১	৯১
কাঁচা রেশম	৭	১১	২১	৫
সোরা	৪	৪	৪	৩
অন্যান্য	৬	২	৪	১
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০

সূত্র : সুশীল চৌধুরী : *ট্রেড এ্যান্ড কমার্শিয়াল অরগানাইজেশন ইন বেঙ্গল,* ২৫৪।

প্রথমদিকে বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্যের মোট মূল্য তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। যেমন, ১৬৫২ সালে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির পণ্যসংগ্রহের মোট মূল্য ছিল ৭০০০ পাউন্ড বা ৫৬,০০০ টাকা। আর ঐ বছরে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ওলন্দাজ রপ্তানির মোট মূল্য ছিল ৬,৮৫,২৮০ ফ্লোরিন বা ৪,৫৬,৮৫৩ টাকা।[৫৫] তবে, বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির রপ্তানিবাণিজ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৭৩০-এর দশক পর্যন্ত এই বাণিজ্যে ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষণীয়। অবশ্য এর মাঝে কিছুদিন নানা কারণে, যেমন ইউরোপ ও ভারতবর্ষে যুদ্ধবিগ্রহ এবং বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ব্যাহত হয়েছে। সতেরো শতকের মাঝামাঝি ইংরেজ বাণিজ্যের হঠাৎ বিশেষ গতিবৃদ্ধি হয়—১৬৭৫-৭৬ এবং ১৬৭৬-৭৭ এই দু'বছরের রপ্তানিপণ্যের গড়পড়তা মূল্য দাঁড়ায় ৪,৪৩,৩৭৬ টাকা। অবশ্য ওলন্দাজ রপ্তানির পরিমাণ ইংরেজ রপ্তানিকে ম্লান করে দেয়—ঐ সময় ওলন্দাজদের রপ্তানির মোট মূল্য ছিল ১৮,৫৫,৪৭৩ টাকা।[৫৬] সতেরো শতকের শেষ দশকে ওলন্দাজ রপ্তানির পরিমাণ মোটামুটি এরকমই ছিল। এই শতকের শেষ দু'বছর ১৬৯৮-৯৯ ও ১৬৯৯-১৭০০ সালে ওলন্দাজ রপ্তানি গড়ে বছরে পনের লক্ষ টাকার মতো ছিল। সারণি ৪ ও ৫ থেকে আঠারো শতকের প্রথম দুই দশকে বাংলা থেকে ওলন্দাজ ও ইংরেজ কোম্পানির মোট রপ্তানিমূল্যের তুলনামূলক হিসাব পাওয়া যাবে।

৫৫. Original Correspondence (এখন থেকে O. C.), 2246, Vol. 22, 14 January 1652, IOL, for English investment. For the Dutch exports, Om Prakash, *Dutch East India Company*, 70. The rate of Conversion £1 = Rs. 8/- and 1Re = 1.5 florin (Dutch).

৫৬. বৃটিশ পণ্যরপ্তানি সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, S. Chaudhuri, *Trade and Commercial Organization*, 253 and for Dutch exports, Om Prakash, *Dutch East India Company*, 70.

সারণি ৩ : ওলন্দাজ রপ্তানির ত্রিবাৎসরিক মোট মূল্য

সময়	মোট মূল্য (এশিয়া ও ইউরোপে রপ্তানি)	গড় (ফ্লো)	গড় (টাকা)	মোট মূল্য (ইউরোপ)	গড় (ফ্লো)	গড় (টাকা)
১৭০০/০১-১৭০২/৩	৯৮,৮২,১৩৫ ফ্লো	৩২,৯৪,০৪৫ ফ্লো	২১,৯৬,০৩০ টা:	৭৬,৩৯,৮৩৫ ফ্লো	২৫,৪৬,৬১২ ফ্লো	১৬,৯৭,৭৪১ টাঃ
১৭১০/১১-১৭১২/১৩	৯৪,১২,২৫৪ "	৩১,৩৭,৪১৮ "	২০,৯১,৬১২ "	৬৭,৪৬,৬৫২ "	২২,৪৮,৮৮৪	১৪,৯৯,২৫৬
১৭১৫/১৬-১৭১৭/১৮	১,১৫,৩৭,৬৪৬ "	৩৮,৪৫,৮৮২ "	২৫,৬৩,৯২১ "	৮৪,৫৩,৪১৮ "	২৮,১৭,৮০৬	১,৮৭,৫৩৭

[সূত্র : ওম প্রকাশের *দি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি* নামের বইটি থেকে পৃ. ৭০, ৭৬, ৭৭ থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে এখানে মোট পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে। ফ্লো= ফ্লোরিন, ১.৫ ফ্লোরিন= ১ টাকা]

সারণি ৪ : ইংরেজ রপ্তানির ত্রিবাৎসরিক মোট মূল্যের হিসাব

সময়	মোট মূল্য (পাঃ)	বার্ষিক গড় (পাঃ)	বার্ষিক গড় (টাকা)
১৭০০/১-১৭০২/০৩	৬,৯৮,৯৮৯ "	২,৩২,৯৯৬ "	১৮,৬৩,৯৭১ "
১৭১০/১১-১৭১২/১৩	৭,২১,৯২৬ "	২,৪০,৬৪২ "	১৯,২৫,১৩৬ "
১৭১৫/১৬- ১৭১৭/১৮	৬,৪৫,৪৩৬ "	২,১৫,১৪৫ "	১৭,২১,১৬৩ "

[সূত্র : সুশীল চৌধুরী, *ট্রেড এ্যান্ড কমার্শিয়াল অরগানাইজেশন*, ২৫০ থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে এখানে মোট মূল্যের হিসাব দেয়া হয়েছে।
১ পাঃ=৮ টাকা]

সারণি ৪ ও ৫ থেকে এটা স্পষ্ট যে, এশিয়া ও ইউরোপ মিলিয়ে ওলন্দাজ রপ্তানির পরিমাণ আঠারো শতকের প্রথম দুই দশকে ইংরেজ রপ্তানির চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তবে এশীয় অঞ্চলে রপ্তানি বাদ দিয়ে শুধু ইউরোপে রপ্তানির পরিমাণ ধরলে ওলন্দাজ ও ইংরেজ রপ্তানি এই সময়ে প্রায় সমমূল্যের ছিল, ইংরেজদের সামান্য একটু বেশি ছিল। কিন্তু ১৭২০-এর দশক থেকে ওলন্দাজরা ইংরেজদের রপ্তানি তুলনায় রপ্তানিবাণিজ্যে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে। ইংরেজদের বাণিজ্য ১৭৩০-এর দশকে সবচেয়ে তুঙ্গে উঠে। ১৭৩০ সাল থেকে প্রতি বছরে ওলন্দাজ রপ্তানির পরিমাণের তথ্য আমাদের কাছে এখন না থাকলেও ১৭৩০-এর দশক থেকে প্রত্যেক দশকের প্রথম তিন বছরে ওলন্দাজ রপ্তানির মোট পরিমাণ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। ইংরেজ কোম্পানির রপ্তানির সব তথ্য অবশ্য আমাদের কাছে আছে।

যাই হোক, ১৭৩০ থেকে প্রত্যেক দশকের প্রথম তিন বছরে ওলন্দাজ ও ইংরেজ রপ্তানির পরিমাণ থেকে আমরা মোটামুটি একটা তুলনামূলক চিত্র পেতে পারি।

উপরের সারণি থেকে বোঝা যায় যে, ত্রিশের দশক থেকে ইউরোপে ওলন্দাজ রপ্তানির পরিমাণ ইংরেজদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে। ১৭৩০-এর দশকেব প্রথমদিক থেকে ১৭৫০-এর দশকের প্রথমদিক পর্যন্ত ওলন্দাজদের বার্ষিক গড়পড়ভা রপ্তানিবাণিজ্যের মোট মূল্য ইংরেজ বাণিজ্যের অর্ধেকেরও কম ছিল। তবে এ সারণিতে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ওলন্দাজ রপ্তানির পরিমাণ ১৭৩০-এর প্রথমদিকে সর্বনিম্ন বিন্দুতে অবনত হলেও ১৭৪০-এর দশকের প্রথমদিক থেকে আবার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৭৫০-এর দশকের প্রথমেও সেটা বজায় থাকে। তবু তাদের রপ্তানিবাণিজ্যের পরিমাণ পুরো সময়েই ইংরেজদের রপ্তানির তুলনায় অনেক কম ছিল। বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির রপ্তানির

সারণি ৫ : ওলন্দাজ ও ইংরেজ কোম্পানির মোট রপ্তানিমূল্যের ত্রিবাৎসরিক হিসাব

সময়	ওলন্দাজ রপ্তানি (ইউরোপে) মোট মূল্য (ফ্লো)	গড় (ফ্লো)	গড় (টাকা)	ইংরেজ রপ্তানি মোট মূল্য (পাঃ)	গড় (পাঃ)	গড় (টাকা)
১৭৩০/৩১-১৭৩২/৩৩	৪৭,৪৯,৯২৬ ফ্লো	১৫,৮৩,৩০৯ ফ্লো	১০,৫৫,৫৩৯ টা:	১২,৮৭,৭৬৯ ফ্লো	৪,২৯,২৫৬ পাঃ	৩৪,৩৪,৪০৮ টাঃ
১৭৪০/৪১-১৭৪২/৪৩	৭৫,৪৬,১১৩ "	২৫,১৫,৩৭১ "	১৬,৭৬,৯১৪ "	১২,২৫,৫৬৫ "	৫,০৮,৫২২ "	৪০,৬৮,১৭৬ "
১৭৫০/৫১-১৭৫২/৫৩	৮০,৭০,৩৬৯ "	২৬,৯০,১২৩ "	১৭,৯৩,৪১৫ "	১২,৯৭,২৫৭ "	৪,৩২,৪১৯ "	৩৪,৫৯,৩৫২ "

[সূত্র : ডাচ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে V.O.C. records, Algemeen Rijkarschief, the Hague থেকে। ইংরেজ রপ্তানির জন্য কে. এন. চৌধুরী, "দি ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড অব এশিয়া" পৃ. ৫০৯-৫১০ থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে মোট পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে।]

বার্ষিক গড়পড়তা মূল্যের দীর্ঘস্থায়ী প্রবণতা বিচার করলে ১৭৩০-এর দশকের প্রথমদিক পর্যন্ত স্থির ঊর্ধ্বগতিই লক্ষ্য করা যায়। তারপর মধ্য ত্রিশের দশকে সামান্য একটু কমে গিয়ে আবার চল্লিশের দশকের প্রথমদিকে তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়। তারপর থেকে পলাশীযুদ্ধ পর্যন্ত অবশ্য ইংরেজদের রপ্তানিবাণিজ্যে ক্রমাবনতিই লক্ষণীয়। এই ধারার গতি পরের সারণি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে।

সারণি ৬ : ইংরেজ রপ্তানির পঞ্চবাৎসরিক মোট মূল্যের পরিমাণ, ১৭২৭-১৭৫৫

সময়	মোটমূল্য (পাঃ)	বার্ষিক গড় (পাঃ)	বার্ষিক গড় (টাকা)
১৭২৭-৩১	২২,৮৯,৩২৩ "	৪,৫৭,৮৬৫ "	৩৬,৬২,৯২০ "
১৭৩২-৩৬	২০,৪৬,১৫০ "	৪,০৯,২৩০ "	৩২,৭৩,৮৪০ "
১৭৪১-৪৫	২৪,০১,৭৮৫ "	৪,৮০,৩৫৭ "	৩৮,৪২,৮৫৬ "
১৭৪৬-৫০	২১,৭৩,৫২৪ "	৪,৩৪,৭০৫ "	৩৪,৭৭,৬৪০ "
১৭৫১-৫৫	২০,৩৩,২৩৫ "	৪,০৬,৬৪৮ "	৩২,৫৩,১৮৪ "

[সূত্র ঃ কে.এন. চৌধুরী রচিত, '*দি ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড অব এশিয়া*' গ্রন্থের পৃ. ৫০৯-১০ থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে এখানে মোট মূল্য হিসাব করা হয়েছে।]

ফরাসীদের বাণিজ্য তুঙ্গে উন্নীত হয় ১৭৩০-এর দশকে। এ সময় তাদের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ টাকার মতো। অস্টেন্ড ও দিনেমার কোম্পানির রপ্তানি ইংরেজ ও ওলন্দাজদের তুলনায় মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না।

সোরা

সোরা যে শুধু অত্যন্ত লাভজনক পণ্য ছিল তা নয়, ইউরোপগামী জাহাজের তলদেশ বোঝাই করে সমুদ্রপথে জাহাজের ভারসাম্য (ballast) রক্ষার পক্ষেও তা খুব উপযোগী ছিল। বারুদ তৈরির একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ হিসেবেও পাশ্চাত্যে সোরার প্রচণ্ড চাহিদা ছিল। ভারত উপমহাদেশে সোরা উৎপাদিত হতো প্রধানত গুজরাট, করোমন্ডল উপকূল ও বিহারে। সতেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে ক্রমশ বিহারই ইউরোপীয় বাজারে প্রায় একমাত্র সোরা সরবরাহকারী হয়ে উঠলো। তা থেকে বোঝা যায়, সোরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় বিহারের কতগুলি সুবিধা ছিল, যেমন অপেক্ষাকৃত কম দাম, গুণগত উৎকর্ষ এবং গঙ্গার নিকটবর্তী হওয়ায় দ্রুত অথচ সুলভে হুগলী বন্দরে রপ্তানিপণ্য পৌঁছে দেয়ার সুবিধা। সোরা প্রধানত চম্পারণ, বিহার, হাজিপুর, সরণ এবং তিরহুত

জেলায় উৎপাদিত হতো। লুজিয়া নামক সম্প্রদায়ের লোকেরাই সোরা উৎপাদন করতো। উৎপাদনের কাল ছিল নভেম্বর থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

১৬৮৮ সালের একটি ওলন্দাজ রিপোর্টে সোরা উৎপাদনের বিশদ তথ্য পাওয়া যায়, যেমন বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ, কোন্ কোন্ পরগনায় কি পরিমাণ সোরা উৎপন্ন হয়, এসব অঞ্চলের মালিক বা কর্মচারীদের পরিচয় ইত্যাদি।[৫৭] এই রিপোর্ট অনুযায়ী বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২,২৬,২০০ মণ। শোধনের পর এই পরিমাণ (এই পরিশুদ্ধ সোরাকে বলা হতো *দোবারা-কাবেসা)* দাঁড়াতো ১,২৭,২৩৮ মণে। তা থেকে হুগলীতে যেতো ১২০০ মণ, ঢাকায় যেতো ৩০০০ মণ এবং পাটনার বারুদের কারখানার জন্য রাখা হতো ৭০০০ মণ। বাকি ১,০৫,২৩৮ মণ থাকতো রপ্তানির জন্য। মোট ২৮টি পরগনায় সোরা উৎপন্ন হতো। তাদের মধ্যে ১১টি পরগনায় অপরিশোধিত সোরার ২২ শতাংশ উৎপন্ন হতো। এ পরগনাগুলি ছিল বাদশার খালসা জমি। বাকি পরগনাগুলি ছিল জায়গির। এসব জায়গিরের মালিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ওয়াজির আসাদ খান, নবাব শায়েস্তা খান ও উড়িষ্যার নবাব ইব্রাহিম খান।[৫৮]

সাধারণত তিন প্রকারের সোরা উৎপন্ন হতো—পরিশোধিত বা *দোবারা-কাবেসা* বা কাল্‌মি অর্থাৎ দুবার সিদ্ধ বা *দোবারা* এবং অপরিশোধিত বা কাঁচা।[৫৯] ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি প্রধানত পরিশোধিত সোরা রপ্তানি করতো, না হলে তা বারুদ তৈরির কাজে ব্যবহার করা যেতো না। তাছাড়, কাঁচা বা অপরিশোধিত সোরা রপ্তানি করলে অর্থনৈতিক দিক থেকে মোটেই সাশ্রয় হতো না, কারণ কাঁচা সোরা ভারী বলে এতে জাহাজভাড়ার খরচ যেতো বেড়ে। কিন্তু কাঁচা বা অপরিশোধিত সোরার উপর শুল্ক দিতে হতো একই হারে।[৬০] পরিশোধন সাধারণত সাবেকী ভারতীয় পদ্ধতি বাষ্পীকরণের মাধ্যমেই করা হতো এবং এতে মাটির পাত্র ব্যবহার করা হতো। কিন্তু বিশাল বিশাল মাটির পাত্রে পরিশোধন করা সময়সাপেক্ষ ও সমস্যার ব্যাপার ছিল, কারণ প্রায়ই পরিশোধন চলাকালে পাত্রগুলি ভেঙে যেতো। তাই কোম্পানিগুলি এই কাজের জন্য বাইরে থেকে বড় তামার পাত্র আমদানি করতো, স্থানীয় বাজারে এগুলি পাওয়া যেতো না। পরিশোধনের খরচ অবশ্য খুব সামান্যই ছিল—মণপ্রতি ৩/৪ আনা।[৬১]

—

৫৭. V.O. C. 1451 (K.A. 1343), ff. 748 vo -749 vo.

৫৮. S. Chaudhuri, *Trade and Commercial Organization*, Appendix G.

৫৯. *Factory Records*, Hughli, Vol. 10, f. 235.

৬০. D. B., Vol. 95, f. 232.

৬১. D. P. C., Range 1, Vol. 6, f. 488 vo.

সোরার ব্যবসায়ে সরবরাহের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল, বাণিজ্যের বিস্তারও সম্ভব ছিল। তবে বাধা ছিল একটাই। তা হলো স্থানীয় শাসক, উচ্চকর্মচারী ও তাদের পেটোয়া বণিকরা এই ব্যবসাকে একচেটিয়া করে তোলার জন্য সচেষ্ট ছিল। অবশ্য এ চেষ্টা তেমন জোরদার বা সংঘবদ্ধ ছিল না। বাংলার মুগল সুবাদার মীর জুমলা, শায়েস্তা খান ও আজিম-উশ-শান এই ধরনের চেষ্টা করেছেন। তবে এতে সব সময় তাঁরা খুব একটা সফল হন নি।[৬২] আঠারো শতকের চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ও পঞ্চাশের দশকে প্রথমে উমিচাঁদ ও পরে খোজা ওয়াজিদ একচেটিয়াভাবে সোরার ব্যবসা করেন। উমিচাঁদের ভাই দীপচাঁদ বিহারে সোরার প্রধান কেন্দ্র সরকার সিরঙ্গ-এর (সরণ) ফৌজদার ছিলেন।[৬৩] নবাব আলিবর্দীকে ২৫,০০০ টাকা দিয়ে ১৭৫৩ সালে ওয়াজিদ সোরার বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন। বিহারে ওয়াজিদের দুই প্রতিনিধি মীর আফজল ও খোজা আসরফ (ওয়াজিদের ভাই) ওয়াজিদের হয়ে এ ব্যবসা চালাতেন।[৬৪] এই একচেটিয়া ব্যবসার ফলে অবশ্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির পণ্যসংগ্রহে খুব অসুবিধা হয় নি, তবে তাদের অনেক সময় দাম একটু বেশি দিতে হতো। সাধারণত আসমী (assomies) বা সোরার খুচরো ব্যবসায়ীদের সাহায্যে সোরা সংগ্রহ করতে হতো। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে এদের আগাম টাকা দিয়ে সোরাসংগ্রহের জন্য চুক্তি করা হতো। মাঝে মাঝে সাধারণ ব্যবসায়ী বা দালালদের সোরা সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করা হতো। সাধারণভাবে বলা যায় যে, সোরার বাজারে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ থাকতো, বিশেষকরে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে।

সতেরো শতকের আশি ও নব্বই-এর দশকে ওলন্দাজদের সোরারপ্তানির পরিমাণ নিঃসন্দেহে ইংরেজদের পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এমনকি আঠারো শতকের প্রথম দুই দশকেও যখন বাংলা থেকে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের মোট রপ্তানির মূল্য প্রায় সমপর্যায়ের ছিল, তখন ওলন্দাজদের সোরার বাণিজ্য ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। ঐ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকেই ইংরেজদের সোরারপ্তানি বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে চতুর্থ দশকের প্রথমদিকে একমাত্র তাদের বাণিজ্য ওলন্দাজদের ১৭১০-এর দশকের বৃহত্তম পরিমাণকেও অতিক্রম করে যায়। পরবর্তী সারণি (সারণি ৭ ও ৮) থেকে তা প্রতীয়মান হবে।

৬২ S. Chaudhuri, *Trade and Commercial Organization*, 166.

৬৩. B. P. C., Range 1, Vol. 17, f. 769, 16 December 1744.

৬৪. The "Memorie" of A. Bisdom, Voo. C. 2850 (K. A. 2742), ff. 498-301vo., 10 January 1756; আরও দেখুন, *IHB*-তে আমার রচিত নিবন্ধ, "Armenians in Bengal Trade and Politics—A Study of Khwaja Wazid's Role in mid-18th Century Bengal".

সারণি ৭ : ওলন্দাজ ও ইংরেজ রপ্তানির পঞ্চবাৎসরিক মোট পরিমাণ : সোরা (১৬৮১-১৭১৫)

ক. ওলন্দাজ রপ্তানি

সময়	মোট পরিমাণ (ওলন্দাজ পাঃ)	বার্ষিক গড় (ওলন্দাজ পাঃ)	বার্ষিক গড় (ইংরেজ পাঃ)
১৬৮১/৮২-১৬৮৬/৮৭ (১৬৮৪/৮৫ বাদে)	১,২০,২৮,২৬৯	২৪০৫,৬৫৪	২২,০৭,০২১
১৬৮৮/৮৯-১৬৯৪/৯৫	১,১৮,৫১,০৮৫	২৩,৭০,২১৭	২১,৭৪,৫১১
১৭০১/০২-১৭০৫/০৬	১,৩৪,২৭,১৫০	২৬,৮৫,৪৩০	২৪,৬৩,৬৯৭
১৭১০/১১-১৭১৪/১৫	১,৮২,৩৫,৮৭০	৩৬,৪৭,১৭৪	৩৩,৪৬,০৩১

খ. ইংরেজ রপ্তানি

সময়	মোট পরিমাণ (ইঃ পাঃ)	বার্ষিক গড় (ইঃ পাঃ)
১৬৮১/৮২-১৬৮৫/৮৬	৬২,৯৮,২০৮	১২,৫৯,৬৪১
১৬৯০/৯১-১৬৯৫/৯৬ (১৬৯১/৯২ বাদে)	২৬,৫২,৯৬৪	৫,৩০,৫৯২
১৭০১/০২-১৭০৬/০৭ (১৭০৩-০৪ বাদে)	৩৭,৮৫,৪৮৬	৭,৫৭,০৯৭
১৭১০/১১-১৭১৪/১৫	৪২,০২,৫১৪	৮,৪০,৫০২

সূত্র : ওম প্রকাশের *দি ডাচ্ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ্যান্ড দি ইকনমি অব বেঙ্গল*, পৃ. ২০৪-০৫ থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে ওলন্দাজ রপ্তানি এবং সুশীল চৌধুরীর *ট্রেড এ্যান্ড কমার্শিয়াল অরগানাইজেশন*, পৃ. ১৭০-৭১ থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে এখানে মোট পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে।

সারণি ৮ : ইংরেজ কোম্পানির রপ্তানির পঞ্চবাৎসরিক মোট পরিমাণ : সোরা ১৭৩০-৫০

সময়	মোট পরিমাণ (ইঃ পাঃ)	বার্ষিক গড়(ইঃ পাঃ)
১৭৩০/৩১-১৭৩৪/৩৫	১,০১,৬৫,৯০৪	২০,৩৩,১৮৪
১৭৩৫/৩৬-১৭৩৯/৪০	৮৮,২২,০১৬	১৭,৬৪,৪০৩
১৭৪০/৪১-১৭৪৪/৪৫	২০,৭,৬৭,৩৭৬	৪১,৫৩,৪৭৫
১৭৪৫/৪৬-১৭৪৯/৫০	৯৬,৮৭,৬৬৪	১৯,৩৭,৫৩৩

সূত্র : কে. এন. চৌধুরীর *দ্য ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড অব এশিয়া*, ৫৩১-৩২ থেকে তথ্য নিয়ে হিসাব করা হয়েছে

কাঁচা রেশম

১৬৭০-এর দশক থেকে আলোচ্য সময়ের শেষ পর্যন্ত বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্যে একমাত্র সুতীবস্ত্রের পরেই অন্যতম পণ্য ছিল কাঁচা রেশম। যদিও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি, বিশেষত ইংরেজ ও ওলন্দাজরা প্রথমদিকে চীনদেশীয় ও পারস্যের রেশম সম্বন্ধে আগ্রহী ছিল, ১৬৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলার রেশম তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলার রেশমের প্রধান আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, চীন ও পারস্যের রেশমের তুলনায় তার দাম অনেক কম এবং সেজন্য ইউরোপে তা বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা করা যেতো। বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমনের আগেও বাংলা থেকে রেশমের আন্তঃআঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বহুল পরিমাণেই হতো। এই বাণিজ্যের সঙ্গে প্রধানত সংশ্লিষ্ট ছিল আগ্রা, গুজরাট ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত ব্যবসায়ীরা। কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ ও সংলগ্ন অঞ্চলই ছিল রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। সতেরো শতকের ষষ্ঠ দশকে টেভারনিয়ের লিখেন যে, কাশিমবাজারে বছরে বাইশ হাজার গাঁট বা বস্তা (bale) রেশম উৎপন্ন হতো, প্রত্যেক গাঁটের ওজন একশ' পাউন্ড করে।[৬৫]

রেশমচাষের ফসল [যাকে 'বন্দ' (band) বলা হতো] উৎপাদিত হতো বছরে তিনবার—নভেম্বর, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ও জুন-জুলাইতে। নভেম্বরের রেশমই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট, ফেব্রুয়ারি-মার্চের ফসল তার চেয়ে নিকৃষ্ট আর জুন-জুলাই মাসের রেশম হতো মোটা ধরনের। চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ কুঠির অধ্যক্ষ ইয়ান কারসেবুম (Ian Karseboom) ১৭৫৫ সালে লিখেন যে, বার্ষিক রেশম উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশই প্রথম দুই ধরনের রেশম।[৬৬] বাংলায় উৎপন্ন সব কাঁচা রেশমের সূক্ষ্মতা আবার নানা মাত্রার হতো। ১৬৬১ সালে কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠির প্রধান জন কেন (John Kenn)-এর লিখিত বিবরণীতে জানা যায় যে, বাংলায় তিন ধরনের রেশম বোনা হতো—সূক্ষ্মতার দিক থেকে এদের বলা হতো 'মাথা' (head), 'পেট' (belly) ও 'পা' (foot) অর্থাৎ উৎকর্ষে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রেশম। ইংরেজ কোম্পানি প্রধানত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রেশম কিনতো যথাক্রমে ৫ : ৪ আনুপাতিক হারে। এই রেশমকে পাট্টা (putta) বা সরু/পাতলা গোছের বলা হতো। এশীয় ব্যবসায়ীরা আগ্রা ও অন্যান্য অঞ্চলের জন্য যেধরনের রেশম কিনতো,তাকে বলা হতো 'দোলেরিয়া' (dolleria)। এই জাতীয় রেশম

---

৬৫. Jean-Baptiste Tavernier, *Travels in India, 1640-67*, trans. V. Ball, Vol.2, (London 1889), 1, 2-3, দেখুন, টেভেরনিয়েরের তথ্য সম্পর্কে ওম প্রকাশের মন্তব্য, Om Prakash, *Dutch East India Company*, 57.

৬৬. V. O. C. 2849 (K. A. 2741), f. 110.

ছিল 'মাথা', 'পেট' ও 'পা' তিন শ্রেণীর রেশমের সংমিশ্রণ।[৬৭] ওলন্দাজ কোম্পানি এই তিন ধরনের রেশমকে যথাক্রমে 'কাবেসা' (cabessa), 'বারিগা' (bariga) ও 'পী' (pea) বলতো। পরে ওলন্দাজরা 'টানি' (tanny) নামে অতি সূক্ষ্ম এক ধরনের রেশম রপ্তানি করতো। গুটিপোকার উৎকৃষ্টতম সূক্ষ্ম সুতায় জড়ানো কাটিম জাতীয় অংশ থেকে এই রেশম তৈরি হতো। হল্যান্ড থেকে ১৬৭৬ সালে পাঠানো পণ্যতালিকায় টানি রেশমের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই এই জাতীয় রেশমের চাহিদা অন্যান্য শ্রেণীর রেশমের চাহিদার চেয়ে অনেক বেড়ে যায় এবং তা বাংলার বিভিন্ন জাতের রেশমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রয়যোগ্য হয়ে উঠে।[৬৮]

প্রথমদিকে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি নীতিগতভাবে বাংলার অতি সূক্ষ্ম রেশম রপ্তানি করতে একেবারেই আগ্রহী ছিল না। কারণ ঐ জাতীয় রেশম বেশি সূক্ষ্ম বলে ইউরোপীয় কারিগরদের পক্ষে তা ব্যবহারের অনুপযোগী বিবেচিত হতো। তাই এই রেশম বাজারে বিক্রি করতে হতো খুবই কম মুনাফায়।[৬৯] ইংরেজ কোম্পানি ধীরে ধীরে 'গুজরাট' রেশম নামে বাংলার সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে দামি রেশম কিনতে শুরু করলো। ১৭৩৫ সাল নাগাদ 'গুজরাট' রেশম ইংল্যান্ডের ক্রেতাদের কাছে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠলো যে লন্ডন থেকে কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরস বাংলায় কর্মচারীদের কাছে নির্দেশ পাঠায় তারা যেন এই উৎকৃষ্টতম সূক্ষ্ম রেশম সংগ্রহ করতে চেষ্টার ত্রুটি না করে এবং তারা যেন এই পণ্যের ব্যক্তিগত ব্যবসা না করে।[৭০] কাশিমবাজার ছাড়া রংপুর অঞ্চলেও রেশম উৎপন্ন হতো। তাছাড়া নদীয়া জেলার কুমারখালি থেকেও অন্য এক ধরনের রেশম আসতো। প্রথমদিকে ইউরোপীয় চাহিদা শুধু কাশিমবাজার অঞ্চলে উৎপন্ন রেশমে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৭৩০-এর দশক থেকে ইংরেজ কোম্পানি রংপুর ও কুমারখালি অঞ্চলের রেশমও ইউরোপে রপ্তানি করার চেষ্টা শুরু করে। অবশ্য বণিকদের সঙ্গে কোম্পানির চুক্তিতে বিভিন্ন জাতের রেশমের পরিমাণ বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন রকম হতো। পরবর্তী সারণি (সারণি ৯) পর্যবেক্ষণ করলে তা বোঝা যায়।

---

৬৭. B. M. Addl. Mss. 34, 123, f. 42 ; C. R. Wilson, *The Early Annals of the English in Bengal*, Vol. 1, (London 1895), 376

৬৮. Kristof Glamann, *Dutch Asiatic Trade, 1620-1740*, (Copenhagen 1958).

৬৯. K. N. Chaudhuri, *The Trading World of Asia and the English East India Company, 1660-1760* (Cambridge 1978), 352.

৭০. D B., Vol. 106, para 31, f. 411, 31 January 1735.

সারণি ৯ : বণিকদের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির রেশম সরবরাহের চুক্তি

রেশম	১৭৩৩		১৭৪০	
নভেশ্বরবন্দ	২৪০০ মণ	প্রতি সের ৫টাকা ১২ আনা	১৩৫০ মণ	প্রতি সের তথ্য নেই
গুজরাট	৭৮০ "	" " ৬ " ৬ "	৪২০ "	" " " " "
কুমারখালি	৬০০ "	" " ৫ " ২ "	১৮০০ "	" " " " "
রংপুর	৮০০ "	" " ৪ " ৫ "	১৫০ "	" " " " "
মোট	৪,৫৮০ মণ		৩,৭২০ মণ	

[সূত্র ঃ *কাশিমবাজার ফ্যাক্টরি রেকর্ডস*, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, লন্ডন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।]

ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি কাশিমবাজারের বড় বড় রেশমব্যবসায়ীদের সঙ্গে কিংবা ছোট ব্যবসায়ী, বিশেষকরে পাইকারদের সঙ্গে রেশম সরবরাহের চুক্তি করতো। এরা রেশমউৎপাদক চাষীদের আগাম টাকা দিয়ে পত্তনি (pattani) বা না-বোনা রেশমের ছোট ছোট গাঁট সংগ্রহ করতো। রেশমের বাজারে বিভিন্ন বণিকগোষ্ঠীর উপস্থিতি এবং তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকায় খোলা বাজারে তাৎক্ষণিক বেচাকেনার উপর ভরসা করা যেতো না। সেজন্য রেশমচাষের ফসল তোলার ঠিক আগেই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যসরবরাহের চুক্তি করাটা পর্যাপ্ত পরিমাণ রেশমসংগ্রহের শ্রেষ্ঠ পন্থা ছিল। সাধারণভাবে ইংরেজ কোম্পানি যেসব ব্যবসায়ী আড়ং-এ পত্তনি কিনেছে তাদের সঙ্গেই রেশমসরবরাহের চুক্তি করতো। এসব ব্যবসায়ীর বাড়িতেই রেশম বোনার ব্যবস্থা করা হতো। ওলন্দাজ কোম্পানি কিন্তু প্রধানত পাইকারদের কাছ থেকে পত্তনি কিনে তাদের নিজস্ব কুঠিতে রেশম বোনার ব্যবস্থা করতো। অস্টেন্ড কোম্পানির প্রধান হিউমের মতে, এটাই হচ্ছে ভাল রেশম কেনার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, কারণ এতে কুঠিতে রেশমকাট্‌নিদের উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা সম্ভব হতো।[৭১] ১৬৫৩ সালে ওলন্দাজরা কাশিমবাজারে রেশম তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু তার অস্তিত্ব অস্বাভাবিক রকম টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে টিকিয়ে রাখতে হয়। কখনো কখনো কোম্পানির প্রায় সব কাঁচা রেশমই এখানে রিল (reel) করা হতো। আবার কখনো একেবারেই কিছু হতো না। কাজ যখন পুরোমাত্রায় চলতো, তখন এখানে বছরে ১৫০০ বেল বা গাঁট রেশম রিল করা হতো এবং এ কাজে ৩০০০ লোক নিযুক্ত থাকতো। আবার অন্যদিকে এমন চরম অবস্থারও সৃষ্টি হতো, যখন ১০০ জনেরও কম লোক কাজ করতো এবং শুধুমাত্র বণিকদের সঙ্গে চুক্তির জন্য খালি

---

৭১. Hume's "Memorie".

নমুনা এখানে প্রস্তুত হতো।[৭২] এর ফলে ওলন্দাজদেরও প্রায়ই কাঁচা রেশম সরবরাহের জন্য বণিকদের সঙ্গে চুক্তি করতে হতো।

ইউরোপীয়রা বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণে রেশম রপ্তানি করলেও বাংলার রেশমের বাজার নিয়ন্ত্রণ করা তাদের সাধ্যাতীত ছিল। বাংলার রেশমবাজারে যে বিপুল সংখ্যক এশীয় বণিক বাণিজ্য করতো তারাই তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। কাশিমবাজার ইংরেজ কাউন্সিলের কলকাতায় লেখা নানা চিঠিপত্রে এটা খুবই স্পষ্ট।[৭৩] ১৭৪৪ সালে কাশিমবাজারের কুঠিয়ালরা রেশমের বাজার নিয়ন্ত্রণে তাদের অক্ষমতা স্পষ্টভাবে জানিয়ে লিখছে : "যদিও গত বছরের তুলনায় এবছর (রেশমের) দাম অনেক বেশি, তবু আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়, কারণ আমরা (রেশমের) বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম— কিছুদিন হলো বাজারদর অত্যন্ত চড়া যাচ্ছে।"[৭৪] রেশমের বাণিজ্যে পণ্যসংগ্রহের ব্যাপারে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে বাংলায় বিভিন্ন এশীয় বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এদের মধ্যে গুজরাটিরাই ছিল সর্বপ্রধান এবং তাদের কার্যকলাপ বাংলার রেশমবাজারের 'সাধারণ নির্দেশক' (general indicator) ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[৭৫] ১৭২৬ সালে কাশিমবাজার কাউন্সিল তাড়াহুড়ো করে রেশম-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করলো। কারণ তাদের ভয় ছিল, "গুজরাটিদের অস্বাভাবিক চাহিদার জন্য দাম আরো বেড়ে যাবে।"[৭৬] "গুজরাটি ছাড়াও বাংলার রেশমবাজারে তৎপর ছিল লাহোর, মুলতান, বেনারস, গোরখপুর, হায়দ্রাবাদ, দিল্লী ('কালোয়ার') এবং মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরের বণিকগোষ্ঠী। শেষোক্ত বণিকরা আবার বেনারসের ব্যবসায়ীদের গোমস্তা হিসেবে রেশম কেনার কাজে নিযুক্ত ছিল। আর আর্মেনীয় বণিকরা তো ছিলই। রেশমসংগ্রহে আরেক দল বণিক সক্রিয় ছিল, নথিপত্রে যাদের 'বুর্দেলওয়ালী' (Burdelwali) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খুব সম্ভবত তারা উত্তর ভারতের কোন অঞ্চল থেকে আসতো।

এটা খুবই লক্ষণীয় যে, কখনো কখনো এই বণিকগোষ্ঠীর চাহিদা এমনকি গুজরাটিদের বাদ দিয়ে রেশমের বাজারে বেশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো, যার ফলে কাঁচা রেশমের দাম বেড়ে যেতো। কাশিমবাজার কুঠির তরুণ কর্মচারী ওয়ারেন হেস্টিংস পদ্মার ওপারে 'পাওয়া' (powa) নামক রেশমের আড়ং থেকে জানায় যে, পত্তনির দাম সেখানে হঠাৎ বেড়ে গেছে "গুজরাটিদের কেনাকাটার জন্য নয়, সব রকম বিদেশী বণিকদের ওই আড়ং-এ কিনতে আসার কারণে।" হেস্টিংস লিখেছেন যে, এসব বণিক হলো 'কালোয়ার',

---

৭২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Om Prakash. *Dutch East India Company*, 113-17.
৭৩. উদাহরণস্বরূপ, C & B. Abstr., Vol. 3, para 38, 26 December 1733.
৭৪. *Factory Records*, Kasimbazar, Vol. 6, 23 January 1744.
৭৫. K. N. Chaudhuri, *Trading World*, 354.
৭৬. B. P. C., Range 1, Vol. 6, f. 172, 21 February 1726.

গোরখপুরী আর জঙ্গিপুরী, "যারা ছয় সাত লক্ষেরও বেশি টাকা মূল্যের পত্তনি, বিশেষকরে সূক্ষ্ম জাতের রেশম চড়া দাম সত্ত্বেও রোজ কিনে নিচ্ছে।"[৭৭] এত চড়া দাম সত্ত্বেও কেন এসব বণিক এটা করছে বুদ্ধিমান হেস্টিংস তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> প্রথমোক্ত দুই দল (কালোয়ার ও গোরখপুরী) সুদূর দিল্লী ও বেনারস থেকে এসেছে। এত দূর থেকে এসেছে বলেই তারা চড়া দাম দিয়েও পণ্য কিনতে দ্বিধা করছে না। পরবর্তী (জঙ্গপুরী) দলেরও প্রায় একই অবস্থা। যদিও এখান থেকে জঙ্গিপুরের দূরত্ব মাত্র কয়েক দিনের, কিন্তু এদের বেশির ভাগই সুদূর বেনারসের ব্যবসায়ীদের গোমস্তা হিসেবে কাজ করছে। ফলে বেনারস থেকে যে পরিমাণ রেশমের ফরমাশ আসছে এরা তাই সংগ্রহ করতে উৎসুক, দাম যতো বেশি হোক না কেন।[৭৮]

সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পুরোটাতেই ওলন্দাজদের কাঁচা রেশম রপ্তানি ইংরেজদের তুলনায় বেশি ছিল। ওলন্দাজ বাণিজ্যের এই অগ্রগতি আঠারো শতকের প্রথম দুই দশকেও বজায় ছিল। (সারণি ১০ দেখুন)

কিন্তু ক্রমশ ওলন্দাজ বাণিজ্য সাধারণভাবে কমতে থাকে, অন্যদিকে ইংরেজ বাণিজ্য ধীরে ধীরে বাড়তে আরম্ভ করে। ফলে ১৭২০-এর দশকের শেষভাগে ও ১৭৩০-এর দশকে ইংরেজদের রেশমরপ্তানি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বস্তুত ১৭৩০-এর দশকে ইংরেজদের কাঁচা রেশমের বাণিজ্য তুঙ্গে পৌঁছায়।

সারণি ১০ : ওলন্দাজ ও ইংরেজ রপ্তানির পঞ্চবাৎসরিক মোট পরিমাণ : কাঁচারেশম ১৭০০ -১৭২০

	ওলন্দাজ রপ্তানি		ইংরেজ রপ্তানি		
সময়	মোট পরিমাণ (ওল. পাঃ)	বাৎসরিক গড় (ওল. পাঃ)	বাৎসরিক গড় (ইঃ পাঃ)	মোট পরিমাণ (ইঃ পাঃ)	বাৎসরিক গড় (ইঃ পাঃ)
১৭০০/০১-১৭০৪/০৫	৭,৫৪,৬৪৮	১,৫০.৯৩০	১,৬৪,৫১৪	৪,৭৬,২৮৩	৯৫,২৫৬
১৭১০/১১-১৭১৪/১৫	৭,৫১,০৫৪	১,৫০,২১১	১,৬৩,৭৩০	২,৫৯,২৯২	৫১,৮৫৮
১৭১৫/১৬-১৭১৯/২০	৬,২৫,৬৫৩	২,০৮,৫৫১	৩,১২,৮২৭	৬,৩৫,২২৫	১,২৭,০৪৫

(ওলন্দাজ রপ্তানি ৩ বছরের জন্য-১৭১৫/১৬-১৭১৭/১৮)

সূত্র : ওম প্রকাশ, *ওলন্দাজ কোম্পানি*, পৃ. ২১৮ থেকে তথ্য নিয়ে ওলন্দাজ রপ্তানির হিসাব এবং এস. চৌধুরীর *ট্রেড এ্যান্ড কমার্শিয়াল অরগানাইজেশন* গ্রন্থের পৃ. ২৫৪-৫৫ থেকে তথ্য নিয়ে ইংরেজ রপ্তানির হিসাব করা হয়েছে। এক ওলন্দাজ পাউন্ডকে (ওঃ পাঃ) ১.০৯ ইংরেজ পাউন্ড (ইঃ পাঃ) ধরে হিসাব করা হয়েছে।

৭৭. *Factory Records*, Kasimbazar, Vol. 12, Consultations, 27 January 1756.
৭৮. ঐ, K. N. Chaudhuri's contention that the "products bought by the Gujaratis did not directly compete with those shipped to Europe" is hardly tenable.

নিম্নের সারণিতে (সারণি ১১) ১৭৪০ সাল থেকে ইংরেজ কোম্পানির রেশমরপ্তানিবাণিজ্যে বার্ষিক গড়ের ক্রমাবনতির নির্দেশ পাওয়া যাবে :

সারণি ১১ : ইংরেজ রপ্তানির পঞ্চবাৎসরিক মোট পরিমাণ : কাঁচা রেশম ১৭৩০-১৭৫৫

সময়	মোট পরিমাণ (গ্রেট পাঃ)	বার্ষিক গড় (গ্রেট পাঃ)	বার্ষিক গড় (স্মল পাঃ)	বার্ষিক গড় (মণ)
১৭৩০/৩১-১৭৩৪/৩৫	৭,০২,৯০৭	১,৪০,৫৮১	২,১০,৮৭২	২,৮১২
১৭৩৫/৩৬-১৭৩৯/৪০	৭,১৪,০০৪	১,৪২,৮০০	২,১৪,২০১	২,৮৫৬
১৭৪০/৪১-১৭৪৪/৪৫	৫,৯৬,০৫১	১,১৯,২১০	১,৭৮,৮১৫	২,৩৮৪
১৭৪৫/৪৬-১৭৪৯/৫০	৩,০০,০০১	৬০,০০০	৯০,০০০	১,২০০
১৭৫০/৫১-১৭৫৪/৫৫	২,৮৬,৬২০	৫৭,৩২৪	৮৫,৯৮৬	১,১৪৬

সূত্র : কে. এন. চৌধুরীর *ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড*গ্রন্থের পৃ. ৫৩৪ থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে হিসাব করা হয়েছে। ইংল্যান্ডে রেশমের ওজন হতো গ্রেট বা বড় পাউন্ডে, যা স্মল পাঃ বা সাধারণ ইংরেজ পাউন্ডের দেড় গুণ। বাংলায় রেশমের ওজন হতো মণ ও সেরে, এক মণের সমান ৭৫ পাঃ।

প্রাক-পলাশী যুগে বাংলার বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে ইউরোপীয়দের বাণিজ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল—এ ধারণা বহুলপ্রচলিত এবং সাধারণভাবে স্বীকৃত। কিন্তু এ ধারণা যে অচল বিশেষকরে বাংলার রেশমরপ্তানির ব্যাপারটি বিচার করলে এতে সন্দেহ থাকে না। ১৭৪০ এবং ১৭৫০-এর দশকে এশীয় বণিকরা বাংলা থেকে যতো কাঁচা রেশম রপ্তানি করেছিল তার পরিমাণ সবগুলি ইউরোপীয় কোম্পানির মোট রেশমরপ্তানির পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি। মুর্শিদাবাদ থেকে শুধুমাত্র এশীয় বণিকদের রেশমরপ্তানি ১৭৪৯-৫৩ সালে ছিল বছরে গড়ে ১৯,৮০৩ মণ, যার মূল্য ৫৫ লক্ষ টাকা এবং ১৭৫৪-৫৮ সালে ছিল বছরে গড়ে ১৪,৯৩৭ মণ, যার মূল্য ছিল ৪২ লক্ষ টাকা। নিম্নের সারণিতে (সারণি ১২) এর একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায় ১৭৩০ সালের তুঙ্গপর্যায়ে, যখন ইংরেজ কোম্পানির কাঁচা রেশম রপ্তানির উচ্চতম গড় ছিল মোটামুটি ২,৮৫৬ মণ এবং তা কখনোই ৩,০০০ মণ অতিক্রম করে নি (সারণি ১১) এবং ১৭৩০-এর দশক থেকে ১৭৫০-এর দশক পর্যন্ত ওলন্দাজ কোম্পানির রপ্তানির মোট মূল্য ইংরেজ বাণিজ্যের এক তৃতীয়াংশ ছিল (যা সারণি ৫ থেকে স্পষ্ট)। একথা মনে রেখে বলা যায় যে, বাংলার কাঁচা রেশমের ওলন্দাজ রপ্তানি সবচেয়ে বেশি হলেও কখনোই ১,০০০ মণ অতিক্রম করে নি। এর সঙ্গে অন্যান্য ইউরোপীয়দের মোট রপ্তানি যদি বড় জোর ১,০০০ মণ ধরেও হিসাব করা হয়, তাহলেও বাংলার রেশমের মোট ইউরোপীয় রপ্তানির পরিমাণ

বছরে ৫,০০০ মণের বেশি হতে পারে না। এটা এশীয় বণিকদের বার্ষিক রপ্তানির এক-চতুর্থাংশ। কাঁচা রেশমের ইউরোপীয় রপ্তানির মোট মূল্য তাহলে এক সের রেশমের দাম ৭ টাকা হিসাবে (ইংরেজ নথিপত্রে এশীয় বাণিজ্যের এই দরই পাওয়া যায়) ১৪ লক্ষ টাকার মতো দাঁড়ায়। এই মূল্য আবার ১৭৫০ সালের গোড়ার দিকে এশীয় রপ্তানিবাণিজ্যের বার্ষিক গড় মূল্যের এক-চতুর্থাংশ। সুতরাং এসব তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক-পলাশী যুগে ইউরোপীয়রাই বাংলায় সোনা-রূপার প্রধান আমদানিকারী ছিল[৭৯] বলে বক্তব্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

সারণি ১২ : এশীয় বণিকদের রেশমরপ্তানির পঞ্চবাৎসরিক মোট পরিমাণ ১৭৪৯-৫৮

সময়	মোট পরিমাণ (মণ)	বাৎসরিক গড় (মণ)	সর্বোচ্চ পরিমাণ (মণ)	মোট মূল্য (টাকা)	গড়মূল্য (টাকা)
১৭৪৯-৫৩	৯৯,০১৬	১৯,৮০৩	২৩,৭৩৯ (১৭৫১)	২,৭৭,২৪,৩৬৫	৫৫,৪৪,৮৭৩
১৭৫৪-৫৮	৭৪,৬৯২	১৪,৯৩৮	২১,৩৪৬ (১৭৫৭)	২,০৯,১৩,৩৪২	৪১,৮২,৬৬৯

[সূত্র : বি. পি. সি. রেঞ্জ ১, খণ্ড ৪৪, কনসালটেশন ১৯ জুন ১৭৬৯, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, লন্ডন।]

বস্ত্র

বাংলায় ইউরোপীয় কোম্পানির রপ্তানিবাণিজ্যের সাধারণ কাঠামোয় পরিমাণ ও মূল্য উভয় দিক থেকে বস্ত্র ছিল প্রধানতম শিল্পজাত পণ্য। এশিয়ার বাকি সমস্ত অঞ্চল ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে মোট যে পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহ করতো, একা বাংলাই তার চেয়ে অনেক বেশি বস্ত্র এই কোম্পানিগুলিকে সরবরাহ করতো। ওলন্দাজ কোম্পানি যে কাপড় সংগ্রহ করতো, তার কিছুটা যেতো এশিয়ার বিভিন্ন বাজারে, যেমন জাপান, পারস্য, সিংহল ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ। তবে সংগৃহীত পণ্যের সিংহভাগই ছিল ইউরোপের জন্য—কিছুটা হল্যান্ডের জন্য, বাকিটা পুনঃরপ্তানির জন্য রাখা হতো। অনুরূপভাবে ইংরেজ কোম্পানিও বস্ত্রসংগ্রহ করতো বেশিরভাগই ইংল্যান্ডের বাজারের জন্য পুনঃরপ্তানির উদ্দেশ্যে। ইউরোপে বাংলার বস্ত্রবাণিজ্যের সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা হলো ১৬৮০-এর দশকের প্রথমদিকে ইউরোপের বাজারে বাংলার কাপড়ের হঠাৎ অস্বাভাবিক চাহিদাবৃদ্ধি। এর মূলে ছিল ইউরোপের বাজারে বাংলার কাপড়ের চাহিদার দ্রুত বিস্তৃতি ও সমাদরলাভ।

৭৯. P. J. Marshall, *Bengal : The British Bridgehead, New Cambridge History of India*, (Cambridge 1987), 65, 67; C. A. Bayly, *Indian Society and the Making of the British Empire, New Cambridge History of India*, (Cambridge 1987), 49-50.

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বাংলার কাপড়ের চাহিদার কারণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম দাম ও গুণগত উৎকর্ষ। সুদক্ষ কারিগর ও তাঁতীদের সুনিপুণ শিল্পকর্ম বাংলার চিরন্তন ঐতিহ্য। সূক্ষ্ম বয়নশিল্প ও সুলভ মূল্যের জন্য বাংলার কাপড় এশীয় বণিকদের কাছে বহু শতাব্দী ধরেই সমাদর লাভ করেছে। সুতরাং ইউরোপীয়রা যে বাংলার বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করতো এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

১৬৮০-এর দশকের প্রথমদিক থেকে ইউরোপের বাজারে বাংলার বস্ত্রের অস্বাভাবিক চাহিদাবৃদ্ধিকে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের পণ্যভোগকারীদের রুচির এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ১৬৮০-এর দশকের প্রথমদিকে 'ভারতীয়ত্বের' (Indianness) প্রতি যে অস্বাভাবিক ঝোঁক শুরু হয়, সতেরো শতকের শেষ দশক পর্যন্ত তা লক্ষ্য করা যায়। এই নতুন 'ফ্যাশনের' গতিপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় ১৬৯৫ সালে লেখা জে. ক্যারির এক ইস্তাহারে :

> কুড়ি বছর আগে ভাবাই যেতো না যে আমরা ক্যালিকো [সুতীবস্ত্র] কাপড়—যা আমাদের অভিজাতদের সর্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার হিসেবে গণ্য হতো (মসলিন বা অন্য যেকোন নামেই তাকে ডাকা হোক না কেন)—দেখতে পাব, তখন এই কাপড় কদাচিৎ ব্যবহার করা হতো। শুধু মৃতের আচ্ছাদন হিসেবে কিংবা যারা ভাল দামি লিনেন কিনতে অক্ষম সেই সব গরীবরা ছাড়া আর বিশেষ কেউ ক্যালিকো ব্যবহার করতো না। কিন্তু এখন খুব কম লোকই ক্যালিকোর পোশাক ছাড়া নিজেকে সুসজ্জিত মনে করে। পুরুষ, নারী সবারই এক অবস্থা। পুরুষদের জন্য ক্যালিকো শার্ট, গলাবন্ধ, কবজিবন্ধ, রুমাল ইত্যাদি এবং মেয়েদের জন্য মাথার বন্ধনী, রাত্রিবাস, জামার হাতা, এপ্রন, গাউন, পেটিকোট ইত্যাদি এবং কি নয়। আর সবার জন্য ভারতীয় মোজা। এসব না হলে কারুরই চলে না।[৮০]

একই সুর শোনা যায় ১৬৯৬ সালে বোর্ড অব ট্রেডের সামনে পোলেক্সফেনের (Palexfen) বক্তৃতায়, যাতে ১৬৮১ সালে ইংল্যান্ডে ভারতীয় বস্ত্রের কদর ও জনপ্রিয়তা প্রতিধ্বনিত হয় :

> আগাছা যেমন দ্রুত বেড়ে উঠে, তেমনি ভারতের এই শিল্পজাত দ্রব্য [বস্ত্র] সর্বোচ্চ অভিজাত থেকে ঠাকুর, পরিচারিকা সবার কাছে এমন সমাদর লাভ করেছে যে ভারতীয় বস্ত্র ছাড়া আর কোন পরিধানকে তারা নিজেদের সাজসজ্জার যোগ্য বলে মনে করছে না।[৮১]

বাংলার বস্ত্রের এত বৈচিত্র্য ও বিবিধ ধরনের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাদের শ্রেণীকরণ ও যথার্থ সনাক্তকরণ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল। তৎকালীন নথিপত্রে অন্তত পঁচাত্তরটি বিভিন্ন নামের কাপড়ের উল্লেখ আছে। শ্রেণীকরণ সহজ না হলেও ইউরোপীয়

৮০. J. Carry, *A Discourse Concerning the East India Trade*, (London 1696), 4.
৮১. *India Office Tracts*, Vol. 83, Tract No. 7, 50.

কোম্পানিগুলি যেসব বস্ত্র রপ্তানি করতো, সেগুলোকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন—রেশমবস্ত্র, রেশম ও সুতীমিশ্র বস্ত্র এবং সাধারণ সুতীবস্ত্র (রং না করা ও রং করা)। ইংরেজদের কাছে বাংলার রেশমবস্ত্র 'টাফাটি' (taffatie) বা 'টাফেটা' নামে পরিচিত ছিল আর ওলন্দাজরা একে বলতো আর্মোসিনেন (armosijnen)। বাংলার রেশমবস্ত্র বা টাফেটার বেশিরভাগই প্রস্তুত হতো কাশিমবাজার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে। এক ধরনের টাফেটার নাম ছিল রেস্‌টাস্‌ (restas)—দাঁড়িকাটা বা সোনালী 'পামবার্স' (pumbers)। ইউরোপীয়রা অন্য যেসব রেশমবস্ত্র রপ্তানি করতো, তাদের মধ্যে সারসেনেটস্‌ (sarcenetts), জামবার (jamwars) এবং রেশমী লুঙ্গি প্রধানত কাশিমবাজারেই প্রস্তুত হতো। রেশমী রুমাল, গলাবন্ধ এ্যাটলাস্‌ (atlasses) ইত্যাদি হুগলী ও বালেশ্বর অঞ্চলে তৈরি হতো। রুমাল ঢাকাতেও তৈরি হতো। সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে টাফেটা ইংরেজ কোম্পানির রপ্তানিতালিকায় প্রধানতম পণ্যদ্রব্য হলেও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে এর প্রাধান্য হ্রাস পায়। আমাদের আলোচ্য সময়কালের পুরোটাতেই দেখা যায় সুতী ও রেশমের মিশ্রবস্ত্র এবং সুতীবস্ত্রই একক বৃহত্তম রপ্তানিপণ্য ছিল। যেসব মিশ্রবস্ত্র কোম্পানি রপ্তানি করতো সেগুলোর মধ্যে প্রধান হলো আলাবানি (allabanee), কাটানি (cuttanee), খারাদারি (carriderie) বা চোরাদারি, চাকলা (chukla), চারকোণা (cherconna), কাস্‌তা (cushta), এলাচি (elatchi), কিংখাব (gingham), জামদানি (jumdenie), নীলা (nilla), পেনিয়াসকোস (peniascoes), সুসি (soosy), শিরসাকার (seersucker) এবং মন্ডিলা (mandilla)। এর মধ্যে কিংখাব ও নীলা সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রপ্তানিতালিকায় প্রাধান্য লাভ করেছে। এ দু'টি প্রধানত প্রস্তুত হতো হুগলী ও বালাসোর সংলগ্ন অঞ্চলে।

তবে ইউরোপীয় কোম্পানির রপ্তানিতালিকায় সংখ্যার দিক থেকে সুতীবস্ত্রই অন্যান্য বস্ত্রের (রেশম বা মিশ্র) চেয়ে অনেক বেশি স্থান পেয়েছে। সুতীবস্ত্র প্রধানত মসলিন ও ক্যালিকো এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মসলিন খুব মিহি সুতো থেকে তৈরি হতো। এর বুনোট ছিল শিথিল। ঢাকা জেলায় সর্বোৎকৃষ্ট মসলিন বোনা হতো। সোনারগাঁ, জঙ্গলবাড়ি ও বাজিতপুর ছিল মসলিন তৈরির ঐতিহ্যবাহী প্রধান কেন্দ্র। রোমান যুগ থেকে প্রসিদ্ধ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও মহার্ঘ জাতের মসলিন অবশ্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি রপ্তানি করতো না। তার কারণ সম্ভবত এই যে, স্বল্পপরিমাণে তৈরি হতো বলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তার সবটাই একচেটিয়াভাবে সংগ্রহ করতো ধনী অভিজাতদের কাছে বিক্রির জন্য, ইউরোপীয়রা তার নাগাল পেতো না। তাছাড়া ইউরোপের শীতল আবহাওয়াতে অতি সূক্ষ্ম মসলিন খুব উপযোগীও ছিল না। মসলিনের অন্যান্য উৎপাদনকেন্দ্রগুলি ছিল মালদহ জেলা

ও নদীয়া জেলার শান্তিপুরে। হুগলী ও বালেশ্বরে তৈরি হতো সাধারণ মানের মসলিন। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি নানা ধরনের যেসব মসলিন রপ্তানি করতো, সেগুলোর মধ্যে প্রধান হলো তাঞ্জেব (tanjeb), টেরিন্দাম (terrindam), খাসা (khasa or cossa), মলমল (mulmal), দুরিয়া (dorea), রেহাঙ্গ (rehang), আদাতি (adatie), আত্‌ছাবানি (atchabanie), চন্দরবানি (chanderbani), দোতানি (dotani), একতানি (ektani), গঙ্গালহরী (gangalahari), কামখানি (kamkhani), কোমরবন্ধ (kamarband), মিলমিল (milmil), মোহনবানি (mohanbani), রুদ্রবানি (rudrabani), নয়নসুখ (nainsook), শিরবন্দ (sirband) ইত্যাদি। তবে এদের মধ্যে খাসা ও মলমলের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি। তারপরে দুরিয়া বা ডুরে। হাতের এবং সূচের কারুকার্য করা হতো মলমল, তাঞ্জেব বা খাসার মতো মিহি মসলিনের জমিতে। বিভিন্ন স্থানে বোনা মসলিনের গুণমান/সূক্ষ্মতা এবং দামের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য হতো। দাম ও সূক্ষ্মতা দিয়ে শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়, কারণ তাতে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[৮২]

মসলিনের মতো সাধারণ সুতীবস্ত্র বা ক্যালিকোর ক্ষেত্রেও উৎকর্ষের মান ও নানা বৈচিত্র্যের অভাব নেই। সূক্ষ্মতর সুতীবস্ত্রের উৎপাদনকেন্দ্র ছিল মালদহ ও ঢাকা জেলায়। অপেক্ষাকৃত মোটা ধরনের কাপড় তৈরি হতো বীরভূম, পাটনা, হুগলী ও বালেশ্বর এলাকায়। এ ধরনের কাপড়ের মধ্যে ইউরোপীয়রা রপ্তানি করতো প্রধানত হামাম (humhum), সলোগাজি (sologazi), সানু (sanu), রুমাল, ফোটা (fota), চিনটস (chints), গিনি কাপড়, গারা (garra), চেলা (chela), দিমিটি (dimiti), বাফ্‌তা (bafta), বেথিলা (bethila), ডানগেরি (dengeri), লাখোরি (lakhori), আমৃতি (amriti), দরিয়াবাদি (dariabadi), পটকা (patka), সালামপুরী (salampuri) ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে গারা, ফোটা, গিনিকাপড় ইত্যাদি ছিল সাধারণ মোটা কাপড়, তাতে কোন নক্সা থাকতো না। এগুলি কোরা , সাদা কিংবা উজ্জ্বল রঙে ছোপান হতো। অন্যান্য কাপড়ের মধ্যে সানু, হামাম ইত্যাদি ছিল সাদা বা কোরা, কিন্তু মিহি।

বাংলা থেকে বস্ত্ররপ্তানির পরিমাণ বিচার করলে সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ওলন্দাজদের রপ্তানিবাণিজ্য ইংরেজদের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল। কিন্তু আঠারো শতকের গোড়ার দিক থেকে ইংরেজ রপ্তানির পরিমাণ ওলন্দাজদের ছাড়িয়ে যায়। কি পরিমাণ বস্ত্র

---

৮২. দ্রষ্টব্য, S Chaudhuri, *Trade and Commercial Organization*, 194-195, f. u. 141 for a fuller discussion.

রপ্তানি হয়েছে তা যদি কোন নির্দেশক হয়, তাহলে এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরু থেকেই ইংরেজ রপ্তানি ওলন্দাজদের ছাড়িয়ে গেছে। এই দশকে যেখানে ওলন্দাজদের বস্ত্ররপ্তানির পরিমাণ হলো বছরে গড়ে ২,০৩,৮৫৩, সেখানে ইংরেজ রপ্তানির পরিমাণ ২,৭৮,৫৮৮। বাংলা থেকে ইংরেজদের বস্ত্ররপ্তানি ক্রমে বৃদ্ধি পায়, যা শীর্ষে পৌঁছায় ১৭৪০-এর দশকের প্রথমভাগে। নিম্নের সারণি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

বাংলার বস্ত্রশিল্পে ইউরোপীয় বাণিজ্যের ভূমিকা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয়রাই বাংলায় সবচেয়ে বেশি সোনা-রূপা আমদানি করেছে—এই তত্ত্বের অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে ধরে নেয়া হয় যে, ইউরোপীয়দের বস্ত্ররপ্তানির পরিমাণ

সারণি ১৩ : ইংরেজ রপ্তানির পঞ্চবাৎসরিক মোট পরিমাণ ঃ বস্ত্র

১৭১০-১৭৫৫

সময়	মোট সংখ্যা (পাঃ)	মোট মূল্য	গড় সংখ্যা (পাঃ)	গড় মূল্য (টাকা)	গড় মূল্য
১৭১০/১১-১৭১৪/১৫	১২,৪৬,৯০৭	৯,১৪,৪৪৬	২,৪৯,৩৮১	১,৮২,৮৮৯	১৪,৬৩,১১২
১৭১৫/১৬-১৭১৯/২০	১৫,৩৮,৯৭২	৯,৭০,৭৫৯	৩,০৭,৭৯৪	১,৯৪,১৫২	১৫,৫৩,২১৬
১৭৩০/৩১-১৭৩৪/৩৫	৩০,২৮,১৩২	১৬,৫৬,৫৮৮	৬,০৫,৬২৬	৩,৩১,৩১৮	২৬,৫০,৫৪৪
১৭৩৫/৩৬-১৭৩৯/৪০	২৮,২০,৭৮৩	১৫,৫২,৯৮১	৫,৬৪,১৫৭	৩,১০,৫৯৬	২৪,৮৪,৭৬৮
১৭৪০/৪১-১৭৪৪/৪৫	৩০,৪২,৯৬৪	১৯,২৬,৩৩৫	৬,০৮,৫৯৩	৩,৮৫,২৬৭	৩০,৮২,১৩৬
১৭৪৫/৪৬-১৭৪৯/৫০	২৩,৫৬,৪০৫	১৮,৯৭,৫০৫	৪,৭১,২৮১	৩,৭৯,৫০১	৩০,৩৬,০০৮
১৭৫০/৫১-১৭৫৪/৫৫	১৯,৫৪,০৭১	১৭,০৭,৭৩৫	৩,৯০,৮১৪	৩,৪১,৫৪৭	২৭,৩২,৩৭৬

সূত্র ঃ কে. এম. চৌধুরীর *ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড* গ্রন্থের পৃ: ৫৪৪-৪৫ থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে এখানে হিসাব করা হয়েছে। ১৭৪০ ও ১৭৫০ সালের পরিসংখ্যান সন্দেহজনক মনে হয়। কারণ চৌধুরীর দেয়া ইংরেজ রপ্তানির মোট মূল্য (সারণি ৬) যদি ঠিক হয়, তাহলে তা ৩৮ লক্ষের বেশি কখনো হয় নি। এর মধ্যে কাঁচা রেশমের রপ্তানি (গড়ে ২,৮০০ মণ) ৮ লক্ষ টাকার মতো, সোরা ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকার মতো। তাহলে বস্ত্ররপ্তানির মোট মূল্যের পরিমাণ খুব বেশি হলে ২৫ লক্ষ টাকার মতো হবে।

এশীয় বণিকদের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু তা সত্য নয়। প্রাক-পলাশী যুগেও বাংলা থেকে এশীয় ব্যবসায়ীদের বস্ত্ররপ্তানির পরিমাণ ইউরোপীয়দের চেয়ে বেশি ছিল। ১৭৪৭ সালে

ঢাকা থেকে মোট রপ্তানির এক হিসাবে দেখা যায়, আর্মেনীয়সহ এশীয়দের বাণিজ্য মোট রপ্তানির ২/৩ অংশ ছিল, যেখানে ব্যক্তিগত বাণিজ্যসহ ইউরোপীয় রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১/৩ অংশ।[৮৩] ওলন্দাজ কোম্পানির নথিপত্রেও বস্ত্ররপ্তানিতে এশীয় বণিকদের প্রাধান্যের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে দেখা যায় যে, ১৭৪২ সালে ওলন্দাজদের বাদ দিয়ে বাংলায় বস্ত্রজাত পণ্যসংগ্রহের জন্য ৭৬ লক্ষ টাকা লগ্নি করা হয়েছে। তন্মধ্যে ইংরেজ ও ফরাসীদের সমন্বিত অংশের মূল্য খুব বেশি হলেও ৩০ লক্ষের বেশি হতে পারে না।[৮৪] তার অর্থ, এশীয় বাণিজ্যের অংশ হবে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষের মতো।

ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রভাব

বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রভাব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের অতিশয়োক্তি করার প্রবণতা প্রতিহত করার সময় এসেছে। এপর্যন্ত যেসব তথ্য বিশ্লেষণ করেছি তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য হলেও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলার বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল না। তখনো এশীয় রপ্তানিবাণিজ্য ইউরোপীয় রপ্তানিবাণিজ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবু বাংলার অর্থনীতিতে ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রভাব নিশ্চিতরূপে পড়েছে। ইউরোপীয় বাণিজ্যের ফলে বাংলায় প্রভূত পরিমাণে সোনা-রূপা ও টাকার আমদানি হয়েছে, যদিও ইউরোপীয়রা সোনা-রূপার একমাত্র আমদানিকারক নয় এবং সবচেয়ে বড় তো নয়ই। বাংলার অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির কার্যকলাপ নিশ্চিতভাবে রপ্তানিদ্রব্য উৎপাদনকে উৎসাহিত করেছে। বাংলার উৎপন্নদ্রব্যের জন্য ইউরোপীয় চাহিদা রপ্তানিবাণিজ্যের ইতিহাসে একটি অভিনব ঘটনা। ইউরোপীয় বাজারে সরবরাহ করার জন্য বাংলার যেসব অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী (traditional) রপ্তানিবাণিজ্য ছিল সেখান থেকে তা সরে গেছে বলে যেহেতু কোন তথ্য পাওয়া যায় না, সেহেতু একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এই সময় রপ্তানিপণ্যের উৎপাদন অনেক বেড়েছিল। অন্যান্য বাজারে সরবরাহ বন্ধ না করে বা পুরনো ক্রেতাদের জন্য নির্ধারিত পণ্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির সরবরাহ না করে বাংলা ইউরোপীয়দের রপ্তানিবাণিজ্যের চাহিদা মিটিয়েছে। রেশম ও বস্ত্রের বাজার থেকে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার। বাংলার পণ্যদ্রব্যের সনাতন ক্রেতারা—গুজরাটি, উত্তর

৮৩. Taylor's Report, *Home Misc. Series*, 456 f, ff. 94-95, IOL.

৮৪. "Memorie" of Dutch Director Taillefert, V. O. C. 2849 (K. A. 2741), 27 October 1755, ff. 188vo.-189.

ভারতীয় এবং অন্যান্য এশীয় বণিকরা ইউরোপীয়দের পাশাপাশি এবং তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলার বাজারে রেশম ও বস্ত্র সংগ্রহের ব্যবসা চালিয়ে গেছে।

ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির রপ্তানিপণ্যের তালিকা দেখলেই বোঝা যায় যে, সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের তুলনায় আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় রপ্তানির পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। পণ্যউৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিকার সম্প্রসারণ ছাড়া ইউরোপীয় চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উৎপাদনব্যবস্থা বা পদ্ধতির কোন আমূল পরিবর্তন ছাড়াই পণ্যউৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছিল। কাঁচা রেশমের ক্ষেত্রে সম্ভবত গুটিপোকার উৎপাদন বাড়ানো হয়েছিল তুঁতচাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়ে, একরপ্রতি গুটিপোকার উৎপাদন বাড়িয়ে নয়। কারণ গুটিপোকাচাষের পদ্ধতি বা প্রযুক্তিতে কোন পরিবর্তন করা হয় নি। এভাবে তুঁতচাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকতে পারে হয় অনাবাদি জমিকে চাষের কাজে লাগিয়ে অথবা অন্য ফসলের জমি তুঁতচাষের অন্তর্ভুক্ত করে।

বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে অনুমান করা যায় যে, অর্থনীতিতে যে শিথিলতা ছিল তাকে চাঙ্গা করে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছিল। কারণ বাংলার বস্ত্রশিল্পে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনপদ্ধতি বা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কোন রকম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন না করেও মোট উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়ানো হয়েছিল। এ থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট, সীমিত সময়ের জন্য হলেও বাংলার বস্ত্রশিল্পে সম্ভাব্য অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা ছিল অথবা বেশ কিছু নতুন সুদক্ষ কারিগর এই শিল্পে যোগদান করেছিল, যেটা উৎপাদনব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সম্প্রতি বলা হচ্ছে, নিতান্ত আনুমানিক এবং মোটাদাগের (crude) হিসাবের ভিত্তিতে ওলন্দাজ ও ইংরেজ বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলি আঠারো শতকের প্রথমদিকে প্রচুর পণ্য ক্রয় করে ১,০০,০০০ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।[৮৫] দুর্ভাগ্যক্রমে যেসব ঐতিহাসিক ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ায় অত্যুৎসাহী, তাঁরা উক্ত লেখকের প্রদত্ত তথ্যাদি সতর্কভাবে যাচাই করে না দেখেই তাঁর বক্তব্য লুফে নিয়েছেন।[৮৬] উক্ত লেখক অবশ্য বলেছেন যে, তাঁর হিসাব 'মোটা' (crude) এবং তাতে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাও প্রচুর। কিন্তু লেখকের হিসাব একেবারেই সঠিক নয়, খুবই অতিরঞ্জিত। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় আপত্তি, ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির রপ্তানিবস্ত্রের

৮৫. Om Prakash, "Bullion for Goods : International Trade and the Economy of early Eighteenth Century Bengal", *Indian Economic and Social History Review*, XII (1976), 173-75 Om Prakash, *Dutch East India Company*, 241-48.

৮৬. Marshall, *Bengal*, 66

মোট দৈর্ঘ্য হিসাব করার সময় আসল একক (basic unit) কোবিদকে (covid) ২৭´ ইঞ্চি বলে ধরা হয়েছে। কোবিদ আসলে ১৮´ ইঞ্চি। এর ফলে লেখকের হিসাব এক লাফে এক-তৃতীয়াংশ কমে যেতে বাধ্য। যার মানে দাঁড়ায়, নতুন কর্মসংস্থানের সংখ্যা এক লক্ষের জায়গায় ৬৬ থেকে ৬৭ হাজার। অর্থাৎ ভ্রান্তির সীমারেখা দাঁড়াচ্ছে শতকরা ৩৩, যেটা কোন রকমেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া মসলিন, মিহি সুতীবস্ত্র, সাধারণ সুতীবস্ত্র— কাপড়ের এই ধরনের শ্রেণীকরণ, যা এই হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, মোটেই নির্ভুল নয়। এতে হিসাবে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এমন অবস্থায় এই 'মোটা হিসাব' যথেষ্ট অবাস্তব, এর উপর বিশেষ ভরসা করা যায় না।[৮৭]

বাংলায় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির বাণিজ্যিক কার্যকলাপের ফলে উৎপাদন ও ব্যবসায়িক সংগঠনে বিরাট মাত্রায় না হলেও কিছু নতুন উপাদান যুক্ত হয়। কিন্তু তাদের প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না বলে এই নতুনত্বকে অভিনব পরিবর্তন বলা চলে না। কোম্পানিগুলির আগমনের আগে এশীয় ও পর্তুগীজ বণিকরা বাজার থেকে বা সোজাসুজি উৎপাদকদের কাছ থেকে যে সময় যে রকম পাওয়া যেতো সে রকম পণ্যদ্রব্যই কিনতো। কিন্তু ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি একদিকে ইউরোপে ভারতীয় জিনিসের প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক মেটাবার জন্য ব্যবসা করতো বলে এবং অন্যদিকে প্রচুর মুনাফা অর্জনের দিকে লক্ষ্য রাখতো বলে প্রত্যেকটি জিনিস সরবরাহের ক্ষেত্রে নমুনা অনুযায়ী বিশেষকরে মাপ, রং, গুণগত উৎকর্ষ ইত্যাদির উপর খুব জোর দিত। ফলে সরবরাহের ক্ষেত্রে বাংলায় নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী সরবরাহের ধারণার প্রথম প্রবর্তন ঘটলো। এর আগে এ অঞ্চলে নমুনা বা মান অনুযায়ী সরবরাহের জন্য চুক্তির প্রচলন ছিল না। তবে এ ব্যাপারটির উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া ঠিক নয়। কারণ একদিকে স্থানীয় কারিগরি উৎপাদনব্যবস্থার প্রকৃতি এমন ছিল যে খুব বাঁধাধরা কোন মাপকাঠি বা নমুনা অনুযায়ী কাজ করানো বেশ কঠিন ছিল। অন্যদিকে স্থানীয় বাজারে পণ্যসংগ্রহের জন্য ক্রেতাদের মধ্যে এমন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল যে বণিক ও উৎপাদক কেউই কঠোর মান অনুযায়ী জিনিস সরবরাহে মোটেই ইচ্ছুক ছিল না। কারণ তাদের জিনিস ক্রয়ের জন্য বাজারে আগ্রহী ক্রেতার কোন অভাব ছিল না।

ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির চেষ্টায় ও উৎসাহে দাদনব্যবস্থা এ সময় আরো বিস্তৃত হয়। অবশ্য তাদের আগমনের অনেক আগে থেকেই এ ব্যবস্থা চালু ছিল। বাংলার বাণিজ্যে বিদেশী কোম্পানিগুলির আগমনের আগে এশীয় ও পর্তুগীজ বণিকরা আগাম দেবার সময়

---

৮৭. Om Prakash, *Dutch East India Company*, 241-48.

কখনো ফরমায়েশী পণ্যদ্রব্যের দাম বেঁধে দিত না। পণ্যদ্রব্য যখন নিয়ে আসা হতো, তখনই তার দাম ঠিক করা হতো। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি কিন্তু অগ্রিম দেয়ার আগেই নমুনা অনুযায়ী পণ্যের দাম ঠিক করে নিত। এই ব্যবস্থা বাংলার বাণিজ্যিক সংগঠনে সম্পূর্ণ নতুন। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি অনেক সময় কাপড় সাদা করা (bleach), রং করা (dyeing) ইত্যাদি নানারকম প্রক্রিয়ার জন্য এবং রেশমের সুতা বোনা বা গোটানোর জন্য কারখানা স্থাপন করেছিল। আবার তারা তাঁতী ও অন্যান্য কারিগরদের দিনমজুর হিসেবে নিয়োগ করতো। তারা এমনকি ইউরোপ থেকেও সুতীবস্ত্র ও রেশমের দক্ষ কারিগর এনে স্থানীয় কারিগর ও বয়নশিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে জিনিসের গুণগত মান উন্নত করার চেষ্টা করতো, যাতে বস্ত্র ও রেশমের রং ও বুনটের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ ধরনের সংস্থা এ অঞ্চলের উৎপাদনব্যবস্থার পরিধি আরো সম্প্রসারিত করেছিল, যদিও এটা এ দেশে সম্পূর্ণ অভিনব ছিল না। নবাবি আমলে এখানে 'কারখানা' অনেক পুরনো ছিল এবং যদিও তাতে উৎপাদন ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল, বাজারে বিক্রির জন্য নয়, তথাপি বণিকরা ঐ কারখানার ধাঁচেই তাদের নিজস্ব সংস্থাগুলি গড়ে তুলেছিল।

১০

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও কৃষি অর্থনীতি

সিরাজুল ইসলাম*

সুপ্রাচীনকাল হতে বৃটিশ বিজয় অব্দি এ দেশে অনেক রাজনৈতিক উত্থান-পতন ঘটেছে, কিন্তু এর ফলে সনাতন জীবনযাত্রার প্রবহমানতায় কখনো কোন বিঘ্ন ঘটে নি। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিপ্লব বা বৈদেশিক আক্রমণ ও বিজয় সাধারণ মানুষ অবলোকন করেছে অতিশয় উদাসীনভাবে। কারণ তারা জানতো শাসকশ্রেণীর ঐ পরিবর্তনের কোন প্রভাব তাদের জনপদে প্রতিফলিত হয় নি। ধর্মপ্রথা ও ঐতিহ্যের মধ্যে নিমজ্জিত জনপদগুলি ছিল যেন এক একটি আলাদা বিশ্ব; পরিবর্তনবিহীন একই গ্রন্থিতে বাঁধা খণ্ড খণ্ড গ্রামীণ বিশ্ব। জনঅসন্তোষ এড়িয়ে নির্বিঘ্নে শাসন করার স্বার্থে সকল শাসক সাধারণ সমাজের প্রথা-প্রতিষ্ঠান, সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের পূর্বধারা অক্ষুণ্ন রেখেছে। যেমন, মুগল কৃষিব্যবস্থা আসলে পূর্ববর্তী তুর্কী-পাঠান ব্যবস্থারই অনুকরণ, আবার তুর্কী-পাঠান ব্যবস্থা সেন-পাল ব্যবস্থার অনুকরণ। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার খাতিরে শাসনপদ্ধতির ক্ষেত্রে একে অপরকে অনুসরণ করার এই ঐতিহ্য সম্পর্কে কোম্পানির শাসকশ্রেণী অবশ্য সচেতন ছিল, কিন্তু তবু তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো এমন একটি অভিনব ব্যবস্থা প্রবর্তনের ঝুঁকি গ্রহণ করে, যার প্রভাব এদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

পূর্ববর্তী শাসকদের মতো কোম্পানি কেবল শাসন করার বা বংশীয় আধিপত্য কায়েমের উদ্দেশ্যে রাজ্যস্থাপন করে নি। কোম্পানি রাজ্যস্থাপন করেছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে, অধিকতর মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। এই রাজ্যের অন্যতম স্থপতি হেস্টিংস-এর ভাষায়, "এদেশের উদ্বৃত্ত রাজস্ব দেশে পাচার করা"ই ছিল এদেশে বৃটিশ আধিপত্য

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্থাপনের অন্যতম লক্ষ্য।[১] অধিকতর হারে সম্পদ পাচার করতে প্রয়োজন ছিল অধিকতর সম্পদ সৃষ্টি করা। কৃষিসম্পদ বৃদ্ধি না করে রাজস্ব বৃদ্ধি করলে ব্যাপক কৃষক অসন্তোষ এবং পরিশেষে কৃষিউৎপাদনের ধ্বংস ছিল অনিবার্য। অতএব ঔপনিবেশিক শাসনকে যুক্তিযুক্ত এবং স্থায়ী ভিত্তিতে স্থাপন করার জন্য প্রশাসকদের মধ্যে চিন্তাভাবনা শুরু হয় কিভাবে সনাতন কৃষিব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে কৃষিক্ষেত্রে বৃটেনের মতো রূপান্তর আনয়ন করা যায়। কৃষির প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভর করছে বাড়তি রাজস্ব সংগ্রহ এবং বাড়তি আমদানি-রপ্তানি। আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পেলে কোম্পানির আয়বৃদ্ধিও ছিল সুনিশ্চিত। কিন্তু কোম্পানি-প্রশাসকদের মধ্যে প্রতীতি জন্মে যে সনাতন ভূমিব্যবস্থার অধীনে কাঙ্ক্ষিত রূপান্তর সম্ভব নয়।

কোম্পানি-প্রশাসকদের এই 'উন্নয়নচিন্তার' আরেকটি কারণ ছিল দেশের কৃষি ও শিল্পে ক্রমাগত মন্দা ও ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ। পলাশী থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত সময়কাল ছিল কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্মম শোষণ, লুটতরাজের যুগ। এদের লাগামহীন লুটপাটের ফলে দেশের অর্থনীতিই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি, খোদ কোম্পানিও এই প্রক্রিয়ায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যবসায় প্রতি বছর কোম্পানি বিপুল পরিমাণ লোকসান দিতে থাকে। এদেশে রাজ্যস্থাপনের আগে এখানে কোম্পানির ব্যবসা ছিল লাভজনক, কিন্তু পলাশী পরিবর্তনের পর লাভের হার হ্রাস পেতে থাকে এবং দীউয়ানি (১৭৬৫) লাভের পর ব্যাপক লোকসান শুরু হয়।[২] কোম্পানির স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এর কর্মচারীগণ নিজ নিজ ব্যবসা এবং লুটপাটে নিমগ্ন থাকে। ফলে দেশের ঐতিহ্যবাহী কৃষি ও শিল্প প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৭৬৯ থেকে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ শুরু হয় এবং এসব দুর্ভিক্ষের ফলে দেশের লোকসংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেতে থাকে। এর প্রভাব পড়ে কৃষি-আবাদে। ১৭৯০ সালের একটি সরকারি হিসাবে অনুমান করা হয় যে, কোম্পানির দুঃশাসন ও ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমি চাষাবাদের অভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে বুনো পশুপাখির আবাসে পরিণত হয়।[৩]

কোম্পানি ও দেশের এই অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সওদাগর-সরকার চিন্তা শুরু করেন কিভাবে অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা যায়, কিভাবে দেশের কৃষি অর্থনীতিতে নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করে পুঁজিবাদী সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। কোম্পানির চিন্তা-চক্রের (think-tank) সুখ্যাত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আলেকজান্ডার ডাও, হেনরি প্যাট্রোলো, রিচার্ড বারওয়েল, ওয়ারেন হেস্টিংস, ফিলিপ ফ্রান্সিস, জর্জ ডুকারেল, ফিলিপ ডাকার্স, বাউটন রাউস, টমাস

১. Warren Hastings, *Memoirs Relative to the State of India, 1786*, extracted in Ramsay Muir, *The Making of British India, 1756-1858*, (First published, London 1915, Pakistan reprint 1969), 162.

২. Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations*, Vol III, (London 1819), 251

৩. Lord Cornwallis's Minute, 18 September 1784, *Fifth Report*, 1812.

ল, জেমস গ্রান্ট, হেনরি কোলব্রুক, চার্লস স্টুয়ার্ট এবং জন শোর। এঁরা সবাই দেশের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন না কোন মতবাদ ও মতাদর্শ ব্যক্ত করেছেন। পরে লর্ড কর্নওয়ালিসও যোগ দেন তাঁদের সঙ্গে। চিন্তা-চেতনা, ভাবধারায় এরা সবাই সমকালীন রাজনৈতিক অর্থনীতি ও ফিজিওক্রেসির মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির স্বরূপ কি হবে এ নিয়ে যুক্তিতর্কে তাঁরা ইউরোপীয় মনীষীদের উদ্ধৃতি দেন বিস্তর। বাংলায় কি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায় এ ব্যাপারে দুটি প্রশ্নে তাঁরা ছিলেন সবাই একমত। একটি হচ্ছে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি করা এবং আরেকটি হচ্ছে ভূমিনিয়ন্ত্রণে একটি ভূস্বামী শ্রেণী সৃষ্টি করা। উভয় প্রতিষ্ঠানই ইউরোপীয় এবং দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস নিজে ছিলেন একজন অভিজাত এবং উন্নয়নকামী ভূস্বামী। অতএব তিনি ছিলেন মুগল জমিদারশ্রেণীকে বৃটিশ মডেলে ভূস্বামী করার পক্ষপাতী। তিনি যুক্তি দেন যে, বাংলার জমিদারদের যদি জমির মালিক ঘোষণা করা হয় এবং সে মালিকানা যদি চিরস্থায়ী ভিত্তিতে স্থাপিত হয় এবং জমিদারদের উপর সরকারি রাজস্ব চিরস্থায়ীভাবে ধার্য করে দেয়া হয়, তাহলে তারা নিরাপদ বোধ করবে এবং বৃটিশ ভূস্বামীদের মতো ভূমিউন্নয়নে মনোযোগী হবে এবং জমিদার কর্তৃক ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃটেনের মতো এদেশেও একটি কৃষিবিপ্লব সংঘটিত হবে। কর্নওয়ালিস তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেন যে, ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ও সরকারকে প্রদেয় চিরস্থায়ী রাজস্বে অনুপ্রাণিত হয়ে জমিদারেরা অধিক মুনাফার জন্য পতিত জমি আবাদ করবে। ফলে দেশের অভাব দূর হলে জনসংখ্যা বাড়বে, সার্বিক উৎপাদন কর্মকাণ্ড বাড়বে, আমদানি-রপ্তানি বাড়বে এবং এসব উপাদানের পৌনঃপুনিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, যার সুফল ভোগ করবে কোম্পানিসরকার ও দেশবাসী উভয়েই।[৪] কিন্তু কর্নওয়ালিসের এমন আশাব্যঞ্জক তত্ত্বের সারবত্তা সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহ পোষণ করেন বোর্ড অব রেভিনিউ-এর প্রেসিডেন্ট জন শোর (গভর্নর জেনারেল, ১৭৯৩-৯৭)। জন শোর তত্ত্বের উপর নির্ভর না করে জোর দেন এদেশের সমাজঅর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার উপর। তাঁর যুক্তি ছিল যে, বৃটিশ তত্ত্ব বাংলার প্রেক্ষাপটে অনুপযোগী, কেননা বৃটিশ ও বঙ্গমুলুকের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা মোটেই তুলনীয় নয়। অতএব বৃটিশ তত্ত্ব বাংলায় প্রয়োগ করলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তিনি গ্রহণীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে এদেশের ভূমিব্যবস্থা, জমিদার-রায়তের সম্পর্ক ও অধিকার, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, খাজনার হার প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[৫] কিন্তু কর্নওয়ালিস মনে করেন যে, তথ্য সংগ্রহের নামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে বিলম্বিত করা মানে অবশ্যম্ভাবী উন্নয়নকে ঠেকিয়ে রাখা। যাহোক, কোর্ট অব ডিরেক্টর্স শোরের যুক্তির প্রশংসা

৪. Cornwallis's Minute, 3 February 1790, *Fifth Report,* 1812.

৫. Shore's Minute, 21 December 1789, *Fifth Report,* 1812.

করলেও অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন কর্নওয়ালিসের পক্ষে। কালবিলম্ব না করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করার জন্য কোর্ট কলকাতা সরকারকে নির্দেশ দেন। তদনুসারে ১৭৯৩ সালের ২৩ মার্চ গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস ঘোষণা করেন :

> দশসনা বন্দোবস্তের সময় জমিদার, তালুকদার ও অন্যান্য ভূস্বামীগণ যে জমায় জমিতে বন্দোবস্ত নিয়েছেন সে বন্দোবস্ত দশ বছরের স্থলে চিরস্থায়ী ঘোষণা করা হলো। এখন থেকে চিরস্থায়ী জমায় তারা এবং তাদের বৈধ উত্তরাধিকারীগণ বংশপরম্পরায় জমিতে একচ্ছত্র মালিকানা ভোগ করবেন।[৬]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে ভূসম্পত্তি

লর্ড কর্নওয়ালিস কলকাতা ত্যাগ করেন এই সন্তোষ নিয়ে যে, তিনি অবশেষে ভূমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টি করতে পারলেন যা কিনা ইতিপূর্বে এদেশে ছিল অনুপস্থিত। তাঁর আরেক তৃপ্তি ছিল এই যে, তিনি জমিদারকে তাঁর সৃষ্ট সম্পত্তির মালিক করতে পারলেন। কর্নওয়ালিসের দৃষ্টিতে সামাজিকভাবে জমিদারেরা ছিল বৃটেনের ভূস্বামী শ্রেণীর কাছাকাছি এবং তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল এই যে, বৃটিশ ভূস্বামীদের মতো বাংলার জমিদারেরাও দেশের উন্নয়নে নেতৃত্ব দেবেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিতে জমিদারকে একচ্ছত্র মালিক বলে ঘোষণা করা হলো। মালিক হিসেবে তিনি তাঁর ইচ্ছে মোতাবেক জমি ব্যবহার, হস্তান্তর, ইজারা ও দান করতে পারবেন। মুসলিম ও হিন্দু উত্তরাধিকার আইন মোতাবেক জমিদারের বৈধ উত্তরাধিকারীরা তাঁর ভূসম্পত্তির অধিকারী হবে এবং এ ব্যাপারে সরকার কোনরকম হস্তক্ষেপ করবে না। জমিদারি সম্পত্তিকে জোরদার করে উন্নয়নের হাতিয়ারে পরিণত করার লক্ষ্যে জমিদারের উপর সরকারি রাজস্ব চিরস্থায়ী করা হলো। এই ত্যাগস্বীকার করতে সরকার কুণ্ঠাবোধ করে নি এই আশায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে কৃষিবিপ্লব ঘটবে এবং কৃষির পরিবর্তনের ফলে আসবে শিল্পবিপ্লব এবং এসব পরিবর্তনের ফলে সার্বিক অর্থনীতির এমন উন্নতি ঘটবে যে, সরকার নানা পরোক্ষ কর আরোপের মাধ্যমে চিরস্থায়ী রাজস্বের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে।

কিন্তু আদর্শিকভাবে ভূমালিকানা যতো মুক্তভাবে কার্যকরী করা উচিত ছিল ততোটা মোটেই হয় নি। নানা বিধি-নিষেধের বেড়াজালে মালিকানা কণ্টকাকীর্ণ হয়েছে, যার ফলে বৃটেনের ভূস্বামীদের মতো বাংলার ভূস্বামীরা মুক্তভাবে সম্পত্তির স্বাভাবিক গতি অনুসরণ করতে পারেন নি। জমিদারেরা সব সময় আতঙ্কিত ছিলেন রাজস্ব বিক্রয় আইনের ভয়ে। রাজস্ব বিক্রয় আইনে ঘোষণা করা হয় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন জমিদার খরা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের অজুহাতে সরকারি রাজস্ব মওকুফের জন্য

৬. Section 4, Regulation 1, 1793

আবেদন করতে পারবেন না। "যদি কোন জমিদার ধার্য তারিখে সরকারি রাজস্ব পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে অনিবার্যভাবে তার ভূসম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করে বকেয়া রাজস্ব আদায় করা হবে। কোনক্রমেই কারো জন্য এই নিয়মের ব্যত্যয় কবা হবে না।"[৭] এই আইন কঠোরভাবে কার্যকর করা হয়। নিলামি বিক্রয় আইন থেকে রক্ষা পাবার জন্য জমিদারেরা ছিলেন সদা ভীত-সন্ত্রস্ত। নিয়মিত রাজস্ব পরিশোধ তখনই সম্ভব যখন নিয়মিত ফসল উঠে। কিন্তু এদেশের ফসল সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল প্রাকৃতিক পরি-বেশের উপর। মৌসুমি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল কৃষি অর্থনীতি প্রায়শই বিরাট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতো। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপদ্রব যেখানে কৃষি অর্থনীতিকে অনিবার্যভাবে অনিয়মিত করে রেখেছে, সেখানে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের কঠোর আইন ভূসম্পত্তির চালিকাশক্তিকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে। জমিদারি সম্পত্তির আরেকটি দুর্বল দিক ভূমিতে রায়তের অধিকার। বৃটেনে ভূস্বামীগণ প্রজাকে ইজারাশেষে বিদায় করে দেবার অধিকার ভোগ করতেন, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে রায়তের প্রথাভিত্তিক অধিকার স্বীকৃত।[৮] ফলে জমিদারকে তাঁর সম্পত্তি পরিচালনায় রায়তের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়েছে। কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশে রায়তের অবস্থান ছিল একটি বড় বাধা। বৃটিশ ভূস্বামীরা তাদের ভূমিনিয়ন্ত্রণে ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে ভূস্বামী পূর্বপ্রজার বদলে অন্য যেকোন প্রজার সঙ্গে চুক্তি করার অধিকার ভোগ করতেন। কিন্তু বাংলার জমিদার রায়তকে এমনিভাবে উৎখাত করতে পারতেন না। প্রথা আইনে ভূমিতে রায়তের ভোগদখলের অধিকার স্বীকৃত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই প্রথাভিত্তিক অধিকার বিলুপ্ত করে নি। বরঞ্চ সরকার একটি রেগুলেশনে ঘোষণা করে যে, ভবিষ্যতে রায়তের স্বার্থে প্রয়োজনে জমিদার-রায়ত সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধা করা হবে না।[৯] এর অর্থ এই যে, জমিদারি একটি নির্ভেজাল কণ্টকবিহীন সম্পদ নয়। এ সম্পদ নিয়ন্ত্রণে জমিদারের হাত নানাভাবে বাঁধা। অতএব, জমিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কেন সৃষ্টি হয় নি তা অনুসন্ধানে এই বাধাসমূহ নজরে রাখা আবশ্যক।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাথমিক অভিঘাত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণেতাগণ সবাই আশাবাদী ছিলেন যে, এই ব্যবস্থা কৃষি অর্থনীতিতে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করবে। কর্নওয়ালিসের কথায় :

> এই ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে অদম্য শ্রম ও অর্থনৈতিক স্পৃহা জাগিয়ে তুলবে এবং এর প্রভাবে বর্তমানে অনাবাদ অবস্থায় পড়ে থাকা বিপুল আয়তনের জমি আবাদ হবে। ভূস্বামীরা প্রভূত লাভবান হবেন এবং লাভের এক অংশ বাঁধ নির্মাণ, জলাধার ও অন্যান্য কৃষি উন্নয়ন খাতে ব্যয় করবেন এই কারণে যে, এর ফলে তাদের মুনাফা আরো বৃদ্ধি পাবে। কৃষকরা যেহেতু সকল কৃষিকর্মের মূল,

৭. Proclamation Article III, Section 4, Regulation 1,1793.

৮ Section 3, Regulation VII, 1793.

৯. Cornwallis's Proclamation Article VIII, Clause 1, 1793.

সেহেতু জমিদারেরা আপন স্বার্থেই তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন এবং প্রয়োজনে সাহায্য-সহায়তা করবেন।[১০]

কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, জমিদারগণ বাস্তবে উন্নয়নকর্মে কোন ভূমিকা রাখেন নি এবং রায়তশ্রেণীর প্রতিও সহানুভূতিশীল থাকেন নি। এর জন্য হয়তো কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা অনেকাংশে দায়ী। তাঁর ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ভূমালিকানাকে একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠান হিসেবে মালিকানাকে চিরস্থায়ী করা হয়, কিন্তু মালিককে নয়। মালিকের স্থায়িত্ব শর্তযুক্ত করা হয় নিয়মিত সরকারি রাজস্ব পরিশোধের সঙ্গে। এই শর্ত মালিক শ্রেণীর মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে। যেকোন কারণে সরকারি রাজস্ব বাকি পড়লে নিলামের মাধ্যমে জমি হস্তান্তর ছিল অবশ্যম্ভাবী। এই ত্রাস বিশেষকরে বিদ্যমান ছিল ঐসব জমিদারের মধ্যে, যাদের রাজস্বহার সম্পদাতিরিক্ত ধার্য করা হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজস্ব কোন জরিপের উপর ভিত্তি করে ধার্য করা সম্ভব হয় নি, যেজন্য সরকারি রাজস্ব সকল এস্টেটের উপর সম্পদের দিক থেকে সমভাবে ধার্য করা হয় নি।[১১] সম্পদাতিরিক্ত রাজস্বভারে ন্যুব্জ জমিদারগণ স্বাভাবিক কারণেই ছিলেন রাজস্ব বিক্রয় আইনের ভয়ে সন্ত্রস্ত। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, নিলামে জমিবিক্রয় এমন একটি ভূমিবাজার সৃষ্টি করবে, যেখানে "অজ্ঞ, অযোগ্য ও দুর্বল মালিকের জমি বাজারে আসবে এবং এই বাজারের মাধ্যমে জমি যোগ্য পুঁজিবাদী মালিকের কাছে হস্তান্তরিত হবে।"[১২]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণেতাদের স্বপ্ন কতটুকু সফল হয়েছিল? বাংলার জমিদার-সমাজ কি বৃটিশ ভূস্বামীদের মতো পুঁজিবাদী স্বভাব লাভ করতে পেরেছিল? জমিতে বাজার সৃষ্টির ফলে কি ভূমিনিয়ন্ত্রণে পুঁজিবাদী বিনিয়োগকারীর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল? এককথায়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কি কৃষি অর্থনীতিতে ইপ্সিত রূপান্তর ঘটেছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আরেকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এসে যায়। তা হলো, সকল ইপ্সিত পরিবর্তনের উৎস হিসেবে ধরা হয় ভূসম্পত্তির মালিক জমিদারকে; আশা করা হয়, সম্পত্তির যাদুকাঠির স্পর্শে সকল জমিদার একটি উন্নয়নকামী পুঁজিবাদী শ্রেণীতে পরিণত হবে। কিন্তু খুঁজে দেখা দরকার আসলে জমিদারেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতি কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল।

বৃটিশের রাজত্ব স্থাপনের আগে জমিদারসমাজ ছিল রাষ্ট্র পরিচালনায় সরাসরি জড়িত। বিশেষকরে মুগল কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে জমিদারেরা আঠারো শতকের প্রথমার্ধে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়। শিরীন আখতারের মতে, বড় বড় জমিদারেরা

১০. Governor General in Council to the Court of Directors, 12 April 1790, Para 3, *General Revenue Letter*, (India Office Records, London)

১১. Sirajul Islam, *The Permanent Settlement in Bengal: A Study of its Operation* 1790-1819, (Dacca 1979), 22-30

১২. Thomas Law, *A Sketch of some late arrangements and a view of the Rising Resources in Bengal*, (London, 1792), 179

তখন নবাবি রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সুবাদারি পদ লাভের রাজনীতিতে প্রতিযোগীগণ জমিদারদের সমর্থন কামনা করে এবং সেই রাজনীতির ধারামতেই তারা ব্যাঙ্কার ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যোগসাজশে সরকার পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়। এমনি ছিল তাদের ক্ষমতা।[১৩] জমিদারদের বিধিবদ্ধ ক্ষমতা যাই থাকুক না কেন, সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা এলাকার একমাত্র প্রভুতে পরিণত হয়। বড় বড় জমিদাররা প্রতিবেশী ক্ষুদ্র জমিদারদের এলাকা বলপ্রয়োগে নিজেদের দখলে এনে জমিদারির সীমানা আরো সম্প্রসারিত করে। রাজা, মহারাজা প্রভৃতি উপাধি দিয়ে তাদের আধিপত্যবাদের স্বীকৃতি দেয় সরকার। এমনকি সরকার তাদেরকে সামাজিক বিচারক্ষমতা পর্যন্ত প্রদান করে।[১৪] মাঝারি ও ছোট জমিদারদেরও ছিল প্রজাকুলের উপর প্রভূত ক্ষমতা। এককথায়, তাত্ত্বিকভাবে জমির মালিক হোন আর নাই হোন, নবাবি আমলে জমিদার ছিলেন ভূমির স্থায়ী দখলকার এবং এলাকার একচ্ছত্র অধিপতি।

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিধি মোতাবেক জমিদারশ্রেণী সার্বিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। তারা এখন শুধু ভূস্বামী, ভূমিনিয়ন্ত্রণের অধিকারী, জেলা কালেক্টরের অধীনে অতি সাধারণ নাগরিক। জমির উপর জমিদারদের মালিকানা প্রদান করে এবং সরকারি রাজস্বহার চিরস্থায়ীভাবে ধার্য করে সরকার সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এতে জমিদারগণ কৃষিউন্নয়ন কর্মে উদ্বুদ্ধ হবে। কিন্তু জমিদারগণ এই মালিকানাস্বত্ব পেয়ে নতুন কোন সুবিধা লাভ করেছে বলে মনে করে নি। বরঞ্চ বৃটিশ শাসনাধীনে তাদের চূড়ান্ত পতন হয়েছে বলে তারা ধরে নেয়। তারা মনে করে যে, রাজস্ব বিক্রয় আইনের অধীনে তারা অবশিষ্ট ক্ষমতাটুকুও যেকোন সময় হারাতে পারে। চিরস্থায়ী রাজস্বহারও তাঁদের জন্য কোন বিশেষ সুবিধা ছিল না, কারণ মুগল আমলে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে রাজস্বদাবিও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সম্পদ হ্রাস পেলে রাজস্বদাবিও অনুরূপভাবে হ্রাস পেয়েছে। মুগল আমলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রাজস্ব মওকুফ করা হয়েছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে রাজস্ব বাকি পড়লে জমিদারকে এজন্য দায়ী করে উৎখাত করা হতো না। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে যেকোন কারণেই হোক, সরকারি রাজস্ব বাকি পড়লে তৎক্ষণাৎ জমি বিক্রি করে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। জমিদারদের বক্তব্য ছিল এই যে, নিয়মিত রাজস্ব পরিশোধ নির্ভর করে নিয়মিত ভাল ফসল উৎপাদনের উপর এবং সেটা নির্ভর করে প্রথমত নিয়মিত ও পরিমিত বৃষ্টিপাতের উপর এবং দ্বিতীয়ত মহামারী, কীটপতঙ্গ, নদীসিকস্তি প্রভৃতি থেকে নিরাপদ থাকার উপর।[১৫] এরকম প্রাকৃতিক বিষয়গুলো মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, অথচ কঠোর নির্দেশ দেয়া হলো যে, রাজস্ব বাকি পড়লেই এর কারণ বিবেচনা না করে জমি নিলামে বিক্রি করে বকেয়া সংগ্রহ করা হবে।

১৩. Shirin Akhtar, *The Role of the Zamindars in Bengal 1707-1772*, (Dhaka 1982), 179.

১৪. ঐ, দেখুন অধ্যায় 4-6.

১৫. Sirajul Islam, *Permanent Settlement*, 20-22

স্বাভাবিক কারণেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থাকে জমিদারেরা স্বাগত জানাতে পারে নি। তবুও তারা এই বন্দোবস্তে রাজি হতে বাধ্য হয়েছে, কারণ এছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। অনেক জমিদার অবশ্য প্রতিবাদ জানিয়ে বন্দোবস্ত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং বিধি মোতাবেক রাজস্বের উপর শতকরা দশ ভাগ মালিকানা নিয়ে তারা সরকারকে জমি ইজারা দিয়ে দেন। এককথায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারকে ভূমিউন্নয়নে প্রেরণা যোগাবে– কোম্পানি সরকারের এই ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকর করার পরপরই ভূমিনিয়ন্ত্রণে এক বিরাট সঙ্কট সৃষ্টি হয়। রাজস্ব বকেয়ার কারণে হাজার হাজার জমিদারি প্রতি বছর নিলামে বিক্রি হতে থাকে। জমিবিক্রির হিড়িকে বড় বড় জমিদারিগুলি প্রথম দশ বছরের মধ্যেই সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। প্রথম দশকে ধ্বংসপ্রাপ্ত বড় বড় জমিদারিগুলির মধ্যে ছিল নাটোর রাজ, দিনাজপুর রাজ, নদীয়া রাজ, বীরভূম রাজ, বিষ্ণুপুর রাজ এবং আরো অনেক বড় বড় পরিবার।[১৬] এঁদের মধ্যে সমূলে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পান একমাত্র বর্ধমান রাজ। মাঝারি ও ছোট জমিদারগণ এই সঙ্কটে এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হন নি। তবে অচিরেই ভূমিনিয়ন্ত্রণে স্থিরতা আসে। ১৮০৩ সাল থেকে রাজস্ব বকেয়ার কারণে ভূমিবিক্রয় ক্রমশ কমে আসে। ১৮২০ সাল নাগাদ সরকারি রাজস্বের নিরিখে বাংলার প্রায় অর্ধেক জমিদারি ভূমি নিলামের মাধ্যমে হাতবদল হয়।[১৭]

এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন ব্যাপক ভূমিহস্তান্তর মানে সনাতন জমিদার-সমাজকাঠামোয় এক মহা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বড় বড় রাজা-মহারাজা এক দশকের মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেন এবং তাঁদের ধ্বংসস্তূপের উপর সৃষ্টি হলো অসংখ্য নতুন জমিদার, যারা পেশাগতভাবে আগে ছিলেন ব্যবসায়ী, সরকারি ও জমিদারি আমলা। তারা ভূমিনিয়ন্ত্রণে যোগদান করলেন আসলে সামাজিক স্বীকৃতির জন্য, পুঁজিবাদী পরিবর্তনের জন্য নয়। এমন কোন আলামত নেই যে, ভূমিনিয়ন্ত্রণে আগত নতুন জমিদারগণ পুরনোদের চেয়ে বেশি পুঁজিবাদী মনোভাবাপন্ন ছিলেন। নতুন ও পুরনো উভয় শ্রেণীর ভূস্বামীরা ছিলেন ভূমিতে পুঁজিবিনিয়োগের ব্যাপারে অনাগ্রহী। এর অর্থনৈতিক কারণ হয়তো এই যে, মহাজনী, শস্য ব্যবসা, মজুতদারি, কোম্পানির কাগজ ক্রয় প্রভৃতি খাতে পুঁজিবিনিয়োগ যতোটা লাভজনক ও নিরাপদ ছিল, ভূমিউন্নয়ন খাতে তা ততোটা ছিল না। তারা জমিদারসমাজে অনুপ্রবেশ করেছেন সামাজিক স্বীকৃতির জন্য, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য নয়। নতুন জমিদারগণ বরঞ্চ পুরনোদের চেয়ে আরো কঠোর ছিলেন এই অর্থে যে, তাদের বেশিরভাগই ছিলেন এলাকায় অনুপস্থিত। তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা ছিল শহরে। আর তাঁদের এস্টেট পরিচালনা করতো নায়েব-গোমস্তারা। গ্রামের সম্পদ পাচার হয়েছে শহরে, বেড়েছে গ্রামীণ দারিদ্র্য।

---

১৬. ঐ, Chapter four

১৭. ঐ, 157.

এ কথা সত্য যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কৃষির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং দীর্ঘদিন দেশ দুর্ভিক্ষমুক্ত থেকেছে। কিন্তু এর জন্য অবশ্যই জমিদারদের দায়ী করা যায় না, এই কৃতিত্ব কৃষকশ্রেণীর। ঐতিহাসিক ও দার্শনিক জেমস মিল-এর ভাষায়, "রায়তের হাতে পুঁজি সৃষ্টিতে জমিদারি ব্যবস্থা সহায়ক হয়েছে এমন ধারণা আমি করতে পারি না, আমাদের কাছে পরিষ্কার প্রমাণ রয়েছে, অধুনা যে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটছে এর জন্য দায়ী কৃষক, জমিদার নয়।"[১৮] জেমস মিল ছিলেন কোম্পানির ইন্ডিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা। বাংলা থেকে প্রেরিত চিঠিপত্রের উপর ভিত্তি করে তিনি আরো সাক্ষ্য দেন, "জমিদারেরা কৃষির উন্নয়নে কোনরূপ অবদান রাখছেন এমন প্রমাণ নেই। বাংলার বিভিন্ন জেলার কালেক্টরগণ বলছেন যে, এই সম্প্রসারণ ঘটছে সম্পূর্ণ রায়তের প্রচেষ্টায়, জমিদারের বিনিয়োগের জন্য নয়।"[১৯] হেনরি নিউনহ্যাম দীর্ঘদিন বাংলায় অবস্থান করেছেন কোম্পানির বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সদস্য হিসেবে। তিনি সাক্ষ্য দেন যে, বাংলায় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে কৃষক-শ্রমিক কর্তৃক। জমিদারের ভূমিকা এখানে শুধু কৃষককে উচ্চহারে চক্রবৃদ্ধি সুদে সামান্য ঋণ দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। জঙ্গল পরিষ্কার করে জনপদ সৃষ্টি করা, পুকুর কাটা, জলাশয় নির্মাণ প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করেছে কৃষক-শ্রমিক।[২০]

কোম্পানি প্রশাসন আশাবাদী ছিল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারকে বৃটিশ ভূস্বামীদের মতো উন্নয়নকামী পুঁজিবাদী ভূস্বামীতে পরিণত করবে। কিন্তু বাস্তবে সে আশা অচিরেই তিরোহিত হলো। ১৮১৯ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস মন্তব্য করেন যে, "এই বন্দোবস্ত কর্নওয়ালিস করেছিলেন একটি মহৎ উদ্দেশ্যে, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য মোটেই সফল হয় নি। এই বন্দোবস্ত অধিকন্তু বাংলার সকল কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে চরম অত্যাচার-উৎপীড়নের মুখে ঠেলে দেয়।"[২১]

মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর আবির্ভাব

সদ্যসৃষ্ট ভূমিবাজারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ভূস্বামীশ্রেণীর গঠনগত পরিবর্তন এবং ভূস্বামী শ্রেণীতে নতুন সদস্যের অনুপ্রবেশ ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা প্রথমেই অনুমিত হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণেতারা বরং তা কামনাই করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, এর ফলে ভূমিনিয়ন্ত্রণে পুঁজিবাদী উদ্যোগে বিনিয়োগকারীর যোগদান সম্ভব হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা কল্পনা করতে পারেন নি যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে জমিদার ও রায়তশ্রেণীর মধ্যবর্তী একটি বহুস্তরবিশিষ্ট মধ্যস্বত্বশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটবে। মধ্যস্বত্ব

১৮. J. Mill's evidence, *British Parliamentary Papers*, (India Affairs), Vol. 5, Evidence 3348.04

১৯. ঐ, Evidence 3355.

২০. H. Newnham's evidence, 7 May 1832, *British Parliamentary Papers* (India), 1831-32, Vol XI, Evidence 2737.

২১. Hastings' Minute, *British Parliamentary Papers* (India), 1831-32, Vol. XI, Report IV-V.

প্রকৃতপক্ষে ছিল জমিদারদের সৃষ্ট আরেকটি সম্পত্তি। অন্যকথায় সম্পত্তির ভিতর সম্পত্তি। জমিদার কর্তৃক এহেন স্বত্ব সৃষ্টি ছিল আসলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতি তাদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার একটি দিক। এর প্রধান কারণ রাজস্ব বিক্রয় আইন (সূর্যাস্ত আইন)। মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করে তারা তাদের ভূমিনিয়ন্ত্রণের দায়িত্বভার অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে অনর্জিত আয়ের ব্যবস্থা করলো। যে শর্তে জমিদার সরকারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছিল, প্রায় একই শর্তে মধ্যস্বত্বাধিকারীরাও জমিদারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। প্রধান শর্ত ছিল, ধার্য খাজনা নিয়মিত পরিশোধ করা হবে। তবে জমিদারি সম্পত্তি লাভ করতে যদিও জমিদারদের কোন মূল্য দিতে হয় নি, তবু মধ্যস্বত্ব লাভ করতে গিয়ে মধ্যস্বত্বাধিকারীকে মোটা অঙ্কের সেলামি দিতে হয়।

মধ্যস্বত্ব ছিল জমিদারি স্বত্বের মতোই হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারযোগ্য। তবে মধ্যস্বত্বের দায়-অধিকারের বৈশিষ্ট্য সকল অঞ্চলে সমান নয়। স্বত্বের উৎপত্তি ও সম্পর্কের দিক বিচার করলে মধ্যস্বত্বকে মোটামুটি দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—পত্তনিস্বত্ব ও পতিত-আবাদ স্বত্ব। পত্তনিস্বত্ব বাংলার বিদ্যমান কৃষিসম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন। এর উদ্ভাবক ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা। এই অভূতপূর্ব স্বত্ব তৈরি করে বর্ধমানরাজ রাজস্ব বিক্রয় আইনের প্রয়োগ থেকে রক্ষা পান। মহারাজা তাঁর বিশাল জমিদারি কয়েক হাজার তালুকে বিভক্ত করেন এবং মোটা অঙ্কের নগদ সেলামির বিনিময়ে প্রতিটি তালুক এক একজন তালুকদারের কাছে পত্তন দেন। পত্তনির শর্ত থাকে এই যে, পত্তনিতালুকদার জমিদারকে প্রদেয় খাজনা চিরকাল অপরিবর্তিত হারে প্রদান করবে, সে তালুক হস্তান্তর করতে পারবে, তার উত্তরাধিকারীরা জমি একই শর্তে বংশপরম্পরায় ভোগ করবে, কিন্তু নিয়মিত খাজনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে জমিদার উক্ত তালুক বিক্রয় করে বকেয়া খাজনা সংগ্রহ করতে পারবেন। বর্ধমানমহারাজা এই পত্তনিব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে বিপুল বিত্তের অধিকারী হন এবং স্বাভাবিক কারণেই তাঁর এই সাফল্য অন্য ভূস্বামীদেরও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে।[২২]

কৃষি অর্থনীতিতে পত্তনিস্বত্বের কোন গঠনমূলক অবদান রাখার অবকাশ ছিল না। এটি ছিল সম্পূর্ণ একটি খাজনাসংগ্রহপদ্ধতি এবং ভূমিব্যবস্থাপনায় কোন অংশ না নিয়ে অনর্জিত আয় বৃদ্ধি করার একটি দায়িত্বহীন ব্যবস্থা। এর ফলে রায়তের খাজনার হার বেড়ে যায়। সম্পদ বৃদ্ধি না করে পত্তনিতালুকদার কর্তৃক খাজনা বৃদ্ধিতে রায়তেরা উৎপীড়নের শিকার হয়। পত্তনিদারগণ আবার মুনাফার লোভে সৃষ্টি করে অধীনস্থ পত্তনিতালুক। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর পরিণতি ছিল মারাত্মক। এর ক্ষতিকর বিস্তার দেখে বর্ধমানমহারাজা নিজেই হতবাক হয়ে যান। অতি উৎকণ্ঠার সঙ্গে তিনি সরকারকে অবগত করেন :

২২. Sirajul Islam, "The Problem of Madhyasvatvas in Nineteenth Century Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, 1 32 (1987), 14-15.

পত্তনিদারের কুকাণ্ড। অতিলোভের বশবর্তী হয়ে পত্তনিতালুকদারেরা নিজেরা জমির ব্যবস্থাপনা থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে অধিক মুনাফার লোভে পত্তনিমহলে দার-পত্তনি ইজারাদার সৃষ্টি করেছে। দার-পত্তনিদারেরাও ফের সৃষ্টি করেছে সে-পত্তনি অর্থাৎ তৃতীয় মাত্রার ইজারাদার। এমনিভাবে চার-পাঁচটি স্বত্বস্তর সৃষ্টি হয়েছে মূল পত্তনিদার ও রায়তের মধ্যে। সহজেই অনুমেয়, একই জমির আয়ের উপর যদি এতগুলি মুনাফাখোর পরগাছা বাঁচার ব্যবস্থা করে, তা হলে প্রকৃত রায়তের অবস্থা কি পরিণতি লাভ করতে পারে। মহল থেকে এখন রায়তেরা পালিয়ে যাচ্ছে, কৃষিজমি পরিণত হচ্ছে পতিত জঙ্গলে।[২৩]

পত্তনিস্বত্বের বিস্তার পরিমাপ করা কঠিন। তবে অনুমান করা যায় যে, পত্তনি- স্বত্ব বর্ধমান অঞ্চলের বাইরে খুব একটা প্রসারলাভ করে নি। এর অন্যতম প্রধান কারণ, এই পত্তনিস্বত্ব লাভজনকভাবে সৃষ্টি করার জন্য বিশাল আয়তনের জমিদারিগুলি ছিল বিশেষভাবে উপযোগী, কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগেই বড় বড় জমিদারিগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বর্ধমান অঞ্চলের বাইরে বরঞ্চ আরেক শ্রেণীর মধ্যস্বত্ব বিকাশলাভ করে। সেটি হচ্ছে পতিত-আবাদ স্বত্ব এবং এর আদর্শ ক্ষেত্র ছিল পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চল।

কৃষিযোগ্য পতিত জমি আবাদপ্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড উনিশ শতকের প্রথম থেকে শুরু হয়। সরকারিভাবে অনুমান করা হয় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাক্কালে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমি প্রাকৃতিক অবস্থায় বিরাজমান ছিল।[২৪] এই বিশাল পতিত এলাকার বৃহদংশ অবস্থিত ছিল পূর্ব বাংলার ব-দ্বীপ অঞ্চলে। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দশকে এসে দেখা যায়, আবাদ আন্দোলনের ফলে সুন্দরবনের কেবল 'রিজার্ভ ফরেস্ট' ছাড়া বাকি সব পতিত জমিতে বসতি স্থাপিত হয়েছে।[২৫]

পতিত-আবাদ শ্রেণীর মধ্যস্বত্ব বিকাশের জন্য কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করা যেতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চাপে জমিদারেরা নানা ধরনের প্রতিরক্ষাকৌশল অবলম্বন করে। একটি হচ্ছে পতিত ভূমি আবাদ করা। খাজনার হার না বাড়িয়ে আয় বাড়ানোর একটি সফল পন্থা ছিল পতিত-আবাদ। জমিদারেরা এতে আগ্রহী হয় আরেকটি কারণে। সরকার সকল বসতিহীন পতিত জঙ্গলভূমি খাসমহল অর্থাৎ গভর্নমেন্ট এস্টেট বলে ঘোষণা করে।[২৬] অতএব জমিদারির পার্শ্ববর্তী বন এলাকা আবাদ করে জমিদারেরা এর উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোন জরিপের উপর ভিত্তি করে

২৩. Raja of Burdwan to Sadr Diwani Adalat, date not available, *Civil Judicial Proceedings*, 8 October 1819, No. 30, (India Office Records, London)

২৪. Lord Cornwallis's Minute, 18 September 1788, *Fifth Report*, 1812, Appen-dix 5

২৫. The courses of reclamation movement may be traced in Rennel's Survey Maps (1764-72), *Revenue Survey Maps* (1847-63) and Survey and Settlement Maps (1886-1944)

২৬. Governor General in Council to Board of Revenue, 5 July 1816, abstracted in *Board of Revenue Proceedings*, 15 June 1827, No 90, (India Office Records, London)

হয় নি এবং ১৮৫০-এর দশকে থাক্‌বস্ত জরিপের আগে গ্রাম ও জমিদারির কোন সুনির্দিষ্ট সীমানা ছিল না। জমিদারেরা এর সুযোগ গ্রহণ করে আবাদকে মালিকানার সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিস্তীর্ণ এলাকা আবাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। জমিদারশ্রেণী আবাদে আগ্রহী হয়েছে আরো দুটি প্রধান কারণে—একটি জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং অপরটি কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি।

একই পরিবেশে সমকালীন বৃটেনেও আবাদ আন্দোলন হয়েছে। জনসংখ্যা ও মূল্যবৃদ্ধির ফলে বৃটিশ ভূস্বামীরা আবাদের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগ করেন এবং সে বিনিয়োগ ছিল পুঁজিবাদী। কিন্তু বাংলার ভূস্বামীরা আবাদে পুঁজিবাদী পন্থা অবলম্বন না করে সামন্ত কায়দায় স্বত্ব সৃষ্টি করে অনর্জিত আয়ের ব্যবস্থা করেন। পতিত-আবাদের জন্য প্রয়োজন বিপুল শ্রমশক্তি। আবাদজমি থেকে মুনাফা অর্জন করার জন্য কমপক্ষে দশ বছর অপেক্ষা করতে হতো। জঙ্গল কাটা, নল-খাগড়া কাটা, বৃক্ষের গুড়ি তোলা, পানি নিষ্কাশন ও জলসেচের ব্যবস্থা করা, গ্রামবসতি স্থাপন করা প্রভৃতি খাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ, লোকশক্তি ও সময়ের দরকার ছিল তা যোগাড় করার শক্তি অনেক জমিদারেরই ছিল না। অতএব, এরা অবলম্বন করে আবাদের সামন্তবাদী পথ অর্থাৎ জঙ্গলবাড়ি তালুকদারের মাধ্যমে আবাদ করা। জমিদার কর্তৃক জঙ্গলবাড়ি তালুকদারের মাধ্যমে আবাদ করার সমস্যাটি ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষও লক্ষ্য করেন। পতিত-আবাদ মধ্যস্বত্বের আবির্ভাব ও বিকাশ সম্পর্কে একটি সরকারি রিপোর্টে (১৮৩৯) মন্তব্য করা হয় :

> বৃটেনে জনসংখ্যা ও মূল্যবৃদ্ধিতে সাড়া দিয়ে ভূস্বামীরা ব্যাপক কৃষি সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন এবং সে সম্প্রসারণ সংঘটিত হয়েছে পুঁজিবাদী ইজারাদার কর্তৃক। কিন্তু অনুরূপ জনসংখ্যা ও মূল্যবৃদ্ধির পরিবেশে এদেশে কৃষি সম্প্রসারণ সংঘটিত হয়েছে সামন্ত চরিত্রের স্থায়ী মধ্যস্বত্ব কর্তৃক। তালুকদার এবং অধীনস্থ হাওলাদার—এই দুই প্রধান মধ্যস্বত্বাধিকারীর নেতৃত্বে পতিত-আবাদ সংঘটিত হচ্ছে।[২৭]

বৃটিশ ভূস্বামীদের মতো বাংলার জমিদারেরাও বিরাট মুনাফা লাভ করতে পারতেন, গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনতে পারতেন, যদি তারা মধ্যস্বত্বের আশ্রয় না নিয়ে পুঁজিবাদী পন্থায় ইজারাদারের মাধ্যমে আবাদ সংগঠন করতে সক্ষম হতেন। আবাদ অঞ্চলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের বিশেষ সুযোগ ছিল এজন্য যে, এখানে কোন জনপদ ছিল না, রায়ত ছিল না। অতএব রায়ত উৎখাত করে পুঁজি ও শ্রমের ভিত্তিতে কৃষিতে পুঁজিবাদী সম্পর্ক গড়ে তোলার কঠিন সমস্যা এখানে ছিল না। তবুও জমিদারেরা সরাসরি আবাদ না করে মধ্যস্বত্বাধিকারীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন কেন? এদের এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে তিনটি প্রধান কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, রাজস্ব বিক্রয় আইন

২৭. Halliday's Note on undertenures, 30 July 1839, *Bengal Revenue Consultations*, 12 November 1839, No 49, (India Office Records, London).

থেকে রক্ষা পাবার জন্য নিয়মিত সরকারি রাজস্ব পরিশোধের প্রয়োজন ছিল। মধ্যস্বত্বাধিকারী কর্তৃক সেলামি ও নিয়মিত খাজনা প্রদানের ফলে জমিদারেরা আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়। দ্বিতীয়ত, জমিদারের ছিল পুঁজির অভাব। আবাদকাজের জন্য যে বিপুল পুঁজির প্রয়োজন ছিল, যে সাংগঠনিক দক্ষতার প্রয়োজন ছিল এর কোনটাই জমিদারদের ছিল না। তৃতীয়ত, ঐতিহ্যগতভাবে চিরকালই পতিত-আবাদ সংগঠিত করেছে জঙ্গলবাড়ি তালুকদার। মুগল সরকার সবসময়ই পতিত-আবাদে আগ্রহী ছিল। জঙ্গলবাড়ি তালুকদার নামেমাত্র রাজস্বের ভিত্তিতে বা নিষ্কর ভিত্তিতে সরকার থেকে পাট্টা লাভ করতো। জঙ্গলবাড়ি তালুকদার এবং লাখেরাজদারেরা প্রকৃত আবাদ সংগঠনের জন্য সৃষ্টি করতো বিভিন্ন নামের মধ্যস্বত্বাধিকারী, যথা, হাওলাদার, গুনতিদার, জোতদার, ওদাদার ইত্যাদি। এদের নেতৃত্বে গ্রামপত্তন হতো এবং এরাই ছিল গ্রামের প্রকৃত ভূস্বামী।

মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করে আবাদ করার ঐতিহ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারেরা পরিহার করতে পারে নি। পুঁজিপতির ভূমিকা পালন করার জন্য যে পুঁজি, শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ছিল তা জমিদারদের মধ্যে ছিল না। তবে উনিশ শতকের আবাদ আন্দোলন ছিল এতই ব্যাপক এবং অর্থনৈতিক ও কৃষিসম্পর্কের দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যে, এর সংগঠক মধ্যস্বত্বাধিকারী শ্রেণী সম্পর্কে কিছু বিবরণ দেয়া প্রয়োজন। স্বত্ব ও সংগঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যস্বত্বকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন, নোয়া-আবাদ, চর-আবাদ, বিল-আবাদ এবং সুন্দরবন-আবাদ।[২৮] নোয়া-আবাদ চট্টগ্রাম অঞ্চলের আবাদ আন্দোলনের বিশেষ নাম। সরকার থেকে মেয়াদি পাট্টা নিয়ে ইজারাদারেরা জঙ্গল আবাদ করতো। নোয়া-আবাদ তালুকদার নামে পরিচিত এসব ইজারাদার প্রকৃত আবাদের জন্য আবাদকার পাট্টা প্রদান করে চৌধুরী নামে গৃহস্থকে, যারা জমি আবাদ করে সেখানে বসতি স্থাপন ও কৃষিকাজের ব্যবস্থা করে। মেঘনা ব-দ্বীপ এলাকার চরসমূহ আবাদ হয় একটি ভিন্ন পরিবেশে। চর জেগে উঠার পর প্রথম দখলকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সরকার থেকে বন্দোবস্ত লাভ করে মেয়াদি বা চিরস্থায়ী ভিত্তিতে। চরকে কৃষি-উপযোগী করে তোলার জন্য ঐ বন্দোবস্তকারী ভূস্বামী মেয়াদি বা চিরস্থায়ী স্বত্বে পুঁজি বিনিয়োগকারী ইজারাদার নিয়োগ করে। তালুকদার নামে এসব ইজারাদার গ্রামপত্তন ও চাষাবাদ শুরু করার জন্য মেয়াদি বা চিরস্থায়ী ভিত্তিতে হাওলাদার নামে আবাদকার নিযুক্ত করতো। একই শর্তে হাওলাদার নিযুক্ত করতো নিম-হাওলাদার। হাওলাদার ও নিম-হাওলাদারেরা হচ্ছে বসতিপত্তনকারী গ্রামপ্রধান। পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে চাষী এনে তারা চাষাবাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। চর-আবাদ পদ্ধতির মতো দক্ষিণবঙ্গে বিস্তীর্ণ বিল এলাকায়ও আবাদ শুরু হয় কয়েক দফা মধ্যস্বত্বাধিকারীর পুঁজি বিনিয়োগের ফলে। মধ্যস্বত্ব কর্তৃক সুন্দরবন

২৮. The organisational structure of reclamation by madhyasvatva interests has been elaborated in Sirajul Islam's *Bengal Land Tenure : The origin and growth of intermediate interests in the 19th Century*, (Calcutta, 1988), 47-56.

আবাদের কাহিনী বেশ চমকপ্রদ। সুন্দরবন অতিশয় উর্বর এলাকা, কিন্তু এর আবাদ ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও ঝুকিপুর্ণ। কমপক্ষে দশ থেকে বারো বছর সময় লাগলো আবাদ সম্পন্ন করে কৃষি-আবাদ শুরু করতে। বৃক্ষ কর্তন, নলখাগড়া ও আগাছা পরিষ্কার, নালা কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, সমুদ্রের লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ করার জন্য বাঁধ নির্মাণ, দীর্ঘদিন কর্ষা বা চাষীদের খোরাকি ও গবাদিপশু বাবদ ঋণ প্রদান করা, হাট-বাজার স্থাপন করা প্রভৃতি কাজে বিপুল পুঁজি বিনিয়োজিত হয়। এই পুঁজির ব্যবস্থা করতে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করা হয়েছে বিভিন্ন স্বত্ব-সেকা (intermediate tenure)। তালুকদার, ওসাত তালুকদার, নিম-ওসাত তালুকদার, হাওলাদার, নিম-হাওলাদার, ওসাত নিম-হাওলাদার প্রভৃতি নামে মধ্যস্বত্বাধিকারীর স্তর বা সেকার সংখ্যা সাধারণত চার থেকে ছয় মাত্রা। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দশ থেকে বিশ মাত্রা পর্যন্ত স্বত্বস্তর লক্ষ্য করা যায়।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাক্কালে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূমি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। উনিশ শতকের শেষ দশকে এসে আমরা একটি ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। প্রায় সারা দেশই তখন চাষাবাদে ভরে উঠেছে। এই মহা আবাদ আন্দোলনে জমিদারশ্রেণীর ভূমিকা ছিল অতি নগণ্য। এই আবাদ আন্দোলনে বড় অবদান রেখেছে মধ্যস্বত্বাধিকারী শ্রেণী, মূল পুঁজিবিনিয়োগকারী আবাদকার তালুকদার এবং মাঠ পর্যায়ে মূল আবাদ সংগঠক হাওলা, নিম-হাওলা, ওসাত হাওলাদার প্রভৃতি আবাদকার। তারাই গ্রামপত্তন করে এবং তাদের পুঁজি ও শ্রমের ফলেই জঙ্গল পরিণত হয় উর্বর শস্যক্ষেত্রে। কর্ষা নামক চাষীরা ছিল এক ধরনের কৃষিশ্রমিক। জমিতে এদের কোন অধিকার ছিল না। জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য প্রথমে এদেরকে মজুর হিসেবে আনা হতো এবং তারাই ছিল আবাদ জমির প্রথম চাষী।

মধ্যস্বত্ব অর্থনীতিতে পুঁজিবিনিয়োগ হলেও এটি আধুনিক পুঁজিবাদী সম্পর্কে রূপান্তরিত হতে পারে নি। পতিত-আবাদে পুঁজিবিনিয়োগের প্রাতিষ্ঠানিক দিক ছিল এমন যে, তা উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে পারে শুধু আবাদের প্রাথমিক স্তরে। গ্রামপত্তন এবং কৃষিউৎপাদন শুরু হবার পর মধ্যস্বত্বাধিকারীর ভূমিকা শুধু খাজনা সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রকৃত কৃষকের সকল খাজনা সংগ্রহকারী স্তর তখন অনর্জিত আয়ভোগকারী শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয় এবং কৃষক হয় তাদের শোষণের শিকার।

প্রজাস্বত্বের বিকাশ ও এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মুগল আমলে জমিতে রায়তের ভোগদখলের অধিকার ছিল। রেওয়াজ ও দস্তুর ছিল এই অধিকারের ভিত্তি। জমিদার কখনো এই অধিকার থেকে রায়তকে বঞ্চিত করতে পারতো না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে রায়ত প্রজায় পরিণত হলো, কারণ জমির মালিক এখন জমিদার, সরকার নয়। জমিদার এখন ভূস্বামী এবং রায়ত তার চুক্তিবদ্ধ প্রজা। পাট্টায় লিপিবদ্ধ চুক্তির বরখেলাপ করলে জমিদার মালিক হিসেবে তাঁর প্রজাকে

উৎখাত করতে পারেন। তবে আপাতদৃষ্টিতে ভূমিতে রায়তের কোন অধিকার না থাকলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোষণায় রায়তের প্রথাভিত্তিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য রায়তের সে অধিকার ঐ ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয় নি। ফলে রায়তের অধিকার সংক্রান্ত মামলায় আদালত সাধারণত জমিদারের পক্ষেই রায় দিয়েছে, যদিও আদালত কখনো কখনো ব্যাখ্যা দিয়েছে এই মর্মে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্বত্বেও ভূমিতে রায়তের প্রথাভিত্তিক অধিকার রয়েছে এবং তা অস্পষ্ট। অনুরূপ দ্বন্দ্ব ছিল পত্তনি ও অন্যান্য স্বত্বের প্রশ্নেও। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে জমিদার কর্তৃক উপস্বত্ব সৃষ্টি ছিল বিধিবহির্ভূত। এসব কারণে জমিদার-প্রজা সম্পর্ক ক্রমশই অবনতির পথে যাচ্ছিল। অধিকার আদায়ের জন্য রায়তেরা বিদ্রোহ করেছে জমিদারের বিরুদ্ধে। বিশেষকরে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে কৃষক-আন্দোলন ভীষণভাবে বেড়ে যায়। গ্রামাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে কৃষকের অধিকার সংজ্ঞায়িত করে আইন পাশ করতে সরকার বাধ্য হয়। অধিকন্তু কৃষকের পক্ষে সরকারের চিন্তা-ভাবনার আরেকটি কারণ ছিল গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নে জমিদারদের চরম ব্যর্থতা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম অর্ধ শতকের অভিজ্ঞতা সরকারি মহলে প্রতীতি জন্মায় যে, গোটা কৃষিব্যবস্থারই পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। এই চিন্তারই প্রথম ফসল ১৮৫৯ সালের দশম আইন।[২৯]

প্রাক-ঔপনিবেশিক রায়ত সমাজকে প্রধান দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যথা, খোদকাশতা ও পাইকাশতা। খোদকাশতা রায়ত ছিল গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। খোদকাশতা রায়তের মধ্যে একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী ছিল। এরা সরকারকে খাজনা দিত চিরস্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় হারে। জমিতে স্থায়ী অধিকারপ্রাপ্ত এইসব খোদকাশতা রায়তকে বলা হতো মুকারারি এবং মিরাসি রায়ত। পাইকাশতা রায়ত ছিল তারা, যারা কোন গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতো না। এরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে অস্থায়ীভাবে চাষাবাদ করতো। এ শ্রেণীর রায়ত সৃষ্টি হবার একটি অর্থনৈতিক কারণ এই ছিল যে, এরা খোদকাশতা রায়তের চেয়ে অনেক কম হারে খাজনা দিত এবং যেখানে ভাল জমি কম খাজনায় পাওয়া যায় সেখানেই গমন করতো। আবাসিক রায়তের সামাজিক মর্যাদা ছিল বেশি, তবে এই মর্যাদার জন্য অধিক হারে খাজনা দিতে হতো। অতএব সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পাইকাশতা রায়তিতে যোগদান করতো অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য। সকল প্রকার রায়তের দায়- অধিকারের ভিত্তি ছিল পরগনার প্রচলিত প্রথা, রেওয়াজ, দস্তুর। প্রতিটি পরগনার জন্য ছিল নির্দিষ্ট খাজনার হার, যাকে বলা হতো পরগনা নিরিখ। জমিদার পরগনা নিরিখের অতিরিক্ত খাজনা দাবি করতে পারতো না বা দাবি করতো না। রায়তের এই সব প্রথাভিত্তিক অধিকার অস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে বটে, কিন্তু সংজ্ঞায়িত

২৯. Resolution of the Governor General in Council, 29 April 1859, *Bengal Government Proceedings* (Council).

হয় নি। কিন্তু জমিদার ভূসম্পত্তির মালিকানাবলে পরগনা নিরিখ পদদলিত করে রায়তের খাজনার হার বৃদ্ধি করেছে। জমিদারের এই ধরনের আচরণ কখনো রায়তশ্রেণী মেনে নেয় নি। ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে জমিদার-রায়ত সম্পর্কের ক্রমশ অবনতি ঘটে।

১৮৫৯ সালের রাজস্ব আইন-এর উদ্দেশ্য ছিল জমিদারি অধিকার ক্ষুণ্ন না করে যতোটুকু সম্ভব রায়তের পূর্বঅধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তবে আগের মতো রায়তকে খোদকাশতা ও পাইকাশতা শ্রেণীতে বিভক্ত না করে রায়তের অধিকার সংজ্ঞায়িত করার জন্য এদেরকে তিনটি দলে বিভক্ত করা হয় :

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে যারা অপরিবর্তিত হারে খাজনা দিয়ে আসছে, তাদের খাজনা ভবিষ্যতে বৃদ্ধি করা যাবে না (ধারা ৩) এবং জমি থেকে তাদের উৎখাত করা যাবে না। এরা চিরস্থায়ী রায়ত।

২. যারা এক নাগাড়ে কমপক্ষে বারো বছর জমি ভোগদখল করে আসছে, তারা স্থিতিবান রায়ত (occupancy raiyat)। তাদের খাজনা বাড়ানো যাবে, তবে জমির সম্পদ বৃদ্ধি না পেলে বা মুদ্রাস্ফীতি না ঘটলে খাজনা বাড়ানো যাবে না। নিয়মিত খাজনা প্রদান করলে তাদেরকে উৎখাত করা যাবে না (ধারা ৬)।

৩. যারা বারো বছরের কম জমির ভোগদখলে আছে বা যারা খুবই অস্থায়ী, তারা অস্থিতিবান রায়ত (non-occupancy raiyat)। তারা জমিদারের ইচ্ছাধীন প্রজা (tenants-at-will)। তাদের খাজনা কারণ দর্শানো ছাড়াই বাড়ানো যাবে এবং নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে তাদের উৎখাত করা যাবে (ধারা ৮)।

দশম আইনে মূলত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তপূর্ব রায়ত সমাজকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। পূর্বেকার মুকারারি ও মিরাসি রায়ত প্রথম শ্রেণী, খোদকাশতা রায়ত দ্বিতীয় শ্রেণী এবং পাইকাশতা রায়ত তৃতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। দশম আইনে প্রথম শ্রেণীর রায়তের প্রথাভিত্তিক অধিকার এখন আইনগত বৈধতা লাভ করলো। প্রথম শ্রেণীর রায়ত এখন প্রকৃত অর্থে প্রায় মালিক। জমিদারের মতো এদের প্রদেয় খাজনাও এখন চিরস্থায়ীভাবে ধার্য হয়ে গেল। কিন্তু অধিকারের দিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর রায়তের কিছুটা অবনতি ঘটেছে, কেননা মুদ্রাস্ফীতি বা সম্পদবৃদ্ধির কারণ দর্শিয়ে খাজনা বাড়ানোর ক্ষমতা জমিদার লাভ করলো। বর্ধিত খাজনা প্রদানে ব্যর্থ হলে রায়তকে উৎখাত করার অধিকারও পেলো জমিদার। বলা বাহুল্য যে, একজন ভূস্বামীর পক্ষে মুদ্রাস্ফীতি বা ভূমির মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে খাজনা বৃদ্ধি করা দুঃসাধ্য কিছু ছিল না। দশম আইনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলো তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ পূর্বেকার পাইকাশতা রায়ত। আগে বিপুল সংখ্যক রায়ত পাইকাশতা মর্যাদায় চাষাবাদ করতো অর্থনৈতিক কারণে। জমি যখন মানুষের তুলনায় অঢেল ছিল তখন দরকষাকষি করে রায়তেরা যেখানে কম খাজনায় ভাল জমি চাষ করতে পারতো সেখানেই গমন করতো। স্থিতিশীল বা খোদকাশতা রায়ত গ্রাম-গ্রামান্তরে গিয়ে চাষ করতো না বলে দরকষাকষির সুবিধা তার ছিল না। অতীতে এদের উপর খাজনার হার

ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধে জমি ও মানুষের অনুপাত ছিল প্রায় সমান সমান । জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় খাজনার হারও বৃদ্ধি পায় এবং এই বর্ধিত খাজনার ভার বহন করে অস্থিতিবান রায়ত। অচিরেই দেখা যায় যে, স্থিতিবান রায়তের চেয়ে অস্থিতিবান রায়ত অধিক হারে খাজনা প্রদান করতে বাধ্য হচ্ছে। তদুপরি স্থিতিবান রায়তের খাজনা বৃদ্ধি করা কঠিন বলে অস্থিতিবান রায়ত যেন স্থিতিবান হতে না পারে সেজন্য ভোগদখলের বারো বছর অতিক্রম করার আগেই ভূস্বামী কর্তৃক তাকে উৎখাত করার প্রবণতা বেড়ে যায়।

১৮৫৯ সালে খাজনা আইন পাশকালে সরকারি আলোচনায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, এই আইন রায়তের হাতে পুঁজিসঞ্চয়ে সহায়ক হবে, কেননা এই আইন রায়তের উদ্বৃত্তের প্রতি হাত বাড়ানো থেকে জমিদারকে বিরত রাখবে।[৩০] কিন্তু বাস্তবে এই আইন প্রণীত হয়েছে ক্রমবর্ধমান কৃষক-অসন্তোষ প্রশমিত করার জন্য। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মধ্যস্বত্ব বিকাশের ফলে গ্রামীণ শ্রেণীবিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। মধ্যস্বত্বাধিকারীদের অধিকাংশই প্রজাও বটে। প্রজা হিসেবে তারা জমিদারকে বাড়তি খাজনা দিতে প্রস্তুত নয়। খাজনা বাড়াবার জমিদারি প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার ক্ষমতাও তাদের আছে। গ্রামীণ প্রধান হিসেবে তাদের প্রভাব অনেক। এই প্রভাবশালী গ্রামীণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর আবির্ভাব জমিদারশ্রেণীর অপ্রতিরোধ্য প্রভাবকে বহুলাংশে ক্ষুণ্ন করে। এই উঠতি প্রভাবশালী মধ্যবিত্তশ্রেণীকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্বীকৃতি দেবার উপলব্ধি থেকেই খাজনা আইন ১৮৫৯ প্রণীত হয়। এই আইনে যাদের খাজনা অপরিবর্তনীয় ঘোষণা করা হয়, তারা মূলত মধ্যস্বত্বাধিকারী রায়ত। এদেরকে সুবিধাভোগী শ্রেণীতে উন্নীত করা ছিল একটি রাজনৈতিক প্রয়োজন, কারণ তাদের নেতৃত্বে জমিদারবিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছিল। লেফটেন্যান্ট গভর্নর টমসন-এর (১৮৮৩) কথায় :

> সরকার তখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হলো যখন দেখা গেল যে, ভূস্বামীদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে কৃষককুল একটি গ্রামীণ বিদ্রোহের পরিবেশ সৃষ্টি করলো এবং বিদ্রোহের পথ থেকে তাদের বিরত রাখার জন্যই খাজনা আইন ১৮৫৯ সালে প্রণয়ন করা হলো যেন ভূস্বামীগণ যথেচ্ছভাবে খাজনার হার বৃদ্ধি করতে না পারে।[৩১]

কিন্তু এই আইন প্রকৃতপক্ষে জমিদার কর্তৃক খাজনা বৃদ্ধি করা এবং বলপূর্বক খাজনা আদায় করার প্রবণতা রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই আইনের অধীনে সুবিধা পায় শুধু মিরাসি ও মুকারারি রায়ত নামে কথিত ধনী জোতদারশ্রেণী, যারা খাজনা আইনের বলে

৩০. *Proceedings of the Legislative Council of India*, January-December, 1859, Vol 5, (Calcutta 1859), 221-30.

৩১. Speech of Sir Rivers Thompson at the Legislative Council of India, 13 March 1883.

জমিতে প্রায় স্থায়ী মালিকানাস্বত্ব লাভ করে। এই সুবিধা প্রদান করেই সরকার তাদেরকে কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব থেকে বিচ্যুত করে ভূস্বামীশ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করলো। সরকারের উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হয়েছিল। জোতদারশ্রেণী বিদ্রোহের পথ পরিহার করে ভূস্বামীশ্রেণীর সাথে সমঝোতা ঘোষণা করে এবং নেতৃত্বহীন সাধারণ কৃষকশ্রেণী আগের মতোই ভূস্বামী শ্রেণীর শোষণ-উৎপীড়নের শিকারে পরিণত হয়।[৩২]

স্বাভাবিক কারণেই ভূস্বামী-রায়ত সম্পর্কের কোন উন্নতি হয় নি। জোতদারশ্রেণী নেতৃত্ব হারালেও অচিরেই রায়তশ্রেণীর মধ্যে নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠে এবং পুনরায় দেশের কৃষিসম্পর্কে এমন অবনতি ঘটে যে, সরকার অবশেষে বাধ্য হয় কৃষকের অধিকারসংক্রান্ত একটি অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। ১৮৭৯ সালে একটি Rent Commission গঠন করা হয়। কৃষিসম্পর্কের সার্বিক অবস্থা বিচার-বিবেচনা করে কমিশন একটি রিপোর্ট প্রদান করে। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই প্রণীত হয় ১৮৮৫ সালের বিখ্যাত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন। এই আইনের প্রধান লক্ষ্য ছিল জমিদারি শোষণ বন্ধ করা এবং কৃষকের উদ্বৃত্ত যেন হাতছাড়া না হয়ে পুঁজিতে পরিণত হয় সে পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই লক্ষ্যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে (১৮৮৫) নিম্নবর্ণিত ধারাসমূহ সন্নিবেশ করা হয় :

১. যেসব রায়তের খাজনার হার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কখনো বাড়ানো হয় নি, তাদের খাজনা ভূস্বামীগণ ভবিষ্যতেও আর বৃদ্ধি করতে পারবেন না।

২. বারো বছর বা ততোধিক বছরের উর্ধ্বে ভোগদখলকার রায়তের খাজনার হার শুধু তখনই বাড়ানো যেতে পারে, যখন জমিদার আদালতের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারবে যে তার নিজস্ব উদ্যোগ ও বিনিয়োগের ফলেই জমির উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং এহেন পরিস্থিতিতে খাজনা বৃদ্ধি করলেও সে বৃদ্ধির হার অবশ্য সমগুণের পার্শ্ববর্তী জমির খাজনার হার অতিক্রম করতে পারবে না।

৩. স্বল্পমেয়াদি বা কুর্ফা রায়তের খাজনার হার চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগে বৃদ্ধি করা যাবে না।

৪. কুর্ফা রায়ত ব্যতিরেকে বাকি সব শ্রেণীর রায়ত প্রথা অনুসারে জমি হস্তান্তর করতে পারবে, তবে প্রতি হস্তান্তরের জন্য জমিদারকে নির্দিষ্ট হারে সেলামি প্রদান করতে হবে।

ভূমিতে রায়তের স্বত্বের প্রশ্ন বিচার করলে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনকে অবশ্যই একটি বড় মাইলফলক হিসেবে গণ্য করা যায়। ১৮৫৯ সালের খাজনা আইনের অভিজ্ঞতা এই আইনকে অনেকাংশে সাহায্য করেছে এবং বলা যায় যে, এই আইন ভূমিতে প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূল স্থাপন করেছে। তবে প্রজাস্বত্ব আইন পাশের পরও রায়তঅর্থনীতি জমিদারঅর্থনীতির নাগপাশে আবদ্ধ থাকে। যেমন, প্রজারা বৃক্ষ কর্তন করতে পারে না, যদিও রোপণ করতে পারে; জমিদারের অনুমতি ব্যতিরেকে জমি বন্ধক বা হস্তান্তর করতে পারে না; পাকা ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে পারে না; পুকুর, দিঘি খনন করতে পারে না।

৩২. Chittabrata Palit, *Tensions in Bengal Rural Society*, 1830-1860, (Calcutta 1975), 190.

এইসব সীমাবদ্ধতা কৃষিঅর্থনীতিকে আড়ষ্ট করে রেখেছে গণ্য করে ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইন অনুসারে জমিদারের অনুমতি গ্রহণ ছাড়াই প্রজা জমিহস্তান্তরের অধিকার লাভ করে, কিন্তু জমিদারকে হস্তান্তরের জন্য সেলামি প্রদানের নিয়ম বলবৎ থাকে। এই সংশোধিত আইনে প্রজা জমিদারের সম্মতি ছাড়াই বৃক্ষ কর্তন, পাকা বাড়ি নির্মাণ, পুকুর খনন প্রভৃতির অধিকার লাভ করে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে আরেক দফা সংশোধনী আনা হয় ১৯৩৮ সালে, যখন জমিহস্তান্তরের জন্য জমিদারকে সেলামি প্রদানের নিয়ম বিলুপ্ত করা হয়। এর ফলে প্রজা জমির উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করলো। এইসব আইনের ফলে জমিদারি ব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে এর কার্যকারিতা হারালো।

ভূমিতে প্রজার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সনাতন ভূমিনিয়ন্ত্রণকাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ভূমিনিয়ন্ত্রণে জমিদারের ভূমিকার আমূল পরিবর্তন হয় মধ্যস্বত্বাধিকারী শ্রেণী সৃষ্টির ফলে। তেমনি প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে স্বত্বাধিকারী সমাজও পরিণত হয় একটি অনর্জিত আয়নির্ভর উপজীবী শ্রেণীতে। জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারী উভয় শ্রেণীই খোলসসর্বস্ব সত্তায় পরিণত হয় ১৯৩৮ সালের সংশোধনীর পর। তবে প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে কৃষকশ্রেণীর অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত পরিবর্তন ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কৃষিঅর্থনীতির উপর এর প্রভাবের দিক দিয়ে সুদূরপ্রসারী।

আগে জমি হস্তান্তর অবৈধ ছিল বিধায় কৃষকশ্রেণীর মধ্যে ভূমিহীনতার সমস্যা কখনো প্রকট হয়ে দেখা দেয় নি। কৃষিউদ্বৃত্ত বিনিয়োগ করা হতো কৃষি সম্প্রসারণে বা অন্যান্য ভূমিউন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে। কিন্তু ভূমিতে প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার পর কৃষিউদ্বৃত্ত জমিক্রয়ে ব্যয়িত হতে থাকে। এর ফলে কৃষক একদিকে যেমন উৎপাদন খাতে কৃষিউদ্বৃত্ত বিনিয়োগ না করে অনুৎপাদনশীল ভূমিক্রয়ে বিনিয়োগ করতে থাকে, অন্যদিকে কৃষকশ্রেণীর দুর্বল অংশ ভূমিনিয়ন্ত্রণ থেকে উৎখাত হয়ে ভূমিহীন রায়তে পরিণত হতে থাকে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এইসব ভূমিহীন কৃষক অস্তিত্ব রক্ষা করে বর্গাদার বা দিনমজুর হিসেবে।[৩৩] ভূমিহীনতার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে অর্থনৈতিক মন্দা ও দুর্ভিক্ষের সময়, যখন প্রান্তিক কৃষক জমি বিক্রয় করে বা বন্ধক দিয়ে অস্তিত্বরক্ষার প্রয়াস পায়। এর ফলে কৃষিভূমি নিয়ন্ত্রণে বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইশহাক জরিপে (১৯৪৪-৪৫) দেখা যায় যে, মাত্র শতকরা ষোল ভাগ কৃষকপরিবার গড়ে পাঁচ একরের অধিক জমি নিয়ন্ত্রণ করে, আর বাকি সবাই ছিল প্রান্তিক চাষী, বর্গাদার বা দিনমজুর।[৩৪] ধনী কৃষকেরা অবশ্যই পুঁজিবাদী

৩৩. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন , Benoy B. Chaudhury, "The Process of Depeasantization in Bengal and Behar, 1885-1947", *Indian Historical Review*, 2:1 (1975), 105-65; Partha Chatterjee *Bengal 1920-1947. The Land Question* (Calcutta 1984), section 12

৩৪. H S M. Ishaque, *Agricultural Statistics by Plot-to-Plot Enumeration* in *Bengal*, 1944-45, Part-I (Alipore 1946), 49-50, আরো দেখুন, Atiur Rahman, "Peasant Differentiation in Bangladesh, 1950 to 1980s", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, 32 1 (1987), 70-72.

বিকাশে এগিয়ে আসে নি। পূর্বেকার জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীর মতো সদ্য গজিয়ে উঠা ধনী কৃষকেরও পুঁজিবাদী বিনিয়োগে ছিল অনীহা। এর কারণ অনেক। তবে এখানে আমরা শুধু একটি সমস্যা আলোচনা করবো। সেটি হচ্ছে খাজনা।

'খাজনা' ও কৃষিঅর্থনীতিতে এর প্রভাব

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণেতাগণ মহাপরিবর্তন প্রত্যাশা করেছিলেন এবং খাজনা এই পরিবর্তনের একটি অনুঘটক হবে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। খাজনা কিভাবে পরিবর্তন ঘটাতে পারে এ নিয়ে তাঁরা তত্ত্বালোচনাও করেন। তাঁদের মতে, সংগৃহীত খাজনায় উদ্বৃত্ত পুঁজি আকারে ভূমিউন্নয়নে বিনিয়োজিত হলে কৃষিসম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে খাজনার হার বৃদ্ধি করে জমিদার প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে পারবে। জমিতে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে খাজনা ছাড়াও আয়বৃদ্ধির অন্যান্য উৎস সৃষ্টি হতে থাকবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণেতাদের এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় নি। বৃটিশ ভূস্বামীদের মতো এদেশের জমিদারেরা উন্নয়নমুখী পুঁজিবাদী ভূস্বামীতে পরিণত হতে পারে নি, যদিও খাজনার হার বৃদ্ধি করা হয়েছে কয়েক গুণ। এই ব্যর্থতার জন্য অনেক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক কারণ ক্রিয়াশীল ছিল। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যায় যে, জমিদার কর্তৃক সংগৃহীত খাজনার উদ্বৃত্ত জমির চেয়ে অন্য খাতে অধিক মুনাফা ও নিরাপত্তায় বিনিয়োগ করার সুযোগ বিদ্যমান ছিল। ভূমিউন্নয়ন ছিল অতিশয় ব্যয়বহুল এবং বিনিয়োজিত টাকার লাভ ছিল খুবই অনিশ্চিত ও সময়সাপেক্ষ। অপরপক্ষে মহাজনি, শস্য মজুতদারি, কোম্পানির কাগজ প্রভৃতি ব্যবসায় একদিকে যেমন লাভের হার ছিল অনেক গুণ বেশি, অন্যদিকে পুঁজির নিরাপত্তাও ছিল সমধিক। তাছাড়া কৃষকখামারকে ভেঙে পুঁজিবাদী খামারে রূপান্তরিত করা বা গোটা কৃষকখামারকেই পুঁজিবাদী খামারে রূপ দেয়া সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ছিল একটি অবাস্তব ও অলীক চিন্তা। জমিদার কর্তৃক পুঁজিবিনিয়োগের বিকল্প সুযোগগুলির মধ্যে একটি অতি লাভজনক পন্থা ছিল সেলামির বিনিময়ে মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করা এবং পুঞ্জীভূত সেলামির অর্থ ভূমিউন্নয়নে বিনিয়োগ না করে লাভজনক ব্যবসায় খাটানো। এভাবেই বর্ধমানের মহারাজা রাজস্ব বিক্রয় আইন থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন এবং কালে একজন মহাধনী ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পেরেছিলেন।

কৃষিঅর্থনীতিতে পরিবর্তন আনতে জমিদারদের ব্যর্থতা সরকারকে নতুনভাবে পুঁজিবাদী রূপান্তর নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করতে বাধ্য করে। কিন্তু কিভাবে রূপান্তর আসবে? কৃষিঅর্থনীতির বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সরকার এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, খাজনা আকারে জমিদার যদি কৃষকের উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করতে না পারে এবং এর ফলে কৃষকের হাতে যদি পুঁজি তৈরি হয়, তাহলে ঐ পুঁজি তারা কৃষি এবং গবাদি পশুর উন্নয়নে বিনিয়োগ করবে। কৃষকের অনুকূলে এই চিন্তার মূলে ছিল আসলে দেশব্যাপী

জমিদারবিরোধী অসন্তোষ এবং সমকালীন বৃটিশ উদারনৈতিক মনোভাব। ১৮৫৯ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হবার ফলে রায়তশ্রেণী অধিকারের দিক দিয়ে ক্রমশ এমন শক্তিশালী হয়ে উঠে যে, বিশ শতকের শুরু থেকে জমিদার কর্তৃক খাজনা বৃদ্ধি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। অর্থাৎ প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে কৃষকের উদ্বৃত্ত কৃষকের হাতেই থাকার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

এবার দেখা যেতে পারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে কি হারে খাজনা সংগৃহীত হয়েছে এবং কৃষিঅর্থনীতিতে এর কি প্রভাব পড়েছে। বিশেষকরে আমরা লক্ষ্য করবো প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার পর কৃষকের হাতে পুঁজি সৃষ্টি হয়েছিল কিনা, না হলে কেন সৃষ্টি হয় নি। প্রকৃত 'খাজনা'র সহজ সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। আসলে তা প্রজা কর্তৃক ভূস্বামীকে প্রদেয় নানা ধরনের জমা, যার বর্গীয় নাম খাজনা। এর রকম ছিল অনেক, যেমন নগদ খাজনা, শস্য খাজনা, স্থিরীকৃত খাজনা, অস্থিরীকৃত খাজনা, চাকরান বা সার্ভিস খাজনা, শ্রম খাজনা, রেওয়াজি খাজনা, বর্গা খাজনা, জিরাতি খাজনা, চুক্তি খাজনা, আবওয়াব বা চাঁদা খাজনা, তুহুরি খাজনা বা ঘুষ খাজনা, এমনকি লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর খাজনা। খাজনার ধরন থেকে ভূস্বামী-প্রজা সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। খাজনার বৈচিত্র্য ছাড়াও এর হারও ছিল বিভিন্ন। একই জেলা, একই পরগনা, এমনকি একই মৌজার ভিতরেও খাজনার হার মোটেও এক ছিল না। কারণ খাজনার হার নির্ভর করতো জমির গুণের উপর নয়, জমিদার-প্রজা সম্পর্কের উপর। মকারারি, মিরাসি, খোদকাশতা, পাইকাশতা প্রভৃতি রায়ত একই মানের জমির জন্য খাজনা দিত ভিন্ন হারে, কারণ জমিদারের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল ভিন্ন ধরনের। ভূ-স্বত্বের ধরনের উপরও নির্ভর করেছে খাজনার হার, যেমন একই মানের জমির খাজনার হার এস্টেটভেদে ভিন্ন ছিল। সাধারণত সরকারি এস্টেটের গড় খাজনার হার জমিদারি এস্টেটের চেয়ে বেশি ছিল; আবার জমিদারি এস্টেটের মধ্যে ওয়ার্ড এস্টেটের খাজনার হার খাস এস্টেটের চেয়ে বেশি ছিল; আবাদ এস্টেটের খাজনার হার পুরনো জমিদারির চেয়ে বেশি ছিল; পুরনো জমিদারি এস্টেটের চেয়ে নতুন জমিদারির খাজনাহার বেশি ছিল। তাই দেখা যায় যে, উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহগুলির বেশিরভাগই পরিচালিত হয়েছে নব্য জমিদারদের বিরুদ্ধে। অনুপস্থিত জমিদারদের এস্টেটের চেয়ে আবাসিক জমিদারদের এস্টেটের খাজনার হার ছিল বেশি। সুতরাং খাজনার হারে পরিবর্তন দেখানোর জন্য কোন বিশেষ জেলা বা পরগনা বা মৌজাকে বেছে নিলে একপেশে চিত্র বেরিয়ে আসতে বাধ্য। সে চিত্র থেকে খাজনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে খুবই ত্রুটিপূর্ণ।

যাহোক, ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন মোতাবেক পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জেলায় জরিপ ও বন্দোবস্তের দলিলপত্র থেকে খাজনা বিষয়ে অনেক তথ্য মেলে।[৩৫] ইতিপূর্বে

৩৫. Such notes and observations of the Settlement Officers have been recorded in classified forms in Record Series called *Village Notes* and *Village Statistics* now reserved at the concerned district Collectorate Record Rooms

হান্টারের পরিচালনায় একটি জেলাওয়ারি তথ্যানুসন্ধান জরিপ হয়েছিল, যার উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয় *A Statistical Account of Bengal* (২০ খণ্ড)। সরকারপরিচালিত খাসমহলগুলির ব্যবস্থাপনা দলিলপত্র থেকেও খাজনা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়।[৩৬] অনুরূপ নির্ভরযোগ্য তথ্য ওয়ার্ড এস্টেটের দলিলপত্র থেকেও পাওয়া যায়। এইসব উৎস থেকে আমরা প্রমাণ পাই যে, অন্তত টাকার নিরিখে খাজনার হার খুব লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয় না। জমিদারগণ খাজনার হার বৃদ্ধির চেয়ে নতুন আবাদের মাধ্যমে আয় বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন এমন প্রচুর তথ্য মেলে। সার্ভে এ্যান্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্টসমূহে সার্ভে-অফিসারগণ প্রায় সকলেই মতপ্রকাশ করেছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম দিকে প্রজার উপর খাজনার যে বোঝা ছিল, উনিশ শতকের শেষ সিকিতে এসে তা অনেকাংশে হালকা হয়ে আসে। কৃষিপণ্যের মূল্য এবং ভূমির উৎপাদন যতো বেড়েছে খাজনার হার ততো বাড়ে নি। অনুমান করা যায় যে, খাজনার হারের আপেক্ষিক স্থবিরতা এবং একই সময়ে মূল্য ও উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে এক শ্রেণীর কৃষকের হাতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছে।

জেলা কালেক্টরেটের নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে, ১৮২৮ সালে একই রকমের জমির বিঘাপ্রতি খাজনার হার ছিল ঢাকা জেলায় টা. ৩-২-০, বাখরগঞ্জ জেলায় টা. ২-১৩-১২, কুমিল্লা জেলায় টা. ২-৭-১৬, দিনাজপুর জেলায় টা. ১২-১৮, নোয়াখালী জেলায় টা. ২-১২-১৭ এবং যশোর জেলায় টা. ২-৯-৮।[৩৭] ১৯৪০ সালে এইসব জেলার গড় খাজনার হার উপরোক্ত হারের চেয়ে খুব বেশি নয়[৩৮], অথচ ইতিমধ্যে মূল্য ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের আয় বেড়েছে অনেক গুণ। ১৮৭৩ সালে জে. সি. চার্লস ঢাকা জেলার খাজনার উপর একটি প্রতিবেদনে বলেন :

> সরেজমিনে তদন্তকালে আমি দেখে বিস্মিত হলাম যে, এই জেলার কৃষকেরা যা উৎপাদন করে তার সিংহভাগ নিজেরা ভোগ করে। অনেক সূক্ষ্মভাবে তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি যে, স্থিতিবান কৃষকেরা তাদের গোটা উৎপাদনের মাত্র ১০ থেকে ১৫ ভাগ খাজনা হিসেবে ভূস্বামীকে দিয়ে থাকে।[৩৯]

খাজনা সম্পর্কে অনুরূপ চিত্র তুলে ধরেছেন জে. সি. জেক। বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার সার্ভে এ্যান্ড সেটেলমেন্ট অফিসার ছিলেন তিনি। সময়ের ব্যবধানে কিভাবে খাজনার বোঝা হালকা হয়ে বিশ শতকে প্রায় নামমাত্র হয়ে গেল, এ সম্পর্কে জেক বলেন :

৩৬. For quality of these records see Akinobu Kawai, *'Landlords' and Imperial Rule. Change in Bengal Agrarian Society, 1885-1940*, 2 Vols, (Tokyo 1986)

৩৭. Sirajul Islam, *Rent and Raiyat: Society and Economy of Eastern Bengal, 1859-1928*, (Dhaka 1989), 20

৩৮. Motaharul Huq, *Final Report on the Revisional Survey and Settlement Operations in the District of Bakarganj,1940-42*, (Dacca 1953), 57-59.

৩৯. Cited in Nariaki Nakazato, *Agrarian Structure* in the Dacca Division of Eastern Bengal 1870-1905, (Unpublished Ph D thesis at Calcutta University, 1985), 397-98.

টাকার মাপকাঠিতে বর্তমানে একজন কৃষক একরপ্রতি গড়পড়তা যে পরিমাণ ফসল ভূস্বামীকে দিয়ে থাকে, পঞ্চাশ বছর আগে এর তুলনায় দিত অনেক বেশি। পাট এবং অন্যান্য অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের ফলে কৃষকের খাজনার ভাব অনেক কমে গেছে। মূল্যবৃদ্ধির বদৌলতে যে খাজনা ১৮৬০ সালে ছিল কৃষকের জন্য জুলুমপ্রায়, ১৯১৪ সালে তা হ্রাস পেয়ে অতিশয় নগণ্য হয়ে গেলো। সংরক্ষিত হিসাবপত্র থেকে বোঝা যায়, এই জেলায় ১৮৬০ সালে গড়পড়তা একরপ্রতি খাজনার হার ছিল গোটা উৎপাদনের বাজারমূল্যের শতকরা ১৫ ভাগ, ১৮৮০ সালে তা ছিল ১২ ভাগ এবং ১৯১৪ সালে মাত্র ৬ ভাগ।[৪০]

আর. সি. দত্ত প্রায় পঁচিশ বছরকাল রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দেখেছেন যে, রায়তের খাজনাবৃদ্ধির হার মূল্যবৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। তিনি মন্তব্য করেন, "আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে, জমিদার-গণ যে হারে খাজনা সংগ্রহ করে তা মোদ্দা ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ বা আরো কম।"[৪১] পার্বতী চরণ রায় তাঁর দীর্ঘ রাজস্বঅভিজ্ঞতা থেকে মন্তব্য করেন যে, রায়তের খাজনাভার ক্রমেই কমছে। তিনি অনুমান করেন, ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ জেলার খাজনার হার যথাক্রমে মোদ্দা ফসলের পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ মাত্র।[৪২]

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, খাজনাকাঠামো নিয়ে আলোচনায় কোন সুনিশ্চিত মন্তব্য করা ঝুঁকিপূর্ণ। তবে খাজনার বিস্তারিত চিত্র প্রদান পরিপূর্ণভাবে সম্ভব না হলেও আমরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, খাজনার হার বৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধির অনেক পশ্চাতে ছিল। ফলে খাজনার ভার ক্রমেই হালকা হয়ে আসে। পাটচাষ, দু-ফসল উৎপাদন এবং ব্যাপক পতিত-আবাদের ফলে কৃষকের যে আয় বৃদ্ধি পায়, এর অতি কম অংশের উপরই জমিদার হাত বাড়াতে পেরেছে। বিভিন্ন প্রজাস্বত্ব আইন এবং বর্ধিত খাজনা পরিশোধে রায়তের অনীহা ও প্রতিরোধের মনোভাব জমিদারকে বল্গাহীনভাবে খাজনাবৃদ্ধি করা থেকে বিরত রাখে। ফলে, যে খাজনা ছিল এককালে রায়তের জন্য বিরাট বোঝা, ১৯৪০-এর দশকে এসে তা নামমাত্রে পরিণত হয়। তা হলে প্রশ্ন জাগে, কৃষকের হাতের উদ্বৃত্ত আয় গেল কোথায় ? এই জিজ্ঞাসার কারণ আমাদের সকলের এই অবগতি যে, কখনো কৃষিঅর্থনীতিতে স্থবিরতা লক্ষণীয়ভাবে কাটে নি। অতএব, কৃষকের উদ্বৃত্ত কোথায় বিলীন হলো—এ অনুসন্ধিৎসা অতি স্বাভাবিকভাবেই জেগে উঠে।

নাকাজাতো এ প্রসঙ্গ তুলে ব্যাখ্যা দেন যে, আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হতে পারে যে, খাজনার হার প্রকৃত অর্থে হ্রাস পাওয়ার ফলে কৃষকের হাতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু

৪০. J. C. Jack, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Faridpur District, 1904 to 1914*, (Calcutta 1916), para 74

৪১. Romesh C. Dutt, *Open Letters to Lord Curzon on Famines and Land Assessment in India* (London 1900), 60-61

৪২. Parbati Charan Roy, *The Rent Question* (Calcutta 1876), 8-12

আসলে কৃষকের উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করার ভিন্ন ফন্দি ভূস্বামীরা উদ্ভাবন করে নিয়েছিল।[৪৩] ১৮৬০ ও ৭০-এর দশকের ব্যাপক কৃষকঅসন্তোষ, প্রজাস্বত্ব আইন (১৮৮৫, ১৯২৮) প্রভৃতি থেকে ভূস্বামীরা উপলব্ধি করতে পারে যে, খাজনাবৃদ্ধির মাধ্যমে জমিদারি আয় বাড়ানোর প্রচেষ্টা রায়তেরা সহজে মেনে নেবে না। খাজনার ব্যাপারে রায়তেরা স্পর্শকাতর হলেও অন্যান্য আদায় সম্পর্কে এদের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায়। এর সুযোগ নিয়ে জমিদারেরা আবওয়াব, সেস, সেলামি প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষকের উদ্বৃত্ত আত্মসাতের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পত্তনি ও অন্যান্য কায়েমি স্বত্ব সৃষ্টি করে সেলামির নামে ধনী কৃষকের উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ ছিল একটি অন্যতম কৌশল। ভূমিহস্তান্তরের জন্য সেলামি দিতে হতো। সুতরাং কৃষকের উদ্বৃত্ত আগে হরণ করা হতো খাজনার মাধ্যমে এবং বিশ শতকের শুরু থেকে হরণ করা হয় কায়েমি স্বত্ব ও ভূমিহস্তান্তর বাবদ সেলামির মাধ্যমে। জমির মূল্যের শতকরা পঁচিশ ভাগ নামজারি সেলামি হিসেবে গ্রহণ করা হতো এবং আনুপাতিক হারে অন্যান্য সেস আদায় করা হতো।

ভূমিহস্তান্তরের অধিকার প্রাপ্তির পূর্বে কৃষকের উদ্বৃত্ত ব্যয়িত হতো কৃষি- সম্প্রসারণে। এখন সে উদ্বৃত্ত ব্যয়িত হয় ভূমিক্রয়ের মতো অনুৎপাদনশীল খাতে। ভূমিহস্তান্তরের অধিকার পাওয়ার ফলে কোন কারণে অভাবগ্রস্ত হলে কৃষক তার জমি বিক্রি করে অর্থাগমের ব্যবস্থা করে। ফলে ভূমিহস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষক সমাজ-কাঠামোয় দেখা দেয় বৈষম্য। অনটন-দুর্ভিক্ষের সময় সে বৈষম্যপ্রক্রিয়া বিশেষভাবে ত্বরান্বিত হয়। যেমন ত্রিশের মহামন্দা ও তেতাল্লিশের মহাদুর্ভিক্ষের সময় ভূমি- হস্তান্তরের মাধ্যমে বৈষম্য এমন বৃদ্ধি পায় যে, মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষকরা ব্যাপকহারে ভূমিহীনে পরিণত হয় এবং তাদের জমি হস্তান্তরিত হয় গ্রামের মুষ্টিমেয় জোতদার-মহাজনের হাতে।[৪৪] এমনিভাবে নতুন পরিস্থিতিতে পুরনো কৃষিকাঠামো ভেঙে গিয়ে গ্রামীণ সমাজ ধনী কৃষক ও ভূমিহীন বর্গাদার এই দুই মেরুতে পুনর্বিন্যস্ত হয়। এই প্রক্রিয়ায় জমিদারি বন্দোবস্ত এর পূর্বকল্পিত পুঁজিবাদী সম্ভাবনা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। যৌক্তিকভাবেই এই বন্দোবস্ত ১৯৫০ সালে বিলুপ্ত হয় এবং অতি স্বাভাবিকভাবেই এই বিলুপ্তি গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতিতে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নি।

৪৩. Nakazato, *Agrarian Structure*, 399.

৪৪. Ratan Lal Chakraborty, *Rural Indebtedness in Bengal 1935-1947*, (Unpublished Ph.D. thesis at the University of Dhaka, 1988), 73.

১১

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ

বিনয়ভূষণ চৌধুরী*

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগেও বাংলায় কৃষিপণ্যের বাজার ছিল। কিন্তু এর ব্যাপ্তি ছিল সীমিত। প্রাক-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র-অর্থনীতি এবং বিশ্ববাজারে বাংলার অবস্থান ব্যাপক আকারে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের সহায়ক ছিল না। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির লেনদেন এবং নির্দেশনা বাংলায় একটি নতুন অবস্থার সূচনা করে, যার ফলে বিভিন্নভাবে ব্যাপক আকারে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই অধ্যায়ে আমরা বাণিজ্যিকীকরণের বিভিন্ন অবস্থা আলোচনাসহ তার ফলাফলও বিশ্লেষণ করবো। কৃষিঅর্থনীতির উপর বাণিজ্যিকীকরণের প্রভাব আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। এখানে বাংলা বলতে পুরনো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বোঝাচ্ছে, যেখানে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পত্তন হয়েছিল।

কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিকীকরণের ক্রমবিকাশ নির্দিষ্ট কতগুলো পণ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মধ্যে চা, রেশম, আফিম, নীল, আখ ও পাট উল্লেখযোগ্য। আমরা বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলের উপর বিশেষভাবে নজর দেবো, যেখানকার দুটো বিশেষ অর্থকরী পণ্য ছিল পাট ও নীল।

তা ছাড়া এ সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহ আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো। এ পর্যায়ে কতিপয় প্রশ্ন হলো— কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে কৃষকরা কিভাবে জড়িত হলো ? অর্থকরী ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কি তাদের স্বাধীনতা ছিল ? অথবা তা কি কৃষিভিত্তিক সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল ? যদি তাই হয়, তবে প্রশ্ন উঠে,

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

অর্থকরী ফসল আবাদের ক্ষেত্রে চাষীদের ভূমিকা, সামাজিক কাঠামো এবং কৃষক-অর্থনীতিতে এর কতখানি প্রভাব ছিল ?

কতগুলি কৃষিপণ্যের বাজারে চাহিদার সঙ্গে কৃষকদের প্রতিক্রিয়ার প্রশ্নগুলি সঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিভাবে এই বাজারের উৎপত্তি ও উন্নয়ন হলো সেটাও অনুসন্ধানের বিষয়। অবশ্য বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি বিশ্লেষণের পূর্বে ঔপনিবেশিক যুগে এর অবস্থা কি ছিল তা নির্ণয় করা দরকার।

সর্বপ্রথম আমরা চায়ের কথাই ধরি। শুরুতে সংক্ষেপে এর উৎপাদনের ইতিহাসটি তুলে ধরা যাক। চা উত্তরবঙ্গ ও আসামে উৎপন্ন হতো। আমাদের পর্যালোচনায় চা অন্যান্য পণ্যের চেয়ে ভিন্নধর্মী। বেতনভোগী শ্রমিক কর্তৃক এর চাষ হতো। ১৮২৪ সালে আসামে চা আবিষ্কারের পর এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব ১৮৩০-এর দশকে প্রথম অনুভূত হয়। এই শিল্পে প্রথম সরকারই পূর্ণ মাত্রায় বিনিয়োগ আরম্ভ করে এবং এর কারণ ছিল ইংল্যান্ড ও চীনের মধ্যে আফিম প্রশ্নে সংঘর্ষের সম্ভাবনা, যার ফলে জনপ্রিয় চীনা চায়ের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা। উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডে তখন চা একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয় ছিল। যাহোক, সরকার অচিরেই চা আবাদের উদ্যোগ থেকে সরে দাঁড়ায় এবং ১৮৪০ সালে চা সংক্রান্ত সব দায়িত্ব নবপ্রতিষ্ঠিত আসাম টি কোম্পানির উপর ছেড়ে দেয়। তারপর থেকে এই শিল্পের উন্নয়ন নির্ভর করেছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ এই শিল্পটি ছিল একচেটিয়াভাবে ইউরোপীয়দের করায়ত্ত।

আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় চায়ের সঙ্গে অন্যান্য দেশের চায়ের প্রতিযোগিতা ছিল এবং তন্মধ্যে চীনা চা অন্যতম। কিন্তু অচিরেই ভারতীয় চা বাজারে বিশেষ স্থান দখল করে নেয়। ১৮৫০ সালের শেষদিকে চীনা চায়ের একচেটিয়া আধিপত্য ঘুচে যায়। ভারতীয় চায়ের রপ্তানি ১৮৪৭ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে বিশেষভাবে বেড়ে যায়। ১৮৫৮-৫৯ এবং ১৮৭৬-৭৭ সালে এটা আরো বাড়ে।[১] তখন থেকে প্রবৃদ্ধির হার মাঝে মাঝে উঠানামা করে, যার কারণ ছিল উনিশ শতকের শেষ দশকে প্রায় ৪৫ শতাংশ চাষবৃদ্ধি।

চা-বাজারের উত্থান সম্পর্কে প্রথম পর্যায়ে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয় নি, যদিও এর শুরুটা শুভই হয়েছিল। কারণ, এর জন্য মূলধন-ভূমি-শ্রম যোগানোর ক্ষেত্রে বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যখন চা-চাষের জন্য অন্যান্য অর্থকরী ফসলের চেয়ে অধিক মূলধনের প্রয়োজন ছিল, তখন ব্যক্তিগত মালিকানায় এর দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বে এর যোগান ছিল কম। তাছাড়া ভারতীয় চায়ের বাজারের ভবিষ্যৎ এতখানি আশাপ্রদ ছিল না যে, ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ততোটা আকর্ষিত হবে। যাহোক, ক্রমে মূলধন বিনিয়োগ-

১. Romesh Dutt, *Economic History of India in the Victorian Age, 1837-1901*, 5th edition, (London), 351

সমস্যার সমাধান হতে থাকে, কারণ এর সিংহভাগ সরকারের ইউরোপীয় কর্মকর্তাগণ যোগাতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ড থেকেও মূলধনের একটা বিশেষ অংশ আসতে থাকে।

চা-চাষে ভূমির প্রাপ্যতার কোন অসুবিধা ছিল না, কারণ প্রচুর পতিত জমি চাষের আওতায় আনা হয়। তবে সরকার যেখানে উচ্চ খাজনায় রায়তি স্বত্বের উপর জোর দিতে থাকে এবং বিশেষ সময়ের মধ্যে পতিত জমি উদ্ধারের উপর জোর দেয়, সেখানে চা-উৎপাদকগণ নামমাত্র মূল্যে ভূমির মালিকানা চাচ্ছিলেন। তাদের মতে, এর ফলে চায়ের বাজার আরো সম্প্রসারিত হবে এবং লন্ডনের বাজার থেকে এখানে পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া অপর্যাপ্ত শ্রমশক্তির যোগান ছিল আরো একটি গুরুতর সমস্যা।

চা-চাষ ছিল শ্রমভিত্তিক এবং বহুকাল ধরে অযান্ত্রিক পদ্ধতিতে চা উৎপাদিত হতো। ফলে চাষের জন্য পর্যাপ্ত শ্রম যোগান ছিল অনিশ্চিত। এমনকি আসামের গতানুগতিক কৃষির ক্ষেত্রেও শ্রমের স্বল্পতা ছিল লক্ষণীয়। স্থানীয় খাজনা আদায়কারীগণ বৃটিশ বিজয়ের পর (১৮২৬) যতোটুকু সম্ভব চাষ এবং সরকারের খাজনা-আয় বৃদ্ধির জন্য চা রোপণকারীদের দ্বারা স্থানীয় শ্রম বিনিয়োগে বাধা সৃষ্টি করলেন। সিপাহি বিদ্রোহের পর চা-উৎপাদকদের অসুবিধা আরো বৃদ্ধি পায়, কারণ এ সময়ে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ধান এবং অন্যান্য অর্থকরী শস্য, যেমন সরিষা, পাট ও তামাক চাষের উৎসাহ আরো বেড়ে যায়, যার ফলে পুরনো কৃষির ক্ষেত্রে শ্রমের ব্যতিক্রমধর্মী চাহিদার সৃষ্টি হয়। সিপাহি বিদ্রোহের পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইউরোপীয়দের উপনিবেশের বিস্তার এবং ইউরোপীয় মূলধনের ব্যাপক বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিবিস্তার এবং চা-চাষ বৃদ্ধির ফলে অসুবিধাগুলি আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। শ্রম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষকদের মনোভাবের পিছনে একটা কারণ ছিল। ভাড়া করা শ্রম ইংরেজদের বিজয়ের পূর্বে প্রায় অজ্ঞাত ছিল, অথবা কাছাড়ী বা অহিন্দু অন্যান্য অনুন্নত উপজাতির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল, যাদেরকে ভূমিদাস হিসেবে গণ্য করা হতো এবং যারা উন্নত শ্রেণীর মুক্তবৃত্তির অহিন্দুদের চাইতে ঘৃণ্য হিসেবে চিহ্নিত ছিল। তাছাড়া যাতায়াতের অসুবিধার জন্য বাইরে থেকে শ্রম আমদানিও সম্ভব ছিল না।

শ্রমসমস্যাব সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কতগুলো অসুবিধার জন্য চা-উৎপাদকেরাই দায়ী ছিল। ১৮৬৫-৬৬ সালের সঙ্কট এটা প্রমাণ করে। ১৮৫৯-৬০ সালে চায়ের প্রতি অতিআকর্ষণ এবং অতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশার ফলে অপরিকল্পিতভাবে চা-চাষের বিস্তার ঘটে। এর ফলে এক্ষেত্রে ফটকাবাজি বিনিয়োগ শুরু হয় এবং এর আসল উদ্দেশ্য ছিল এই শিল্পের একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন না করে অধিক মুনাফা লাভের জন্য শুধুমাত্র ক্রয়-বিক্রয় করা। অযোগ্য ব্যবস্থাপনায় এ অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। অপরিকল্পিতভাবে উন্নয়নের হিড়িকে যোগ্যতা যাচাই না করেই ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা

হতো। এই হিড়িকে নিম্নমানের চা-উৎপাদনের জন্য এর সুনাম ক্ষুণ্ন হয়। ১৮৬৫-৬৬ সালে সর্বপ্রথম চায়ের বাজারদর হঠাৎ কমে যায়, ফলে লন্ডনে অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং বাণিজ্যের মন্দা দেখা দেয়।

এই সঙ্কটের জন্য ভারতীয় চা-শিল্পে অবশ্য বড় একটা অবনতি ঘটে নি। তবে ফটকাবাজারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দূরদর্শী চা-রোপণকারীগণ শেষ পর্যন্ত টিকে যায়, এমনকি প্রতিযোগিতা হ্রাস পাওয়ার কারণে শ্রম এবং ঋণবাজারের অপর্যাপ্ততার মধ্যেও তাদের অবস্থা আরো শক্তিশালী হয়। এই সঙ্কটের শেষে চা-শিল্পের উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

আমাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য অর্থকরী ফসলের উৎপাদনের জন্য ক্ষুদ্র চাষীরাই মূলত মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং প্রয়োজনীয় মূলধনের কিছু অংশ অন্যান্য শ্রেণীর কাছ থেকেও আসে। এর মধ্যে আফিমেব একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। আফিম উৎপাদন ও বিক্রির সমুদয় নিয়ন্ত্রণ ছিল সরকারের হাতে। এর চাষাবাদ সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত নির্ভরশীল ছিল সরকারের উপর।[২]

বৃটিশ শাসনের পূর্বে এদেশে স্বল্পমাত্রায় আফিমচাষ ছিল। আগে যেখানে এর ব্যাপ্তি পাটনা ও তার নিকটবর্তী স্থানসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে এ সংক্রান্ত বাণিজ্যসম্পর্ক বৃটেন, চীন ও ভারতের মধ্যে প্রসারলাভ করে। তখন মূল প্রশ্ন ছিল বৃটেন কর্তৃক চীনা চা ও রেশম (এবং মূলত চা) ক্রয়ের জন্য অর্থ যোগান। বৃটিশ পণ্যের চাহিদা চীনে কম ছিল এবং বৃটেনের ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের বাণিজ্যে ক্রমাগত কম লাভের পরিপ্রেক্ষিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চীনা চা আমদানিতে মনোনিবেশ করে। চীনে রৌপ্য আমদানি দ্বারা এই সমস্যার স্বাভাবিক সমাধান সর্বদা সম্ভবপর হয় নি । ১৭৭৯ ও ১৭৮৫-এর মধ্যে ইউরোপ থেকে রৌপ্য আমদানি হ্রাস পেলো, যখন আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলো এবং এর ফলে দক্ষিণ আমেরিকা থেকেও বৃটেনে রূপার স্বাভাবিক যোগান কমে যায়।

ভারতীয় দু'টি পণ্য কাঁচা তুলা ও আফিম রপ্তানি এই অবস্থার ফলপ্রসূ সমাধান দেয়। চীন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তুলা উৎপন্ন করলেও সেদেশ আংশিকভাবে ভারতীয় তুলার উপর নির্ভরশীল ছিল। অবশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তার নিজস্ব ফসলহানি না ঘটলে ভারতের উপর নির্ভর করতে হতো না। তাছাড়া চীনে তখন আফিমের ব্যবহার বেড়ে যায়। দূরপ্রাচ্যের বাজারে বাংলার আফিমব্যবসার উন্নতি হওয়ার পশ্চাতে প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা লন্ডনে প্রেরণ এবং আরেকটি কারণ আফিম বিক্রির মাধ্যমে কলকাতা নিলামবাজারে ভারত সরকারের ক্রমবর্ধমান রাজস্ব আদায়।

২. Benay Chaudhuri, *Growth of Commercial Agriculture in Bengal, 1757-1900,* (Calcutta 1964), Vol I, Chapter I

আফিমচাষের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ১৮৩০ সাল পর্যন্ত সরকার এর চাষ বাড়ানোর জন্য সচেষ্ট ছিল না এবং সবচেয়ে ভাল জমিতে এর চাষ হতো, যদিও সরকার এ থেকে বেশি রাজস্ব আদায় করতে চাইতো। কারণ যতোদিন পর্যন্ত বাংলার আফিমের একচেটিয়া ব্যবসা অক্ষুণ্ন থাকবে, ততোদিন স্থিতিশীল রাজস্বপ্রাপ্তির ব্যাপারে সরকার নিশ্চিত ছিল। চীনে ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য এর দাম বেড়ে যায়, যার ফলে কলকাতা নিলামবাজারেও এর প্রভাব পড়ে।

অতিমাত্রায় মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সরকার সীমিত আফিমচাষের নীতি পরিহার করতে বাধ্য হয়। বাংলার আফিমের মূল্য চীনের বাজারে এত বেড়ে যায় যে, সেখানকার ভোক্তারা অন্য কোন সূত্রে তা পাওয়ার জন্য তৎপর হলো (১৭৯৮-৯৯ সাল থেকে ১৮১৬-১৮১৭ সালের মধ্যে এর বাজারমূল্য শতকরা ৩৩.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়)। শীঘ্রই এর বিকল্প আবির্ভূত হলো, যা বাংলার আফিমের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো। এটি 'মালওয়া আফিম' নামে পরিচিত, যা মালওয়া ও মধ্যভারতের বিভিন্ন অংশে এবং রাজপুতনার দেশীয় রাজ্যসমূহে উৎপন্ন হতো। সেসব স্থানে বিপুল পরিমাণে এর চাষের কারণ ছিল মারাঠা ও পিণ্ডারী ভীতির অবসান, আফিমের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি এবং মুক্তভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা।

বাংলার আফিমের একচেটিয়া আধিপত্যজনিত ভীতিপ্রদ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এর চাষ বাড়ায় নি, বরং বিভিন্ন উপায়ে তা রোধ করার চেষ্টা করে। এর মধ্যে একটি ছিল বাজার থেকে ক্রেতা হিসেবে বিশেষ পরিমাণে মালওয়া আফিম ক্রয় করা এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে সেখানকার শাসকদের সহায়তায় এর চাষ বন্ধ করা। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি, কারণ দেশীয় রাজ্যের শাসকগণ বৃটিশ সরকারকে অনেক সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করলেও তাদের স্ব স্ব রাজ্যের অর্থনৈতিক কারণে সে প্রতিশ্রুতি থেকে তাঁরা সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। এরপর সরকার বাংলার আফিম আবাদ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে যাতে বাংলার আফিম পূর্বদেশীয় বাজারে কিছুটা সহজলভ্য হয় এবং তার হৃত অবস্থা পুনরুদ্ধার করা যায়। ১৮২৮-২৯ ও ১৮৩৮-৩৯ সালের মধ্যে আফিমচাষ শতকরা ১২২.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

১৮৩০-এর দশকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলো আফিমব্যবসার প্রতি চীন সরকারের উত্তরোত্তর শত্রুভাবাপন্ন হওয়া। আফিমব্যবসার উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা কলকাতার ব্যবসায়ীদের ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং আফিমের বাজারে অনিশ্চয়তাসহ লন্ডনের মুদ্রার বাজারে মন্দা দেখা দেয়। ফলে কলকাতার নিলামবাজারে আফিমের দর অনেক গুণ কমে যায়, যার ফলে ১৮৩৭ সালে এক বাক্স আফিমের দাম ১৩২১ রুপী থেকে ৫৩৬ রুপীতে নেমে আসে। ১৮৪০ সালে আফিমযুদ্ধ আরম্ভ হলে এই সঙ্কট আরো ঘনীভূত হয়। ১৮৩৮-৩৯ ও ১৮৪১-৪২ সময়কালে আফিমচাষ শতকরা ২৫.৭ ভাগ হ্রাস পায়। যুদ্ধে বৃটিশ শক্তির

বিজয়ে আফিমের বাজারে লোকসান পরে পুষিয়ে নেয়া হয়। ফলে ১৮৪২-৪৩ ও ১৮৪৫-৪৬ সময়ের মধ্যে এর চাষ আবার ১৫.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

চীনের বাজারে বাংলার আফিমের চাহিদা স্থিতিশীল হওয়ার পর সরকার এর চাষ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলো যাতে আফিম থেকে রাজস্বের পরিমাণ একই পর্যায়ে থাকে। সরকার কেবল 'সঙ্কীর্ণ' মনোভাবের বশবর্তী হয়ে রাজস্বের পরিমাণ রক্ষায় নিমগ্ন ছিল না, ঐ সময়ের বৃহত্তর অর্থনৈতিক কারণে কিছু স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা নেয়ার উদ্দেশ্যও কর্তৃপক্ষের ছিল। তবে আফিমের ব্যাপক চাষাবাদও সরকারকে বিব্রত করেছিল। বাজারের চাহিদার চেয়ে বেশি উৎপাদন আফিমের মূল্য কমিয়ে দেবে এবং তাতে রাজস্বও কমে যাবে এ ভয় সরকারের ছিল। আফিমের কম উৎপাদনের ফলে চীনে রপ্তানি হ্রাস ছিল একটি বড় ধরনের বিপদ, যার ফলে চীনে স্থানীয়ভাবে আফিমের ফলন শুরু হয় এবং বাংলার আফিমের একচেটিয়া স্থান বিনষ্ট হয়। সরকারের স্বাভাবিক ব্যবস্থার মধ্যে ছিল আফিমচাষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আফিমের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া। ১৮৪৫-৪৬ ও ১৮৬০-এর মধ্যবর্তী সময়ে সরকার আফিমচাষীদের বিশেষ উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে চাষবৃদ্ধির ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিল। ঐ সময়ে বাজারে আফিমের স্বল্প চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বাংলায় সমসাময়িক কিছু ঘটনা সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। তখন ইক্ষুচাষ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সরকারের সংশয় ছিল যে, অধিক মূল্যের জন্য আফিমচাষ বৃদ্ধি পেলে জমি ইক্ষুচাষের পরিবর্তে আফিমচাষের জন্য ব্যবহৃত হবে। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে সরকার তথ্য প্রকাশ করে যে, প্রচুর পরিমাণে আফিম বিক্রয়ের ফলে ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ রুপী বাজারে হাতবদল হয়, যার ফলে ব্যবসা ও অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ১৮৪৮ সালে বাণিজ্যিক সঙ্কটের সময়ে চীনে আফিমের সীমিত চাহিদার কারণে সরকারের আফিমচাষ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটে।

তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, সরকারের এরকম সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও চাষীরা ১৮৪৫-৪৬ ও ১৮৫৩ সালে আফিমের চাষ শতকরা ৫২ ভাগ বাড়িয়ে দেয়। এর কারণ চিনি ব্যতীত রপ্তানিযোগ্য অন্যান্য পণ্যের বাজার তখন অতি মন্দা ছিল। এমনকি খাদ্যপণ্যের মূল্য কোন কোন স্থানে হ্রাস পায়, যদিও তুলনামূলকভাবে সন্নিহিত কিছু অঞ্চলের (যেমন উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ) তুলনায় বাংলা ও বিহারে এই হ্রাস তেমন লক্ষণীয় ছিল না।

সিপাহি বিদ্রোহের (১৮৫৭) পরে যখন কৃষিমূল্যে ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে দ্রব্যমূল্য ও মজুরি হঠাৎ বেড়ে যায়, তখন কৃষকদের আফিমচাষের উৎসাহে ভাটা পড়ে। বিদেশী বাজারে চাহিদা এবং বিশাল ইউরোপীয় সৈন্যদলের উপস্থিতি তৈলবীজ, খাদ্যশস্য ও আলুচাষের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে শ্রমের মজুরি বৃদ্ধির ফলে আফিমচাষের ব্যয় বেড়ে যায়। ১৮৩০ সাল থেকে যেসব নতুন চাষী আফিমচাষের দিকে ঝুঁকে পড়ে,

তারা পুরনো আফিমচাষীদের (কোয়েরী) চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নবাগতদের মধ্যে রাজপুত, ব্রাহ্মণ ও অন্যদের শ্রমিক ভাড়া করতে হতো, কারণ বর্ণগত বিধিনিষেধের জন্য তাদের মেয়েরা মাঠে কাজ করতে পারতো না।

এভাবে আফিমচাষ সর্বত্র কমে যায় এবং ১৮৫৩-৫৪ সাল ও ১৮৫৮-৫৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে শতকরা প্রায় ২৪ ভাগ আফিম আবাদ কমে যায়। দেশে আফিমচাষের এই হ্রাসপ্রাপ্তি এবং চীনে আফিমচাষ বৃদ্ধির ফলে সরকার চাষীদের মূল্য প্রায় ৪২ শতাংশ বৃদ্ধি করে। বস্তুত নিম্নমানের জমি, যা আফিমচাষের জন্য অনুপযোগী ছিল, তাও এর চাষের জন্য বরাদ্দ করা হয়। ১৮৬১ থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত এর চাষ ৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

শীঘ্রই এর একটি প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। আফিমচাষের ক্রমবর্ধনশীলতার ফলে বাজারে এর মজুদ বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা দেখে সরকার ১৮৬৪ সালে চাষীর মূল্যের শতকরা ১০ ভাগ কমিয়ে দেয়। এভাবে মূল্যনির্ধারণের মাধ্যমে চাষের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হতো। ১৮৮৭-৮৮ সালে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। আফিমের এজেন্টদের কড়া নির্দেশ দেয়া হয় তারা যেন কম লাভজনক স্থানগুলো ত্যাগ করে, অসন্তোষজনক উৎপাদকদের আর আগাম না দেয় এবং বড় শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় নিম্নমানের আবাদ বন্ধ করে দেয়। এভাবে অবাঞ্ছিত আফিমচাষ বন্ধ হয়ে যায়।

আফিমচাষের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল এর উপর সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ। অন্যান্য অর্থকরী ফসলের মধ্যে নীলের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। নীলচাষের উদ্যোগ ছিল একচেটিয়াভাবে ইউরোপীয়দের। পরবর্তীকালে আমরা দেখবো কিভাবে ইউরোপীয় নীলকররা নীলচাষীদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল, যা ক্ষুদ্রচাষীদের উৎপাদন থেকে পৃথক ছিল। অপরদিকে বিহারের জেলাসমূহে আফিমচাষের প্রচলন বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল। স্বল্পকালের জন্য উত্তর ও পূর্ববঙ্গে নীলচাষ বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর এর অনুকূল প্রভাব পড়ে।

নীলচাষের প্রবৃদ্ধি ছিল উৎসাহজনক। এর কারণ হচ্ছে, নীল একটা নতুন ফসল ছিল এবং বাণিজ্যিকভাবে নীলচাষের জন্য ইউরোপীয়দের উদ্যোগ নেবার কোন ভিত্তি ছিল না। কতগুলো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর চাষের উন্নতি ঘটে, যেমন আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা বৃদ্ধি এবং গতানুগতিক উৎস, যেমন পশ্চিম ভারত, উত্তর আমেরিকার কিছু অংশ এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে এর সরবরাহ হ্রাস। রঞ্জক পদার্থ হিসেবে ১৭৪০ সাল নাগাদ নীল প্রতিষ্ঠালাভ করে এর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী *ওয়াড*-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর যুদ্ধে জড়িত শক্তিগুলোর সৈন্যদের নীল পোশাক উৎপাদনের জন্য নীলের ব্যবহার অনেক বেড়ে যায়। আমেরিকার স্বাধীনতালাভের পর আমেরিকা থেকে এর সরবরাহ কমে যায়।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নীলউৎপাদকরা কফি ও তুলা উৎপাদন আরম্ভ করে এবং ১৭৮৩ থেকে ১৭৮৯ সালের মধ্যে ঐসব স্থানে নীলচাষ প্রায় ৫০ শতাংশ কমে যায়।

বাংলাদেশ ধীরে ধীরে নীল সরবরাহের উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ ব্যাপারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বহির্বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যে এবং ইংল্যান্ডের সঙ্গে বাংলার বস্ত্রদ্রব্যের ব্যবসায় মন্দার ফলে নীল ব্যবসার মাধ্যমে আয়ের বিকল্প উৎস খুঁজে পেলো। বিভিন্নভাবে কোম্পানিসরকার ইউরোপীয় নীলকরদের সাহায্য করে। আর্থিক অনটনের সময়ে অর্থ ধার দেয়া ছাড়াও উত্তর ভারত থেকে মুক্ত আমদানি রোধ করে বাংলার নীলচাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়। এর ফলে প্রথমত উত্তর ভারতীয় নীল বাংলার নীল থেকে দামে সস্তা থাকায় বেশি বিক্রি হতো, দ্বিতীয়ত নিম্নমানের হলেও উত্তর ভারতীয় নীল বাংলা নীল নামে কলকাতা থেকে রপ্তানি হতো। বাংলার নীলকরদের আরো অনেক অসুবিধা ছিল। জটিল ভূমিব্যবস্থার জন্য তারা সঠিক জমি চাষের জন্য পেতো না এবং আইনত জমির মালিক হতে পারতো না। নীলের মতো একটা নতুন শিল্পের বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল মূলধনের, যা কখনো সৃষ্টি হয় নি, কারণ এ শিল্পে কৃতকার্য নীলকরেরা তাদের স্ব স্ব উপার্জন ও লাভ নিয়ে দেশে ফিরে যেতো এবং বোর্ড অব ট্রেডের মতে নিঃস্ব ও সম্বলহীন ব্যক্তিরা আবার তাদের স্থলাভিষিক্ত হতো।

পরবর্তীকালে বাংলার নীল ১৮১০ সালের মধ্যে দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর মতে, বাংলার নীল ইউরোপের চাহিদা মেটাতো এবং তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকার সম্ভাবনা ছিল না। বাংলার নীলের প্রবৃদ্ধির কালে এর উৎপাদন ১৭৮৮-৮৯ সালে ৪৯৫২ ফ্যাক্টরি মণ থেকে ১৮২৯-৩০ সালে ১৩২৯৪৯ ফ্যাক্টরি মণে উন্নীত হয়।

নীলের প্রবৃদ্ধি বাধাহীনভাবে ঘটে নি। এর উত্থান-পতনও ছিল। এই প্রবৃদ্ধি সর্বপ্রথম ঘটে যখন বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাজারে দ্রব্যের সরবরাহ সম্পর্কে কাল্পনিক ধারণার প্রসার ঘটে। বাংলায় ১৭৮৮-৮৯ সালে ৪৯৫২ মণের স্থানে ১৭৯৫-৯৬ সালে ৬২৫০০ মণ নীল উৎপন্ন হয় এবং লন্ডনের বাজারে তা থেকে শতকরা ৬৭ ভাগ সরবরাহ যায়। ঐসব অবস্থায় নীলের চালান ছিল পর্যাপ্ত। ১৭৯৬-৯৭ সালে লন্ডনে অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে নীলের দাম কমে যায়। ফলে বাংলায় নীলচাষ ১৭৯৭-৯৮ ও ১৭৯৮-৯৯ সালের মধ্যে ৫৬ শতাংশ হ্রাস পায়। কেবল ১৮০৪-০৫ সালে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ ১৭৯৫-৯৬ সালের প্রায় সমপরিমাণ হয়। তারপর এর স্বল্পকালীন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৮০২-০৩ ও ১৮০৮-০৯ সালের মধ্যে এর উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নেপোলিয়ন কর্তৃক মহাদেশীয় অবরোধ আরোপের ফলে এই প্রবৃদ্ধির ধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ১৮০৪-০৯ সাল ছিল বাংলার আফিমব্যবসার সবচেয়ে প্রতিকূল সময়। ১৮০৮-০৯ ও ১৮০৯-১০ সালের মধ্যে নীলচাষ শতকরা ৫৪ ভাগ হ্রাস পায়। যাহোক, যুদ্ধের সমাপ্তি এবং সেই সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য শুরু (১৮১৩) হলে নীলচাষের প্রসার ঘটে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ১৮১০-১৪ থেকে ১৮১৫-১৬ এই দুই বছরে নীল উৎপাদন প্রায় ৫৪.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

যাহোক, নীলচাষের নতুন উদ্যোগ ছিল দুর্বল। নতুন নীলকরেরা ছিল ভাগ্যান্বেষী। তারা কলকাতার এজেন্সিহাউজসমূহ থেকে প্রচুর অর্থ ঋণগ্রহণ করতো। তাদের অনেকেরই ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে এবং তারা তাদের ঋণদাতাদের সহানুভূতি হারায়। এই ধরনের উদ্যোগ সফল করার জন্য যে প্রযৌক্তিক ও ব্যবস্থাপনাবিষয়ক দক্ষতা থাকা দরকার তা তাদের ছিল না। ফলে নীল উৎপাদন কমে যায়। তবে অচিরেই নীলের বাজার চাঙ্গা হয়ে উঠে। বিভিন্ন কারণে ১৮২০-এর দশকে নীলচাষ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসব কারণের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে নীল রপ্তানির মাধ্যমে লন্ডনে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মুনাফা প্রেরণের সরকারি সিদ্ধান্ত। নীল আবাদ এত দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, নীলচাষ ও নীলকর-নীলচাষী সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৮২৩ সালে একটি রেগুলেশন (ষষ্ঠ রেগুলেশন) প্রণীত হয়।[৩]

১৮২৬ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে দু'টি কারণে এই শিল্পের দারুণ অবনতি ঘটে। কারণ দু'টি হচ্ছে ১৮২৬ সাল থেকে ইংল্যান্ড ও বাংলায় অর্থনৈতিক মন্দা এবং ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৩৩-এর মধ্যে প্রধান এজেন্সিহাউজগুলোর অকৃতকার্যতা। অর্থনৈতিক মন্দা নীলবাজারকে অত্যধিক নিস্তেজ করে ফেলে এবং এজেন্সিহাউজগুলোর অবসান নীলকরদের বিনিয়োগের সুযোগ রুদ্ধ করে দেয়। অতএব ১৮২৬ থেকে ১৮৩১-৩২-এর মধ্যে নীলচাষ প্রায় ১৯.৫ শতাংশ হ্রাস পায়। নীলকরদের দুরবস্থার কারণে নীল আবাদ হ্রাসের পরিমাণ আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল। অর্থনৈতিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে এর রপ্তানির পরিমাণ ১৮২৮-২৯ ও ১৮৩৯-৪০ সালের মধ্যে কম ছিল।[৪]

দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক মন্দা শেষ হওয়ার পর নীলশিল্পে আবার ১৮৩৯-৪০ থেকে ১৮৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৫২-৫৩ থেকে ১৮৫৭-৫৮ পর্যন্ত ছয় বছরে গড়ে এর বাৎসরিক উৎপাদন ১৮৩৯-৪০ থেকে ১৮৪৪-৪৫ পর্যন্ত ছয় বছরের তুলনায় শতকরা ২০.৫ ভাগ কম ছিল। নীলশিল্পের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে এই হ্রাসের কোন সম্পর্ক ছিল না। এজেন্সিহাউজগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর বিনিয়োগের জন্য অর্থ যোগান দেয়ার যে অসুবিধা দেখা দেয় তার সমাধান হয় ১৮২৯ সালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপনের ফলে। ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনবলে ইউরোপীয় নীলকরদের জমিতে স্বত্বাধিকার দেয়া হয় এবং এর ফলে নীলশিল্পের ভিত্তি আরো শক্ত হয়।

---

৩. Benay Chaudhuri, *Growth of Commercial Agriculture*, 149-52.

৪. K. N Chaudhuri, "India's Foreign Trade and the Cessation of the East India Company's Trading Activities, 1828-1840", *The Economic History Review*, No 2 (1966).

চাষীদের প্রতিরোধ নীলব্যবসা হ্রাসের কারণ ছিল না। কেবল ১৮৫৯-৬০ সালে ব্যাপক নীল বিদ্রোহ এবং এর পরও পুনঃ পুনঃ নীলকরদের সঙ্গে চাষীদের সংঘর্ষ নীলচাষের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই শিল্পের ক্রমাবনতির কারণ ছিল আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমাগত নীলের চাহিদা হ্রাস। বিশেষকরে ১৮৪৫-৪৬ সালে ১৮৪১-৪২ সালের তুলনায় মূল্য শতকরা ২০.৪ ভাগ কমে যায়। লন্ডনের বাজারে ১৮২২ থেকে ১৮২৬ সালে মূল্যবৃদ্ধির সময়ে এর মূল্য মণপ্রতি ২২০ রুপী থেকে ২৮০ রুপীর মধ্যে উঠানামা করতো এবং ১৮৪১-৪২-এর মন্দার সময় তা ১৯৬ রুপীতে পড়ে গেল এবং ১৮৪৬-৪৭-এর পর কোন সময়েই এর মূল্য ১৬০ রুপীর উপরে উঠে নি। আসলে নীলশিল্পের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত ছিল ১৮৫৯-৬০ সালের কৃষক বিদ্রোহ। এই সঙ্কটে নীল রপ্তানিতে দ্রুত নিম্নগতির ফলে রপ্তানির পরিমাণ ১৮৫৫ সালের ১২৩৫৫২ মণ থেকে ৬৮৭১০ মণে নেমে আসে অর্থাৎ শতকরা ৪৪.৩ ভাগ উৎপাদন হ্রাস পায়। ১৮৬৮-৭৪ সালে যশোরে এর চাষ অর্ধেক কমে যায়।[৫] রংপুরে পশ্চিমা শিল্পপতিরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যারা নীল ব্যবসায় প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছিল।[৬] রাজশাহীর কুঠিসমূহের মধ্যে যেগুলোর পানি সরবরাহের পরিমাণ কম ছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

নীলশিল্প থেকে ইউরোপীয় মূলধন প্রত্যাহার করার ফলে অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়। রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনারের মতে, শিল্পপতিরা চায়ের মতো পণ্য উৎপাদনে বেশি আগ্রহী হয়, কারণ এতে ঝুঁকি ছিল কম এবং নীলের চেয়ে লাভ ছিল বেশি। ১৮৭৬ সালে ঢাকার কমিশনারের প্রতিবেদনে জানা যায় যে, পূর্ববর্তী চার বছর থেকে নীলচাষ প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৭] ঢাকাতেও এর চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কেবল একটা কুঠি তখন সীমিতভাবে কাজ করছিল। ফরিদপুরে ১৮৬১ সালে নীলচাষের পরিমাণ প্রায় ৫০ ভাগ হ্রাস পায়।

বাংলায় দেশীয় উদ্যোক্তাদের নীলচাষে ক্রমবর্ধমানভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। রাজশাহীর কমিশনার বলেন যে, মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী ছাড়া অন্যত্র সব ব্যবসা স্থানীয় লোকদের হাতে ছিল এবং তা খুব স্বল্প মূলধন দ্বারা পরিচালিত হতো।[৮] ১৮৭৩ সালে রংপুরের ডেপুটি কালেক্টর অনেক লোককে তিনশ' বা চারশ' রুপী পুঁজি নিয়ে নীল ব্যবসা করতে দেখেছেন। কয়েকজন প্রভাবশালী জমিদারও এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। বাংলার জমিদারদের এই উৎসাহ বেশিদিন টেকেনি। রাজশাহীতে অনেকের কোন লাভই হয় নি

৫. Benay Chaudhuri, 'Growth of Commercial Agriculture in Bengal and its Impact on the Peasant Economy", *The Indian Economic and Social History Review*, VII : 1 (1970), 46.

৬. ঐ।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. ঐ, ৪৭।

এবং নিরাশ হয়ে তারা তাদের উৎপাদন বন্ধ করে দেন। নীল ব্যবসার মন্দার সময়ে স্বল্প বিনিয়োগকারী প্রান্তিক ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রংপুরের স্থানীয় কুঠিগুলিতে প্রস্তুতকৃত নীল ছিল নিম্নমানের এবং তা স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত হতো।

অপরদিকে বিহারে নীলচাষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৪০-এর দিকে আখচাষ থেকে তাদের আকর্ষণ নীলের দিকে চলে যায় এবং তাদের মূলধন আখচাষের পরিবর্তে নীলচাষের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়। ১৮৫০-এর দশকে নীল আখের স্থান দখল করে নেয় এবং নীলচাষ ইউরোপীয়দের বিরাট ব্যবসায়ে পরিণত হয়। ১৮৫৯-৬০-এর বিদ্রোহের পর বাংলাদেশ থেকে মূলধন বিহারের নীলশিল্পে স্থানান্তর করা হয় এবং রাসায়নিক রং তখনো উক্ত শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে নি। ১৮৯০-এর পরে এর ফলাফল অনুভূত হয়। ১৮৮৮ সালে কলকাতার কাস্টমস কালেক্টর মন্তব্য করেন, "নীল সকল প্রকার রাসায়নিক রং থেকে উন্নত"। কিন্তু যখন রাসায়নিক রং-এর বিপণন শুরু হয় তখন বিহার এবং বাংলার নীল এর সঙ্গে কোন প্রকার প্রতিযোগিতায় আসতে পারে নি।

আফিম, নীল ও পাটের (এ সম্পর্কে পরে আলোচিত হবে) মতো বাংলার রেশম কখনই আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ স্থান অধিকার করে নি। ইউরোপে এর একটা ক্ষুদ্র অংশ রপ্তানি হতো। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত রেশমের রপ্তানি বৃদ্ধি পায় এবং এর পরই তা হ্রাস পেতে থাকে। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির মতো এর চাহিদা কমতে থাকলেও অভ্যন্তরীণ বাজারে এর চাহিদ অক্ষুণ্ন থাকে। রেশমগুটির মূল খাদ্য তুঁত গাছের পাতা। তাই সময়ে সময়ে তুঁতচাষের উৎপাদনে তারতম্যের ফলে রেশমের ফলনে তারতম্য ঘটে এবং এর প্রভাব পড়ে বাজারমূল্যে।

পলাশী যুদ্ধের পূর্ব থেকেই বাংলার রেশমের একটি আন্তর্জাতিক বাজার ছিল। বলা যায়, তুলাশিল্প ছাড়া রেশমই ছিল বাংলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রপ্তানিপণ্য। পলাশীর পর রেশম উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ কোম্পানির দীউয়ানি লাভের পর রপ্তানিবাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। ১৭৬৮ সালে বাংলা সরকারের কাছে কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর লিখিত প্রতিবেদনে বলা হয় কোম্পানি যেন রেশম রপ্তানির মাধ্যমে উদ্বৃত্ত রাজস্ব স্বদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করে। পরবর্তীকালে কোম্পানি কাঁচা রেশমের ব্যবসার প্রসার ঘটায়। কোর্ট অব ডিরেক্টর্স বুঝতে পেরেছিল যে বৃটেনে বস্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কাঁচা রেশমেরও চাহিদা বাড়বে।

বাংলা সরকার রেশম উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৭৬৯-৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পরে অল্প সময়ের জন্য বাংলা সরকার কর্তৃক তুঁতচাষ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু লোকসংখ্যাহ্রাসের কারণে হঠাৎ তুঁতচাষ কমে যায়। দুর্ভিক্ষের পরে চাষীদের পুনরায় দুর্ভিক্ষভীতি তুঁতচাষ বৃদ্ধিতে তাদের অনীহা সৃষ্টি করে। সরকার তুঁতচাষে সরাসরি কোন মূলধন বিনিয়োগ করে নি। সরকার কেবল স্বল্প হারে খাজনা নির্ধারণ করেছিল যেন চাষীরা পতিত জমি তুঁতচাষের জন্য আবাদ করে। তুঁতচাষ বেড়ে গেল ঠিকই, তবে তা সরকারের আশানুরূপ বাড়ে নি। এর কারণ, উৎপাদকরা

রেশমবাজারের স্থিতিশীলতা সম্পর্কে এতটা আস্থাশীল হতে পারে নি। অতএব তুঁতচাষে বিনিয়োগ করতে তারা অনিচ্ছুক ছিল। তারা নির্বিচারে যেকোন স্থানেই তুঁতচাষ করতো না। এজন্য উপযুক্ত জমি সেগুলোই ছিল, যেগুলোর অবস্থান ছিল প্লাবনসীমার উপরে। বাজারের অনিশ্চয়তার জন্যই মূলত ১৭৭৯ থেকে ১৭৮৫-এর মধ্যে তুঁতচাষ হ্রাস পায়। কোম্পানি আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়কার অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য রেশমশিল্পে বিনিয়োগ বহুলাংশে কমিয়ে দেয়। এর মূল কারণ ছিল ১৭৮১ ও ১৭৮২ সালে ইউরোপীয় রেশমবাজারে মন্দাভাব এবং ১৭৮৩ থেকে ১৭৮৫ সালের খাদ্যসঙ্কটের বছরগুলোতে বাংলায় খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি, যার ফলে পুরনো তুঁতচাষীরা খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কাঁচা রেশমের গুণগত মান বৃদ্ধি করার জন্য সরকারের প্রচেষ্টা চলতে থাকে, যার জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন ছিল। দেশীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত রেশম ইংল্যান্ডে তৈরি কতগুলি বস্ত্রপণ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

রেশমের গুণগত মান উন্নয়ন কেবল সুতা গুটানো ও উন্নতভাবে পাকানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা তুঁতগাছের পাতা এবং গুটিপোকার গুণগত মানের উপরও নির্ভরশীল ছিল। অতএব সরকারের তৎপরতা কেবল তুঁতচাষীদের প্রয়োজনীয় অগ্রিম প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। তাছাড়া এটি উৎপাদনের কলাকৌশল তদারক করা হতো সেখানে, যেখানে শুধুই ইউরোপীয় পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হতো। চাষী ও অন্যরা পুরাদস্তুর তুঁতচাষে গুটিপোকার যত্ন নিত। গুটিপোকার যোগান দেয়ার ব্যবস্থা একটি মধ্যবর্তী দলের উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা অনুপযোগী প্রমাণিত হয় যখন অল্প সময়ের মধ্যে অনেক গুটিপোকা সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হতো। ১৮১২ সালে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, এই ব্যবস্থায় সরকারকে প্রতিযোগিতায় নানাপ্রকার অসুবিধায় পড়তে হয় যার ফলে মূল্য বৃদ্ধি পায়। কীট বা তুঁতগাছ বাছাইয়ের উপর (রেশম পোকা যার পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে) কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না, যেজন্য রেশমের গুণগত মানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সরকারের প্রতি কোর্টের প্রস্তাব ছিল তারা যেন সরাসরি তুঁতচাষ এবং গুটিপোকা পালনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। রেশমের গুণগত মান উন্নত করার বিষয়ে সরকারের ভূমিকার মধ্যে চীনদেশ থেকে উন্নতমানের তুঁতচারা আনয়ন এবং রেশম গুটানোর উন্নত পদ্ধতির প্রবর্তন ছিল অন্যতম। শেষোক্ত বিষয়ে ইউরোপ থেকে আগত রেশমবিশেষজ্ঞরা মাঝে মধ্যে দেশীয় উৎপাদকদের প্রশিক্ষণ দিত। ফলে বাংলার রেশমের গুণগত মান উন্নত হয়। নতুন নীতির ফলে তিন বছরের মধ্যে রেশম উৎপাদন শতকরা ৮০ ভাগ বেড়ে যায় এবং সেই ধারা অব্যাহত থাকে। বাংলার রেশম ব্যবসায়ে যে ক্রমাগত স্থবিরতা দেখা দেয় তা ১৭৯২ থেকে ১৮১১ সাল পর্যন্ত রেশম রপ্তানির পরিমাণ থেকে বোঝা যায়।[৯]

---

৯. নিম্নে উল্লিখিত পাঁচ বছর মেয়াদি পর পর চারটি কালপর্বে রেশম রপ্তানির গড় বার্ষিক পরিমাণের গতি-প্রকৃতি থেকে এর মন্দার বিষয়টি স্বতঃপ্রতীয়মান—১৭৯২/৯৬ : ৪৮৩৬৮৭ পাউন্ড, ১৭৯৭/১৮০১: ৩৭১০৭৭ পাউন্ড, ১৮০২/১৮০৭: ৪৭৭১৯৫ পাউন্ড এবং ১৮০৮/১৮১১: ৪৮১৩২০ পাউন্ড।

মহাসাগরীয় অবরোধ আরোপের ফলে ১৮১১ সাল থেকে রেশম ব্যবসার উন্নতি হয়, যখন ইতালি থেকে লন্ডনে রেশম আমদানি বন্ধ হয়ে যায় এবং বৃটিশ রেশম- ব্যবসা গভীর সঙ্কটে পড়ে। ফলে বাংলার রেশমের চাহিদা বেড়ে যায়। ১৮০৮- ১৮১২ সময়কালে বৃটিশ রেশমশিল্পের স্বার্থরক্ষার জন্য বৃটেন বাংলা সরকারের কাছে এই মর্মে ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, শত্রুর খামখেয়ালি ও বিরুদ্ধ বাণিজ্যিক নীতির উপর নির্ভরশীল বৃটিশ উৎপাদকদের যেকোন অবস্থায় উদ্ধার করা উচিত। ১৮৩০-এর প্রথমদিকে বাণিজ্যিক মন্দার পূর্ব পর্যন্ত রেশমরপ্তানি বেশ উচ্চস্তরে ছিল। ১৮৩১ থেকে ১৮৩৫ সালের মন্দার সময়ে রপ্তানি শতকরা ৩৩.৫ ভাগ হ্রাস পায়। ১৮৪০-এর দিকে এই নিম্নগতি রোধ হলেও বাংলার বাণিজ্যের স্থবিরতা অনেকদিন চলতে থাকে। ইতালি, ফ্রান্স, চীন ও জাপানের কাছে বাংলাদেশ তার রেশমের বাজার হারাতে থাকে।

উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে প্রতিপক্ষের গুটিপোকার চাষ ও লালন এবং রেশম গুটানোর পদ্ধতি অনেক উন্নত হওয়ায় বাংলার রেশম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পরাজয় বরণ করে। চীন ও জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরো তীব্র হয় সুয়েজ খাল নৌপথ হিসেবে খুলে যাবার পর, যখন ঐসব দেশ থেকে বর্ধিত হারে অধিকতর কম মূল্যে রেশম রপ্তানি আরম্ভ হয়।

ইউরোপীয় বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বাংলায় চায়ের ব্যবসার প্রসার ঘটে। ১৭৮৪ সালে বৃটিশ কম্যুটেশন এ্যাক্ট-এর বলে চীনের আমদানিকৃত চায়ের উপর ধার্যকৃত কর হ্রাস পায় এবং ফলে চায়ের ব্যবহার বাড়লে ইংল্যান্ড ও ইউরোপ মহাদেশে চিনির ব্যবহারও বেড়ে যায়। অপরদিকে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বৃটিশ ও ফরাসী উপনিবেশসমূহ, বিশেষকরে সেন্ট ডোমিনগো থেকে এর যোগান কমে যায়। দাসবিদ্রোহের (আগস্ট ১৭৯১) ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশেষকরে শ্রমিকসঙ্কটের আবর্তে সেখানকার চিনিব্যবসা খর্ব হয় এবং ইউরোপীয় বাজারে চিনির মূল্য বেড়ে যায়। এর ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া স্টকের (১৫ মার্চ ১৭৯২) জেনারেল কোর্ট অব প্রোপ্রাইটার্স বাংলা সরকারকে অতি শীঘ্র এবং স্থায়ীভাবে একটি বিশেষ পরিমাণ চিনি গ্রেট বৃটেনের ঘাটতি লাঘবের জন্য প্রেরণ করতে অনুরোধ করে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছুকাল নিম্নমুখী থাকার পর বাংলায় আখচাষ আবার চাঙ্গা হতে থাকে। চিনিব্যবসার মাধ্যমে ইংল্যান্ডে দেয় অর্থ প্রদানের মাধ্যম হিসেবে কোম্পানি ইক্ষুচাষে উৎসাহী হয়। কোম্পানির সরাসরি উদ্যোগের ধরন ছিল তিন প্রকার— জেলা অফিসারদের মাধ্যমে চাষীদের বাজার সম্পর্কে তথ্য প্রদান, জমিদাররা যাতে বেশি মুনাফা লাভের আশায় আখক্ষেত থেকে বেশি খাজনা আদায় না করে তা দেখার জন্য জেলা অফিসারদের আদেশ প্রদান এবং ইউরোপীয়দের উক্ত ব্যবসায় এই বলে উৎসাহ প্রদান যে, দেশীয় পদ্ধতিতে চিনি উৎপাদন দ্বারা সম্প্রসারণশীল চিনির বাজারের চাহিদা

পূরণ করা যাবে না। তবে সরকার ইউরোপীয় উদ্যোগের উপর বেশি নির্ভরশীল হলেও তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং চিনিশিল্পের উন্নয়ন দেশীয় উদ্যোগেই হয়। বিদেশ থেকে ইক্ষুচারা এনে ইউরোপীয়রা সেগুলোকে এদেশীয় আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সেগুলোর অধিকাংশ উইপোকার দ্বারা ধ্বংস হয়। যেসব উৎপাদক পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অনুসৃত ধারায় বিশেষকরে ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠান গড়তে চেয়েছিল তাদের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়।

বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে চিনির ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইউরোপ মহাদেশের সঙ্গে ব্যবসাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়। ফ্রান্সের আমদানি- বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষকরে যুদ্ধরত নেদারল্যান্ড ঐ সময়ে ইউরোপে বাংলার চিনির সবচেয়ে বড় খরিদ্দার ছিল। ১৮০৪ সালে যেখানে এর রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭৮৬১৯, সেখানে ১৮১১ সালে তা গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র ২৩৩৬ কিলোওয়াটে। কোম্পানি বাংলার চিনি ইউরোপের জন্য ক্রয় করা বন্ধ করে দেয়।

১৮১৩ সালে শান্তি স্থাপিত হওয়ার ফলে অন্যান্য পণ্যের মতো চিনিব্যবসার সম্ভাবনাও কিছুটা উজ্জ্বল হয়। নীলের জন্য বিনিয়োগকৃত মূলধন চিনিশিল্পে স্থানান্তরিত হয়। কারণ চিনির বাজার নীলের থেকে বেশি স্থিতিশীল ছিল এবং তুলনামূলকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ উঠানামা থেকে বেশি নিরাপদ ছিল।

বাংলার চিনির বাণিজ্যে নানা অন্তরায় ছিল এবং নীলব্যবসার ন্যায় তা খুব দ্রুত উন্নত হয় নি। লন্ডনের বাজারে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চিনি বাংলার চিনির চেয়ে অনেক কম শুল্কে আমদানি করা হতো। ফলে প্রতিযোগিতায় বাংলার চিনিচাষীরা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ১৮২৪ সালে বাংলার চিনির উপর শুল্ক শতকরা ১০০ ভাগ বেড়ে যায়। ১৮৩০ সালের অর্থনৈতিক মন্দা (১৮২৯-৩০ ও ১৮৩৩-৩৪-এর মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার চিনির ব্যবসা শতকরা ৫৫.৬ ভাগ হ্রাস পায়) শেষ হওয়ার পর ১৮৩৫-৩৬ সালে চিনি রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। ঐ বছর বৃটেনে চিনির উপর শুল্কের একই হার ঘোষণা করাই এর মূল কারণ। ১৮৩৫-৩৬ থেকে ১৮৪৫-৪৬ সালের মধ্যে বাংলার চিনির রপ্তানি শতকরা ৮৩.৬ ভাগ বেড়ে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চেয়ারম্যান মিঃ টাকার পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির কাছে ১৮৪৮ সালে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন, "নীলের চেয়ে চিনি অনেক মূল্যবান পণ্য, কারণ এই দেশে এর চাহিদাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে নীল উৎপাদনের পরিমাণ থাকে সীমিত। আমরা নীল উৎপাদন করতে পারি বটে, কিন্তু সুবিধামতো বিক্রি করতে পারি না।"

১৮৪৬ সালে বিহারে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কিছু উৎপাদকের উদ্যোগ যদি কৃতকার্য হতো, তবে বাংলার চিনিশিল্প হয়তো অনেকটা শক্তিশালী হতো। ১৮৩৩ সালে দাসপ্রথা রহিত হওয়ার ফলে উৎপাদকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮৪৬ সালে বাণিজ্যিক বিপর্যয়ের

পর ভারতে তারা ভাগ্যপরিবর্তনের চেষ্টা করে এবং বিহারকে এ বিষয়ে ঘাঁটি হিসেবে বাছাই করে। এভাবে ১৮৪৬ সালে বিহারে চিনিশিল্পের বিকাশের জন্য অনেকে ঝুঁকে পড়ে এবং মরিশাসের একজন উৎপাদক তার সমুদয় মূলধন বিহারে বিনিয়োগ করে। অনেক মূলধন বড় বড় ইমারত, ব্যয়বহুল অথচ অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য ব্যয় হয়। তাছাড়া পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ইক্ষুগাছকে এ দেশীয় আবহাওয়ায় খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। অতএব চিনিশিল্পের উন্নয়নে উৎসাহ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হতাশাগ্রস্ত উৎপাদকরা তাদের মূলধন চিনি থেকে সরিয়ে নিয়ে নীলে বিনিয়োগ করে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে বাংলার চিনিব্যবসার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এর আন্তর্জাতিক বাজার হ্রাস। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বাংলার চিনি বিদায় নেয়। ইউরোপের সবচেয়ে উত্তম চিনিশিল্পের দ্রুত উন্নয়নই বাংলার চিনিশিল্পের সঙ্কোচনের প্রধান কারণ। ইউরোপের বিশাল চিনিশিল্পের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে বীটচিনি বাজারজাত করার ফলে বাংলার চিনি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে নি।

আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলার চিনির বিশ্বব্যাপী চাহিদা থাকলো না।[১০] তাছাড়া উন্নতমানের চাষ এবং চিনি তৈরির জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রস আহরণও এর অন্যতম কারণ ছিল। রপ্তানিক্ষেত্রে সরকারি আনুকূল্যে চিনি উৎপাদনকারী দেশের অবস্থান আন্তর্জাতিক বাজারে শক্তিশালী হলো। অপরদিকে কলকাতা সরকার এদেশের শিল্পের উন্নয়নের জন্য তেমন কোন উদ্যোগ নেয় নি। কেবল আমদানিকৃত শুল্করেয়াত লাভকারী চিনির উপর করারোপ করা হয়। যাহোক, মুক্তবাণিজ্যের ফলে বাংলার চিনির বাণিজ্যে যে ক্ষতি হয়েছিল এভাবে তার আংশিক পূরণ হয়।

আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলার চিনির চাহিদা কমলেও এখানে ইক্ষুচাষ কমে নি। বস্তুত এর পরিমাণ বেড়েছিল।[১১] এর কারণ ছিল খোদ ভারতেই অপরিশোধিত চিনির চাহিদা বৃদ্ধি। অভ্যন্তরীণ চাহিদার স্থিতিশীলতা ছাড়াও ইক্ষুচাষের উন্নতির জন্য আরো কতগুলো অনুকূল অবস্থা কাজ করেছিল, যেমন বিহারে উন্নতমানের সেচব্যবস্থা, আখ মাড়াইয়ের উন্নততর ব্যবস্থা এবং নীলচাষ থেকে ইক্ষুচাষে মূলধন স্থানান্তর। ১৮৭৫ সালে শোন খাল নির্মাণের ফলে জলসেচব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়। এর ফলে পাটনা বিভাগে ইক্ষুচাষের অনেক উন্নতি হয় এবং এবং চাষের জমির পরিমাণ ১৮৭৫ সালে ১৮০৪ একরের স্থলে ১৮৮০ সালে ২২০০০ একরে উন্নীত হয়।

ইক্ষু মাড়াইয়ের জন্য লৌহযন্ত্রের ক্রমাগত ব্যবহার কৃষিপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলা এবং বিহারে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। শাহবাদ এস্টেটের অধিকারী টমসন ও মেইন

১০. A. K. Bagchi, *Private Investment in India, 1900-1939,* (1969), 360

১১. M. M. Islam, *Bengal Agriculture, 1920-1946,* (Cambridge 1978), 234.

'বেহিয়ামিল' নামে ক্ষুদ্র এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং তা কল নামে পরিচিত পূর্বতন কারখানার স্থলাভিষিক্ত হয়। নতুন কারখানায় কাষ্ঠাধারের মধ্যে স্থাপিত বৃহদাকার যন্ত্র এক জোড়া বলদ দিয়ে ঘুরানো হতো। ইক্ষু ছোট ছোট করে কেটে কাষ্ঠাধারে রেখে যন্ত্রটি ঘুরিয়ে মাড়াই করা হতো। পুরনো কলের চেয়ে নতুন কল প্রায় তিনগুণ ইক্ষু মাড়াই করতে পারতো এবং তা একজন লোক দিয়েই করানো যেতো। যে রস পাওয়া যেতো তা ছিল অনেক পরিষ্কার এবং তা থেকে শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ চিনি বেশি পাওয়া যেতো। প্রথম পর্যায়ে এই নতুন যন্ত্র কৃষকদের শ্রম সাশ্রয়ের উপায় হিসেবে ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়। রাজশাহীর কমিশনারের মতে চিনি উৎপাদনের ব্যয় এর ফলে এক-তৃতীয়াংশ কমে যায়।[১২]

পাট তুলনামূলকভাবে একটি নতুন ফসল। অর্থকরী ফসল হিসেবে এর আবির্ভাব ১৮৫০-এর মাঝামাঝি দিকে। এর চাষে প্রবৃদ্ধির হার বেশি ছিল। অন্য কোন অর্থকরী ফসলের এরকম তুলনামূলক রেকর্ড নেই। অন্যান্য অর্থকরী ফসলের চেয়ে এর চাষ অধিক জমিতে হতো। উনিশ শতকের শেষে ইক্ষুচাষ ১৬০২০০ একর জমি দখল করেছিল। আফিমচাষ কদাচিৎ ৩.২০ লক্ষ একরের বেশি জমিতে হতো। রাসায়নিক রং নীল ব্যবসার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার আগে ১৮৯০ সালের প্রথমদিকে ৬.৫ লক্ষ একর জমিতে নীলচাষ হতো। এমনকি শাহবাদ অঞ্চলেও ১৯১০ সালের দিকে নীলচাষের এলাকা শতকরা ৩ ভাগের বেশি ছিল না। যেখানে ইক্ষুচাষ সবচেয়ে বেশি হতো, সেখানে আফিমচাষ কদাচিৎ শতকরা ১ থেকে ৩ ভাগ ছিল। নীলের সবচেয়ে বেশি আবাদি এলাকা, যথা সরণ, মোজাফফরাবাদ, চম্পারণ এবং দ্বারভাঙ্গায় যথাক্রমে মোট আবাদি এলাকার শতকরা ৩.৪৫, ৫.৬২, ৬.৬৩ এবং ৩.০৮ এলাকায় নীলচাষ হতো। দশ বছরে চাষের বার্ষিক হার (১৮৯১-৯২ থেকে ১৯০০-১৯০১) ছিল ২০৩০৫৪৮ একর। ১৯০১-০২ সালে রংপুর, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ এবং ঢাকার সম্পূর্ণ আবাদি জমির যথাক্রমে ৩০%, ২৭%, ১৮% ও ১৩.৫% এলাকায় পাটচাষ হতো।[১৩]

বাংলার কৃষিপণ্যের মধ্যে পাটের বিশেষ অবস্থানের কারণ ছিল দেশে ও বহির্বিশ্বে অন্যান্য পণ্যের তুলনায় এর বেশি চাহিদা। কতগুলো অস্থায়ী কারণের জন্য পাটের চাহিদা অস্থিতিশীল ছিল। কৃষিতে শ্রম সরবরাহের বিশেষত্ব এর জন্য দায়ী ছিল।[১৪] কতটুকু জমি একজন চাষী পাটচাষের জন্য বরাদ্দ করবে তা নির্ভর করতো কাঁচা পাটের মূল্য এবং ধান ও পাটের তুলনামূলক মূল্যের উপর। বস্তুত ধানের চেয়ে পাটের জমির স্থিতিস্থাপকতা

১২. *Annual General Report on the Rajshahi Division by the Commissioner*, 27 June 1883, para 10.

১৩. নির্দিষ্ট জেলাসমূহের জন্য দ্রষ্টব্য, *District Gazetteer* (Statistics), (Calcutta 1905), Table no VII .

১৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : Akbar Ali Khan, *Peasant Behaviour in Bengal : A Neo-Classical Analysis. 1872-1914*, (Dhaka 1983).

কয়েকগুণ বেশি ছিল। যখন কাঁচা পাটের দাম বাড়তো তখন চাষীরা বেশি জমি পাটচাষের অধীনে আনতে প্রলুব্ধ হতো। চাষীদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের দরুন পাটের সরবরাহ অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত হতো এবং ফলে পাটের বাজারমূল্য পড়ে যেতো। অপরদিকে পাটকলগুলো এর সুযোগ গ্রহণ করে অল্প মূল্যে পাট কিনে তা গুদামজাত করতো। স্বাভাবিক কারণেই পরবর্তী উৎপাদনের মৌসুমে তাদের কাঁচা পাটের চাহিদা কম হতো বলে বাজারমূল্য কম হতো। এর প্রতিক্রিয়ায় পাটচাষের এলাকাও সঙ্কুচিত হতো। পাটের চাহিদাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবার তার দামও বাড়তো। ফলে চাষীরা পাটচাষে উৎসাহিত বোধ করতো এবং মৃত পাটক্ষেত্র পুনরুজ্জীবিত হতো। মোটের উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত পাটচাষ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, যদিও প্রবৃদ্ধির হার ছিল কম।

১৮৫৫ সালে কলকাতায় প্রথম পাটকল স্থাপনের পর কারখানার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৩ সালে এর সংখ্যা ছিল ১২৫০টি তাঁতসহ ৫টি। ১৮৭৫ সালে ১৩টি নতুন মিল স্থাপিত হয় এবং তাঁতের সংখ্যা ৩৫০০-তে বৃদ্ধি পায়। এরপর ১৮৭৫ থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি খুব শ্লথ হয় এবং উক্ত সময়ে কেবল একটি কারখানা স্থাপিত হয়। এরপর আবার পাটের বাজার চাঙ্গা হয়ে উঠে। পাট ব্যবসার প্রসারের ফলে কারখানাগুলোর কর্মকাণ্ড বেড়ে যায় এবং ১৮৮২-৮৪-এর মধ্যে আরো এক হাজার তাঁতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অতিমাত্রায় উৎপাদনের জন্য পুনরায় এর প্রবৃদ্ধি শ্লথ হয়ে পড়ে। এই দুঃসময় কাটিয়ে উঠার জন্য মিলমালিকদের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৮৮৪ সালে একটি জুট মিল এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উৎপাদন কমানোর জন্য শ্রমিকসংখ্যা হ্রাস করা হয়। পরবর্তী দশকে মাত্র একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছিল।

১৮৫০ সালের পর কাঁচা পাট রপ্তানিও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। পাটের সঙ্গে শনের মিশ্রণের প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে বাংলার পাটের ব্যবহার কমে যায়। ১৮৩৮ সাল নাগাদ ওলন্দাজ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জন্য কফিব্যাগ শনের পরিবর্তে পাট দিয়ে তৈরি শুরু হলো। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময়ে (১৮৫৪-৫৫) রাশিয়া থেকে শনের যোগান বন্ধ হয়ে গেলে বিকল্প হিসেবে পাটের চাহিদা আবার বেড়ে যায়। পাট সম্পর্কে পূর্বেকার কুসংস্কার সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়। ডান্ডির কারখানাগুলো ছিল মূল আমদানিকারক। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬০-৬৪) পাটের অবস্থান আরো শক্তিশালী করে। পৃথিবীতে প্যাকিংসামগ্রীর মধ্যে চটের তৈরি কাপড় সবার উপরে স্থান পায়।[১৫] ১৮৩৮-৪৩ থেকে ১৮৬৪-৭৩-এর মধ্যে কাঁচা পাট রপ্তানি একচল্লিশ গুণ বৃদ্ধি পায়।[১৬] ১৮৬৬-৬৮-এর বছরগুলো বাদে অন্য বছরে পাটের সাফল্য ছিল অপ্রতিহত। ১৮৭৩ সালে এর সাফল্য ব্যাহত হয়।

১৫. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee, 1934,* Vol. I, (Calcutta 1934), 6.

১৬. Hem Chandra Kar, *Report on the Cultivation of and Trade in Jute,* (Calcutta 1877), para 267.

১৮৭৩ সালের পর কাঁচা পাটের রপ্তানিতে মন্দার কতগুলো কারণ ছিল। বাংলা সরকারের মতে স্থানীয় কারখানাগুলোতে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় কাঁচাপাট ব্যবহার ১৮৭২-৭৩ থেকে ১৮৭৬-৭৭ সালের মধ্যে রপ্তানিবাণিজ্যের ঘাটতি সৃষ্টি করেছিল। এই ধারণা আংশিকভাবে সত্য হলেও পাটচাষের স্থিতিশীলতাও এখানে লক্ষণীয়। ১৮৭৩ সাল থেকে অর্থনৈতিক মন্দায় কাঁচা পাটের মূল্যহ্রাস রপ্তানিবাণিজ্যে ঘাটতির কারণ ছিল। তাছাড়া ১৮৭৩-৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ থেকে ১৮৭৭-৭৮ সালে মাদ্রাজ ও বোম্বেতে দুর্ভিক্ষের সময় পর্যন্ত চালের মূল্যবৃদ্ধির ফলে পাটচাষের চেয়ে ধানচাষের দিকে চাষীরা বেশি ঝুঁকে পড়ে।

আমরা পাটের চাহিদা দ্রুত হ্রাসের জন্য দু'টি উদাহরণ দিতে পারি। যথা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এবং ১৯৩০-পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা। যাহোক দু'ভাবে পাটচাষ সংশ্লিষ্ট এলাকার উপর প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধের সময়ে হঠাৎ পাটের দর কমার ফলে পাটচাষের এলাকা কমে যায় এবং অন্য কতগুলো কারণেও চাষীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাংলার পাটের আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা আনয়ন করে। ফলে চাষীরা অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং একনাগাড়ে অনেকদিন তেজী অবস্থা চলার পর তা হয়েছিল। তাছাড়া কাঁচা পাট ব্যবহারের ধরনটিও এখানে লক্ষণীয়। অর্ধেকের বেশি পাট রপ্তানি হতো ইউরোপ ও আমেরিকায়। ঐসব স্থানে পাটজাত দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য ছিল। অপরদিকে কাঁচা পাটের উপর কোন কর আরোপিত ছিল না। বিশেষকরে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরিতে মহাদেশীয় বাজার হাতছাড়া হওয়ার ফলে কাঁচা পাটের চাহিদা অনেকাংশে কমে যায়। শিপিং-এর অভাবে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। ফলে কাঁচা পাটের দাম কমে যায়। যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, পাটের মূল্য প্রায় ৪০% কমে গিয়েছিল। এর প্রভাবে পাটচাষের এলাকাও সঙ্কুচিত হয়েছিল।

অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে সব পণ্যের মূল্য হ্রাস পায়। চার বছর পূর্ব থেকে পাটের ক্ষেত্রে মূল্যহ্রাসের কারণ ছিল বিশ্ববাণিজ্যে বিশেষ বিশেষ কৃষিপণ্যের আমদানি-রপ্তানিতে পাটের অর্থনৈতিক মন্দা। পাটের অতিরিক্ত ফলনও পাটের মূল্য কমিয়ে দেয়।[১৭] পাটের মূল্যহ্রাসের ফলে পাটচাষের এলাকাও কমে যায়। তবে মূল্যহ্রাসের ফলে পাটের আবাদ কমলেও অতিরিক্ত ফলনের দরুন পাটের মোট সরবরাহ তেমন কমে নি। কিন্তু স্থানীয় কারখানাগুলিতে কাঁচা পাটের ব্যবহার হ্রাস পেলে সঙ্কট সৃষ্টি হয়।[১৮] অন্যান্য সময়ের মতো কারখানাগুলো পাটের মূল্যহ্রাসের সুযোগ নিয়ে কাঁচা পাট ক্রয় করে মজুদ বৃদ্ধি করে নি। কারণ পাট ব্যবসার মন্দার কারণে কারখানাগুলো পাট কিনে গুদামজাত করা সমীচীন মনে করে নি।

১৭. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee, 1934*, 86.

১৮. ঐ; আরো দেখুন, *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee, 1939*, (Calcutta 1939), Vol. 1.

কৃষকদের অন্যান্য কৃষিপণ্য চাষে অসুবিধার কারণে পাটচাষ ও তার মূল্যহ্রাস হওয়া সত্ত্বেও কৃষকরা পাটচাষ কমাতে পারে নি। অন্যান্য প্রায় সকল কৃষিপণ্যের মূল্য পাটের মূল্যের চেয়ে কম ছিল। আখের মতো কোন কোন কৃষিপণ্যের চাষ পাটচাষের জমির জন্য অনুপযুক্ত ছিল। তাছাড়া ঐসব পণ্যের বাজার সীমিত থাকায় পাটচাষের জমিতে তা চাষ করা সমীচীন ছিল না। পাটের মূল্য হ্রাসের জন্য পাট উৎপাদকরা বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ধান উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়ে নি, কারণ ধানের মূল্যের মন্দাভাব আরো লক্ষণীয় ছিল।

মহামন্দার পূর্ব থেকেই ধানের মূল্য নিম্নগামী ছিল। ত্রিশের মন্দা ঐ অবস্থাকে আরো তীব্রতর করেছিল। এর কারণ ছিল বাংলা ও ভারতীয় বাজারে বার্মার ধানের ক্রমাগত প্রতিযোগিতা।[১৯] ধীরে ধীরে বাংলার চাল ব্রহ্মদেশের চালের কাছেই শুধু নয়, থাইল্যান্ড ও ইন্দোচীনের মতো ধান উৎপন্নকারী দেশের চালের কাছে হার মানে এবং ভারতের বিভিন্ন অংশের আঞ্চলিক বাজার হারায়। ব্রহ্মদেশের ধান স্থানীয় বাজারে বাংলার ধানের স্থান দখল করে নেয়।

আমরা সংক্ষেপে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ধারা বর্ণনা করেছি। এখন এই প্রসঙ্গে কতগুলো প্রশ্নের উত্তর দেয়া প্রয়োজন। উক্ত ধারায় কৃষকরা কিভাবে জড়িয়ে পড়েছিল ? কৃষকরা কি কেবল বাজারের অবস্থার সঙ্গে সাড়া দিত ? অথবা তারা কি কেবল জীবনধারণের তাগিদেই সাড়া দিত এবং তা কি কেবল কৃষিজ সমাজকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত ছিল ? তাই যদি হয়, তবে কিভাবে বাণিজ্যিকীকরণের ধারা এই সমাজকাঠামো এবং কৃষক-অর্থনীতিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল ? আমরা এসব প্রধান প্রশ্নের উত্তর আধুনিক নতুন ব্যাখ্যার আলোকে দিতে চেষ্টা করবো।

লক্ষণীয় যে, প্রথমদিকে জাতীয়তাবাদী লেখকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত বাণিজ্যিকীকরণের ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। তিনি কেবল খাদ্যশস্যের বাণিজ্যসম্প্রসারণের উপর দৃষ্টি দিয়েছেন। এই বাণিজ্যসম্প্রসারণ কৃষকদের উন্নতি এনেছিল বলে সরকারের যে ধারণা তা তিনি চ্যালেঞ্জ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে উক্ত ব্যবসা ছিল 'কৃত্রিম ও জবরদস্তিমূলক', যার উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক শক্তিকে অর্থ যোগান দেয়া । দত্তের সূত্র ধরে পরে বি. এ. ভাটিয়া ভারতীয় বাণিজ্যঘাটতির জন্য কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিকীকরণকে দায়ী করেন। তাঁর মতে, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে বৃটেন থেকে আমদানিকৃত পণ্যের পরিবর্তে ভারত খাদ্যশস্য রপ্তানি করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তা পরিশোধ করতে পারতো না। দত্ত ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে এ ধরনের জবরদস্তিমূলক বাণিজ্যের কুফল লক্ষ্য করেন, যার প্রভাব জনগণের খাদ্যশস্য প্রাপ্তির উপর বেশি প্রভাব ফেলেছিল। যে বিষয়টি তাঁকে প্রভাবিত করেছিল তা হলো স্থানীয় বাজারে

১৯. *The Bengal Paddy and Rice Enquiry Committee Report, 1939*, (Calcutta 1939), para 52.

খাদ্যশস্য সরবরাহে অস্থিতিশীলতা, মানুষের ভোগ্য নিম্নমানের শস্যের উচ্চমূল্য এবং ঘন ঘন খাদ্যঘাটতি ও সঙ্কট। তাঁর প্রধান চিন্তা ছিল জনগণের খাদ্যের নিরাপত্তা বিধান নিয়ে। গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি দুর্বল করার জন্য তিনি ঔপনিবেশিক শাসনকে দায়ী করেন। জাতীয়তাবাদী পণ্ডিতগণ কৃষির বাণিজ্যিকীকরণকে জবরদস্তিমূলক চাপিয়ে দেয়া ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁদের মতে, কৃষিক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক ধারার চেয়ে অন্যরকম এবং এর ফলে উদ্বৃত্ত শস্যের স্বাভাবিক বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। এমন ধারণা করা হয় যে, এই ধরনের বিনিময়ের ফলে কৃষকদের আর্থিক সঙ্গতি বাড়ে এবং অনেক রকমের দ্রব্য আহরণের সুযোগ হয়। আবার এও মনে করা হয় যে, চাষীদের কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ছিল অনিচ্ছাকৃত। তারা তাদের উদ্বৃত্ত শস্য বাজারজাত করতো না। তাৎক্ষণিক অর্থের প্রয়োজনেই তারা উৎপাদিত পণ্যের বিশেষ অংশ বিক্রি করতে বাধ্য হতো।

জাতীয়তাবাদী পণ্ডিতদের পরবর্তী লেখাসমূহে ভারতের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির চেয়ে ধীরে ধীরে চাষীদের নগদ অর্থের প্রয়োজন এবং সেই সাথে গ্রামের প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিষয়ই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, কৃষকদের অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়লো ঔপনিবেশিক শাসকের দাবি মেটানোর জন্য, যেমন খাজনা প্রদান। খাজনা প্রদানে অক্ষম হলে চাষীকে তার জমি থেকে উৎখাত করা হতো। ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলেও একই পরিণতি হতো। তাছাড়া ঋণদানকারীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার বা শত্রুতা করলে ঋণের উৎসসমূহ বন্ধ হয়ে যেতো। ভূমিহীন এবং ঋণলাভে অসমর্থ হওয়া ছিল চাষীর জীবিকার উপর এক অপ্রতিরোধ্য হুমকি।

অমিত ভাদুড়ী[২০] বাজারে ক্রয়বিক্রয়ের ধারার সঙ্গে একজন চাষীর অর্থনৈতিক জীবনধারার সম্পর্কের কথা বলেছেন। ভাদুড়ী মনে করেন যে, চাষী বাজারে যেটা বিক্রি করতো সেটা তার উৎপাদিত পণ্যের উদ্বৃত্তাংশ ছিল। তাঁর ব্যাখ্যায় বাংলার কৃষকের অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বিশেষকরে ভূমিব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণের কারণে। অর্থাৎ জমিদারেরা দীর্ঘ বা স্বল্প মেয়াদের জন্য তাদের জমির অংশবিশেষ কৃষকদের কাছে ইজারা দিতেন। ইজারাদারেরাও প্রায়শ এই ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি করতো। ভূমিবণ্টনব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি ও জটিলতা কৃষকের খাজনার বোঝা বাড়িয়ে দেয় এবং তাকে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য করে।[২১] কৃষিউৎপাদন ক্রমবর্ধমান খাজনার তুলনায় বাড়ানো যায় নি। ঋণের জন্য তাকে দুঃসময়ে পণ্য বিক্রি করতে হতো। তার মজুদকৃত খাদ্য হ্রাস পাওয়ার কারণে বছরের শুষ্ক মাসগুলোতে বাজার থেকে তাকে খাদ্য কিনতে হতো।

২০. A Bhaduri, " The evolution of land relations in Eastern India under British Rule," *Indian Economic and Social History Review*, January-March 1976.

২১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Sirajul Islam, *Bengal Land Tenure*, (Calcutta 1988) । আরো দেখুন, Sirajul Islam, *Rent and Raiyat*, (Dhaka 1987).

চাষীরা তাদের প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য আংশিকভাবে খাদ্যশস্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলায় শহীদ আমিনের ইক্ষুচাষের উপর আলোচনায় প্রতিভাত হয়েছে যে, উত্তর প্রদেশে এর মূল কারণ ছিল চাষীর খাজনা প্রদানের সময় এবং শস্য আহরণের সময়ের অসঙ্গতি। এমনও হতো যে, খাজনার কিস্তি পরিশোধের জন্য কোন খাদ্যশস্য অবশিষ্ট থাকতো না। তখন চাষীর ইক্ষুফসল কাটার সময়। তাই ক্ষুদ্র চাষী একদিকে ফসল তোলার সময়ের স্বল্পতা এবং অতি সত্বর খাজনা দেয়ার প্রয়োজনীয়তার চাপে ইক্ষু থেকে অর্থলাভের ব্যবস্থা করতো। আমিন উপসংহারে বলেন, "অর্থ যোগান এবং ঋণ পরিশোধেই ইক্ষুচাষের গুরুত্ব ছিল। তা দিয়ে উদ্বৃত্ত কিছু করা যেতো না এবং উনিশ শতকের শেষের দিকে এটাই ছিল গোরখপুরের ক্ষুদ্র চাষীঅর্থনীতির গোড়ার কথা। ইক্ষুচাষ ও গুড় উৎপাদন ক্ষুদ্র চাষীর অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল"।[২২] পূর্বভারতের সবচেয়ে বড় অর্থকরী ফসল পাটের প্রতি কৃষকের আকর্ষণ সম্পর্কে একইভাবে আলোচনা হয়েছে। অনেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, পাটের প্রতি চাষীদের আকর্ষণের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল এর মাধ্যমে অগ্রিম পাওয়ার সুবিধা। ফলে পাট কৃষকদের জীবিকানির্বাহের এক প্রান্তিক পর্যায়ে রাখতে অবদান রাখতো।[২৩]

জাতীয়তাবাদীদের ধারণা হয়, এ বিশেষ কৃষিকাঠামো বাণিজ্যিকীকরণ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। গতানুগতিক যুক্তি অনুযায়ী গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণকে তা আরো শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। বিশেষকরে গ্রাম্য ঋণদাতাদের অবস্থা আরো শক্তিশালী হয়। প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতে তারা সময়বিশেষে সাহায্যদাতা ছিল, কিন্তু এখন তারা গ্রাম্য অর্থনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ কৃষকরা তাদের ঋণ ছাড়া চলতে পারতো না।

সুনীল সেনের[২৪] মতে, অর্থকরী ফসল চাষের ফলে গতানুগতিক কৃষির্থনীতিতে গতি সঞ্চারিত হয়। জাতীয়তাবাদীগণ বাণিজ্যিকীকরণকে একটি অর্থনীতিতে নেতিবাচক ধারা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তপন রায় চৌধুরী অর্থনীতিকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন— গতানুগতিক এবং আধুনিক। তাঁর মতে, বর্তমান জীবিকাকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের দক্ষতা, প্রযুক্তি, সামাজিক সংগঠন ও দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চলতার কারণ।[২৫] অমিত ভাদুড়ীর বর্ণনায় দেখা

২২. Shahid Amin, *Sugarcane and Sugar in Gorakhpur An Enquiry into Peasant Production for Capitalist Enterprise in Colonial Period*, (Delhi 1984), 70-71, 88.

২৩. Partha Chatterjee, " Agrarian Structure in pre-partition Bengal" in Asok Sen et al. (eds.) *Three Studies in the Agrarian Structure in Bengal, 1850 1947,* (Delhi 1952), 115; আরো দেখুন, Daniel and Alice Thorner, *Land and Labour in India,* (Delhi 1965), 55.

২৪. Sunil Sen, *Agrarian Relations in India, 1793-1947,* (New Delhi 1979), 90, 97. সেনের যুক্তি বিশেষ করে আখচাষীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২৫. Raychaudhuri, " A Reinterpretation of the Nineteenth Century Economic History" in M. D Morris et al. (eds.) *Indian Economy in the Nineteenth Century:* A Symposium, (Delhi 1969)

যায় যে, বাণিজ্যিকীকরণের ফলে ঋণের আবশ্যকতার দরুন ঋণের পরিবর্তে ধান দেয়া হতো। সে অবস্থায় অর্থনৈতিক স্থবিরতা ছিল স্বাভাবিক। কারণ জবরদস্তিমূলক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের দারিদ্র্য জিইয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল। তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শস্যের আপৎকালীন ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কেও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। কৃষকের বিনিময়পদ্ধতির ফলে তার বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ছিল না। ফলে কৃষি এবং শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরতা জন্মে নি। উৎপাদিত দ্রব্যের সঙ্গে কৃষিপণ্যের বিনিময় সম্ভবপর হলে শিল্পপণ্যের দেশীয় বাজার প্রসারিত হতো এবং একটি সুষ্ঠু শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য কৃষিজ কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি পেতো।[২৬]

সাম্প্রতিককালে যুক্তি দিয়ে বলা হয় যে, কৃষকের সনাতন উৎপাদনব্যবস্থায় বর্তমান দক্ষতা ও উৎকর্ষ একে আরো উৎপাদনশীল করে গড়ার পথে ছিল বাধা স্বরূপ। ইউরোপীয় উদ্যোগের ফলে বাণিজ্যিকীকরণ সম্পর্কে যে চিন্তাধারা ভারতীয় গ্রামসমাজকে প্রভাবিত করেছে তাকে খণ্ডন করার জন্যই এই ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ও নব্য সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রাচ্যদেশীয় সমাজ কতটুকু সাহায্যপুষ্ট তার উপরই গতানুগতিকভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নতুন গবেষণাপদ্ধতির প্রবক্তা সি. জে. বেকার উক্ত মতবাদ নাকচ করে মত প্রদান করেন যে, স্থানীয় সমাজ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে কতটুকু প্রভাবিত করেছিল সে বিষয়টির উপরও গুরুত্ব দেয়া উচিত।[২৭] এই মতবাদের অপর প্রবক্তা বেইলি আরেক পণ্ডিত বুয়েকের দ্বৈত অর্থনীতির ধীকল্প (idea) খণ্ডন করেন। তিনি ইউরোপীয় এবং দেশীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে লেনদেন করতে যেসব বাধার সৃষ্টি হয় তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে উক্ত ধীকল্প খণ্ডন করেন। বুয়েকের মতে, অনুন্নত অর্থনীতির ব্যবসায়িক লেনদেন স্থবির হয়ে যায়, কারণ আধুনিক ধনতান্ত্রিক বাণিজ্য কার্যক্রম অধনতান্ত্রিক সমাজের সনাতন মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে অসম্পূর্ণভাবে সম্পর্কিত। মন্তব্য করতে গিয়ে বেইলি বলেন, কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, স্থানীয় ব্যবসায়ী সমাজের কর্মক্ষমতা ও মূল্য সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ধারণা বহিরাগতদের মূল্য এবং মুদ্রা যোগান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা নস্যাৎ করে দেয়।[২৮]

আমরা বাংলায় বাণিজ্যিকীকরণ সম্পর্কিত তথ্যাদি কতগুলো যুক্তির আলোকে আলোচনা করবো। দত্তের কাছ থেকে আমরা খাদ্যশস্যের জবরদস্তিমূলক এবং 'কৃত্রিম' বাণিজ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করি। তাতে দেখা যায়, প্রান্তিক চাষী এবং মাঝারি কৃষকরা

২৬. দ্রষ্টব্য পাদটীকা, ২০।

২৭. C J Baker, *An Indian Rural Economy The Tamil and Countryside*, (Delhi 1984), 520.

২৮. C. A Bayly, *Rulers, Townsmen and Bazaars: North Indian Society in the Age of British Expansion*, (Cambridge 1983), 464-65

তাদের জীবিকার মৌলিক চাহিদা মেটাতে শস্য বাজারজাত করতো। কিন্তু কৃষিকাঠামোর উপর সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব সম্পর্কে দত্ত কোন বিশ্লেষণ দেন নি।

কুর্ফা কৃষক সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীদের ধারণা আমাদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে কৃষকদের চিন্তাধারা ও ব্যবহার বোঝার জন্য এবং সেটা অবশ্যই অর্থকরী ফসল উৎপাদন সংক্রান্ত। ভারতীয় দৃষ্টিতে কুর্ফা কৃষক সম্পর্কে ধারণা গ্রহণযোগ্য। তবে অর্থকরী ফসল চাষের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক সেটা খুঁটিয়ে দেখার বিষয়।

মূল্য উঠানামার সঙ্গে সময় সময় অর্থকরী ফসল চাষের তারতম্য জানার জন্য ঐ দু'টি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা চাই। মূল্য নিম্নগামী হলে অর্থকরী ফসলের চাষ কমই বাড়তো। যাহোক, বাণিজ্যিকীকরণে একটা সামাজিক ধারাও কাজ করেছিল। সব চাষী কি বাজার বিষয়ে একইভাবে সাড়া দিত ? কেন কেউ কেউ সাড়া দিত আবার কেউ কেউ সাড়া দিত না ? সবাই কি তাদের চাষ একইভাবে বিন্যাস করতো ? একবার যখন চাষীরা কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতো, তারা কি সব সময় তাই করতে থাকতো ?

অর্থকরী ফসলের চাষ ও পরিবর্তনশীল মূল্যের সম্পর্ককে চাষীদের বহুমুখী সম্পর্ক থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়, যা আবার গভীরভাবে জড়িত গ্রাম্য প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে।

বাণিজ্যিকীকরণে জবরদস্তির কথা কতগুলো প্রধান শস্য সম্পর্কে জরিপ করে যাচাই করা যেতে পারে, যেমন নীল, আফিম, ইক্ষু ও পাট। আমাদের সর্বপ্রথম যে বিষয় সম্পর্কে ধারণা পেতে হবে সেটা হলো অর্থকরী ফসল ফলানোর জন্য চাষীদের অগ্রিম প্রদান। চাষীরা কৃষির জন্য অগ্রিম চাচ্ছিল মূলধনের অভাবের জন্য, না অন্যান্য আর্থিক দায়দায়িত্ব মেটানোর জন্য ? এই অগ্রিমগ্রহণ সাধারণ ঋণগ্রহণের চেয়ে ভিন্ন রকমের ছিল। এই অগ্রিমগ্রহণে চাষীদের দরকষাকষির স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু সাধারণ ঋণের বেলায় এ রকমটি ছিল না। উল্লিখিত অর্থকরী ফসল চাষে অগ্রিমের কি ভূমিকা ছিল ? কৃষকদের জন্য এর গুরুত্ব কি ছিল ? অগ্রিম না নিলে কৃষকের পক্ষে কি সুবিধা ছিল ? তিন রকমের অগ্রিম গ্রহণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আফিম ও নীলের ক্ষেত্রে সেসব অগ্রিম সবাই গ্রহণ করতো। ইক্ষুচাষীদের ক্ষেত্রে অগ্রিম ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা হতো এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পাটচাষের বেলায় প্রথম পর্যায়ে এবং পরবর্তীতে পাটচাষের প্রসারের ফলে আংশিকভাবে ঋণ গ্রহণ করা হতো।

নীলচাষে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অগ্রিমের উপর নির্ভরশীল ছিল। চাষী অগ্রিম গ্রহণে উৎসাহী ছিল এবং উৎপাদকরা চাষীদের অগ্রিম দেয়ার বিষয়ে আগ্রহী ছিল। অবশ্য চাষীদের উৎসাহ কদাচিৎ নীলচাষে মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি করতো। উৎপাদকদের মতে নীল ছিল একটি অলাভজনক ফসল। চাষীরা অগ্রিম গ্রহণ করতো অন্যান্য প্রয়োজনের তাগিদে। এক্ষেত্রে নীল কমিশনের পর্যবেক্ষণ উল্লেখযোগ্য। চাষীরা আগাম গ্রহণ করে বছরের এমন

এক সময়ে, যখন তার খাজনা দিতে হতো অথবা বাৎসরিক দুর্গাপূজা উদযাপন করতে হতো। কেউ কেউ ঋণগ্রস্ত ছিল, আবার কেউ কেউ ছিল অতিব্যয়ী এবং সবাই সুদবিহীন অর্থ গ্রহণ পছন্দ করতো।[২৯] এই কারণেই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র কৃষকরা নীলকরের নাগপাশে বন্দী হয়ে পড়েছিল। তারা যে অগ্রিম গ্রহণ করতো তার কিছু অংশ নীলচাষে ব্যয় হতো। নীলকরেরা স্বল্প মূল্য প্রদান করতো, যা দিয়ে কৃষিব্যয় সঙ্কুলান হতো না এবং চাষের জন্য পুঁজির অভাবের ফলে চাষী আরো গভীরভাবে নীলকরের কাছে বাধা পড়তো। এভাবে তারা নীলচাষের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তো, যদিও সেখানে দাদন পাওয়ার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না। অপরদিকে নীলকর দাদনের মাধ্যমে চাষীর জমি ও শ্রমের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেলো। দাদন গ্রহণকারী চাষীর জমি তাৎক্ষণিকভাবে কুঠির কর্মচারীদের দ্বারা সনাক্ত ও চিহ্নিত করা হতো।

সরকারের এক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ইক্ষুচাষ ব্যয়সাধ্য হলেও লাভজনক ছিল। বিত্তশালী কৃষকেরা এর চাষ করতো এবং ঋণপ্রদানকারীদের সাহায্য কদাচিৎ গ্রহণ করতো।[৩০] স্থানীয় প্রতিবেদন অনুযায়ী এই তথ্য সঠিক নয়। উদাহরণস্বরূপ, বর্ধমানে ইক্ষুচাষীরা ঋণদাতাদের আঙিনায় ইক্ষুমাড়াই করে রস ও গুড় তৈরি করতো এবং সেই গুড় উক্ত স্থানে বসে অথবা বাজারে বিক্রি করে ঋণ শোধ করতো।[৩১] রাজশাহীতে কোন কোন চাষী মহাজনদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করতো এবং গুড় প্রদানের মাধ্যমে তা পরিশোধ করতো এবং বাজারের প্রচলিত হার অনুযায়ী চাষীদের মণপ্রতি ছয় থেকে আট আনা সুদ দিতে হতো।[৩২] পাবনায় চাষীরা ঋণের অর্থে চাষ করতো অথবা মহাজনদের সঙ্গে অংশীদার হিসেবে থাকতো। মহাজনরা অর্থ অগ্রিম প্রদান করতো এবং বিনিময়ে সুদ ও অপরিশোধিত চিনি বাজারদরের চেয়ে কমমূল্যে আদায় করতো।[৩৩] চিনির ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে পরে সাধারণ বিত্তশালী কৃষকরাও ইক্ষুচাষে উৎসাহিত হয়। ঋণ গ্রহণে তাদের অনীহা ছিল না যদি তারা মনে করতো যে, ইক্ষুচাষ তাদের জন্য লাভজনক। এখন প্রশ্ন হলো, কেন অধিকাংশ ইক্ষুচাষী ঋণ ছাড়া চলতে পারতো না? শহীদ আমিন গোরখপুরের ক্ষেত্রে যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে কি চাষীদের মানসিকতা একই ধরনের কাজ করতো বলে মনে হয়? অর্থাৎ শস্য পরিপক্ব হওয়ার সময়ে কি বিশেষভাবে খাজনা দেয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল? খাজনা বা করের বোঝার ধরন বাংলায় ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। শীতকালীন ফলনের পর অর্থাৎ মধ্য-নভেম্বর থেকে মধ্য-ডিসেম্বরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি

২৯. *Report of the Indigo Commission*, (1860), para 57.

৩০. *India Agriculture and Horticulture Proceedings*, May 1844, Government of Bengal to Government of India.

৩১. ঐ, Burdwan Commissioner to Government of Bengal, 9 May 1883, para 16.

৩২. ঐ, Commissioner of Rajshahi and Cooch Behar to Government of Bengal, 6 July 1885.

৩৩. ঐ।

খাজনার কিস্তি পরিশোধ করতে হতো। চাষীকে ঋণ প্রদানের আগ্রহ স্বাভাবিকভাবে এই ফসলের ফলনের উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল ছিল। অর্থ আদায়কারী এবং ঋণ পরিশোধকারী ফসল হিসেবে এখানে ইক্ষুর ভূমিকা উত্তর প্রদেশের চেয়ে অনেক সীমিত ছিল।

তবুও ইক্ষুচাষীরা ঋণের উপর নির্ভরশীল ছিল। আমিনের আলোচনায় খাজনা প্রদান তথা বাঁচার তাগিদে ঋণ বা আগাম নেয়ার উপর জোর দেয়া হয়েছে। ফলে ঋণ যে বিনিয়োগে ব্যবহৃত হতো সে দিকটা উপেক্ষিত হয়েছে। ইক্ষুচাষে ব্যয় এবং গুড় তৈরি এই ঋণ দ্বারা সম্পন্ন হতো এবং চাষীরা লাভের জন্যই ঋণ গ্রহণ করতো। তারা সম্ভবত কিছু লাভও করতো।

ইক্ষুচাষের খরচ ছিল অনেক। সেজন্যই ঋণের প্রয়োজন ছিল। শহীদ আমিন স্বীকার করেন যে, উত্তর প্রদেশের কৃষকদের ইক্ষুচাষের জন্য সবচেয়ে বেশি সময় ও শ্রম দিতে হতো। ফসল হিসেবে ইক্ষু দশ মাস জমি দখল করে রাখে এবং গুড় তৈরিতে কৃষকেরা আরো দশ থেকে বার সপ্তাহ অতিবাহিত করে। ইক্ষুমাড়াই করে রস আহরণ এবং গুড়তৈরি একটি ব্যয়বহুল পদ্ধতি। বেহিয়া মিলের মতো ইক্ষু মাড়াইয়ের লৌহকারখানাসমূহ, যেগুলো ধীরে ধীরে গতানুগতিক কাষ্ঠনির্মিত কলের পরিবর্তে স্থাপিত হচ্ছিল, সেগুলো ইক্ষুচাষীদের জন্য ছিল বেশি ব্যয়বহুল। কোন কোন সময় হিসেবী চাষীরা যৌথভাবে তা ক্রয় করতো। অনেক সময় তারা ঋণদাতা বা জমিদারদের কাছ থেকে তা ভাড়া নিয়ে ব্যবহার করতো। বিরাটাকার জ্বাল দেয়ার কড়াই, যেটি ছিল অত্যন্ত দামী বস্তু, তা একটা বিশেষ সময়ের জন্য ভাড়া দেয়া হতো। সেই কড়াইয়ের জন্য চাষীরা ঋণ বা আগাম গ্রহণ করতো। ঋণের এই উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করার অর্থ কৃষকদের এ সুবিধার বিষয়টি বিকৃত করা।

স্পষ্টত পাটচাষ আংশিকভাবে আগামের উপর নির্ভরশীল ছিল। পাটের মূল্য হঠাৎ হ্রাস পেলে এর উপর আরো বেশি নির্ভর করতে হতো। অগ্রিম অর্থের প্রাপ্যতা নির্ভর করতো মহাজনের ব্যবসায়ী স্বার্থের উপর। অপরদিকে পাটব্যবসায়ী অথবা পাইকারেরা নিজেদের মধ্যে কাঁচা পাট কেনার প্রতিযোগিতায় চাষীদেরকে আগাম দিত।

আগামের প্রশ্নটি উদঘাটন করে বেঙ্গল জুট কমিশন (১৮৭৩) মন্তব্য করে যে, "আগাম অর্থের কোন চাহিদা নেই এবং বেশ কিছু চাষী মহাজন বা ফড়িয়াদের কাছ থেকে আগাম না নিয়েই পাটচাষ চালিয়ে যাচ্ছিল।"[৩৪] মনে হয় এই মন্তব্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত যথার্থ ছিল। ১৯১৪ সালে ঢাকার সেটেলমেন্ট অফিসার গ্রামীণ ঋণব্যবস্থা সম্পর্কে লিখেন, "আমি সন্দেহ করি এক হাজারে একজন কৃষক ঋণ বা আগামের জন্য আড়তদার, বেপারি বা পাট ব্যবসায়ীর উপর নির্ভরশীল ছিল কিনা। জেলায়

৩৪. Hem Chandra Kar (Report on Jute,) (পাদটীকা ১৫) Appendix, পাটচাষীদের বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য, Statements Nos 10, 11, 12, 14, 19, 22, 25, 28, 31-32, 38-49, etc.

এটি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং পরে ঋণগ্রহণতত্ত্ব পরিত্যক্ত হয়েছে।"[৩৫] ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পাটচাষীদের জন্য দুঃসময় নিয়ে আসে, কারণ এর ফলে পাটের মূল্য হ্রাস পায়। তখন আগামের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৬ সালের পর নারায়ণগঞ্জ মহকুমা, পাবনা এবং রংপুরে দাদনব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠে। ময়মনসিংহে পাটের বাজারদরের চেয়ে কম হারে ঋণ পরিশোধ করার ব্যবসা আরম্ভ হয়।[৩৬]

পাটচাষীদের আগামের উপর নির্ভরতা থাকলেও একে ভিত্তি করে পাটচাষ করা তেমন উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। ১৯১৬ সালের এক সরকারি তদন্তে তা দেখা যায়। আগাম গ্রহণের শর্তে তারতম্য ছিল। ঢাকার কালেক্টর রিপোর্ট দেন, "এই জেলায় পাট বা অন্যান্য ফসলের জন্য আগাম গ্রহণ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। মহাজনরা অবশ্য চাষীদের সুদে উচ্চহারে চৈত্র এবং বৈশাখ মাসে অর্থঋণ দেয় এবং তা শ্রাবণ অথবা ভাদ্র মাসে আদায় করে।"[৩৭] জামালপুর ও ময়মনসিংহের মহকুমা হাকিম একই বিবরণ প্রদান করেন, "এই মহকুমায় শস্যচাষের জন্য দাদন প্রথা নেই। মহাজন কৃষকের কাছ থেকে কৃষিপণ্য ক্রয় করে এবং লাভজনক বাজার না পাওয়া পর্যন্ত মজুদ রাখে। পাট ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল শস্যের বেলায় এটাই ছিল নিয়ম। পাট মাড়োয়ারী ও ইউরোপীয় জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলো কিনতো।"[৩৮] ময়মনসিংহ সদর মহকুমার অবস্থা অবশ্য অন্যরকম ছিল। পাটব্যবসায়ীদের দালালরা পাটচাষীদেরকে আগাম প্রদান করতো এ শর্তে যে, উৎপাদিত সমুদয় পাট বাজারদর অনুযায়ী তাদের কাছে বিক্রি করতে হবে, তবে কদাচিৎ পাটচাষীরা বাজারদর পেতো।[৩৯] রংপুর জেলার গাইবান্ধার মহকুমা হাকিমের প্রতিবেদনে জানা যায়, যে হাটে বেপারি বা ফড়িয়ারা ক্রয় করতে আসে সেখানে চাষীরা পাট বিক্রি করার জন্য নিয়ে যায়। কোন কোন সময় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ সরাসরি ক্রয় করার জন্য হাটে নিজস্ব ক্রেতা পাঠাতো, কিন্তু এটা সাধারণ নিয়ম নয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি দালালের মাধ্যমে বেপারিদের অর্থ আগাম দেয় এবং আগাম প্রদানে বিভিন্ন এজেন্সির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে।[৪০] কুড়িগ্রামের মহকুমা হাকিম দৃঢ়তার সঙ্গে জানান যে, আগাম নিলেই বাজারদরের চেয়ে কম মূল্যে চাষীরা তাদের পাট বিক্রি করবে এ মর্মে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে পাট উৎপাদনকারী কৃষক লিখিত চুক্তির মাধ্যমে মহাজনের কাছ থেকে ফাল্গুন

৩৫. উদ্ধৃত, Omkar Goswami, " Agriculture in Slump, the Peasant Economy of East and North Bengal in the 1930s", *Indian Economic and Social History Review*, July-September 1984, 338

৩৬. ঐ, 339-40

৩৭. *Marketing of Agricultural Produce in Bengal, 1926*, (Calcutta 1926), 38.

৩৮. ঐ, 41

৩৯. ঐ, 42

৪০. ঐ, 60-61

মাসে আগাম গ্রহণ করে এবং চুক্তি অনুযায়ী মহাজনকে কার্তিক মাসে প্রতি তিন রুপী অগ্রিমের জন্য এক রুপী লাভ হিসেবে প্রদান করে। তবে মহাজনের ইচ্ছানুযায়ী মূল উৎপাদনকারী তার পাট বিক্রি করতে বাধ্য ছিল না।[৪১]

পাটচাষে আগাম অর্থ গ্রহণের ভূমিকা সম্পর্কে জুট এনকোয়ারি কমিটিগুলো (১৯৩৪, ১৯৩৫) অনুসন্ধান চালিয়েছিল। প্রথম কমিটির প্রশ্নমালায় এই প্রশ্নগুলো স্থান পায়—চাষীরা তাদের শস্য ফলনের পূর্বেই তা বিক্রি করার জন্য কি কি শর্তে দায়বদ্ধ ? চাষীরা কার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে ? এ কথা বললে কি সত্য হবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণদাতারাই শস্যক্রেতা ? দ্বিতীয় কমিটির প্রশ্নগুলো ছিল—শস্য সংগ্রহের পূর্বেই কৃষকরা তাদের শস্য বিক্রির বিষয়ে কতখানি এবং কাদের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল ? মূল্যের উপর এর প্রভাব কি ছিল ? এই কমিটিগুলোর প্রাপ্ত তথ্যে গ্রামীণ ঋণব্যবস্থায় বিভিন্ন স্থানে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। তবে এর মধ্যে কতগুলো সাধারণ ধারা সনাক্ত করা যায়। ১৯৩০-এর দশকে যখন বাণিজ্যমন্দা চরমে ছিল, তখন পাটচাষীদের ঋণ সম্পর্কে দু'টি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, যখন পাটচাষীরা অন্যান্য চাষীদের মতো ঋণ চাইছিল, তখন ঋণের পরিমাণ হ্রাস পেলো এবং পেশাদার ঋণদাতারা ঋণ প্রদান কমিয়ে দিল। ফলে পাটচাষীরা পাটকল ও পাটব্যবসায়ীদের দালালদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, কাঁচা পাটের ক্রমাগত চাহিদাবৃদ্ধি (যদিও পূর্বের চেয়ে কম) সত্ত্বেও ব্যবসার সাধারণ অনিশ্চয়তা এবং অনিশ্চিত বাজারের প্রেক্ষাপটে চাষীদের কাছে কোম্পানি আগাম ঋণ প্রদানে অনীহা প্রকাশ করছিল। তারা সে সময়ের দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তন, চাষীদের খাজনা ও ঋণ পরিশোধে অনিচ্ছা এবং দুঃস্থ চাষীদের পক্ষে স্থানীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ও পক্ষাবলম্বন ইত্যাদি বিষয় কঠিনভাবে গ্রহণ করে। চাষীদের অসন্তোষের পশ্চাতে কৃষিপণ্যের মূল্যহ্রাসের পরও খাজনাবৃদ্ধি এবং ঋণের অর্থ পরিশোধ করার অতিরিক্ত তাগিদ কাজ করছিল। সমসাময়িক রাজনীতিকদের উস্কানিতে 'খাজনা দেবো না, ঋণ শোধ করবো না' এই মানসিকতার উদ্ভব পাটকল ও ব্যবসায়ী-এজেন্টদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। চাষীদের ঋণপরিশোধের বিষয়ে স্থানীয় সরকারের মনোভাবের ফলে ভীতি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল।[৪২] ১৯৩৫ সালের 'বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ডেটর্স এ্যাক্ট'-এর উদ্দেশ্য ছিল চাষীর ঋণের পরিমাণ হ্রাস ও ঋণপরিশোধ সহজতর করা। ডেট সেট্‌লমেন্ট বোর্ড উক্ত আইনের অধীনে স্থাপিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ঋণের বোঝা হ্রাস করা হয় যদিও ঋণ প্রদানকারীর স্বার্থ একেবারে জলাঞ্জলি দেয়া হয় নি।[৪৩] কাঁচা পাট

---

৪১. ঐ, 59

৪২. Binay Bhushan Chaudhuri, "The Process of Depeasantization in Bengal and Bihar", *Indian Historical Review*, July 1975, Section 3 আরো দেখুন, Sugata Bose, *Agrarian Bengal Economy, Social Structure and Politics, 1919-1947,* (Cambridge 1986), Chapter 4.

৪৩. Ratan Lal Chakraborty, *Rural Indebtedness in Bengal, 1935-1947,* (Unpublished Ph D Dissertation, University of Dhaka, 1978) Dr Chakraborty Concludes: " It is believed commonly that the operation of the debt Settlement Boards had rescued the Bengal peasantry from the clutches of the mahajans of various denominations But our investigations have revealed that mahajani interests were more enthusiastic about resorting to D S Boards than the peasantry" ঐ , 271

বাজারজাতকরণপ্রক্রিয়ার উপর প্রতিবেদনসমূহ থেকে এই ধারণা করা যায় যে, স্বাভাবিক সময়ে পাটচাষে আগামের ভূমিকা অস্বাভাবিক ছিল না। অধিকাংশ চাষীই তাদের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় হাট-বাজারে বিক্রি করতো। পাটের চাহিদাবৃদ্ধির সময়ে ফড়িয়ারা চাষীদের বাড়ি থেকে পাট ক্রয় করতো। পূর্বেকার ব্যাপক আকারে আগামব্যবস্থায় ঐ রকম খোলা বাজারে বিক্রি ছিল সীমিত। ১৯৪৪ সালের 'জুট এনকোয়ারি কমিটি' পাট বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত বিবরণে এ বিষয়ে মন্তব্য করে যে, চাষী তার পাট মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে বিক্রি করে এবং তাদের মধ্যে ফড়িয়া, বেপারি, আড়তদার অথবা মহাজন ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা চাষীদের প্রতারণা করে থাকে। তারা চাষীদের বাড়ি থেকে অথবা স্থানীয় হাট থেকে পাট ক্রয় করে। প্রথমত, স্মরণ রাখা উচিত যে চাষীরা কোনক্রমেই অজ্ঞ নয় এবং দ্বিতীয়ত, ফড়িয়া ও বেপারিরা স্থানীয় লোক এবং কৃষকও বটে। অতএব, তারা যাদের কাছ থেকে পাট ক্রয় করে তারা তাদের পরিচিত জন।[৪৪]

পাটের বাজারে মন্দার ফলে কিভাবে পাটচাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতো সেটা পাটচাষে আগামের প্রান্তিকতা প্রমাণ করে। প্রথমত আমরা ১৮৭২-৭৩ সালের মন্দার কথা উল্লেখ করতে পারি। পূর্বের দু'বছরে পাটের লাভজনক ফটকাবাজি ব্যবসা করে বেপারিরা কৃষকদের কাছ থেকে পাটক্রয়ের অতি আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৮৭২-৭৩ সালে পাটচাষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। পরে হুজুগে নিম্নমানের পাট উৎপন্ন করা এবং বাজারে সরবরাহ অতিমাত্রায় বেড়ে যাবার ফলে পাটের বাজারে মন্দা নেমে আসে। স্থানীয় বিবরণসমূহে মন্দার তীব্রতা প্রকাশ পায়। ২৪ পরগনা ও হুগলীতে অবিক্রিত পাট মোট ফসলের এক-চতুর্থাংশ থেকে তিন-চতুর্থাংশ ছিল। পাট উৎপাদনের প্রধান দুই জেলা ঢাকা এবং ময়মনসিংহে সর্বত্র আগের মৌসুমে উৎপাদিত পাট মাঠে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। কলকাতার বাজারে মূল্যহ্রাসের দরুন চাষীদের মনে এমন ভীতির সঞ্চার হয় যে, পানিতে ভেজানো তাদের অনেক কাঁচা পাট পরিত্যক্ত অবস্থায় পঁচে যায়।[৪৫]

এর সঙ্গে তুলনীয় ১৮৮২-৮৩ সালের ঘটনা। ১৮৮০ সাল থেকে বাজারে পাটের অতিরিক্ত সরবরাহ ঘটে। ১৮৭৯ সালে স্বাভাবিকের তুলনায় সর্বত্র পাটচাষ কম ছিল। পাটচাষের উপর ট্যাক্স বসবে এই গুজবের ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে পাটচাষ হ্রাস করা হয় এবং দুর্ভিক্ষ এড়ানোর জন্য ম্যাজিস্ট্রেটসহ অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাগণ ঢোল পিটিয়ে পাটের পরিবর্তে ধান চাষের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেন।[৪৬] ফলে পাটের স্বল্পতার দরুন অনেক তাঁত বন্ধ করে দেয়া হয়।[৪৭] রাজশাহীতে একটা বিশেষ ধরনের পাটের মূল্য ৮০% বৃদ্ধি পায়।

৪৪. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee, 1934,* 12-13

৪৫. H. C. Kar to Government of Bangal, 10 April 1873, Bengal Agriculture Progs, November 1873, file 1-85/89

৪৬. *Annual General Report,* Rajshahi Division, 1879-80, 29 June 1880, para 9.

৪৭. *Report on the Administration of the Customs Deptartment,* 1879/80, para 55.

এর ফলে কৃষকরা পাটচাষে আবার প্রলুব্ধ হয়। ১৮৮০ সালে ধানের মূল্য হ্রাসের জন্য চাষীরা পাটচাষের স্থির সিদ্ধান্ত নেয়। এতে ঢাকা বিভাগের পাট প্রায় ২৫% বৃদ্ধি পায়।[৪৮] পাটের উচ্চমূল্য তখনো বিদ্যমান ছিল। সুতরাং স্বল্প সময়ের জন্য চাষীরা পূর্ণ মুনাফা লাভ করে।[৪৯]

১৮৮১ সালে পাটের আবাদ বৃদ্ধি পায়। আবহাওয়াও ছিল অনুকূলে। ফলে সে বছর পাটের প্রচুর ফলন হয়। ঢাকা বিভাগে পূর্ববর্তী দশ বছরের তুলনায় সবচেয়ে বেশি ফলন হয়।[৫০] বাজারে চাহিদা তখনো হ্রাস পায় নি। ১৮৮২ সালে পাটের আবাদ আরো বৃদ্ধি পায়। তখন ময়মনসিংহ জেলার বিস্তৃত এলাকা পাটচাষভুক্ত ছিল। অচিরেই এর কুফল পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় পাটকলসমূহে, ডান্ডিতে এবং অন্যত্র এইসব পাটের চাহিদা কমে যাওয়ায় এর মূল্য কমে যায়। ঢাকায় ২৯% এবং ফরিদপুরে ৬৬.৬% হারে মূল্য হ্রাস পায়।[৫১] পূর্ণিয়া জেলায় পাটের দাম এতো কমে যায় যে উৎপাদনখরচ তুলে আনাও কঠিন হয়ে পড়ে এবং চাষীরা পাটগাছ থেকে আঁশ ছাড়াতে অস্বীকৃতি জানায়।[৫২] ত্রিপুরায় অনেক চাষী নিম্নমূল্যের জন্য পাট কাটা থেকে বিরত থাকে।[৫৩]

দু'বছর পাটের উচ্চমূল্য বজায় থাকার পর ১৮৯০-৯১ সালে একই সঙ্কট দেখা দেয়, এবং ফলে পাটচাষ বৃদ্ধি পেলো। তখন দিনাজপুরের কালেক্টর লিখেন, "কৃষিযোগ্য জমির এক-তৃতীয়াংশ জমি পাটচাষের আওতায়।" মোটকথা, আগে যেসব জেলায় পাটচাষ হতো না, সেখানেও তা আরম্ভ হয়। এতে অতিউৎপাদনের ফলে আবার সর্বত্র মূল্য হ্রাস পেতে থাকে এবং পূর্ণিয়াতে মূল্য ৪২.১% হ্রাস পায়। নোয়াখালীতে প্রত্যাশিত মূল্যের অর্ধেকের কিছু বেশি পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় মূল্য এত হ্রাস পায় যে সেটা হাস্যরসের বিষয়ে পরিণত হয়। দিনাজপুরে পাটবিক্রয়কেন্দ্রে ক্রেতা ছিল না, বিস্তৃত স্থানের পাট আকাটা অবস্থায় মাঠে পড়ে থাকে।

পাটচাষে আগামের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। ঋণ ব্যতিরেকে পাটচাষীরা চাষ করতে পারতো না এটা ঠিক নয়। চাষীদের জীবনধারণের প্রয়োজন ছাড়াও পাটচাষের জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন ছিল। সাধারণত এ চাষ ছিল শ্রমকেন্দ্রিক এবং ধানচাষের চেয়ে বেশি ব্যয়বহুল। পাটচাষীরা পাটব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে আগাম না নিয়ে বিকল্প ঋণদাতাদের উপর নির্ভর করতে পারতো। পাট ছিল

৪৮. *Annual General Report*, Dacca Division 1880/81, 12 July 1881

৪৯. ঐ, para 40.

৫০. *Annual Report on the Internal Trade in Bengal*, 1881/ 82, para 50

৫১. *Annual Report on the Internal Trade in Bengal*, 1882/83, *para* 44

৫২. *Annual General Report*, Bhagalpur Division, 1882/83, 28 June 1883, para 29

৫৩. *Annual General Report*, Chittagong Division, 1882/83, 30 June 1883, para 38.

কৃষিঅর্থনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিরল ক্ষেত্র বাদে পাটচাষ কোথাও কোথাও কৃষকদের মুখ্য কর্ম ছিল। পাটের বাজারের উঠানামা চাষীকে পাটচাষে দ্বিধাগ্রস্ত করতো। প্রয়োজনের সময়ে ধান ও অন্যান্য শস্যের চাষীও গ্রামীণ ঋণদাতা এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতো।

অন্যদিকে পাটব্যবসায়ী ও পাটউৎপাদকরা শুধু তাদের ইপ্সিত পাট পাওয়ার জন্যই চাষীদের অগ্রিম প্রদান করতো না, প্রচলিত বাজারদরে বিক্রির জন্য উৎপাদিত পাট বাজারে আনতে তাদের প্রলুব্ধ করতো। এ প্রসঙ্গে ১৯০৫-০৬ সালে পাটের মূল্যবৃদ্ধি লক্ষণীয়। পাটের বাজারে অনেক ক্রেতার আগমন এবং পাটের মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখে অনেক ক্ষেত্রে পাটব্যবসায়ী পাটচাষীকে আগাম দিয়ে উৎপাদিত ফসল বন্ধক দিতে প্রলুব্ধ করে। স্বাভাবিক বাজারে পাটব্যবসায়ীরা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা চাষীদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য আগাম না দেয়া পছন্দ করতো। অতএব কৃষকেরা আগাম ছাড়াই পাট উৎপাদন করতো। চাষী তার কতখানি জমির উপর পাট জন্মাতো এবং বিভিন্ন সময়ে তার কি পরিবর্তন হতো তা নির্ভর করতো কাঁচা পাটের মূল্য এবং পাট-ধানের মূল্যের আনুপাতিক ব্যবধানের উপর।

পাটের প্রতি চাষীর ঝোঁকের বিষয়টি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। আজিজুল হক পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের জেলাসমূহে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে কৃষকের জমির উপর চাপবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করেছেন। অনাবাদি নিম্নজমিতে পাটচাষ দ্বারা জমির দুষ্প্রাপ্যতা পুষিয়ে নেয়া হয়।[৫৪]

পাটচাষের ফলে শ্রমিকদের এবং বিশেষকরে কৃষকপরিবারের একটা বিশেষ অংশ যারা বেকার থাকতো, তারা আবাদের কাজ পায়। এতে পাটচাষের সম্প্রসারণ ঘটে। যাহোক, জনসংখ্যা বিষয়টি পরিষ্কারভাবে পাটচাষের চরিত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

কেবল কাঁচা পাটের মূল্য সর্বত্র পাটচাষের পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি ধারা নির্ধারণ করতে পারে না। আমরা নিকটবর্তী আসামে পাটচাষের প্রসারকে একটা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে বাংলায এর চাষ সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছিল। কিন্তু তবুও আসামে পাটচাষ প্রসারলাভ করে। এই তুলনা প্রাসঙ্গিক এজন্য যে পাটচাষের প্রসারের জন্য স্থানীয় কৃষকরা দায়ী ছিল না, বরং পূর্ব বাংলার ময়মনসিংহ জেলা থেকে আগত আবাদি কৃষকদের জন্যই এটি সম্ভবপর হয়েছিল। আসাম উপত্যকায় বহিরাগতদের অভিবাসনের ফলে ১৯১১ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে শতকরা ৫৫.৬ ভাগ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এর সঙ্গে বৃদ্ধি পায় পাটচাষ। এই প্রসঙ্গে আমরা তিনটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আলোচনা করতে চাই :

৫৪. A Haque, *The Man Behind the Plough*, (Calcutta 1939) ,124-25.

১. কুর্ফা চাষীদের আগাম গ্রহণের অর্থ কি ? অগ্রিম গ্রহণ কি নির্ভরশীলতা বাড়িয়েছিল ?

২. আগাম গ্রহণের ফলে অর্থকরী ফসল উৎপন্নকারী চাষীদের কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ?

৩. চাষীদের স্বত্বহীনতা ও নির্ভরশীলতা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত বা স্থিতিশীল করার পথে কতটুকু বাধাস্বরূপ ছিল ? এটি একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, কারণ জবরদস্তিমূলক বাণিজ্যিকীকরণের আদৌ কোন প্রমাণ নেই এবং সংশ্লিষ্ট চাষীদের এই ধরনের নির্ভরশীলতা বা জবরদস্তি মোকাবেলা করার ক্ষমতা ছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বলা প্রয়োজন যে, আগাম গ্রহণই নির্ভরশীলতার একমাত্র কারণ ছিল না। এর সঙ্গে ফসলের উৎপাদনব্যবস্থা এবং প্রসারিত বাজারপদ্ধতিও সম্পর্কিত ছিল। আমরা দু'টি পণ্যের উল্লেখ এখানে করতে পারি—আফিম ও নীল। চাষীরা এখানে সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল ছিল। ইউরোপীয় নীলচাষপদ্ধতি ক্ষুদ্র চাষীর উৎপাদন এবং শ্রমমজুরির ভিত্তিতে মালিকের সরাসরি চাষকে তথা জিরাতকে নিরুৎসাহিত করে। পরবর্তীতে আমরা দেখাবো যে, কৃষিঅর্থনীতিতে জিরাতপদ্ধতি একটা বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। চাষীর ভূমি ও শ্রমের উপর মালিকের নিয়ন্ত্রণ ও সফলতা নির্ভরশীল ছিল। সাধারণভাবে মালিকরা তাদের ইচ্ছানুযায়ী কৃষকদেরকে নীলচাষে বাধ্য করতে ব্যর্থ হয়। ১৮৫৯-৬০ সালে বাংলায় ব্যাপকভাবে নীলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই ব্যর্থতার প্রমাণ। তখন পর্যন্ত রায়তি চাষে নীল উৎপাদনের মুখ্য সাংগঠনিক ব্যবস্থা ছিল। মালিকরা বিভিন্ন কারণে রায়তি ব্যবস্থা পছন্দ করতো, কিন্তু চাষীরা সে ব্যবস্থায় মালিকের কাছে আবদ্ধ থাকতো বলে তারা এই ব্যবস্থাকে ঘৃণা করতো। মালিকরা বিকল্প জিরাতব্যবস্থায় অনেক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়। রায়তি ব্যবস্থা তাদের জন্য ছিল অনেক লাভজনক। মালিকের লাভ মানে কৃষকের ক্ষতি। এই কারণে কৃষকরা বিভিন্নভাবে এই ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করে।

জিরাতি চাষে কুঠিয়ালের সুবিধা ছিল (ক) দখলিস্বত্বসহ পর্যাপ্ত জমি পাওয়ার, (খ) উক্ত জমি চাষের ব্যবস্থা করার এবং (গ) চাষ লাভজনক করার। জমিদারের কাছ থেকে পতিত জমি ইজারা অথবা খাসখামার ইজারা নিয়ে সরাসরি চাষ করা কুঠিয়ালদের জন্য সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি ছিল। অনেক ভূস্বামীর পতিত জমি ছিল, কিন্তু তা বেশি পাওয়া যেতো না। পতিত জমি আবাদের মাধ্যমে কৃষিপ্রযুক্তির তথা কৃষির উন্নতি হয় এবং লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পতিত জমির পরিমাণ হ্রাস পায়। খাসখামার ইজারা দেয়ায় ভূস্বামীর অবস্থার পরিবর্তন হয় নি, কারণ তারা সরাসরি চাষ করতো না, তাদের খাসখামার ক্ষুদ্র ছিল।

নীলকরদের ব্যক্তিগত কর্ষণে অক্ষমতা এবং অনিশ্চিত শ্রমসরবরাহের জন্য প্রাপ্ত জমি সরাসরি আবাদে অসুবিধা হতো। কুঠিয়াল ব্যয়হ্রাস করার জন্য হাল-বলদ ক্রয় এবং সারা

বছর পোষার পরিবর্তে কৃষকদের কাছ থেকে হাল ভাড়া করতে পছন্দ করতো। তারা অবশ্য ইচ্ছানুযায়ী চাইলেই হাল ভাড়া পেতো না, কারণ চাষীরা নীলচাষের জন্য তা দিতে অনিচ্ছুক ছিল পাছে তাদের নিজস্ব কৃষিকর্মের ক্ষতি হয়।

জিরাতি চাষে উৎপাদনের সকল খাতে নগদ অর্থ প্রদান করতে হতো। কিন্তু রায়তি চাষে কুঠিয়ালদের অনেক সাশ্রয় হতো, কারণ তাতে শ্রমের মূল্য দিতে হতো না, রায়ত নিজেই সব কিছু করতো। রায়ত জমি পরিষ্কার করতো, চাষ করতো এবং তার সন্তানগণ তাকে সাহায্য করতো। এভাবে কুঠিয়ালরা অল্প খরচে দাদন প্রথার মাধ্যমে রায়তি ব্যবস্থায় নীলচাষ করতো। এ ব্যবস্থায় অগ্রিম গ্রহণকারী চাষীরা তাদের সমুদয় উৎপাদিত শস্য মালিকের কাছে সমর্পণ করতো। এর মূল্য থেকে আগাম অর্থসহ মালিকপ্রদত্ত শস্যের মূল্য, নীলকুঠিতে উৎপাদিত ফসল পৌছানোর খরচ এবং নীলচুক্তির আনুষ্ঠানিক স্টাম্পের মূল্য কেটে রাখা হতো। এরপর অবশিষ্ট যা থাকতো তা অর্থনৈতিকভাবে চাষীর জন্য মোটেই লাভজনক ছিল না। যে মুহূর্তে বকেয়া জমে যেতো, নীলকরেরা চাষীকে দাদন দেয়া বন্ধ করে দিত এবং মূল্য থেকে বকেয়া কেটে নেয়া হতো। নীলকরেরা চাষীদের কাছ থেকে সাধারণ বকেয়া সংগ্রহে আগ্রহী ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতের জন্য চাষীদের আবদ্ধ রাখা। এভাবে শ্রমশক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ফলে উৎপাদনের অন্যান্য হাতিয়ারসমূহের উপরও কুঠিয়ালের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৫]

নীলচাষে দাদনব্যবস্থা থাকার ফলে কৃষকের অধীনতা পাকাপোক্ত হতো। কর্ষণব্যবস্থার উপর কুঠিয়ালের নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নীলচাষের জন্য জমি নিজে পছন্দ করার অধিকার চাষীর ছিল না। নীলকরের পছন্দানুসারে সে চাষ করতে বাধ্য ছিল। অতএব তার কোন জমি বিশেষ কোন শস্য চাষের জন্য কর্ষিত হলেও, এমনকি তাতে ঐ শস্যের বীজবপন করা হলেও সেই জমিতে নীলকরের ইচ্ছানুযায়ী নীলচাষ করতে হতো। নীলকরের হস্তক্ষেপের এখানেই শেষ নয়, নীলচাষের জন্য উপর্যুপরি জমি চাষ করতে হতো, মাটিঢেলা পেষণ করতে হতো এবং আগাছাদি পরিষ্কার, জমি মসৃণ করা প্রভৃতি কাজে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে নীল রোপণ করতে হতো।[৫৬]

আফিমচাষীদের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল অন্য ধরনের। সরকারি নিয়ন্ত্রণের সফলতা গ্রামের শক্তিশালী মহলের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করতো। সরকারের একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য আগামব্যবস্থার রূপরেখা প্রণীত হতো। আগাম গ্রহণের সঙ্গে চাষী আফিম আবাদ করতে সরকারের অনুমতি লাভ করতো। সরকার ব্যতীত তারা অন্য কারো অনুমতি নিতে পারতো না। অতএব সরকার যতোখানি চাইতো ততোটুকুই তারা উৎপন্ন করতো এবং যা উৎপন্ন হতো তাই সরকারকে দিত। আগাম গ্রহণকারী আফিমচাষীরা

৫৫. Sugata Bose, *Agrarian Bengal*, 52, 54

৫৬. *Report of the Indigo Commission* (1860), para 59

দীর্ঘকালের জন্য উক্ত চাষে জড়িয়ে পড়ে নি। দৃঢ়ভাবে ঋণে আবদ্ধ কৃষকের সংখ্যা ছিল নগণ্য। আগত বছরের হিসাবের সঙ্গে ঋণের হিসাব যোগ করা হতো না। আফিমচাষ জরবদস্তিমূলক বা অপরিহার্য ছিল না। এই চাষ হ্রাসের জন্য এবং তাকে কম আকর্ষণীয় করার জন্য সরকার আফিমের মূল্য কমিয়ে দেয়। চাষীরা অপছন্দ করলে এ চাষ নাও করতে পারতো। যাহোক, সরকারের একচেটিয়া আফিমব্যবসা চাষীদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক ছিল। আইনগত ব্যবস্থা ছাড়াও গ্রাম্য প্রভাবশালী মহল, যথা মহাজন, গ্রাম্য মাতব্বর ও জমিদারদের সহযোগিতার উপর এ বিষয়ে সরকারের কৃতকার্যতা নির্ভর করতো। খাতাদারের মাধ্যমে আফিম বিভাগের সঙ্গে কৃষকদের যোগাযোগ হতো। আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিভাগের অঙ্গীভূত না হলেও চাষীদের অগ্রিম প্রদানের দায়িত্ব খাতাদারের উপর ন্যস্ত ছিল।

অনেক ক্ষেত্রে খাতাদারদের সঙ্গে চাষীদের সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি হতো, যা নিরসনের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতো না। খাতাদারদের আরোপিত সেস সম্পর্কে সরকার অবহিত থাকতো। এই কর এত পুরনো ছিল যে তা প্রদান লোকদের অভ্যাসে পরিণত হয়। এমনকি চাষীরা সেস আরোপের জন্য খাতাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগও করতো না। বিনা প্রতিবাদে ওরা সেস প্রদান করতো। খাতাদারদের সাহায্য ছাড়া সরকারের এ বিষয়ে কোন কিছু করার ক্ষমতা ছিল না বলে সরকার এ বিষয়ে কোনরকম হস্তক্ষেপ করতো না। সেজন্য স্থানীয় কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার জন্য প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও সরকার খাতাদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি, পাছে আফিমচাষ ভণ্ডুল হয়ে যায়।[৫৭]

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আগামগ্রহণ পাটচাষে আংশিক ভূমিকা পালন করেছিল। এমনকি যেখানে চাষীরা আগাম গ্রহণ করেছিল সেখানে তাদের অবস্থা নীল ও আফিম চাষীদের থেকে যথেষ্ট ভিন্ন ছিল। আগামগ্রহণের ফলে ঋণদাতাদেরকে পূর্বনির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী পাটের একটি অংশ দিতে হতো এবং সে মূল্য ঋণদাতাদের অনুকূলে থাকতো। যাহোক, মূল্যের ঘন ঘন উঠানামার জন্য ঋণদাতারা পাটচাষীদের সঙ্গে মহাজন-খাতক সম্পর্ক গড়ে তোলে নি এবং নীলকর ও আফিম বিভাগ যেমন প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল ছিল, তারা তেমন ছিল না।

যাহোক, পাটচাষী আগামগ্রহীতা হোক আর নাই হোক, তারা যে আরেক ধরনের স্বার্থগোষ্ঠীর অধীন ছিল তা হলো পাটকলসমূহ। এটির উপর জোর দেয়া দরকার, কারণ বলপূর্বক বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে চাষীর ঋণগ্রহণের বিষয়টি সম্পর্কিত।

এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, অপেক্ষাকৃত শক্তিমান, সংগঠিত এবং বুদ্ধিমান পাটব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা, অসংগঠিত এবং সীমিত বিত্তের চাষীরা,

৫৭. Parliamentary Papers 1896, IX1 (32), 22; Board of Revenue to Government of Bengal, 19 February 1895, para 14

যারা পাট উৎপন্ন হওয়ার পর পরই তা বাজারে না এনে পারতো না, তাদের পক্ষে প্রথমোক্তদের সঙ্গে দরকষাকষি করা কঠিন ছিল। ফসল কাটার পর পরই বাজারে কাঁচা পাটের স্তূপ জমে যেতো, যার ফলে পাটকলের দালালরা সুবিধাজনক মূল্যে পাট ক্রয় করতে পারতো। এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, পাটকলের এরকম ক্ষমতা থাকার ফলে বছর বছর পাটের মূল্য উঠানামা করতো এবং তা পাটচাষীদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো। বাজারের চাহিদার একটি আপেক্ষিকতা ছিল এবং যারা পাটের সঙ্গে সম্পর্কিত তাদের পক্ষে চাহিদার উপর প্রভাববিস্তার করার কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল। কৃষকরা পাটব্যবসায়ী ও পাটক্রেতাদের মাধ্যমে বৃহত্তর বাজারপরিমণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এরা বেশি উৎপাদন করতে চাইলেও পাটকলগুলো অবশ্যই বেশি ক্রয় করতো না। পাটকলের এই আধিপত্য বিশ শতকের প্রথম চার দশকে যতোটা পরিলক্ষিত হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ততোটা দেখা যায় নি।

চাহিদার চেয়ে উৎপাদন বেশি হওয়ার একটি বিশেষত্ব ছিল। ১৮৯৭-১৯৩৭ সময়ের মধ্যে উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা পাটশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রপ্তানিবাজারের প্রসারের ফলে পাটকলের সংখ্যা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বিশ শতকের প্রথম চার দশকে রপ্তানি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এটা ছিল ধীরগতিসম্পন্ন এবং এতে মূল্যের ঘনঘন উঠানামা হতো। পুরনো ও গতানুগতিক উৎপাদনপদ্ধতি নতুন নতুন দ্রব্য উৎপাদনের প্রচেষ্টা ব্যাহত করে, যার ফলে অনেক দেশে এর বিকল্প দ্রব্যের ব্যবহার আরম্ভ হয়। অপরদিকে গতানুগতিক পাটশিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সংশয় দেখা দেয় পাছে তার চাহিদা আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ফলে এই শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা এবং উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। কোন কোন সময়ে পাটশিল্পের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যোগসূত্র ছাড়াই উৎপাদন হ্রাস পায়। উৎপাদন ইচ্ছাকৃতভাবেই হ্রাস করা হয় যাতে বিধিনিষেধের দরুন বাজারে স্তূপীকৃত মালের একটা সুরাহা হয় এবং পাটজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। পাটকলমালিকগণ ঐক্যবদ্ধভাবে একাজ করতে পারতো। নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে তাদের গৃহীত ব্যবস্থাদির মধ্যে ছিল তাঁত ও টাকু বন্ধ করে দেয়া এবং কারখানার কাজের সময়ের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা কাজ না করার জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।

উৎপাদনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রভাব পড়ে পাটকলগুলোর কাঁচা পাট ক্রয়ের নীতির উপর। পাটকলগুলো অনুকূল সময়ে স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে বেশি পাট ক্রয় করে তা মজুদ করতো এবং পরবর্তী সময়ে তা ক্রেতা হিসেবে দরকষাকষির ক্ষেত্রে তাদেরকে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে আসতো।

উল্লিখিত পদ্ধতিতে পাটকলগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে উৎপাদন হ্রাস করানো ছাড়া অন্যভাবেও পাটের বাজারে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতো। ফলে কাঁচা পাটের মূল্য কমে যেতো। পাটকলগুলো বিক্রেতাদের কাছে পাটের সার্বিক চাহিদা সম্বন্ধে তথ্যসমূহ গোপন রাখতো এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতো। ফলে পাটচাষীরা পাটকল ও অন্যান্য ক্রেতারা কত

পরিমাণ পাট ক্রয় করবে সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেতো না। অনেক ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে পাট সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ ব্যয়বহুল ছিল। তাই এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে উঠে। নীল ও আফিমের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন প্রতিরোধের হাতিয়ারসমূহ ক্ষুদ্র কৃষিখামারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। নীলকর ও আফিম বিভাগের হাতে ব্যবসাব্যবস্থাপনার ভূমিকা ছাড়াও ক্ষুদ্র কৃষকের চাষের উপর বিশেষ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ছিল এবং সে নিয়ন্ত্রণ ছিল জমিতে ফসল তৈরি থেকে আরম্ভ করে ফসল তোলা পর্যন্ত প্রসারিত। নীলকর ও আফিম বিভাগ কৃষিপ্রক্রিয়াসমূহ পরিদর্শন করতো বটে, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণে তাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। কৃষকের জমিগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকায় কৃষিপ্রক্রিয়ার খুটিনাটি বিষয়গুলোর তদারকি করা ছিল ব্যয়বহুল। নিয়ন্ত্রণ যেখানে কম সেখানে প্রতিরোধ গড়ে উঠার সম্ভাবনা ছিল বেশি।

বৃহৎ জেলাসমূহের নীল উৎপাদনকারী কৃষকরা যখন নীলচাষবিরোধী বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, তখন তাদের প্রতিরোধের ধরনও ব্যাপক আকার ধারণ করে। কৃষক আন্দোলনের মুখে নীলকরদের জবরদস্তিমূলক কর্তৃত্বের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি ধ্বসে পড়ে। ১৮৪৭-৪৮ সাল থেকে কতিপয় কারণে পরিবর্তন আসে, যার ফলে সমগ্র নীলচাষী সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দু'ধরনের পরিবর্তন আসে, যেমন নীলচাষ ব্যবস্থায় নীলচাষীদের উপর নতুন ধরনের চাপ সৃষ্টি করা হয় যাতে তারা ঐ ব্যবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য অশান্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় তারা তাদের শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পায়। বাংলায় ১৮৫৯-৬০ সালে তাদের দৃঢ় প্রতিরোধের মুখে নীলচাষ দ্রুত কমতে থাকে। ১৮৬৮ সালে বিহারের নীলকরেরা সর্বপ্রথম বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। জিরাতি ব্যবস্থার ফলে তাদের অবস্থা আংশিকভাবে রক্ষা পায়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, রাসায়নিক রং আবিষ্কারের ফলে প্রাকৃতিক নীলের বাজার বিনষ্ট হয়। ১৯১৭-১৮ সালে ব্যাপক চাষীপ্রতিরোধের মুখে বিহারে অবস্থিত নীলকরদের শেষ ঘাটির পতন ঘটে। নীলকরদের মূলধনের বিরাট উৎস ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন (ডিসেম্বর ১৮৪৭-জানুয়ারি ১৮৪৮) বাংলার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপর থেকে নীলকরেরা ঋণগ্রস্ত চাষীদের ঋণমওকুফ বন্ধ করে দেয়। ১৮৫৫-১৮৫৯ সালে সকল পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা কৃষকদের নীলের সঙ্গে তাদের পূর্বেকার আবশ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করে। মজুরিবৃদ্ধি ও হালের গরু ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধির ফলে নীলচাষের ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। নীলকরেরা কৃষিউৎপাদনের বাড়তি মূল্যের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়ায় নি। অপরদিকে নীলচাষের মতো অলাভজনক চাষ বাদ দিয়ে অর্থকরী ও লাভজনক পণ্য, যেমন তামাক ও আলু (যার চাহিদা কলকাতা ও এর সন্নিহিত এলাকায় বৃটিশ সৈন্যের অবস্থিতির জন্য বেড়ে গিয়েছিল) সহ অন্যান্য কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঐসব পণ্যের চাষের প্রতি চাষীদের আকৃষ্ট করে।

নীলের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল ঐক্য এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল। আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল নীলচাষ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া এবং নীলকরদের বলপূর্বক নীলচাষ করানোর প্রচেষ্টা নস্যাৎ করা। এই আন্দোলন লেলিহান শিখার মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে

পড়ে। নীলকরেরা আন্দোলনকারীদের দমন করার জন্য শত চেষ্টা করেও সফলকাম হয় নি। স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতা তাদের কাজে আসে নি এবং আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সামাজিকভাবে একঘরে করার জন্য তাদের উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থাদিও কার্যকর হয় নি। জমিদার কর্তৃক প্লান্টারদের দেয়া জমির লীজ বা দখলিস্বত্ব, যেটি এতদিন তাদের আধিপত্যের সামাজিক ভিত্তি ছিল তাও নষ্ট হয়। মোটকথা প্লান্টারদের বিরুদ্ধে কিছু শক্তিশালী জমিদার জমির দখলি-স্বত্ব দেয়ার ব্যাপারে শত্রুমনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন।

আফিম বিভাগের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কিন্তু এ ধরনের বিরুদ্ধশক্তির সম্মুখীন হয় নি। আমরা আফিম উৎপাদকদের এ ধরনের মুক্ত বাজারের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে দেখি না। আফিম বিভাগের নিয়ন্ত্রণের উপরই তারা নির্ভরশীল ছিল। ঐ নিয়ন্ত্রণের অর্থ হলো, বিভাগ থেকে আগাম গ্রহণকারী কৃষকরা তার উপর অনধিকারচর্চা করতে পারতো না। তবে তারা আফিম উৎপাদন করা না করার বিষয়ে স্বাধীন ছিল। অপরদিকে নীলকরদের চেয়ে আফিম বিভাগ চাষীদের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অর্থাৎ অন্যান্য শস্যের লাভের বিষয়ে উদাসীন ছিল এবং চাষীদের স্বার্থ রক্ষার্থে আফিমের মূল্য প্রায়শ বাড়িয়ে দিত। অর্থাৎ মূল্যের বিষয়ে তারা অহেতুক কঠিন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে নি। যখন কৃষকরা দেখলো যে, আফিমের চাষ অলাভজনক, তখন তারা অন্যান্য অর্থকরী ফসলের চাষে মনোযোগ দিল এবং এতে তারা কখনো আফিম বিভাগ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয় নি ।

চাষীরা কোন কোন স্থানে অবৈধ উপায়ে আফিম চাষ ও বিক্রয় করতো। একচেটিয়া মূল্যের চেয়ে বেশি দামে গোপনীয়ভাবে পাইকারদের কাছে আফিম বিক্রি করা ছিল একচেটিয়া ব্যবস্থাকে পাশ কাটানোর একটি পদ্ধতি। বস্তুত কৃষকদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা ছিল আফিমের জন্য দাদন নিয়ে এর চাষের আইনগত ভিত্তি ঠিক রাখা এবং তার বিশেষ বিশেষ অংশ তাদের উৎপাদিত পণ্যের অবৈধ ব্যবসায় ব্যবহারের জন্য ব্যয় করা। ঐসব কাজের জন্য কঠিন শাস্তি দেয়া সত্ত্বেও তাদের এ পন্থা থেকে নিবৃত করা যায় নি। উদ্ধত কৃষকেরা আফিমচাষের জন্য নির্ধারিত উত্তম জমিসমূহের পরিবর্তে নিম্নমানের জমি ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। তাছাড়া তারা তাদের আয় বাড়ানোর জন্য আফিমের পাশাপাশি অন্যান্য অখ্যাত শস্যও চাষ করতে থাকে। এ সবই কৃষকদের বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন।

পাটের ক্ষেত্রে উক্ত দু'ধরনের প্রতিরোধমূলক তৎপরতা দেখা যায় নি। তার কারণ পাট সম্বন্ধে চাষীদের ভিন্ন ধারণা ছিল এবং পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থাদি ছিল। নীলচাষীরা নীলচাষব্যবস্থার বিরুদ্ধে একত্র হয়েছিল, কারণ তাদের কাছে ঐ ফসল চাষ করা ছাড়া কোন বিকল্প পথ ছিল না। কিন্তু আফিমচাষীরা বিভিন্ন কারণে আফিমচাষ করতো। তাদের এটি পছন্দনীয় না হলে তা চাষ না করার স্বাধীনতা ছিল। এই স্বাধীনতা

একচেটিয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। তারা তাদের উৎপাদিত ফসলের জন্য যে মূল্য পেতো সেটাই আসল ব্যাপার ছিল। তাদের প্রাত্যহিক প্রতিরোধমূলক তৎপরতা আফিমচাষকে আরো লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করার একটা ফন্দি ছিল। প্রত্যক্ষ কৌশলগুলো প্রকাশ্য এবং সমষ্টিগত প্রতিরোধ থেকে পৃথক ছিল এবং সদাসচেতন আফিম বিভাগ থেকে সেসব সুকৌশলে গোপন রাখা হতো।

অপরদিকে কৃষকগণ পাট সম্পর্কে উৎসাহী ও তৎপর ছিল। যদি পাটের মূল্য কম বিবেচিত হতো, তবে বিকল্প হিসেবে তারা ধান বা অন্য শস্য চাষে মনোনিবেশ করতো। আফিম ও নীলচাষের বিশেষত্বগুলো এখানে অনুপস্থিত। এই দু'টি ফসলের চাষ নির্ভরশীল ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবে আগামের উপর। আফিমের একচেটিয়া ব্যবসার জন্য আগামের প্রয়োজন ছিল। নীলকরদের সে ধরনের কোন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ছিল না। তবে ১৮৩৫-এর পরে নীলকরদের নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব লোপ পায়। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, 'বেঙ্গল ইনডিগো কোম্পানি' নামে এক বৃহৎ সংস্থার আবির্ভাব ঘটে ঐ সময়ে এবং উক্ত সংস্থা বিশাল নীল এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতো। উভয় প্রকার চাষের সাফল্য নির্ভর করতো শক্তিশালী সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর সহযোগিতার উপর।

পাটের বিষয়টি ছিল ভিন্ন ধরনের। পাটব্যবসায়ীদের কাছ থেকে গৃহীত আগামের সীমিত ভূমিকা ছিল। স্থানীয় ঋণদানকারী এবং অন্যান্য উৎস থেকে কৃষকেরা ঋণ নিত। তবে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ঋণদান সংস্থাগুলোর আগাম আর ঋণের মধ্যে পার্থক্য ছিল। অন্যদিকে একাধিক পাটক্রয়সংস্থা ও পাটদ্রব্য উৎপাদনকারী থাকায় এক্ষেত্রে আফিম বিভাগ এবং নীলকরদের মতো কৃষকের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা অত সহজ ছিল না। পাটক্রেতারা কোন কোন ক্ষেত্রে পাটকল অথবা কাঁচা পাট রপ্তানি সংস্থাগুলো থেকে আগাম নিয়ে পাটক্রয়ে বিনিয়োগ করতো। যাহোক, সংস্থাগুলো নিজেরাই অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে তথ্যবিনিময় না করে বিনিয়োগ করতো।

পাটকলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য ও দরকষাকষির ক্ষমতা থাকার ফলে কাঁচা পাটের চাহিদা ও মূল্যের উপর তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারতো। তবে অনুকূল পারিপার্শ্বিকতার অভাবে স্বাভাবিক কৌশলের দ্বারা ইপ্সিত ফললাভ অনেক সময় ব্যাহত হয়। কাঁচা পাট ক্রয়ের জন্য পাটের পাইকার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে অতিরিক্ত প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুন তারা নির্বিচারে যে ধরনের পাট পেতো তাই কিনতো। পাটরপ্তানিসংস্থাগুলো সরকারকে ফড়িয়াদের অসৎ পন্থা গ্রহণ বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু সরকার তাতে রাজি হয় নি, কারণ তার যুক্তি ছিল, যে পর্যন্ত পাটের পাইকারেরা পাটের বাজারে একে অপরের চেয়ে বেশি দাম দেবে সে পর্যন্ত আইনের খুব একটা কার্যকারিতা থাকবে না।

এটা স্বীকার্য যে, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয় নি। কাঠামোগত পরিবর্তনসাধন সম্ভব হলে ক্ষুদ্র কৃষিঅর্থনীতি হয়তো অন্তর্হিত হতো এবং কৃষিতে পুঁজিবাদী সম্পর্ক সৃষ্টি হতো। সাধারণভাবে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে প্রভাবশালী গ্রাম্য গোষ্ঠীসমূহ তাদের ক্ষমতার ভিত্তি শক্তিশালী ও সংগঠিত করে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে। গ্রাম্য ভূস্বামীগণ, যারা কৃষির সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার গতানুগতিক ধারা ছিল খাজনা ও আইনবহির্ভূত আবওয়াব আদায়ের মাধ্যমে কৃষকের কৃষিউদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করা। এই আত্মসাতের ফলে উৎপাদকদের উন্নতি সীমিত হয়ে পড়ে।

আফিম বিভাগ আফিমউৎপাদনকারীদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিল না এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করতো এবং তাদের উপর আফিম বণ্টনের দায়িত্ব অর্পণ করতো। খাতাদারদের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পছন্দ খামখেয়ালির ঊর্ধ্বে ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই গ্রামীণ ঋণদাতা। বাইরে থেকে ঋণের অর্থের যোগান তাদেরকে মক্কেলদের উপর গতানুগতিক নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। সুবিন্যস্ত শ্রেণীকাঠামোর অনুপস্থিতি, যেটা এরিক স্টোক্স বিভিন্ন অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর মিশ্র ভূমিকা থেকে উল্লেখ করেছেন, তা কদাচিৎ প্রমাণ করে যে, বিভিন্ন গোষ্ঠী কর্তৃক উৎপাদনের উৎসসমূহ অপরিবর্তিত রইলো।

অবশেষে এ কথা বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে, ঔপনিবেশিক বাংলায় কৃষকসমাজ কৃষির যে বাণিজ্যিকীকরণ আনয়ন করে এবং এর ফলস্বরূপ যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা মূল্যায়নের সত্যিকারের মাপকাঠি হলো কাঠামোগত পরিবর্তন।

১২

দেশী শিল্পের অবস্থা

ইফতিখার-উল-ব

আঠারো শতকের প্রথম পাদে বাংলা একটি সমৃদ্ধিশালী ও বর্ধিষ্ণু প্রদেশরূপে সুপরিচিত ছিল। এর বিপুল প্রাচুর্যের জন্যই সমসাময়িক সুধীজনেরা এই দেশটিকে 'রাজ্যসমূহের মধ্যে স্বর্গ', 'ভারতের স্বর্গ', 'স্বর্গরাজ্য' প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন।[১] এর সম্পদের আকর্ষণেই দূরদূরান্ত থেকে বিদেশী বণিকেরা বাংলার উপকূলে এসে ভিড় জমাতো। বিশেষকরে আসতো ইউরোপের বিভিন্ন জাতির বণিক। তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং অন্যান্য বর্ণনায় এ অঞ্চলের গৌরবগাথা অঙ্কিত রয়েছে। এমনও বলা হয়েছে, এটি এমন একটি আকর্ষণীয় স্থান, 'যেখানে প্রবেশের জন্য রয়েছে হাজারো উন্মুক্ত দরজা, কিন্তু ফিরে যাওয়ার জন্য একটিও নয়'।[২]

এ জাতির সম্পদ সৃষ্টির পিছনে রয়েছে এদেশের উর্বর মাটি, যেখানে ফলতো ধান, গম এবং অন্যান্য শস্য, যেমন আখ, তুলা, আফিম, নীল এবং বিভিন্ন রকমের তেল ও সবজি জাতীয় কৃষিপণ্য। অর্থনৈতিক দিক থেকে মূল্যবান অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে এখানে উৎপন্ন হতো প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা, মোম, লম্বা মরিচ, লবণ এবং শোরা। কিন্তু আর সবকিছুকে ছাড়িয়ে বাংলা হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন জাতের তুলা এবং সিল্কের তৈরি পণ্যের এক অসাধারণ ভাণ্ডার। এ পণ্য শুধু মহান মুগলদের সাম্রাজ্য হিন্দুস্থানেই ব্যবহৃত হতো না, এ পণ্য যেতো বৃটেনে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশেও। এই পণ্যগুলো শুধু যে

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. দেখুন, এ খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়।

২. Francois Bernier, *Travels in the Mughal Empire,* (Oxford 1914), Vol. I, 190.

চমৎকার মসৃণতা এবং মিহি কারুকাজের জন্যই খ্যাত ছিল তাই নয়, তুলনামূলকভাবে দামেও ছিল সস্তা। এভাবে প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলের বাংলার শিল্প-অর্থনীতিকে পৃথিবীর অন্য যেকোন দেশের অর্থনীতির সঙ্গে তুলনা করা যায়।

এই অধ্যায়ে ঔপনিবেশিক আমলে দেশীয় শিল্পের অবস্থা কেমন ছিল তা পর্যালোচনা করা হবে। শেষ পর্যন্ত এই শিল্প কেন ধ্বংস হলো তার কারণগুলিও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হবে। এ প্রসঙ্গে শৈল্পিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করার বা নিরুৎসাহিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যে ভূমিকা তাও পরীক্ষা করে দেখা হবে যাতে বৃটিশ শাসকদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল তা নিরূপণ করা যায়। তারা কি দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করার জন্য এবং এগুলোর উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল? শিল্পের এই যে ধ্বংস তা কি প্রাকৃতিক নিয়মে সংঘটিত হয়েছে নাকি তা করা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে? শিল্পের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে যে অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুসৃত হয়েছিল, তাও পরীক্ষা করে দেখা হবে যেন স্থানীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্পগুলোর উপর এধরনের নীতিমালার সার্বিক প্রভাব নিরূপণ করা যায়।

১.০ তাঁতশিল্প : সুতীবস্ত্র

বাংলার সব রকমের হস্তশিল্পের মধ্যে কার্পাসশিল্প ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর ইতিহাস অন্ততপক্ষে দু'হাজার বছর প্রাচীন। রোমান সাম্রাজ্যের আমলে সবচাইতে বিত্তশালী রোমান মহিলাদের কাছে ভারতীয় মসলিন ছিল গভীর অনুরাগের বস্তু। দ্বিতীয় শতকের প্রথমদিকের রোমান লেখক প্লীনি অভিযোগ করেন যে, এমন কোন বছর যায় না যখন ভারত এই সাম্রাজ্য থেকে পাঁচশত পঞ্চাশ মিলিয়ন 'সেস্টারসেজ' (Sesterces) শুষে নেয় না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের হিসাব অনুযায়ী এ অঙ্কের পরিমাণ দাঁড়ায় বছরে ১,৪০০,০০০ পাউণ্ড।[৩] কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* 'ভঙ্গ' বা পূর্ববঙ্গের মিহি কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃস্টীয় প্রথম শতকের নাম-না-জানা লেখকের *Peripuss of the Erythraean Sea* গ্রন্থে গাঙ্গিটিকি (Gangitiki) নামের যে মসলিনের উল্লেখ পাওয়া যায় তার উৎস সম্ভবত পূর্ববঙ্গে। নবম শতকে সোলায়মান নামের যে আরব পরিব্রাজক ভারত ভ্রমণে আসেন তিনিও সম্ভবত পূর্ববঙ্গের মিহি মসলিনের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, "রাহমী রাজ্যে (যাকে পূর্ববঙ্গ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে) যে সুতীবস্ত্র উৎপন্ন হয় তা এত মিহি এবং সূক্ষ্ম যে অনায়াসে একটি পুরাদস্তুর পরিধেয় সিগনেট রিং-এর মধ্যে তা প্রবিষ্ট করানো যায়।" মার্কো পোলোর সফরকালে (১২৯৪ থেকে ১২৯৫ সাল) ভারতে তুলা বয়নের প্রধান কেন্দ্র ছিল গুজরাট, ক্যাম্বে, তেলেঙ্গানা, মালাবার এবং বাংলা। তিন শতাব্দী পর

৩. S. N. Gupta, *British, The Magnificent Exploiters of India,* (New Delhi 1979), 7-9. The estimate obviously included silk fabrics which were so eagerly sought after by Roman ladies.

(১৫৮৩) ভারত ভ্রমণকারী র‍্যালফ্ ফিৎস (Ralph Fitch)-এর মতে, ঢাকা থেকে দক্ষিণপূর্ব দিকে তেরো মাইল দূরে অবস্থিত সোনারগাঁও ছিল "এমন একটি শহর যেখানে সমগ্র ভারতের মধ্যে সবচেয়ে মিহি কাপড় তৈরি করা হতো।" প্রায় একই সময়ে আবুল ফজলও লিখেন, "সরকার সোনারগাঁও-এ এমন এক জাতের মসলিন উৎপন্ন হয় যা অত্যন্ত মিহি এবং যার পরিমাণও বিপুল।"[৪] বার্নিয়ার ও ট্যাভার্নিয়ারের মতো পরবর্তীকালের ভ্রমণকারীগণও বাংলায় তৈরি সস্তা, হালকা, জমকালো এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বাংলায় উৎপন্ন তুলাজাত দ্রব্যের সৌন্দর্য এবং মসৃণতার জন্য সহজেই তা ইউরোপের ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সতেরো শতকের শেষেরদিকে বাংলায় ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে, যা তখন 'ফ্যাক্টরি' নামে পরিচিত ছিল।

১.১ তাঁত সংগঠন

বাংলায় বৃটিশ নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি সুদৃঢ় হবার আগে তুলাশিল্পের সংগঠন ছিল পুরোপুরি কুটিরভিত্তিক। তখন ক্ষুদ্র এবং স্বাধীন উৎপাদনকারীগণ নিজ পরিবারের সদস্যদের শ্রমে উৎপাদন চালিয়ে যেতো, অবশ্য মাঝে মাঝে মজুরির বিনিময়ে শ্রমিকও নিয়োগ করতো। গোড়াতে তেমন কোন শ্রমবিভাজন ছিল না এবং প্রধান উৎপাদনকারীকে লগ্নিকারী এবং ব্যবসায়ী উভয় ভূমিকাই পালন করতে হতো। অন্যদিকে, ঘরোয়া ব্যবস্থাপনায় প্রধান কারুশিল্পী মহাজনদের মূলধনের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই মহাজনেরা প্রায়ই ঋণদান এবং কাপড়ের ব্যবসাকে সংযুক্ত করে নিত। মহাজনেরা মধ্যস্বত্বভোগীর মাধ্যমে টাকা আদানপ্রদান করতো। মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের বলা হতো পাইকার। পাইকারদের অধস্তন এক ধরনের কর্মচারী ছিল, যাদের বলা হতো 'মুকিম'। এরা ঘুরে ঘুরে উৎপাদিত বস্তুর গুণ এবং মানের তদারকি করতো। ইউরোপীয়দের ভারতে আগমনের পর কুটিরভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থা আরো প্রসারলাভ করে। সেসময় প্রায় সকল ভারতীয় কারুশিল্পীরই মূলধনের প্রচণ্ড অভাব ছিল। তাই যথেষ্ট পরিমাণ পণ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদনকারীদের অগ্রিম টাকা প্রদান না করে বিদেশী ব্যবসায়ীদের গত্যন্তর ছিল না।[৫]

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দু'টি ভিন্ন পদ্ধতিতে তাঁতীদের অগ্রিম প্রদান করতো। এ দু'টি পদ্ধতি ছিল চুক্তি এবং এজেন্সি ব্যবস্থা। প্রথমোক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোম্পানি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতো। এই ব্যবসায়ীদের বলা হতো 'দাদনি' ব্যবসায়ী। এরা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করতো। এরা আবার

৪. J. C. Sinha, "The Dacca Muslin Industry", *The Modern Review*, April 1925, 400-01.

৫. It was not the same as the 'putting out' system of Europe under which the merchant advanced to weavers not liquid capital but the actual raw materials.

তাঁতীদের সঙ্গেও চুক্তি সম্পাদন করতো এবং তাদের অগ্রিম বা দাদন প্রদান করতো।[৬] চুক্তি সম্পাদনের সময় দাদনি ব্যবসায়ীরা কাপড়ের মোট মূল্যের অর্ধেক, এমনকি চার ভাগের তিন ভাগ টাকাও পেতো। তাই তারা আবার তাঁতীদের প্রয়োজনমাফিক দাদন দিতে পারতো। তাদের কাজের জন্য দালালদের মূল্যের শতকরা ৪.৫ থেকে ৮ ভাগ পর্যন্ত কমিশন দেয়া হতো। আর খরচপত্র মেটানোর জন্য দেয়া হতো অতিরিক্তি সাড়ে সাত ভাগ।[৭] দাদনি ব্যবসায়ীরা প্রায়ই নিম্নমানের পণ্য বেশি দামে সরবরাহ করছে বলে অভিযোগ আসতো।[৮] এই প্রেক্ষিতে ১৭৫৩ সালে চুক্তিব্যবস্থা রহিত করা হয়। কিন্তু আসলে ইংরেজরা কখনো একটা জিনিসের ন্যায্যমূল্য দিত না। আবার বায়নাকৃত পণ্য নেবার বেলায়ও এরা ছিল মাত্রাতিরিক্ত খুঁতখুঁতে। এজন্য "১৭৪০ সালের পর থেকে দাদনি ব্যবসায়ীরা ইংরেজ কোম্পানির পক্ষে ব্যবসা করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বরং ফরাসী ও ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক শর্ত তাদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ঠেকে। তখন অনেক ক্ষেত্রে তারা ইংরেজ কোম্পানির আরোপিত শর্ত মেনে নিতে অসম্মতি প্রকাশ করে।"[৯]

১৭৫৩ সালে যে নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় তার নাম এজেন্সি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় কোম্পানির ইউরোপীয় কর্মকর্তারা কোম্পানির নিজস্ব তহবিল থেকে তাঁতীদের অগ্রিম প্রদান করতো। অন্যভাবে বলতে গেলে, কম দামে সবচেয়ে বেশি পণ্য সংগ্রহের স্বার্থে কোম্পানি দ্রব্য সরবরাহের আসল উৎসের কাছাকাছি যেতে চায়। তাঁতীদের সাথে চুক্তির শর্তগুলো যেন যথাযথভাবে পালিত হয় সেটা তদারক করার জন্য তারা ফ্যাক্টরির অধীনে প্রত্যেক 'আড়ং'-এ বেশ কিছু ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগ করে। এসব কর্মচারী 'গোমস্তা', 'সেরেস্তাদার', 'মুহুরি', 'মুকিম', 'তাগিদগির' প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল; কখনো কখনো অন্যান্য কর্মচারীও নিয়োগ করা হতো। তাদেরকে অভিহিত করা হতো 'আমিন', 'নায়েব-গোমস্তা', 'নায়েব' এবং 'তহবিলদার', 'জমাদার', 'বরকন্দাজ' ও 'পিয়ন' নামে। গোমস্তা ছিল 'আড়ং'-এর প্রধান কর্মকর্তা। তার মাধ্যমেই অগ্রিম প্রদান এবং সংগ্রহের কাজ করা হতো। "গোমস্তাদের মাধ্যমেই প্রায় ফ্যাক্টরির সব কেনাকাটা পরিচালিত হতো। ... এসব কর্মচারী নিয়োগের শর্ত দ্বারাই কোম্পানির প্রতি তাদের আনুগত্য নিশ্চিত করা হতো। তারাই ছিল কোম্পানির কর্তৃত্বের প্রতিভূ ... ।"[১০] দাদনি

৬. J. C. Sinha, *Economic Annals of Bengal,* (London 1927), 79.

৭. Anisuzzaman, *Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India Office Library and Records,* (London1981), 5

৮. J. C Sinha, *Economic Annals,* 80.

৯. D B. Mitra, *The Cotton Weavers of Bengal,* 1757-1833, (Calcutta 1978), 46-47.

১০. Hameeda Hossain, "The Company's Controls Over Textile Production: Implications of its Regal Framework for Weavers, 1757-1800", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* XXVIII: 1. (June 1983), 115.

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে তাঁতীরা যে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, তা এভাবে গোমস্তাদের সঙ্গে কোম্পানির একচেটিয়া সম্পর্কে পরিণত হয়।[১১]

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এককালের কর্মকর্তা উইলিয়ম বোল্টস তাঁর *Considerations on Indian Affairs* গ্রন্থে গোমস্তারা কিভাবে কোম্পানির পণ্য সংগ্রহ করতো তার এক প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছেন। এ গ্রন্থ থেকে গোমস্তাদের আচরণ সম্পর্কেও অনেক তথ্য জানা যায়। তিনি লিখেছেন :

> সে (গোমস্তা) তাদের (তাঁতীদের) দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং মূল্যে একটি নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য সরবরাহের শর্তে বন্ড সই করিয়ে নিত এবং তাদের প্রাপ্য টাকার একটা অংশ অগ্রিম প্রদান করতো। দরিদ্র হতভাগ্য তাঁতীদের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতির তারা পরোয়া করতো না। কোম্পানির ব্যবসায়ে নিয়োজিত হবার পর গোমস্তারা প্রায়শই তাঁতীদের দিয়ে যা খুশি তা সই করিয়ে নিত; এবং তাঁতীরা প্রস্তাবিত শর্তে আগাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তা তাদের কোমরে বেঁধে দেয়া হতো এবং বেত্রাঘাত করে তাদের বিদায় করা হতো। ···এসব তাঁতীদের অনেকের নামই গোমস্তারা সাধারণত কোম্পানির খাতায় রেজিষ্ট্রি করে রাখতো এবং তাদেরকে অন্য কারো অধীনে কাজ করতে দেয়া হতো না। বরং ক্রীতদাসের মতো তাদেরকে একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে হস্তান্তর করা হতো। এরা পরবর্তী প্রত্যেক গোমস্তার অত্যাচার এবং নষ্টামির শিকার হতো। বস্ত্র তৈরি হবার পর তা সংগ্রহ করে গুদামঘরে রাখা হতো এবং সংশ্লিষ্ট তাঁতীর নাম লিখে তা চিহ্নিত করে রাখা হতো। পরে গোমস্তা সুবিধামতো 'খাতা'র আয়োজন করে প্রতিটি বস্ত্রখণ্ডের শ্রেণীবিভাগ করে মূল্য নির্ধারণ করতো। এ কাজে যাচনদার নামে কোম্পানির একজন কর্মচারী নিয়োজিত থাকতো। এ বিভাগে যে কি পরিমাণ হঠকারিতার আশ্রয় নেয়া হতো তা কল্পনাতীত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভীষণভাবে ঠকতো গরিব তাঁতীরা। কারণ কোম্পানির গোমস্তারা এবং তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে যাচনদারেরা পণ্যের যে দাম নির্ধারণ করতো তা সর্বত্রই খোলা বাজারের চেয়ে অন্তত পক্ষে শতকরা পনেরো ভাগ এবং কোথাও কোথাও শতকরা চল্লিশ ভাগ পর্যন্ত কম ছিল। এজন্য ন্যায্যমূল্য প্রত্যাশী তাঁতীরা গোপনে অন্যের কাছে তাদের উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রয় করার চেষ্টা করতো ··· তাই কোম্পানির গোমস্তারা তাঁতীদের পাহারা দেয়ার জন্য তাদের পিয়ন নিয়োজিত করতো এবং প্রায়শই বুননের শেষ পর্যায়ে তাঁত থেকে বস্ত্র কেটে নিত।[১২]

বোল্টের এই বর্ণনার মধ্যে কোন আতিশয্য নেই। সমসাময়িক দলিলপত্রে কোম্পানির ইউরোপীয় প্রভুদের যোগসাজশে স্থানীয়-কর্মচারীরা যে শঠতা ও দুর্নীতির আশ্রয় নিত তার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে।[১৩]

১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা করার জন্য ১৭৭৩ সালের এপ্রিলে ইংরেজ কোম্পানি হুকুম জারি করে যে, প্রচলিত বাজারমূল্যে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য ক্রয় করতে হবে। এ মুক্ত বাজারনীতির কারণ এই যে, তখন

১১. ঐ।

১২. William Bolts, *Considerations on India Affairs*, (London 1772), 193.

১৩. J. C. Sinha, *Economic Annals*, 83-84.

উৎপাদন কমে গিয়েছিল অথচ বাজারে চাহিদা ছিল যথেষ্ট। দু'বছর পর কোম্পানি আবার চুক্তিব্যবস্থায় ফিরে আসে।[১৪] কিন্তু মূলধন সংগ্রহের এই চুক্তি দাদনি বণিকদের সঙ্গে না করে করা হতো ফ্যাক্টরির প্রধান ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে। দুর্ভাগ্যবশত, এই পরিবর্তনগুলি কোম্পানির জন্য লাভজনক হয় নি। মুক্ত বাজারব্যবস্থায় একদিকে যেমন মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, অন্যদিকে পণ্যের গুণগত মানেও দেখা দেয় অবনতি। যেসব তাঁতী কোম্পানির কাছে দায়বদ্ধ ছিল, তারা এক সময় ওলন্দাজ ও ফরাসী কোম্পানি এবং বেসরকারি ব্যবসায়ীদের কাছে কোম্পানির স্থিরীকৃত মূল্যের চেয়ে শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ বেশি দামে গোপনে পণ্য বিক্রয় করতে শুরু করে। নিজের মূলধন উদ্ধার করার জন্য কোম্পানি ১৭৭০ ও ১৭৮০ সালে এক জবরদস্তিমূলক আইন প্রবর্তন করে। এর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল পণ্যের গোপন বিক্রয় বন্ধ করা। চুক্তির শর্ত পালন না করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। ১৭৯৩ সালের কর্নওয়ালিস কোডে এসমস্ত আইনের চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়, এবং এর দ্বারা বয়নশিল্পে কোম্পানির ব্যবসার শর্তাদিও নিরূপিত হয়। এসব অনুশাসন জারি করার ফলে তাঁতীদের কর্মোদ্যোগ খুবই বাধাপ্রাপ্ত হয়, স্বাধীন উৎপাদক রূপান্তরিত হয় দিনমজুরে।[১৫]

এদিকে কোম্পানির এজেন্টদের অত্যাচার-উৎপীড়ন শিল্পের এতটা ক্ষতি করে যে, অনেক তাঁতী তাঁতের পেশা ছেড়ে কম ঝামেলার পেশার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এমনকি ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের আগেও তাঁতীদের ব্যাপক ঘাটতি দেখা দেয়। এরপর সে ঘাটতি আরো বেড়ে যায়। "অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, তাঁতীরা হয় অন্যত্র পালিয়ে বাঁচে নয় বন্দী হয়। পেশাত্যাগকারীদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য···। এরা তাঁত বয়ন ছেড়ে দিনমজুরের পেশা গ্রহণ করে। কেউ কেউ মাছ ধরার বা অন্য কোন পেশা নেয়, আর কেউ কেউ পলাতক অবস্থায় মারা যায়।"[১৬]

কোম্পানি অবশ্য প্রদেশের তাঁতের পেশায় নিয়োজিত জনগণের প্রায় তিন ভাগের একভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো।[১৭] অল্প ক'জন ব্যতীত অন্যান্য বয়নশিল্পীরা মূলধন এবং পণ্য বাজারজাত করার ব্যাপারে স্থানীয় মহাজনদের উপর নির্ভরশীল ছিল। অবশেষে ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনের (Charter Act) মাধ্যমে কোম্পানি তার বস্ত্রব্যবসা গুটিয়ে ফেলে (বাস্তবে ১৮২৫ সাল নাগাদ ফ্যাক্টরিগুলিতে কাপড় তৈরির ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়)। যেসব তাঁতী এরপরও এই পেশা চালিয়ে যায়, তারা স্থানীয় মহাজনদের নিয়ন্ত্রণাধীনে এসে পড়ে। কারুশিল্পীদের চরম দারিদ্র্যের জন্যই এধরনের নির্ভরশীলতার সম্পর্ক দেখা দেয়। কাজ

১৪. In 1787, the agency system was reintroduced and commercial residents were appointed to the factories. This was done to stop the corrupt practices of contractors.

১৫. Hameeda Hossain, "Textile Production", 121.

১৬. Anisuzzaman, *Factory Correspondence*, 13.

১৭. Mitra, *Cotton Weavers*, 107.

চালিয়ে যাওয়ার মতো কাঁচামাল (যেমন সুতা) কেনার জন্য একজন কারুশিল্পীর যে শুধু সচল মূলধনের প্রয়োজন ছিল তা নয়, সংরক্ষিত মূলধনেরও প্রয়োজন ছিল। উৎপাদিত পণ্য বাজারের অভাবে প্রায়ই অবিক্রীত পড়ে থাকতো, বিশেষকরে যখন চাহিদা ছিল কম। অথচ এসময়েও তাঁতীকে কাজে লিপ্ত থাকার জন্য সুতা ক্রয় করতে হতো। একবার কোন হস্তচালিত তাঁতী মহাজনের কাছে ঋণী হয়ে পড়লে তার পক্ষে আর ঋণের দায় থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন ছিল। মহাজনেরাও তাঁতীদেরকে ঋণের ক্ষেত্রে বেশ উৎসাহ দিত। তাঁতী কিছু টাকার জন্য ঋণগ্রস্ত থাকলে যেসব মাসে খেলাপী হয়ে পড়তো সেসব মাসে তা মহাজনের গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতো। এসব চুক্তির ক্ষেত্রে প্রভাবশালী অংশীদার হিসেবে স্বাভাবিকভাবে মহাজনেরা তাদের নিজেদের অনুকূলে চুক্তির শর্তাদি নির্ধারণ করতো। আর আসল কর্মী পেতো ভরণ-পোষণের জন্য কিছু অর্থ। কেনাবেচা থেকে যে ব্যবসায়িক লাভ হতো মহাজনেরা তার পুরোটাই নিজেরা গ্রহণ করতো। মহাজনেরা হস্তচালিত তাঁতীদেরকে সমবায়ভিত্তিতে পরিচালনার সব প্রচেষ্টায় প্রবল বাধা দেয়। এভাবে বৃটিশ শাসনের শেষ পর্যন্ত এ শিল্প সাধারণভাবে মহাজনের খপ্পরেই থেকে যায়।

১.২ তাঁতজাত দ্রব্য

বাংলার হস্তচালিত তাঁতভিত্তিক সুতীবস্ত্র শিল্প ছিল সারা দেশে বিস্তৃত। রবার্ট ওরমে (Robert Orme) এসম্পর্কে বলেন :

> করমন্ডল উপকূলে বা বাংলায় 'সদর' রাস্তা বা কোন প্রধান শহর থেকে কিছু দূরে অবস্থিত এমন কোন গ্রাম পাওয়া কঠিন ছিল, যেখানে প্রত্যেক নারী, পুরুষ এবং বালক-বালিকা একখণ্ড কাপড় তৈরিতে নিয়োজিত নেই··· সমগ্র প্রদেশগুলোর বিরাট অংশ এই একটি উৎপাদনে নিয়োজিত··· লিনেন (তুলা) থেকে উৎপাদনের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে পাওয়া যাবে হিন্দুস্থানের জনগণের অর্ধাংশের জীবনের আলেখ্য।[১৮]

ওরমের এই মন্তব্যে কোন অতিরঞ্জন নেই। ১৭৭৬ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, শুধু ঢাকা জেলাতেই বস্ত্রবয়নশিল্পে জড়িত ছিল ১,৪৬,৭৫১ জন লোক। এদের মধ্যে ২৫,২০০ জন ছিল তাঁতী, বাকি ৮০,০০০ জন সুতা কাটার লোক। ১৮২৫ সালে কোম্পানির প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার ফলে বেকার হয়ে যাওয়া তাঁতী, তুলা উৎপাদক, তন্তুবায়, ড্রেসার এবং নকশাকারের সংখ্যা বোর্ড অব ট্রেডের হিসাব মতে দাঁড়ায় ৫০০,০০০।[১৯] যেহেতু ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসলে প্রদেশের তাঁতীকুলের মাত্র শতকরা ৩৩ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো, ১৮২৫ সাল নাগাদ এ অঞ্চলের ১.৫ মিলিয়ন লোক

১৮. Robert Orme, *Historical Fragments of the Mogul Empire*, (London 1805), 409.

১৯. Mitra, *Cotton Weavers*, 169.

সুতীবস্ত্র উৎপাদনে সরাসরি নিয়োজিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। এই শিল্পের এত প্রসারের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ওরমে বলেছেন যে, শারীরিক শক্তি কম হওয়ার ফলে এখানকার অধিবাসীগণ তাঁতবোনা অধিক পছন্দ করতো। কাজটি বসে করা যেতো, তাই এতে শারীরিক শক্তির প্রয়োজন সবচেয়ে কম হতো।[২০] কে. এন. চৌধুরী এর সম্ভাব্য অন্য কারণের কথাও বলেছেন। তাঁর মতে, এই শিল্পের প্রসারের সঙ্গে জনগণের বিশেষ কোন জেনেটিক (genetic) বৈশিষ্ট্যের যোগ ছিল না, বরং সমগ্র ভারতে বয়নশিল্প সংগঠিত হয়েছিল বর্ণভেদের উপর ভিত্তি করে।[২১]

বয়নশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটলেও স্থানীয় বাজারের জন্য উৎপাদিত বস্ত্র এবং বৈদেশিক ও আন্তঃআঞ্চলিক ব্যবসার জন্য উৎপাদিত বস্ত্রের মধ্যে গুণগত পার্থক্য ছিল। শুধুমাত্র স্থানীয় ব্যবহারের জন্য উৎপাদিত বস্ত্র ছিল মোটা এবং দামে সস্তা। কাপড়ের মান ও মূল্য জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। কিন্তু রপ্তানিযোগ্য পণ্য তৈরি করা হতো খুব যত্নের সঙ্গে, ব্যবসায়ীদের নমুনা অনুসারে। তবে রপ্তানির জন্য প্রস্তুত বস্ত্রের মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যেতো। মালদহ, হরিপল (রাজশাহী জেলায় অবস্থিত), শ্রীপুর (রাজশাহী জেলায় অবস্থিত), বলিকুশী, কাগমারী (ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি কোসা, এলাচি, হাম্মাম চৌতাহ, তুতালী, শশী, শিরসাকার, বাফতা, সেনো, মলমল এবং তানজিব উৎপাদনের জন্য খ্যাতি অর্জন করে। বর্ধমান, খীরপয় (মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত), রাধানগর (মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত), দেয়ানগঞ্জ এবং বলীগিসাগর শহর থেকে ইংরেজ কোম্পানির জন্য সরবরাহ হতো দরিয়া, তরিন্দম, কাটানী, শশী, সুতীরুমাল, গুড়া, শিস্টেরসায়, সন্তান কুপি, চরিধারী চিলা, কুস্তা, দুসুতা প্রভৃতি নামের বস্ত্র। বীরভূমের এলামবাজার থেকে ইউরোপে সরবরাহ করা হতো বিপুল পরিমাণ গুড়া, নদীয়া জেলার শান্তিপুর এবং বুরন থেকে সরবরাহ করা হতো মলমল এবং কোসা। মেদিনীপুরের খ্যাতি ছিল মসলিন এবং রঙিন বস্ত্রসম্ভারের জন্য। রংপুরের আড়ংসমূহ, ঘোড়াঘাট (দিনাজপুরে অবস্থিত) এবং সন্তোষ বুদৌল (দিনাজপুরে অবস্থিত) থেকে ইংরেজ কোম্পানির জন্য সরবরাহ করা হতো সেনো মলমল এবং তানজিব।[২২] কিন্তু সাদাসিধে বস্ত্র উৎপাদন এবং জামদানী, নামক নকশামণ্ডিত মসলিন তৈরিতে ঢাকার অবস্থান ছিল নিঃসন্দেহে সবার উপরে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য ঢাকা ফ্যাক্টরির আড়ং-এ আঠারো শতকের শেষ দশকে নিম্নলিখিত ধরনের মসলিন উৎপাদিত হতো :

---

২০. Orme, *Historical Fragments of the Mogul Empire,* (London 1805). 409.

২১. "The Structure of Indian Textile Industry in the Seventeenth and Eighteenth Centuries", *The Indian Economic and Social History Review,* Vol xi, Nos. 2-3, June-September, 1974, 131.

২২. Mitra, *Cotton Weavers,* 151-52

চাঁদপুর : আদি, কোসা, লাক্কারিখ এবং নয়নসুখ।

ঢাকা : আক্রয়ান, আদি, বুটা, কোসিদা, চীকন, ডুরে, জামদানী, জরি ও সাদা বস্ত্র।

ধামরাই : বুটা, কোসিদা, তরিন্দম ও সাদা বস্ত্র।

জঙ্গলবাড়ী : আদি, বাফতা, বুটা, কোসা, শিরকার গুজী, কোরা, নয়নসুখ, সাদাসিধে বস্ত্র, সমুদ্রলহর সুতা, শিরহাদকোনা, শির আলী ও তানজিব।

নারায়ণপুর : আদি, মামুদী, মামুদিয়াতি, মুগাদিয়া, নয়নসুখ, শিরবন্দ , শিরবতী ও তানজিব।

সোনারগাঁও : আদি, আলাবলি, বুনীজি, কোসা, গুজী, মলমল, সাদাসিধে বস্ত্র, সমুদ্রলহর সুতা, শিরবন্দ ও শিরবতী।

শ্রীরামপুর : কোসা, দিমতি, হাম্মাম, ইজরি ও লং ক্লথ।

তিতবাধী : তানজিব।[২৩]

শুধুমাত্র ঢাকার আড়ংগুলি থেকেই ১৭৪৭ সালে কার্পাসের তৈরি যেসব পণ্য রপ্তানি হয়, তার বার্ষিক মূল্য ছিল সাড়ে আটাশ লক্ষ টাকা।[২৪] ১৭৮৭ সালে এই অঙ্ক বেড়ে হয় ৫০ লক্ষ টাকা।[২৫] কিন্তু জন টেইলরের মতে, ঢাকা কাস্টমস হাউজ বার্ষিক ৫০ বা ৬০ লক্ষ টাকার যে হিসাব দেখিয়েছে, তার মধ্যে লক্ষ্মীপুর, হুরীপুর এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি নিকটবর্তী অঞ্চলের পণ্যের মূল্যও অন্তভুর্ক্ত ছিল। এসব পণ্যের রপ্তানির চালান অবশ্যই ঢাকা কাস্টমস হাউজ থেকেই নিতে হতো। তাঁর মতে, ১৭৯০ সালের দিকে ঢাকা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে বার্ষিক যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদিত হতো, তার মূল্য ছিল প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা। পরবর্তী পৃষ্ঠায় এর একটা সারণি দেয়া হলো[২৬]:

কোন কোন উৎপাদন-অঞ্চলে তাঁতীদের বৈশিষ্ট্য এবং বেশি সংখ্যায় অবস্থানের কারণ নির্ভর করতো অনেকগুলো অবস্থার উপর। এর মধ্যে অন্যতম কাঁচামালের সহজ প্রাপ্তি। এই বিষয়টিই আবার নির্ভরশীল ছিল বিশেষ জলবায়ু এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের উপর। অন্য দু'টি কারণ হলো রাজদরবার ও ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং পরিবহনের সুবিধা (পরিবহনের সুবিধা বলতে বোঝানো হয়েছে বাজারের সুবিধা এবং পরিবহন খাতের স্বল্পব্যয়)।

২৩. Anisuzzaman, *Factory Correspondence*, 10.

২৪. দেখুন, John Taylor's Report in Abdul Karim, "An Account of the District of Dacca, Dated 1800", *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, VII· 2 (1962), 307-09.

২৫. Anisuzzaman, *Factory Correspondence*, 4.

২৬. John Taylor's Report in Abdul Karim, "Dacca" 331

আড়ং-এর নাম	উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (আর্কট টাকায়)
ঢাকা	৪,৫০,০০০
সোনারগাঁও	৩,৫০,০০০
নারায়ণপুর	২,০০,০০০
জঙ্গলবাড়ী-বাজিতপুর	৪,৫০,০০০
চাঁদপুর	৫০,০০০
শ্রীরামপুর	৫০,০০০
ধামরাই	২,৫০,০০০
তিতবাধী	১,৫০,০০০
	মোট ১৯,৫০,০০০
স্থানীয়দের ব্যবহারের জন্য নিম্নমানের বাদ দিয়ে	৪,৫০,০০০
হিসাবে সম্ভাব্য কম পড়ার বিষয়টি ধরে ঃ	২,০০,০০০
মোট টাকার অঙ্ক	২৬,০০,০০০

বস্ত্রবয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল

বাংলায় তখন বস্ত্র তৈরির ভালো কাঁচামাল পাওয়া যেতো। এসব কাঁচামাল উৎপন্ন হতো বিশেষ উৎপাদনকেন্দ্রসমূহের বেশ কাছাকাছি এলাকায়। ঢাকায় ফোটি কার্পাস থেকে প্রায় সব ধরনের মিহি মসলিন উৎপাদিত হতো।[২৭] এছাড়া ঢাকায় আরও উৎপন্ন হতো বৈরাতি কার্পাস। এভাবে যে স্থানীয় তুলা উৎপন্ন হতো তা ছিল বিশ্বের যেকোন অঞ্চলের তুলা থেকে উৎকৃষ্টতর। এই তুলার আঁশ ছিল অন্য যেকোন ভারতীয় আঁশের চেয়ে মিহি। পাকানোর সময় এটাকে বহুবার ঘোরানো ও প্যাঁচানো যেতো। ঢাকার তুলার আর একটা বিশেষ গুণ ছিল এই যে, শুভ্র (bleach) করার পর এই তুলা থেকে উৎপন্ন সুতা ফুলে যেতো না।[২৮] ঢাকার কার্পাসের এই শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জন টেইলর বলেন যে, এটি উৎপাদিত হতো সমুদ্রের খুব কাছেই। সমুদ্রের জল জোয়ারের সময় মেঘনার জলের সঙ্গে মিশতো, কারণ বছরের তিন মাস এই জলে দেশের এই অংশ প্লাবিত হতো। ভাটার সময়

২৭. J. C Sinha, "Dacca Muslin Industry", 402.

২৮. ঐ।

জল থেকে বালি, লবণের কণা ইত্যাদির তলানি পড়তো। এর ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি খুব বেড়ে যেতো। এই মাটির রং ছিল হালকা বাদামী। এটাও ধরে নেয়া যেতে পারে যে, কার্পাস গাছের পুষ্টিতে সমুদ্রের সতেজ বাতাসের শুভ প্রভাব পড়তো।[২৯] ঢাকা ছাড়া পাটনাতে পাঁচ রকম তুলা উৎপন্ন হতো। মালদহ, বর্ধমান এবং রাধানগরে উৎপন্ন হতো তিন রকম তুলা। হুরীপলে উৎপন্ন হতো দুই রকম তুলা। মেদিনীপুর, শান্তিপুর এবং চট্টগ্রামেও তুলা উৎপন্ন হতো।[৩০]

উৎপাদনের এই বিশেষ কেন্দ্রগুলি সারাদেশে ছড়ানো রাজদরবার ও উপরাজ-দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে গড়ে উঠতে পারতো না। প্রতিটি দরবারই সাধারণত একদল তাঁতী পুষতো। বাংলার হিন্দু রাজন্যবর্গ এবং পরবর্তী সময়ে মুগল সম্রাট ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকজন অধিকতর মিহি এবং মূল্যবান বস্তুর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মুগলদের রাজত্বকালে রাজপরিবারে ব্যবহারের জন্য বস্ত্র উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নির্মিত কারখানাকে বলা হতো মালবুস খাস কুঠি। ঢাকা, সোনারগাঁও ও জঙ্গলবাড়ীতে এগুলি অবস্থিত ছিল এবং এগুলির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন দারোগা। দারোগাদের তাৎক্ষণিক কর্তব্য ছিল সকল বস্ত্র উৎপাদনপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা। ঢাকা থেকে মুর্শিদকুলি খান কর্তৃক সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে পাঠানো মালবুস খাসের বার্ষিক মূল্যই ছিল প্রায় এক লক্ষ আর্কট টাকা।[৩১] মুর্শিদাবাদের নবাবের জন্য এবং জগৎশেঠের জন্য পাঠানো বস্ত্রের আড়ংমূল্য ছিল যথাক্রমে তিন লক্ষ আর্কট টাকা এবং দেড় লক্ষ রুপী।[৩২] তাঁতীরা এসময় নিয়মিত বস্ত্রবুননে নিয়োজিত ছিল। ফলে তাদের দক্ষতা বেশ বেড়ে যায়। দারোগাদের এবং তাদের লোকদের অবিরাম খবরদারি, তাদের কাছে প্রত্যাশিত কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি হলে তার জন্য শাস্তির ভয় নিশ্চয়ই বস্ত্র উৎপাদনের সময়ে কোন প্রকার অযৌক্তিক পন্থা অবলম্বন করতে তাঁতীদের কার্যকরভাবে নিবৃত্ত করেছিল।[৩৩] তাছাড়া সুতা কাটার সবচেয়ে দক্ষ শ্রমিকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে এসব বস্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সুতা কাটায় নিয়োজিত করা হয়। সব সময় এরকম মিহি সুতা কাটার অভ্যাস, সুতা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট করে কাটার প্রচ্ছন্ন দায় এবং এ ধরনের কাজে নিয়োজিত লোকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রতিযোগিতার মনোভাব সুতাকে গুণগত দিক থেকে যতোখানি সম্ভব উৎকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ছিল।[৩৪] পরবর্তীকালে ইউরোপীয় ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলো এসব

২৯. John Taylor's Report in Abdul Karim, "Dacca", 313-14.

৩০. Mitra, *Cotton Weavers*, 156-57.

৩১. Taylor's Report in Abdul Karim, "Dacca", 303-05.

৩২. ঐ, 307-09.

৩৩. ঐ, 321.

৩৪. ঐ, 319

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বুননকেন্দ্রের কোন কোনটিতে আবাসিক প্রতিনিধির অবস্থানের ব্যবস্থা করে। তাছাড়া এরা ইউরোপীয় বাজারে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যাওয়া বাংলার এই সুবিখ্যাত তৈরি বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আরো নতুন নতুন বুননকেন্দ্রেরও পত্তন করে।

উৎপাদনকেন্দ্রগুলিতে জলপথে, স্থলপথে বা উভয় পথেই যোগাযোগব্যবস্থা ছিল চমৎকার। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, কলকাতা ও পাটনার সঙ্গে নেপাল ও ভুটানের যোগাযোগ ছিল। ঢাকা এবং কলকাতার মধ্যে যোগাযোগ ছিল দু'টি রাস্তার মাধ্যমে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বর্ধমানেরও যোগাযোগ ছিল। জেমস রেনেল আঠারো শতকের এই যোগাযোগব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বহু সড়কের একটি তালিকা প্রদান করেন। এ গ্রন্থের অন্যত্র এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।[৩৫] স্থলপথে ছাড়াও অভ্যন্তরীণ নৌপথে উৎপাদনকেন্দ্রগুলির মধ্যে যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত চমৎকার। জলপথে ঢাকা ও চট্টগ্রাম এবং কলকাতা ও পাটনার মতো বড় শহরে সারা বছরই যাতায়াত করা যেতো। এ প্রসঙ্গে ডাও বলেন, "জলপথে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থা অধিবাসীদের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠার পথ সুগম করে . . . বিভিন্ন মুখে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়ে গঙ্গা নদী পণ্য ও উৎপাদিত দ্রব্যাদি রপ্তানির সমুদ্রপথ উন্মুক্ত করে দেয়।"[৩৬]

১.৩ উৎপাদনের ব্যয়কাঠামো

বয়নশিল্পের উৎপাদনব্যয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে মজুরি এবং কাঁচামালের মূল্য। মজুরির মধ্যে রয়েছে বুননের জন্য ব্যয়, আয়তন ঠিক করা এবং তাঁতের টানা সুতা তৈরির (টানা এবং দুমড়ানোসহ) জন্য ব্যয়, কাপড়ের প'ড়েন পাকানোর জন্য ব্যয় এবং চূড়ান্ত রূপদানের ব্যয়। মজুরি বাবদ ব্যয় অবশ্য নির্ভর করতো কি ধরনের বস্ত্র উৎপাদিত হতো তার উপর। সর্বোৎকৃষ্ট মালবুস খাসের মূল্য অনেক বেশি। প্রতিবছর সম্রাটের জন্য যে মালবুস খাস পাঠানো হতো অথবা বাংলার নবাবের জন্য 'সরকার-ই-আলী' নামে যেসব বস্ত্র উৎপাদন করা হতো, সেগুলোর জন্য পারিশ্রমিক ছিল খুবই বেশি। এক্ষেত্রে তাঁতীদেরকে অত্যন্ত মিহিসুতা দিয়ে কাজ করতে হতো। শ্রমের জন্য ব্যয় আরো নির্ভর করতো 'জামদানী' নামের ফুলখচিত মসলিনে যে ধরনের নকশা বোনা হবে তার জটিলতার উপর। টেইলর জানাচ্ছেন যে, আঠারো শতকের শেষদিকে সর্বোৎকৃষ্ট অর্ধখণ্ড 'মলমল খাসের' মূল্য ছিল আশি আর্কট টাকা। এর মধ্যে সুতার দাম ছিল ঊনচল্লিশ টাকা আর একচল্লিশ টাকা থাকতো মুনাফা হিসেবে তাঁতীর জন্য।[৩৭] মোটকথা মজুরিই ছিল

৩৫. দেখুন, দ্বিতীয় অধ্যায়।

৩৬. Alexander Dow, *The History of Hindostan*, Vol. III, (New Delhi 1985, reprint), lxii

৩৭. Taylor's Report in Abdul Karim, "Dacca", 318.

মোট উৎপাদনখরচের শতকরা ৫১.২৫ ভাগ। কিন্তু আঠারো শতকে ইউরোপে যে সমস্ত বোনা বস্ত্রপণ্য রপ্তানি করা হতো তা সর্বোৎকৃষ্ট মানের ছিল না। "১৭৯২ সাল পর্যন্ত কোম্পানি কখনো সম্পূর্ণ একখণ্ড কাপড়ের জন্য পঞ্চাশ আর্কট টাকার অধিক মূল্য প্রদান করে নি।"[৩৮] সর্বোৎকৃষ্ট নয় এমন ধরনের বস্ত্রের উৎপাদনখরচ কিছুটা কম ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৭৮৯ সালের ঠিক আগের বছরগুলিতে কোন কোন ধরনের মিহি বাফতা এবং কোসার উৎপাদনখরচ স্বাভাবিক সময়ে শতকরা ৩১ থেকে ৩৭ ভাগ পর্যন্ত উঠানামা করতো।[৩৯] ১৭৯৪ সালে একখণ্ড 'মলমল মামনী'র জন্য মজুরি ছিল শতকরা প্রায় ২৫.৮০ ভাগ, মামুধিয়াটির জন্য লাগতো ২৭.৫০ ভাগ, সাধারণ শিরবতীর জন্য লাগতো ২৫.৯৩ ভাগ, এবং ১২০০ সুতার মলমলের জন্য লাগতো ২৩.৫৩ ভাগ।[৪০] ১৮০৪ সালের কোন কোন বস্ত্রের উৎপাদনব্যয়ের যে হার পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, তুলার ক্রমবর্ধমান উচ্চমূল্যের ফলে তাঁতীদের লাভের পরিমাণ অনেক কমে যায় (সারণি ১.১)।

রপ্তানির জন্য সূক্ষ্মতর বস্ত্রাদি ছাড়াও সাধারণ মানুষের জন্য শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি, চাদর, গামছা এবং এ ধরনের রকমারি বস্ত্রাদি উৎপন্ন করা হতো। বৃটিশ শাসনের শেষ পর্যায়ে বাংলায় এ ধরনের বস্ত্রপণ্য বোনার জন্য মজুরি পড়তো শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ।[৪১]

উৎপাদনখরচের ক্ষেত্রে অন্য গুরুত্বপূর্ণ চলক (variable) হলো সুতার মূল্য। এই মূল্য আবার নির্ভর করতো সুতার সূক্ষ্মতার উপর (এবং অন্য কোন উপাদান ব্যবহৃত হলে তার উপর)। রাজপরিবারের জন্য মসলিন তৈরি করা হতো সূক্ষ্মতম সুতা দিয়ে। এই সুতা কাটা হতো সম্ভবত ৫০০ কাউন্টের উপর।[৪২] টেইলরের মতে, সারা মাস ধরে পুরো সকাল মাকুতে কাজ করার পরও একজন সুতা কাটার লোক সর্বোচ্চ মাত্র আধা তোলা পরিমাণ সুতা কাটতে পারতো। তিনি আরো হিসাব করে দেখান যে, সূক্ষ্মতম ধরনের মসলিনের অর্ধখণ্ড (যার ওজন ৪.৫ আউন্স) বোনার জন্য (১০গজ×১গজ) একজন লোকের প্রয়োজনীয় পরিমাণ সুতা কাটতে লাগতো প্রায় দু'বছর।[৪৩] বুনন খরচের মতোই এধরনের সুতার দাম স্বাভাবিকভাবেই বেশি থাকতো। কোম্পানির রপ্তানিযোগ্য পণ্যের অধিকাংশই ছিল মাঝারি ধরনের আর সুতার মূল্যই ছিল উৎপাদনখরচের বড় অংশ। সাধারণ বাফতা এবং মিতা মামুদির ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ছিল শতকরা ৮০ ভাগ। সূক্ষ্মবস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে সুতার আনুপাতিক মূল্য ছিল কিছুটা কম (সারণি ১.১)। অর্থাৎ প্রতি পাউন্ড তুলা ব্যবহার

৩৮. ঐ।

৩৯. K. N. Chaudhuri, "Indian Textile", 169.

৪০. Mitra, *Cotton Weavers*, 113-15.

৪১. Iftikhar-ul-Awwal, *The Industrial Development of Bengal, 1900-1939*, (New Delhi 1982), 221.

৪২. J. C. Sinha, "Dacca Muslin Industry", 403.

৪৩. ঐ, 404-05.

করে অতিসূক্ষ্ম কাউন্টের সুতা তৈরির জন্য একজন তাঁতী যে শ্রম দিত তা সাধারণ সুতা তৈরির শ্রমের চাইতে ছিল অনেক বেশি।[৪৪]

সারণি ১.১ : কয়েক শ্রেণীর সুতীবস্ত্রের ব্যয়কাঠামো

বস্ত্রের শ্রেণী	সুতার মোট মূল্য	২ থেকে ৬ পর্যন্ত শতকরা ভাগ	তাঁতীদের মজুরি	৪ থেকে ৬ পর্যন্ত শতকরা ভাগ	গোমস্তার হাতে তুলে দেয়ার সময়ে বস্ত্রের প্রকৃত মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬
	টা-আ-প		টা-আ-প		টা-আ-প
বাফতা চৌবিশা ২৫×২	২-২-০	৮০.৯৫	০-৮-০	১৯.০৫	২-১০-০
মীতামামুদি ২৫×২	২-১১-০	৮১.১৩	০-১০-০	১৮.৮৭	৩-৫-০
মূকাশাড়ি ২৫ × ১ $\frac{১}{২}$	২-৮-০	৭৬.৯২	০-১২-০	২৩.০৮	৩-৪-০
মিহি বাফতা ২৫×২	৩-১-০	৭৭.৭৮	০-১৪-০	২২.২২	৩-১৫-০
কোসা ৪০ × ২	৩-১১-৮	৭৫.৮০	১-৩-০	২৪.২০	৪-১৪-৮
শুরা ৩৬×২$\frac{১}{২}$	৩-২-০	৭৫.৭৬	১-০-০	২৪.২৪	৪-২-০

উৎস : Proceedings of the Bengal Board of Trade (Commercial), Vol. 171, March 30, 1804, No. 25.

তাঁতীদের আয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। প্রকৃতপক্ষে বৃটিশদের অধীনে তাঁতী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। বোল্টের ভাষায়, আলিবর্দী খানের আমলে তাঁতীরা স্বাধীন ছিল। তারা তখন নিজেদের মতো করে কাজ করতে পারতো এবং একবারেই একজন ব্যবসায়ীর কাছে ৮০০টি মসলিন বস্ত্রখণ্ড বিক্রি

৪৪. *Report of the Indian Industrial Commission, 1916-18*, (Parliamentary Paper, XVII of 1919), 435.

করতে পারতো।[৪৫] নতুন রাজনৈতিক সম্পর্কের ফলে শুধুমাত্র এ ধরনের সফল ও সৃজনশীল তাঁতী শ্রেণীরই ক্রমশ বিলুপ্তি ঘটে নি, সাধারণ তাঁতী এবং সুতা কাটার লোকদের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়ে। এর প্রধান কারণ খাদ্যশস্য ও শিল্পের কাঁচামালের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। ১৭৬০ সালের দিকে যে কার্পাস বিক্রি হতো প্রতি সের চার থেকে পাঁচ পণ দরে, ১৮০০ সালে সে দাম বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রতি সের নয় পণ। চল্লিশ বছরের মধ্যেই চালের দাম প্রতি আর্কট টাকায় আড়াই মণ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রতি আর্কট টাকায় দেড় মণ।[৪৬] উনিশ শতকের প্রথম দু'দশকে দ্রব্যমূল্য আরো বৃদ্ধি পায়। বাংলার প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই চালের দাম প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। কাঁচা তুলার দামও বেশ বৃদ্ধি পায়।[৪৭] জীবনযাত্রার ব্যয় এবং শিল্পের কাঁচামালের মূল্যের এই বৃদ্ধির ফলে তাঁতীরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোম্পানি নিজের আয়-ব্যয় সম্পর্কে ছিল যথেষ্ট সচেতন। কোম্পানি তাদের চুক্তিবদ্ধ তাঁতীদের মজুরি এমনভাবে ধার্য করতো যেন তারা কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারে। জামদানী বস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে দাম অস্বাভাবিকভাবে কমিয়ে দেয়া হয় (সারণি ১.২)। টেইলর লিখেন :

> জামদানী বস্ত্রের দাম যে অত্যন্ত কমে গেল তার কারণ এই নয় যে, সব তাঁতী কারুকার্যবিহীন বস্ত্র প্রস্তুত করে যে লাভ করতো তার তুলনায় জামদানী প্রস্তুতকারক তাঁতীরা সবসময় সামঞ্জস্যহীন মুনাফা অর্জন করতো। তার কারণ বরং এই যে, আগে জামদানীর স্বল্পসংখ্যক প্রস্তুতকারক যেমন দারুন মুনাফা অর্জন করতো তা একটা যুক্তিযুক্ত মানে কমিয়ে আনা হয়। এর আগে অবশ্য জামদানী প্রস্তুতকারক তাঁতীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের মধ্যে এই বস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে আনুপাতিক হারে প্রতিযোগিতাও বেড়ে যায়।[৪৮]

ডি. বি. মিত্র বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, কোম্পানির কাজ করে প্রায়শই তাঁতীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতো।[৪৯] "যথার্থভাবে ক্ষতিটা ছিল বস্ত্রের প্রকৃত মূল্য এবং কোম্পানির এজেন্টের কাছ থেকে তাঁতীরা যে মূল্য পেতো তার মধ্যকার তারতম্যের কারণে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁতীরা তাদের শ্রমের জন্য কোন মূল্য পেতো না এবং তারা যে কাঁচামাল ব্যবহার করেছে তার দাম পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হতো।"[৫০] এ থেকেও বোঝা যায় কেন তাঁতীরা ক্রমশ কোম্পানির কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। যারা সুতা কাটতো তারাও খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের পারিশ্রমিক দীর্ঘকাল ধরে অপরিবর্তিত থেকে যায়। যেমন, যথাক্রমে ১৭৯২-৯৩ সাল থেকে ১৮২২-২৩ সাল পর্যন্ত মালদহ এবং

৪৫. James Taylor, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, Vol. II, (Calcutta 1840), 311.
৪৬. Taylor's Report in Abdul Karim, "Dacca", 328.
৪৭. Mitra, *Cotton Weavers*, Table 5 & 6.
৪৮. Taylor's Report in Abdul Karim, "Dacca", 323
৪৯. Mitra, *Cotton Weavers*, 109-15.
৫০. ঐ, 115.

সারণি ১.২ : ১৭৬০-৬৪ এবং ১৮০০ সালে ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত ঢাকা প্রস্তুত বস্ত্রের মূল্যের তুলনামূলক চিত্র

বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র	সুতার সংখ্যা	মাপ (হাতে)	১৭৬০-৬৪সালে প্রদত্ত মূল্য (আর্কট টাকা)	১৮০০ সালে প্রদত্ত মূল্য (সিক্কা টাকা)
ডুরী	১৫০০	৪০ ×২	১২	১৫
" মাঝারি	১৯০০	"	১৮	২০-১৫
" প্রশস্ত	"	৪০ ×২ ১/৪	২০-৪	২২-১০
" মিহি	২০০০	৪০ ×২	২৫	২৯
চারকোনা অতিমিহি	২১০০	"	৩০	২৮
" প্রশস্ত	"	৪০ × ২ ১/৪	৩৩-১২	৩৭-১১
" বগজি	"	৪০ × ২	৫০	৪৪
আব্রুয়ান	১৪০০	"	৩৬	৩৯-২
জামদানী	"	২০ × ২	৫০	৩৬-৪
শ্রীবতী সাধারণ	"	৪০ × ২	৫	৭-৮
শিরবন্দ মিহি	"	৪০× ১/৪	৪	৪-১৫
মলমল	১২০০	৪০ ×২	৭-৪	১০-৪
" মিহি	১৩০০	"	৯	১২-৭
" লম্বা	"	"	১১	১৪-১৫
" অতিমিহি, লম্বা	১৪০০	"	৩০	৩৩-৮
" অতিমিহি	১৬০০	"	২০	২২-৫
" "	১৮০০	৪৫ × ২	৪৭	৫০-৪
মামুধিয়াটি	২৭০০	৪০ ×২	৩-৯	৫-৪
শিরবন্দ	৬০০	৪০ × ১ ১/৪	৩-৪	৩-১২
নয়নসুখ চাঁদপুর মিহি	"	৪০ × ২ ১/৪	১০	১২
" অতিমিহি	"	"	১৬	১৮
" কালো মিহি	"	"	১৪	১৫-৮
" অতিমিহি	"	"	২০	২১
হাম্মাম মিহি	"	২৪ × ৩	১৬	১৪
" অতিমিহি	"	"	২১	১৮-৮
দ্বিমত্তি সাধারণ	"	২৪ × ২	৬	৬-১০
" মিহি	"	"	১১-৮	১২-৮

উৎস : Taylor's Report in Abdul Karim, "Dacca", 324-26.

রাধানগরে তাদের মাসিক আয় ছিল প্রায় পৌনে তিন টাকা এবং তিন টাকা।[৫১] তাদের দিন আসলে ফুরিয়ে আসে। বৃটেন থেকে যন্ত্রের তৈরি সূক্ষ্ম অথচ স্বল্পমূল্যের সুতা আমদানির ফলে শ্রেণী হিসেবে তারা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাঁতীদের কেউ কেউ নতুন পেশা গ্রহণ করে, কেউ বা অনাহার-অপুষ্টিতে মারা যায়। এদিকে বৃটিশ মিলে তৈরি বস্ত্রে বাজার ছেয়ে যায়। ভারতীয় বস্ত্রের বাজার হয়ে পড়ে সঙ্কুচিত। জি. এন. গুপ্ত দেখিয়েছেন যে, বিশ শতকের শুরুতেও যেসব তাঁতী নাছোড়বান্দার মতো নিজের পেশায় নিয়োজিত ছিল, তারা দৈনিক ২ থেকে ৩ আনা মাত্র আয় করতো। আর যারা নিজেদের মূলধন বিনিয়োগ করেছিল, তারা গড়ে মাসে ১৫ থেকে ২০ টাকা আয় করতো বলে জানিয়েছে।[৫২]

১.৪ সুতীবস্ত্র রপ্তানি

বাংলার প্রধান রপ্তানিপণ্য ছিল সুতীবস্ত্র। তা শুধুমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীন ও ইউরোপসহ দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোতেও ব্যাপকভাবে রপ্তানি হতো। ইবনে বতুতা, মা-হুয়ান, দুয়ার্তে বারবোসা, সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক, বার্নিয়ার এবং বাংলায় ভ্রমণ করেছেন এমন অন্যান্য ভ্রমণকারীদের রচনায় বিভিন্ন রকমের অত্যন্ত মিহি এবং সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্র উৎপাদনের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলায় উৎপাদিত বস্ত্রের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে (১৬৪০-৪১) ম্যানরিক বলেন :

> এখানে সবচেয়ে সূক্ষ্ম এবং মূল্যবান মসলিন বস্ত্র উৎপাদিত হয়। এগুলোর দৈর্ঘ্য ৫০ অথবা ৬০ গজ। প্রস্থ ৭ অথবা ৮ তালু। এগুলোর প্রান্তদেশ স্বর্ণ-রৌপ্য এবং রঙিন সিল্কের কারুকাজখচিত। এই মসলিন বস্ত্রগুলো এত সূক্ষ্ম যে, ব্যবসায়ীরা এগুলোকে দুই সাধারণ বিঘৎ লম্বা বাঁশের পাইপে করে বহন করতো এবং এভাবে তারা এগুলি খোরাসান, পারস্য, তুরস্ক এবং অন্যান্য অঞ্চলে নিয়ে যেতো।[৫৩]

১৬৬৬ সালে বাংলায় আগমনকারী ফরাসী ব্যবসায়ী ভ্রমণকারী বার্নিয়ার জানান যে, এই বস্ত্র এখানে বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হতো। তিনি লিখেন :

> আমি মাঝে মাঝে বিপুল পরিমাণ সুতীবস্ত্র দেখে অবাক হতাম। এগুলি ছিল বিভিন্ন রকমের মিহি এবং মোটা, সাদা ও রঙিন। এসব বস্ত্র শুধু হল্যান্ডের অধিবাসীরাই বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষকরে জাপান ও ইউরোপে রপ্তানি করতো। ইংরেজ, পর্তুগীজ এবং স্থানীয় বণিকেরা এসব পণ্যের প্রচুর ব্যবসা করতো। লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র মুগল সাম্রাজ্য, কাবুল এবং সাধারণত যেসব বিদেশী

৫১. ঐ, Table 7.

৫২. G. N. Gupta, *A Survey of the Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam for 1907-08*, (Shillong 1908), 14.

৫৩. *Travels of Fray Sebastian Manrique 1629-1643*, Vol. I, (translated by C. Eckford Luard), (Oxford 1927), 57.

জাতির কাছে সুতীবস্ত্র পাঠানো হতো তা সরবরাহের জন্য প্রতি বছর বাংলা থেকে যে পরিমাণ সুতীবস্ত্র সংগ্রহ করা হতো তা কল্পনা করা সম্ভব নয়।[৫৪]

ইতিহাসে উল্লেখিত আছে যে, আঠারো শতকেও এশিয়া এবং ইউরোপের বণিকেরা বাংলায় উৎপাদিত পণ্যের জন্য ভীষণ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো। হিন্দু, আর্মেনিয়ান এবং মুসলিম বণিকেরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল, তুরস্ক, আরব এবং পারস্যের সঙ্গে তেজী ব্যবসা করতো। ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজদের মতো ইউরোপীয় ব্যবসায়ী এবং অসংখ্য ব্যক্তিগত ও মুক্ত ব্যবসায়ী ইউরোপে বিভিন্ন রকমের সুতীবস্ত্র রপ্তানিতে নিয়োজিত ছিল। ১৭৪৭ সালে ঢাকায় বস্ত্রব্যবসায়ের একটি বিবরণ থেকে বিভিন্ন জাতির যেসব বণিক এসময়ে ব্যবসা করতো তাদের সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। নীচে এর একটি তালিকা দেয়া হলো[৫৫] :

	(আর্কট টাকায়)
দিল্লীর সম্রাটের জন্য প্রেরিত বস্ত্রের মূল্য	১০০,০০০
মুর্শিদাবাদের নবাবের জন্য প্রেরিত বস্ত্রের মূল্য	৩০০,০০০
জগৎশেঠের বাণিজ্যের মূল্য	১৫০,০০০
তুরানী বণিকদের বাণিজ্যের মূল্য	১০০,০০০
পাঠান বণিকদের বাণিজ্যের মূল্য	১৫০,০০০
বসরা, মক্কা এবং জেদ্দার সঙ্গে আর্মেনীয় বণিকদের বাণিজ্যের মূল্য	৫০০,০০০
অংশত দেশের অভ্যন্তরে এবং অংশত বসরা, মক্কা ইত্যাদির সঙ্গে মুগল বণিকদের বাণিজ্যের মূল্য	৪০০,০০০
দেশের অভ্যন্তরে হিন্দু বণিকদের বাণিজ্যের মূল্য	২০০,০০০
ইউরোপের সঙ্গে বৃটিশ বণিকদের বাণিজ্যের মূল্য	৩৫০,০০০
বিভিন্ন দেশের সঙ্গে স্বতন্ত্র বৃটিশ বণিকদের বাণিজ্যের মূল্য	২০০,০০০
ইউরোপের সঙ্গে ফরাসী কোম্পানির বাণিজ্যের মূল্য	২৫০,০০০
ফরাসী প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যের মূল্য	৫০,০০০
ইউরোপের সঙ্গে ওলন্দাজ কোম্পানির বাণিজ্যের মূল্য	১০০,০০০
মোট বস্ত্রব্যবসার পরিমাণ	২,৮৫০,০০০

৫৪. Francois Bernier, *Travels in the Mughal Empire. A. D. 1656-1658,* (reprinted, Delhi 1968), 439.

৫৫. Taylor's Report in Abdul Karim, "Dacca", 308-09.

কিন্তু আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দীউয়ানি লাভ করে এবং বাংলা থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত রাজস্ব পণ্যের আকারে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (ইতিপূর্বে আমদানিকৃত স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বাট দ্বারা পণ্যক্রয়ের কাজ সমাধা করা হতো)।

সারণি ১.৩ : ১৭৭১-১৭৯২ সালে বাংলা থেকে আমদানিকৃত এবং যুক্তরাজ্যের কোম্পানি কর্তৃক বিক্রীত বস্ত্রপণ্যের সংখ্যা

সন	দ্রব্যাদির সংখ্যা	বিক্রয়মূল্য (পাঃ)	বিক্রয়মূল্য (সিক্কা টাকা)
১৭৭১	৬,০৪,৭৫৭	১০,৭৩,৮৪১	৮৫,৯০, ৭২৮
১৭৭২	৬,২৬,১৬০	১০,৩৫,৬৮৬	৮২,৮৫, ৪৮৮
১৭৭৩	৭,৬১,৪৮৯	১২,২৪,৪৬৭	৯৭,৯৫,৭৩৬
১৭৭৪	৬,১৬,২২৬	১১,০৫,২৩০	৮৮,৪১,৮৪০
১৭৭৫	৫,১৭,৭৬১	৯৬০,২৪৪	৭৬,৮১,৯৫২
১৭৭৬	৬,০৭,৮৭৮	১০,৯০,৭৪৪	৮৭,২৫,৯৫২
১৭৭৭	৬,৫৫,৩৩২	১১,১৪,৭৩৪	৮৯,১৭,৮৭২
১৭৭৮	৮,০৫,০১০	১১,৯৪,৬১৩	৯৫,৫৬,৯০৪
১৭৭৯	৩,৩৮,৪৬৫	৫,২৪,৬৩৬	৪১,৯৭,০৮৮
১৭৮০	৪,৭৪,৭০৩	৯,৮৪,৭৬৩	৭৮,৭৮,১০৪
১৭৮১	৩,০১,৬১৭	৫,৮২,১১৬	৪৬,৫৬,৯২৮
১৭৮২	৪,৪৬,৪৮৮	১০,৩৩,৫৫৭	৮২,৬৮,৪৫৬
১৭৮৩	৪,৩৭,৮০২	১০,৪৯,২২৪	৮৩,৯৩,৭২২
১৭৮৪	৫,১৬,০৮৮	৯,০৮,৩৭০	৭২,৬৬,৯৬০
১৭৮৫	৭,৬৮,২২৮	১৪,২৬,২৫২	১,১৪,১০,০১৬
১৭৮৬	৭,৬৪,১৭৩	১৪,৫৮,৪১৬	১,১৬,৬৭,৩২৮
১৭৮৭	৭৪৫,৪৪৯	১৩,১৭,৯৩৪	১,০৫,৪৩,৪৭২
১৭৮৮	৫,৯৪,৭২৮	৯,৭৮,৫০৭	৭৮,২৮,০৫৬
১৭৮৯	৬১৪,৮৩৯	৯,৪৩,০৯৬	৭৫,৪৪,৭৬৮
১৭৯০	৮,৬৬,২৮২	১৪,৮৫,০৮০	১,১৮,৮০,৬৪৫
১৭৯১	৭,০৯,৫৪০	১১,৩১,৭১৭	৯০,৫৩,৭৩৬
১৭৯২	৬,০৭,৩২৯	১১,৯৪,৮৭৫	৯৫,৫৯,০০০

William Milburn, *Oriental Commerce*, Vol. II, (London 1813), 234. ১সিক্কা টাকা = ২ শিলিং ৬ পেনস। এই হারে পাউন্ড-স্টারলিং-এর মূল্যের অনুপাতে সিক্কা টাকাতে বিক্রয় মূল্য হিসাব করা হয়েছে। মিলবার্ন অন্যত্র এই হার ব্যবহার করেছেন। বস্ত্রপণ্যের দ্বারা মিলবার্ন বুঝিয়েছেন প্রত্যেক রকমের ক্যালিকো এবং মসলিন।

রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকমের বস্ত্রপণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য কোম্পানি তাঁতীদের উপর প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং কর্তৃত্বপ্রাপ্ত অসংখ্য কর্মচারী ও এজেন্টের দ্বারা এই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হতো। "হিন্দুস্থানের উচ্চ অঞ্চলের বণিকেরা কার্যত বিতাড়িত হয়। যারা সমুদ্রপথে রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা নিরুৎসাহিত হয়। আর তাতে উৎপানকারীরা শুধু যে বাধাগ্রস্ত হয় তা নয়, সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা স্থানীয় এজেন্টদের দ্বারা প্রায়শই তারা নির্যাতিত হয়। এসব এজেন্ট তাদের নিয়োগকারীদের দ্বারা এবং যাদের উপর তারা খবরদারি করতো তাদের দ্বারাও লাভবান হতো।"[৫৬]

মিলবার্নের বিবরণে ১৭৭১-৯২ কালপর্বের বছরগুলিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ইংল্যান্ডে রপ্তানিকৃত বস্ত্রপণ্যের পরিমাণ জানা যায়। এই বিবরণে লন্ডনে এসব পণ্যের বিক্রয়মূল্যও জানা যায়। তিনি যেসব পরিসংখ্যান সরবরাহ করেছেন (সারণি ১.২ দ্রষ্টব্য) তা থেকে দেখা যায় যে, ১৭৭৮ সাল পর্যন্ত এসব পণ্যের রপ্তানি বেশ স্থিতিশীল ছিল এবং এই সালেই ৮,০৫,০১০টি বস্ত্র বিক্রয় হয়। এরপর প্রায় ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় স্বাধীনতাযুদ্ধের জন্য রপ্তানিবাণিজ্যে মন্দাভাব দেখা দেয়। এই স্বাধীনতাযুদ্ধে ফ্রান্স, স্পেন এবং হল্যান্ড ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ইংল্যান্ডে যেসব পণ্য আমদানি করা হতো তা প্রধানত সেদেশে ভোগ করা হতো না। ১৭৮৮ সালে লর্ডস অব দি ট্রেজারির উদ্দেশে নিবেদিত একটি স্মারক থেকে জানা যায় যে, "ইংল্যান্ডে যেসব জিনিস আমদানি করা হয় তার বিশ ভাগের সতেরো ভাগ ছিল সবচেয়ে মোটা পণ্য এবং এগুলির নাম ছিল ক্যালিকো। যেসব পণ্য মসলিন নামে অভিহিত, তার পাঁচ ভাগের তিন ভাগ এবং ভারতে প্রস্তুত সব রকম রঙিন পণ্য রপ্তানির জন্য বিক্রয় করা হতো।[৫৭] পুনঃরপ্তানিকৃত পণ্যের সর্বশেষ ভোক্তা ছিল ইউরোপীয় দেশগুলি, আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

শান্তির সময় ফরাসীরাও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করে। কিন্তু ১৭৫৬ সালে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হলে বাংলায় ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং অন্যান্য ফরাসী ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৬৩ সালে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর ব্যবসা-বাণিজ্য পুনরায় শুরু হয়। ১৭৬৪ সাল থেকে ১৭৭৮ সালের মধ্যে বাংলায় ফরাসী ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। তারা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের মূলধন দিয়ে ব্যবসা করতো। এসব কর্মচারী তাদের সম্পদ ইংল্যান্ডে পাঠাতে ছিল আগ্রহী। কিন্তু তারা চাইতো যে, তাদের প্রভুরা যেন কিছুতেই বিষয়টি জানতে না পারে।[৫৮] এক হিসাব মতে ১৭৬৫ সালের পর বাংলায় ফরাসী ব্যবসার বার্ষিক মূল্য ছিল ৫ থেকে ৬ লাখ 'লিভার্স' (Livres)।[৫৯] ১৭৮৩ সালের পর ফরাসীরা পুনরায় বাংলায় বাণিজ্য শুরু করে। ১৭৯১ সালে ল' উপরয়েন্টে (L' Orient) বাংলায় উৎপন্ন যে বস্ত্রপণ্য বিকিকিনি

৫৬. Letter from Cornwallis to the Court of Directors, dated November 1, 1788. Cited in J. C. Sinha, *Economic Annals*, 81.

৫৭. William Milburn, *Oriental Commerce*, Vol. II, (London 1813), 233.

৫৮. N K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, Vol. I, (Calcutta 1965), 36-37.

৫৯. S P. Sen, *The French in India* , (Calcutta 1958), 91-92.

হয় তার মূল্য হলো—বেঙ্গল ক্যালিকো পাঃ ১,৪৩, ৭৪৮, নিষিদ্ধ বাংলা-পণ্য পাঃ ১৩,০১৪ এবং বাংলায় উৎপন্ন মসলিন পাঃ ৩,১৮, ৩৪৩।[৬০]

বাংলার সঙ্গে ওলন্দাজদের বাণিজ্য চললেও তারা এদেশ থেকে বস্ত্রপণ্য রপ্তানিতে তেমন আগ্রহী ছিল না। ওলন্দাজরা বাংলা থেকে ১৭৫০ সালে রপ্তানি করে ৫৭,০০০ টি, ১৭৫৩ সালে ৭৯.০০০টি এবং ১৭৫৬ সালে ৫১,০০০টি বস্ত্রপণ্য। ১৭৫৮ সালে এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫,০০০টি। অবশ্য ১৭৬৪ সালে তা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৭,০০০টি।[৬১] ওলন্দাজদের এই অনাগ্রহের প্রধান কারণ দেখাতে গিয়ে এন. কে. সিনহা বলেন যে, তারা "সুতা এবং রেশমের তৈরি বস্ত্রপণ্যের চেয়ে শোরা (saltpetre) এবং আফিম সংগ্রহে বেশি মনোযোগী ছিল।"[৬২] ১৭৮৫ থেকে ১৭৯১ সাল পর্যন্ত সাত বছরে যে বস্ত্রপণ্য রপ্তানি করা হয়, তার গড় বিক্রয়মূল্য ছিল মাত্র পাঃ ১,০৯,৫৭০।[৬৩] কিন্তু এর সঙ্গে ওলন্দাজেরা ১৭৮৭ থেকে ১৭৮৯ পর্যন্ত অস্টেন্ড, হামবুর্গ, জেনোয়া এবং অন্যান্য দেশের পতাকাবাহী অসংখ্য জাহাজযোগে ভারত থেকে ইউরোপ মহাদেশে যা আমদানি করে তার মূল্যও অবশ্য যোগ করতে হবে। নেপোলিয়নের সময়ে সংঘটিত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে রপ্তানিবাণিজ্যের ধরনে কিছু পরিবর্তনের সূচনা হয়। তখন বাংলায় উৎপন্ন বস্ত্রপণ্যের ফরাসী বাজার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় (১৮০২-০৩ সাল ব্যতীত)। ফলে বাংলা রপ্তানির একটি মূল্যবান বাজার হারায়। এই ক্ষতিটুকু ছাড়া ইংল্যান্ডের সঙ্গে কোম্পানির রপ্তানিবাণিজ্য ১৭৯৭-৯৮ সালটি ছাড়া ১৮০২ সাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। ১৭৯৭-৯৮ সালে কোম্পানির আমদানির বিক্রয়মূল্য আগের বছরের বিক্রয়মূল্যের অর্ধেকের চেয়েও কম ছিল।[৬৪] এই হ্রাসের কারণ ছিল ইউরোপে যুদ্ধবিগ্রহের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা।[৬৫] বাজারের সঙ্গিন অবস্থা বিবেচনা করে কোম্পানি নিজেই ১৮০২-০৩ সাল থেকে আমদানি কমিয়ে দেয়। এ সময় বাংলার মসলিনের বিকল্প পণ্যে আন্তর্জাতিক বাজার ছেয়ে যায়। মসলিনের দাম তখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, তা বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ব্যক্তিগত উদ্যোগী ব্যবসায়ী কর্তৃক আমদানিও এই সময়ে অত্যন্ত কমে যায়। নেপোলিয়নের জারিকৃত বার্লিন এবং মিলান ডিক্রির ফলে রপ্তানিপরিস্থিতি আরো সঙ্গিন হয়ে পড়ে। ১৮০৩-০৪ সালের পাঃ ১০,৬০,৬১২-এর তুলনায় ১৮০৬-০৭ সালে বাংলা থেকে কোম্পানির আমদানিকৃত বস্ত্রপণ্যের বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় মাত্র পাঃ ২,০১,১০৭-এ।[৬৬] "নেপোলিয়নের বার্লিন এবং মিলান ডিক্রির ফলে বাংলার বস্ত্রপণ্যের জন্য ইউরোপ মহাদেশের বাজার ব্যাপকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে

---

৬০. Milburn, *Commerce,* 234.

৬১. N K Sinha, *The Economic History,* Vol. I, 57.

৬২. ঐ, 56.

৬৩. Milburn, *Commerce,* 234.

৬৪. ঐ, 235.

৬৫. Mitra, *Cotton Weavers,* 26

৬৬. Milburn, *Commerce,* 235.

১৮০৭-০৮ সালে ইংরেজ এবং ওলন্দাজদের পারস্পরিক বৈরিতার ফলে অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ে।"[৬৭] ১৮১৫ সালে এই বৈরিতার অবসান হলো বটে, কিন্তু তখন ইংল্যান্ডের তুলাজাত বয়নশিল্প দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। ১৮১৫ সাল থেকে ইংল্যান্ড নিজের উৎপাদিত বস্ত্রপণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে থাকে।

সারণি ১.৪ : ১৭৯৫-৯৬ থেকে ১৮৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত কলকাতা থেকে সমুদ্রপথে সুতী বস্ত্রাদির বেসরকারি রপ্তানিমূল্য (সিক্কা টাকায়)

সন	মূল্য	সন	মূল্য
১৭৯৫-৯৬	৫১,৫৩,৬০৭	১৮১৬-১৭	১,৬৫,৯৯, ৯৪৩
১৭৯৬-৯৭	৭৪,২৬,৭৫২	১৮১৭-১৮	১,৩২,৩৪,৭২৫
১৭৯৭-৯৮	৫৭,৪৮,৬১৭	১৮১৮-১৯	১,৩২,৮২,৭৮৯
১৭৯৮-৯৯	৫৭,৭৪,০৫৭	১৮১৯-২০	৯০,৩৫,১৫২
১৭৯৯-১৮০০	১,২০,০১,১৯৯	১৮২০-২১	৮৫,৩২,৬৫৬
১৮০০-০১	১,৪১,৬৭,১০৬	১৮২১-২২	৭৭,০১.৩১৯
১৮০১-০২	১,৬৫,৯১,৩০৯	১৮২২-২৩	৭৯,৯৯, ৫২১
১৮০২-০৩	১,৮৫,৯৪,৬৭৬	১৮২৩-২৪	৫৮,৭২,৭২৯
১৮০৩-০৪	১,৬১,৬৯,৪৭৮	১৮২৪-২৫	৪২,২৫,৭১৯
১৮০৪-০৫	১,১০,৮৫,৫০৯	১৮২৫ ২৬	৩৪,১৩,৪৫৪
১৮০৫-০৬	১,১৮,৪৯,৬৭০	১৮২৬-২৭	২৮,৫১,২১৩
১৮০৬-০৭	১,৩৩,৪০,৭৩৮	১৮২৭-২৮	২৭,৫৬, ১৬৮
১৮০৭-০৮	১,১৫,৮৮,৯৪৯	১৮২৮-২৯	২১,৩৬,০০৪
১৮০৮-০৯	৫৪,৭৯,১৪৭	১৮২৯-৩০	১৫,২৭,৬৯২
১৮০৯-১০	১,১১,৪১,৬৭৪	১৮৩০-৩১	১১,৯৩,৩৯১
১৮১০-১১	১,৩১,১৯,৫৩৫	১৮৩১-৩২	৯,৬৭ ,৭০১
১৮১১-১২	১,০৭,৫৬,৫১৯	১৮৩২-৩৩	৯,০১,৮৫১
১৮১২-১৩	৯৫,১২,৭৫৮	৮৩৩-৩৪	৭,৪৩,৮৫৩
১৮১৩-১৪	৫২,৮৬,৩৬২	১৮৩৪-৩৫	৮,৬৮,৪৪৩
১৮১৪-১৫	৮৪,৯৫,৫৯৯	১৮৩৫-৩৬	৮,২২,৭২১
১৮১৫-১৬	১,৩১,৫৬,৫৮৭	১৮৩৬-৩৭	৭.৬৯,৩৭৯
		১৮৩৭-৩৮	৭,৩০,০৪৬

উৎসসমূহ : India Office Records, P/174/13; *Bengal Commercial Reports,* 1795-1802 ; P /174/20, ঐ, 1808-09; P/174/25, ঐ, 1813-14; P/174/33, ঐ, 1821-28, P/174/41; ঐ, 1829-30; P/174/49, ঐ, 1837-38.

৬৭. H. R. Ghoshal, *Economic Transition in the Bengal Presidency, 1793-1833*, (Patna 1950), 40.

ইউরোপে প্রলম্বিত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে যেসব দেশ বহুদিন ধরে বাংলার পণ্য আমদানি করতো, সেসব দেশে এ অঞ্চলের বস্ত্রপণ্য রপ্তানিতে ভাটা পড়ে। কিন্তু তখন আমেরিকা এবং ইউরোপের বেসরকারি ব্যবসায়ীরা মাঝারি মানের বস্ত্রপণ্য কিনতে শুরু করে।

সারণি ১.৫ : ১৮০২-০৩ এবং ১৮২১-২২ সালে বাংলার সুতী বস্ত্রপণ্যের গন্তব্যস্থল এবং রপ্তানমূল্য (সিক্কা টাকায়)

গন্তব্যস্থল	১৮০২-০৩	১৮২১-২২
লন্ডন	৬৪,৭০,২০২	৬,৪৬,৬৯০
লিসবন	২৪,৩৩,০৯২	৪,৪৭,৭১২
ক্যানডিজ	৩,৭৫,৭৮২	শূন্য
আমেরিকা	৪০,২১,৯৪২	৩,৪৯,১১৮
বাটাভিয়া	৮৭,০৫৯	শূন্য
ম্যানিলা	১,২৮,৪৮৬	৫,৩৯,৯৬৮
আরব ও পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহ	৮,৭৭,৯১৬	১৮,৩০,৫৮০
সুমাত্রা উপকূল	৬৮,৬০০	১,৯৩,৮০৫
মালাবার উপকূল	১০,৪২,৬৪২	১,৬২,৮৮৮
করমন্ডল উপকূল	২,৪৪,৩১২	৫৯,৩৭০
পেনাং এবং ইস্টওয়ার্ড	১৪,৭৪,৫৫৯	৬,৫৮,২৬৩
চীন	৪,৭২,৫৪৪	১৮,১৩৫
পেগু	১,১৮,১৯২	২৭,৪৬৫
মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ	১৪,০০৪	শূন্য
মরিশাস	৫,১০,৬৩৪	৫,২৫,৮৪৫
মাল্টা এবং জিব্রালটার	শূন্য	৪,১৫,৫৩৮
ব্রাজিল	শূন্য	১,৩০,৮৮৩
দক্ষিণ আমেরিকা	শূন্য	৭,৫০,২৯৫
উত্তমাশা অন্তরীপ	শূন্য	৩,০৩,৭২৯
জাভা	শূন্য	৫,৬০,৮৫৫
নিউ সাউথ ওয়েলস	শূন্য	৭৩,৫০৫
অন্যান্য স্থানসমূহ	২,৫৪,৭০৯	শূন্য
মোট	১,৮৫,৯৪,৬৭৬	৭৭,০১,৩১৯

উৎস : India Office Records, P/174/14; *Bengal Commercial Reports*, 1802-03, ঐ, 1829 30, P/174/33, ঐ, 1821-22.

"আমেরিকা এবং ইউরোপে বাংলার বাণিজ্যবৃদ্ধির ফলে সাময়িকভাবে ভারতীয় বয়নশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটে।"[৬৮] ১৭৯৫-৯৬ সালে কলকাতা থেকে বস্ত্রপণ্যের বেসরকারি রপ্তানিমূল্য দাঁড়ায় সিক্কা টাকা ৫১,৫৩, ৬০৭। ১৮০২-০৩ সালে এ অঙ্ক নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে হয় সিক্কা টাকা ১,৮৫,৪,৬৭৬ (সারণি ১.৩)। মার্কিনীরাই ৪০ লক্ষ সিক্কা টাকা মূল্যের পণ্য ক্রয় করে এবং লিসবনের ব্যবসায়ীরা ক্রয় করে প্রায় ২৫ লক্ষ সিক্কা টাকার পণ্য। (সারণি ১.৪ দ্রষ্টব্য)। ১৮১২ সালে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধের ফলে আমেরিকার সাথে ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।[৬৯] ইউরোপে শান্তি ফিরে আসার পর বাংলার বস্ত্রপণ্যের বেসরকারি ব্যবসা পুনরায় চাঙ্গা হয়। কিন্তু বিশ্ববাজারে মার্কিন ও বৃটিশ বয়নশিল্পের ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশের ফলে ১৮২০ সালের দিকে এতে পুনরায় দ্রুত ভাটা পড়ে। আরব দেশ, পারস্য উপসাগরীয় দেশ, ম্যানিলা, জাভা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় বাংলার বস্ত্রপণ্যের চাহিদা দেখা দিলে স্বল্প সময়ের জন্য ইউরোপীয় ও মার্কিন বাজার হারানোর কিছুটা ক্ষতিপূরণ হয়। অবশ্য সে বাজারও অচিরেই হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৮৩১-৩২ সাল নাগাদ বাংলার বস্ত্রপণ্যের রপ্তানি ১০ লক্ষ সিক্কা টাকার নীচে নেমে আসে (সারণি ১.৩)।

১.৫ তাঁতশিল্পের অবনতি

বাংলায় তাঁতভিত্তিক তুলাজাত বয়নশিল্পের অবনতির অনেকগুলি কারণ নির্দেশ করা যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রাথমিক বছরগুলিতে তাঁতীদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার পরিলক্ষিত হয়। এ সময় কোম্পানি তার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যবসা শুরু করে। অবশ্য এরকম নিপীড়ন মুগল আমলেও চলতো। কিন্তু তখন যেসব তাঁতী রাজকারখানায় কাজ করতো শুধু তারাই এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোম্পানি শাসনামলে জবরদস্তি এবং চাপপ্রয়োগ অনেক ব্যাপক আকার ধারণ করে। আসলে এটা নতুন উৎপাদনব্যবস্থার একটি অংশ হয়ে যায়। এই ব্যবস্থা আইনের কতগুলি ধারার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক রূপলাভ করে। শারীরিক নির্যাতন, জরিমানা, পণ্যের জন্য হয়রানি, সম্পত্তি দখল, মামলা ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে কোম্পানি অর্থ আদায় করে। এর ফলে তাঁতীদের উদ্যোগ স্তিমিত হয়। তারা কোম্পানির কাজেও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। "তাঁতীদের বৃদ্ধাঙ্গুল কেটে ফেলার প্রচলিত অতিরঞ্জিত কাহিনীর কথা বাদ দিলেও একথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না যে, নির্যাতন এই শিল্পটির জন্য এত ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয় যে, অনেক তাঁতী তাদের পেশাই পরিত্যাগ করে।"[৭০] অন্যদিকে, কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের ফলে তাঁতীরা তাদের শ্রমের জন্য ন্যায্য

৬৮. A Tripathi, *Trade and Finance of Bengal Presidency, 1793-1833,* (Calcutta 1956), 117.
৬৯. ঐ, 79.
৭০. J. C Sinha, *Economic Annals,* 85

পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতো না। কোম্পানিপ্রদত্ত দাম শুধু যে কম ছিল তাই নয়, দৈনন্দিন জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির বছরগুলিতেও এ দাম ছিল স্থির। কিন্তু এর চেয়ে জঘন্য ছিল কোম্পানির আবাসিক বাণিজ্যিক কর্মকর্তাদেরকে প্রদত্ত ব্যক্তিগত ব্যবসার অধিকার। "নিজেদের ব্যক্তিগত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এরা ১৭৯৩ সালের ৩১ নং রেগুলেশনের অপব্যবহার করে বস্ত্রপণ্যের তাঁতীদেরকে নিজেদের দেয়া দাম গ্রহণ করতে বাধ্য করতো। বোর্ড অব ট্রেডের কার্যবিবরণীতে জোর করে আদায়, প্রতারণা এবং জালিয়াতির বিরুদ্ধে প্রচুর নালিশ রয়েছে। এজন্য স্থানীয় কর্মকর্তারা অধিকতর দায়ী হলেও ইউরোপীয়রা বরাবর এসব কাজে তাদেরকে ইন্ধন যোগায়।"[৭১]

আঠারো এবং উনিশ শতকের গোড়াতে ইংল্যান্ডে যে রাজস্বনীতি অনুসৃত হয়, বাংলায় তুলাজাত বয়নশিল্পের অবনতির জন্য তাও কম দায়ী নয়। ১৭০০ সালের এ্যাক্টের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে কয়েক জাতের 'ক্যালিকো' ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। মোটা মসলিন এবং মিহি ক্যালিকোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকায় এই এ্যাক্টের জন্য কয়েক ধরনের মসলিনও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৭২০ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে আরেকটি এ্যাক্ট পাশ হয়, যা ইংল্যান্ডে ছাপা ক্যালিকো ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। "এই দু'টি এ্যাক্টের ফলে ইংল্যান্ডে বাংলার তুলাজাত বস্ত্রপণ্যের রপ্তানি বহুল পরিমাণে সীমিত হয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডের বাজারে ছাপা এবং রঙিন ক্যালিকো ও বিশেষ জাতের মসলিনের বাজারে প্রবেশ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। সাদা ক্যালিকোর আমদানিও হয়ে পড়ে সীমিত।"[৭২] যেসব পণ্য নিষিদ্ধ করা হয় নি (যেমন সাদা ক্যালিকো এবং কয়েক ধরনের মসলিন) সেগুলির উপরও শতকরা ১৫ ভাগ শুল্ক ধার্য করা হয়। ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এই কর আরো বৃদ্ধি করা হয়। শেষ পর্যন্ত দেশে ব্যবহারের জন্য সাদা ক্যালিকো আমদানির উপর কর ধার্য হয় শতকরা ৮৫ পাঃ ২ শিঃ ১ পেঃ এবং মসলিন ও ন্যানকিনের উপর শতকরা ৪৪ পাঃ ৬ শিঃ ৮ পেঃ, যা ১.৬ সারণিতে পরিস্ফুট করা হয়েছে।

তুলাজাত পণ্যের উপর এভাবে উচ্চহারে করারোপ এ সময়ে বৃটিশ শিল্পের স্বার্থে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। ১৮১৩ সালেও বৃটেনের বাজারে এগুলি বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করা যেতো এবং শুল্কারোপ সত্ত্বেও ইংল্যান্ডে উৎপাদিত পণ্যের দামের চেয়ে এগুলির বাজারমূল্য ছিল শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ কম।[৭৩] অবস্থা যদি এ রকম না হতো, যদি এরকম বিধিনিষেধমূলক কর এবং ডিক্রি না থাকতো, তাহলে শুরুতেই পেইজলি এবং ম্যানচেস্টারের কারখানাগুলি হয়তো বন্ধ হয়ে যেতো। ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হলে এর প্রতিশোধ নিতে পারতো। কিন্তু তখন আত্মরক্ষামূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কোন

৭১. A. Tripathi, *Trade*, 218

৭২. J. C Sinha, *Economic Annals*, 26-27

৭৩. Opinion of H. N Wilson cited by S. N. Gupta, *British*, 32

সুযোগ ছিল না। ভারত তখন অধিকতর ক্ষমতাধরের দয়ার উপর নির্ভরশীল। কোন রকম কর না দিয়েই বৃটেন তার তৈরি পণ্য এর উপনিবেশ ভারতে বিক্রি করেছে। এভাবে বিদেশী উৎপাদনকারীরা রাজনৈতিক প্রতিপত্তি খাটিয়ে একজন প্রতিযোগীকে বাজার থেকে উৎখাত করেছে।[৭৪] ১৮৪০ সালের দিকে ইংল্যান্ডে বাংলা থেকে আমদানিকৃত বস্ত্রপণ্যের জন্য কর দিতে হতো শতকরা ১০ ভাগ। অথচ এর বিপরীতে ভারতে ইংল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত পণ্যের জন্য কর দিতে হতো মাত্র শতকরা ৩.৫০ ভাগ। এটাও বিদেশী ব্যবসায় প্রশাসনের খরচ মেটাবার জন্য ধার্য করা হয়েছিল।

সারণি ১.৬ : ১৮০২-১৮১৪ সালে দেশে ব্যবহারের জন্য ইংল্যান্ডে আমদানিকৃত ভারতীয় বস্ত্রপণ্যের উপর আরোপিত করের হার

সন	সাদা ক্যালিকো			মসলিন এবং ন্যানকিন		
	পা	শি	পে	পা	শি	পে
১৮০২	২৭	১	১	৩০	১৫	৯
১৮০৩	৫৯	১	৩	৩০	১৮	৯
১৮০৪	৬৫	১২	৬	৩৪	৭	৪
১৮০৫	৬৬	১৮	৯	৩৫	১	৩
১৮০৬	৭১	৬	৩	৩৭	৭	১
১৮০৯	৭১	১৩	৪	৩৭	৬	৮
১৮১৩	৮৫	২	১	৪৪	৬	৮
১৮১৪	৬৭	১০	১	৩৭	১০	০

উৎস : Edward Baines, *The History of the Cotton Manufacturers in Great Britain*, (London 1835), 325.

কিন্তু বাংলার তুলাজাত পণ্যের উপর সবচেয়ে কঠোর আঘাত হানে আঠারো শতকের শেষার্ধের ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব। একটির পর একটি যান্ত্রিক উদ্ভাবন ইংল্যান্ডের তুলাজাত শিল্পের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়। এই যন্ত্রাদি উদ্ভাবনের দীর্ঘ তালিকার শীর্ষে ছিল ১৭৬৭ সালের হারগ্রীভস স্পিনিং জেনি। এর পর পরই উদ্ভাবিত হয় আর্করাইটের জলীয় কাঠামো (১৭৬৮) ও ক্রম্পটনের 'মিউল' (১৭৭৫)। শেষোক্ত যন্ত্রটি দিয়ে এত মিহি সুতা কাটা যেতো যে খোদ ইংল্যান্ডেই মসলিন উৎপাদন করা সম্ভব হয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলি হলো ১৭৮৪ সালে কার্টরাইট কর্তৃক উদ্ভাবিত শক্তিচালিত তাঁত এবং বেলের বেলুন দিয়ে ছাপা (Cylindrical Printing Process) পদ্ধতি এবং ১৭৮৫ সালে বার্থোলেটের (Berthollet's) ক্লোরিন দিয়ে শুভ্র করার যন্ত্র। ১৭৮৭ সাল নাগাদ বৃটেনে

---

৭৪. ঐ, 32-33.

তুলাজাত বয়নশিল্প এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয় যে, তা প্রায় ৫,০০,০০০ খণ্ড মসলিন উৎপাদনে সক্ষম হয়।[৭৫] এ প্রসঙ্গে কোর্ট অব ডিরেক্টরস মন্তব্য করে, "বৃটিশ উৎপাদনকারীদের মহাকৌশল এবং অধ্যবসায়ী শ্রমের ফলে সাধারণ এবং মাঝারি ধরনের মসলিন বস্ত্র শেষপর্যন্ত নৈপুণ্যের এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে, যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধারণা করা যায় যে, সুরাটের সর্বোৎকৃষ্ট তুলার যথেষ্ট সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে বিদেশী বাজারে ভারতের সাদা বস্ত্রপণ্যের চাহিদা বৃটিশ মসলিন দিয়ে মেটানো সম্ভব হবে।"[৭৬] ১৮০৩ ও ১৮১৩ সালে যথাক্রমে জনসন এবং হরকস্ কর্তৃক শক্তিচালিত তাঁতের উন্নতিসাধনের ফলে উৎপাদন আরো বেড়ে যায়। তুলাজাত শিল্পের ক্ষেত্রে এই উন্নতির ফলে ইংল্যান্ড পৃথিবীর একটি সেরা বয়নশিল্পের দেশে পরিণত হয়। একই সঙ্গে সুতা ও বস্ত্রপণ্যের উৎপাদনখরচও যথেষ্ট হ্রাস করা সম্ভব হয়। ১৮৩০ সাল নাগাদ ভারতে সুতা উৎপাদনের যে ব্যয় তার অর্ধেক দিয়েই ইংল্যান্ডে অনুরূপ সুতা উৎপাদন করা সম্ভব হয়।[৭৭] ফলে বৃটেনে তৈরি বস্ত্রপণ্যের বাজারমূল্য এত কমে যায় যে, বাংলা থেকে বস্ত্রপণ্যের আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।[৭৮] এমনিভাবে বাণিজ্যের চাকা ঘুরে গেল এবং ইংল্যান্ড থেকে বাংলায় তুলনামূলকভাবে সস্তায় বিপুল পরিমাণ বস্ত্রপণ্যের আমদানি শুরু হয়ে গেল (সারণি ১.৭)। "ভারতীয় বস্ত্রপণ্য এখন স্থানীয় বাজার থেকে হলো বিতাড়িত এবং বৃটিশ বস্ত্রপণ্য দ্রুত সরবরাহের ফলে গ্রামের বাড়ি পর্যন্ত এই বস্ত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই সেই গ্রাম, যেখানে স্মরণাতীত কাল থেকে সুতাকাটা ছিল একটি সহায়ক কর্মসংস্থান এবং প্রকৃতির খেয়ালের বিরুদ্ধে একটি রক্ষাকবচ।"[৭৯]

অভ্যন্তরীণ শুল্কব্যবস্থা বাংলার তুলাজাত বয়নশিল্পের অবনতিকে ত্বরান্বিত করে। ১৮১৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট অনুযায়ী বাংলায় আমদানিকৃত বিদেশী বস্ত্রশিল্পের জন্য দিতে হতো শতকরা ২.৫ ভাগ শুল্ক। কিন্তু বাংলায় উৎপাদিত পণ্যের জন্য শুল্ক দিতে হতো আরও অনেক উচ্চহারে। যেমন, কাঁচা তুলার জন্য শুল্ক দিতে হতো শতকরা ৫ ভাগ, সুতা উৎপাদনের পর আরো দিতে হতো শতকরা ৭.৫ ভাগ। বস্ত্রপণ্যের উৎপাদনের পর দিতে হতো শতকরা ২.৫ ভাগ আর যদি সাদা কাপড় হিসেবে এটির জন্য 'রওয়ানাহ' দেবার পর এটিকে রঙ করা হতো, তাহলে শতকরা আরো ২.৫০ ভাগ কর দিতে হতো। এভাবে মোট করের পরিমাণ দাঁড়াতো শতকরা ১৭.৫ ভাগ।[৮০] "উৎপাদনশীলতাকে দাবিয়ে রাখার ব্যাপারে এই বিধিনিষেধের যে প্রভাব তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারলে কেউ আর

৭৫. Milburn, *Commerce*, 232.

৭৬. উদ্ধৃত J. C Sinha, *Economic Annals*, 247.

৭৭. A. Tripathi, *Trade*, 197.

৭৮. ১৮১৭ সালে বৃটিশ ও ভারতীয় বস্ত্রপণ্যের তুলনামূলক বাজারমূল্য সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য দেখুন ঐ, ২৪৭।

৭৯. ঐ, 204.

৮০. C. E. Trevelyan, *Report Upon the Inland Customs and Town Duties of the Bengal Presidency* (ed. by T. Banerjee), (Calcutta, reprint 1976), 99.

ভারতের উৎপাদনশিল্পের দুরবস্থা সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করবে না। কাঁচা তুলা থেকে অবশ্যই সুতা তৈরি করতে হবে, সুতা থেকে অবশ্যই বস্ত্র তৈরি করতে হবে এবং একই স্থানে বস্ত্রকে অবশ্যই রঙ করতে হবে, অন্যথায় কোন 'চৌকি' বা শুল্ক আদায়ের ঘাঁটি অতিক্রম করলে অতিরিক্ত কর দিতে হতো। এ হেন ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্থানের লোকদের নৈপুণ্যের এবং তাদের স্বাভাবিক অবস্থানগত পরিবেশের প্রভাবের ফলে তাদের বিভিন্ন মাত্রার যে সামর্থ্য তা শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে কোনভাবে সহায়তা করতো না।[৮১] অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, এই শুল্কব্যবস্থা ইংল্যান্ডে উচ্চ শুল্কের হার অপেক্ষাও ভারতের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়, কারণ এটা বৃটিশ তুলা উৎপাদনকারীদের স্থানীয় বাজার দখলের পথ সুগম করে এবং ঢাকার মতো উৎপাদনকেন্দ্রগুলির অবক্ষয়কে অবশ্যম্ভাবীভাবে ত্বরান্বিত করে। ১৮৪০ সালে হাউজ অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির কাছে চালর্স ট্রেভেলিয়ন এক করুণ বর্ণনা দেন। বিশপ হেবারের ইন্ডিয়ান জার্নালেও এর মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাওয়া যায়।[৮২] উল্লেখ্য যে, পণ্য চলাচলের উপর ধার্যকৃত শুল্ক আদায়ের সাথে যুক্ত ছিল হয়রানি, বিলম্ব এবং অবৈধ আদায়।[৮৩] ১৮৩৬ সালে বাংলা সরকার পণ্য চলাচলের উপর ধার্যকৃত কর রহিত করে বটে, কিন্তু ততোদিনে ভারতের তুলাজাত পণ্য উৎপাদকেরা ধ্বংস হয়ে যায়।

এই স্বদেশী হস্তশিল্পের অবক্ষয়ের আরেকটি কারণ হলো অভিজাত ও বড় জমিদার পরিবারগুলির পতন। এই পরিবারগুলির প্রত্যেকটিরই বস্ত্র সরবরাহকারী দল ছিল। বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত হওয়ার পর থেকেই উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতার অবসান হয়। ফলে চাহিদার অভাবে সবচেয়ে মিহি মসলিনের উৎপাদনও বন্ধ হয়ে যায়।।[৮৪] এছাড়া শক্তিচালিত তাঁতের কাপড়ের উজ্জ্বল রঙ এবং উন্নতমানের সমাপনী কাজও স্থানীয় লোকদের রুচিকে আকৃষ্ট করে। সব বিদেশী পণ্যের প্রতি ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তীব্র আকর্ষণও এদেশে বিলেতি পণ্যের প্রসারে সাহায্য করে।

এভাবে তুলাজাত বয়নশিল্প শুধু বিদেশী বাজারই হারায় নি, ১৮১৩-১৪ সাল থেকে গ্রেট বৃটেনের শিল্পগুলির দ্বারা ক্রমবর্ধমানভাবে নিজের বাজারও হারায়। ১৮২৪ সাল থেকে বাংলায় বৃটেনের তৈরি সুতা এবং পাকানো তুলার বিপুল আমদানি শুরু হয়। ১৮২৪ সাল থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ সুতা কাটার লোক হয়ে পড়ে বেকার, তাদের জীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুর্দশা ও দুর্ভোগ। ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। এই বিপর্যয় এত ভয়াবহ ছিল যে, ১৮৩৪ সালে ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেলও মন্তব্য করেন, "ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসে এ ধরনের দুর্দশার কোন নজির নেই। তুলাজাত পণ্য

৮১. ঐ, 99-100.

৮২. A. Tripathi, *Trade,* 210.

৮৩. Rohinimohan Chaudhuri, *The Evolution of Indian Industries,* (Calcutta 1939), 326-29.

৮৪. J. C. Sinha, "Dacca Muslin Industry", 48.

উৎপাদনকারী তাঁতীদের অস্থিতে ভারতের মাটি সাদা হচ্ছে।"[৮৫] ১৮২০ ও ১৮৩০ সালের বছরগুলিতে এই অবক্ষয় অত্যন্ত দ্রুত ঘটলেও পুরো উনিশ শতক ধরেই তা বিরাজমান ছিল।

সারণি ১.৭ : ১৮১৬-১৭ থেকে ১৮৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলায় আমদানিকৃত তুলাজাত বস্ত্রপণ্যের এবং তুলাজাত সুতা ও পাকানো তুলার মূল্য (সিক্কা টাকায়)

সন	আমদানিকৃত বস্ত্রপণ্যের মূল্য	যুক্তরাজ্য থেকে আমদানিকৃত বস্ত্রপণ্যের মূল্য	আমদানিকৃত সুতা ও পাকানো তুলার মূল্য	যুক্তরাজ্য থেকে আমদানিকৃত সুতা ও পাকানো তুলার মূল্য
১৮১৬-১৭	পাওয়া যায় নি	৩,১৩,১০২	শূন্য	শূন্য
১৮১৭-১৮	"	১১,২০,৯০৯	"	"
১৮১৮-১৯	"	২৬,৫৫ ,১৯২	"	"
১৮১৯-২০	"	১৫,৮৫,৮৯৮	"	"
১৮২০-২১	৩৪,৫২,৮৫১	২৫,৫৫,৯০৮	"	"
১৮২১-২২	৫৭,৯৬,৮৩১	৪৬,৮১,৮৭০	৪,৯৩০	"
১৮২২-২৩	৭৩,৪১,৪৯৩	৬৫,৭৭,২৭৯	শূন্য	"
১৮২৩-২৪	৪২,১৫,৫৪৮	৩৭,১৬,২৭৮	১১,৮৩৪	"
১৮২৪-২৫	৫৬,০৫,৭৪৬	৪৬,২৭,৭০৫	১,২৪,৮১১	৮১,১৪৫
১৮২৫-২৬	৪৪,১৬,৪০১	৩৬,৮৫,৬৬৭	১,৪৯,৮৬৭	১,৪১,৩০৫
১৮২৬-২৭	৪৯,০৮,৯৭২	৩৮,৮২,২৬৭	৮,২৪,৩৬২	১৮,৪২,১১০
১৮২৮-২৯	৮০,৯২,৮০৯	৭৭,৫৫,৭৪০	৩৪,৮২,৭৩০	৩৩,০০ ,১৮৬
১৮২৯-৩০	৫৪,২৯,৫৪০	৫০,৮৩,৪৪০	১৫,৬৩,৭৭০	১৪,৪৩,৬৯২
১৮৩০-৩১	৬৬,৩৫,৮৬৪	অস্পষ্ট	৩৩,৩৩,১৫৩	৩১,৯৮,৩৪৫
১৮৩১-৩২	৫০,৮২,২২৮	৪৫,১৯,৭২৪	৪৫,৬৫,৭৫১	৪৪,৮৪,১৪৫
১৮৩২-৩৩	৫০,৬৪,১৮৫	৪৩,৯৬,৩৯৯	২৫,৪৫,৪৪০	২২,৮৫ ,৭৫৮
১৮৩৩-৩৪	৫৩,৭০,২৬৬	৪৪,০২,৫৮১	২৬,৮২,৬৫৭	২৪,০৯,৭৯৭
১৮৩৪-৩৫	৫৪,০৭,০০৬	অস্পষ্ট	৩০,৪৮,৯১৭	২৯,৪৩,২৭৯
১৮৩৫-৩৬	৫০,৯৭,৯১৭	৪৪,২৪,১৩৪	৩৮,৭২,৮৪২	৩৬,৯৮,৩৫৬
১৮৩৬-৩৭	৮৪,৩৪,১৫৩	৭৫,২৯,২৫৫	৪৬,৫৪,৯১০	৪১,৮৬,৩০৭
১৮৩৭-৩৮	৬১,৫৫,১১২	৫৪,৫৭,৭৫০	৪৫,৮৯,৬১০	৪৪,০২,৪৭৩

উৎস : India Office Records, P/174/33; *Bengal Commercial Reports*, 1821-22,ঐ, 1829-30, P/174/49, ঐ, 1837-38.

---

৮৫. S. N. Gupta, *British*, 36-37.

২.০ রেশমশিল্প

রেশমের আদি আবিষ্কার এবং রেশম উৎপাদনপ্রথার উদ্ভব হয়েছিল প্রাচীন চীনে। পরে চীন থেকে এর প্রচলন যায় পারস্য, ভারত, জাপান এবং সাধারণভাবে প্রাচ্যের দেশগুলিতে। যদিও কখন এবং কিভাবে বাংলায় এই শিল্পের গোড়াপত্তন হয় তা এখন আর বলা সম্ভব নয়, তবু বলা যায় যে, গৌড়ে শেষ হিন্দু রাজত্বকালে এখানে রেশমের উৎপাদন শুরু হয়। রেশমের তৈরি কাপড় তখন ঢাকা, সোনারগাঁও এবং সপ্তগ্রামের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে রপ্তানি করা হতো। মুসলিম বিজয়ের পর কিছু ধর্মীয় বিধিনিষেধের ফলে এই শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় বটে, কিন্তু দ্রুত এই শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটে। স্থানীয় লোককথা অনুযায়ী, সীতা বসানী নামে এক ব্যক্তি মহানন্দা নদীর কুলে পুনরায় রেশম পোকার চাষ করে। পনেরো শতকের প্রথমদিকে চীনদেশের প্রচারক দলের বর্ণনায় এই শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবুল ফজলের মতে, আকবরের রাজত্বকালে সরকার ঘোড়াঘাটে (রাজশাহী) বিপুল পরিমাণ রেশমবস্ত্র উৎপন্ন হতো। প্রথমদিকের ইউরোপীয় পর্যটকদের বর্ণনাতেও এসব অঞ্চলে খুব কম দামে প্রচুর পরিমাণে ভাল জাতের কাঁচা রেশম পাওয়া যেতো বলে উল্লেখ রয়েছে। ১৬২০ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রেশম সংগ্রহের জন্য পাটনায় একটি কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করে। ১৬৩০ সালে উড়িষ্যার উপকূলেও তারা একই প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু ১৬৫০ সালে কোম্পানি শুধু বাংলা থেকেই সরাসরি রেশম আমদানি করে।

১৬৫৮ সালের দিকে মুর্শিদাবাদ থেকে কিছু দূরে কাশিমবাজারে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজের কারখানা স্থাপন করে। এর আগে ১৬৫৩ সালে একই অঞ্চলে ওলন্দাজেরাও তাদের কারখানা স্থাপন করেছিল। বিখ্যাত ভ্রমণকারী ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার ১৬৬৬ সালে বাংলা পরিভ্রমণ করেন। তিনি এখানে এত বিপুল পরিমাণ তুলা ও রেশম দেখতে পান যে, তাঁর মনে হয়, এই রাজ্যটি শুধুমাত্র হিন্দুস্থান বা মহান মুগলদের সাম্রাজ্যেরই শুধু নয়, বরং আশেপাশের সব রাজ্যের, এমনকি ইউরোপেরও তুলা ও রেশমের সাধারণ ভাণ্ডার।[৮৬] আরেকজন পরিভ্রমণকারী ব্যাপটিস্ট ট্যাভারনিয়ারের হিসাব মতে, সতেরো শতকের মাঝামাঝি কাশিমবাজারে বছরে যে কাঁচা রেশম উৎপাদিত হয় তার পরিমাণ ২.৫ মিলিয়ন পাউন্ড। তাঁর মতে, এই পরিমাণ থেকে ০.৭৫ মিলিয়ন পাউন্ড গুজরাট এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রেরিত হতো এবং কিছু অংশ আবার তাতার ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এশিয়ায় বিপণন হতো। ওলন্দাজেরাও প্রতি বছর কাশিমবাজারে উৎপাদিত কাঁচা রেশম থেকে ০.৭৫ মিলিয়ন পাউন্ড জাপান বা হল্যান্ডে রপ্তানি করতো আর বাকি এক মিলিয়ন পাউন্ড বাংলায় রেশমবস্ত্র উৎপাদনে ব্যবহার করা হতো।[৮৭] বাংলায় কাঁচা রেশমের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ইংরেজ কোম্পানি ১৬৮৬ সালে মালদহে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রেশম এজেন্সি খোলে। এর পর পরই ইউরোপীয় বিনিয়োগ এবং

৮৬. Francois Bernier, *Travels in the Mughal Empire*, Vol. I, 439.

৮৭. J. B. Tavernier, *Travels in India*, (Ball's edition), Vol. II, (London 1889), 2-3.

উদ্যোগের কারণে আরো অনেকগুলি রেশম কারখানা স্থাপিত হয়। যেমন কুমারখালি, সোনামুখি, রাধানগর, ঘাটাল, রামপুর বোয়ালিয়া, সুর্‌পুর, গনুটিয়া, জঙ্গীপুর, সারদা এবং লক্ষ্মীপুর। আঠারো শতকের মাঝামাঝি এই ব্যবসা খুব প্রসারলাভ করে। এ সময়ে মুর্শিদাবাদের কাস্টমস অফিসে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাঁচা রেশম ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করা হয়। অবশ্য এ হিসাবে ইউরোপীয়দের বিনিয়োগের কথা ধরা হয় নি।

২.১ মালবেরী চাষ এবং পালন

ভারতের রেশমশিল্প প্রধানত বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর কারণ, ভারতের অন্যান্য অঞ্চল মালবেরী চাষের অনুকূল ছিল না। বরেন্দ্র অঞ্চলের শক্ত আঠালো মাটিতে এই গাছটি সবচেয়ে ভাল জন্মে। এজন্য মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, মালদহ, নদীয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় এর চাষ করা হয় সবচেয়ে বেশি। তবে দিনাজপুরের দক্ষিণাংশ, রংপুর এবং বগুড়ার পশ্চিমাংশেও এই গাছ সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এসব স্থানের মধ্যে নিঃসন্দেহে মুর্শিদাবাদই ছিল মালবেরী চাষাবাদের প্রাণকেন্দ্র। এমনকি ১৮৭৬ সালের মতো এত বিলম্বেও ৫০,০০০ বিঘা (১৭,০০০ একর) জমিতে মালবেরীর চাষ হতো বলে এক হিসাবে দেখা যায়।[৮৮] মালদহ ছিল অন্যতম জেলা, যেখানে ব্যাপকভাবে মালবেরীর চাষ হতো এবং গুটিপোকা পালন করা হতো। এই জেলার কালেক্টরের মতে, প্রতি বছর ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ বিঘা বা প্রায় ২০,০০০ একর জমিতে মালবেরীর চাষ হতো। এটা অবশ্য ছিল কালেক্টরের সর্বনিম্ন হিসাব। তাঁর মতে, অনুকূল বছরে চাষাবাদের জমির পরিমাণ এই হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি হতো।[৮৯] সতেরো এবং আঠারো শতকের সম্প্রসারণশীল বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের আমলে রাজশাহী জেলাতে মালবেরীর চাষ অনেক বেড়ে যায়।

বৃটিশ শাসনের গোড়াতেই কোম্পানির সরকার মালবেরী গাছের এবং গুটি পোকার গুণগত মান উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নেয়। এর কারণ, উৎপাদনের এবং ভিন্ন ভিন্ন রেশম গুটির ও বান্ড-এর (Bunds) গুণগত মানের ক্ষেত্রে বিরাট তারতম্য ছিল। এছাড়া মারাঠাদের হামলার ফলে বিপুল সংখ্যক উৎপাদনকারী তাদের কাজ পরিত্যাগ করে। ফলে গাছের গুণগত মানের ক্ষেত্রে অবনতি দেখা দেয়। ১৭৬৭ সালে বাংলার গভর্নর হ্যারি ভেরেলস্‌ট ব্যক্তিগতভাবে মালবেরী চাষের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সব রকম উৎসাহ প্রদান করার জন্য জমিদারদের অনুরোধ জানান। ১৭৬৯-৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পর খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রাধান্য পাওয়ায় মালবেরী চাষের ক্ষেত্রে বেশ ভাটা পড়ে। এসময়ে কোম্পানি চাষীদের মালবেরী চাষে উদ্বুদ্ধ করার জন্য খাজনার হার হ্রাস করে।[৯০] বাস্তবে কোম্পানির স্বার্থের

৮৮. Statistical Account of Murshidabad, 152 in W. W Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. IX, *Districts of Murshidabad and Pabna* (London 1876).

৮৯. Hunter, *Statistical Account*, Vol. VII, Maldah, 96-97.

৯০. দেখুন বর্তমান খণ্ডের একাদশ অধ্যায়।

দু'টি খাত— বাণিজ্যিক খাত ও রাজস্বখাতে দ্বন্দ্ব পরে সংঘর্ষের রূপ নেয়। এর ফলে রেশম খাতে বিনিয়োগ হয় ক্ষতিগ্রস্ত।[৯১] রেশম গুটি উৎপাদনকারীরা উচ্চহারে খাজনা দিতে থাকে। তাতে রেশমের দাম বেড়ে যায়। ১৭৭১ সালে জেনারেল কীড বাংলা সরকারের প্রচেষ্টায় সম্পূরক সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে চীন থেকে 'বম্বিকস মোরি'র কিছু ডিম নিয়ে আসেন। কিন্তু তাতে সম্ভবত বিদ্যমান অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয় নি। ১৭৭৫ সালে কলকাতায় কোম্পানির রেশম বিনিয়োগ তত্ত্বাবধায়ক রেশম উৎপাদনকে তার বিশেষ গবেষণার বিষয়বস্তু করে গবেষণানিবন্ধ রচনা করেন। ঐ নিবন্ধে গুটিপোকা প্রতিপালনের যথাযথ স্থানগুলির বর্ণনা দেয়া হয় এবং কি ধরনের মাটিতে মালবেরী চাষ করা যায় সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। কিভাবে গুটিপোকার ডিম ফোটানো যায়, গুটিপোকাকে খাওয়ানো যায়, এগুলির অসুখ ও চিকিৎসা কি, রেশমের খোসার গঠন এবং কিভাবে এগুলি বাছাই করা হবে এবং সবশেষে কিভাবে রেশমের রিল তৈরি করা হবে এসব বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন।[৯২] গুটিপোকা এবং মালবেরীর চারা সরবরাহের সুবিধার্থে ১৭৮০-এর শেষেরদিকে কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনে একটি নার্সারি স্থাপন করা হয়। আরো পরে শান্তিপুরের রেসিডেন্টকে অনধিক ২৫,০০০ টাকা ব্যয়ে মালবেরীর বড় বড় নার্সারি স্থাপনের এবং ভাড়াটে শ্রমিক দিয়ে সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু এতে কোন স্থায়ী কার্যকরী ফললাভ সম্ভব হয় নি। "১৮৩৫ সালে যে পদ্ধতিতে এবং যে ধরনের মালবেরীর চাষ করা হতো তা ছিল একশ' বছর আগের মতোই। নতুন ধরনের গুটিপোকা চালু করার চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু চীন থেকে যে পোকা আনা হয়েছিল তা সফলভাবে প্রজনন করা সম্ভব হয় নি। এছাড়া এসব উদ্যোগকে সফল করার মতো তেমন আন্তরিকতাও তখন পরিলক্ষিত হয় নি"।[৯৩]

২.২ কাঁচা রেশম উৎপাদন এবং রপ্তানি

যদিও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই শিল্পটির রেশমগুটি চাষের প্রত্যক্ষ যত্ন নেয় নি, তবু রেশম উৎপাদনের ব্যাপারে এটি যথেষ্ট আগ্রহ দেখায়। তারা কাঁচা এবং যন্ত্রোৎপাদিত রেশমের জন্য অনেক কারখানা স্থাপন করে এবং উৎপাদিত পণ্য ইংল্যান্ডে রপ্তানির উদ্যোগ নেয়। কিন্তু ক্রমশ তারা অবস্থার চাপে পড়ে কাঁচা রেশম উৎপাদন ও রপ্তানি করার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এর পিছনে অবশ্য কতগুলি কারণ ছিল। কাঁচা রেশমের ব্যবসা ছিল অত্যন্ত লাভজনক। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৫৭ সালের পর বাংলায় কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানি কাঁচা রেশম উৎপাদনের দিকে ক্রমশ

৯১. M Huq, *The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, 1698-1784,* (Dhaka 1964), 217.

৯২. Abdul Ali, "The Silk Industry in Bengal in the Days of John Company", *Bengal Past and Present,* (1925), 36.

৯৩. Warner, *The Silk Industry of the United Kingdom : Its Origin and Development,* (London n. d.), 383-84.

মনোযোগ দেয়। ১৭৬৯ সালে কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরস ঘোষণা করে, "কাঁচা রেশমের ব্যবসা ছাড়া আমাদের ব্যবসার আর কোন শাখা নেই যেটাকে আমরা সম্প্রসারিত করতে অধিকতর আগ্রহী হতে পারি এবং আমরা চাইবো যে, যারা এখন রেশম বয়ন শিল্পে ব্যস্ত তারা সেটা ছেড়ে দিয়ে কাঁচা রেশম পেঁচানোর কাজে এগিয়ে আসুক।"[৯৪] পরে যখন চীন থেকে আমদানি সঙ্কুচিত হয়ে আসে এবং ইউরোপে সরবরাহ হয়ে পড়ে অনিশ্চিত, তখন কাঁচা রেশম উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়ে যায়।

রপ্তানিনীতি পরিবর্তনের সাথে সাথে কোম্পানি বাংলার কাঁচা রেশমের গুণগত মান উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়। এই কাঁচা রেশম ছিল একাধারে অমসৃণ এবং ভাঙা ভাঙা। বাংলার কাঁচা রেশমের নিম্নমানের কারণ নির্ণয়ের জন্য ১৭৫৭ সালে রিচার্ড ওয়াইল্ডারকে কাশিমবাজার পাঠানো হয়। ওয়াইল্ডার ১৭৬১ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বাংলায় কর্মরত ছিলেন। এই অন্তর্বর্তী সময়ে তিনি রেশম পেঁচানোর জন্য একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। পদ্মার পশ্চিম তীরে বসবাসরত গ্রামবাসীদেরকে রেশমের রিল বানানোর কৌশলও তিনি শেখান। তিনি কোম্পানির বিভিন্ন রেশম কারখানাও পরিদর্শন করেন। কাশিমবাজারের কারখানায় তাঁর রেশম পাকানোর মেশিনটি বেশ কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়। এই মেশিনের মাধ্যমে তাদের ত্রুটিপূর্ণ রেশম পাকানোর ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সংশোধন হয়। চামিয়ার নামক আর এক ভদ্রলোককে ১৭৬৯ সালে কাঁচা রেশম পাকানোর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি পরের বছরই মারা যান। ১৭৭০ সালে কোর্ট অব ডিরেক্টরস ওয়াইজ, রবিনসন ও অবার্টকে কাঁচা রেশম পাকানোর তত্ত্বাবধায়করূপে পাঠান। তাদের সঙ্গে রিল বানানোর জন্য কর্মচারী এবং ইতালি ও ফ্রান্স থেকে নির্বাচিত যন্ত্রী দেয়া হয়। হস্তচালিত যন্ত্র এবং কারিগরি যন্ত্রের মডেল তাদেরকে দেয়া হয় যেন তারা কাজ শুরু করতে পারে। ১৭৭১ সালে আরো একদল সুতা পাকানোর লোক ইতালি থেকে আনীত হয়। এদের সম্মিলিত প্রয়াসে কাশিমবাজার, বোয়ালিয়া, কুমারখালি এবং রংপুরে গুটি হতে রেশম নিষ্কাশনের যন্ত্র তৈরি হয় ও এগুলির প্রত্যেকটি একশ' ফার্নেস পর্যন্ত ধারণ করতে পারতো। "১৭৭০ ও ১৭৭৫ সালের মধ্যে কোম্পানির কারখানাগুলিতে ইতালীয় পদ্ধতিতে রিল করা চালু হয় এবং উৎপাদনের মানও বেশি বৃদ্ধি পায়।[৯৫] ইতালীয় পদ্ধতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৭৮০ সালে বমগার্টনার, ব্রিগন্টি, ফ্রেশার্ড এবং পগিওকে অন্তর্ভুক্ত করে আরো একদল যন্ত্রী পাঠানো হয়। কোম্পানির এই অবিরত উদ্যোগের ফলে রিল করার কাজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

৯৪. Despatches to Bengal, Vols. 3 & 17, March 1769, cited in K. M. Mohsin, "অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদাবাদের রেশমশিল্প", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৭৬, ১১৫।

৯৫. Report on an Inquiry into the Silk Industry in India, (by Maxwell-Lefroy and E. C. Ansorge), Vol. 1, (Calcutta 1917), 9.

সারণি ২.১ গ্রেট ব্রিটেন কর্তৃক বাংলা থেকে ১৭৭৩-১৮৩৫ সালে আমদানিকৃত কাঁচা রেশমের পরিমাণ (ক্ষুদ্র পাউন্ড ওজনে)

সন	পরিমাণ	সন	পরিমাণ
১৭৭৩	১,৪৫,৭৭৭	১৮০৫	৮,৩৫,৯০৪
১৭৭৪	২,১৩,৫৪৯	১৮০৬	৪,০৮,৫২৩
১৭৭৫	২,০৮,৮৮১	১৮০৭	৪,৯৩,৫৮৫
১৭৭৬	৫,১৫,৯১৩	১৮০৮	৩,৭৮,৪৯৮
১৭৭৭	৫,৬৩,১২১	১৮০৯	১,৬২,৭৪৭
১৭৭৮	৬,০২,৯৬৪	১৮১০	৫,৮৪,৭১৮
১৭৭৯	৭,৩৭,৫৬০	১৮১১	৪,০৪,৭৫৬
১৭৮০	২,৩৫,২১৬	১৮১২	৯,৮২,৪২৭
১৭৮১	৭,৮৫,৬৭৩	১৮১৩	১০,৮৪,৩৫
১৭৮২	৭৭,৬১০	১৮১৪	৮,৩৬,৯৬৬
১৭৮৩	৬,১১,০৭১	১৮১৫	৮,০২,২৮৬
১৭৮৪	১,৪৯,৩৯৪	১৮১৬	৭,৭৯,৭৬৪
১৭৮৫	৩,২৪,৩০৭	১৮১৭	৫০২,৩৩৫
১৭৮৬	২,৫২,৯৮৫	১৮১৮	১,১৬০,৯৭৬
১৭৮৭	১,৭৮,১৮০	১৮১৯	৭৫১,০২৭
১৭৮৮	৩,০৫,৯৬৫	১৮২০	১০,৭১,৪৪৭
১৭৮৯	৪,২৭,২৬৩	১৮২১	৯,৯০,৪৬৩
১৭৯০	৩,২০,৮২৬	১৮২২	১,০৪২,৬১৭
১৭৯১	৩,৭৩,৫০৩	১৮২৩	১১,৬১,১৮৬
১৭৯২	৩,৮০,১০৭	১৮২৪	৯,৩১.৬৪৯
১৭৯৩	৭,৩৬,০৮১	১৮২৫	৯,১৯,৪৩৬
১৭৯৪	৫,২১,৪৬০	১৮২৬	১,২৩৭,০২৩
১৭৯৫	৩,৮০,৩৫২	১৮২৭	১.০২৬.০৩৯
১৭৯৬	৩,৪৭,৯৩৬	১৮২৮	১,১৩৬,৩০৯
১৭৯৭	৯২,২০৪	১৮২৯	১৩,৮৭,৭৫৪
১৭৯৮	৩,৫৩,৩৯৪	১৮৩০	১১,৮৬,১৬৩
১৭৯৯	৬,৪৪,৮১৯	১৮৩১	১০,৯৪,৮৭৭
১৮০০	৫,৮৩,০৮৬	১৮৩২	৯,৫৬,৪৫৩
১৮০১	৪,৪৪,৮৬২	১৮৩৩	৭,৫০,৯৮০
১৮০২	২,৪৪,৮০৯	১৮৩৪	৮,১০,৬৪১
১৮০৩	৪,০৯,০৯৩	১৮৩৫	৭,২৭,৫৩৫
১৮০৪	৬,২১,৭১০		

উৎস : George Watt, A *Dictionary of the Economic Products of India*, Vol. VI, Part III. (second reprint, Delhi 1972), 189, 195.

সুতা পাকানোর পদ্ধতিগুলির উন্নতির ফলে ১৭৭২ সাল হতে বাংলা থেকে রেশম নিষ্কাশন যন্ত্রে গুটানো রেশম রপ্তানি শুরু হয়। পুরনো স্থানীয় পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়েও ১৭৭৫ সালের আগে নতুন পদ্ধতি সম্পূর্ণ কার্যকর হয় নি। অন্তবর্তীকালীন সময় কাটে দালান তৈরি, ফার্নেস ও রিল বসানো, কারিগরদের শিক্ষাদান এবং তার চেয়ে বড় কথা, ১৭৬৯-৭০ সালের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের প্রভাব কাটিয়ে উঠার প্রচেষ্টায়। এই বছরগুলিতে গড়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র ১৮৭,৪৯৪ ক্ষুদ্র পাউন্ড।[৯৬] পরবর্তী বছরগুলিতে রপ্তানির পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৭৭৬ সাল থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত এর গড় ছিল ৫৬০,২৮৩ ক্ষুদ্র পাউন্ড (সারণি ২.১)। কিন্তু কোম্পানি এই সম্প্রসারিত রপ্তানিবাণিজ্য থেকে লাভবান হতে পারে নি। বরং উল্লিখিত বছরগুলিতে ৮৮৪,৭৪৪ পাঃ লোকসানের বোঝা বহন করতে হয়।[৯৭] এর কারণ হিসেবে বলা হয়, যেসব ঠিকাদার কোম্পানির পণ্য সরবরাহ করতো, তারা ছিল চরম দুর্নীতিপরায়ণ এবং কোম্পানির স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন।"কোম্পানির স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া হয়; উৎপাদনকারীরা নির্যাতিত হয় এবং এর স্বাভাবিক ফলস্বরূপ নিম্নমানের পণ্য সরবরাহ করা হয় অতিরিক্ত মূল্যে।"[৯৮] রেশমের ব্যবসাকে লাভজনক করার লক্ষ্যে এরপর লর্ড কর্নওয়ালিস কয়েকটি বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করেন। ১৭৮৭ সালে তিনি এজেন্সি পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কাশিমবাজার কারখানার মর্যাদাকে 'চীফশিপ' থেকে 'রেসিডেন্সির' পর্যায়ে নামিয়ে আনেন। "... চুক্তিতে সরবরাহের পদ্ধতি রহিত হয় এবং এর বিকল্প হিসেবে এজেন্সি প্রথা চালু করে দুর্নীতির পথ রুদ্ধ করা হয়; প্রচলিত ব্যবস্থায় ত্রুটিগুলির সংশোধন সাধন করা হয়; উৎপাদনকারীরা স্বস্তিলাভ করে; বস্ত্রপণ্য পুনরায় বাজার পায় এবং সবচেয়ে পছন্দের পণ্য যথাযথ ও হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ করা হয়।"[৯৯] ভবিষ্যতে লোকসানের পথ বন্ধ করার জন্য ১৭৯৬ সালে আরো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফ্লোরেনটাইন্স ও সারসেনেন্টস নামের বস্ত্রাদি ছাড়াও ভেলভেট ও রিবনে ব্যবহারের জন্য কোম্পানির বাংলা রেশম ইংল্যান্ডে এনে অরগেনজাইনে চুবিয়ে নেয়া হতো। ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের সময়ের যুদ্ধবিগ্রহের ফলে উদ্ভূত টালমাটাল অবস্থা সত্ত্বেও কোম্পানি এসময় বেশ অর্থোপার্জন করে। সংস্কারগুলি কোম্পানির জন্য সুফল বয়ে আনে এবং আঠারো বছরে কোম্পানি ৬১৬,৭৮১ পাউন্ড নীট লাভ করে। প্রতি বছর এই লাভের গড় হচ্ছে ৩৪,২৬৬ পাউন্ড অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১৩ ভাগ (সারণি ২.২)। মহাদেশীয় অবরোধ চাপিয়ে দেবার ফলে এবং ১৮১১ সাল থেকে ইউরোপীয় রেশমের আমদানি বন্ধ হবার ফলে বাংলার কাঁচা রেশমের বাজার আরো তেজিভাব অর্জন করে। কাঁচা রেশমের সরবরাহ কমে যাওয়ার ফলে বৃটিশ উৎপাদকেরা

৯৬. George Watt, *Economic Products,* Vol. VI, Part III, 186.

৯৭. ঐ।

৯৮. ঐ, 187

৯৯. ঐ।

তাদের এবং বৃটিশ রেশম ব্যবসায়ীদের অধীনে কর্মরত দরিদ্র শ্রেণীকে শত্রুপক্ষের খামখেয়ালিপূর্ণ বাণিজ্যনীতির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কোর্ট অব ডিরেক্টরসের কাছে আবেদন করে।[১০০] বাংলা সরকারকে বিষয়টি অবহিত করার পর রপ্তানি চাঙ্গা করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ১৮৩০ সাল অব্দি এ ব্যবস্থা বলবৎ থাকে। এরপর অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে রপ্তানিবাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। এসব কারখানার নতুন মালিক হয় ইউরোপীয় ফার্ম। ফার্মগুলির মধ্যে প্রধান হলো ওয়াটসন এন্ড কোম্পানি, জেমস ল্যায়াল এন্ড কোম্পানি, লুইস পেইয়েন এ্যান্ড কোম্পানি এবং বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানি।

সারাণ ২.২ : ১৭৮৬-১৮০৩ সালে রেশম ব্যবসা খাতে কোম্পানির লাভালাভের বিবরণ (অঙ্কের হিসাব পাউন্ডে)

সন	জাহাজভাড়া ও অন্যান্য খরচসহ মোট সংগ্রহমূল্য	ইংল্যান্ডে বিক্রিত মূল্য	লাভ	লোকসান
১৭৮৬	১,৯২,৮৯৮	১,৯৮,৫০৭	৫,৬০৯	
১৭৮৭	১,৩৩,৭৯৫	১,৪৫,৭১২	১১,৯১৭	
১৭৮৮	২,১২,৩৫৭	২,২১,৮৮৮	৯,৫৩১	
১৭৮৯	২,৭৬,৭৩২	২,৮৯,২৭১	১২,৫৩৯	
১৭৯০	২,৬৮,৭৯০	৩,০২,৯৯৩	৩৪,২০৩	
১৭৯১	২,৯০,১৫৪	৩,২০,৩৯৫	৩০,২৩০	
১৭৯২	২,৬২,৯০২	২,৭৬,৩১৭	১৩,৪১৫	
১৭৯৩	২,৭৪,৫৫৩	২,২১,৩২৯	—	৫৩,২২৪
১৭৯৪	২,৯০,৪১৯	৩,০৯,৭৪৩	১৯,৩২৪	
১৭৯৫	৩,৭৮,৫১২	৩,৮১,৩৮৫	২,৮৭৩	
১৭৯৬	৩,৩৫,৩১৫	৩,২৭,৪২৭	—	৭,৮৮৮
১৭৯৭	২,৬২,৯১৭	২,৫৮,৬৪৪	—	৪,২৭৩
১৭৯৮	২,৭৭,৯৯০	৩,২২,৮৭৩	৪৪,৮৮৩	
১৭৯৯	৩,২৪,৪৬০	৩,৯০,১৪৯	৬৫,৬৮৯	
১৮০০	২,০৮,৯৬৯	২,৯৭,৬৪৫	৮৮,৬৭৬	
১৮০১	২,৬২,৪২৮	৩,৯৫,৪১০	১,৩২,৯৮২	
১৮০২	১,৫৬,৫০২	২,৬৯,২৪৯	১,১২,৭৪৭	
১৮০৩	১,৯৫,১১৭	২,৯২,৬৫৯	৯৭,৫৪২	
মোট	৪৬,০৪,৮১৫	৫,২২১,৫৯৬	৬,৮২৯৬৬	৬৫,৩৮৫

উৎস : George Watt, ঐ 190

---

১০০. এ খণ্ডের একাদশ অধ্যায় দেখুন।

কোম্পানিগুলি রপ্তানিবাণিজ্য চাঙ্গা রাখে এবং ১৮৩৬ থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত পরবর্তী বিশ বছরে রেশম রপ্তানি সম্প্রসারণে সাফল্যলাভ করে। এসময়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রতি বছর গড়ে ১৪,৩৫,২২২ পাউন্ড।[১০১] বেশ কিছু সময় পর্যন্ত বাংলার কাঁচা রেশম রপ্তানিতে প্রবল তেজিভাব বজায় থাকে। ১৮৫০-এর দশকে ও ১৮৬০-এর দশকের প্রথমদিকে রেশম গুটিপোকায় মারাত্মক ব্যাধির সংক্রমণ ঘটলে ইউরোপের রেশমশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু বাংলা রেশমের বাজার অব্যাহত থাকে। ১৮৬০-এর দশকে ইউরোপে রেশমশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং উন্নততর মানের রেশম উৎপন্ন হয়। এর ফলে ও অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিতের জন্য (যা পরে আলোচনা করা হবে) বাংলার রেশমশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদেশের কাঁচা রেশমের রপ্তানি ১৮৭০ সাল থেকে দ্রুত কমতে থাকে। ১৮২০ সাল থেকে রিল করা মালবেরী রেশমের রপ্তানি এক মিলিয়ন পাউন্ড ওজন ছাড়িয়ে যেতে শুরু করে। ১৮৫৭ সালে (যে বছর বর্জ্য এবং বন্য রেশমের ব্যবহার আবিষ্কৃত হয়) ভারতের রপ্তানি দাঁড়ায় এক মিলিয়ন সাত লক্ষ পাউন্ড। বিশ বছর পর রিল করা মালবেরী রেশমের বিক্রি দাঁড়ায় আগের পরিমাণের মাত্র চার ভাগের এক ভাগ। বিগত চার বছরে (১৮৮৭-৮৮ থেকে ১৮৯০-৯১) এর গড় দাঁড়ায় চার লক্ষ পাউন্ড।[১০২] পরবর্তী বছরগুলিতে ভারত থেকে বিদেশে কাঁচা রেশম রপ্তানি ক্রমশ কমতে থাকে। ১৯২১-২২ সালে তা দাঁড়ায় সাত লাখ টাকারও নীচে, যা ছিল সে বছর কলকাতা থেকে রপ্তানিবাণিজ্যের মাত্র শতকরা ০.০৮ ভাগ।[১০৩]

সমুদ্রপথে বিদেশে কাঁচা রেশম রপ্তানি করা ছাড়াও রেশমের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অভ্যন্তরীণ বাজার ছিল। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের আগে মুর্শিদাবাদে প্রায় দশজন ভারতীয় বণিক অবস্থান করতো, যারা একত্রে ১৩,০০০ থেকে ২০,০০০ মণ পর্যন্ত কাঁচা রেশম সমুদ্রপথে বোম্বে এবং সুরাটে রপ্তানি করে।[১০৪] ১৭৬৫ সালে সুরাটে যে কাঁচা রেশম ও

১০১. Warner, *"Silk Industry"*, 384

১০২. Watt, *Economic Products*, 201 The actual figures of raw silk exported from British India, other than Tasar and wild silk, were as follows

1886-87	410,640	lbs.
1887-88	361,869	"
1888-89	381,878	"
1889-90	502,301	"
1890-91	369,007	"

দেখুন, Watt, ঐ, 199

১০৩. *Report on the Maritime Trade of Bengal, 1921-22,* 14 There had been a growth of a traffic in waste and wild silks from about 1858 but that too had diminished as the figure indicates However, the "entire returns of raw silk, sent from India during the administration of the East India Company be accepted as having been reeled silk." Watt, *Economic Products*, 196.

১০৪. N K Sinha, *The Economic History of Bengal,* Vol I, 112.

বস্ত্রপণ্য রপ্তানি করা হয় তার পরিমাণ ছিল ১৯৫ বেল এবং এর মূল্য ২,৫৭,৬৫০ টাকা।[১০৫] স্থলপথ ও জলপথে নিজামদের রাজ্যেও কাঁচা রেশম রপ্তানি করা হতো। সেখানে এই রেশম দিয়ে পরিধেয় কাপড় তৈরি করা হতো। এ ছাড়াও স্থলপথে নাগপুর, বেনারস, মির্জাপুর প্রভৃতি ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় শহরগুলির বাজারেও কাঁচা রেশম

সারণি ২. ৩ : ১৯০২-০৩ সন থেকে ১৯২১-২২ সন পর্যন্ত বাংলা থেকে বিদেশে যে কাঁচা রেশম রপ্তানি করা হয় তার পরিমাণ (পাউন্ডে) এবং মূল্য (টাকায়)

সন	পরিমাণ	মূল্য
১৯০২-০৩	৫,৯৭,৫৯৭	৪৬,৩৩,৫৭৮
১৯০৩-০৪	৫,০৬,৮৪২	৪০,৩৬,৪৯৯
১৯০৪-০৫	৪,০৮,৩৭৬	৩১,৭৪,১৩১
১৯০৫-০৬	৪,৮৬,১২৪	৩৭,৩০,৫৮২
১৯০৬-০৭	৬,৩৪,৯৮২	৫০,১৩,২২৪
১৯০৭-০৮	৫,১২,১৪২	৪১,৩৩,৫৫৯
১৯০৮-০৯	৪,৫৩,১২৮	৩৪,০৫,৫২৮
১৯০৯-১০	৩,১৯,৭০২	২৩,০১,১০০
১৯১০-১১	৩,২৭,৯৪৭	২৩,১২,৬০৫
১৯১১-১২	১,৯০,৪২৫	১৪,০৪,০৫১
১৯১২-১৩	১,০৪,৫৮৭	৭,৭৮,৭৬৮
১৯১৩-১৪	৫২,৯৬১	৪,৬৫,০৫৫
১৯১৪-১৫	২৮,৯০৫	২,৬৯,৫৬০
১৯১৫-১৬	২৩,৮৩৭	২,০৬,৪০০
১৯১৬-১৭	৭০,৪৬৭	৮,১৮,৩৬৬
১৯১৭-১৮	৪৪,৩০৩	৫,২৬,৬৪০
১৯১৮-১৯	৫৩,০২৪	৮,৫২,৮৬০
১৯১৯-২০	২১,৪৯৪	৩,০৭,০১০
১৯২০-২১	১৬,৪১৮	৩,১৫,৩৬০
১৯২১-২২	২০,৩১৭	৩,৮২,৯৫৫

উৎস : *Report on the Administration of Bengal*, 1911-12, 24 ; ঐ, 1921-22, 25. যে অঙ্ক দেখানো হয়েছে তা থেকে রেশম নিষ্কাশন বর্জ্য এবং রেশমগুটির পরিমাণ ও মূল্য বাদ দেয়া হয়েছে।

১০৫. Eur Ms. D 281, উদ্ধৃত Sinha, 128.

রপ্তানি করা হতো। পুনা, লাহোর, মুলতান এবং মধ্য ভারতের ছত্তরপুরেও কাঁচা রেশম পাঠানো হতো। আঠারো শতকের শেষেরদিক থেকে যেসব ব্যক্তি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল (কোম্পানির জাহাজের কমান্ডার ও কর্মকর্তাবৃন্দ) এবং ১৭৯৩ সালের আইন দ্বারা যাদের বিনাশুল্কে পণ্য বহনের সুবিধা দেয়া হয়েছিল, তারাও করমন্ডল ও মালাবার উপকূলে কাঁচা রেশম রপ্তানি করতো। লন্ডন, আরব এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল, পিউলো পেনাং এবং এর পূর্বাঞ্চলীয় অনেক স্থানেই যেতো তাদের সামগ্রী।

সারণি ২.৪ : ১৯০২-০৩ সাল থেকে ১৯১১-১২ সাল পর্যন্ত বাংলা থেকে অন্যান্য প্রদেশগুলিতে উপকূলীয় বাণিজ্যের মাধ্যমে যে কাচা রেশম রপ্তান করা হয় তার পরিমাণ (পাউন্ডে) এবং মূল্য (টাকায়)

সন	পরিমাণ	মূল্য
১৯০২-০৩	৩০,৪৭০	১,৭৪,১৮৪
১৯০৩-০৪	২৩,৭৪০	১,২৮,৮৬০
১৯০৪-০৫	২০,৭৯৫	১,১০,৭২৫
১৯০৫-০৬	১৭,৭৬৫	১,০৫,৫৯৬
১৯০৬-০৭	১৬,৮৩০	১,১৭,৩৪০
১৯০৭-০৮	২২,৬৪৫	১,৭৮,৭০৩
১৯০৮-০৯	২৬,৭০৮	১,৮৭,৭৬৬
১৯০৯-১০	১৯,২০৪	১,৫৫,৪৪০
১৯১০-১১	১৭,৪০৮	১,৫৯,৬৬০
১৯১১-১২	১৫,৩৩৬	১,৪৪,৯৫০

উৎস : *Report on the Administration of Bengal,* 1911-12, 24.

১৭৯৫-৯৬ সাল থেকে ১৮০৫-০৬ সাল পর্যন্ত তারা উল্লিখিত অঞ্চলসমূহে ১.৬১ কোটি সিক্কা টাকা মূল্যের কাঁচা রেশম রপ্তানি করে। এর মধ্যে লন্ডনে সরবরাহ করা হয় মাত্র ৪০ লক্ষ সিক্কা টাকা মূল্যের পণ্য।[১০৬] কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দশকে কাঁচা রেশমের অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় ক্রমশ মন্দা দেখা দেয়। এর উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হলো প্রায় সব উপকূলীয় অঞ্চলে রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়া। ১৮৭৭-৭৮ সালে বাংলা থেকে অন্যান্য প্রদেশে কাঁচা রেশমের উপকূলীয় রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬৮৪,৮৮৮ পাউন্ড (এর মধ্যে মালবেরী রেশম ছাড়া অন্য রেশমও ছিল)।[১০৭] কিন্তু বিশ শতকের শুরুতে এই বাণিজ্য কমতে

১০৬. Watt, *Economic Products,* 191

১০৭. *Report on the Administration of Bengal, 1911-12,* 24.

কমতে প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। ১৯০২-০৩ সাল থেকে ১৯১১-১২ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরের গড় পরিমাণ ছিল মাত্র ২১,০৯০ পাউন্ড এবং এর মূল্য ছিল ১,৪৬,৩২২ টাকা (সারণি ২.৪)।

২.৩ রেশমি বস্ত্র উৎপাদন এবং রপ্তানি

রেশমি বস্ত্রপণ্য এবং মিশ্রিত বস্ত্র উৎপাদন এক সময় প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান এবং রাজশাহী বিভাগে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল। বস্তুত সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারত থেকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রপ্তানির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক রপ্তানিপণ্য ছিল রেশমি বস্ত্র। সাধারণত ইংল্যান্ডে তৈরি হতো না এরকম বস্ত্র, যেমন, সারসেনেট, তাফতা এবং অন্যান্য সাদামাটা বা রেখাঙ্কিত রেশম ও পেলেংস আমদানি করা হতো। এতদিন পর্যন্ত ফ্রান্স, ইতালি বা হল্যান্ড থেকে সমজাতীয় যে বস্ত্র আমদানি করা হতো এগুলির দাম ছিল তার তুলনায় অনেক সস্তা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রেশমি এবং মিশ্রিত রেশমবস্ত্রের উৎপাদন দীর্ঘদিন উৎসাহলাভ করে নি। ১৬৭৩ সালে ও পুনরায় ১৬৮১ সালে স্পাইটেলফিল্ডস-এর তাঁতীরা অভিযোগ করে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক পাকানো রেশম এবং অন্যান্য চটকদার পরিধেয় বস্ত্র আমদানির ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের ক্রোধ এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে, ১৬৯৭ সালে তারা লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউজ আক্রমণ করে। ফলে ১৭০০ সালে পার্লামেন্টে আইন পাশ করা হয়— "এতদ্দ্বারা এখন থেকে গ্রেট বৃটেনে পাকানো সিল্কের চুড়ি অথবা রেশম মিশিয়ে তৈরি কোন বস্তু পরিধান বা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করা হলো।" প্রথম তিন জর্জের রাজত্বকালেও অনুরূপ আইন পাশ করা হয়। এই আইনগুলি অবশ্য কোম্পানির পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে নি। এজন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিভিন্ন দেশে পুনঃরপ্তানির লক্ষ্যে নিয়মিত পাকানো সিল্ক রপ্তানি অব্যাহত রাখে। কোন কোন অঞ্চলে, যেমন কাশিমবাজার, মালদহ ও শান্তিপুরে কোম্পানি বস্ত্রপণ্যের উৎপাদন চালিয়ে যেতে থাকে।

দীর্ঘকাল ধরে বাংলা থেকে প্রধানতম যে পণ্যটি রপ্তানি করা হতো, তার নাম কোরা বা সাদামাটা ভারতীয় অরঞ্জিত রেশমি বস্ত্রপণ্য। এগুলি ইংল্যান্ডে আমদানি করা হতো প্রধানত ছাপানোর জন্য এবং পরে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে রপ্তানি করার লক্ষ্যে। ১৮৩৮ ও ১৮৩৯ সালে যথাক্রমে ৩,২৬,০০০ এবং ৩,৯০,০০০ খণ্ড কোরা আমদানি করা হয়। এ থেকে যথাক্রমে ১৬,০০০ ও ৩৮,০০০ খণ্ড মাত্র দেশে ব্যবহারের জন্য রেখে দেয়া হয়।[১০৮] ইউরোপে রপ্তানির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য হলো বন্দনা বা ছাপানো ভারতীয় রুমাল। অবশ্য এর সঙ্গে অন্যান্য রুমালও থাকতো। কম দাম ও ভারতীয় রেশমের ব্যাপারে ফরাসীদের আগ্রহের ফলে এই ব্যবসা বেশ প্রসারলাভ করে। ১৮৩৭ সালে

১০৮. R. C. Dutt, *The Economic History of India in the Victorian Age*, 117.

ইংল্যান্ড থেকে শুধুমাত্র ফ্রান্সেই ১,৭৪,৫০০ পাউন্ড মূল্যের বন্দনা ও অন্যান্য রুমাল রপ্তানি করা হয়। কোম্পানির অন্য একটি রপ্তানিপণ্যের নাম 'চোপ্পা'। বিপুল সংখ্যায় বিদেশে রপ্তানি করা হতো সোনার ব্রোকেড, যেগুলিকে 'কিনকব' নামে অভিহিত করা হয়। অন্যান্য মিহি রেশমবস্ত্রের উৎপাদন ১৮৯০ সাল নাগাদ অত্যন্ত কমে যায়। আসামের মুগা রেশম দিয়ে ঢাকায় *কাসিদা* নামের একটি বিশেষ ধরনের বস্ত্র বয়ন করা হতো। এটা ছিল নকশা করা মসলিন বস্ত্রখন্ড। সচারচর মুসলমানরা নামাজের সময় এ বস্ত্র পরিধান করতো। এটা দিয়ে পাগড়ীও বাঁধা হতো। বয়ন করার সময় এটার উপর নকশার ছাপ দেয়া হতো এবং মহিলারা পরে এটার উপর কারুকাজ করতো। আরব ও তুরস্কের লোকদের কাছে এই বস্ত্র ছিল খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু তুর্কীদের ক্ষমতায় ভাটা পড়ার পর কাসিদা রপ্তানি বহুলাংশে কমে যায়। "পূর্বে তুরস্কের প্রতিটি সৈন্যই কাসিদার পাগড়ী ব্যবহার করতো। আজকাল শুধু উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাই এধরনের পাগড়ী ব্যবহার করে থাকে। সাধারণ সৈনিকেরা এখন ব্যবহার করে 'ফেজ'।"[১০৯] ডঃ টেইলরের সময় ঢাকায় বছরে প্রায় ১,২০,০০০ খণ্ড বস্ত্র তৈরি হতো। ১৯০৭-০৮ সালের দিকে ঢাকা থেকে যে কাসিদা রপ্তানি করা হয় তার মোট মূল্য ছিল প্রায় দু'লাখ টাকা।[১১০] রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পরিশোধিত তুলা এবং আসামের রেশম দিয়ে ঢাকায় আজিজি নামের বাফতা বস্ত্রও উৎপাদন করা হতো। এই বস্ত্র ইতিপূর্বে রপ্তানি করা হতো এবং ইহুদীরা তা পরিধান করতো। ১৮৯০ সাল নাগাদ এই বস্ত্রের বয়ন বেশ কমে আসে।[১১১]

বিদেশে রপ্তানির জন্য উৎপাদিত বস্ত্র ছাড়াও দেশে বিভিন্ন ধরনের রেশমবস্ত্রের বেশ চাহিদা ছিল। সমগ্র ভারতের হিন্দু জনগণ কতগুলি ধর্মোৎসবের সময়ে স্থানীয় রেশমের কাপড় ব্যবহার করতো। খুংরু এবং গুটি হতে নিষ্কাশিত রেশম দিয়ে অজস্র চাদর, ধুতি, শাড়ি ও জরি উৎপন্ন হতো। মোটাবস্ত্রের জন্য ব্যবহার করা হতো খুংরু রেশম এবং মিহিবস্ত্রের জন্য গুটি নিষ্কাশিত রেশম। সম্পূর্ণ খণ্ড ছাড়াও উড়িষ্যা ও উত্তর ভারতে রপ্তানির জন্য মটকার থান (মালবেরী রেশমের বিদীর্ণ গুটি দিয়ে) তৈরি করা হতো। স্যুট, ফ্রক ও অন্যান্য মোটাবস্ত্র তৈরি করার জন্য মটকা ব্যবহার করা হতো। এই বস্ত্রের দাম ছিল বেশ সস্তা। হাতেকাটা সুতার তৈরি বলে এটা অমসৃণ ছিল। বাঁকুড়া ও বীরভূমে তসর থান দিয়ে এক ধরনের বস্ত্র তৈরি করা হতো। ইরি থানের স্থানীয় ব্যবসা ছিল বেশ জমজমাট। এটি এককালে দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়ায় উৎপন্ন হতো। রপ্তানির জন্য মুর্শিদাবাদেও এটা উৎপন্ন হতো। ঢাকা, ভাগলপুর, বাঁকুড়া এবং মালদহে বাফতা নামের তসর ও তুলামিশ্রিত বস্ত্র বয়ন করা হতো। এধরনের বস্ত্রে লম্বালম্বি টানা সুতা ছিল তসরের আর পড়েনের সুতা ছিল তুলার।

১০৯. G N. Gupta, *The Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam from 1907-08,* 11

১১০. ঐ।

১১১. E. W. Collin, *Report on the Existing Arts and Industries in Bengal,* (Calcutta, 1890), 10.

এই শিল্পের অবক্ষয় ঘটে অত্যন্ত দ্রুত। ডক্টর বি. হ্যামিল্টনের হিসাব অনুযায়ী ১৮১০ সালে মালদহ থেকে প্রতি বছর রপ্তানিকৃত বস্ত্রের মূল্য ছিল ২,৫০,০০০ টাকা বা ২৫,০০০ পাউন্ড। ১৮৭৬ সালে তা কমে গিয়ে হয় ৬,০০০ টাকা বা ৬০০ পাউন্ড।[১১২] ১৮৭৫ সালে মুর্শিদাবাদে উৎপন্ন রেশমের দাম ছিল ছয় লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৮৯০ সাল নাগাদ এই শিল্পটি বিলীন হয়ে যায়।[১১৩] কর্মসংস্থানের অবস্থা থেকেও অবক্ষয়ের চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯০১ সালে বাংলায় রেশম সুতা কাটায় ও বয়নে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ছিল ৫০,৩৯৩ জন। ১৯২১ সালে এই সংখ্যা নেমে আসে ১৩,৫৮৭ জনে এবং তাদের মধ্যে সুতাকাটায় নিয়োজিত ছিল ৪,৫২৬ জন আর বয়নে নিয়োজিত ছিল ৯,০৬১ জন।[১১৪] যারা সুতাকাটায় নিয়োজিত ছিল তাদের শতকরা ৯২.৫৩ ভাগই ছিল মালদহ জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। রেশম দিয়ে বুননের কাজ প্রধানত বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। ১৯২১ সালে এই কাজে যথাক্রমে ৩,২৪০ জন এবং ২,৯১৮ জন নিয়োজিত ছিল। ৯৫৭ জন লোক নিয়ে বীরভূমের অবস্থান ছিল তৃতীয়।[১১৫] বাংলার রেশম বয়ন শিল্পে তাদের অংশের আনুপাতিক হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৩৫.৭৬, ৩২.২০ ও ১০.৫৬ ভাগ। এই শিল্পটির দ্রুত অবক্ষয়ের ফলে বিদেশী রেশমের তৈরি পণ্যের আমদানির পথ প্রশস্ত হয়। এতে ১৯০৪-০৫ সালে ১৪ লক্ষ টাকারও বেশি এবং ১৯২০-২১ সাল নাগাদ ৩২ লক্ষ টাকা এই দেশকে আমদানিতে ব্যয় করতে হয়।[১১৬]

২.৪ রেশমশিল্পের অবনতি

রেশমশিল্পের অবনতির অনেকগুলি কারণ উল্লেখ করা যায়। এর একটি হচ্ছে গুটিপোকার উপর অত্যন্ত বিষাক্ত ও সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ। চারটি প্রধান ব্যাধির মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হলো পেইব্রিন বা 'কাটা'। এটি রেশমের একটি মহামারী রোগ। মুখার্জির মতে, ১৮৭০ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় এই রোগ ছিল অপরিচিত। ডিম্বাবস্থা অথবা পোকাসৃষ্টির অবস্থায় এই ব্যাধি শুরু হয়। এতে তিরিশ দিনের মধ্যে অর্থাৎ সুতাকাটার অবস্থায় পৌঁছার আগেই পোকার মৃত্যু ঘটে। ১৯০৬ সালে যে রেশম কমিটি আলোচনায় মিলিত হয় তার সদস্যদের নিশ্চিত অভিমত এই যে, পেইব্রিনের আক্রমণের জন্যই প্রধানত বাংলায় মালবেরী রেশম উৎপাদনের ক্রমাবনতি অব্যাহত থাকে। অন্যান্য যেসমস্ত রোগ পোকাকে আক্রমণ করে, পোকা ও গাছ ধ্বংস করে, তা হলো মাসকারডাইন, ফ্লেচারি ও গ্রেসারি। বাংলায় মাসকারডাইন 'চূনা' বা 'চূনাকীট' নামে পরিচিত। এর উৎস হলো এক প্রকার ক্ষুদ্র ছত্রাক বা ফাংগাস। 'ফ্লেচারি বা কালাশিরা'

১১২. W W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal,* Vol. VII, Maldah, 98.

১১৩. E. W, Collin, *Bengal,* 8.

১১৪. *Census of India, 1921,* Vol. V, Bengal, Part I, Report (by W. H. Thompson), 402-03.

১১৫. ঐ, 103.

১১৬. *Statistics of British India,* Part II, Commercial, 1909-10, (Calcutta 1911), 18; *Report on the Maritime Trade of Bengal, 1921-22,* 4.

সাধারণত শালফা নামে পরিচিত। এর কারণ হলো পোকার বদহজম। গ্রেসারি বা 'রাসা' রোগ আগেও বাংলায় বর্তমান ছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই রোগের কারণ হলো অনুপযুক্ত আহার এবং ত্রুটিপূর্ণ বায়ুচলাচল ব্যবস্থা। বিভিন্ন রকমের পরভোজী ও অন্যান্য শত্রু, বিশেষকরে মাছির আক্রমণও যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইংল্যান্ডে ধার্য অসম শুল্ক এই শিল্পটির অচল হয়ে পড়ার একটি অন্যতম কারণ। বৃটিশ জাহাজে করে ভারতে আনীত বৃটেনে উৎপাদিত রেশমসামগ্রীর জন্য যেখানে কর দিতে হতো শতকরা ৩.৫ ভাগ, সেখানে ভারত থেকে বৃটেনে আমদানিকৃত রেশমসামগ্রীর জন্য কর দিতে হতো শতকরা ২০ ভাগ বা তারও বেশি।[১১৭] ভারতে উৎপন্ন রেশমসামগ্রী বৃটেনে উৎপন্ন রেশমসামগ্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হলেও বৃটিশ পণ্যদ্রব্যের জন্য একটি রক্ষাকবচ হিসেবে এই কর ছিল যৌক্তিক। নানা কারণে বিদেশীরা বৃটিশ পণ্যের চেয়ে ভারতীয় পণ্য বেশি পছন্দ করতো। পার্লামেন্টের একটি বিবরণ থেকে উদ্ধৃত নিম্নে প্রদত্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, শুরুতে ভারতীয় পণ্যের চেয়ে বৃটিশ পণ্য সামান্য অগ্রগামী ছিল এবং ফরাসী ক্রেতারা এটাকে বেশি পছন্দ করতো। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতীয় পণ্য বৃটিশ পণ্যকে প্রায় পুরোপুরি বিতাড়িত করে দেয়।

সারণি ২.৫ : ১৮৩২-১৮৩৯ সালে বৃটেন থেকে ফ্রান্সে রপ্তানিকৃত বৃটিশ ও ভারতীয় রেশমপণ্যের মূল্য (পাউন্ডে)

সন	বৃটেনে উৎপাদিত রেশমসামগ্রী	ভারতীয় বন্দনা এবং অন্যান্য রুমাল
১৮৩২	৫০,৬০০	২৯,৫০০
১৮৩৩	৩৬,৭০০	৬০,৪০০
১৮৩৪	৩২,৭০০	৭৭,৭০০
১৮৩৫	১৬,৮০০	১,১৪,৪০০
১৮৩৬	১৫,৬০০	১,০৭,৬০০
১৮৩৭	১০,০০০	১,৭৪,৫০০
১৮৩৮	৯,৪০০	২,০২,২০০
১৮৩৯	৫,৫০০	১,৬৮,৫০০

উৎস : আর. সি. দত্ত, *দি ইকোনোমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া ইন দি ভিক্টোরিয়ান এজ*, (প্রথম পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী ১৯৮৫), ১১৯। পার্লামেন্টের দলিল দস্তাবেজ (Parliamentary Papers) থেকে উদ্ধৃত রিপোর্ট।

১১৭. Select Committee of the House of Lords, 1840, উদ্ধৃত R. C. Dutt, *The Economic History of India in the Victorian Age*, 117-18.

এর ব্যাখ্যা খুব সোজা। যখন ফ্রান্সে প্রথম বৃটেনে উৎপন্ন পণ্য রপ্তানি করা হয়, তখন সেখানে ভারতীয় পণ্যের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। এর ফলে ফরাসী ক্রেতারা বৃটিশ পণ্যই বেশি পছন্দ করতো। যখন এই ব্যবস্থা রহিত হয় এবং ভারতীয় পণ্য ফ্রান্সে প্রবেশের সুযোগ পায়, তখনই ফ্রান্সের সঙ্গে বৃটেনের ব্যবসা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।[১১৮] যদি করের সমতা বিধান করা হতো, তাহলে বাংলায় উৎপন্ন রেশমসামগ্রী সম্ভবত অন্যান্য ইউরোপীয় বাজার দখল করার পাশাপাশি বৃটিশ বাজারও যে দখল করতো তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু বৃটিশ উৎপাদনকারীরা করের সমতার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে। টমাস কোপ ১৮৪০ সালে পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেন যে, "এটি (করের সমতা) এখানকার ব্যবসা ধ্বংস করার মতো অবস্থার সৃষ্টি করতো; এবং... এখানকার লোকজন বেকার হয়ে পড়তো...তারা হয়ে পড়তো নিঃস্ব ও বেপরোয়া...তারা সমাজের বাকি অংশের উপর বোঝা হয়ে পড়তো...এবং এর ফলে একটি বড় অংশের মূলধনও হয়ে পড়তো বেকার। এটা বিদেশীদের হাতে সেই বিনিয়োগ তুলে দিত যা দিয়ে আমাদের চলার কথা।"[১১৯]

বাংলায় উৎপন্ন রেশমের দোষ-ক্রটিও এর অবনতির অন্যতম কারণ। জাপান ও চীনের গুটিপোকার তুলনায় বাংলার নিম্নমানের গুটি থেকে মাত্র এক চতুর্থাংশ লম্বা সুতা পাওয়া যেতো। এই প্রদেশে গুটিপোকা থেকে রেশম নিষ্কাশনকালে সুতা কেবলই নিঃসৃত হতে থাকতো এবং যে নিষ্কাশন করতো সে কেবলি নতুন সুতা যেমন-তেমন করে পেঁচিয়ে দিত। সেজন্য রেশম মসৃণ এবং সমান শক্তির হতো না। সমান পরিচ্ছন্নতাও এতে পাওয়া যেতো না। যখনই কোন নতুন সুতা লাগানো হতো, তখন এটাকে একটা বড়শির মতো মনে হতো এবং খোলাচোখে এটাকে মনে হতো রেশম সুতার উপর ক্ষুদ্র একটি তুলার ফেঁসোর মতো।[১২০] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নিষ্কাশন যন্ত্রের পরিবর্তে এর অধিকাংশই দেশজ চরকায় অথবা 'ঘাইস' -এ পেঁচানো হতো। এর ফলে ময়লামুক্ত, আঠাহীন ও আগাগোড়া মসৃণ রেশমের মিহিসুতা পাওয়া আরো অসম্ভব হয়ে পড়তো। এতে বর্জ্য, খোলসহীন শামুকবিশেষ প্রভৃতি অপদ্রব্য লেগে থাকার সম্ভাবনা ছিল। বাংলার রেশমকে যথাযথভাবে বাছাই বা শ্রেণীভেদও করা হতো না। এসব দোষ-ক্রটি থাকতো বলে তাঁতীদের পক্ষে তাঁতে এদেশীয় রেশম ব্যবহার করা কষ্টকর হয়ে পড়তো। অথচ বিদেশ থেকে আমদানিকৃত রেশমি সুতা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি মসৃণ ও উত্তমরূপে প্রস্তুত।

১১৮. ঐ, 118-19.

১১৯. প্রাগুক্ত, 119-20

১২০. Evidence of J Goodman of Messrs Anderson, Wright & Co, Merchants and Agents, Calcutta, before the Indian Industrial Commission, দেখুন Minutes of Evidence, Vol II (Parliamentary Papers, XVIII), 172

অধিকন্তু বেশিরভাগ তাঁতী যেসব মাকু ছুঁড়ে মারা তাঁত ব্যবহার করতো, সেগুলির যান্ত্রিক উন্নতিসাধনের প্রয়োজন ছিল। এসব বিবিধ অসুবিধার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে এ অঞ্চলের রেশমের চাহিদা ব্যাপকভাবে কমে যায়। ভারতের অন্যান্য অংশেও অবস্থা দাঁড়ায় অনুরূপ। বাংলার শিল্প বিভাগের পরিচালক এ. টি. ওয়াটসন বলেন, বোম্বে ও পাঞ্জাবের রেশম কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আসে চীন, জাপান, ফ্রান্স এবং ইতালি থেকে। ঐসব স্থানে উৎপাদিত রেশম বাংলায় উৎপাদিত রেশমের তুলনায় ভারতের বাজারে বেশি আদৃত হচ্ছে।[১২১]

এসব ত্রুটির ফলে বাংলায় রেশমের চাহিদা যে শুধু সীমিত হয়ে পড়ে তা-ই নয়, এর দামও যথেষ্ট কমে যায়। ১৮৫৫-৫৬ সালে এ অঞ্চলে উৎপাদিত এক সের রেশমের দাম ছিল ২২ টা. ১৫ আনা এবং ১৯১৪-১৫ সালে এই দাম কমে গিয়ে দাঁড়ায় টা. ১৩-৬-২ পাইতে।[১২২] অন্যান্য দেশের দামের চেয়ে কম দাম বিশিষ্ট হওয়া ছাড়া বাংলার রেশমের চাহিদার আর তেমন কোন কারণ ছিল না।[১২৩] বাস্তবিকপক্ষে বাংলার রেশমের দাম শুধু যে জাপান, ফ্রান্স বা ইতালির রেশমের দামের চেয়ে কম ছিল তাই নয়, এর দাম হাঙ্গেরির রেশমের দামের চেয়েও কম ছিল। কিন্তু বাংলার রেশমের বাজারদর পড়ে গেলেও উৎপাদনখরচ কিন্তু কমে নি। ১৮৬০-এর দশকে যখন বাংলায় কাঁচা রেশমের চড়ামূল্য ছিল, সেসময় ভূস্বামীরা যেসব জমিতে মালবেরীর চাষ হতো সেখান থেকে অত্যধিক কর আদায় করতো (কোন কোন ক্ষেত্রে করের পরিমাণ ছিল প্রতি একরে ৫০ টাকা)। তখন গুটিপোকা চাষীরা এ পরিমাণ কর প্রদানে সমর্থ ছিল। কিন্তু পরে বাংলার কাঁচা রেশমের দাম ভীষণভাবে পড়ে যাওয়ার পরও কর অপরিবর্তিত থেকে যায়। শ্রমিকদের নগদ অর্থে দেয়া মজুরিও ক্রমশ বেড়ে যায়। কিন্তু রেশম উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারীদের বর্ধিত পারিশ্রমিক প্রদানের সামর্থ্য তখন ছিল না। রেশম চাষাবাদ অলাভজনক হয়ে পড়ায় তারা পাট ও ধান উৎপাদনের পথ বেছে নেয়। গোলআলু ও অন্যান্য শাকসব্জি উৎপাদনের দিকেও তারা ঝুঁকে পড়ে।

কিন্তু বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার ছিল ইউরোপীয় ফার্মগুলির ক্রমপ্রত্যাহার। এই ফার্মগুলিই বাংলায় বিনিয়োগ হিসেবে রেশমনিষ্কাশন যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। "বিশ বছর আগে বেশ কয়েকটি ফার্ম এই কাজে নিয়োজিত ছিল। রেশম উৎপাদনকারী জেলাগুলিতে যেখানে সেখানে রেশমনিষ্কাশন কারখানা দেখা যেতো। এই কারখানাগুলিতে রপ্তানির জন্য রেশম রিল করা হতো।"[১২৪] এই ফার্মগুলি কাঁচা রেশমের ক্ষেত্রে অর্থলগ্নিকারী,

১২১. GOB, *Proceedings of the Agricultural and Industries Department* (Industries), December 1925, Nos. 9-10, 12.

১২২. *Report of the Indian Tariff Board regarding the Grant of Protection to the Sericulture Industry*, (Delhi 1933), 15.

১২৩. *Report on the Maritime Trade of Bengal, 1912-13*, (Calcutta 1913), 25

১২৪. *Report on an Inquiry into the Silk Industry of India*, 10-11.

শিল্পপতি ও বাজারজাতকারীর ভূমিকা পালন করতো। কিন্তু যখন তারা অত্যন্ত বেকায়দায় পড়লো, তখন তারাই এই ব্যবসা পরিত্যাগ করলো। "ইউরোপীয় ফার্মগুলি তখনই ব্যবসা ছেড়ে দিল, যখন কাঁচা রেশমের দাম এত কমে গেল যে, তারা রেশমগুটির জন্য যে মূল্য দিতে পারতো তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ রেশমগুটি সংগ্রহ করা যেতো না, যার দ্বারা রেশমনিষ্কাশন যন্ত্রগুলি ভালভাবে চালু রাখা যায়। একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান ও কারখানার জন্য বিপুল ব্যবসায়ের প্রয়োজন ছিল। ব্যবসা যখন পড়ে গেল তখন তা চালিয়ে যাওয়া আর লাভজনক ছিল না।[১২৫] তাদের প্রত্যাহারের ফলে বাংলার রেশম উৎপাদনকারীদের মধ্যে বিশ্বাসের সঙ্কট দেখা দেয় এবং এর ফলে শিল্পটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

জাপান ও চীন কর্তৃক অব্যাহতভাবে সস্তা রেশমসামগ্রী বাজারজাতকরণ এবং যুক্তরাজ্য থেকে কৃত্রিম রেশমি সুতা ও বস্ত্রপণ্যের আগমন এ দেশের রেশমশিল্পের উপর মারাত্মক আঘাত হানে। ইতিমধ্যে সঙ্কুচিত বাজারকে তা একেবারে অর্থহীন করে তোলে। চীনা রেশমের বিপুল আগমনের প্রধান কারণ হলো হ্রাসকৃত বিনিময় ভর্তুকি ব্যবস্থা। আংশিকভাবে এর আরেকটি ব্যাখ্যা হলো উৎপাদনের অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি। জাপান থেকে ক্রমবর্ধমান ফরমায়েশের কারণ ছিল "মূল্য পড়ে যাওয়া এবং জাপানী বিনিময়ের হার কমে যাওয়া"।[১২৬] এছাড়াও আরো গুরুতর বিপদ দেখা দিল কৃত্রিম রেশমি সুতা ও বস্ত্রপণ্যের দিক থেকে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার আকারে, কারণ এসব কৃত্রিম সুতা ও বস্ত্র "ধৌত করা সহজ এবং এগুলির রং টেকসই"। আর এগুলি দামেও সস্তা। কৃত্রিম রেশমখচিত সুতীবস্ত্রও ক্রমবর্ধমান পরিমাণে এবং বৈচিত্র্যে বাজারে আসতে শুরু করে। তবুও একথা বলা যায় যে, যথোপযুক্ত রাষ্ট্রীয় সহায়তা পেলে এক সময়ের এই বিশ্ববিখ্যাত শিল্পকে সম্ভবত বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যেতো। ইউরোপেও সংক্রামক ব্যাধি ও পরভোজী জীবাণু দ্বারা গুটিপোকা আক্রান্ত হয় এবং রাষ্ট্রীয় সাহায্যে এই আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের এবং জাপান ও চীনের রেশম উৎপাদনের ইতিহাসেও এ ধরনের রাষ্ট্রীয় সাহায্যের উপমা বিধৃত রয়েছে। ফ্রান্সের সরকার রেশমগুটি উৎপাদনকারী এবং রিল প্রস্তুতকারকদের অনুদান হিসেবে অর্থপ্রদান করে। ইতালিতেও রেশমশিল্পের উন্নতির জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক অনুদান এবং বিশেষ অর্থসাহায্য প্রদান করা হতো। সিন্ডিকেট ও সমবায় সংস্থাগুলি এককালীন অনুদানের আকারে এবং বাৎসরিক আবর্তক গ্রান্টের আকারে অর্থসাহায্য পেতো। জাপানে রেশমশিল্পের উন্নতির জন্য যেসব প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল তা ছিল ব্যাপক এবং বিশেষ আইনের দ্বারা পরিচালিত। জনগণকে রেশমগুটির ভাণ্ডার স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গুটি শুকানোর যন্ত্র স্থাপন এবং এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানোর জন্য ১৯২৫ সাল থেকে তিরিশ বছরের জন্য জাপান সরকার বিশেষ অনুদান মঞ্জুর করে। এমনকি চীনেও দক্ষিণ চীন প্রাদেশিক সরকার শতকরা চার ভাগ হার সুদে রেশম উৎপাদনকারীদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। স্পেন, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি

১২৫. ঐ, 12.

১২৬. *Report on the Maritime Trade of Bengal, 1924-25,* (Calcutta 1925), 15

ও তুরস্কের মতো অন্যান্য দেশও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সাহায্য দিয়ে রেশম উৎপাদনকারীদের উৎসাহিত করে।[১২৭] অন্যদিকে ভারতে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা ঐসব দেশ থেকে যে চ্যালেঞ্জ আসে তা মোকাবেলা করার জন্য তেমন কিছুই করে নি। ১৯৩৪ সালে বৃটিশ শাসনের প্রায় শেষ পর্যায়ে এই শিল্প আমদানি-রপ্তানি শুল্কের ক্ষেত্রে সংরক্ষণমূলক সহায়তা লাভ করে, তবুও খোদ এই সংরক্ষণ প্রদানকারী ভারত সরকারও যে পরিমাণ সংরক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল তার কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। অপরদিকে ১৯২০-এর দশকে ভারতে দু'টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়। এর একটি হলো ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত ভাগলপুর সিল্ক ইনস্টিটিউট আর অন্যটি ১৯২৫ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত গভর্নমেন্ট সিল্ক উইভিং এ্যান্ড ডাইং ইনস্টিটিউট। এ দু'টি থেকে কিছু তরুণ প্রশিক্ষণ লাভ করে। তারা নৈপুণ্য অর্জন করে বেরিয়েও আসে, কিন্তু অর্থ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত সমস্যার জন্য বেশিদিন এই পেশায় টিকে থাকতে পারে নি। বহরমপুরের সিল্ক ইনস্টিটিউট থেকে কারিগরি কোর্সে যে ১২২ জন ছাত্র পাশ করে, তাদের মাত্র ৩৯ জন ১৯৩৫ সালে তখনও এই পেশায় নিয়োজিত ছিল।[১২৮] রেশমশিল্পের উন্নতিসাধন ও কল্যাণের জন্য ১৯৩১ সালের স্টেট এইড টু ইন্ডাস্ট্রিজ এ্যাক্টের অধীনে ১৯৩৭ সালের জুন পর্যন্ত মোট বিতরিত রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৩,৩২৫ টাকা।[১২৯]

৩.০ জাহাজনির্মাণ শিল্প

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার অধিবাসীরা সমুদ্রগামী জাতি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। এদেশের নাবিকদের নৈপুণ্য ও সাহস, উপনিবেশ স্থাপনকারীদের উদ্যম এবং অভিবাসীদের উৎসাহ যুগ যুগ ধরে বাংলাকে সমুদ্রের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে এবং পূর্বাঞ্চলীয় সমুদ্রের অধিশ্বরী হিসেবে তার গর্বিত অবস্থান অর্জন করতে ও দীর্ঘদিন তা বজায় রাখতে সহায়তা করে। বাণিজ্য ও ধর্মের স্বার্থে, কখনও কখনও রাজ্যবিস্তারের জন্য সাহসের সঙ্গে সমুদ্রের বিপদের মুখোমুখি হয়ে সেই সুদূর অতীতে বাঙালিরা তাদের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করেছে।[১৩০] ঐতিহাসিক ডাও-এর ভাষায়, "এই বাঙালিরাই কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের পত্তন করে, সেখান থেকেই সমুদ্রের পরপারে বিজয় অভিযান পরিচালনা করে এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জাভা ও অন্যান্য দ্বীপমালায় তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে।"[১৩১] বাংলার নাবিকেরা সুদূর চীন, জাপান, সুমাত্রা ও জাভায় গমন করে। তারা করমন্ডল, মালাবার, ক্যাম্বে, পেগু, ট্যানাসেরিন (বার্মা) এবং সিংহলের উপকূলেও অভিযান

১২৭. Government of Bengal, Proceedings of the Department of Agriculture and Industries (Agriculture), April 1932, Nos. 3-4, 17-18

১২৮. *Bengal Legislative Council Debates,* August 26, 1935, Vol. XLVI, No. 2, 403.

১২৯. ঐ, September 17, 1937, Vol. III, 236.

১৩০. Atul Chandra, *History of Bengal, Mughal Period,* (Calcutta 1968), 500.

১৩১. উদ্ধৃত Atul Chandra, ঐ, 502.

চালায়। সমুদ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে বাঙালিরা, বিশেষকরে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার লোকেরা যে নৈপুণ্য অর্জন করে তার মূলে রয়েছে তাদের চমৎকার ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধা। বাংলার ছিল দীর্ঘ উপকূল আর এর সংযোগ ছিল এশিয়ার বিশাল ভূখণ্ডের সঙ্গে। পশ্চিমে তার যোগাযোগ ছিল আফ্রিকার সাথে, পূর্বে ছিল বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে। সামুদ্রিক কর্মকাণ্ড বিস্তারের জন্য প্রকৃতিপ্রদত্ত সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার অবস্থান ছিল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত অনুকূল। জালের ন্যায় বিস্তৃত নদীনালা এদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য ছিল অত্যন্ত সুবিধাজনক। এর ফলে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার ঘটে।

চর্যাপদ, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল এবং পূর্ববঙ্গগীতিকার মতো প্রথমদিকের উপাখ্যানগুলিতে সমুদ্রগামী জাহাজ ও বিশাল বিশাল নৌকা নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে। মুগল সম্রাট আকবর বাংলায় একটি রাজকীয় নৌঘাঁটি পত্তন করে তা রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তাঁর নৌ-বিভাগের নাম ছিল নাওয়ারা। রাজপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার সময়ে শায়েস্তা খান জাহাজনির্মাণ ও মেরামতের জন্য ঢাকায় একটি বিরাট শিপইয়ার্ড তৈরি করেন। তিনি হুগলী, বালাসোর, সুরাট, চিলমারী, যশোর ও কড়িবাড়ি প্রভৃতি বন্দরসমূহে যতো বেশি সম্ভব জাহাজ নির্মাণের হুকুম জারি করেন। তাঁর নৌবহরের সাহায্যে তিনি ১৬৬৬ সালে মগ-ফিরিঙ্গিদের নৌশক্তিকে নির্মূল করতে সমর্থ হন। পরবর্তী মুগল সম্রাটেরা নৌ-বাহিনীকে অবহেলা করলেও দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে পণ্যদ্রব্য পরিবহনের জন্য নিয়মিতভাবে বিভিন্ন রকমের পণ্যবাহী নৌকা নির্মাণ করতেন। প্যাটেলা, বোরা, প্যালওয়ার প্রভৃতি কয়েক রকমের নৌকা পাটনা থেকে হুগলীতে এবং সেখান থেকে উড়িষ্যা উপকূলের পিপলি ও বালাসোরে সাধারণত শোরা পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হতো। কথিত আছে যে, প্যাটেলা শ্রেণীর নৌকাগুলির ১৫০ থেকে ২০০ টন পর্যন্ত পণ্য পরিবহনের ক্ষমতা ছিল।[১৩২]

৩.১ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজনির্মাণ

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভের পর পরই ১৭৫৮ সালে বৃটিশ জাহাজ নোঙ্গরের সুবিধার্থে একটি ডক প্রতিষ্ঠা করাব প্রস্তাব গৃহীত হয় যাতে "শীতকালে এসব জাহাজ এখানে থাকতে চাইলে অবস্থান করতে পারে।"[১৩৩] কিন্তু এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সে সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। এছাড়া ১৭৮০ সালের আগে বাংলায় যে দু'টি জাহাজ নির্মিত হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে, সে দু'টি সম্পর্কেও

১৩২. R. Mookerji, *Indian Shipping A History of the Sea-borne Trade and Maritime Activity of the Indians from the Earliest Times*, (London 1912), 235,

১৩৩. W H Carey, *The Good Old Days of Honourable John Company*, (Calcutta 1907), Vol. II, 114.

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিছু জানা যায় না। এ দু'টি জাহাজের একটি সম্ভবত নির্মিত হয়েছিল ১৭৬৯ সালে, অন্যটি ১৭৭০ সালে।[১৩৪] কিন্তু ১৭৮০ সালে হায়দার আলির কর্ণাটক অভিযানের ফলে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাই শেষ পর্যন্ত বাংলায় জাহাজনির্মাণ শিল্প পুনরুজ্জীবিত করতে ইংরেজ কোম্পানিকে প্রভাবিত করে। কোম্পানি ১৭৭২ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্ট প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রামের মতো জেলাগুলি থেকে খাদ্যশস্য ও ফোর্ট সেন্ট জর্জ-এ সৈন্য পরিবহনের জন্য জাহাজনির্মাণের চেষ্টা করে। এ্যাক্টে কোম্পানিকে ভারতে উপকূলীয় বাণিজ্য প্রতিরক্ষার জন্য জাহাজনির্মাণ করা বা ভাড়া করার অধিকার দেয়া হয়।[১৩৫] ১৭৮০ সালে সিলেটের কালেক্টর মিঃ লিন্ডসে ৪০০ টন ধারণক্ষম একটি জাহাজ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। পরে ২০টি জাহাজের একটি বহরও তিনি গঠন করেন। প্রথমোক্ত জাহাজে করে তিনি মাদ্রাজে চাল প্রেরণ করেন।[১৩৬] ইতিপূর্বে এই প্রদেশের নিজস্ব বাণিজ্যের জন্য সুরাট, বোম্বে, জার্মানি ও পেগুতে তৈরি জাহাজ ব্যবহার করা হতো।

কলকাতা অবশ্য অনতিবিলম্বে নিয়মিত জাহাজনির্মাণ শিল্পের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সরকারের চীফ ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল হেনরি ওয়াটসন কলকাতার সুবিধাজনক অবস্থানের বিষয়টি অনুধাবন করেন এবং জাহাজনির্মাণ, মেরামত, যুদ্ধজাহাজ ও বাণিজ্যজাহাজ সজ্জিত করার সবরকম সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি ডক, একটি সামুদ্রিক জাহাজঘাট (Yard) প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছ থেকে খিদিরপুরে জমি বরাদ্দ করিয়ে নিতে সক্ষম হন। ১৭৮০ সালে তিনি কাজ শুরু করেন। এতে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।[১৩৭] ১৭৮১ সালে তিনি 'ননসাচ' নামক ৪০০ টন ধারণক্ষম ফ্রিগেটটির উদ্বোধন করেন। এরপর ৩৯০ টন ধারণক্ষম 'সারপ্রাইজ' ফ্রিগেটটিও তিনি সমুদ্রে চালু করেন। এই দু'টি ফ্রিগেটকে ৩২টি কামানে সজ্জিত করা হয়। তাঁর নিজের নির্দেশে স্থানীয় কর্মীরা এ দু'টি নির্মাণ করে। এগুলির গতি, দ্রুত পণ্যবোঝাই, খালাস করা, অনির্ধারিত সময়েও সমুদ্রযাত্রার উপযুক্ততা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকার মাসিক ১০,০০০ টাকা ভাড়ায় ১৭৮৩ সালে 'সারপ্রাইজ' ফ্রিগেটটি রিকুইজিশন করে। আগের বছর একইভাবে 'ননসাচ' ফ্রিগেটটি চীনে আফিম বহন করার জন্য অধিগ্রহণ করা হয়, আর এবারই সর্বপ্রথম কোম্পানির খাতে চীনে আফিম চালান দেয়া শুরু হয়।[১৩৮]

১৩৪. ঐ, 115.

১৩৫. R. Mookerji, *Indian Shipping,* 247.

১৩৬. ঐ।

১৩৭. S. B. Singh, *European Agency Houses in Bengal, 1783-1833* (Calcutta 1966), 19.

১৩৮. Singh, *Bengal,* 19.

এদেশে তৈরি জাহাজের সাফল্য অন্যান্য শিল্পোদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করে। আকারে ছোট হলেও সরকারের পাইলট জাহাজের জন্য ১৭৯০ সালে কলকাতার বংশালে প্রথম একটি শুকনো ডক নির্মাণ করা হয়।[১৩৯] এর পর পর কয়েকটি বড় আকারের ডক নির্মিত হয়। ১৭৯৬ সালে বেকন সাহেব সুলকিয়াতে একটি ডক প্রতিষ্ঠা করেন। এতে 'অর্ফিউস' নামের ফ্রিগেটটি সর্বপ্রথম টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮০৩ সালে ডব্লিউ. ওয়াডেল খিদিরপুর ডকটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন কোম্পানির প্রথম প্রধান নির্মাতা। জেমস ও রবার্ট কিড তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। প্রায় তিরিশ বছর যাবৎ এই দু'জন বাংলা অঞ্চলে জাহাজনির্মাণ ও মেরামত কাজে নিয়োজিত থাকেন এবং অনেকগুলি চমৎকার জাহাজ নির্মাণ করেন। তাঁদের নির্মিত জাহাজের সংখ্যা ছিল চব্বিশ। স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের জন্যও তাঁরা জাহাজ নির্মাণ করেন। টিটাগড়, কাশিপুর, হাওড়া ও ফোর্ট গ্লস্টারের ডকগুলিতেও জাহাজনির্মাণ শুরু হয়। এই ডকগুলির সব কটাই ছিল হুগলী নদীর কূলে।

এক হিসাব মতে, ১৭৮১ থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত নির্মিত জাহাজের সংখ্যা ছিল ৩৭৬। এগুলির মধ্যে ১৮১১-২৮ সালে ফোর্ট গ্লস্টারে নির্মিত হয় ২৭টি জাহাজ। এগুলির ধারণক্ষমতা ছিল ৯,৩২২ টন।[১৪০] বাংলায় নির্মিত বড় জাহাজগুলির একটির নাম ছিল 'হেস্টিংস', যার ধারণক্ষমতা ছিল ১৭০৫ টন। বৃটিশ নৌবাহিনীর জন্য এটিতে ৭৪টি কামান সজ্জিত করা হয়। এটির নির্মাতা ছিল মেসার্স কিড এন্ড কোম্পানি। আর একটি জাহাজের নাম ছিল 'কাউন্টেস অব সাদারল্যান্ড'। এটির ধারণক্ষমতা ছিল ১৪৫০ টন। এটি নির্মিত হয় টিটাগড়ে ১৮০০ সালে। অন্য দু'টি জাহাজ 'ক্যাসল হান্টলি' ও 'ভ্যানসিটার্ট' নির্মিত হয় খিদিরপুরে, ১৮১২ ও ১৮১৩ সালে। এ দু'টির প্রত্যেকটির ধারণক্ষমতা ছিল ১২০০ টন। এ দু'টি নির্মিত হয় কোম্পানির বাণিজ্যের জন্য।[১৪১] আমরা সঙ্গতভাবেই এ নিয়ে গর্ব করতে পারি যে, ৮৯ টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ 'ডায়না' ভারতে তৈরি প্রথম বাষ্পীয় শক্তিচালিত জাহাজ। ১৮২৩ সালে কিডের খিদিরপুরস্থ ডকইয়ার্ডে এটি নির্মিত হয়।[১৪২] আঠারো শতকের শেষদিকে জাহাজনির্মাণে নৈপুণ্য ও উৎকর্ষ এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে, গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি এব্যাপারে সপ্রশংস মন্তব্য করেন। ১৮০০ সালে তিনি লিখেন :

> কলকাতা বন্দরে বর্তমানে মজুত জাহাজের মোট ধারণক্ষমতা এবং বাংলায় ইতিমধ্যেই জাহাজনির্মাণ কৌশল উৎকর্ষের যে পর্যায়ে পৌঁছেছে (আরো দ্রুত উন্নতির সম্ভাবনাপূর্ণ এবং কাঠের প্রচুর এবং ক্রমবর্ধমান সরবরাহের দ্বারা মদদপুষ্ট), তা থেকে এটা নিশ্চিত যে, এই বন্দর সব

১৩৯. R. Mookerji, *Indian Shipping*, 248.

১৪০. Singh, *Bengal*, 22.

১৪১. ঐ, Carey, *John Company*, 116-17.

১৪২. Evan Cotton, *East Indiamen : The East India Company's Maritime Service*, (ed). Charles Fawcett, (London 1949), 123. The ship was dismantled in 1836.

সময়েই এ অঞ্চলের বেসরকারি বৃটিশ বণিকদের মালামাল লন্ডন বন্দর পর্যন্ত বহন করার মতো প্রয়োজনীয় ধারণক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজের যোগান দিতে পারবে।[১৪৩]

সারণি ৩.১ : কলকাতা বন্দরে ১৭৮১-১৮৪৬ সালে তৈরি জাহাজের সংখ্যা ও ধারণক্ষমতা (টনে)

সন	জাহাজের সংখ্যা	ধারণক্ষমতা
১৭৮১-১৮০০	৩৫	১৭,০২০
১৮০০-১৮০৫	৭৫	৩২,৫০৭
১৮০৬-১৮১৩	৭১	৩৩,৭১৯
১৮১৪-১৮২১	৯৫	৪১,৬৮৬
১৮২২-১৮২৯	৬১	১২,৪৪৯
১৮৩০-১৮৩৭	৩৬	১১,৫৩৮
১৮৩৭-১৮৪৬	৮৩	১০,১৫০

উৎস : ডব্লিউ. এইচ. কেরি, *দি গুড ওল্ড ডেইজ অব অনারেবল জন কোম্পানি*, ভলিউম-২, ১১৬, ১১৯-২০, (কলকাতা ১৯০৭)। হিসাবে ১৮০০ সাল এবং ১৮৩৭ সালকে দু'বার ধরায় হিসাবটি কিছুটা অসম্পূর্ণ।

লেঃ কর্নেল এ. ওয়াকারও সামুদ্রিক পরিবহনশিল্পে এ অঞ্চলের তৈরি জাহাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যাপারে প্রামাণিক বক্তব্য রেখেছেন। ১৮১১ সালে তিনি লিখেন, "বাংলায় উত্তম জাহাজ নির্মিত হতে পারে, এবং এর সংখ্যা আরো বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায়...।"[১৪৪] একই বছর বাল্টজার সলভাইনস নামক একজন ফরাসী মন্তব্য করেন, "ভারতীয় জাহাজে সৌষ্ঠব এবং প্রয়োজনীয়তার সমন্বয় ঘটেছে এবং এগুলি চমৎকার কর্মকৌশলের উত্তম আদর্শ।"[১৪৫]

অনেকগুলি কারণে বাংলায় জাহাজনির্মাণ শিল্পের বিকাশ সাধিত হয়। যেসব অঞ্চলের সঙ্গে বাংলার সুবিস্তৃত সীমারেখা রয়েছে, সেসব অঞ্চল থেকে অত্যন্ত ভাল কাঠের সরবরাহ ছিল প্রচুর; যেসব কাঠ দিয়ে বাংলার জাহাজ নির্মিত হতো, সে সম্পর্কে ১৮০২ সালে এন্টর্নি ল্যামবার্ট লিখেন :

এগুলির মধ্যে ছিল পেগু থেকে আমদানি করা টিককাঠ (সেগুন) এবং তক্তা ; বিহার, অযোধ্যা এবং বাংলা ও বিহারের উত্তরাঞ্চলীয় সীমারেখা দিয়ে যে পাহাড়শ্রেণী, তার মধ্যকার অফুরন্ত বন থেকে সংগৃহীত শাল এবং শিশুকাঠ। জাহাজের রিব, নী ও ব্রেস্ট-হুক বা কাঠামোটি সাধারণত

১৪৩. উদ্ধৃত William Digby, *'Prosperous' British India*, (New Delhi 1969), 86.

১৪৪. উদ্ধৃত S. N Gupta, *British*, 4-5.

১৪৫. ঐ।

শিশুকাঠ দিয়ে তৈরি হতো, বীম ও ভিতরের তক্তাগুলি ছিল শালকাঠের এবং তলা, পার্শ্ব, ডেক, হাল, পিছন দিক ইত্যাদি তৈরি হতো টিক দিয়ে। জাহাজ নির্মাণের জন্য টিকের কার্যকারিতা ও এর স্থায়িত্ব এত বহুলবিদিত যে তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন,... শিশু ও শালকাঠের মধ্যে প্রথমোক্তটি আকার, আকৃতি, দৃঢ় গঠন ইত্যাদি দিক থেকে জাহাজ তৈরির জন্য চমৎকারভাবে উপযোগী। এছাড়াও এই কাঠ থেকে সব আকারের এবং আয়তনের বাঁকানো কাঠ এবং 'নী' তৈরি করা যায় এবং তা পূর্ণ আকৃতির এবং যেকোন মাপের জাহাজের জন্যই, এমনকি প্রথম শ্রেণীর একটি যুদ্ধজাহাজের জন্যও উত্তম। দ্বিতীয়টির কাঠ দিয়ে তৈরি করা যায় উত্তম বীম, 'নী' এবং ভিতরের তক্তা।[১৪৬]

খুব সস্তা দরে প্রচুর সংখ্যক স্থানীয় কারিগর এবং শ্রমিক সহজলভ্য ছিল। যদিও তারা সঠিক অর্থে দক্ষ জাহাজপ্রকৌশলী ছিল না, তাদের বৃহদায়তন নৌকানির্মাণের উল্লেখযোগ্য দক্ষতা ছিল। বিদেশী ফার্ম এবং নির্মাতাদের দক্ষ পরিচালনায় তারা উত্তম জাহাজ-ছুতোর হিসেবে প্রমাণিত হয়।

স্থানীয় দক্ষ কারিগর এবং কাঁচামালের পর্যাপ্ততা ও সহজলভ্যতা ছাড়াও সেসময় দেশের সম্প্রসারণশীল আঞ্চলিক ও উপকূলীয় বাণিজ্যও নিঃসন্দেহে শিল্পটিকে উৎসাহিত করে। কলকাতার আঞ্চলিক জাহাজগুলি বিশেষকরে দু'ধরনের রপ্তানিবাণিজ্যের জন্য নিয়োজিত ছিল, এর একটি খাদ্যশস্যের অন্যটি আফিমের। উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষের কারণে ফোর্ট সেন্ট জর্জ প্রেসিডেন্সিতে বিশেষকরে চাল বহন করা এজেন্সি হাউজসমূহের জন্য বিরাট লাভের উৎস হয়ে উঠে। অধিকন্তু করমন্ডল উপকূল থেকে লবণ আমদানি করতে গিয়ে কলকাতার ব্যক্তিমালিকানাধীন জাহাজগুলি লাভজনক কাজ পায়। ১৭৯০-এর দশক ও ১৮০০-র দশকে তীব্র খাদ্যসঙ্কট দেখা দেয়ায় দেশীয় জাহাজে করে লন্ডনে চাল বহন করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডে নিজেদের খাতে আপৎকালীন পণ্যসামগ্রী বহন করার জন্য কোন কোন এজেন্সি হাউজ জাহাজনির্মাণের ফরমায়েশ দেয়। একমাত্র ১৮০০-০১ সালেই লন্ডনে চাল বহন করার জন্য পনেরোটি ভারতীয় জাহাজ ভাড়া করা হয়।[১৪৭] ভারতে তৈরি জাহাজের ভাড়া খাটার এটা ছিল এক চমৎকার সুযোগ। ইংল্যান্ডে বৃটিশ সরকার ক্ষয়ক্ষতি হলে প্রতি হন্দর ওজনের জন্য পূর্ণমূল্য বত্রিশ শিলিং প্রদানের গ্যারান্টি দেয়।[১৪৮] ১৮১৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট এদেশের জাহাজ ব্যবসাকে আরো উদ্দীপ্ত

১৪৬. উদ্ধৃত R. Mookerji, *Indian Shipping,* 248-49. Bengal ships. built of teak and *saul,* were greatly superior to the "oaken Walls of old England'. They were preferred to any other for durability and wear It was calculated that every ship in the navy of Great Britain was renewed every twelve years. On the other hand, teak wood built vessels lasted fifty years and upwards. দেখুন the testimony of Lt. Col. A Walker in W. Digby, *'Prosperous' British India,* 86; Carey, *Good Old Days,* 116.

১৪৭. Besides the 15 ships taken up in India for conveyance of rice to London, another 22 ships licensed in England came to Bengal for the same purpose. One American ship was also permitted to proceed to Calcutta to convey rice to London. Altogether about 4,80,164 maunds of rice valued at Rs. 9,77,795 was sent to England in 1801 দেখুন Singh, *Bengal,* 108.

১৪৮. ঐ, 106

করে। এর দ্বারা কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবসান ঘটে। ইউরোপের বেসরকারি ব্যবসায়ীরা ঝুঁকি নিতে শুরু করে এবং কয়েকটি এজেন্সি হাউজ নিজেদের জাহাজে করে ভারত থেকে চিনি, তুলা, বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য পণ্য বহন করার অনুমতি প্রার্থনা করে।

মুনাফার উচ্চহারের জন্যও শিল্পটির বিকাশ ঘটে। একটি জাহাজ যদি মাদ্রাজে প্রতি ব্যাগের ভাড়া ২.৫০ টাকা করে ৪০,০০০ ব্যাগ চাল নিয়ে বছরে চারবার যাতায়াত করতে পারে, তাহলে জাহাজের মালিক প্রতি বছর ৯,০০০ পাউন্ডের বেশি মুনাফা অর্জনের আশা করতে পারে।[১৪৯] ফলে, কোম্পানির কর্মচারীরা এবং দায়হীন বণিকেরা জাহাজনির্মাণে তাদের সম্পদ বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি লাভজনক পথের সন্ধান পায়।[১৫০] এছাড়া স্থানীয় সম্পদের বিনিয়োগও ছিল বেশ উৎসাহজনক। ১৭৮১ সাল থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত প্রতি টনের জন্য ২০০ টাকা গড়ে খরচ করে অন্ততপক্ষে ১৫০,০০০ টনের জাহাজ নির্মাণের জন্য কমপক্ষে তিন কোটি এবং তদূর্ধ্ব টাকা ব্যয় করা হয়।[১৫১] ১৮১৩ সালের আগে কলকাতায় যেসব বড় বিদেশী জাহাজের ফার্ম উল্লেখযোগ্য অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করে, সেগুলি হলো ফেয়ারলি ফারগুসন এন্ড কোং ; হোগ, ডেভিডসন এন্ড কোম্পানি; হিউ এ্যাটকিন রিড; পামার এন্ড কোং; এডওয়ার্ড ব্রাইটম্যান এবং জোহানেস সারকিজ। মেসার্স ফেয়ারলি ফারগুসনের জাহাজের সংখ্যা ছিল নয়টি। এদের প্রত্যেকটির ধারণক্ষমতা ছিল ৪০০ টন। মেসার্স হোগ, ডেভিডসন এন্ড কোম্পানির জাহাজের সংখ্যা ছিল পাঁচটি। আর উল্লিখিত অন্যান্য ফার্মগুলির প্রত্যেকটির দু'টি করে জাহাজ ছিল। ১৮১৩ সাল নাগাদ গোলাম হোসেনের বড় বড় চারটি জাহাজ ছিল। এদেশীয় অন্যান্য মালিকের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ সাদেক, রামদুলাল দে ও দোরাবজী বাইরামজী।[১৫২] সম্ভবত বাইরামজী কাওয়াজী, সাইদ হোসাইন এবং সাইদ মোহাম্মদও জাহাজের মালিক ছিলেন। উপকূলীয় ও উপসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে তাদের ব্যাপক ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিল। কতিপয় ইউরোপীয়-ভারতীয় ধনপতিও যুগ্মভাবে কয়েকটি জাহাজের মালিক ছিলেন।

বাংলায় জাহাজনির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগের জন্য পরিবেশ যতোই অনুকূল থাকুক না কেন, এর বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে এই শিল্প কখনো ভালভাবে বিকশিত হতে পারতো না। জাহাজনির্মাণ শিল্পকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কলকাতা সরকার ১৭৯৫ সালের নভেম্বরে সমুদ্রপথে এবং উত্তরাঞ্চলের প্রদেশসমূহ থেকে আমদানিকৃত কাঠের উপর থেকে কাস্টমস শুল্ক রহিত করে। এছাড়া আঞ্চলিক ও উপকূলীয় বাণিজ্য ভারতে তৈরি জাহাজের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। এতে স্থানীয়

১৪৯. ঐ, 21.

১৫০. ঐ, 5.

১৫১. দেখুন, Table 3.1; R. Mookerji, *Indian Shipping*, 248.

১৫২. ঐ, Singh. *Bengal*, 21.

জাহাজনির্মাণ শিল্প বিপুলভাবে লাভবান হয়। অন্য সবকিছুকে ছাড়িয়ে তৎকালীন ঔপনিবেশিক সরকার, বিশেষকরে লর্ড ওয়েলেসলিও ভারতে তৈরি জাহাজের প্রতি একান্ত আন্তরিক উৎসাহ-সমর্থন প্রদান করেন। আর এই সমর্থন ছিল পুরাতন লন্ডনভিত্তিক জাহাজশিল্প স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে। এই স্বার্থের অংশীদারেরা কোম্পানির জন্য জাহাজনির্মাণের একচেটিয়া অধিকার অর্জন করেছিল। বাংলায় তৈরি জাহাজকে লন্ডন অভিমুখে যাত্রা করতে অনুমতি দেয়ায় তারা আক্রান্তবোধ করছিল। অধিকন্তু তারা আরো ভয় পেয়েছিল এজন্যে যে, বাংলায় তৈরি জাহাজ অনেক কম হারে ভাড়া করা যেতো। তাছাড়া এজেন্সি হাউজগুলি ৩০,০০০ টনের মতো মাল বহনের জন্য জাহাজ ভাড়া করতো।[১৫৩] এসময় হেনরি ডানডাস ছিলেন ইন্ডিয়া বোর্ড এবং যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের প্রধান। তিনি ১৭৯৭ সালের ১ জুলাই এব্যাপারে বোর্ডের নীতি ব্যাখ্যা করে কমিটি অব শিপবিল্ডারস অব দি টেমস্-এর কাছে কোন রকম সন্দেহের অবকাশ না রেখে লিখেন, "ইন্ডিয়ায় অবস্থিত বৃটিশ রাজ্যগুলি এখন গ্রেট বৃটেনের সার্বভৌমত্বের অধীন। সেখানে নির্মিত জাহাজগুলি বৃটেনে নির্মিত জাহাজগুলির মতো একই রকমের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। এছাড়াও ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কানাডা বা সাম্রাজ্যের অধীন অন্য যেকোন দেশের জাহাজের মতোই সুযোগ-সুবিধা এসব জাহাজ পাবে।"[১৫৪]

ডানডাসের প্রচেষ্টা ডেভিড স্কট কর্তৃক বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই সমর্থিত হয়। ১৭৯৬ ও ১৮০১ সালে স্কট ছিলেন ইন্ডিয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান। ১৭৯৫ ও ১৮০০-০১ সালে তিনি ছিলেন এই বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যান। ওয়েলেসলি যে ভারতে তৈরি জাহাজকে বৃটেন ও ভারতের মধ্যে মাল পরিবহনের জন্য যাতায়াতে সমর্থন দিয়েছিলেন তার পিছনে ছিল উপরোক্ত দুই ব্যক্তির উৎসাহ। অবশ্য ভারতে তৈরি জাহাজের চলাচলকে সমর্থন দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পশ্চাতে কোম্পানিকে ইংল্যান্ডে অত্যধিক ভাড়ায় অতিরিক্ত জাহাজ ভাড়া করে যে লোকসান দিতে হয় তা থেকে শুধু রক্ষা পাবার বিষয়টি এবং বাংলায় ব্যবসারত যেসব বৃটিশ বণিক রয়েছে তাদের স্বল্পব্যয়ে ব্যবসা করতে ও দেশে লাভজনকভাবে নিজেদের সম্পদ প্রেরণ করতে সহায়তা করা ছাড়াও অন্য কারণ ছিল। সম্পদের অভাব

১৫৩. Ships were chartered and were not owned by the Company. Private individuals, who were known as 'Ship's husbands' were given the right to build ships which the Company bound itself to charter at stipulated rates. This is how the 'system of hereditary bottoms' came into existence. The rates of freightage fluctuated very much and were between £22 and £47 a ton from 1773 to 1795 দেখুন Cotton, *East Indiamen*, 48-49; C H. Philips. *The East India Company, 1784-1834* (Manchester 1961), 80-81. The British merchants in Bengal offered to let them at £12 per ton in peace and £16 in war if they were allowed to load the ships themselves or to procure cargoes from private traders. দেখুন, Tripathi, *Trade*, 40-41.

১৫৪. Tripathi, *Trade*, 47-48.

সত্ত্বেও ভারত থেকে বড় বড় অঙ্কের বিনিয়োগের ফরমায়েশ, যুদ্ধের সরঞ্জামাদি বহনের খরচবৃদ্ধি এবং জাহাজ তৈরির কাঠ ও নাবিকের দুষ্প্রাপ্যতা ডানডাসকে ক্রমবর্ধমানভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। অন্যদিকে এজেন্সি হাউজগুলির জন্য ওয়েলেসলির কিছু করার প্রয়োজন ছিল। কারণ তাঁর সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তাঁকে এদের নৈতিক ও অর্থনৈতিক সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। এজেন্সি হাউজগুলি নিজেদের স্বার্থেই যুদ্ধবিগ্রহে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল। তারা আশা করেছিল, যুদ্ধবিগ্রহের ফলে তারা প্রচুর কন্ট্রাক্ট পাবে, বাধ্যতামূলক স্বর্ণ-রৌপ্যের আমদানির মাধ্যমে তাদের আর্থিক সঙ্কট লাঘব হবে, সেই সাথে খুলে যাবে সুদে সরকারি ঋণ বিনিয়োগের সম্ভাবনার দ্বার। তাদের এই সমর্থনের বিনিময়ে তারা নিজেদের জাহাজে করেই পণ্যপ্রেরণের সুবিধা দাবি করেছিল, যার ফলে তারা এই জাহাজে করেই ইংল্যান্ড থেকে তাদের অতি প্রয়োজনীয় মূলধন আমদানি করতে পারবে। ওয়েলেসলি তাদের এই সুবিধা দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারেন নি, বিশেষকরে তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, কোম্পানির চাহিদার সংকোচন ভারতে উৎপাদন ও রাজস্বআয় ব্যাহত করবে। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের কারণেও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর অভিজাতসুলভ ঔদ্ধত্য জন বেব ও কোর্টের মধ্যকার ষড়যন্ত্রের ফলে গভীরভাবে উদ্দীপ্ত হয়।[১৫৫] ওয়েলেসলি যে ভারতে তৈরি জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন তার আরো একটি কারণ, যুদ্ধের সময়ে আমেরিকার মতো নিরপেক্ষ দেশসমূহের ব্যক্তিমালিকানাধীন জাহাজ ভারত ও ইউরোপের মধ্যেকার বৈদেশিক বাণিজ্যের বহুলাংশ কব্জা করে নিয়েছিল।[১৫৬] সেজন্য তিনি এই মতে উপনীত হন যে, নিরপেক্ষ শক্তির জাহাজের পরিবর্তে এ দেশে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যাদি এ দেশের নিজস্ব জাহাজে করেই ইউরোপে নিয়ে যাওয়া অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। যেসব বিদেশী বণিক রপ্তানিবাণিজ্য নিজেদের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিচ্ছিল, তিনি চাচ্ছিলেন যে, তাদের পরিবর্তে ভারতীয় বণিকেরাই এই ব্যবসাটা চালিয়ে যাবে।[১৫৭]

৩.২ : জাহাজনির্মাণ শিল্পের ক্রমাবনতি

কোর্ট অব ডিরেক্টরস ও ভারত সরকারের সমর্থন ও উৎসাহে ভারতে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ছিল স্বল্পায়ু। যখন থেকে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ভারতীয় জাহাজে করে

১৫৫. ঐ, 61.

১৫৬. উদাহরণস্বরূপ the American trade with Calcutta tripled in extent between 1795 and 1800. Being neutral, their rates of insurance was lower and they had also the access to ports from which the English were excluded C N. Parkinson, *War in the Eastern Seas*, (London, 1954), 45-46. Nor were the American ships expensively built for the Indian trade nor for political purposes; they could also sail without waiting for convoy Consequently, their average rate of freight was £20 a ton compared with the Company's 35 a ton. দেখুন C. H. Philips, *East India Company*, 107.

১৫৭. Cotton, *East Indiamen*, 46.

লন্ডনে পরিবহন করা শুরু হয়, তখন থেকেই বৃটেনের জাহাজ ব্যবসায়ীরা এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানায়। *হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া* গ্রন্থে টেইলর লন্ডন বন্দরে ভারতে তৈরি জাহাজের প্রথম আগমনের ফলে যে ক্রোধ ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল সে সম্পর্কে বলেন:

> লন্ডন বন্দরে ভারতে নির্মিত জাহাজে করে ভারতে উৎপন্ন পণ্যের আগমনের ফলে একচেটিয়া জাহাজ ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, টেমস নদীতে কোন শত্রু জাহাজবহরের উপস্থিতির ফলে উদ্ভূত আলোড়নও তাকে অতিক্রম করতে পারতো না। লন্ডন বন্দরের জাহাজনির্মাতারা সতর্কবাণী তোলার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়; তারা ঘোষণা করে যে, তাদের ব্যবসা ধ্বংসোম্মুখ এবং জাহাজনির্মাণে নিয়োজিত ইংল্যান্ডের সব ছুতার মিস্ত্রিদের পরিবার নিশ্চিত ক্ষুৎপীড়িত হবার মুখে।[১৫৮]

ভারতে নির্মিত জাহাজের অনেকগুলি সুবিধা ছিল। এর মধ্যে প্রধান ছিল পণ্য পরিবহনে কম ভাড়া। ১৭৯৫ সালে জাহাজের মালিকেরা সব রকম পণ্যের জন্য প্রতি টন ১৬ পাউন্ড হারে ২০,০০০ টন পণ্য পরিবহনের সুযোগ প্রদান করে। কেবল বস্ত্রপণ্যের জন্য তারা টনপ্রতি ২০ পাউন্ড দাবি করে। ১৭৯৯-১৮০০ সালে বোর্ড প্রতি টন ২২ পাউন্ড হারে তিনটি জাহাজ ভাড়া করে। অন্যদিকে কোম্পানি জাহাজভাড়া আদায় করতো প্রতি টন ৩৫ পাউন্ড হারে। এছাড়া ইভান কটন উল্লেখ করেন :

> ভারতে নির্মিত এই জাহাজগুলি নিয়মিত ইন্ডিয়াগামী (ইন্ডিয়াম্যান) জাহাজ থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নত মানের ছিল। গতিতে এগুলি নিয়মিত জাহাজগুলিকে ছাড়িয়ে যেতো, মাল উঠানো-নামানোর কাজ অনেক দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতো এবং কোম্পানির কর্মচারীদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে ইন্ডিয়াম্যানদের জন্য নির্ধারিত ইউরোপীয় পণ্য ইংল্যান্ড থেকে অনির্ধারিত সময়ে বহন করে এগুলি ঐতিহ্য ভঙ্গ করেছিল।[১৫৯]

অতএব ভারতের বেসরকারি জাহাজের মালিকদের হাত থেকে নিজেদের একচেটিয়া বাণিজ্য রক্ষার জন্য বৃটিশ জাহাজমালিকেরা একটি সুসঙ্ঘবদ্ধ পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করে। তারা ছোট ৫০০ টনের জাহাজে করে ১০,০০০ টন পণ্য পরিবহনের সুযোগ প্রদান করে। এর উদ্দেশ্য ছিল কম জাহাজভাড়ায় ব্যক্তিগত ব্যবসার সুযোগ দেয়া এবং ভারতে নির্মিত জাহাজের প্রয়োজনীয়তা দূর করা। এব্যাপারে তারা একটি প্রচারাভিযানও শুরু করে। লন্ডনে কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে এ দলটি খুব সহজেই মালিকবর্গকে পত্র-পত্রিকায় ও প্যামফ্লেটে তাদের পক্ষে লেখালেখি করার জন্য প্ররোচিত করতে পারে। সংখ্যার অনুপাতে তাদের প্রভাব অত্যধিক হওয়ায় বিশেষকরে ডিরেক্টর নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের জয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। ওয়েলেসলি কর্তৃক ভারতে নির্মিত জাহাজকে উৎসাহিত করার নীতিকে তারা কোম্পানির ও জাতীয় স্বার্থের জন্য বিপজ্জনক বলে গণ্য করে এবং তার ও ডানডাসের

১৫৮. Digby, *India,* 79.

১৫৯. Cotton, *East Indiamen,* 46

বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করে যে, তারা কলকাতার এজেন্সি হাউজগুলির হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। ভারতে নির্মিত জাহাজ দিয়ে ব্যবসার বিরুদ্ধে সমালোচনায় কোর্ট অব ডিরেক্টরস অদ্ভুত সব যুক্তি উত্থাপন করা শুরু করে। তাদের একটি লেখায় এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, লস্করদের অর্থাৎ ভারতীয় নাবিকদের বৃটেনে অবতরণ করতে দিলে ভারতে তাদের সাম্রাজ্য শাসন হুমকির সম্মুখীন হবে। ১৮০১ সালে এ বিষয়ে কোর্ট লেখে :

> দেশে ফেরার পর তারা (ভারতীয় নাবিকেরা) আমাদের সম্পর্কে যেসব অবজ্ঞাপূর্ণ বিবরণ ছড়ায় তা আমাদের এশীয় প্রজাদের মনের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার না করে পারে না। এর ফলে আমাদের চরিত্র সম্পর্কে তাদের মনে যে শ্রদ্ধাবোধ ছিল, যা এতদিন প্রাচ্যে আমাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে, তা ক্রমশ অত্যন্ত বাজে ধারণায় পরিণত হবে। যদি একবার তারা এই ক্ষুব্ধ উপলব্ধিতে উপনীত হয় যে, এ পর্যন্ত তারা আমাদের অত্যন্ত বেশি মর্যাদা দিয়েছে বা খুব বেশি সম্মান দেখিয়েছে, তাহলে এর প্রভাব আমাদের অত্যন্ত স্বার্থবিরুদ্ধ প্রমাণিত হতে পারে।[১৬০]

ভারতীয় জাহাজ এবং ভারতীয় নাবিক খাটানোর ব্যাপারে এর পর পরই কোর্ট অব ডিরেক্টরস নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে। ১৮০২ সালের ১৬ জুনে লিখিত একটি সাধারণ চিঠিতে কোর্ট গভর্নর জেনারেলকে উদ্দেশ করে এই শর্তারোপ করে যে, এ পর্যন্ত প্রাইভেট বণিকদের জন্য প্রতিবছর জাহাজে করে ৩,০০০ টন মালামাল পরিবহনের যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার অতিরিক্ত তিন, চার বা পাঁচ হাজার টনের বরাদ্দও তারা দাবি করতে পারে, যা তাদেরকে বরাদ্দ করা যেতে পারে। এজন্য যেসব জাহাজের প্রয়োজন হতে পারে সেসব হয় গ্রেট বৃটেনে নয়তো ভারতে নির্মাণ করতে হবে এবং কোম্পানি সেসব ভাড়া করে নিজেদের মালামাল লন্ডনে পরিবহনের জন্য প্রাইভেট বণিকদের কাছে ভাড়া দেবে। এছাড়া কোর্ট আরো নির্দেশ দেয় যে, এভাবে যেসব জাহাজ ভাড়া করা হবে সেসবের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ নাবিকদল ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত হতে হবে; জাহাজভাড়ার হার টনপ্রতি ১৪ পাউন্ডের বেশি হবে না এবং জাহাজ এই শর্তে সমুদ্রযাত্রা করবে যে, এগুলো আর ভারতে ফিরে আসতে পারবে না, ইংল্যান্ডেই বিক্রি হয়ে যাবে।

এই নির্দেশনামা ভারতীয় জাহাজমালিকদেরকে নিঃশর্তে নিজেদের জাহাজে মালামাল পরিবহনের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত করে। তাছাড়া ১৮০৩ সালের এপ্রিল থেকে দু'বছর পর্যন্ত ভারতে নির্মিত জাহাজ খাটাতে হবে—প্রধানমন্ত্রী এ্যাডিংটনের এই সিদ্ধান্তের (যা আরও বর্ধিত করা হবে বলে এজেন্সি হাউজগুলি সঠিকভাবে বা ভ্রমাত্মকভাবে মনে করেছিল) ফলে জাহাজনির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে যে জল্পনা-কল্পনার উদ্ভব হয়েছিল তার উপর উল্লিখিত চিঠিটির প্রভাব ছিল বেলুন ফুটো করে দেয়ার মতো। ১৮১৪ সালে বৃটিশ

১৬০. Digby, *India*, 102-03.

পার্লামেন্ট আরো একটি আইন পাশ করে। তা হলো, কোন জাহাজই, এমন কি বৃটিশ মালিকানাধীন হলেও তা লন্ডনে প্রবেশ করতে পারবে না, যদি না তার নাবিকদের তিন-চতুর্থাংশ বৃটিশ হয়। জাহাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা সরকারের উপর প্রভাব খাটিয়ে ভারতীয় জাহাজ যেন বৃটেনে নিবন্ধিত হবার পূর্ণ সুবিধা না পায় সে ব্যবস্থাও করে নিয়েছিল। ১৮১৬ সালের জানুয়ারিতে বা এর আগে নির্মিত ৩৫০ টনের বেশি ধারণক্ষম জাহাজকে মাত্র সীমিত সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করা হয়েছিল।[১৬১] ভারতে নির্মিত জাহাজকে বৃটেনে নিবন্ধিত হবার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে যেসব বন্দরের সঙ্গে বৃটেনের পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি ছিল, ভারতীয় জাহাজকে সেসব বন্দরের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত করা হয়। ১৮১১ থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে বৃটেনের নয় এরকম সব জাহাজের উপর বৈষম্যমূলক আমদানিশুল্কও আরোপিত হয়। এই শুল্কহার 'ভারতীয় বাণিজ্যের জন্য ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকর'।[১৬২] এভাবে ১৮২০ সালের আগেই ভারতীয় জাহাজের কার্যত শুধু ইংল্যান্ডে যাওয়াই নিষিদ্ধ করা হয় নি, বরং অন্যান্য ইউরোপীয় ও বিদেশী বন্দর থেকেও একে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এখন এর একমাত্র অক্ষুণ্ন বিচরণক্ষেত্র হলো দেশের লাভজনক অভ্যন্তরীণ ব্যবসা এবং তা বছরের পর বছর সম্প্রসারিত হতে থাকে। ১৮১৩ সাল থেকে যেসব বৃটিশ জাহাজমালিক ও বণিক ভারতের সঙ্গে ব্যাপক লাভজনক ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল (কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকার রহিত করার পর), তারা এখন উপকূলীয় বাণিজ্যের সুবিধাদিও দাবি করে বসে। ১৮২৩ সালের কনসোলিডেটিং এ্যাক্ট দ্বারা বৃটিশ জাহাজকে এসব সুবিধাদিও দেয়া হয়। বৃটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতার অনেকগুলি এজেন্সি হাউজের তীব্র প্রতিবাদ শেষ পর্যন্ত অসার প্রমাণিত হয়। তাদের অনেকগুলি জাহাজ বেকার হয়ে পড়ে।[১৬৩]

অন্যান্য অনেকগুলি কারণের জন্য এই শিল্পটি গুরুতরভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে। প্রথমত, তখন ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে অর্থবাজারে যে টানাপড়েন শুরু হয়, তাতে কলকাতার এজেন্সি হাউজগুলি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই একই সময়ে গ্রেট বৃটেনে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়, তাতে দুর্দশা আরো তীব্র হয়। এর ফলে মেসার্স পামার এন্ড কোম্পানিসহ অনেক এজেন্সি হাউজ তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নেয়। এ থেকে আবার ভারতীয় ধনপতিরা তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ প্রত্যাহার করে নেয়। দ্বিতীয় যে কারণে বাংলার জাহাজ চলাচল

১৬১. Singh, *Bengal,* 21

১৬২. S N. Gupta, *British,* 37, The nascent Indian ship-building industry was beginning to damage the well established British shipbuilders because its cost structure was found economical by the British users of merchantmen Hence the British shipbuilders clamoured for a duty on India-built shipping which would make the buyer indifferent as to where he purchased his ship. S Ambirajan, *Classical Political Economy and British Policy in India,* (Cambridge 1978). 189.

১৬৩ . Singh, *Bengal,* 130

নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা প্রায় এই সময়েই ঘটে। যন্ত্রকৌশলজনিত উদ্ভাবনের ফলে বৃটিশ নৌ-পরিবহন শিল্পে মূল্যমানের প্রচুর হ্রাস ঘটে। জাহাজভাড়া প্রতি টনের জন্য ৬ পাঃ থেকে ৮ পাঃ পর্যন্ত কমিয়ে আনা যেতো।[১৬৪] তুলনামূলকভাবে সস্তা বৃটিশ জাহাজগুলির চলাচল এবং নেভিগেশন আইনের প্রয়োগের ফলে চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতে নির্মিত জাহাজের পরাজয় ছিল অবধারিত। এসব কারণে ইতিপূর্বে আমেরিকান জাহাজেরও পরাজয় ঘটে। ভারতীয় এবং বৃটিশ জাহাজের ভাড়ার পার্থক্য ছিল পরেরটির অনুকূলে শতকরা ৩০ ভাগ। গত বিশ বছর বিরাজমান ভাড়ার তুলনায় জাহাজভাড়া কমে গিয়েছিল তিন ভাগের দুই ভাগ। আর বৃটিশ জাহাজগুলি বন্দর থেকে বন্দরে তাদের বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছিল আইনের শর্ত উপেক্ষা করে।[১৬৫] উপরের দু'টি কারণ ছাড়াও বাংলার (সে অর্থে সমগ্র ভারতের) জাহাজ চলাচল এসময় মাস্‌কটের ইমামের সম্প্রসারিত জাহাজবহর থেকে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছিল। এ সব কিছুর পুঞ্জীভূত প্রভাবের ফলে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের জাহাজনির্মাণ শিল্প মারাত্মক দুর্দশায় পড়ে। ১৮১৪-২১ সালে যেখানে গড়ে ন্যূনপক্ষে ৫,২১১ টন জাহাজ নির্মিত হয়েছে, ১৮২২-২৯ সালে সেখানে এই গড় পড়ে গিয়ে হয় ১,৫৫৬ টন ; ১৮৩০-৩৭ সালে হয় ১,৪৪২ টন, এবং ১৮৩৭-৪৬ সালে গিয়ে দাঁড়ায় ১,০১৫ টনে।[১৬৬] ১৮৩০ ও ১৮৪০-এর দশকে বাংলার জাহাজশিল্পের ক্রমাবনতি এত দ্রুত ঘটে যে, নবনির্মিত জাহাজগুলি পুরাতনগুলির স্থলাভিষিক্ত হবার মতো যথেষ্ট ছিল না। এই পরিস্থিতিতে লাভবান হচ্ছিল ইউরোপীয় জাহাজগুলি (প্রধানত বৃটিশ), এবং ভারতীয় বৃটিশ বন্দরে স্থানীয় জাহাজগুলির তুলনায় এগুলির মাল বহনক্ষমতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে আসছিল (সারণি ৩.২)। অবশেষে ১৮৬৩ সালের এপ্রিলে জাহাজনির্মাণ শিল্প চূড়ান্তভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। এটা ঘটে বৃটিশ রাজ কর্তৃক ভারত সরকারের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই। এর ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উইলিয়াম ডিগবি বলেন, "যেভাবে পশ্চিমা বিশ্বের সমুদ্রেশ্বরী প্রাচ্যের সমুদ্রেশ্বরীকে মারণাঘাত হেনে কুপোকাত করে,তার চেয়ে অন্য কোন কিছুই আমাকে এত প্রবলভাবে আক্রান্ত করে নি।"[১৬৭]

এভাবে বাংলার সামুদ্রিক পরিবহন শিল্পকে পরিপূর্ণরূপে গড়ে তোলার বিস্ময়কর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, স্বদেশে বৃটিশ সরকার ভারতীয় জাহাজ চলাচল শিল্পের কণ্ঠরোধ করার সচেতন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভারতীয় জাহাজ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা না করার সিদ্ধান্তটি নেয়া হয় লন্ডনে কার্যকর ক্ষমতাধর বৃটিশ জাহাজশিল্প স্বার্থগোষ্ঠীর

১৬৪. Tripathi, *Trade,* 131

১৬৫. ঐ, 252.

১৬৬. দেখুন সারণি ৩.১।

১৬৭. Digby, *India,* 88

উদ্যোগে। ইংল্যান্ডের সরকার এই স্বার্থগোষ্ঠীর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এবং ভারতের সম্প্রসারণশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুবিধাবৃদ্ধির জন্য অতঃপর যথাযথ আইন, রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান পাশ করে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এধরনের প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশে বাংলার জাহাজশিল্প চূড়ান্তভাবে ইংল্যান্ডের জাহাজশিল্পের কাছে পরাজিত হবে।

সারণি ৩.২ ঃ ১৮৪১ ও ১৮৫৪ সালে ভারতের বৃটিশ বন্দরে স্বদেশী জাহাজসহ যেসব জাহাজ ভিড়ে এবং মাল খালাস করে তাদের সংখ্যা এবং ধারণক্ষমতা

সন	যেসব জাহাজ ভিড়েছে তার সংখ্যা		মাল খালাসকারী জাহাজের সংখ্যা		মোট	
	জাহাজ সমূহ	টনে ওজন	জাহাজ সমূহ	টনে ওজন	জাহাজ সমূহ	টনে ওজন
১৮৪১	২৫,৮৮৭	১০,৫০,৮৮৭	২৬,৫৮৯	১১,৩০,৪৩৭	৫২,৪৭৬	২১,৮১,৩৬০
১৮৫৪	১২,৭৮৯	১,৫৫,৩০০	১৩,২৯২	১৬,৮১,২৭১	২৬,০৮১	৩২,৩৫,৫৭১

ইউরোপীয় এবং দেশীয় জাহাজের সংখ্যা এবং টনের হিসাবে পণ্যপরিবহন ক্ষমতার তুলনামূলক বিবরণ

ইউরোপীয় জাহাজসমূহ

সন	জাহাজ	টন	জাহাজ	টন	জাহাজ	টন
১৮৪১	১,৩৯০	৪৫৯.২৯৫	১,৫৮৭	৪,৯৫,২৯১	২,৯৭৭	৯,৫৪,৫৮৬
১৮৫৪	২,৮১৩	১.১০৪.২৪৪	৩,২২৩	১২,৩০,৫৭০	৬,০৩৬	২৩,৩৪,৮৯৪

দেশীয় জাহাজসমূহ

সন	জাহাজ	টন	জাহাজ	টন	জাহাজ	টন
১৮৪১	২৪,৪৯৭	৫,৯১,৫৯২	২৫,০০২	৬,৩৫,১৮২	৪৯,৪৯৯	১২,২৬,৭৭৪
১৮৫৪	৯,৯৭৬	৪,৫০,০৫৬	১০,০৬৯	৪,৫০,৭০১	২০,০৪৫	৯,০০,৭৫৭

উৎস : জন বিগস, ইন্ডিয়া এ্যান্ড ইউরোপ কমপেয়ারড ঃ বিং এ পপুলার ভিউ অব দি প্রেজেন্ট স্টেট এ্যান্ড ফিউচার প্রসপেক্টাস অব আওয়ার ইস্টার্ন কন্টিনেন্টাল এম্পায়ার (লন্ডন ১৮৭৫), ৯৬।

৪.০ লবণশিল্প

বাংলার চারশ' মাইল দীর্ঘ ও একশ' বিশ মাইল গভীরতাবিশিষ্ট কটক থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলরেখা বরাবর লবণ উৎপন্ন হতো। এই এলাকার মাটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে

এই যে, তা প্রাকৃতিকভাবেই লবণকণায় পরিপূর্ণ।[১৬৮] এজন্য তা ছিল লবণ উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত। এই এলাকায় দু'টি প্রক্রিয়ায় লবণ উৎপাদিত হতো। এর একটি হলো সূর্যালোকে সমুদ্রের জল বাষ্পীকরণ পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন লবণকে কুরকুচ বলা হতো। পুঙ্গা ধরনের লবণ উৎপন্ন হতো সমুদ্রের ঘন লবণাক্ত জল সিদ্ধ করে। এ দু'ধরনের লবণের মধ্যে পুঙ্গা ধরনের লবণ বা সিদ্ধলবণ ছিল ভোক্তাদের অধিকতর প্রিয়। তা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে উৎপন্ন হতো। অন্যদিকে হিন্দু জনগণের কিছু অংশ সূর্যালোকে শুকানো কুরকুচ ধরনের লবণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য শুভ মনে করতো। এই লবণের বাজার ছিল কিছুটা সীমিত।

প্রাচীনকাল থেকেই লবণ রাজস্ব আয়ের একটি উৎস হলেও এ খাতে আয় ছিল কিছুটা সীমিত। মুগল আমলে এর দায়িত্ব একচেটিয়া হিসেবে কোন আনুকূল্যপ্রাপ্তকে বা আনুকূল্যপ্রাপ্তদের দেয়া হতো বা সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে বিক্রি করা হতো। কিন্তু মুগল আমলে একচেটিয়া অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির একচেটিয়া অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য না ছিল কোন সামর্থ্য না ছিল কোন সংস্থা। তাছাড়া সরকারকে সারাক্ষণ বিস্তৃত এলাকা জুড়ে কর্মরত চোরাচালানীদের কথা ভাবতে হতো। বোল্টের মতে, নবাব আলিবর্দীর আমলে চল্লিশ, পঞ্চাশ বা ষাট টাকায় প্রতি একশ' মণ লবণ বিক্রি হতো।[১৬৯]

পলাশীর যুদ্ধের পর ইউরোপীয়রা প্রথমবারের মতো লবণ ব্যবসায়ে যোগদান করে। ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ লবণ, সুপারি ও তামাকের ব্যবসার জন্য একটি 'এক্সক্লুসিভ সোসাইটি' বা একচেটিয়া সংস্থা গঠন করে। এর লভ্যাংশ কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় যেন সেবছর আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য রহিত করার ফলে কোম্পানির কর্মচারীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ হয়। ঠিকাদার হিসেবে ক্রয় ও বিক্রয় ব্যতীত অন্য কোনভাবে সোসাইটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যবসা না করার জন্য সবাইকে নিষেধ করে দেয়া হয়। অন্য কথায়, এই পদক্ষেপ ছিল ব্যবসা এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা। কোম্পানির সরকারকে মূল্যানুসারে শতকরা ৩৫ ভাগ শুল্কআয় বরাদ্দ করা হয়। পরে এটা বৃদ্ধি করে করা হয় ৫০ ভাগ।[১৭০] এই 'এক্সক্লুসিভ সোসাইটি'র অধীনে লবণের দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৭৬৫ সালে এই সোসাইটি গঠন করার আগে যেখানে প্রতি ১০০ মণ লবণের দাম ছিল ১২৫ টাকা, সোসাইটি গঠন করার পর ১৭৬৬ ও ১৭৬৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় যথাক্রমে ২৪৭ টাকা এবং ২৩১ টাকা।[১৭১] সোসাইটিকে একচেটিয়া ও অভিনব বিবেচনা করে ১৭৬৮ সালের অক্টোবরে কোর্ট অব ডিরেক্টরস এটি বিলুপ্ত করে দেয়।

১৬৮. John William Kaye, *The Administration of the East India Company,* (London 1853), 671

১৬৯. *Midnapore Salt Papers*, Introduction, 2.

১৭০. A. M. Serajuddin, 'The Salt Monopoly of the East India Company's Government in Bengal', *Journal of the Economic and Social History of the Orient,* XXI: III, 304-05

১৭১. N. K. Singh, *The Economic History,* Vol. 1, 216.

অতঃপর খোলা এবং মুক্ত একটি পদ্ধতি সদ্যবিলুপ্ত সোসাইটির স্থলাভিষিক্ত হয়। এই ব্যবস্থার অধীনে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কোম্পানির সরকারকে শতকরা ৩০ ভাগ আবগারি কর প্রদান সাপেক্ষে চুক্তিতে আবদ্ধ হবার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু এক্সক্লুসিভ সোসাইটির অসাধু আচরণের ফলে সরকারের রাজস্ব আয় প্রত্যাশিত আয়ের চেয়ে অনেক কম হয়। কারণ তাদের পুরনো মজুত বিক্রির অজুহাতে সোসাইটি বণিকদের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করে। ১৭৬৫ সালে গঠিত হবার পর ছয় বছরের মধ্যে সোসাইটি এত বিপুল পরিমাণ লবণ চোরাচালান করে যে, ১৭৭৩ সালে 'কমিটি অব সিক্রেসি'র হিসাব মতে সরকার মোট ৪০ লক্ষের অধিক টাকার বিক্রয়কর থেকে বঞ্চিত হয়।[১৭২] অধিকন্তু, লবণের ব্যবসা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হলেও বাস্তবে এই ব্যবসা কোম্পানির কর্মচারীদের একচেটিয়া ব্যবসায়ে পরিণত হয়। মুৎসুদ্দিদের এজেন্সির মাধ্যমে ইউরোপীয়রা লবণ ব্যবসায়ের চুক্তিতে বেনামে সংশ্লিষ্ট থাকা অব্যাহত রাখে।

সরকারের সম্পদবৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস লবণ ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা সরাসরি সরকারের হাতে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৭৭২ সালে পাঁচ বছর মেয়াদে তিনি ঠিকাদারদের কাছে লবণ উৎপাদনের ইজারা দেন। এতে ঠিকাদাররা একটি পূর্বনির্ধারিত মূল্যে সব উৎপাদিত লবণ কোম্পানির কর্মকর্তাদেরকে সরবরাহ করবে এবং তারা তা সরবরাহ করবে লবণ বণিকদের কাছে। লবণ ব্যবসায়ীরা আগেভাগেই ঠিকাদারদের অগ্রিম অর্থ প্রদান এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ গ্রহণ করার ব্যাপারে সম্মত হয়। লবণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার ঠিকাদারদের উপর ন্যস্ত করে ১৭৭৭ সালের জুলাইতে এই ব্যবস্থা সংশোধন করা হয়। কিন্তু এ সংস্কার আদৌ সফল হয় নি। স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দুর্নীতির প্রচলন ছিল। সর্বোত্তম লবণখামারগুলি তারা বেনামি লেনদেনের মাধ্যমে নিজেদের জন্য সংরক্ষিত রাখতো। এভাবে তারা সরকারকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করে। তারপরও করমন্ডল উপকূল ও মারাঠা অধ্যুষিত জেলাগুলি থেকে সস্তাদরের লবণের বিরাট চালান আসার ফলে কোম্পানির বিক্রয়কেন্দ্রে বাংলার উৎপাদিত লবণের দাম পড়ে যায়।[১৭৩]

১৭২. *Parliamentary Report* of the Commons on Salt in British India, 1856, উদ্ধৃত *Midnapore Salt Papers*, Introduction. 4.

১৭৩. The Coromandel salt was of *kurkutch* variety and was, therefore, much cheaper than the *pungah* variety manufactured in Bengal. "Madras salt is inferior, and sells at a much lower price though a much higher price is given by the Company than for their own.' (*Report from the Select Committee of the House of Lords,1830,* p. 413). It was even proposed that the Coromandel salt might undergo a process of purification at Calcutta which would adopt it perfectly to the Bengal market (*Midnapore Salt Papers*, Introduction. 8) The coast salt was imported in the interest of British ship owners. In 1775, no less than 11, 33,686 Mds. of Madras and Orissa salt was imported which led to a loss in the Company's sales. The government imposed a duty of Rs. 30 per 100 mds. on salt imported in country boats but salt imported in boats of European construction and navigated by Europeans was not affected

একথা বলা যায় যে, ১৭৮০ সাল পর্যন্ত লবণের উৎপাদন ছিল ব্যবসায়ী মহলের ব্যবস্থাপনাধীন এবং তারা 'মালঙ্গি'দের (লবণ শ্রমিক) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতো ও তাদের অগ্রিম প্রদান করতো। কোম্পানিসরকারের আগে এই ব্যবসায়ের মুনাফা যেতো স্থানীয়দের হাতে। কিন্তু বাংলায় বৃটিশদের ক্ষমতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়, ইংরেজরা শীঘ্রই এই ব্যবসায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লবণের কোন ব্যবসায়ে জড়িত হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তারা এই ব্যবসায়ে গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকে। "যদিও লবণ ব্যবসায়ের এই দিকটি (উৎপাদনের দিক) ১৭৮১ সালের এজেন্সি সিস্টেম চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্থানীয়দের জন্য উন্মুক্ত ছিল, তথাপি ইংরেজ কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের স্বার্থ ছিল ব্যাপক। তারা সরাসরি চুক্তিতে আবদ্ধ না হলেও স্থানীয়দের নামে চুক্তিতে আবদ্ধ হতো।"[১৭৪]

১৭৮১ সালে সরকার ইজারাব্যবস্থা রহিত করে এজেন্সিব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে লবণরাজস্ব প্রশাসনে একটি পরিবর্তন আনয়ন করে। এ. এম. সিরাজুদ্দীন যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে, "এই ব্যবস্থায় অভিনবত্ব কিছু ছিল না। সরকারের প্রয়োজন ছিল রাজস্ববৃদ্ধির এবং এরই ব্যবস্থা করা হয়েছে এই সংস্কারের মাধ্যমে। বিপুল সংস্থাপন ব্যবস্থাই এই সংস্কারের নতুন দিক।"[১৭৫] এই পরিকল্পনার অধীনে এদেশের লবণ উৎপাদনের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ছয়টি এজেন্সির মাধ্যমে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। এগুলি হলো 'হিজলি', 'তামলুক', 'চব্বিশ পরগনা', 'রায় মঙ্গল', 'ভুলুয়া' এবং 'চট্টগ্রাম'। এগুলির তত্ত্বাবধানে থাকবে কোম্পানির এজেন্ট, যারা উৎপাদকদের দাদন প্রদান করবে। বছরে কি পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হবে এবং নগদ টাকায় কি মূল্যে তা বিক্রয় করা হবে তা প্রত্যেকবার মৌসুমের শুরুতে গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত এবং প্রকাশিত হবে। এভাবে যে লবণ উৎপন্ন হতো তার একাংশ বিভিন্ন এজেন্সিতে অবস্থিত সরকারের গোলায় মজুত করা হতো, একাংশ পাঠানো হতো কলকাতার সন্নিকটে অবস্থিত সুলকিয়াস্থ কোম্পানির গুদামে। অনির্ধারিত পরিমাণে লবণ নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করা হতো। লবণের উৎপাদনমূল্য ও ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রদত্ত পাইকারিমূল্যের মধ্যে যে তারতম্য তা-ই ছিল লবণ থেকে আদায়কৃত শুল্ক। সরকার এভাবে শুধু লবণ উৎপাদনের উপরই নয়, লবণ বিক্রির উপরও সম্পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার পর সরকারি খাত ছাড়া অন্য খাতে লবণ আমদানি বন্ধ হয়ে যায়।

লবণের মতো একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য থেকে হেস্টিংস যতো বেশি রাজস্ব আদায় করা সম্ভব ততোটাই আদায় করেছিলেন। সে হিসেবে হেস্টিংসের লবণরাজস্ব প্রশাসন

১৭৪. M Huq, *Bengal*, 25.

১৭৫. A. M. Serajuddin, 'The Collapse of the Salt Industry of Bengal in the 19th Century', in the *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, XXIX 1: 1984, 21.

বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে বলে মনে হয়। আগের ৮,৪২৭ পাউন্ড থেকে বৃদ্ধি পেয়ে নতুন ব্যবস্থার প্রথম বছরে (১৭৮১-৮২) ৩,২১,৯১২ পাউন্ড রাজস্ব আদায় হয়। ১৭৮২-৮৩ এবং ১৭৮৩-৮৪ সালে লবণরাজস্ব থেকে আয় বৃদ্ধি পেয়ে হয় যথাক্রমে ৬,০৫,৬৪৬ এবং ৬,০৩,০৭৬ পাউন্ড। ১৭৮৬-৮৭ থেকে ১৭৯১-৯২ সাল পর্যন্ত (উভয় বছর হিসাবে ধরে) ছয় বছরে রাজস্বের গড় হলো ৯,৩৫,৩১৯ পাউন্ড।[১৭৬] ১৭৯৩ সালে বোর্ড অব ট্রেড গঠনের ফলে লবণরাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থার আরো অনেক উন্নতি হয়। ১৮১০ থেকে ১৮১২ সালে লবণ বিক্রি থেকে যে পরিমাণ রাজস্ব সংগৃহীত হয় তা হলো ১৩,৬০,১৮০ পাঃ।[১৭৭] পরবর্তী বছরগুলিতে রাজস্ব আরো বৃদ্ধি পায়। সারণি ৪.২-তে এ বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এব্যবস্থা পুরোপুরি কার্যকর হবার পর লবণ থেকে কোম্পানির আয় এত বিপুল পরিমাণে

সারণি ৪.১ : ১৭৬৬-১৭৮৪ সালে লবণ থেকে কোম্পানির রাজস্ব আয় (পাউন্ডে)

সন	প্রাপ্ত টাকার অংক	সন	প্রাপ্ত টাকার অঙ্ক
১৭৬৬-৬৭	১,১৮৯২৬	১৭৭৫-৭৬	১,৪৭৩ (-)
১৭৬৭-৬৮	১,১৪,২১৮	১৭৭৬-৭৭	১,৩৯,০১২
১৭৬৮-৬৯	চিহ্নিত করা হয়নি	১৭৭৭-৭৮	৫৪,১৬০
১৭৬৯-৭০	১৬,৯০৭	১৭৭৮-৭৯	৬৩,৬৯৭
১৭৭০-৭১	৭০,৯১৪	১৭৭৯-৮০	৩২,২৮৭
১৭৭১-৭২	৬১,৬৬৩	১৭৮০-৮১	৮,৪২৭
১৭৭২-৭৩	৪৫,০২৭	১৭৮১-৮২	৩,২১,৯১২
১৭৭৩-৭৪	২,২৯,১৯২	১৭৮২-৮৩	৬,০৫,৬৪৬
১৭৭৪-৭৫	১,৩০,২৬৩	১৭৮৩-৪	৬,০৩,০৭৬

উৎস : মজহারুল হক, *দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিজ ল্যান্ড পলিসি এন্ড কমার্স ইন বেঙ্গল. ১৬৯৮-১৭৮৪,* (ঢাকা ১৯৬৪), ২৫৩।

বেড়ে যায় যে, তা কোম্পানির রাজস্বআয়ের দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাতে পরিণত হয়। এভাবে লবণরাজস্বের অবস্থান হয় ঠিক ভূমিরাজস্বের পরেই এবং এর পরিমাণ দাঁড়ায় বাংলা থেকে সর্বমোট রাজস্বের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ।[১৭৮] অতি সুসংগঠিতভাবে

১৭৬. P. Ray. *"History of Taxation of Salt under the Rule of the East India Company", The Calcutta Review,* January 1930, 38

১৭৭. *Midnapore Salt Papers*, Introduction, 5-6

১৭৮. A M Serajuddin, "Salt Monopoly", 308.

লবণসম্পদ আহরণের ফলে লবণ খাতে রাজস্ব ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮০৩ সালে উড়িষ্যাতে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তারের দুই দশকের মধ্যে তা ভূমিরাজস্বকেও অতিক্রম করে যায়।

সারণি ৪.২ : ১৮২২-২৭, ১৮৩৯-৫০ সালে বাংলায় লবণ থেকে প্রাপ্ত মোট রাজস্ব (টাকায়)

সন	প্রাপ্ত টাকার অঙ্ক	সন	প্রাপ্ত টাকার অঙ্ক
১৮২২	২,০৪,৭৫,৪১২	১৮৪২-৪৩	১,৬৪,৩৩,৪১২
১৮২৩	১,৯০,৩৯,৫১৪	১৮৪৩-৪৪	১,৫৫,৭৮,০১০
১৮২৪	১,৮১,৯১,৩০১	১৮৪৪-৪৫	১,৬০,৪২,৭৩০
১৮২৫	১,৮৪,৪৩,৬৯৮	১৮৪৫-৪৬	১,৪৯,০৯,০২১
১৮২৬	১,৮৭,৩৫,৭৩৩	১৮৪৬-৪৭	১,৬২,৭৯,৭২৫
১৮২৭	২,০৫,৩৬,৮৭২	১৮৪৭-৪৮	১,৬৫,৮৩,৬৬৪
১৮৩৯-৪০	১,৬১,৯৪,১৮৮	১৮৪৮-৪৯	১,৪১,৪৪,৩২১
১৮৪০-৪১	১,৬৩,৮০,০৮৪	১৮৪৯-৫০	১,৬১,০৭,৩৮৪
১৮৪১-৪২	১,৫৭,৫০,৯৬৭		

উৎস : এ. ত্রিপাঠি, *ট্রেড এন্ড ফাইনান্স*, ২৬০; জন কেই, প্রাগুক্ত, ৬৭০।

লবণ থেকে সরকারের বাৎসরিক ১,০০,০০০ থেকে ১,২০,০০০ পাউন্ড রাজস্ব আয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল তা বহুগুণ ছাড়িয়ে যায়।[১৭৯] এটা নিশ্চিতভাবেই অল্প শুল্কহারে আরো অধিক বিপণন সম্ভব করে, বেশি মুনাফা অর্জন সম্পর্কিত বোর্ডের যে বিঘোষিত নীতি তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। একমণ লবণ উৎপাদনের মূল্য যেখানে এক টাকার অর্ধেক এবং সবচেয়ে উত্তরের জেলাগুলিতে ১২ বা ১৪ আনা, সেখানে বিক্রয়মূল্য ছিল উৎপাদনমূল্যের শতকরা ৬০০ থেকে ৮০০ ভাগ বেশি।[১৮০] অবস্থা যে এমন ছিল তা সহজেই সরকারি নিলামে (সারণি ৪.৩) প্রতি একশ' মণ লবণের গড় মূল্য থেকে বোঝা যায়। অত্যন্ত চড়া এই বিক্রয়মূল্যের জন্য দায়ী ছিল মূলত একটি নির্দিষ্ট হারে আবগারি আরোপের নীতি। আবগারির এই হার ছিল প্রতিমণ লবণের জন্য তিন টাকা চার আনা। এরকম উচ্চ আবগারি কর আরোপের ফলে বছরে গড়ে লবণের দাম একচেটিয়া অধিকার প্রয়োগ করার আগে যা ছিল তার চেয়ে কমপক্ষে শতকরা ৩০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়।[১৮১]

১৭৯. *Midnapore Salt Papers*, Introduction , 6.

১৮০. *Report of the Select Committee of the House of Lords*, 1830, 42 .

১৮১. ঐ, 217.

সরকারের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে অবশ্য লবণের উপর এভাবে উচ্চহারে শুল্ক আরোপ অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। সরকারের মতে, লবণের উপর আরোপিত শুল্কই হচ্ছে রাষ্ট্রের অর্থখাতে জনগণের একমাত্র অবদান। "যেখানে শুধু লক্ষ লক্ষ মানুষ ধানক্ষেতের উৎপাদনের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করে, কৃষকের কটিতে থাকে শুধু একটি ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড এবং তাদের গৃহস্থালির দ্রব্য বলতে থাকে কয়েকটি হাঁড়ি, সেখানে অর্থনৈতিক কলাকৌশল ও বিচার-বিবেচনা দেখানোর মতো বিস্তৃত ক্ষেত্র নেই। পঞ্চাশটি পৃথক পথে ইংরেজ শুল্ক আদায়কারীরা গরিব মানুষদেরকে করের জন্য পাকড়াও করতে পারতো। কিন্তু ভারতে দিনমজুরদের পর্ণকুটিরের দিকে যাবার পথ ছিল অল্প কয়েকটি এবং শুল্ক সংগ্রাহককে সেসব পথেই অগ্রসর হতে হবে অথবা একেবারেই করের পথ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে।"[১৮২]

সারণি ৪.৩ : ১৭৯০-১৮২৭ সাল পর্যন্ত (বিভিন্ন বছরে) নিলামে প্রতি ১০০ মণ লবণের মূল্য (টাকায়)

সন	প্রাপ্ত মূল্য
১৭৯০	২৩৪ এবং ৩১৪-এর মধ্যে
১৭৯৬-৯৭	৩০৮(গড়ে)
১৭৯৮	৩০৬ এবং ৩৮০ এর মধ্যে
১৮০৩-১৮০৪	৩৪২ (গড়ে)
১৮২২	৪১৮
১৮২৫	৩৯০
১৮২৬	৪১৯
১৮২৭	৪১৫

উৎস : *মিদনাপুর সল্ট পেপারস*, ৬; এ, ত্রিপাঠী, *ট্রেড এন্ড ফাইনান্স*, ২৬০,

তারা সাধারণ লোকের উপর লবণশুল্ককে বোঝা বলেও মনে করে নি। হিসাব করে দেখা গেছে যে, প্রতিটি ভোক্তা লবণের জন্য গড়ে বছরে ১২ আনা প্রদান করে। প্রতি মাসে একজন মজুরের পারিশ্রমিক তিন টাকা ধরে হিসাব করলে দেখা যাবে যে, কলকাতায় সারা বছরের জন্য একজন শ্রমিকের লবণ বাবদ খরচ হবে পাঁচ দিনের পারিশ্রমিক। শাসক শ্রেণীর মতে, এভাবে বিচার করলে "শ্রমের উপর লবণশুল্কের চাপকে কোনমতেই কঠোর বলে অভিহিত করা যাবে না।"[১৮৩] এই শুল্কের ক্ষেত্রে আরেকটি সুবিধা ছিল এই

১৮২. J. W. Kaye, *The Administration of the East India Company* (London 1853), 142-43.

১৮৩. ঐ, 668.

যে, শুল্ক কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই এই শুল্ক আরোপ করা যেতো এবং তা আদায় করাও সুবিধাজনক ছিল।

শুল্কমুক্ত লবণ ব্যবসায়ের বিরোধীরা, লোকহিতৈষীরা, সংবাদপত্র ও জনগণ শুল্কারোপকে এই বলে আক্রমণ করে যে, এই শুল্ক অনুপাতহীন, অন্যায় এবং কুৎসিতভাবে নিষ্ঠুর। তারা দেখিয়ে দেয় যে, এই শুল্ক মোটেও হালকা নয়, বরং তা ছিল জনগণের উপর একটি দুঃসহ বোঝা। লবণের পাইকারি ক্রেতারা একটা কৌশল অবলম্বন করে। তারা সব লবণ না উঠিয়ে সরকারি গুদাম ঘরে একটা অংশ রেখে আসতো এবং বাজারে কম সরবরাহের সুযোগে সর্বাধিক মুনাফা লুটে নিত। এ ধরনের মজুতদারির ফলে লবণের খুচরা মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এর ফলে লবণের গড় ব্যবহার যায় কমে। বোর্ড তাদের নিজেদের বেলায় 'দ্বিতীয় একচেটিয়া অধিকারীর' অস্তিত্ব অস্বীকার করলো বটে, কিন্তু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে যে, তাদের হিসাব ছিল সম্পূর্ণ ভুল। ১৮৩৬-৩৭ সালে নির্ধারিত মূল্য এবং উন্মুক্ত গুদামঘরের নতুন ব্যবস্থা চালু হলে এবং পরবর্তী বছরগুলিতে লবণের উপর কর ক্রমশ কমিয়ে প্রতিমণে ২ টাকা ৮ আনায় নামিয়ে আনা হলে ১৮৪০-এর দশকে লবণের ব্যবহার শতকরা প্রায় ২৪ ভাগের মতো বেড়ে যায়।[১৮৪]

বোর্ড কর্তৃক লবণ সংক্রান্ত বিষয়টি আনাড়ির মতো পরিচালনার ফলে লবণের দাম এত বেড়ে যায় যে, এর ফলে বহু লোক বাধ্য হয়ে লতাপাতা পুড়িয়ে তার ছাইভস্ম থেকে লবণের বিকল্প বের করে অনেক দূষিত, এমন কি তিক্ত জিনিস ব্যবহার করে। বুকানন, কোলব্রুক এবং পরে রামমোহন রায় এ ব্যাপারে তথ্য প্রদান করেন। মূল্যবৃদ্ধির ফলে বাংলার যেসব অঞ্চলে লবণাক্ততা বেশি সেসব অঞ্চলে গোপনে লবণের উৎপাদন শুরু হয় এবং তা বন্ধ করার জন্য সরকারকে ব্যাপক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। চড়ামূল্যের ফলে কোম্পানির গুদাম থেকে বের করে আনার পর বিশেষকরে পাইকারি ব্যবসায়ীরা লবণে ভেজাল মেশাতে উৎসাহিত হয়। বলা হয়ে থাকে যে, এদের হাতে "উত্তম, বিশুদ্ধ এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যবস্তুটি" হয়ে উঠে আর্বজনার স্তূপ। প্রধানত বালি দিয়ে ভেজালকৃত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় শতকরা প্রায় ২৫ থেকে ৫০ ভাগ।[১৮৫] সমসাময়িক একজন আক্ষেপ করে বলেন, "যেখানে প্রত্যেক বাজারেই মরিচ, চিনি, মশলা, তরকারির জিনিসপত্র এবং ঔষধ অনন্য বিশুদ্ধতায় ও সস্তায় পাওয়া যায়, সেখানে বিশটি শহর ঘুরেও কোথাও কোম্পানির গুদাম অথবা খাদ্য সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত বিভাগ থেকে যে স্বচ্ছ দানা সরবরাহ করা হয় তার মতো দেখতে এবং তার মতো রঙের লবণ পাওয়া অসম্ভব।"[১৮৬]

১৮৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন Kaye, *East India Company*, 665-66.

১৮৫. A M Serajuddin, "Salt Monopoly", 316.

১৮৬. "Religious Aspects of the Charter Question", *The Calcutta Review*, XIX, (1853), 137.

৪.২ লবণশিল্পের ক্রমাবনতি

লবণশিল্প যে শুধুমাত্র দেশের ভিতর থেকেই সমালোচিত ও আক্রান্ত হয়েছিল তা নয়, এটি প্রতিপক্ষেরও তীব্র আক্রমণের শিকার হয়। এই প্রতিপক্ষের বেশির ভাগই ছিল ইংল্যান্ডের বণিক গোষ্ঠীভুক্ত। তাদের প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকারের ব্যবস্থা শুধুমাত্র কালের সঙ্গেই অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল না, তা ১৮১৩ সালের চার্টার এ্যাক্টের সঙ্গেও ছিল সামঞ্জস্যহীন। এই এ্যাক্টের ফলে কোম্পানি ভারতের সঙ্গে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং সব ইংরেজ বণিকের জন্য এই উপমহাদেশের বাজারের দ্বার উন্মুক্ত হয়। অধিকন্তু ব্যবসায়ী হিসেবে তারা যদি বিধি-নিষেধ ছাড়া অন্যসব পণ্য রপ্তানি করতে পারে, তাহলে শুধু লবণের ক্ষেত্রে কেন বিধি-নিষেধ বলবৎ থাকবে ? তারা এর মধ্যেও কোন যুক্তি খুঁজে পায় নি যে, যখন বিকল্প উৎস থেকে অধিকতর উন্নতমানের এবং সস্তা লবণ সংগ্রহ করা সম্ভব, তখন সাধারণ মানুষের উপর কেন অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্যের বোঝা চাপানো হবে ? রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকারের আওতায় যেসব জেলায় লবণ উৎপন্ন হয়, সেসব জেলায় মালঙ্গিরা যে নির্যাতনমূলক ও অমানবিক ব্যবহারের শিকার সেকথা তুলে ধরতেও তারা পিছপা হয় নি।

উপরের যুক্তিগুলি আপাতদৃষ্টিতে যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত মনে হলেও এদের সব কিছুই সম্পূর্ণভাবে এবং একমাত্র সত্য ছিল না। বস্তুত, ১৮১৭ সালের রেগুলেশন ১১ দ্বারা সরকার থেকে লাইসেন্স নিয়ে তাদের নিজেদের খাতে প্রতিমণ লবণের জন্য ৩ টাকা শুল্ক দিয়ে বাংলায় লবণ আমদানি করার অনুমতি দেয়া হয়। এর পরের বছরই গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল বিদেশ থেকে লবণ আমদানির উপর আরো গুরুত্ব আরোপ করেন ও সিদ্ধান্ত নেন যে, আমদানিকারকগণকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দিতে হবে যেন দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী লবণ পরিবহনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। কিন্তু লবণ আমদানির প্রথম পর্যায়গুলিতে বৃটিশ লবণ উৎপাদনকারীদের মনে বরাবরই সন্দেহ ছিল যে, লবণ ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াসে কোম্পানি হয়তো বাজারে বিপুল পরিমাণ লবণ ছাড়বে এবং এভাবে বিদেশী লবণ আমদানিকারকদের লোকসান ঘটাবে। তা সত্ত্বেও ১৮২০-এর দশকে বিদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লবণ আমদানি করা হয়। ১৮৩২ সালে আমদানি করা হয় দুই লাখ মণ লবণ। এতে মুনাফার পরিমাণ ছিল মণপ্রতি আট আনা। বাংলার বাজারের তৎকালীন অবস্থায় এই মুনাফার হার অন্য যেকোন ব্যবসায়ের মুনাফার হারের চেয়ে ছিল বেশি।[১৮৭]

কিন্তু যেখানে লক্ষ্য ছিল সমগ্র বাংলার লবণের বাজার করায়ত্ত করা, সেখানে উল্লিখিত বৃদ্ধি সামান্যই সান্ত্বনার কারণ ছিল। বিশেষত ইংল্যান্ড তখন বিপুল পরিমাণ

১৮৭. S. Choudhury, *Economic History of Colonialism, A Study of British Salt Policy in Orissa* (Delhi 1979), 105-07.

লবণ সরবরাহে সমর্থ ছিল। তার কারণ, ১৮২৫ সালে ইংল্যান্ডে লবণশুল্ক রহিত করার ফলে সেখানে লবণশিল্প বিপুলভাবে উৎসাহিত হয়। এজন্য বৃটেনের লবণ উৎপাদনকারীরা বাংলায় লবণের একচেটিয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান শুরু করে। এদের সঙ্গে যোগ দেয় অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল, যেমন জাহাজে মাল বোঝাইকারী ও বয়নশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই আন্দোলনের ফলে হাউজ অব কমন্সের একটি সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়, যার চেয়ারম্যান হন জর্জ উইলব্রাহাম। কমিটির দায়িত্ব হলো বৃটিশভারতে লবণ সরবরাহের ব্যাপারে অনুসন্ধান করা। কমিটি সরকারের একচেটিয়া অধিকারের স্থলে এক্সাইজ এন্ড কাস্টমসের একটি সমন্বিত ব্যবস্থা সুপারিশ করে। কমিটি অভিমত ব্যক্ত করে যে, উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও সরকার রাষ্ট্রের জন্য সরকারি রাজস্বের প্রাপ্য অংশ আদায় করতে সক্ষম হবে। কঠোর প্রকৃতির পরিবর্তন পরিহার করার জন্য কতগুলি অন্তবর্তীকালীন সুপারিশ প্রদান করা হয়। এর প্রথমটি হলো সরকারি গুদাম থেকে সারা বছরই লবণ বিক্রির ব্যবস্থা করা, এমনকি ১০০ মণের সমান স্বল্প পরিমাণে হলেও; দ্বিতীয়টি হলো, লবণের উৎপাদনমূল্যের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট হারের কর আরোপ করে এর বিক্রয়মূল্য ধার্য করা। তৃতীয় সুপারিশ হলো, স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন লবণের উপর কর যে হারে বলবৎ আছে তার সমান হারে কর দেয়ার পর বিদেশী লবণ বিক্রির অনুমতি দেয়া। এছাড়াও কমিটি আরো সুপারিশ করে যে, করের হার গত দশ বছরের সরকারের নীট মুনাফার গড় হারের চেয়ে বেশি যেন না হয়।[১৮৮]

স্থানীয় লবণের উপর শুল্কের হারের সমান হারে আমদানিশুল্ক দিয়ে বাংলায় বিদেশী লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা এ দেশের লবণ উৎপাদন শিল্পের উপর বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলে। এর ফলে স্থানীয় লবণ উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পায়। বিদেশী লবণের উৎপাদনব্যয় তুলনামূলকভাবে কম এবং এর ফলে তারা বাংলায় উৎপন্ন লবণের বিক্রয়মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে তাদের লবণ বাজারে ছাড়তে পারতো। তাছাড়া গুণেও বিদেশী লবণ অনেক উচ্চমানের। ১৮৪৭ সালে বাংলার সাধারণ লবণের দাম ছিল গড়ে ৯৫ টাকা এবং ৭৫ টাকা। বিপরীতে বৃটেনে তৈরি সাধারণ গুদামজাত লবণের দাম ছিল ৮০ টাকা এবং সাধারণ লবণের দাম ছিল ৫০ টাকা।[১৮৯] ১৮৪৫-৪৬ সালে কমপক্ষে ১৫,৮১,৯৮৬ মণ ও ১৮৫১-৫২ সালে ২৯ লক্ষ মণ বিদেশী লবণ বাংলার বন্দরগুলিতে আনা হয়। পরের চালানটির পরিমাণ সেই বছরের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ব্যবহারের শতকরা ৫৬.৫০ ভাগ ছিল।[১৯০] পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে ২৪ পরগনা এজেন্সি বাতিল করতে এবং চট্টগ্রামে লবণ উৎপাদন স্থগিত রাখতে হয়।

১৮৮. Kaye, *East India Company*, 666

১৮৯. A. M Serajuddin, "Collapse of the Salt Industry," 28.

১৯০. ঐ, S. Choudhury, *Economic History*, 108.

যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, মূল্যের তারতম্যের জন্য বাজারে বিদেশী লবণের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে, বাংলার লবণ প্রতিষ্ঠানের সতর্ক ও উত্তম ব্যবস্থাপনার দ্বারা তখনও এই লবণকে বিদেশী লবণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখা যেতো। লবণ বিভাগটির ছিল একটি ব্যয়বহুল প্রশাসনযন্ত্রের বোঝা এবং এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যিক সংস্থার মতো পরিচালিত হয় নি। এই বিভাগটিতে নিযুক্ত ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের বেতনের হার যে শুধু উচ্চ ছিল তাই নয়, বিভাগটিতে একটি বিশাল প্রতিরোধক বাহিনীও ছিল। এ বাহিনীর কাজ ছিল কটক থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত উপকূল বরাবর লবণের বেআইনি উৎপাদন বন্ধ করা। এছাড়া এই বিভাগের মূল্য নির্ধারণের নীতিও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। দেশীয় লবণের ক্রয়মূল্য অযৌক্তিক ও অহেতুকভাবে বাড়ানো হয়। ১৮৩৪ সালে চার্লস ট্রেভেলিয়ান তাঁর বিখ্যাত রিপোর্ট 'আপন দি ইনল্যান্ড কাস্টমস এন্ড টাউন ডিউটিজ অন দি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'-তে এই ব্যবস্থার ব্যাপারে আক্ষেপ করে বলেন, "সরকার এবং জনগণের ব্যয় আরো বেশি পরিমাণে লাঘব করে একই পদ্ধতিতে লবণরাজস্ব সংগ্রহ করা যেতো।"[১৯১] কিন্তু সরকার ব্যয় কমানোর জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, তারা ক্রমশ দেশীয় লবণ উৎপাদন হ্রাস করে আমদানির মাধ্যমে বিদেশী লবণ সরবরাহকে উৎসাহিত করার পক্ষে পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। ১৮৩২ সালে হাউজ অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার জন্য সেই পরিকল্পনাটি ইতিমধ্যেই বাৎলিয়ে দিয়েছিল। কমিটি এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, "আমদানির মাধ্যমে লবণ সরবরাহকে উৎসাহিত করার পন্থা অবলম্বন করা হবে সরকার কর্তৃক লবণ উৎপাদনের বিকল্প।" কিন্তু কমিটি উপদেশ দেয় যে, "দেশী লবণ উৎপাদন এখনই সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া অত্যন্ত অবিচক্ষণতার কাজ হবে।" কাজেই, "আশা করা যায় যে, দেশীয় লবণ উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস করা হবে এবং একাজ ঐসব জেলা থেকেই শুরু করতে হবে যেখানে উৎপাদনব্যয় এবং জীবননাশ হয় সবচেয়ে বেশি। ততোদিন বিপুল পরিমাণ লবণ বিদেশ থেকে সরবরাহ করা হবে, যতোদিন কাস্টমসশুল্কের আওতায় যথেষ্ট লবণ আমদানির অনুমতি দেয়া নিরাপদ বিবেচিত হবে। এরপর সরকার শুধু ঐসব জেলাতেই লবণ উৎপাদনের অনুমতি দিবেন (যদি এরকম কোন জেলা থাকে), যেখানে লাভজনকভাবে উৎপাদন করা সম্ভব হবে।"[১৯২] তাই স্বাভাবিকভাবেই, সংস্কার সাধনের দ্বারা লবণ বিভাগকে দক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে সরকারের কোন উৎসাহই দেখা যায় নি।

১৯১. Charles E Trevelyan, Report upon the Inland customs and Town Duties of the Bengal Presidency, (ed), T Banerjee, (Calcutta reprint, 1976), 319-20 Therein he elaborated his plan as to how this was possible to raise the entire amount of revenue spending much lesser resources

১৯২. *Report from the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East India Company, 1832*, (London 1833), 89.

অবশ্য সরকারকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয় নি। লবণ তৈরি ও বিপণনের উপর একচেটিয়া অধিকার রহিত করার জন্য হৈ চৈ করার ফলে ১৮৫৬ সালে জর্জ প্লাউডেনের অধীনে আরো একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। প্লাউডেন কমিটি লবণের একচেটিয়া ব্যবসার স্থলে ক্রমশ এক্সাইজ ব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ করে। সরকার যখন দেখল যে, তারা শুধু লবণের উৎপাদক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তারা দেশী লবণ শিল্পের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং এক্ষেত্রে সব রকমের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার একটি চমৎকার সুযোগ পায়। এটা কার্যকর করা হয় ১৮৬৩ সালের ৩০ এপ্রিল থেকে। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকারের পরিবর্তে এক্সাইজ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থাধীনে লাইসেন্স ব্যতীত লবণ উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয় এবং এ ধরনের লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় উড়িষ্যার বালাসোর, কটক ও পুরী এই তিনটি জেলায় ও সাগর দ্বীপে এবং ২৪-পরগনা জেলায়। এই ব্যবস্থাধীনে লবণের উৎপাদন প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে নি। ১৮৭৪-৭৫ এবং ১৮৭৫-৭৬ সালে যথাক্রমে মাত্র ৫.৮৫ এবং এবং ৩.২৩ লক্ষ মণ লবণ উপন্ন হয়।[১৯৩] অন্যদিকে ১৮৭৯-৮০ সালে আমদানি পৌঁছে সর্বোচ্চ ৮৬.৫০ লক্ষ মণে। এর বেশিরভাগই আসে গ্রেট বৃটেন থেকে।[১৯৪]

লবণশিল্পের ক্রমাবনতির ফলে সবচেয়ে বেশি দুর্দশাগ্রস্ত হয় মালঙ্গিরা। কারণ, তাদের প্রায় সবাই বংশপরম্পরায় এই পেশায় নিয়োজিত ছিল। শ্রমিকরা লাইসেন্স-প্রাপ্ত লবণের ঠিকাদারদের আওতায় এসে পড়ে এবং এই ঠিকাদারেরা, যারা লবণ উৎপাদন করতো ধার করা মূলধন দিয়ে, তারা অত্যন্ত নির্মমভাবে অসহায় শ্রমিকদেরকে শোষণ করতো। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মালঙ্গিরা অনেকে এক্সাইজ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের অধীনে কাজ করার চেয়ে অনাহারে থাকাটা শ্রেয়তর মনে করতো। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় যে দুর্ভিক্ষ হয় তাতে বহু মালঙ্গি চিরতরে হারিয়ে যায়। অন্যান্য অনেকেই বিকল্প কাজের সন্ধানে পরিবার-পরিজনদের পিছনে ফেলে বেরিয়ে পড়ে। এসব পরিবারও সম্ভবত সংস্থানের অভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শ্রমিকের অভাবে লবণাক্ত অঞ্চলের জমিদারেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা লবণ উৎপাদনের জন্য তাদের জমি দীর্ঘকালের জন্য সরকারকে লীজ দিয়েছিল ; যখন তাদের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গেল, তখন তাদের অনেকেই সরকারের রাজস্ব প্রদানে অপারগ হয়ে পড়লো এবং এভাবেই তারা হয়ে পড়লো নিঃস্ব।

৫.০ চিনিশিল্প

এমন প্রমাণ রয়েছে, যা থেকে ধারণা করা যায় যে, চিনি উৎপাদনের আদি স্থান ছিল ভারত। উৎপাদনশিল্পের এই শাখাটির সাফল্য এত ব্যাপক ছিল যে, আখের চাষ এবং

১৯৩. *Report on the Administration of Bengal, 1875-76,* (Calcutta 1877), 329.

১৯৪. ঐ, *1879-80,* (Calcutta 1880), 44.

চিনি উৎপাদন পদ্ধতি অধ্যয়ন করার জন্য চীন সম্রাট তাই সুং (৬২৭-৬৫০ খৃঃ) বিহারে একদল চীনা ছাত্র প্রেরণ করেন। মুসলিম শাসনামলেও এই শিল্প সমৃদ্ধির পর্যায়ে ছিল। পনেরো শতকের চীনা বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বাংলায় চিনির প্রাচুর্য ছিল এবং অন্যান্য দেশে এ অঞ্চল থেকে চিনি রপ্তানি করা হতো। ষোল শতকের শুরুতে এ অঞ্চল ভ্রমণকারী বারবোসা এবং ভার্তেমা উল্লেখ করেছেন যে, বাংলায় উৎপাদিত চিনির গুণগত মান অত্যন্ত উন্নত এবং বহু জাহাজে করে এই চিনি ব্যাপকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করা হতো। বারবোসা আরো উল্লেখ করেছেন যে, সেসময় চিনি ছিল বাংলার প্রধান রপ্তানিদ্রব্য এবং এর আকার ছিল পাউডারের মতো। এই চিনি কাঁচা চামড়ার মোড়কে আবৃত করে পাঠানো হতো। ১৬৬৬ সালে বার্নিয়ার উল্লেখ করেন, "বাংলায় রয়েছে চিনির প্রাচুর্য। গোলকুণ্ডা এবং কর্ণাটকে এই চিনি সরবরাহ করা হয়। এদু'টি স্থানে চিনি মোটেও উৎপন্ন হয় না। মক্কা ও বসরা শহরের উপর দিয়ে এই চিনি যায় আরবে এবং মেসোপটেমিয়ায় এবং বন্দর আব্বাসের মধ্য দিয়ে পারস্যে।"[১৯৫] টেভার্নিয়ারও অনুরূপ বিবরণ রেখে গেছেন। তিনি হুগলী, পাটনা, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে চিনির ব্যবসায়ের বর্ণনা দিয়েছেন। সতেরো শতকের মাঝামাঝি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও ইংল্যান্ডের সঙ্গে পরিশোধিত চিনি এবং মিছরির অনিয়মিত বাণিজ্য শুরু করে। ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত বাংলার উদ্বৃত্ত চিনি বোম্বে, মাদ্রাজ, মালাবার, সুরাট ও সিন্ধুর মতো ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে রপ্তানি হতো। ভারতের বাইরে এই চিনি রপ্তানি হতো মস্কট, মক্কা, জেদ্দা এবং পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহে। কলকাতা অধিকৃত হবার পূর্ববর্তী সময়ে (১৭৫৬) বাৎসরিক চিনি রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ মণ। এ থেকে লাভ হতো প্রায় শতকরা ৫০ ভাগের মতো এবং তা পরিশোধ করা হতো সাধারণত ধাতব মুদ্রায়। কিন্তু ১৭৫৭ সালের পর থেকে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের যে সাধারণ ক্রমাবনতি ঘটে এবং পশ্চিম ভারতের বাজারে জাভায় উৎপাদিত চিনির যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তার ফলে এই লাভজনক ব্যবসায় ভাটা পড়ে।[১৯৬]

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উন্নতমানের আখ উৎপাদনের জন্য গঙ্গা অববাহিকার সুনাম রয়েছে। বৃটিশদের আগমনের পূর্বে সমগ্র উত্তর ভারতে এবং বাংলার গোরখপুর পর্যন্ত, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ বিভাগে গুড় থেকে প্রথম শ্রেণীর সাদা চিনি উৎপন্ন হতো। ১৭৯৩ সালে বেনারসের ভারপ্রাপ্ত রেসিডেন্ট পি, ট্রিভস সব অঞ্চলে, বিশেষকরে জৈনপুর, গাজীপুর, বেনারস ও মির্জাপুর জেলার অংশবিশেষে আখের চাষ দেখতে পান। চার্লস ট্রেভেলিয়ান লিখেন, "বেনারস প্রদেশটি হচ্ছে আমাদের জ্যামাইকা, এটি ভারতের সবচেয়ে বেশি চিনি উৎপাদনকারী জেলা।"[১৯৭] এসব অঞ্চলে আখ ও চিনির উৎপাদন বেশি হওয়ার কারণ হলো, এ অঞ্চল গঙ্গার সমতল ভূমিতে অবস্থিত ছিল, তাই মাটি ছিল

১৯৫. উদ্ধৃত M. Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal*, Vol. IB, (Riyadh 1985), 943.

১৯৬. J. C. Sinha, *Economic Annals*, 36.

১৯৭. Rohinimohan Chaudhuri, *Industries*, 13

উর্বর। উপরন্তু এখানে উৎপন্ন হতো এক প্রকার সরু ধরনের আখ, যা এখানকার জলবায়ুর জন্য ছিল অত্যন্ত উপযোগী। আখ পরিশোধিত এবং অপরিশোধিত চিনির মূল উৎস হিসেবে বলবৎ থাকলেও, এখান থেকে যে মোটা বাদামি চিনি বা গুড় পাওয়া যেতো তার উৎস ছিল প্রধানত খেজুর গাছ, আখ নয়। বাংলার এই বাদামি গুড় খেজুরের রস থেকে তৈরি করা হতো। খেজুর গাছ প্রধানত যশোর, বর্ধমান, বারাসত এবং নদীয়া জেলায় বেশি দেখা যেতো।

৫.১ ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত চিনিশিল্পের অবস্থা

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে চিনি উৎপন্ন হতো তা প্রধানত ভারতেই ভোক্তাদের চাহিদা পূরণ করতো। স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পরও বেনারসের চিনি বাংলা ও বিহারের অন্যান্য অঞ্চলে, দক্ষিণ ভারতে এবং পশ্চিমের অন্যান্য প্রদেশে রপ্তানি করা হতো। ১৭৮৭-৮৮ সাল থেকে ১৭৯১-৯২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে বেনারসে উৎপন্ন ৪,৭৯,৩৬৩ মণ চিনি বিহার এবং বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ভোক্তাদের চাহিদা পূরণ করে। এই পরিমাণ হচ্ছে বেনারস থেকে মোট রপ্তানির শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ (এ পরিমাণের মধ্যে বাংলা থেকে পুনঃরপ্তানিও ধরা হয়েছে)। ১৭৯১ সাল থেকে বাংলায় উৎপন্ন চিনি পুনরায় আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করে। এই বছরই হাইতি এবং সেন্ট ডোমিঙ্গোতে কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ শেতাঙ্গ জনগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং শ্বেতাঙ্গদের পাইকারিভাবে হত্যা করে। ফলে চিনির সবচেয়ে বেশি উৎপাদনকারী এবং রপ্তানিকারী অর্থনীতিটি বিলীন হয়ে যায়। ইংল্যান্ডে চিনির উচ্চমূল্যের সুযোগ গ্রহণ করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার চিনি পুনঃরপ্তানি করতে শুরু করে। ১৭৯১ সালে প্রায় ৪,০৫০ হন্দর চিনি লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসের বিক্রয়কেন্দ্র থেকে নিলাম হয়। ১৭৯৫ সালে এই পরিমাণ বেড়ে হয় ১৬১,৮২৯ হন্দর।[১৯৮] বিপ্লবী যুদ্ধের সমাপ্তি এবং শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পর রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে শুরু করে। সারণি ৫.১ থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। এসব সত্ত্বেও উনিশ শতকের প্রথম সিকিতে রপ্তানিপণ্য হিসেবে চিনির গুরুত্ব ছিল না। চিনি রপ্তানির অন্যতম প্রধান বাধা ছিল ইংল্যান্ডে প্রতি হন্দর চিনির উপর আরোপিত ৮ থেকে ২০ শিলিং আমদানিশুল্ক।[১৯৯] অধিকন্তু উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে সমুদ্রযাত্রার কারণে জাহাজভাড়া বেড়ে যায়। কিন্তু সেসময় কার্যত চিনিই একমাত্র গুরুভার পণ্য ছিল, যা কোম্পানির হাল্কা পণ্যবাহী জাহাজের জন্য কোন রকম ক্ষতি ছাড়াই স্থৈর্যদায়ক দ্রব্য (ballast) হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারতো। এজন্য কোম্পানি বাংলা থেকে উন্নতমানের চিনি সংগ্রহ অব্যাহত রাখে।

১৯৮. K. P. Mishra, *Benares in Transition, 1738-1795,* (New Delhi 1975), 140, footnote 2.

১৯৯. Shahid Amin, *Sugarcane and Sugar in Gorakhpur: An Inquiry into Peasant Production for Capitalist Enterprise in Colonial India,* (New Delhi 1984), 16.

সারণি ৫.১ : ১৮১৪-১৫ সাল থেকে ১৮১৭-১৮ সাল পর্যন্ত বাংলা থেকে পৃথিবীর সব অঞ্চলে এবং যুক্তরাজ্যে রপ্তানি কৃত চিনির মূল্য (সিক্কা টাকায়)

সন	মোট রপ্তানি	যুক্তরাজ্যে রপ্তানি
১৮১৪-১৫	২১,১৪,৬৮৯	৮,৯৪,২৫২
১৮১৫-১৬	২৩,২৩,৯২৭	৮,১৭,৩৫,৭
১৮১৬-১৭	৩৪,১৯,৪১১	১০,৪৩,৭১৩
১৮১৭-১৮	৩৮,৮১,৩৯৭	১২,৪৯,০১২

উৎস : এ. ত্রিপাঠী, *ট্রেড এন্ড ফাইনান্স*, ২৮৮।

চিনি সংগ্রহে আগ্রহী হলেও কোম্পানি যেভাবে আফিম উৎপাদনে নিজেদের নিয়োজিত করে, সেভাবে চিনির চাষাবাদ এবং উৎপাদনে নিজেদের নিয়োজিত করে নি। তারা শুধু এমন ধনবান বণিক, যারা ঋণ পরিশোধে সমর্থ, বিশ্বাসযোগ্য এবং অধিক পরিমাণে চিনি সরবরাহ করতে সক্ষম ছিল, তাদের কাছ থেকেই সরাসরি বিনিময়যোগ্য ঋণপত্রের মাধ্যমে চিনি ক্রয় করতো। বণিকদের অনুপস্থিতিতে কোম্পানি চিনি উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে চিনি ক্রয় করতো। এই উৎপাদনকারীরা কোম্পানি থেকে অগ্রিম নিয়ে নিজেদের কাজ করতো। তাদের পালায় চিনি উৎপাদনকারীরা আখ চাষীদেরকে তাদের প্রাপ্ত অগ্রিম থেকে অগ্রিম দিত এবং বাজারদরের চেয়ে কমদরে কাঁচা চিনি সংগ্রহ করতো। আখের চাষাবাদে এবং চিনি উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে সরকারের অনীহার জন্য তাদের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কিছু কারণের কথা বলা হয়ে থাকে। চিনির উৎপাদনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার মতো সরকারের না ছিল যথেষ্ট অর্থনৈতিক সম্পদ, না ছিল উপযুক্ত প্রশাসনকাঠামো। আফিমের তুলনায় চিনির উৎপাদন ছিল অনেক বেশি ব্যাপক। অধিকন্তু চিনির ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার যেকোন প্রচেষ্টা বা দেশীয় বণিকদের স্থানচ্যুত করার যেকোন প্রয়াস হয় অত্যন্ত কঠিন হতো, নয়তো চেষ্টা করলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারতো; কারণ অপরিশোধিত চিনির অভ্যন্তরীণ বাজার ছিল ব্যাপক, আফিমের মতো এত সীমিত নয়। আফিম উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বিদেশে রপ্তানি করা। এছাড়া উদ্বৃত্ত সব চিনি ক্রয় করার মতো যথেষ্ট পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষমতা কোম্পানির ছিল না। অধিকন্তু ইউরোপে রপ্তানিপণ্য হিসেবে ভারতীয় চিনি শুধু মাঝে মাঝেই প্রয়োজনীয় ছিল। এই চিনিকে ইউরোপীয় বাজারে পশ্চিম ভারত, চীন এবং জাভার চিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হতো। আখচাষে এবং চিনি উৎপাদনে জড়িত না হলেও ইক্ষু মাড়াইকারীদের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব পুরোপুরিই বহাল ছিল। "আগামগ্রহীতা উৎপাদককে শুধু চিনি দিয়েই তার গৃহীত অগ্রিম পরিশোধ করতে হতো না, তার কারখানায় উৎপন্ন সব চিনি আড়ংয়ে সরবরাহও করতে হতো।"[২০০] অধিকন্তু

২০০. Shahid Amin, ঐ, 17.

চিনি উৎপাদনকারীদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে কোম্পানি শুধুমাত্র সর্বোত্তম চিনি গ্রহণ করার নিশ্চয়তা দিত। সেই সর্বোত্তম চিনি না পেলে চিনি উৎপাদকারীদেরকে কুঠির কাছে দায়বদ্ধ রাখা হতো।

১৮১৩ সালে প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের কাছে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা উন্মুক্ত করা এবং ১৮২০-এর দশকে মধ্য ভারতে শান্তি স্থাপনের পর চিনির চাহিদাবৃদ্ধি বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক ঘটনার জন্ম দেয়। প্রথমত, এর ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এই শিল্পের বিকাশ সম্ভব হয়। বেনারসে প্রেরিত প্রথম বাণিজ্যিক রেসিডেন্ট জন লয়েড ১৭৮৯ সালে তাঁর নিয়োগকর্তাদের কাছে লিখেন যে, গাজীপুর জেলায় প্রতিবছর যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয় তা হিসাব করলে প্রায় ৩০,০০০ মণ হয় এবং তাঁর বর্ণনায় এই চিনির দাম দাঁড়ায় ১,৮০,০০০ টাকা। তিনি আরো জানান যে, ১৮৩১-৩২ সালে একই জেলায় যে পরিমাণ চিনির উপর কর দিতে হয় তা হলো ২,৬১,১৩৩ মণ এবং এর মূল্য ২০,৭৩,৮৬৮ টাকা।[২০১] আঠারো শতকের প্রথমদিকে গাজীপুর বেনারস কোম্পানির চিনির চাহিদার বেশিরভাগ সরবরাহ করতো। ১৮২০-এর দশকে এই দু'টি জেলা ছাড়া আজমগড়ও বিপুল পরিমাণ চিনি উৎপন্ন করে। ১৮৩০-এর দশকের শেষেরদিকে আজমগড় ভারতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিনি উৎপাদনকারী জেলায় পরিণত হয়। দ্বিতীয়ত, অবাধ বাণিজ্যের ফলে স্থানীয় বাজারের উপর কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ বহুলাংশে দুর্বল হয়ে পড়ে। চিনি ক্রয়ের জন্য বেনারসে প্রধান প্রধান এজেন্সি হাউজগুলির গোমস্তা ছিল। এই পণ্যের জন্য প্রতিযোগিতা এত তীব্র ছিল যে, স্বয়ং কোম্পানির প্রতিনিধিকেও উচ্চমূল্যে চিনি ক্রয় করতে হতো। কোম্পানির স্বার্থের উপর এটি ছিল একটি হতবুদ্ধি করে দেয়ার মতো আঘাত। কারণ আড়ং-এ দাম কম থাকলেই শুধু কোম্পানি ব্যবসা করতে পারতো। কিন্তু দাম কম থাকার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। বড় বড় প্রাইভেট ব্যবসায়ীরা তাদের স্টক ধরে রেখে এবং বাজারদরের বৃদ্ধি ঘটিয়ে চিনির দাম নিপুণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। "অগ্রিম প্রদান ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল আগে থেকেই চিনি উৎপাদনকারীদের দায়বদ্ধ করে তাদের কাছ থেকে বাজারদরের চেয়ে মণপ্রতি আট আনা কম দামে কোম্পানির প্রতিনিধিকে চিনি ক্রয় করতে সক্ষম করা। কিন্তু দেশীয় ব্যবসায়ীরা কোম্পানিকে চালে হারিয়ে দেয়। তারা বাজারদরকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে, প্রতিমণ চিনির দাম আসল দামের চেয়ে আট আনা বেশি প্রতীয়মান হয়। নিজের চিনি সংগ্রহ নীতিতে কোম্পানি নিজেই কুপোকাত হয়।[২০২] তৃতীয়ত, এজেন্সি হাউজগুলি ও কোম্পানির মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে এই পণ্যের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। ১৮২৪ সালে এর দাম শতকরা ২৯ ভাগ বেড়ে যায়। ১৮২৪-২৫ সালে বেনারসের বাণিজ্য প্রতিনিধিকে কোম্পানির খাতে ইতিপূর্বেকার

২০১. C. E. Trevelyan, *Report upon the Inland Customs,* 111.

২০২. Shahid Amin, *Sugarcane,* 20-21.

২,৫০০ মণের পরিবর্তে ৪,০০০ মণ চিনি ক্রয়ের নির্দেশ দেয়া হয়। ১৮২৮ সালে এই পরিমাণ বাড়িয়ে ৬,০০০ মণে উন্নীত করা হয়। এর ফলে বাংলার চিনির দাম কোম্পানির আগের বছরের চিনিতে বিনিয়োগের খরচের চেয়েও শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বেড়ে যায়।[২০৩] ১৮৩০ সাল পর্যন্ত কোম্পানি ৬,০০০ মণ করে চিনির ফরমায়েশ দিয়ে চলে। কিন্তু এরপর শেষ পর্যন্ত ১৮৩২ সালে কোম্পানিকে বাণিজ্যের এ শাখা গুটিয়ে ফেলতে হয়। কারণ লন্ডনে এ সময় চিনির দাম কমে যায়। দাম কমা শুরু হয় ১৮২৯ সাল থেকে। কিন্তু লন্ডনে অর্থ প্রেরণের প্রয়োজনীয়তার তাগিদে কোম্পানিকে এই বিনিয়োগ বলবৎ রাখতে হয়। দেশের কোষাগারের উপর সাধারণ যে চাপ ছিল তা কমানোর জন্য এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।[২০৪] কিন্তু যেসব প্রাইভেট ব্যবসায়ী ভারতের সঙ্গে কোম্পানির চেয়ে বেশি লাভজনক হারে বৃটিশদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল, ইংল্যান্ডে বাণিজ্যের মন্দা সত্ত্বেও তারা তাদের বিনিয়োগ অব্যাহত রাখে। ইংল্যান্ডে এই মন্দা ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

৫.২ ১৮৩৬-১৯০০ সাল পর্যন্ত চিনিশিল্পের অবস্থা : বিদেশে রপ্তানি

আগের অংশে আমরা দেখেছি কিভাবে কার্যকর চাহিদার প্রভাবে ভারতীয় চিনিশিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। বাস্তবে এই শিল্পের যে অবস্থা ছিল, তার চেয়েও দ্রুত সম্প্রসারণের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বৃটেনে ভারতের চিনি রপ্তানি বৃটিশ সরকার কর্তৃক পশ্চিম ভারতীয় চিনির প্রতি অধিকতর আনুকূল্য দেখানোর ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতীয় চিনির প্রতিহন্দর ওজনের জন্য যেখানে ৩৭ শিলিং শুল্ক দিতে হতো, সেখানে পশ্চিম ভারতীয় চিনির জন্য দিতে হতো মাত্র ২৭ শিলিং। এভাবে ভারতীয় চিনির উপর সর্বমোট যে পরিমাণ কর আরোপিত হতো, তা জর্জ টাকার নামের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন উচ্চপদমর্যাদাসম্পন্ন ভদ্রলোকের মতে প্রাথমিক মূল্যের চেয়েও প্রায় শতকরা ২০০ ভাগ বেশি। এই অবিবেচনা আরো প্রকটভাবে প্রকাশ পায় যখন ভারতে উৎপাদিত এক প্রকার চিনির (চিটাগুড়ের) উপর আরো ৫ শিলিং কর আরোপ করা হয়। এছাড়াও বৃটেন থেকে পুনঃরপ্তানি হলে পশ্চিম ভারতীয় প্রতিটন চিনির জন্য প্রতিহন্দর ওজনে ৩ শিলিং করে ভর্তুকিও প্রদান করা হয়। এই অসম কর আরোপ করা না হলে পশ্চিম ভারতীয় বণিকরা একচেটিয়া বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারতো না।[২০৫]

অনেক ভারতীয় সিভিল সার্ভেন্টের মতে, পশ্চিম ভারতীয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই দুই দল উৎপাদনকারীর মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ ছিল 'সাধারণ বিচারের' পরিপন্থী

২০৩. S. B Singh, *European Agency Houses in Bengal, 1783-1833,* (Calcutta 1966), 126.

২০৪. ঐ, 127-28.

২০৫. C. H. Philips, *East India Company,* 250.

এবং 'পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা বিনিময়ের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ'। সিভিল সার্ভেন্টদের কথা বাদ দিলেও রিকার্ডো, ম্যাককুলক এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের মতো অর্থনীতিবিদরাও প্রবলভাবে এই নীতির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। *Parliamentary History and Review* শীর্ষক নিবন্ধে মিল পশ্চিম ভারতীয় চিনির প্রতি যে আনুকূল্য প্রদর্শিত হচ্ছিল তাকে সুস্পষ্ট ভাষায় আক্রমণ করেন। মিল যুক্তি দেখান যে, "যদি কর সমান করা হয়, তাহলে করারোপিত পণ্যগুলি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে কম দামে পাওয়া যাবে। যদি পাওয়া যায়, তাহলে এই বৈষম্যমূলক শুল্ক ইংল্যান্ডের জনগণের উপর করের সমতুল্য, এবং এর উদ্দেশ্য হলো লোকসানমুখী একটি ব্যবসা চালিয়ে যেতে পশ্চিম ভারতীয়দের সহায়তা করা। যদি পাওয়া না যায়, তাহলে এই করের লক্ষ্যই হলো এরকম কোন বিপদ প্রতিহত করা। একারণে এই কর প্রত্যাহার করা উচিত।"[২০৬] কোম্পানির চেয়ারম্যান উইগ্রামের নেতৃত্বে পূর্ব ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও বেশ সক্রিয় ছিল এবং তারা ১৮২২ সালে পূর্ব এবং পশ্চিম ভারতীয় চিনির উপর আরোপিত করের সমতা আনার চেষ্টা করে। বিষয়টি নিয়ে পর পর কয়েকবার জেনারেল কোর্ট মিটিংয়ে পূর্ণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এসব মিটিংয়ে এই সাধারণ মত ব্যক্ত করা হয় যে, "সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিম ভারতীয় উপনিবেশগুলিকে অযৌক্তিক আনুকূল্য দিয়ে ভারতকে ধ্বংস করা।"[২০৭] স্যার চার্লস ফোর্বস নামে একজন প্রাইভেট ব্যবসায়ী এরকম প্রস্তাব করেন যে, কোম্পানির সকল পরিচালককে হাউজ অব কমন্সে আসন দেয়া হোক এবং এর ফলে হয়তো তাদের আর্জি আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। ১৮২৩ সালে কোম্পানি পার্লামেন্টের একটি সিলেক্ট কমিটি গঠনের দাবি করে। কিন্তু তাদের দাবি ৩৪ থেকে ১২৭ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নাকচ হয়ে যায়। করের সমতা কামনা করে পরবর্তীতে বোর্ড অব ট্রেডের কাছে অনেক আবেদন পেশ করা হয়। কিন্তু বোর্ডের প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম হাসকিসন ভারতীয় চিনির উপর কর লাঘব করতে ক্ষমতাশালী পশ্চিম ভারতীয় চিনির স্বার্থরক্ষাকারী মহলকে রাজি করাতে পারেন নি। অবশেষে ১৮৩৬ সালে বিজয় আসে। এসময় পার্লামেন্ট এই মর্মে একটি আইন পাশ করে যে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের চিনি আমদানির অনুরূপ শর্তে ভারত থেকে ইংল্যান্ডে চিনি আনা যাবে। এর অর্থ হলো, উভয় দেশের চিনির প্রতিহন্দর ওজনের জন্য কর দিতে হবে ২৪ শিলিং।[২০৮] কিন্তু পশ্চিম ও পূর্ব ভারতীয় রামের উপর করের কোন পরিবর্তন করা হয় নি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, এসময়ে ইংল্যান্ডে আমদানির পর প্রতি গ্যালন ভারতীয় রামের জন্য শুল্ক দিতে হতো ১৫ শিলিং এবং এর বিপরীতে প্রতি গ্যালন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান রামের জন্য

২০৬. দেখুন, S. Ambirajan, *Classical Political Economy*, 191.

২০৭. C. H. Philips, *East India Company*, 250.

২০৮. Evidence of J. C. Melville before the Select Committee of the House of Commons, 1840, উদ্ধৃত R. Dutt, *Victorian Age*, 100.

দিতে হতো মাত্র ৯ শিলিং, যদিও ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান রাম ছিল বেশি কড়া। ভারতীয় রাম উৎপাদিত হতো গুড় থেকে। রামের ক্ষেত্রে করের অসমতা চিনি এবং রাম উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকর ছিল। এছাড়াও এই অসমতা ভারতের অধিবাসীদের মনে এই তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয় যে, বেশি আনুকূল্যপ্রাপ্ত দেশের স্বার্থের বেদীতে তখনও তাদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া হচ্ছে। ১৮৪০ সালে হাউজ অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যদানকালে সি. ই. ট্রেভেলিয়ান রামের ক্ষেত্রেও শুল্কের সমতা বিধানের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর মতে, "শুধু একটি ক্ষেত্রে সমতাবিধান করা কৌতুকেরই নামান্তর; সমতাবিধান করতে হলে আখ থেকে যতো প্রকার পণ্য উৎপাদন করা হয় তার সবক'টির উপরই শুল্কহার সমান করতে হবে।[২০৯]

তবুও পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় চিনির উপর করের সমতাবিধান করার ফলে লন্ডনে ভারতীয় চিনির এক বিশাল বাজারের দ্বার খুলে যায় (সারণি ৫.২)। শুল্কের সমতাবিধান ছাড়াও এ সময় ক্যারিবীয় দেশে ক্রীতদাসমুক্তিও ভারতীয় চিনির রপ্তানিবাজারের অনুকূলে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্রীতদাসমুক্তির পর পরই বৃটিশ গায়ানার চিনির দাম শতকরা ২৮ ভাগ বেড়ে যায়। ভারতের অনুকূলে আর যে বিষয়টি অবদান রাখে তা হলো "বৃটেনে পণ্য আনার জাহাজভাড়া হ্রাস, বিশেষকরে যেসব জাহাজ নিউ সাউথ ওয়েলসে দেশান্তরীদের রেখে কলকাতা বন্দর হয়ে ফেরত যেতো। একটি ভারতীয় সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃত করে স্যার জন ব্যাগশ বলেন, "পূর্ববর্তী কোন সময়েই কোন একটি পণ্যের ব্যবসায়ে এমন বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত বিরল। এই আকস্মিক বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করার মতো ভারতের সম্পদবিকাশের আর কোন নজিরই পাওয়া যায় না।"[২১০]

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতের আখচাষ সম্প্রসারণের ফলে লন্ডনে ভারতীয় চিনির রপ্তানিবৃদ্ধি সম্ভব হয়। ১৮৩০-এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৮৪০-এর দশকের শুরুতে ক্যারিবীয় অঞ্চলে চিনির ব্যবসা বিঘ্নিত হলে অনেক ইউরোপীয় আখ চাষাবাদকারী ভারতে আগমন করে। পাশাপাশি মরিশাসের অনেক আখচাষীও একই পন্থা অবলম্বন করে। এসব ইউরোপীয় সরাসরি কৃষকদের আগাম প্রদান করে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়োগ করে। এসব কারণেই ভারতের আখ উৎপাদন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮৩৬ সালে গোরখপুরে যেখানে প্রায় ১০,০০০ একর জমিতে আখ উৎপাদন করা হয়, সেখানে ১৮৪৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৫০,০০০ একরে।[২১১] আখের চাষাবাদ ছাড়াও এসব ইউরোপীয় বাষ্পশক্তিচালিত ফ্যাক্টরি স্থাপনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করে। আখ থেকে সরাসরি চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যে আজিজপুর, মতিহারী, বেলসুন্দ, বরচাকিয়া, গোরখপুর এবং রোসায় ফ্যাক্টরি চালু করা হয়। এসব ফ্যাক্টরির মধ্যে রাম ও চিনি উৎপাদনের জন্য

২০৯. ঐ, 104.

২১০. R. Dutt, *Victorian Age*, 126

২১১. Shahid Amin, *Sugarcane*, 35

প্রখ্যাত রোসা ফ্যাক্টরিটি মেসার্স কেরু এ্যান্ড কোম্পানি কর্তৃক শাহজাহানপুরে স্থাপন করা হয়। বলা হয়ে থাকে যে, ভারতের সেনাবাহিনী যে পরিমাণ রাম পান করতো, তার প্রায় সবটুকুই এক সময়ে এই রোসা ফ্যাক্টরি থেকে সরবরাহ করা হতো। এর মোট পরিমাণ ছিল ৫২,২৫০ গ্যালন।[২১২] গুড় শোধনাগারের উপর ভিত্তি করে বাংলায় অনেক শিল্প চালু করা হয়। এসবের মধ্যে কলকাতার কাছে দুবাহতে অবস্থিত এ্যালবিয়ন ও ব্যালিকল ছিল বৃহত্তম। দুবাহ প্রতি বছর ৭,০০০ টন চিনি উৎপাদন করতে পারতো এবং সে সময়ে এটি ছিল "বিশ্বের বৃহত্তম ও সবচেয়ে বেশি সুসজ্জিত চিনি কারখানা"।[২১৩] ইউরোপীয় বিনিয়োগকারীদের কারখানার পাশাপাশি চিনি কারখানা নামের দেশীয় শোধনাগারও স্থাপন করা হয়। বিশেষকরে গোরখপুরে এধরনের কারখানা স্থাপন করা হয়, কারণ এখানে জ্বালানির সরবরাহ ছিল প্রচুর এবং ভূমি-খাজনার হার ছিল কম। সেখানকার কারখানার মালিকরা কলকাতার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের এজেন্টদের সঙ্গে দেশীয় পদ্ধতিতে পরিশোধিত চিনির জমজমাট ব্যবসা করে যাচ্ছিল।

সারাণ ৫.২ : ১৮৩৩-৪৭ সালে কলকাতা থেকে হংল্যান্ডে চিনি রপ্তানি

সন	পরিমাণ (টনে)
১৮৩৩-৩৪	১,৫৫৪
১৮৩৪-৩৫	২,৪৩৫
১৮৩৫-৩৬	৭,৫২৫
১৮৩৬-৩৭	১৪,০৩৩
১৮৩৭-৩৮	২২,৯৫৬
১৮৩৮-৩৯	২৭,৪০৩
১৮৩৯-৪০	২৮,৪০১
১৮৪০-৪১	৬৬,০৩১
১৮৪১-৪২	৫৫,৮২৩
১৮৪২-৪৩	৬০,৫০৫
১৮৪৩-৪৪	৫৯,০৯৫
১৮৪৪-৪৫	৫৮,৩৮৫
১৮৪৫-৪৬	৬৭,০০০
১৮৪৬-৪৭	৮০,০২১
১৮৪৭(মে-অক্টোবর)	৩৫,৬০১

উৎস : *পার্লামেন্টারি পেপার,* ১৮৪৭-৪৮, XXIII, পার্ট ১, ২৫,৩২

---

২১২. W. H. Carey, *John Company,* 413.

২১৩. M. P. Gandhi, *The Indian Sugar Industry,* 5.

চিনির এরকম তেজী ব্যবসা অবশ্য দীর্ঘ সময় বলবৎ থাকে নি। ১৮৪৬ সালে কবডেনিজমের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ শুল্কনীতি মুক্তবাণিজ্যের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়ে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে থেকে ক্রীতদাস কর্তৃক উৎপাদিত চিনি এবং মুক্তশ্রমে উৎপাদিত চিনি সমতার ভিত্তিতে বৃটেনে প্রবেশাধিকার পায়। এর ফলে হঠাৎ করেই লন্ডনের বাজারে চিনির দাম মারাত্মকভাবে হ্রাস পায় এবং এর সঙ্গে কমে যায় বৃটেনে ভারতীয় চিনির রপ্তানিও। রপ্তানিবাজারের এই সঙ্কোচনের ফলে অনেকগুলি সদ্যস্থাপিত চিনির প্রতিষ্ঠানে ধ্বস নামে এবং এর সাথে ভেঙে যায় অনেক চিনি শিল্পোদ্যোক্তার স্বপ্ন। যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিল্পটিকে পরিচালিত করে চিনির দাম কমাতে পারলেই শুধু ব্যবসাটি টিকিয়ে রাখা যেতো, কিন্তু এটা করতে তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এছাড়াও ছিল অন্যান্য নির্বুদ্ধিতা, যেগুলির প্রতি ১৯০১ সালে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কমিটি মতপ্রকাশ করে :

> তড়িঘড়ি করে ফরমাশ দেয়া বেশিরভাগ চিনিকল-যন্ত্রপাতিই পরে অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়; এগুলি ব্যবহার করার জন্য যেসব লোক নিয়োগ করা হয় তারা ছিল অনভিজ্ঞ। ভেঙে যাওয়া যন্ত্রপাতি মেরামত করার কোন ব্যবস্থা ছিল না; সে সময়ে কার্যত যোগাযোগ ছিল একমাত্র নদীপথে; দীর্ঘ এবং শ্রমসাধ্য যাত্রায় যন্ত্রের অনেক খুচরা অংশ হারিয়ে যায়। সে সময়ে যে ধরনের চিনি উৎপাদিত হতো সে ধরনের চিনির কোন চাহিদা দেশে ছিল না। নৌকাযোগে কলকাতায় পরিবহনকালে পথিমধ্যে চিনি খোয়া যেতো। নৌকার ছিদ্র দিয়ে পানি ঢুকে প্রচুর পরিমাণ চিনির অপচয় ঘটতো এবং প্রায়শই নৌকা ও পণ্য একেবারেই নদীগর্ভে হারিয়ে যেতো। ঐ চিনি বা তার যা-কিছু অবশিষ্ট থাকতো তা শেষ পর্যন্ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছতো। একটি দীর্ঘ পথ চলার সময়ে যখন কারখানার চিনি পড়তায় বেশি হতো, তখন এই চিনি নিকটতর অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে অনেক কম খরচে উৎপাদিত চিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কোন লাভজনক বাজার পেতো না। অধিকন্তু এই শিল্পটি যখন মাত্র শুরু করা হয়, তখন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক দেউলিয়া ঘোষিত হয় এবং এতে সমগ্র ভারতের ব্যবসায়ী মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। চিনি উৎপাদকগণ দেখে যে, নতুন কোন শিল্পের জন্য তো দূরের কথা, একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পের জন্যও ঋণ পাওয়া কঠিন। অল্পদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায় যে, নতুন শিল্পের ভিত্তি সঠিক ছিল না এবং বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এই নতুন শিল্পের সাফল্যের সম্ভাবনাও ছিল কম।[২১৪]

এসময়ে ইউরোপে বিট থেকে উৎপন্ন চিনিশিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটে। বেশিরভাগ দেশেই সরাসরি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পটির প্রসার ঘটে। ১৮৭০ সাল নাগাদ ইউরোপের বিটচিনিশিল্প বিশ্বের মোট চাহিদার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ চিনি প্রতিযোগিতামূলক দামে সরবরাহ করতে সমর্থ হয়। এর ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চিনি আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। শুধু ইংল্যান্ডই শোধনাগারের জন্য ভারত থেকে কাঁচা

২১৪. *Report of the Committee appointed to inquire into the prospects of cultivation of Sugar by Indigo Planters of Bihar*, (Calcutta 1901), Para 19

চিনি (অথবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চোলাই করার জন্য নিম্নমানের চিনি) আমদানি অব্যাহত রাখে (সারণি ৫.৩), কারণ এসময়ে বৃটেনে অনেকগুলি শোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সবশেষে, 'উৎপাদনসহায়ক অনুদান' (Bounty System) ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যের একটি প্রধান পণ্যের দ্রুত অবলুপ্তি ঘটে।

সারণি ৫.৩ : ১৮৭২-৭৩ থেকে ১৮৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত বাংলা থেকে বিদেশী বন্দরে চিনি রপ্তানি

সন	মোট রপ্তানি (হন্দর ওজনে)	মূল্য (হাজার টাকায়)	যুক্তরাজ্যে রপ্তানি (হন্দর ওজনে)	মূল্য (হাজার টাকায়)
১৮৭২-৭৩	১৭১	১৮,২৯	১৪৪	১৪,৫৩
১৮৭৩-৭৪	১৩৬	১৩,২৮	১১৫	১০,৩৬
১৮৭৪-৭৫	১০৭	১০,১৪	৮৭	৭,৫৪
১৮৭৫-৭৬	৮৪	৮,১১	৫৮	৪,৭৭
১৮৭৬-৭৭	৬৩৭	৬৮,৫৩	পাওয়া যায় নি	পাওয়া যায় নি

উৎস : *রিপোর্ট অন দি এডমিনিস্ট্রেশন অব বেঙ্গল*, ১৮৭৫-৭৬, (কলকাতা ১৮৭৭), ২২৬; *ঐ*, ১৮৭৬-৭৭, ১৬৬।

৫.৩ চিনির উৎপাদন ও ভুক্তি, ১৯০০-১৯৪৭

নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাংলার চিনির চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে উঠানামা করলেও বাংলার অভ্যন্তরে চিনির একটি সুনিশ্চিত বাজার ছিল। ব্যবহৃত চিনির মান ছিল অত্যন্ত নিম্ন। সারা বাংলায় এই অপরিশোধিত চিনি গুড় নামে পরিচিত ছিল। গুড়ের প্রধান উৎস ছিল আখের রস। এই রসকে কোন প্রকার প্রক্রিয়াজাত না করে ঘন করতে করতে কঠিন অবস্থায় আনা হতো। অল্প পরিমাণ ক্ষার বা অন্য কোন শোধন করার উপাদান মেশানো এবং সরানো ছাড়া এই রস পরিশোধনের আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো না। গ্রামের জনসাধারণ এই আকারেই গুড় খেতো। খাদ্য ও পানীয়কে মিষ্টি করার জন্যই যে শুধু গুড় ব্যবহৃত হতো তা নয়, একটি প্রধান আহার্যদ্রব্য হিসেবেও এটা ব্যবহৃত হতো। গুড়ের গন্ধ ও স্বাদ ছিল চমৎকার এবং এই গুড় ছিল খুবই পুষ্টিকর। এজন্যে গ্রামের লোকেরা সাদা চিনির চেয়ে গুড় বেশি পছন্দ করতো। তবে শহরেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে গুড়ের ব্যবহার হতো। তামাকের সঙ্গে মেশানোর জন্য তামাক ব্যবসায়ীদের কাছেও গুড়ের চাহিদা ছিল প্রচুর। যারা সুরা তৈরি করতো তাদের কাছেও গুড়ের চাহিদা ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তুলনামূলকভাবে গুড় ছিল সস্তা। এসব কারণে বহুল পরিমাণে গুড়ের উৎপাদন এবং ব্যবহার অব্যাহত ছিল। উনিশ শতকে চিনি তৈরির জন্য

শোধনাগারে খুবই কম গুড় ব্যবহার করা হতো। ১৯২৩-২৪ সাল পর্যন্তও ভারতে মোট উৎপাদিত আখের শতকরা ৭১ ভাগ ব্যবহৃত হতো গুড় তৈরির জন্য এবং শতকরা ৫ ভাগেরও কম ব্যবহৃত হতো ফ্যাক্টরিতে চিনি উৎপাদনের জন্য বা শোধনাগারে গুড়কে চিনিতে রূপান্তরিত করার জন্য।[২১৫] এই বছর ভারতে মাথাপিছু চিনি ও গুড়ের ব্যবহার ছিল ২১.২ পাউন্ড এবং এর মধ্যে গুড়ের পরিমাণ ছিল ১৬.৫ পাউন্ড ও চিনির পরিমাণ ছিল মাত্র ৪.৭ পাউন্ড।[২১৬] আশা করা হয়েছিল যে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে চা পানের অভ্যেস বাড়লে, মিষ্টির ব্যবসায়ে গুড়ের পরিবর্তে চিনির ব্যবহার হতে থাকলে এবং চিনিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়লে গুড়ের ব্যবহার ক্রমশ কমে যাবে। কিন্তু কার্যত তা হয় নি। ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে চিনি ও গুড়ের মাথাপিছু ব্যবহারের পরিসংখ্যানে পূর্ববর্তী ধারণারই প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। এই বছর মাথাপিছু ব্যবহৃত মোট ২৫ পাউন্ড চিনি ও গুড়ের মধ্যে গুড়ের ভাগ ছিল ১৮.৫ পাউন্ড ও চিনির ভাগ ছিল মাত্র ৬.৫ পাউন্ড।[২১৭] দেশের জনগণের বৃহদংশের মধ্যে গুড়ের প্রতি আকর্ষণ প্রবলতর হওয়ায় গুড়শিল্পের ক্রমোন্নতি হতে থাকে।

প্রাসঙ্গিক উপাত্তের অভাবে অন্তত ১৮৯০-৯১ সালের আগের বছরগুলিতে বাংলায় মোট কি পরিমাণ চিনি উৎপাদিত হতো তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে উক্ত বছরে ভারতে মোট যতো একর জমিতে আখের চাষ হয়েছে তার মধ্যে ১,১২৬,৭৮১ একর বা শতকরা ৪১ ভাগ জমি ছিল বাংলায়।[২১৮] কিন্তু ১৮৯৮-৯৯ সাল নাগাদ এ প্রদেশের আখচাষের জমির পরিমাণ নাটকীয়ভাবে কমে গিয়ে দাঁড়ায় শতকরা মাত্র ৩৩.৯৮ ভাগে। ১৯০৮-০৯ সালে এই পরিমাণ আরো কমে দাঁড়ায় শতকরা ২২.৫ ভাগে। ১৯৩২-৩৩ সালে বাংলায় মোট ২,৩৩,০০০ এবং ১৯৩৩-৩৪ সালে মোট ২,৫৭,০০০ একর জমিতে আখের চাষ হয়। "আখচাষের জমির পরিমাণের হিসেবে ভারতে বাংলার স্থান এখন চতুর্থ। কিন্তু এটা সর্বজনবিদিত যে, বিশ শতকের শুরুতে বাংলার স্থান ছিল দ্বিতীয়।"[২১৯] যশোর জেলার একটি গ্রামে লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এইচ. ই. এনেট জানান যে, সাধারণত এক বিঘা (এক একরের এক তৃতীয়াংশ) জমি হতে প্রায় ২০ থেকে ৩০ মণ পর্যন্ত গুড় পাওয়া যেতো। কিন্তু অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, প্রতি একরে সচরাচর ৩৭ মণ গুড় উৎপন্ন হতো। এই সূত্র আরো উল্লেখ করে, প্রধানত উন্নত জাতের আখের প্রচলনের পর

২১৫. M. P Gandhi, *Sugar Industry,* Table 12, 55.

২১৬. ঐ, Table 16, 66

২১৭. M. P. Gandhi (edited), *Sugar Industry,* (Bombay 1943), Table 5, XXXVI.

২১৮. Frederick Noel Paton *Notes on Sugar in India,* (Calcutta 1911), 27. From the returns, it appears that Bengal's sugarcane acreage was the largest in British India. It was followed by that of the United Provinces which had 1,104,334 acres under sugarcane in 1890-91.

২১৯. M. P. Gandhi (ed), *Sugar Industry*, 90

থেকে উৎপাদন বেড়ে প্রতি একরে ৫০ মণে দাঁড়িয়েছে। প্রতি একরে যদি ৪০ মণ গুড় এবং উৎপাদিত আখের মোট ৭০ ভাগই গুড় তৈরিতে ব্যবহার করা হয়, তাহলে মোটামুটি এই হিসাবে ১৯৩৩-৩৪ সালে আখ থেকে মোট উৎপাদিত গুড়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৬২,০০০ টন। বলাই বাহুল্য যে, উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথমদিকের বছরগুলিতে আখচাষের জমির পরিমাণ বহুলাংশে বেশি থাকার ফলে এর চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণ গুড় উৎপন্ন হয়েছে।

আখের গুড় উৎপাদন ছাড়াও খেজুরের রস থেকে চিনি উৎপাদনের জন্যও বাংলার খ্যাতি ছিল। নদীয়া জেলার পূর্বাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে খেজুর গাছ জন্মানো হতো। খেজুর রস থেকে চিনি তৈরি ছিল যশোর জেলার একটি প্রধান কুটিরশিল্প। ফরিদপুরে খেজুর রস এবং আখের রস এ দু'টি থেকেই চিনি উৎপাদিত হতো। "যশোর জেলায়, নদীয়া জেলার কিছু অংশে, বশিরহাট ও সাতক্ষীরা মহকুমায় এবং ২৪-পরগনায় ব্যাপকভাবে খেজুর গাছের চাষ এবং খেজুর রস থেকে চিনি উৎপাদন করা হয় এবং কিছুটা হয় ফরিদপুরেও। রায়তদের জন্য খেজুর গাছের চাষ ছিল জনপ্রিয় এবং লাভজনক। তারা বাড়ির চারদিকে, ক্ষেতের আলে সারে সারে এবং মাঝে মাঝে বিরাট এলাকা জুড়ে বিশাল উন্মুক্ত বাগানেও এই গাছ রোপণ করে।[২২০] এক বিঘা জমিতে সাধারণত প্রায় ১০০টি গাছ লাগানো হয়। সাত বছরের মধ্যেই গাছগুলি লাভজনক হয়ে উঠে এবং ৩০ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত ফলন প্রদান করে। শীতকালে প্রতিটি গাছের রস থেকে প্রায় একমণ অপরিশোধিত চিনি পাওয়া যায়। ১৯৪০-এর দশকের প্রথমদিকে এই শিল্পটি ২৪ পরগনা, হাওড়া, মেদিনীপুর এবং ফরিদপুরের মতো জেলাগুলিতে বর্তমান ছিল। এ সময়ে প্রতি বছর মোট প্রায় ১,০০,০০০ টন গুড় উৎপাদিত হয়।[২২১]

উনিশ শতকে বাংলায় উৎপাদিত পরিশোধিত বা অপরিশোধিত চিনির অভ্যন্তরীণ ব্যবসা ছিল ব্যাপক। এক এলাকার উদ্বৃত্ত চিনি দেশীয় নৌকা, স্টিমার, ট্রেন বা সড়ক পথ দিয়ে ঘাটতি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হতো। বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের যে তথ্য পাওয়া যায় যদিও তা সম্পূর্ণ নয়, তবুও তা থেকে ১৮৭৬-৭৭ সালের চিনির অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণের এবং মূল্যের নিম্নলিখিত হিসাবটি আমরা পাই[২২২]:

পরিমাণ (মণের হিসাবে)	মূল্য (টাকার হিসাবে)
পরিশোধিত চিনি ১৫,৮৫,০০০	১,৯০,২০,০০০
অপরিশোধিত চিনি ২৯,৬১,০০০	১,১৮,৪৩,০০০

২২০. *Report on the Administration of Bengal, 1876-77,* (Calcutta 1878), 194.

২২১. M. P. Gandhi (ed), *Sugar Industry,* 68, 70.

২২২. *Report on the Administration of Bengal, 1875-76,* (Calcutta 1877), 174.

প্রধানত যশোর, নদীয়া, ২৪-পরগনা ও ফরিদপুর থেকে চিনি রপ্তানি হতো। যশোর ছিল বাংলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিনি উৎপাদনকারী জেলা এবং এই জেলা থেকে মোট ৭,৭৫,০০০ মণ চিনি রপ্তানি করা হতো। নদীয়া জেলা থেকে চিনি রপ্তানির পরিমাণ ২,০০,০০০ মণেরও কম ছিল। ২৪-পরগনা জেলা থেকে ২,৭৫,০০০ মণ অপরিশোধিত এবং ১,৫০,০০০ মণ পরিশোধিত চিনি রপ্তানি করা হয়। আর ফরিদপুর জেলা থেকে রপ্তানি হয় ২,০০,০০০ মণেরও বেশি।[২২৩] এসব জেলা থেকে কলকাতা, বাকেরগঞ্জ, পাবনা, ঢাকা ও ময়মনসিংহে চিনি রপ্তানি করা হতো। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের মাধ্যমে কলকাতা ২,৭৫,০০০ মণ অপরিশোধিত চিনি, ২৪-পরগনা থেকে যা সরবরাহ করা হতো তার প্রায় সবটুকু এবং যশোর ও নদীয়া থেকে নদীপথে যা রপ্তানি হতো তার বেশিরভাগ আমদানি করতো। যশোর জেলার উত্তরাংশে চাল প্রেরণের বিনিময়ে ঝালকাঠি ও নলছিটি তাদের বিশাল বাজারে যশোর থেকে চিনি আমদানি করতো। যশোর ও ফরিদপুর থেকে সিরাজগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জও চিনি আমদানি করতো। আখ উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে পরিশোধিত চিনির স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য ছোট ছোট শোধনাগার স্থাপন করা হয়েছিল। নদীয়া জেলার প্রধান চিনি শোধনাগার ছিল শান্তিপুর শহরে। এখানে প্রায় ৩০টি কারখানা ছিল এবং কাজের মৌসুমে এসব কারখানায় প্রায় ৫০০ শ্রমিক কাজ করতো। বনগাঁও ও রানাঘাট মহকুমাতেও শোধনাগার ছিল। যশোরের কোট চাঁদপুর এবং অন্যান্য স্থানেও কারখানা ছিল। ফরিদপুরে পরিশোধনের কাজ চলতো প্রধানত গোয়ালন্দ মহকুমায়। ২৪-পরগনা জেলার সাতক্ষীরা এবং বশিরহাট মহকুমায় প্রায় ২৩০টির মতো শোধনাগার ছিল বলে জানা যায়।

৫.৪ চিনিশিল্পের ক্রমাবনতি

প্রায় ১৮৯০ সাল পর্যন্ত চিনিতে বাংলা মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। অধিকন্তু আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলা এই পণ্যের একটি প্রধান সরবরাহকারী দেশ ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দশকে তার রপ্তানি বাণিজ্যই যে শুধু শেষ হয়ে গেল তা-ই নয়, দেশের জনগণের ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণ চিনি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ১৮৮৪-৮৫ সাল থেকে ১৮৮৮-৮৯ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে সমুদ্রপথে কলকাতা বন্দরে যে বিদেশী চিনি আমদানি করা হয় তার গড় হলো ৬,২৬৪ টন পরিশোধিত এবং ৩,২৮৫ টন অপরিশোধিত আখ এবং বীটের চিনি।[২২৪] ১৯০৯-১০ সালে আমদানির পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২,৩১,১০১ টন পরিশোধিত এবং ৬৮,৯৪৩ টন অপরিশোধিত চিনি।[২২৫] ১৯০০-০১ সালে বাংলা

২২৩. ঐ, *1876-77*, 195.

২২৪. Noel Paton, *Notes on Sugar*, 20-21.

২২৫ ঐ।

প্রদেশে যে চিনি আমদানি করা হয় তার মূল্য দাঁড়ায় ১.৬০ কোটি রুপি। এই অঙ্ক বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬.৬৫ কোটি রুপি এবং এটি হলো ১৯১৪-১৫ সাল থেকে ১৯১৮-১৯ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরের গড় চিনির মূল্য। এই মূল্য আরো বৃদ্ধি পেয়ে ১৯২১-২২ সাল নাগাদ ১২.৪৪ কোটি রুপিতে দাঁড়ায়।[২২৬] উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, এসময়ে চিনির আমদানি বিপুলভাবে বেড়ে যায়।

বাংলায় আখচাষের পরিমাণ কমে যাওয়ার জন্যই বিদেশ থেকে চিনি আমদানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই সময়ে খাদ্যশস্যের দাম বেশ বেড়ে যাওয়ায় কৃষকেরা আরো খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়ে। তারা পাটচাষের দিকেও মনোযোগ দেয়। কিন্তু "এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, চিনিও একটি খাদ্যশস্য এবং খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি এটিরও মূল্যবৃদ্ধি না হয়ে থাকে তাহলে স্পষ্টতই এর বিশেষ কোন নিরুৎসাহজনক কারণ রয়েছে"।[২২৭] একরপ্রতি আখের ফলন কম হওয়াটা ঐসব নিরুৎসাহজনক কারণগুলির মধ্যে একটি এবং এর ফলে আখের চাষাবাদ অলাভজনক হয়ে পড়ে। অথচ এর বিপরীতে উন্নত জাতের আখের এবং উন্নততর পদ্ধতির চাষাবাদের প্রচলনের ফলে জাভা ও মরিশাসের কোন কোন অঞ্চলে আখের একরপ্রতি ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ভারতে একরপ্রতি ফলনের পারিমাণ কমই থেকে যায়। নোয়েল ডিয়ারের মতে প্রতি একরে ৬০ টন আখের ফলনকে অত্যন্ত উচ্চফলন হিসেবে অভিহিত কর. যেতে পারে এবং ৪০ টনকে অভিহিত করা যেতে পারে গড়পড়তার চেয়ে বেশি। কিন্তু ১৯৩০-৩১ সালেও ভারতে আখের একরপ্রতি গড় উৎপাদন ছিল মাত্র ১২.৩ টন।[২২৮]

ফলন কম হওয়া ছাড়াও সনাতন পদ্ধতিতে রস নিষ্কাশন এবং আখ ও গুড় উৎপাদনের ফলে যে অপচয় হতো তাও বাংলার চিনিশিল্পের ক্রমাবনতির জন্য যথেষ্ট দায়ী। সাধারণত আখচাষীরাই গুড় উৎপাদন করতো। তারা আখ পেষণ করে রস নিষ্কাশন এবং পরে রস সিদ্ধ করার ক্ষেত্রে মান্ধাতার আমলের পদ্ধতি ব্যবহার করতো। তারা ঘানি বা কাঠের তৈরি হামানদিস্তা এবং মুষলের পেষণযন্ত্র ব্যবহার করতো। এই যন্ত্রে হামানদিস্তার পাশে সংযুক্ত একটি লিভারের সাহায্যে মুষল ঘোরানো হতো। তারা চাকিও ব্যবহার করতো। চাকিতে স্ক্রু আঁটা সমান্তরাল দু'টি কাঠের রোলার ছিল। কিন্তু ক্রমশ এগুলির ব্যবহার কমে গিয়ে লৌহনির্মিত পেষণযন্ত্র চালু হয় এবং ১৯১৬ সাল নাগাদ রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায়, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ জেলায়, চট্টগ্রাম বিভাগের বৃহদংশে লোহার

২২৬. *Statistics of British India,* Part II, Commercial, 1909-10, (Calcutta 1911), 18, *Report on the Maritime Trade of Bengal, 1921-22,* 40.

২২৭. Noel Paton, *Notes on Sugar,* 35.

২২৮. M. P. Gandhi (ed.), *Sugar Industry,* Table 10, XXXIX

পেষণযন্ত্রই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। চুল্লী ও কড়াই তৈরির ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় বটে, "কিন্তু মূল পদ্ধতিগুলি ছিল সেই একশ' বছর আগের মতোই—একটি উন্মুক্ত কড়াইয়ের মধ্যে টাটকা আখের রসকে জ্বাল দিয়ে বেশ ঘন করা।"[২২৯] কিন্তু মান্ধাতার আমলের প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ভারতীয় আখের মধ্যে শর্করা জাতীয় পদার্থের পরিমাণ কমই থাকতো। বস্তুত ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশনের মতে, রস নিষ্কাশনে অদক্ষ সনাতন পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করার ফলে ভারতে উৎপাদিত আখের প্রায় এক তৃতীয়াংশই নষ্ট হয়ে যেতো। এ ব্যাপারে ১৯২০ সালে ইন্ডিয়ান সুগার কমিটি মন্তব্য করে :

> আখের মধ্যে যে পরিমাণ চিনি থাকে, একটি সম্পূর্ণ আধুনিক ফ্যাক্টরিতে কমপক্ষে তার শতকরা ৯৬ ভাগ নিষ্কাশন করা যায়, এবং জ্বাল দেয়ার প্রক্রিয়া দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করে রসের মধ্যে যে শর্করা আছে, উৎপাদিত চিনি হিসেবে তার শতকরা ৯০ ভাগ সংরক্ষণ করা যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, আখের মধ্যে প্রকৃতই যে শর্করা থাকে তার প্রায় শতকরা ৮৬.৪ ভাগই চিনি হিসেবে লাভ করা যায়।[২৩০]

অথচ, বাংলার আখ থেকে শর্করার পরিমাণ মাত্র শতকরা ৫২ ভাগ।[২৩১]

বাজারে বিদেশী চিনির অবাধ আমদানি এই শিল্পটির ক্রমাবনতির জন্য কম দায়ী নয়। জাভা, মরিশাস ও ফরমোজার মতো অঞ্চলগুলিতে চিনি উৎপাদনের কৌশলের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নতি সাধিত হয়। সস্তায় উন্নততর জাতের আখ উৎপাদনের লক্ষ্যে শুধু যে শিল্পটির কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিয়েই বিধিবদ্ধ গবেষণা হয় তাই নয়, শিল্পটির উৎপাদন সম্পর্কিত দিকগুলিরও সমানভাবে উন্নতি সাধন করা হয়। এর ফলে বর্তমান শতকের প্রথম ষোল বছরে ভারতে জাভায় উৎপাদিত চিনির দাম শতকরা ২৫ ভাগ কমে যায় (অথচ এর বিপরীতে ভারতের অপরিশোধিত চিনির দাম বেড়ে যায় শতকরা ২৬ ভাগ) এবং এর ফলে বাংলায় আখ থেকে উৎপাদিত বিদেশী চিনির আমদানি অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে যায় (সারণি ৫.৪)। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও জার্মানি থেকে অনুদানপ্রাপ্ত চিনির আমদানিও এ দেশের চিনির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমবর্ধমান আমদানির ফলে শুধু যে ছোট ছোট পরিশোধনাগারগুলিই বন্ধ হয়ে যায় তা-ই নয়, আখের আবাদও সমানুপাতে সঙ্কুচিত হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচন ঘটে কর্মের।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবও এই গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় শিল্পটির দ্রুত অবনতির জন্য দায়ী ; সরকার বরাবর নিষ্ক্রিয় থেকে যায় এবং শিল্পটির পুনরুজ্জীবনের জন্য সময় মতো সঠিক পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকে। "এটা উল্লেখ করতেই হবে যে, সরকার কখনও দেশের কৃষি, গ্রামীণ এবং শিল্প অর্থনীতিতে চিনি উৎপাদন শিল্পের উন্নয়নের পূর্ণ তাৎপর্য

২২৯. ঐ, 63

২৩০. *Report of the Indian Sugar Committee*, (Simla 1920), 260.

২৩১. M. P. Gandhi (ed.), *The Indian Sugar Industry*, (1942 annual), 28

অনুধাবন করতে পারে নি।"[২৩২] জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার মতো দেশগুলোর গৃহীত নীতির তুলনায় এই নীতি ছিল বৈসাদৃশ্যমূলক, কারণ এসব দেশে বীটের চিনি রপ্তানিতে উৎসাহ দেয়ার জন্য সরকার অনুদান প্রদান করে। এই প্রসঙ্গে জাভা, মরিশাস, ফরমোজা, হাওয়াই এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো অঞ্চলগুলিতে চিনিশিল্পের উন্নয়নের জন্য পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রাষ্ট্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

সারণি ৫.৪ : ১৮৮৫-৮৬ থেকে ১৯০৯-১০ পর্যন্ত সমুদ্রপথে বিদেশ থেকে কলকাতায় আমদানিকৃত আখ এবং বীটজাত চিনির (পরিশোধিত ও অপরিশোধিত) পরিমাণ (টনে) এবং মূল্য (টাকায়)

সন		আখের চিনি (পরিমাণ)	মূল্য	বীটের চিনি (পরিমাণ)	মূল্য
পাঁচ বছরের গড় যে সালে বছর শেষ হয়	১৮৯০-৯১	১৪,২৭৬	২৪,৪১,৫৩৮	৩,৭২২	৮,৯২, ০২২
	১৮৯৫-৯৬	২২,৭৭৫	৪১,৪৮,৩১১	৩,৫১৬	৮,৭৩,৩৫১
	১৯০০-০১	৪২,৬০৬	৬৫,৮১,৫৮০	১৯,৬৫৯	৪৪,১২,৭০০
	১৯০৫-০৬	৮৬,৭৫৯	১,৩৫,৯৩,৭২৫	২৭,৬৭৯	৫৬,০০,৬৮০
যে বছবের হিসাব ধরা হয়েছে	১৯০৬-০৭	১,৮০,৪৮৯	২,১৯,১০,৪০৩	৬২,৭৪৯	১,১১,৫২,২০২
	১৯০৭-০৮	১,৭৯,১৪২	৩,৬৮,৬০,১৫০	৩,৯২৩	৯,৪৪,২৯০
	১৯০৮-০৯	২,৬৯,৫৮২	৪,৩২,৩৩,৫৮৯	১৩,১২৪	২৮,৯৭,৯৫৩
	১৯০৯-১০	২,৮৯,৩২৯	৪,৭৭,৩২,৭৬২	১০,৭১৫	২৪,৯০,২৯৮

উৎস : ফ্রেডারিক নোয়েল পেটন, *Notes on Sugar in India*, (Calcutta 1911), 20-21

"অন্যান্য অনেক দেশে সরকার স্বীয় উদ্যোগে বা অর্থসাহায্য দিয়ে চিনি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণার জন্য সহায়তাদান করতো। কিন্তু সে রকম সহায়তাদানের জন্য যথার্থ অর্থে ভারতে কোন সরকারি চিনি গবেষণা বিভাগ বা দপ্তর ছিল না।"[২৩৩] একথা অবশ্য সত্য যে, ১৮৯৪-৯৫ সাল থেকে ভারত সরকার আমদানিকৃত সব চিনির উপর শতকরা ৫ ভাগ আমদানিশুল্ক আরোপ করে এবং এরপর ১৯১৬ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে

২৩২. M. P. Gandhi (ed.), *Sugar Industry*, 14

২৩৩. A K Bagchi, *Private Investment in India, 1900-1939*, (Cambridge 1972), 369

তা বৃদ্ধি করে। কিন্তু এর সবই করা হয়েছিল সরকারি রাজস্ববৃদ্ধির জন্য। আমদানিশুল্ক ছাড়াও দামের সমতাবিধানের জন্য সরকার ১৮৯৯ সালে ইউরোপীয় দেশসমূহ থেকে আমদানিকৃত বীটজাত চিনির উপর শুল্ক আরোপ করে। কিন্তু সরকার ভুলে যায় যে, শুধু বীটের চিনিই ভারতের পরিশোধিত চিনির শত্রু ছিল না। মরিশাস ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে উৎপাদিত আখের চিনিও ভারতীয় চিনির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগী ছিল। আসলে সরকারের যা করা উচিত ছিল তা হলো বিদেশ থেকে আমদানিকৃত সব চিনির উপরই শুল্ক আরোপ করা—সে বীটের চিনিই হোক বা আখের চিনিই হোক। দেখা যাচ্ছে যে, এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় বাজার থেকে মরিশাস ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের আখচাষী এবং চিনি উৎপাদকদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিতাড়িত করতে তাদের সাহায্য করা, যাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা পেরে উঠছিল না।[২৩৪] অধিকন্তু, সরকার যদি সত্যি সত্যি ভারতীয় চিনিশিল্পের পুনরুজ্জীবনে এবং এই শিল্পকে উৎসাহদানে আগ্রহী হতো, তাহলে দেশীয় শিল্পকে সরাসরি সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করতো এবং আখচাষ ও চিনি উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়নের চেষ্টা করতো। ভারত সরকার ১৯১৯ সালে সরকারের কৃষি বিষয়ক পরামর্শদাতা জে. মেককেনা'র সভাপতিত্বে একটি কমিটি (পরে এটি ইন্ডিয়ান সুগার কমিটি নামে পরিচিত হয়) নিয়োগ করে। কমিটির দায়িত্ব ছিল এই শিল্পের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করা এবং এগুলির উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দেয়া। এই কমিটি একটি অনুকূল এবং বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু কমিটির প্রদত্ত সুপারিশমালা কার্যকর করার জন্য দ্রুত কোন উদ্যোগ নেয়া হয় নি।

৫.৫ ট্যারিফ রক্ষা এবং চিনিশিল্পের বিকাশ

একটি সুগার কমিটিকে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে ১৯২৯ সালে যে ইম্পেরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিচার্স প্রতিষ্ঠিত হয়, তা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সূচনা হয়। যেমন ১৯২৯ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় সুগার কমিটি যেসব সুপারিশ করে তার অন্যতম ছিল ভারতের চিনিশিল্পকে সংরক্ষণসুবিধা দেয়া হবে কি-না এ প্রশ্নে ট্যারিফ বোর্ডের মাধ্যমে তদন্ত করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানো। ভারত সরকার এসব সুপারিশ গ্রহণ করে এবং সংরক্ষণের জন্য ভারতীয় চিনিশিল্পের দাবির বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার জন্য ১৯৩০ সালের মে মাসে ট্যারিফ বোর্ডকে নির্দেশ দেয়। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে ট্যারিফ বোর্ড তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে।

ট্যারিফ বোর্ড এই শিল্প সংরক্ষণের দাবির বিষয়টি পরীক্ষা করে এবং শিল্পটি সংরক্ষণের জন্য একটি ১৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সংরক্ষণের প্রথম সাত বছরের জন্য বোর্ড প্রতিহন্দর ওজন চিনির উপর টাঃ ৭-৪-০ সংরক্ষণশুল্ক ধার্য করার

২৩৪. Bipan Chandra, *The Rise and Growth of Economic Nationalism in India,* (New Delhi), 258

প্রস্তাব করে এবং পরবর্তী আট বছরের জন্য প্রস্তাব করে প্রতিহন্দর ওজনে টাঃ ৬-৪-০ শুল্কের। ভারত সরকার বোর্ডের সুপারিশসমূহ গ্রহণ করে এবং ১৯৩২ সালে আইনসভায় সুগার ইন্ডাস্ট্রি (প্রোটেকশন) এ্যাক্ট পাশ করে। এই এ্যাক্টের দ্বারা চিনিশিল্পের উন্নতিবিধানের এবং বিকাশের ব্যবস্থা করা হয় এবং এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৯৩৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সব ধরনের চিনির উপর প্রতিহন্দর ওজনে টাঃ ৭-৪-০ হারে সংরক্ষণশুল্ক আরোপ করা হয়। আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ১৯৪৬ সালে প্রথম আট বছর মেয়াদ শেষ হবার আগেই নিরূপণ করা দরকার ট্যারিফ নীতি চালু রাখা উচিত কিনা, চালু রাখলে কি হারে ট্যারিফ বসানো উচিত। ট্যারিফশুল্ক ছাড়া এ সময় রাজস্বশুল্কও আরোপিত হয়।

সারণি ৫.৫ : ১৯৩১-৩২ এবং ১৯৪১-৪২ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত উৎপাদনশীল চিনিকলের সংখ্যা

প্রদেশ	১৯৩১-৩২	১৯৪১-৪২
যুক্তপ্রদেশ	১৪	৭০
বিহার	১২	৩১
পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর - পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	০১	০৪
মাদ্রাজ	০২	১১
বোম্বে	০২	১০
বাংলা	শূন্য	০৯
উড়িষ্যা	শূন্য	০২
ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহ	শূন্য	১৩
ভারতে মোট চিনিকলের সংখ্যা	৩২	১৫০

উৎস : এম. পি, গান্ধী (সম্পাদিত), *দি ইন্ডিয়ান সুগার ইন্ডাস্ট্রি*, (১৯৪২ বাৎসরিক), বোম্বে ১৯৪৩), XXXIV.

একটি পর্যাপ্ত শুল্কপ্রাচীরের সহায়তায় ভারতে চিনিশিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। বাস্তবিকপক্ষে বিকাশের দ্রুততা এবং নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে ভারতীয় এই শিল্পটির সঙ্গে খুব কম শিল্পেরই তুলনা করা যায়। ১৯৩১-৩২ সাল থেকে দশ বছরের মধ্যেই ভারতে চিনির কারখানা ৩২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০-এ উন্নীত হয় (সারণি ৫.৫)। ১৯৪১-৪২ সালে এই বাংলা প্রদেশে (বিহার ও উড়িষ্যা বাদ দিয়ে, কারণ এ দু'টি তখন পৃথক প্রদেশে পরিণত হয়েছে) ৯টি চিনিকল চালু ছিল এবং এগুলি ছিল ৩,১৩,৬০০ টন আখ থেকে রস নিষ্কাশন করার ক্ষমতাসম্পন্ন। সে বছর এই কারখানাগুলি ২৩,৭০০ টন চিনি উৎপাদন

করে।[২৩৫] অথচ ট্যারিফ সংরক্ষণের পূর্বে বাংলায় কোন আধুনিক চিনিকলই ছিল না। অন্যান্য প্রদেশের, বিশেষকরে যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার ফলে এখানে চিনিশিল্প আর বিকশিত হতে পারে নি। এই দু'টি প্রদেশে আখের দাম ছিল তুলনামূলকভাবে কম এবং কারখানাগুলিতে চিনি নিষ্কাশনের পরিমাণ ছিল বেশি। "কিন্তু বাংলা সম্পর্কে বলতে হয় যে, এই প্রদেশে বিরাজমান আখমাড়াই কলের ব্যাপ্তি এবং চিনি নিষ্কাশনের শতকরা নিম্নহার প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না বলে মনে হয় এবং এটাও প্রতীয়মান হয় যে, এই ক্ষেত্রে এই প্রদেশের সম্ভাবনাসমূহ এখনও বিকশিত হবার উপযুক্ত সুযোগ পায় নি।"[২৩৬]

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, বৃটিশ শাসনামলে বাংলার একদা খ্যাত চিনিশিল্পের ভাগ্য নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়। ১৭৫৭ সালের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাপ্রবাহের ফলে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার অর্থনীতি সাধারণভাবে বিপর্যস্ত হয় এবং এর ফলে চিনিশিল্পেরও ক্রমাবনতি ঘটে। 'ব্ল্যাক রিবেলিয়ন' এবং ১৮১৩ সালে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের দ্বার খুলে দেবার ফলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও বৃটিশ বন্দরগুলিতে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান চিনির তুলনায় বৃটিশ ভারতীয় চিনির উপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপের ফলে এই শিল্প অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ১৮৩৬ সালে চিনির উপর শুল্কের সমতাবিধান করা হলেও রামের ক্ষেত্রে তা করা হয় নি। ১৮৪৬ সাল থেকেই বৃটিশ সরকার বেশ উদ্যমের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করতে থাকে এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ভারতীয় চিনি ক্রমশ বিতাড়িত হয়। এই অবাধ বাণিজ্যনীতির ফলে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভারতও অচিরেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী চিনি আমদানিকারক দেশে পরিণত হয়। উন্নতজাতের আখের চাষাবাদ ও চিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নততর পদ্ধতি প্রচলনে রাষ্ট্রীয় অবহেলা, বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বীট ও আখ থেকে চিনিউৎপাদন শিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি এই শিল্পের ক্রমাবনতিকে ত্বরান্বিত করে। আমদানিশুল্ক এবং ভারতে বীট থেকে উৎপাদিত চিনির উপর ভারসাম্যরক্ষাকারী শুল্কসমূহও ক্রমাবনতির ধারা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত ক্রমাগতই বিদেশী চিনির অবাধ বাজারে পরিণত হয়। ১৯১৯ সালে ভারত সরকার চিনিশিল্পের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানোর এবং এর উন্নতিবিধানের ব্যাপারে প্রস্তাব রাখার জন্য একটি কমিটি গঠন করলেও প্রায় দশ বছর যাবৎ এই কমিটির সুপারিশমালা ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে। ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশের আলোকে এই শিল্পের সংরক্ষণব্যবস্থা গ্রহণ করার পরই শুধু শিল্পটি পুনরায় উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু বাংলার পক্ষে হৃত অবস্থা পুনরুদ্ধার তখনও সুদূরপরাহতই থেকে যায়।

২৩৫ M P Gandhi (ed), *Sugar Induastry*, Table 3, xxxiv

২৩৬. T. R Sharma, *Location of Industries in India*, (Bombay 1946), 130

উপসংহার

শিল্পবিপ্লবের আগে বাংলায় ছিল একটি সুসমন্বিত অর্থনীতি। প্রাক-শিল্পযুগের অভিধায় এদেশের কৃষি এবং উৎপাদিত পণ্যের মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। গঙ্গা এবং এর শাখা-প্রশাখার পলিমাটি জমে এদেশের মাটি ছিল বেশ উর্বর ও সমৃদ্ধ। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে এ মাটিতে চাষাবাদ হয়ে উঠে সহজ ও লাভজনক। এ কারণে স্মরণাতীতকাল থেকেই বাংলার অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কৃষি। অন্যদিকে, এখানে উৎপাদিত পণ্যের মানও নেহাৎ খারাপ ছিল না। বয়নশিল্প, চিনি, জাহাজনির্মাণ এবং লবণশিল্প ছাড়াও সমগ্র প্রদেশে আরো বিচিত্র রকমের কারুশিল্প এবং অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠে। এসব শিল্প শুধু বাংলার জনগণের প্রয়োজনই মেটায় নি, বিদেশের বাজারের চাহিদাও মিটিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় লৌহ ও ইস্পাত, পিতল ও কাঁসানির্মিত দ্রব্য, হাতির দাঁতের তৈরি জিনিস, পাটজাত দ্রব্য, মৃৎপাত্র ইত্যাদি। এভাবে দেখা যায় যে, বাংলায় মানবসমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পেশাগুলির একটি চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

এই সময়ের বাংলার কারুশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পের একটি চমৎকার দিক হলো এসব শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য। কারিগর ও কারুশিল্পীরা স্ব স্ব কাজে নিজেদের দক্ষ করে তুলতো, একজন স্বর্ণকার যেমন রূপা নিয়ে কাজ করতো না, তেমনি একজন রৌপ্যকারও স্বর্ণ নিয়ে কাজ করতো না। এই বৈশিষ্ট্য ছিল ইউরোপে বিরাজমান বৈশিষ্ট্যের বিপরীত। ইউরোপে শ্রমিকদের বিশেষ বিশেষ কাজে দক্ষতা অর্জনের বিষয়টির তখনও উদ্ভব হয় নি। এ অঞ্চলে শ্রমের জটিল বিভাজনের ফলে, এমনকি একটি বিশেষ পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও—যেমন সুতাজাত বয়নশিল্পে দক্ষ কারিগরেরা তুলনামূলকভাবে কম খরচে অতি চমৎকার পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতো। যুগে যুগে বিদেশীদের কাছে বাংলার শিল্পপণ্যের চাহিদার এটি হচ্ছে অন্যতম কারণ। এ প্রসঙ্গে বার্ডউড মন্তব্য করেন যে, বাস্তবিকই "৩,০০০ বছর ধরে সমগ্র বিশ্ব ভারতে উৎপাদিত শিল্পপণ্য ক্রয়ের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যয় করে চলেছে।"[২৩৭]

এক্ষেত্রে বৃটেনও কোন ব্যতিক্রম নয়। সেই আদিকাল থেকেই ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রপ্তানিপণ্যগুলির মধ্যে (বেসরকারি ব্যবসায়ী এবং লাইসেন্সবিহীন ব্যবসায়ীর রপ্তানিপণ্যও) বাংলার মসলিন ও ক্যালিকো এবং কাঁচা ও যন্ত্রোৎপাদিত রেশমদ্রব্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬৯০-এর দশকে বৃটিশ ব্যবহারকারীদের কাছে এদেশের বস্ত্রপণ্য এত জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, সংশ্লিষ্ট মহল পার্লামেন্টের কাছে এই মর্মে আবেদন করে যে, ভারত থেকে চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত বস্ত্রপণ্যের আমদানি বন্ধ করা হোক, কারণ এসব পণ্য দেশের উলের তৈরি পণ্যবাজারের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে। এর ফলে ভারতীয় বস্ত্রপণ্যের উপর

---

২৩৭. George Birdwood, *The Industrial Arts of India*, Vol. I, (London 1880), 136.

শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হলেও সংশ্লিষ্ট মহল গৃহীত পদক্ষেপ যথেষ্ট নয় বলে মত প্রকাশ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগও উত্থাপন করা হয় যে, তারা এখন নিজ দেশের জনগণের কল্যাণ এবং চাকরির প্রত্যাশার চেয়ে মুগল প্রজাদের কল্যাণ, তাদের দেশের উন্নতি ও তাদের চাকরির প্রতি বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। সমসাময়িক চটুল কবিতায়ও ইংরেজ কোম্পানির সমালোচনা পরিলক্ষিত হয়। ১৭০০ সালে লেখা এমন একটি কবিতায় বলা হয় :

তারা যখন ভারতে তৈরি পণ্যকে উৎসাহ দেয়,
ইংরেজদের চাকরি তারা কেড়ে নেয়
এমন হলে কীভাবে ভাড়াটিয়ারা ভাড়া শোধ করবে
যখন ব্যবসা এবং টাকা-পয়সা ভারতের পথে চলবে,
জনগণ বাঁচবে কী করে, করই বা দেবে কী করে
দরিদ্ররা যখন কাজ চায়, ফিরে যায় ঘরে ?
যেসব পণ্য এসব জাহাজে করে হয় আনা
ইংল্যান্ডে ওগুলি কখনো ছিল না জানা।[২৩৮]

এর ফল কখনো ভাল হবার কথা নয়। এর আগেই ১৬৯৭ সালে স্পাইটেলফিল্ডের তাঁতীরা লন্ডনে অবস্থিত ইন্ডিয়া হাউজ আক্রমণ করে। বৃটিশ বস্ত্রপণ্য উৎপাদকেরা ১৭০০ সালে এবং পুনরায় ১৭২০ সালে পার্লামেন্টের আইনের মাধ্যমে তুলাজাত পণ্যের (ছাপানো এবং রঞ্জিত ক্যালিকো) আমদানির উপর বিধি-নিষেধ আরোপে এবং কয়েক ধরনের মসলিন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করাতে সফল হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালেও এধরনের আইন পাশ করা হয়। এরপর থেকে কোম্পানি শুধু কন্টিনেন্টে এবং অন্য দেশে পুনঃরপ্তানির জন্যই তৈরিপণ্য আমদানি করে। আঠারো শতকের শুরুতে এভাবেই বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতিশীল কোম্পানির সঙ্গে ইংল্যান্ডের বর্ধিষ্ণু শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

ইতিমধ্যে, বার্ষিক মাত্র ৩,০০০ টাকার বিনিময়ে সম্রাট ফররুখশিয়র ১৭১৭ সালে এক ফরমানবলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলায় ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করেন। এর ফলে কোম্পানি ব্যবসার ক্ষেত্রে বাংলায় তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সমর্থ হয়। পরবর্তীতে পরাক্রমশালী মুগল সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবার পর যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা ঘোলাজলে মাছ ধরতে তাদের উৎসাহিত করে। নিতান্তই শঠতা, ছলনা এবং প্রতারণার দ্বারা ১৭৫৭ সালে ইংরেজ কোম্পানি বাংলার ভাগ্যবিধাতা হয়ে

২৩৮. England's Almanac, 1700. উদ্ধৃত Shafaat Ahmad Khan, *The East India Trade in the XVIIth Century*, (London 1923), 215.

উঠে এবং ১৭৬৫ সালের মধ্যে এদেশের অঘোষিত সরকারে পরিণত হয় এবং এভাবে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ একীভূত করে। এসময়ে কোম্পানির লোলুপতা সব সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং কোম্পানির কর্মচারীরাও হয়ে পড়ে লোভাতুর। কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য এবং শিল্পশ্রমিকদের উপর ইংরেজ বণিকদের অত্যাচার, বিবিধ বিধি-নিষেধ, নিয়ন্ত্রণ এবং শর্তারোপ একত্রিত হয়ে বিভিন্ন রকমের পণ্য উৎপাদনে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি লবণ উৎপাদনও এ থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। এই পণ্যটির ব্যবসা এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে জনগণের নিত্যব্যবহার্য এই পণ্যটির দাম বেড়ে আকাশচুম্বী হয়ে উঠে। সে যাই হোক, ভারতে উৎপাদিত পণ্যাদি রপ্তানি করে লাভবান হওয়ার জন্য উৎপাদনের অনুকূলে অবস্থান নেয়ায় কোম্পানিকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হবে। জাহাজনির্মাণ শিল্প গড়ে উঠার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির জন্যও কোম্পানি ধন্যবাদার্হ। কোম্পানির এই নীতি দেশের সরকারের বণিকসুলভ নীতির বেশ পরিপন্থী ছিল, কারণ সরকারের নীতি ছিল ইংল্যান্ডে কারখানায় পণ্য উৎপাদনের এবং কাঁচামাল ও স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে তা রপ্তানির অনুকূল।

কিন্তু ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রাচ্যের সঙ্গে দীর্ঘদিন তার লাভজনক ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে নি। উনিশ শতকের শুরুতেই ইংল্যান্ডের শিল্প পুঁজিবাদ একটি দুর্জয় শক্তিরূপে আবির্ভূত হয় এবং কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে দেখা দেয়। বিভিন্ন স্বার্থবাদী মহল, বিশেষকরে বস্ত্রপণ্যের এবং বেসরকারি ব্যবসায়ীরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ব্যবসায়ের ধরনের পুনর্বিন্যাস দাবি করে উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠে। ভারত এবং ইংল্যান্ড এই দুই দেশেই কলকারখানায় উৎপাদনভিত্তিক শিল্প থাকাটাকে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং বেমানান বলে গণ্য করা হয়। "সংক্ষেপে সেসময়ে শ্রমের একটি নতুন আন্তর্জাতিক বিভাজনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বৃটিশ শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহকারীরূপে ভারতের প্রাথমিক ভূমিকার নতুন সংজ্ঞা নিরূপণের প্রয়োজন দেখা দেয়।"[২৩৯] এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। একটি সুউচ্চ শুল্কপ্রাচীর এবং আমদানির উপর বিধি-নিষেধের আড়ালে থেকে ইংল্যান্ডের কলকারখানায় উৎপাদিত বস্ত্রপণ্য এখন খোদ ভারতভূমিতেই ভারতে উৎপাদিত পণ্যকে হ্রাসকৃত মূল্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করার অবস্থানে পৌঁছে। এভাবে ১৮১৩ সালে যখন কোম্পানির চার্টার নবায়নের সময় আসে, তখন কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার রহিত করে সব ইংরেজের জন্যই ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বার খুলে দেয়া হয় এবং এভাবেই বৃটেনের শিল্পপতিবুর্জোয়াদের কারখানায় উৎপাদিত পণ্য অবাধে ভারতের বিরাট বাজারে প্রবেশের সুযোগ পায়।[২৪০]

১৮০০ সাল থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে এবং ভারতে গভর্নর জেনারেলের মাধ্যমে বৃটিশ বস্ত্রপণ্য ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্যাদির সহায়তার জন্য আইনকানুনের একটি

২৩৯. Barber, *British Economic Thought and India, 1600-1858,* (Oxford 1975), 123.

২৪০. R. Mukherjee, *The Rise and Fall of the East India Company,* (Bombay 1973), 403.

বিস্তৃত বেড়াজাল তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়। এ ধরনের বণিকসুলভ ব্যবস্থাদি গ্রহণের ফলে ভারতের এককালের প্রখ্যাত তুলাজাত বস্ত্রপণ্য ও লবণশিল্পের অবনতি ঘটে। ভারতের জাহাজনির্মাণ শিল্পের সম্প্রসারণ বন্ধ করার জন্য জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত আইন-কানুনও কঠোরতর করা হয়। ভারতীয় শিল্পসমূহের ধ্বংসসাধনের লক্ষ্যে ভারতেও অনুরূপ নিষেধাজ্ঞামূলক আইন ও হুকুম জারি করা হয়। অভ্যন্তরীণ শুল্কারোপ ছিল ঐসব পদক্ষেপের অন্যতম। আরেকটি পদক্ষেপ ছিল নামমাত্র শুল্ক প্রদান করে বস্ত্রপণ্যের আমদানি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রপ্তানিবৃদ্ধির লক্ষ্যে কারখানাজাত বিদেশী পণ্যের জন্য নিজের বাজার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া বা দেশজ শিল্পকে এমন অবস্থায় উন্নীত করা যেন তা বিদেশী শিল্পের সঙ্গে সমান শর্তে প্রতিযোগিতা করতে পারে, ইত্যাদি যেসব সংশোধনমূলক বা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে থাকে, উপনিবেশ হওয়ার ফলে এবং রাজনৈতিক বন্ধ্যাত্বের জন্য ভারত তার কোনটিই গ্রহণ করতে পারে নি।[২৪১]

সরকারের হস্তক্ষেপ না করার নীতি এবং অবাধ বাণিজ্যের সাফল্যের ফলে বাংলার শিল্পসমূহের মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠে। ইংল্যান্ডে এখানকার চিনির প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান বন্ধ হয়ে যায়। সমস্যাগুলি নিরসনযোগ্য হলেও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়ায় এদেশের এককালের গৌরবময় রেশমশিল্পও ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। রাস্তা-ঘাট, রেলপথ এবং নৌপথের সম্প্রসারণ, সমুদ্রবন্দরসমূহের উন্নতিসাধন এবং শুল্করহিতকরণের ফলে কারখানায় তৈরি উৎপাদিত পণ্যসমূহ অবাধে বাজারে প্রবেশ করার সুযোগ পায় এবং স্থানীয় শিল্পের ধ্বংস ডেকে আনে। "আমদানিব্যবসা ভারতীয় শিল্পসমূহের উপর যে আঘাত হানে তা তুলনামূলকভাবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে ভারতে ব্যবসার ক্ষেত্রে কি পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, এসময়ে ব্যবসার ক্ষেত্রে বিরাট স্থানচ্যুতি ঘটেছে এবং ভারত থেকে ভিন্নখাত ধরে মুনাফা চলে গেছে ইংরেজদের পকেটে।"[২৪২]

সে যাই হোক, এটি একটি মর্মান্তিক দুঃখজনক ঘটনা যে, তৎকালীন সরকার সম্পদের উৎসের সম্প্রসারণের জন্য শিল্পোন্নতির ব্যাপারে সচেষ্ট না হয়ে সুপরিকল্পিত এবং বিধিবদ্ধভাবে এদেশের প্রাচীন কলা এবং শিল্পসমূহের ধ্বংসসাধন করার নীতি অনুসরণ করেছে। এর পরিণতিতে দেশ আরো দরিদ্র হয়ে পড়ে এবং নগরায়ণ বন্ধ হয়ে যায় ও বাংলার বর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র কৃষিজাত সম্পদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু কৃষি, জলবায়ু, আবহাওয়া এবং প্রকৃতিদত্ত উর্বরতার সংযোগের উপর নির্ভরশীল হওয়ায়

২৪১. Helen B. Lamb, "The 'State' and Economic Development in India," in Simon Kuznets (et al.) (edited), *Economic Growth: Brazil, India, Japan,* (Duke University Press 1955), 468.

২৪২. P. Padmanabha, Pillai, *Economic Conditions of India,* (London 1925), 27

জনগণের জীবনে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ ও অভাবের মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে (স্থায়ী ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের ফলে মানুষের কর্মপ্রেরণা ও উদ্যমও হারিয়ে যায়)। একথা অবশ্য ঠিক যে, বিদেশী মূলধন দিয়ে দেশের কয়েকটি বিশালায়তন আধুনিক শিল্প স্থাপন করা হয়। কিন্তু এসব শিল্প থেকে যে লাভ হয় তা পাচার হয়ে যায় এবং এর দ্বারা বিদেশীরা সম্পদশালী হয়ে উঠে। এভাবে সতেরো ও আঠারো শতকে একদা যে অঞ্চল "উৎপাদিত পণ্যের বাজারে নিরাপদে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে পারতো"[২৪৩] এসময়ে তা অনেক পিছনে পড়ে যায় এবং ১৯১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী স্কটল্যান্ডের মাথাপিছু ৪৫ পাউন্ড আয়ের তুলনায় এদেশের মাথাপিছু আয় এসে পৌঁছে মাত্র ২ পাউন্ডে।[২৪৪] তাছাড়া মাথাপিছু উৎপাদিত পণ্যের মূল্য দাঁড়ায় মিশরের তুলনায় চার ভাগের এক ভাগ এবং মেক্সিকোর তুলনায় দশ ভাগের এক ভাগ।[২৪৫] অন্য কথায়, বৃটিশ শাসনামলে এদেশের অর্থনীতি প্রাক-শিল্পযুগের স্তরে অচল হয়ে থাকে এবং এর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নেমে আসে শূন্যের কোঠারও নীচে।[২৪৬] বৃটিশ শাসনের অবসানে অবনত হয়ে পড়া দেশটির করুণ এবং অসহায় অবস্থা সমসাময়িক একটি কবিতায় সঠিকভাবে ফুটে উঠেছে

পেটে ভাত নেই
হাতে কাজ নেই
ঘরে শিল্প নেই
বিদেশীর জিনিসে চলে ঘর
তাই
গায়ে জ্বর মনে ডর
চাই
কাজ+ভাত = শক্তি।

২৪৩. Sukumar Bhattacharya, *The East India Company and the Economy of Bengal from 1704 to 1740*, (Calcutta 1969), 172-73

২৪৪. C S. Deole, *The State in relation to Indian Industries*, (Bombay 1916), 3

২৪৫. B. R. Tomlinson, *The Political Economy of the Raj, 1914-1947*, (London 1979), 32.

২৪৬. For an interesting summary on the debate relating to 'arrested' economic development in India under British rule, দেখুন Mufakkharul Islam, 'The Debate on the Question of "Arrested" Economic Development in Indian sub-Continent under British Rule', in মানববিদ্যা বক্তৃতা (উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, n d), 1-52. Prof. Islam takes a very generous and charitable view of many of the criticisms levelled at the pre-industrial Indian society by the imperialist writers and yet could not help conclude that the Indian economy was capable of transformation to industrial capitalism This possibility was frustrated by the colonial government which deliberately and systematically foiled her take-off into modern economic development..

১৩

শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশ

বিনায়ক সেন*

ভূমিকা

উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি অবহেলিত দিক হিসেবে শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশের প্রসঙ্গটি সাম্প্রতিক বছরগুলোয় উত্তরোত্তর মনোযোগ লাভ করছে। ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও প্রসঙ্গটির তাৎপর্য বিদ্যমান। সঙ্গত কারণে শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশের প্রসঙ্গটি অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা, মনোবিদ্যা ইত্যাদি নানা শাস্ত্রগত বিবেচনার দাবি করে। সে প্রেক্ষিতে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে শিল্পখাতের বিকাশের উপর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে থাকলেও বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশপ্রক্রিয়া নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য সীমিত। ইতিমধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যসূত্রের উপর নির্ভর করে সময়ের সাথে বাঙালি পুঁজির বিবর্তনের ধারা, বিশেষত এর অন্তর্নিহিত যুক্তিভিত্তি এই অধ্যায়ে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে যে সময়পর্বের উল্লেখ স্থান পেয়েছে তার ব্যাপ্তি উনিশ শতকের সূচনা থেকে বাংলায় বৃটিশ শাসনের অবসান পর্যন্ত।

অধ্যায়টি সাতটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত। প্রথম অনুচ্ছেদে বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশের (সরবরাহগত) সমস্যা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে স্থান পেয়েছে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতাকেন্দ্রিক ব্যবসায়ী-শিল্পোদ্যোক্তাদের উত্থানপর্ব। তৃতীয় অনুচ্ছেদে ১৮৪৭ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থবাজারে মন্দা ও সঙ্কটের

* রিসার্চ ফেলো, বি. আই. ডি. এস, ঢাকা।

প্রেক্ষাপটে বাংলার 'ক্ষুদে মাপের শিল্পবিপ্লবের' পরিসমাপ্তির কারণ খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পখাত থেকে বাঙালি পুঁজি কিভাবে গতিমুখ পরিবর্তন করে আকৃষ্ট হলো জমি ও বাণিজ্যবহির্ভূত পেশার প্রতি, তার একটি বিবরণ দেয়া হয়েছে চতুর্থ অনুচ্ছেদে। এই পর্বে যেসব বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা আধুনিক শিল্প-কারখানা গড়ার ক্ষেত্রে সীমিত পরিসরে হলেও প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হয় এই অধ্যায়ে। পঞ্চম অনুচ্ছেদে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে স্বদেশী যুগের মধ্যবিত্তভিত্তিক ভদ্রলোক-শিল্পোদ্যোক্তাদের উপর। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোয় বাংলার স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রাগ্রসর শ্রেণী হিসেবে মাড়োয়ারি শিল্পোদ্যোক্তাদের আত্মপ্রকাশ বিধৃত হয়েছে। কি কি প্রভাবকের কারণে এই পর্বে মাড়োয়ারি পুঁজির তুলনায় বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশ পিছিয়ে পড়ে তা সনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এই পর্বে। সপ্তম অনুচ্ছেদে ১৯৪৭ সাল অবধি পূর্ব বাংলায় মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তন খাতে শিল্পোদ্যোক্তাদের উপর আলোচনা করা হয়েছে। সেই সূত্রে উত্থাপিত হয়েছে বাঙালি মুসলিম শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশের প্রসঙ্গটি।

১.১ বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশে অনগ্রসরতার প্রচলিত ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা

বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন যখন শেষ হওয়ার পথে, তখনই বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশে অনগ্রসরতার বিষয়টি বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। অনগ্রসরতার বিষয়ে চমকপ্রদ এক ঐকমত্য দেখা যায় বৃটিশ আমলা, স্বদেশী আন্দোলনের ভাবাদর্শের তাত্ত্বিক, বৃটিশ পুঁজির নেতৃত্বাধীন বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের ব্যবসায়ী, বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য, মফস্বল কলেজের শিক্ষক প্রমুখের চিন্তাধারার মধ্যে। গত শতকের সত্তরের দশকে ভোলানাথ চন্দ্র 'A Voice for the Commerce and Manufactures of India' প্রবন্ধে বাংলার সব অর্থনৈতিক উপসর্গের মূল খুঁজে পেয়েছিলেন শিল্পায়নে ভদ্র সম্প্রদায়ের আগ্রহহীনতার মধ্যে। ভদ্র সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর আবেদন ছিল—তারা যেন শিল্পায়নকে তাঁদের উন্নয়নচিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দেন। শিল্পায়নের এই তাগিদ সমভাবেই অনুভব করেছিলেন যেমন একদিকে রমেশ চন্দ্র দত্তের মতো উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদেরা, তেমনি অন্যদিকে বিপিন চন্দ্র পাল এবং চিত্তরঞ্জন দাসের মতো চরমপন্থী রাজনীতিকেরা। ১৮৯৩ সালে বেঙ্গল কেমিক্যালস প্রতিষ্ঠার পিছনে প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের প্রধান যুক্তি ছিল বেকার শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে শিল্পোদ্যোক্তাসুলভ প্রেষণা জাগিয়ে তোলা। এসব তরুণ মূলত 'সরকারি বাঁধা চাকুরি অথবা তা না পেলে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরি' পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন।[১] বাঙালি সম্পদশালী ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে

১. S. Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*, (New Delhi 1973), 95.

শিল্পোদ্যোক্তাসুলভ আগ্রহের অভাব স্বদেশী যুগের বিভিন্ন লেখার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একই সুর লক্ষ্য করা যায় ১৮৯০ সালে প্রকাশিত ই. ডব্লিউ. কলিনের 'Report on the Existing Arts and Industries in Bengal' শীর্ষক প্রতিবেদনে। এতে বাঙালি ধনাঢ্য শ্রেণী 'উদ্যমহীনতা' এবং 'নতুন কল-কারখানা' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়।[২] ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় আইনসভার একজন সদস্য লক্ষ্য করেন যে, বাঙালিরা আদৌ 'শিল্পমনা' নয় এবং ১৯৪২ সালে আইনসভার আরেকজন সদস্যের মন্তব্যেও একই ধারণা ব্যক্ত হয়। বাঙালিদের মধ্যে 'শিল্পপ্রবৃত্তি মরে গেছে' এই বলে তিনি বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তাকে সহায়তা দেবার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার এই হতদ্দশা নিয়ে বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের মধ্যে একই মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। চট্টগামের বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে হাবিবুর রহমান মন্তব্য করেছিলেন যে, চাটগাঁয়ের ব্যবসায়ীদের 'একান্ত ব্যবসায়ী মনস্তত্ত্ব' নিহিত 'ঝুঁকি না নেওয়া' এবং 'দ্রুত ধনিক হওয়ার' মানসিকতার মধ্যে। এরা সাধারণত 'শিল্পখাতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে' নিরুৎসাহী; তার চেয়ে বরং এরা 'মনোহারী দোকান অথবা রেস্টুরেন্ট খুলতেই আগ্রহী, যেখানে দ্রুত কেনাবেচা চালান যায়।'[৩]

কেন বাঙালি সম্পদশালী শ্রেণী সময়ের বিবর্তনে বৃহদায়তন খাতমুখী স্থায়িত্বশীল এক শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীতে রূপান্তরিত হতে পারলো না এ নিয়ে মোটা দাগে দু'ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। একটি ব্যাখ্যা মতে, বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশে ব্যর্থতার কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ও বৈষম্যমূলক নীতি এবং সামগ্রিকভাবে সহায়ক অর্থনৈতিক পরিবেশের অনুপস্থিতি ; 'সহজতর ব্যাখ্যা হলো, আধুনিক শিল্পখাতে প্রবেশ বৈদেশিক বাণিজ্য, পাইকারি ব্যবসা এবং অর্থায়ন খাতের উপর ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়।'[৪] একে ঔপনিবেশিক শোষণকেন্দ্রিক যুক্তি বলা যেতে পারে। এই যুক্তি প্রদর্শনের একটি অসুবিধে হলো, সাধারণভাবে ঔপনিবেশিক পর্বে স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বাধাগ্রস্ত বিকাশ এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা গেলেও কি কি প্রভাবকের কারণে স্থানীয় অন্যান্য ব্যবসায়ী গ্রুপের (যেমন, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তাদের) তুলনায় বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তারা পিছিয়ে পড়লো তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অথবা এই যুক্তি দিয়ে যদি বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার তুলনামূলক অনগ্রসরতাকে

২. A. Z. M. Iftikhar-ul-Awwal, *The Industrial Development of Bengal, 1900-1939.* (Dhaka 1983), 134.

৩. H. Rahman, "Chittagong since Partition", *Pakistian Economic Journal*, 1:3 (1950), 65-81.

৪. Sarkar, *Swadeshi Movement*, 135.

ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে একথাকে প্রামাণ্য ধরে নিতে হয় যে, শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে বাঙালিরা স্থানীয় অন্যান্য ব্যবসায়ী গ্রুপের তুলনায় ঔপনিবেশিক শাসকদের অপেক্ষাকৃত বেশি বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছিল। ব্যবসা ও শিল্পে বিদ্যমান ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণকে টিকিয়ে রাখার পশ্চাতে যে ধরনের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা দানের ব্যবস্থা ছিল তার মধ্যে বাগচী (১৯৭২) স্পষ্টতই 'racial alignment'-এর বড় একটি ভূমিকা খুঁজে পান।[৫] ক্লিং (১৯৭৫) উপরোক্ত থিসিসের সপক্ষেই এসে দাঁড়ান যখন তিনি বলেন যে, 'অর্থনীতির আধুনিক খাতে বাঙালি ব্যবসায়ীদের অবস্থানের অবনতির' পিছনে কাজ করেছে 'বাঙালিদের বিরুদ্ধে বেসরকারি ও সরকারি বৃটিশদের ক্রমবর্ধমান সামাজিক বঞ্চনা।'[৬] সন্দেহ নেই যে, বাঙালিরা ঔপনিবেশিক বৈষম্যের শিকার হয়েছিল; কিন্তু অন্যান্য স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তার তুলনায় তারা অনেক বেশি বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছে, এর সপক্ষে যথেষ্ট তথ্যগত ভিত্তি যুগিয়ে থিসিসটিকে কখনোই সপ্রমাণ করা হয় নি। বিপরীতে বরং কেউ যুক্তি রাখতে পারেন যে, অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক আচরণে ভুক্তভোগী হওয়ার ক্ষেত্রে বাঙালিদের অবস্থানে অন্যান্য স্থানীয় ব্যবসায়ী-গ্রুপ থেকে বড় একটা পার্থক্য দেখা যায় না। বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে বস্ত্রশিল্পের অবাঙালি স্থানীয় মালিকেরাও ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রচণ্ড বৈষম্যমূলক নীতির শিকার হয়েছিলেন, যা বাঙালিদের তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। মরিসের (১৯৬৭) পর্যবেক্ষণ এই মতে সায় যোগায়—'বস্ত্রখাতের ভারতীয় শিল্পোদ্যোক্তাদের লড়াকু মনোভাবের একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য ছিল এখানেই যে, এরা এমন একটি খাতে প্রবেশ করেছিল, যেখানে বৃটেনের সাথে প্রতিযোগিতা সবচেয়ে তীব্র হওয়ার কথা, ম্যানচেস্টারের তরফ থেকে রাজনৈতিক চাপ যেখানে ছিল সবচেয়ে প্রবল এবং সেখানে বস্তুত কোন প্রকার ট্যারিফ রক্ষাবন্ধনী ছাড়াই তাদেরকে টিকে থাকতে হয়েছিল।'[৭]

বলা দরকার যে, ঔপনিবেশিক শোষণকেন্দ্রিক মতের প্রবক্তারাও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে শিল্পোদ্যোগগত ভিন্নতা লক্ষ্য করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাগচী (১৯৭২) লক্ষ্য করেছেন যে, 'বাঙালি মধ্যবিত্ত শিল্পোদ্যোক্তা উৎসাহী না হলেও' 'মাড়োয়ারি ও উত্তর ভারতের বৈশ্যরা' শিল্পপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল।[৮] কিন্তু, এটুকু লক্ষ্য

৫. A. K. Bagchi, *Private Investment in India 1900-1939*, (Cambridge 1972), 205.

৬. B. B. Kling, "Economic Foundations of the Bengal Renaissance" in R. Baumer (ed.), *Aspects of Bengali History and Society*, (New Delhi 1975), 63.

৭. M. D. Morris, " Values as an Obstacle to Economic Growth in South Asia: An Historical Survey", *Journal of Economic History*, 27: 4 (1967), 599.

৮. Bagchi, *Private Investment*, 205.

করার পর ঔপনিবেশিক আমলে বাংলায় স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তা সরবরাহের পশ্চাতে কি কি প্রভাবক কাজ করেছে তা বিশ্লেষণে তিনি অগ্রসর হন নি। স্পষ্টতই বাগচীর প্রধান লক্ষ্য ছিল ওয়েবারীয় ধারার যুক্তিকে ভ্রান্তিমূলক বলে প্রমাণ করা, যে যুক্তি মতে 'পূর্ব ভারতে ভারতীয় শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর তুলনামূলক অনুপস্থিতির সব দায়দায়িত্ব' চাপিয়ে দেয়া হয় বিরাজমান 'মূল্যবোধ' অথবা 'বর্ণপ্রথাউদ্ভূত নিয়ন্ত্রণবিধির উপর।'[৯] এই সূত্রে অন্যরাও, যেমন মরিস (১৯৬৭), সিংগার (১৯৭৩), ফক্স (১৯৭৩) প্রমুখ বলার চেষ্টা করেছেন যে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আঞ্চলিক যে তারতম্য চোখে পড়ে তা ব্যাখ্যার জন্য 'হিন্দু মূল্যবোধের' মতো রহস্যপূর্ণ কোন ধারণা অথবা পশ্চাৎপদ 'ঐতিহ্যের' যুক্তি কোনটিকেই অবলম্বন করার দরকার নেই। এক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে বাজার-সুযোগের তারতম্য এবং আঞ্চলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট। কিন্তু এই প্রস্তাবনাটিকে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের মধ্যকার স্থানীয় শিল্পোদ্যোগগত তারতম্যকে ব্যাখ্যা করবার পদ্ধতিগত ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা গেলেও একই অঞ্চলের বিভিন্ন শিল্পোদ্যোক্তার মধ্যে প্রভেদ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা কতটা প্রয়োগ করা সম্ভব ? এই প্রস্তাবনার আলোকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, উনিশ শতকের শেষভাগে বাংলার অভ্যন্তরীণ পাট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করবে বাঙালিদের পরিবর্তে মাড়োয়ারিরা এবং তারাই প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'লড়াকু শিল্পোদ্যোক্তা' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে ?[১০] অথবা কেন বাংলার সুবর্ণবণিক গোষ্ঠী, যাদেরকে ১৭৫০ সালের পূর্বে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের 'বেনিয়ার সমতুল্য' ভাবা হতো[১১] এবং যারা ব্যবসা ও মহাজনি বৃত্তিতে বংশানুক্রমে পারদর্শী ছিল, তারা ঔপনিবেশিক আমলের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ইতিহাসে প্রভাবশালী হয়ে দাঁড়াতে পারলো না ? কেন স্বদেশী যুগের 'ভদ্রলোক শিল্পোদ্যোক্তারা' বাংলায় কোন পাটকল স্থাপনের জন্য অগ্রসর হলো না এবং এর পরিবর্তে নিজেদের ব্যাপৃত রাখলো তথাকথিত 'science-industries' খাতে, যেখানে তাদের সাফল্য ছিল নিতান্ত নগণ্য ? স্পষ্টতই একই অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যবসায়ী গ্রুপ বা সম্প্রদায়ের মধ্যে (এমনকি তারা একই ভাষাগোষ্ঠী বা ধর্মীয় পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও) বিদ্যমান 'বাজার-সুযোগ' গ্রহণে মাত্রাভেদ ছিল। মরিস (১৯৬৭) নিজেও এই সমস্যাটি অনুভব করেন যখন তিনি

---

৯. ঐ।

১০. এখানে বলা দরকার যে, বাংলায় বৃটিশ শাসনের পূর্বেই মাড়োয়ারিরা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো। সে আমলের উল্লেখযোগ্য ধনকুবেরদের (জগৎশেঠসহ) প্রায় সকলেই ছিল মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের।

১১. D.R. Gadgil, *Origins of the Modern Indian Business Class, An Interim Report*, (New York 1959), 18.

বলেন যে, ঔপনিবেশিক শোষণকেন্দ্রিক যুক্তি 'সরাসরি ব্যাখ্যা দিতে পারে না কেন উনিশ শতকের গ্রামাঞ্চলে যেসব অর্থকরী সুযোগের সম্প্রসারণ ঘটছিল তার ফায়দা লোটে বাঙালিরা নয়, মাড়োয়ারিরাই।'[১২]

ঔপনিবেশিক আমলে স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর অনগ্রসরতার ব্যাখ্যা হিসেবে অন্য মতটি এরকম—ভারতীয় মূল্যবোধ এবং সমাজকাঠামো (যেটি উপরোক্ত মূল্যবোধের ধারক) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে। এই মতের উৎস সন্ধান করতে গেলে ভারত প্রসঙ্গে ম্যাক্স ওয়েবারের ধারণার সমীপবর্তী হতে হয়। ওয়েবার মনে করেছেন যে, ভারতের ব্যবসায়ী ও বণিকেরা 'প্রোটেস্টান্ট মতাদর্শ' এবং 'পুঁজিবাদের ভাবধারা' থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে সবসময়ই 'সনাতন' ও 'আধুনিক'-এর ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতেন। এভাবে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধব্যবস্থা আধুনিকায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এধরনের যুক্তি প্রদর্শনে অবশ্য বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়, যা নিম্নে আলোচিত হলো।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, মূল্যবোধকেন্দ্রিক ওয়েবারীয় ধারার যুক্তিও[১৩] বিভিন্ন শিল্পোদ্যোক্তা গ্রুপের কর্মকাণ্ডের তারতম্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। যদি ওয়েবারের প্রতিপাদ্যকে মেনে নেই যে, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভারতে রয়েছে একক (হিন্দু) মূল্যবোধব্যবস্থার প্রাধান্য,[১৪] তাহলে একই মূল্যবোধের অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও মাড়োয়ারি, নাটুকোট্টাই, চেট্টিয়ার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের তুলনায় বাঙালি ব্যবসায়ী ও শিল্পপুঁজির অনগ্রসরতাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবো?

উপরোক্ত মূল্যবোধকেন্দ্রিক যুক্তির একটি অপেক্ষাকৃত নমনীয় ধরন পাওয়া যায় পার্সিদের উত্থান সম্পর্কিত ড্যানিয়েল বুকাননের লেখায়। পার্সিদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে বুকানন এমন কিছু সনাক্তসূচক চিহ্ন তুলে ধরেন, যা ওয়েবারীয় চিন্তাধারাকে মনে করিয়ে দেয় : "জাতিগত ও সংস্কৃতিগত বিচারে এরা নিজেদেরকে কখনোই অন্য কোন ভারতীয় গ্রুপের সাথে অঙ্গীকৃত করে দেখে নি এবং একারণেই অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন সম্ভবপর হয়েছিল।"[১৫] ওয়েবারের মতো বুকাননও

---

১২. Morris ," *Values as an Obstacle* " ,601.

১৩. অবশ্য এক্ষেত্রে ওয়েবারের অনেক পূর্বসূরি এবং অনেক অনুসারী ছিল। আঠারো শতকের পর্যবেক্ষকদের মধ্যে Dubois, Trevelyan প্রমুখ সনাতনী মূল্যবোধকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা বলে মনে করতেন।

১৪. M. Weber, *The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism*, (New York 1958).

১৫. D. H. Buchanan, *The Development of Capitalistic Enterprise in India*, (London 1966), 144.

বর্ণপ্রথা না থাকার অর্থনৈতিক তাৎপর্য তুলে ধরেন, যদিও তাঁর লেখায় সমস্যাটির ভিন্ন এক মাত্রা তুলে ধরা হয় : "প্রতিবন্ধকতাসৃষ্টিকারী বর্ণপ্রথা না থাকায় এবং বিদেশভ্রমণ বা ভিনদেশী আচার অনসুরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভারতীয় ভীতি থেকে মুক্ত হওয়ায় পার্সিরা ব্যাপক হারে ইউরোপভ্রমণ করেছিল, অনেক দ্রুত ইউরোপীয় ধারা, বিশেষত ইউরোপীয় ব্যবসাপদ্ধতি গ্রহণ করতে পেরেছিল।'[১৬] অর্থাৎ এই যুক্তি অনুসারে, সনাতন মূল্যবোধে আচ্ছন্ন হয়ে থাকাকে শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশের পথে অনতিক্রম্য কোন বাধা হিসেবে দেখা সঙ্গত হবে না। সনাতনী বানিয়ার পক্ষে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধজনিত ঘাটতি দূর করে আধুনিক শিল্পোদ্যোক্তায় পরিণত হওয়া সম্ভব হবে কিনা তা অনেকটাই নির্ভর করবে বিদেশী পুঁজির সাথে মুৎসুদ্দিসম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার সামর্থ্যের উপর, বিশেষকরে বিদেশী ব্যবসাপদ্ধতি অনুসরণ করতে সে কতোটা আগ্রহী হয় তার উপর। কিন্তু একথা মানলে আরেকটি সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায়। পার্সিদের মতো উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি ব্যবসায়ীরাও 'বিদেশী আচার', 'ইউরোপীয় ধারা' এবং ইউরোপীয় ব্যবসাপদ্ধতি' গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না বা কম উদগ্রীব ছিল না। তাহলে তারা কেন ১৮৫০ সালের পরে কালক্রমে একটি গতিশীল শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীতে রূপান্তরিত হতে পারলো না?

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর হয়তো কেউ দিতে চাইতে পারেন একথা বলে যে, পশ্চিম ভারতীয় ব্যবসায়ী-সংস্কৃতি অনুযায়ী পার্সিদের ছিল সম্প্রদায়ের ভিতরে পরস্পরকে সহায়তাদানকারী সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক, যা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতাকেন্দ্রিক বণিকদের মধ্যে সম্ভবত ছিল না। এই আন্তঃসম্প্রদায় নেটওয়ার্কের অনুপস্থিতি কিছুটা হলেও ব্যাখ্যা করে কেন ১৮৪০-এর দশকের শেষদিকে শেয়ারবাজারের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় মোকাবেলার সামর্থ্যটুকু পর্যন্ত বাঙালি ব্যবসায়ীদের ছিল না। এধরনের ব্যাখ্যার দু'টি সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করতে হয়। প্রথমত, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভিতরে পরস্পরকে সহায়তাদানকারী নেটওয়ার্ক (যা অনেকাংশেই পারিবারিক আত্মীয়তাভিত্তিক হতো) ভারতের অধিকাংশ বনেদি ব্যবসায়ী গ্রুপের ক্ষেত্রেই পরিদৃষ্ট হয়। বাংলাতেও এটা দেখা যায়। সুবর্ণবণিক, সাহা প্রমুখ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে পুঁজি, তথ্য, দক্ষতা প্রভৃতি বিনিময়ের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ নেটওয়ার্ক বরাবর থেকে গিয়েছিল। একই কথা বলা চলে চট্টগ্রামের মুসলিম সওদাগরদের ক্ষেত্রেও, যারা বিশ শতকের প্রথমার্ধে অভ্যন্তরীণ এবং উপকূলীয় বাণিজ্যে সক্রিয় ছিল। কিন্তু এসব ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কোনটিই কালক্রমে (স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে) শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীতে রূপান্তরিত হতে পারে নি। কেউ বলতে পারেন যে, এসব সম্প্রদায়ের পেশাগত সংস্কৃতি ছিল সনাতনী ধাঁচের।

১৬. ঐ।

কিন্তু তাতে করে বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটে না। সাহা বা সওদাগর সম্প্রদায়ের অন্তত কিছু ব্যবসায়ী নিশ্চয়ই ১৯৪৭-উত্তর পাকিস্তানের মুসলিম ব্যবসায়ী মেমনদের মতো তাদের 'সনাতনী' প্রবণতাজাত ঘাটতি পুষিয়ে নিয়ে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারতো, অংশীদার হতে পারতো আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার। দ্বিতীয়ত, একান্নবর্তী পরিবারপ্রথার সম্প্রসারণ হিসেবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভিতরে পরস্পরকে সহায়তা দানের যে নেটওয়ার্ক-প্রথা তা শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশের প্রাথমিক স্তরের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও জয়েন্ট-স্টক ধারার বাণিজ্যিক সংগঠনের মধ্যে বিকাশের যে সম্ভাবনা রয়েছে তার সাথে কোনভাবেই তুলনীয় নয়। জয়েন্ট-স্টক ধারার সংগঠন ইউরোপীয় বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এদিক থেকে দেখলে বলতেই হবে যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি ব্যবসায়ীরা, যারা জয়েন্টস্টক পদ্ধতিতে বাণিজ্যসংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, তারা অনেকটাই ওয়েবারীয় অর্থে 'rational capitalism'-এর ছকের দিকে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। অন্তত তাদের ছক যে বাণিজ্যসংগঠনের দিক দিয়ে (ওয়েবারীয় যুক্তি মানলে) ভারতের অন্যান্য স্থানের অবাঙালি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একান্নবর্তী পরিবারভিত্তিক নেটওয়ার্ক-প্রথার 'pariah capitalism'-এর চেয়ে উন্নততর ছিল একথা হয়তো বলা চলে। অথচ বাস্তবে দেখা গেল যে, আপাতদৃষ্টিতে 'প্রাগ্রসর' বাঙালি পুঁজি কালক্রমে উনিশ শতকের শেষ নাগাদ অকিঞ্চিৎকর এক ব্যবসায়ী শ্রেণীতে পর্যবসিত হলো; পক্ষান্তরে অবাঙালি পুঁজি (আপাতদৃষ্টিতে 'অনগ্রসর' ধরনের বাণিজ্যসংগঠন নিয়ে) পাট, বস্ত্র ও কয়লাশিল্পে বৃটিশ পুঁজির একাধিপত্যের প্রতি উত্তরোত্তর হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। এ থেকে অন্তত এটুকু সিদ্ধান্ত টানা যায় যে, এককালের pariah capitalistও অর্থনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলে শিল্পোদ্যোক্তায় পরিণত হতে পারে।

এসব কথা বলার অর্থ এই নয় যে, শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশে বিদ্যমান মূল্যবোধের বা (সম্ভবত আরো যেটা গুরুত্বপূর্ণ) প্রচলিত সমাজকাঠামোর (যা কিনা উপরোক্ত মূল্যবোধকে ধারণ করে) গুরুত্বপূর্ণ কোন ভূমিকা নেই। অমর্ত্য সেনের *Economics and Ethics* গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মেইজি পর্বের শিল্পবিকাশ ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে মূল্যবোধের (Japanese ethos) তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মূল্যবোধ কোন একটি খাতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে কিভাবে উৎসাহিত করতে পারে তার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে স্বদেশী যুগেই। ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ সালে স্বদেশী ভাবাদর্শের প্রভাব বাংলার তাঁতশিল্পের বিকাশে খুবই সহায়ক হয়েছিল। মূল্যবোধ নেতিবাচক প্রভাবও ফেলতে পারে অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে। ১৮৫০ সালের পর বাংলায় 'ভদ্রলোক-কালচার'-এর উত্থানের ফলে বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। উচ্চবর্ণের বাঙালির পুঁজি ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে স্থানান্তরিত হয়ে জমি ও ব্যবসাবহির্ভূত পেশার প্রতি ঝুঁকতে থাকে। অন্যদিকে, বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে যাদের বিচরণ ছিল,

তারা মূলত নিম্নবর্ণের ব্যবসায়ী ও কারিগর সম্প্রদায়ভুক্ত। শেষোক্তদের মধ্যে সাহা, বণিক, পাল, তেলী, পোদ্দার, শীল, কর্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য, যাদের সামাজিক মর্যাদা ছিল নিম্নে, আর পুঁজিও ছিল কম।

ওয়েবারীয় যুক্তির আরো একটি প্রতিপাদ্য ছিল, আমদানিকৃত পুঁজিবাদ যতবারই সনাতনী ধারাকে ভাঙতে চেয়েছে, ততবারই বর্ণপ্রথা এসে এই ধারাকে টিকিয়ে রেখেছে।[১৭] ফলে দেখা যায় যে, আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ায় অংশ নেবার পরও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সনাতনী মনোবৃত্তি যায় নি। আধুনিক খাতের শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা প্রায়শই ফটকাবাজি মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়, যা শিল্পপুঁজির বিকাশকে শ্লথতর করে তোলে। এবং এই কারণে ওয়েবার ভেবেছেন যে, স্থানীয় ব্যবসায়ীর কালক্রমে শিল্পপতি হওয়ার প্রক্রিয়াটি কখনোই সম্পন্ন হবে না।[১৮] বাগচীর (১৯৭২) একটি মন্তব্য এ প্রেক্ষিতে স্মরণ করা যায়। তিনি লিখেছিলেন যে, বাঙালিরা 'শিল্পে প্রবেশ করে নি, কেননা তারা ব্যবসায়ে অধিকতর উৎসাহী ছিল' এ ধারার যুক্তি মূল সমস্যার সমাধান করে না। কেননা, 'বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্টদেরও ব্যবসায়ে বড় ধরনের স্বার্থ নিহিত ছিল।'[১৯] এই সাথে যোগ করা যায় যে, ফটকাবাজি মনোবৃত্তি স্থানীয়-অস্থানীয় অনেক ব্যবসায়ী গ্রুপের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। ১৮৬০-এর দশকে কলকাতার শেয়ারবাজারে চা-শিল্পকে ঘিরে ফটকাবাজির যে ধুম পড়েছিল তাতে মূলত অংশ নিয়েছিল ইউরোপীয় বণিকশ্রেণী।[২০] এ প্রসঙ্গে *Friend of India* লিখেছিল : 'গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, এমনকি যারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী বলে পরিচিত তাঁরা এই প্রতারণা হতে দিয়েছেন ও ফটকাবাজদের সমর্থন যুগিয়েছেন' (রুংটা ১৯৭০, ৯৯)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে যদি 'ফটকাবাজি মনোবৃত্তি' থেকে গিয়ে থাকে, তবে তা তৎকালীন সামগ্রিক পরিবেশ বা

১৭. M. Weber, *The Religion of India*, translated and edited by H.H Gerth and D. Martindale, (The Free press 1958), 123.

১৮. ঐ, 325.

১৯. Bagchi, *Private Investment*, 205.

২০ এ প্রেক্ষিতে একটি প্রাসঙ্গিক গবেষণাব মন্তব্য নিম্নরূপ :

লন্ডন এবং কলকাতার বাজারে একের পর এক কোম্পানি গজাতে লাগলো। বাস্তবে অস্তিত্ব নেই এমন চা-বাগানের জন্যও বিনিয়োগ করার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা হতে থাকলো। যখন শেয়ারবাজারে বিপর্যয় নামলো, তখন দেখা গেল, অনেক ইংরেজই (যাদেরকে উপরোক্ত চা-কোম্পানিগুলো পরিচালনা করতে পাঠানো হয়েছিল) মাঝপথে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, R. S. Rungta, *The Rise of Business Corporations in India, 1851-1900*, (Cambridge 1970), 98-99.

অবস্থার কারণেও উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে। সেরকম পরিবেশে বা অবস্থায় বৃটিশ ও মার্কিন ব্যবসায়ীরাও অনুরূপ আচরণ করতো না এমনটি নিশ্চিত করে বলা যায় না।

উপরের আলোচনা অনেকাংশেই অতি-সরলীকৃত। কিন্তু একথা পরিষ্কার যে, পূর্ব ভারতে স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশে মূল্যবোধের যে ভূমিকাই থাকুক, ঔপনিবেশিক আমলে সৃষ্ট সামাজিক কাঠামো থেকে পৃথক করে এই মূল্যবোধকে বোঝা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ 'হিন্দু মধ্যবিত্তের মূল্যবোধকেই' বিবেচনায় নেয়া যাক। এই বিশেষ মূল্যবোধকে আবশ্যিকভাবেই শিল্পোদ্যোগবিরোধী বলে অনেকেই বিচার করে থাকেন। এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতার বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দুরা ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চায় নি। পক্ষান্তরে উনিশ শতকের শেষদিকের কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত বাণিজ্যবহির্ভূত পেশাসমূহকেই শ্রেয়তর বলে জ্ঞান করতো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইতিহাসের কোন সময়পর্বের বিচারে বলা হচ্ছে তা নির্দিষ্ট ও বিশ্লেষণ না করে 'হিন্দু মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ' জাতীয় প্রত্যয়ের কথা তুলে বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশ-সমস্যাকে সম্যক উপলব্ধি করা যাবে না। মূল্যবোধকে গতিশীল নিক্তিতে বিচার করে দেখতে হবে কিভাবে এবং কোন নির্দিষ্ট সময়পর্বে বিশেষ ধরনের মূল্যবোধ জন্ম নিল এবং কিভাবে তা ঐ পর্বের বাঙালি সম্পদশালী শ্রেণীর বিনিয়োগসিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করলো।

এই অধ্যায়ের আলোচনার উপসংহারে বলতে হয় যে, উপরোক্ত মতসমূহের কোনটিই এলাকা, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় ও গ্রুপভেদে শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশে তারতম্যের একক ব্যাখ্যা হিসেবে গৃহীত হতে পারে না। কোন একটি মতই ইতিহাসের নানা পর্বে বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশে যেসব প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয় তাকে সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু উপরোক্ত অধিকাংশ মতই প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয়, যা কোন নির্দিষ্ট (একটি বা একাধিক) সময়পর্বে বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশের (বা তার অনগ্রসরতার) কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে হয়তো তুলে ধরতে সক্ষম। বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশের অভাব সম্পর্কে আলোচনায় ঔপনিবেশিক শোষণকেন্দ্রিক যুক্তি এবং মূল্যবোধকেন্দ্রিক যুক্তি কোনটিকে উপযুক্ত ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করা হবে তা নিয়ে বিতর্ক সম্ভবত তেমন লাভজনক হবে না। হেগেল যেমন মনে করতেন, দুই চরমপন্থী অবস্থানের মধ্যে প্রকৃত সমাধান নয়, প্রকৃত সমস্যা নিহিত। মনে হয়, এক্ষেত্রেও কোন একটি বিশেষ মতের অনুবর্তী না হয়ে বা কোন পূর্বনির্ধারিত ব্যাখ্যাকাঠামোকে কি করে বাংলার বাণিজ্য ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্য দিয়ে সপ্রমাণ করা যায় সে চেষ্টায় ব্যাপৃত না হয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন পর্বে বাঙালি পুঁজির পথপরিক্রমার ঐতিহাসিক যুক্তিপরম্পরাকে বোঝাই হবে অপেক্ষাকৃত ফলপ্রসূ দৃষ্টিভঙ্গি। এরকম একটি প্রয়াসই এ অধ্যায়ে নেয়া হয়েছে।

১.২ বাঙালি শিল্পোদ্যোগের প্রাথমিক পর্ব (১৮০০-১৮৫০)

১৮০০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে বাঙালি ব্যবসায়ীরাই ছিল বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অগ্রণী। শুধু অভ্যন্তরীণ নয়, বহির্বাণিজ্যেও তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। অনেকে ইউরোপীয় পুঁজির সঙ্গে যৌথ কারবারে নেমেছিল। এই নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে বাংলায় বৃটিশদের বাণিজ্যিক তৎপরতার পটভূমিতে। ক্লিং দেখিয়েছেন, ষোল শতকে বাংলায় বৃটিশদের বাণিজ্য শুরুর প্রাক্কালে "বাঙালি সাবেকি বণিক সম্প্রদায়কে হটিয়ে দিয়েছিল উত্তর ভারতীয়রা। তারা বাংলার রেশম ও সুতীবস্ত্রের লোভনীয় ব্যবসা বাঙালিদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। আঠারো শতকে বৃটিশরা বাংলার বাণিজ্য হস্তগত করেছিল বাঙালিদের কাছ থেকে নয়, বরং মাড়োয়ারি, পাঠান, কাশ্মীরী ও অন্যান্য বহিরাগতদের হাত থেকে।"[২১] সম্ভবত বৃটিশ পুঁজির এই বাণিজ্যদখলের ফলে সাবেকি বাঙালি বণিক সম্প্রদায় (যাদের মধ্যে দাদনি বণিকরা ও দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহ ছিল) নিতান্ত ক্ষুদে ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছিল। ডি. আর. গ্যাডগিলের বিবরণে এর সমর্থন পাওয়া যায়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের স্থানীয় বণিক সম্প্রদায়ের তুলনায় বাংলার বাঙালি বণিকদের অবস্থা ছিল 'অনেকটা অদ্ভুত', এখানেও 'অন্যান্য অঞ্চলের বানিয়াদের সমতুল্য ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষ বাঙালি বণিক সম্প্রদায় ছিল, যেমন সুবর্ণ বণিক। কিন্তু ১৭৫০ সালে বাংলার ব্যাঙ্কিং ও বাণিজ্যে এদের শক্তিশালী অবস্থান চোখে পড়ে না। ১৭৫০ সালে বাংলার সামগ্রিক পরিস্থিতি ততোদিনে অংশত হলেও বৃটিশ ও ইউরোপীয়দের আগমনের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছে।[২২] সুবর্ণ বণিক, তেলী প্রভৃতি ঐতিহ্যগত বণিক সম্প্রদায় বাংলার নিম্ন-সামাজিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত। ফলে এদের ক্রমঅধঃপতন বাংলার উচ্চবর্ণের সমাজে কোনো উদ্বেগের সঞ্চার করে নি। বৃটিশ পুঁজি কেবল উত্তর ভারতীয় ও সাবেকি বাঙালি বণিকদের বিতাড়িতই করে নি, তাদের স্থলে কলকাতায় গড়ে তুলেছিল এক নতুন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। এই নতুন ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই এসেছে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণ থেকে। বাণিজ্যে এদের 'আগে কোনো অবস্থান ছিল না' এবং এরা প্রবেশ করেছে 'বৃটিশ বানিয়াদের সহকারী ও এজেন্টরূপে।'[২৩] এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, বাংলায় বৃটিশ পুঁজির সঙ্গে কেবল বাণিজ্যিক পূর্বঅভিজ্ঞতাহীন বাঙালিদেরই সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ক্লিং-এর বিবরণ (১৯৭৫) থেকে জানা যায় যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিনিয়োগ-এজেন্টদের মধ্যে শেঠ, বসাক, বণিক প্রভৃতি নিম্নবর্ণীয় সম্প্রদায়ের লোকও ছিল। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেছেন, সতেরো শতকের শেষাংশে

২১. Kling, "Economic Foundations", 27.

২২. Gadgil, *Origins*, 18

২৩. ঐ।

কলকাতা পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশরা কিছু শেঠ ও বসাক পল্লী বানিয়েছিল। বাঙালি নিম্নবর্ণের তাঁতীরা ষোল শতকে পর্তুগীজদের সঙ্গে কারবার করতে গিয়ে বয়নের সঙ্গে বাণিজ্যও শিখেছিল। বৃটিশ শাসনের প্রথমদিকে কোম্পানির এজেন্ট, দালাল ও বানিয়া হয়ে অনেক শেঠ ও বসাক বিপুল ভাগ্য গড়েছিল। তবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতার বড় ব্যবসায়ীদের তালিকায় যাদের দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই ছিল উচ্চবর্ণের। এতে বোঝা যায় যে, কোম্পানির মধ্যস্বত্বভোগী ও বৃটিশ বেসরকারি বাণিজ্যের এজেন্ট হিসেবে পরে এসেও ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পেশাজীবী ও প্রশাসনিক কর্মচারীরা আঠারো শতকের শেষভাগে বাংলায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়ে উঠে।

এই নতুন ধনাঢ্য বণিক শ্রেণী ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারিপ্রথা প্রবর্তনের পরে তাদের ধনসম্পদের একটা অংশ ভূসম্পত্তিতে নিয়োজিত করে। এর পরবর্তী সময়ে যা ঘটে তাকে বলা যায় 'পুঁজির কৃষিকরণের' প্রথম ঢেউ। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, এর ফলে আধুনিক শিল্পোদ্যোগের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশ্য এটা ঠিক নয় যে, বাঙালির পুঁজি একমাত্র ভূমিক্রয়ে ব্যয়িত হয়েছে। লক্ষণীয়ভাবে কলকাতার এই নতুন বাঙালি এলিট প্রথাগত মন্দির ও ঘাট নির্মাণ ছাড়াও নতুন নতুন বাড়ি তৈরি করে আমদানিকৃত পশ্চিমা পণ্য তা সাজিয়েছে। ভারতের উত্তরাঞ্চলের বানিয়ারা এমনটা করে নি। তবে বাঙালি ধনিক শ্রেণী বিলাসী জীবনযাপন সত্ত্বেও উৎপাদনে বিনিয়োগ থেকে বিরত ছিল না। এমনকি তারা বাণিজ্য, জাহাজ মেরামত, গুদামজাতকরণ, স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যাঙ্কিং-এ বৃটিশ পুঁজির সঙ্গে যৌথ কারবারও গড়ে তুলেছিল। ব্লায়ার বি. ক্লিং-এর বিবরণে দেখা যায় যে, ১৮৩৪ সালের পরে বৃটিশ ও বাঙালি ব্যবসায়ীরা যৌথভাবে বাষ্পচালিত মালবাহী জাহাজ, কয়লাখনি, নীলশিল্প, চা-বাগান, বাষ্পচালিত নৌকা ও রেলপথনির্মাণ প্রকল্পে পুঁজি খাটিয়েছে। বাঙালি বানিয়ারা তাদের সমৃদ্ধির যুগে কলকাতার 'বাণিজ্যিক অবকাঠামো' স্বরূপ একটি 'বণিক সমিতি' ও 'বাণিজ্যিক সংবাদপত্র'ও গড়ে তুলেছিল। এক কথায়, আইনানুগ যৌথ কারবারে তাদের সাফল্য তখন ইউরোপীয় মানের তুলনায় কম ছিল না।

আগেই বলা হয়েছে যে, কলকাতার বাঙালি বণিকরা তাদের কারবার শুরু করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে। তারা বৃটিশ বেসরকারি পুঁজিরও উল্লেখযোগ্য মধ্যস্বত্বভোগী ছিল। আঠারো শতকে বাঙালি বণিকদের কদর ছিল অভ্যন্তরীণ বাজার ও সরবরাহের উৎস সম্পর্কে খোঁজ-খবর জানার জন্য। স্থানীয় বাজার সম্পর্কে বৃটিশদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই মধ্যবর্তীদের দাম কমে যায়। বাঙালি বণিকদের প্রকৃত বিকাশ শুরু হয় ১৮১৩ সালের মুক্ত বাণিজ্য সনদ গৃহীত হওয়ার পরে।

এসময় 'বৃটেন থেকে যে নতুন ভাগ্যান্বেষীরা অল্প পুঁজি নিয়ে এসেছিল' তারা "পুঁজির জন্য"[২৪] স্থানীয় বণিকদের দ্বারস্থ হয়। প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে ধারণা করা যায় যে, আন্তর্জাতিক রপ্তানিবাণিজ্যে নিয়োজিত কলকাতার এজেন্সি হাউজগুলোকে যেসব ব্যাঙ্কিং কোম্পানি টাকা দিত, সেগুলোতেই প্রধানত বাঙালিদের পুঁজি বিনিয়োজিত হয়েছিল। রুংটা মন্তব্য করেছেন যে, বাঙালি বণিক শ্রেণীর 'পুঁজি ও উদ্যোগ' ছাড়া ঐ সময় বাংলায় একটিও উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্কিং কোম্পানি গড়ে উঠে নি।[২৫] দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রধানত অবাঙালি ও বৃটিশ পুঁজির যৌথ উদ্যোগে গঠিত কয়েকটি ব্যাঙ্কের উদ্যোক্তা-পরিচালকদের তালিকায় বাঙালির নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল—মহারাজা সুখময়; ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক—দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্রমথনাথ দে (হাজি মোহাম্মদ ইস্পাহানীসহ); ঢাকা ব্যাঙ্ক—খাজা আলিমুল্লাহ, বাবু নন্দলাল দত্ত, কাজী আবদুল গনি; বেনারস ব্যাঙ্ক–বাবু হরি চন্দ; আগ্রা সেভিংস ফান্ড—পীতাম্বর দত্ত।[২৬]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় বাঙালি বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রুপ ছিল নিঃসন্দেহে ঠাকুর পরিবার। দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এই গ্রুপের নেতৃপুরুষ এবং তৎকালের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্ট জমিদারগোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন। প্রথমদিকে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লবণ ও আফিম বিভাগে প্রধান দীউয়ান হিসেবে কাজ করেন। পরে তিনি নীল কারখানা স্থাপন করেন, চিনি উৎপাদন করেন এবং বিখ্যাত 'কার, ঠাকুর এন্ড কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যেসব প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ও অংশীদার ছিলেন, সেগুলো হচ্ছে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক (১৮২৯), দি স্টিম টাগ এসোসিয়েশন (১৮৩৭), দি বেঙ্গল টি এসোসিয়েশন (১৮৩৯), দি বেঙ্গল কোল কোম্পানি (১৮৪৩) ও দি ইন্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি (১৮৪৪)। ১৯৪৫ সালে এইসব কোম্পানির সম্মিলিত পুঁজির পরিমাণ বহু লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি গঠিত হওয়ার আগে তিনি কলকাতা-রানীগঞ্জ রেলপথ নির্মাণে এক-তৃতীয়াংশ পুঁজি যোগান দিতে চেয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, দ্বারকানাথের প্রায় সব কোম্পানিই স্থানীয় ইউরোপীয় পুঁজির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে অস্বাভাবিকতা কিছুই ছিল না, কারণ উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে কলকাতার বাঙালি এলিটরা নিজেদেরকে শিল্প-বাণিজ্যে বৃটিশের অংশীদার বলেই ভাবতো। এখানে বরং বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, তখনকার

---

২৪. Kling, "Economic Foundation", 29
২৫. Rungta, *Rise of Business Corporations*, 19.
২৬. ঐ।

অগ্রণী বাঙালি উদ্যোক্তারা রাজধানীর বৃটিশ 'স্বাধীন ব্যবসায়ীদের' সঙ্গেই নিজেদের জড়িত করেছিলেন এবং সম্মিলিতভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির বিরোধিতা করেছিলেন। দ্বারকানাথ রপ্তানিমুখী খাতগুলোর বিকাশ এবং বিশ্ববাজারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কামনা করতেন। তিনি চাইতেন যে, এতে বৃটিশ পুঁজি, প্রযুক্তি ও দক্ষতা বাংলায় আসবে এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে শিক্ষিত, সংস্কারকামী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হবে।[২৭]

ঠাকুর পরিবার ছাড়া কলকাতায় ঐ সময়ে প্রভাবশালী বাঙালি বণিক পরিবার আরো ছিল, যেমন রামদুলাল দে, দিগম্বর মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী। মুখার্জি অন্তত 'পাঁচটি বড় দল' সনাক্ত করেছেন, যারা কলকাতায় উচ্চ মর্যাদা অর্জন ও সহায়-সম্পদ নিয়ন্ত্রণের তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল।[২৮] এঁরা হলেন ঠাকুর পরিবার, রাধাকান্ত দেব, আশুতোষ দে, বিশ্বনাথ মতিলাল ও কালীনাথ মুন্সি। আরো কিছু ছোট দল ছিল শিবনারায়ণ ঘোষ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পরিবার, পাথুরিয়াঘাটা ও চোরবাগানের (যা ছিল সুবর্ণ বণিকদের এলাকা) মল্লিক পরিবার, নীলকমল ব্যানার্জি প্রমুখের নেতৃত্বে। এসব দল সৃষ্টির মূলে ছিল এক নব্য ধনিকগোষ্ঠীর উদ্ভব, যাদের ধনাগম ঘটেছিল অংশত জমি এবং তার সঙ্গে

২৭. আঠারো শতকের বিশ ও তিরিশের দশকে পুঁজির চাহিদা দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। ইউরোপীয় পরিচালনাধীন কলকাতাকেন্দ্রিক এজেন্সি হাউজের সংখ্যাবৃদ্ধি থেকে এই চাহিদাবৃদ্ধি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। ১৮১০ সালে এরকম এজেন্সির সংখ্যা ছিল ১৫টি; ১৮২৮ সালে ২৭টি, ১৮৩৫ সালে ৬১টি, ১৮৪৬ সালে ৯৩টি। অবশ্য এসব এজেন্সির হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র ছিল বড় আকারের প্রতিষ্ঠান; অধিকাংশের কর্মকাণ্ডই ছিল সীমিত পরিসরের এবং পুঁজি ছিল স্বল্প (Kling 1975, 29)। Buchanan (1966), ও ইঙ্গিত করেছেন যে, ইউরোপীয় 'free merchants'রা যখন ভারতের মাটিতে পা দেয়, তখন তাদের ছিল সামান্যই পুঁজি। নীলচাষের কুঠিয়ালদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'কুঠিয়ালরা কদাচিৎ ইউরোপ থেকে পুঁজি নিয়ে আসতো। ১৮৩০ সালের আগে কেউই পুঁজি নিয়ে আসে নি। পরিবর্তে ভারতীয়দের, কোম্পানির ইউরোপীয় কর্মচারী অথবা কলকাতার এজেন্সি হাউজের কাছ থেকে এরা পুঁজি সংগ্রহ করতো' (৩৭)। এটা বোঝা শক্ত দ্বারকানাথ যখন 'মুক্ত-বাণিজ্য সাম্রাজ্যবাদের' পক্ষে ওকালতি করেছিলেন, তখন তিনি এর সম্যক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কিনা। এই মুক্ত-বাণিজ্য সাম্রাজ্যবাদই ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের অবরুদ্ধ শিল্পবিকাশের জন্য দায়ী। এ কথা ভাবা ভুল হবে যে, দ্বারকানাথ ও রামমোহন বৃটিশ শাসনের ত্রুটিসমূহ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। কিন্তু সম্ভবত আধুনিকীকরণের দায়দায়িত্ব নেয়া এলিটের অংশ হিসেবে তারা মনে করেছিলেন যে, ভারতের জন্য উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত ছক হবে সহযোগিতা ও সংঘাতের একটি ছক। একে স্থানীয় এলিট গোষ্ঠীর 'আধুনিকীকরণ প্রকল্প'ও বলা যেতে পারে, যে প্রকল্পের মোদ্দা কথা ছিল বৃটিশ পুঁজির সাথে সমান শর্তে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কে অংশ নেয়া।

২৮. S.N. Mukherjee, "Daladali in Calcutta in the Nineteenth Century", *Modern Asian Studies*, 9·1 (1975), 71.

বাণিজ্য ও ইউরোপীয়দের সঙ্গে যৌথ কারবার থেকে। এদের অবস্থান ছিল সাবেকি সামন্ত অভিজাত শ্রেণী ও কলকাতার ইউরোপীয় সমাজের মাঝামাঝি।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশের একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক ছিল আধুনিক শক্তিচালিত স্থায়ী কারখানা স্থাপনে অংশগ্রহণ। এরা পুঁজির জন্য রপ্তানিশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতো। এসব লক্ষণ বিবেচনায় ক্লিং মন্তব্য করেছেন যে, ১৮৪০ সালে কলকাতা 'একটা ছোট আকারের শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে' ছিল।[২৯] ১৮৪৪ সালে জে. এইচ. স্টককুয়েলার নামে একজন সাংবাদিক লিখেছেন, "কলকাতায় প্রবেশ করতে নদীর দুই ধারে চতুর্দিকেই চোখে পড়ে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ধোঁয়াউঠা চিমনি, অসংখ্য কারখানার সমাবেশ, আর এগুলো নিয়েই বহু বৃটিশ শহরের প্রতিদ্বন্দ্বী কলকাতা।"[৩০] ঐ সময় বৃটেনের সব ক'টি উপনিবেশের মধ্যে বাংলা ছিল বাষ্পশক্তির ব্যবহারে সবচেয়ে এগিয়ে। নদী ও সমুদ্রগামী স্টিমার, মালবাহী জাহাজ, চিনি শোধনাগার, জাহাজ মেরামতি, কয়লাখনি, আটা ও চাউলকল, রেশমশিল্প ও কাগজকলে এবং সুতাকাটা, বয়ন ও সুতীবস্ত্র রং করা প্রভৃতি কাজে বাষ্পীয় ইঞ্জিন ব্যবহৃত হতো এবং 'সবই ছিল কলকাতার আশেপাশে।'[৩১] উনিশ শতকের অর্ধেক অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই কলকাতার উত্তরে হুগলী নদীর ধার ধরে হুগলী, হাওড়া, শিবপুর ও সুলকিয়ার শহরতলীতে কারখানার বিস্তার ঘটে। এসব এলাকায় গড়ে উঠে চিনিকল, রাম ডিস্টিলারি, সুতার টাকু তৈরির কারখানা, বিস্কুট ফ্যাক্টরি, চালকল, সরিষা ভাঙার কল, বাষ্পশক্তিচালিত লোহাঢালাই কারখানা, কাগজকল প্রভৃতি।

১.৩ ১৮৪৭ সালের ধ্বস এবং বাঙালি উদ্যোক্তা শ্রেণীর সঙ্কট

বাঙালি উচ্চবর্ণের বণিকদের এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। এই শ্রেণীর বিলুপ্তির কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। সম্ভবত এদের অভাবিতপূর্ব পতনের একাধিক কারণ একত্রে দেখা দিয়েছিল। প্রথম কারণ হলো ১৮৪৭ সালের একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সঙ্কট, যার ধাক্কায় রপ্তানি প্রতিষ্ঠানগুলো ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ধ্বসে পড়েছিল। এসব কোম্পানির দায় সীমাবদ্ধ ছিল না (সীমাবদ্ধ দায়ভিত্তিক কোম্পানি আইন প্রবর্তিত হয় ১৮৫০-এর দশকে)। সঙ্কটটা শুরু হয়েছিল বৃটেনে রেলপথ নির্মাণের হিড়িক পড়ার এবং রেলশেয়ারের আকস্মিক পতনের ফলে। এতে বিশ্বব্যাপী সকল উপনিবেশ থেকে পণ্যপরিবাহী

---

২৯. Kling, "Economic Foundations", 29.

৩০. ঐ।

৩১. Buchanan, *Capitalistic Enterprise*, 127-28.

জাহাজকোম্পানিগুলো দেউলিয়া হয়ে পড়ে। কলকাতার বাণিজ্যিক এজেন্টদের অধিকাংশই নীলচাষের উপর নির্ভর করে তাদের পুঁজি খাটিয়েছিল, ফলে তাদের সর্বাধিক ক্ষতি হয়। গত শতকের মধ্য-চল্লিশের দশকের বাণিজ্যসঙ্কট বৃটিশ ও স্থানীয় উভয় পুঁজিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন দেখা দেয়, বাঙালি বণিক শ্রেণীর ধ্বংস এতটা ব্যাপক হয়েছিল কেন যার ফলে সকল বাঙালির 'বাণিজ্যিক উদ্যম' প্রায় উবে গেল ? ঐতিহাসিক তথ্যাদি থেকে জোর দিয়েই বলা যায় যে, প্রথমদিকের বাঙালি প্রতিষ্ঠানগুলোর সামাজিক ভিত্তি ছিল সঙ্কীর্ণ। অনেকটা এ কারণে ১৮৪০-এর দশকের আকস্মিক পতন অনেক পর্যবেক্ষকের কাছে বাঙালি ধনিক শ্রেণীর 'বাণিজ্যিক উদ্যমের' অবসানের করুণ যুগের সূচনা বলে মনে হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি বণিকদের সঙ্কীর্ণ সামাজিক ভিত্তির কারণ একাধিক এবং এ বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে সর্বাগ্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো আঠারো শতকের শেষার্ধে দাদনি বণিকদের প্রায় যুগব্যাপী ক্রমপতন। দাদনি বণিকরা গোমস্তাদের মতো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেতনভোগী চাকুরে ছিল না। এরা ছিল স্থানীয় স্বাধীন ব্যবসায়ী। চুক্তিভিত্তিতে কোম্পানির কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে এরা ব্যবসা করতো, তবে লাভ-লোকসানের দায় ছিল সম্পূর্ণ নিজেদের। চুক্তিভিত্তিক বাণিজ্যে কোম্পানির সঙ্গে উৎপাদকদের কোনো সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল না। দাদনি বণিকরা প্রাথমিক ধনতন্ত্রের সনাতনী 'পুটিং আউট মারচেন্ট'দের ভূমিকা পালন করতো। এরকম চুক্তিপদ্ধতি শুরু হয়েছিল সতেরো শতকে এবং আঠারো শতকের প্রথমার্ধে। কোম্পানির বাণিজ্যে তা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তবে ১৭৫০ সালের আগেই এই পদ্ধতির উপর আঘাত আসে এবং ১৭৫৩ সালে কোম্পানি তা পরিত্যাগ করে। তখন থেকে পণ্যসংগ্রহের জন্য কোম্পানি 'এজেন্সিপ্রথা' গ্রহণ করে।'[৩২] এটা কোম্পানির বেতনভোগী কর্মচারীদের দ্বারাই পরিচালিত হতো, বিশেষত গোমস্তাদের দ্বারা। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে 'দালাল' বা 'পাইকার' বলে অভিহিত মধ্যস্বত্বভোগীদের কাজে লাগানো হতো। এজেন্সিপ্রথা প্রবর্তনের ফলে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যে কোম্পানির মনোপলি কায়েম হয়। ফলে স্থানীয় উৎপাদকরা কোম্পানির গোমস্তাদের উৎপীড়নের শিকার হয়। বিশেষত ১৭৫৭ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরে কোম্পানির ক্ষমতা ও প্রভাব প্রচুর বৃদ্ধি পাওয়ায় গোমস্তারা উৎপাদকদের উপর একতরফা কঠিন কঠিন শর্ত আরোপ করতে থাকে। গোমস্তাদের পিছনে ছিল রেসিডেন্ট ও কোম্পানির অন্যান্য জুনিয়র অফিসার।

পুরনো 'চুক্তিপদ্ধতি'র পরিবর্তে পুরোপুরি 'এজেন্সিপ্রথা' প্রবর্তন বাঙালি ব্যবসায়ী শ্রেণীর বিকাশকে দারুণ প্রভাবিত করে। স্বাধীনচেতা দাদনি ব্যবসায়ীরা ক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বিতাড়িত হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোম্পানির চাকুরি নিলেও অধিকাংশই ব্যবসা ত্যাগ করে। ফলে আঠারো শতক শেষ হওয়ার আগেই গোমস্তারা বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রধান চরিত্ররূপে আবির্ভূত হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সরাসরি পূর্বসূরি হলো এই গোমস্তাকুল। বাণিজ্য থেকে বিতাড়িত দাদনি ব্যবসায়ীদের পরিণতি কি হয়েছিল সে সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। বিষয়টা গবেষণাসাপেক্ষ। তবে নিঃসন্দেহে দাদনিদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ খুব সহজে ঘটে নি। কোম্পানি আমলে মুর্শিদাবাদের রেশমশিল্প সম্পর্কে কে. এম. মহসীনের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ১৭৭১ সাল পর্যন্ত দাদনি ব্যবসায়ীরা তাদের হৃত অবস্থা ফিরে পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করেছে। কোম্পানির অনেক কর্মকর্তা বুঝতে পারেন যে, এজেন্সিপ্রথা দুর্নীতি ও অসৎ কারবারের জন্ম দিয়েছে। ফলে অন্তত রেশমি কাপড় ক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তিপদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তনের বিষয় কোম্পানি বিবেচনা করেছিল। এই সুযোগে দাদনি ব্যবসায়ীরা তাদের হৃত অবস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য কোম্পানির কাছে বেশ কিছু দাবি জানায়। সবচেয়ে জোরালো দাবিটি ছিল, 'কোম্পানির নিযুক্ত সকল গোমস্তাকে প্রত্যাহার করতে হবে।' তারা কোম্পানির একতরফা মূল্য নির্ধারণের অবসান দাবি করে। তাদের আরো দাবি ছিল, চুক্তিতে বর্ণিত মানের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানের কাপড় দিলে বোনাস দিতে হবে এবং তার চেয়ে নিম্নমানের কাপড় দিলে ব্যবসায়ীরা কোম্পানিকে আনুপাতিক মূল্য ফেরত দেবে। রেশমি কাপড়ের ব্যবসায়ে প্রধান প্রধান দাদনি ব্যবসায়ী ছিল বাঙালি এবং এদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই উচ্চবর্ণের। কৃষ্ণ শর্মা, নন্দলাল শর্মা, কৃষ্ণ চন্দ্র, বৈদ্যনাথ, ইন্দ্রনারায়ণ দত্ত, রামকৃষ্ণ দাস, জগৎ কুণ্ড, কৃষ্ণকান্ত, রাধা মাধব, জগন্নাথ দাস, গৌর চৌধুরী প্রভৃতি নামের তালিকা থেকে বিষয়টা স্পষ্ট হয়। কোম্পানির 'ক্যালকাটা কাউন্সিল' সঙ্গে সঙ্গেই এদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং ১৭৭৬ সালে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী (কোর্ট অব ডিরেক্টরস) সংস্কারকে কেবল এই বলে সমর্থন করে যে, "কোম্পানিকে পণ্য সরবরাহ করার মতো যোগ্য কোনো 'দেশী' ব্যবসায়ী নেই।"[৩৩] শিল্প ও বাণিজ্যে স্বাধীনচেতা দাদনি ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের ফলে বাঙালি উদ্যোক্তা শ্রেণীর সামাজিক ভিত্তি বহুলাংশে দুর্বল হয়ে যায়। এর পরে পরেই ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্ব ভারতের কয়েকজন বড় বণিকের পতন ঘটায়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মালিকানাধীন (যেমন সুবর্ণ বণিক) দেশজ ব্যাঙ্কিং হাউজগুলোর ক্রমাবনতির পাশাপাশি ১৮০৯ সালে

৩৩. প্রাগুক্ত

ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল গঠন কলকাতার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সামাজিক ভিত্তি আরও দুর্বল করে দেয়। ব্যবসার বিভিন্ন চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠিত ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে বৃটিশ উদ্যোক্তারা যতোই অর্থনীতির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করে, ততোই বাঙালি ব্যবসায়ীদের স্বাধীনচেতা অংশটি কোম্পানির পোষা বানিয়াদের হাতে তাদের অবস্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় এক নির্মম অসম প্রতিযোগিতা ও শাসকদের তীব্র চাপের মধ্য দিয়ে। দাদনি ব্যবসায়ী ও দেশজ ব্যাঙ্কারদের ক্রমঅবলুপ্তির ফলে সামাজিক ক্ষতি ছিল বিরাট, যা কোম্পানির পোষ্য বানিয়াদের থেকে উদ্ভূত বিখ্যাত কলকাতা বণিকগোষ্ঠীর সাফল্য দিয়েও কখনো পূরণ হয় নি। এজেন্সি হাউজ উদ্যোক্তাদের নবোদ্ভূত শ্রেণীটি আগাগোড়াই সঙ্কীর্ণ সামাজিক ভিত্তিজনিত দুর্বলতায় ভুগেছে। কোম্পানি শাসনের কারণে বাঙালি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিপুল অংশ পেশাচ্যুত হয়ে পড়েছিল। এজেন্সি হাউজগুলো ছিল এই স্বাধীন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন। লন্ডন শেয়ারবাজারের পতনের ধাক্কায় এই হাউজগুলোই শুধু দেউলিয়া হয় নি, গোটা বঙ্গীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ড নুয়ে পড়ে। মধ্য উনিশ শতকের ঐ ধ্বসের পরবর্তী কাহিনী সম্পূর্ণ ভিন্নতর। ক্লিং তা বর্ণনা করেছেন এভাবে : "(লন্ডন) ধ্বসের পরে ব্যবসায়ীরা তাদের ভাগ্যবিপর্যয়কে মেনে নিল এবং কলকাতা হয়ে দাঁড়ালো বিশুদ্ধ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় একটি পরগাছা নগরী, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রজননভূমির পরিবর্তে ঔপনিবেশিক শোষণের স্নায়ুকেন্দ্র।"[৩৪]

১.৪ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির শিল্প-বাণিজ্যউদ্যোগ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির পুঁজি প্রধানত জমি ও অবাণিজ্যিক খাতে বিনিয়োজিত হয়। বিনিয়োগচরিত্রের এই পরিবর্তন শিল্প-বাণিজ্যউদ্যোগের বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। ১৮৫০-এর পরবর্তী তিন দশকে বাংলায় একদিকে ছোট ছোট জমিদার ও অন্যদিকে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি (হিন্দু) 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী'র উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। এর একাধিক কারণ আছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝিতেই সরকারকে দেয় রাজস্ব (১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তানুযায়ী) ও প্রকৃত কৃষকদের কাছ থেকে আদায়কৃত খাজনার মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়।"[৩৫] ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন 'দখলিস্বত্বের' সঙ্গে প্রকৃত চাষাবাদকে যুক্ত করে নি। বিপরীতে ঐ আইনের ফলে এমন একটি রাজনৈতিক-আইনগত কাঠামো গড়ে উঠেছিল যার ফলে 'দখলি রায়ত'দের মধ্যে অকৃষক লীজপ্রাপ্তদের সংখ্যা অনেক

৩৪. Kling, "Ecnomic Foundations", 37-38.

৩৫. বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, S. Islam, *Rent and Raiyat*, (Dhaka 1987).

বেশি হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে বাংলার কৃষিঅর্থনীতিতে 'বিরাট এক খাজনাভোগী স্বার্থের কাঠামো' গড়ে উঠতে দেখা যায়।[৩৬] এভাবে ছোট আকারের ভূসম্পত্তির মালিক খাজনাভোগী একটি শ্রেণীর ব্যাপক ভিত্তিক প্রসারের পাশাপাশি ক্রমে গড়ে উঠে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি (হিন্দু) 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী', যারা অবাণিজ্যিক পেশাগুলোতে নিয়োজিত হয়। কোম্পানিশাসনের শেষদিকে ঔপনিবেশিক প্রশাসনযন্ত্রের আরো বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কারণে এ ধরনের পেশায় পদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। এই নতুন অবাণিজ্যিক পেশার সুযোগবৃদ্ধির ফলে ছোট তালুকের মালিক খাজনাভোগী শ্রেণীই (ক্ষুদে ভূস্বামী ও জমিদার) সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়। চাকুরিতে প্রবেশের একমাত্র উপায় ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষা ঐ একই গোষ্ঠীর করায়ত্ত থাকে, যারা ক্রমে বাঙালি ভদ্রলোক বলে পরিচিত একটি মর্যাদাবান গোষ্ঠী হিসেবে দেখা দেয়। একদিকে অকৃষক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে ভূসম্পত্তির মালিকানা চলে আসা এবং অন্যদিকে তাদেরই চাকুরিপেশায় প্রবেশ বাঙালি পুঁজির স্থানান্তরে বিরাট ভূমিকা রাখে। একই ব্যক্তিকে খাজনাভোগী জমিদার ও চাকুরিজীবী উভয় ভূমিকায় দেখা যায় যদিও কোন্ উৎস থেকে আয় বেশি বা কম আসছে তা নির্ভর করে ব্যক্তি বা পরিবারটি নগরকেন্দ্রের না মফস্বলের, ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উচ্চস্তরের না নিম্নস্তরের তার উপর। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা বড় অংশের, বিশেষত মফস্বলের চাকুরিজীবীদের আয়ের প্রধানতম উৎস ছিল জমির খাজনা। পক্ষান্তরে বেশ কিছু ছোট জমিদার খাজনার অর্থ দিয়ে সংসারও ভালভাবে চালাতে পারতো না।

ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন পরিস্থিতি মধ্যবিত্তের ঐ জমি-চাকুরি সংযোগটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল। রেল ও জাহাজ চলাচলের উন্নতির ফলে যোগাযোগব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং 'মুদ্রা অর্থনীতি' (Money Economy) দুঃখজনকভাবে শিল্পের কদর না বাড়িয়ে বরং জমির দাম বাড়িয়ে দিয়ে জমিতে বিনিয়োগ খুবই আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। বাঙালি পেশাজীবী ও কর্মচারীদের বেতনের উদ্বৃত্ত টাকা প্রধানত জমিতে বিনিয়োজিত হতে থাকে। বাঙালি বিত্তবান শ্রেণীর অবাণিজ্যিক মনোবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায় রেলপথ নির্মাণের প্রথম পর্বে (১৮৪০-৫০), পুঁজি সংগ্রহের জন্য ছাড়া রেলশেয়ার ক্রয়ে তাদের অনীহা থেকে।[৩৭]

---

৩৬. S Islam, *Bengal Land Tenure: The Origin and Growth of Intermediate Interests*, (Calcutta 1986), Chapters 2 and 3.

৩৭. ১৮৫৪ সালের ৩০মে'র একটি চিঠিতে লর্ড ডালহৌসি স্যার চার্লস উডকে লিখছেন : 'স্থানীয় পুঁজিপতিরা রেলওয়ের কোন শেয়ার কিনবে না। সুতরাং আপনার হিসেব থেকে তাদের বাদ রাখতে পারেন।' এই অবস্থায় ইংল্যান্ডের অধিবাসীদের থেকে পুঁজি সংগ্রহ করেই রেলওয়ে নির্মাণ করতে হয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে বলা দরকার যে, রেলওয়ের শেয়ারে পুঁজি বিনিয়োগে ইংল্যান্ডের বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা গিয়েছিল কেবলমাত্র রাষ্ট্র কর্তৃক ন্যূনতম ৪.৫ থেকে ৫ শতাংশ হারে লভ্যাংশ প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করার ফলেই। অন্তিম বিচারে অবশ্য ভারতীয় করদাতারাই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক উপরোক্ত লভ্যাংশ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল যুগিয়েছিল।

তবে ক্রমশ তারা বিনিয়োগের অভ্যাস গড়ে তোলে। অবশ্য তা সীমিত ছিল সরকারি বন্ড ও সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের মধ্যে। কেননা এতে সুদের হার আকর্ষণীয় ছিল। তাদের এই বিনিয়োগ প্রধানত জনসেবামূলক খাতের বিকাশে সাহায্য করেছিল। সরকার এ খাতেই অধিকাংশ সঞ্চয়পত্র ছাড়তো। বিভিন্ন সময়ে বিত্তবানরা বেসরকারি কোম্পানিগুলোর বন্ড ও শেয়ারেও পুঁজি খাটায়। পাট, কয়লা ও চা-বাগান খাতে তৎপর এসব কোম্পানি তখন পর্যন্ত প্রায় একচেটিয়াভাবে ছিল বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউজসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন।

জমির মালিকানা, অবাণিজ্যিক পেশা, সরকারি ঋণ ও সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ ইত্যাদি খাতে বাঙালি পুঁজি স্থানান্তরের ক্রমবর্ধমান ঝোঁককে সহজাত উৎপাদনবিমুখ প্রবণতার নিদর্শন বলে গণ্য করা উচিত নয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৮২) পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, তথাকথিত বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণী পুরোপুরিভাবে ঔপনিবেশিকতা কর্তৃক আরোপিত পরিস্থিতির ফসল : জমি ভোগদখলের ব্যবস্থা এবং দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় প্রবেশের ব্যাপারকে নিরুৎসাহিতকরণ ও দেশজ প্রস্তুতকরণশিল্পের ধ্বংসসাধনের মাধ্যমে এমন এক মৌলিক প্রবেশের ব্যাপারকে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং দেশজ প্রস্তুতকরণশিল্পের ধ্বংসসাধনের মাধ্যমে এমন এক মৌলিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠে, যা থেকে জন্ম নেয় সামাজিক উৎপাদনপরিবেশ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতা এবং এ ব্যাপারে একেবারে আগ্রহহীন কমিশন আদায় ও ভোগকারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর এই শ্রেণী।"[৩৮] সে সময়ে পূর্ব ভারতে বিদ্যমান সার্বিক অর্থনৈতিক পরিবেশে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অবশ্য কিছু কিছু নিদর্শন থেকে দেখা যায় যে, বাঙালি উদ্যোক্তারা আধুনিক খাতসমূহেও প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। এ নিদর্শন অসম্পূর্ণ হলেও এ সময়ে বাঙালি শিল্পোদ্যোগে ঘাটতির সকল দায় বর্ণগত সঙ্কীর্ণতা বা 'মূল্যবোধের' উপর ঢালাওভাবে চাপিয়ে যে প্রচলিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তা সংশোধনের জন্য এটা যথেষ্ট।

কয়লাশিল্পে বিদেশী পুঁজির প্রাধান্য থাকলেও এই খাতে বাঙালি পুঁজির উপস্থিতি একেবারে অনুল্লেখযোগ্য ছিল না। এস. কে. সেনের বিবরণ (১৯৮১) থেকে দেখা যায় যে, "বস্তুত গোটা কয়লাশিল্প বাঙালি পুঁজি বিনিয়োগের অনুকূল ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল" (পৃঃ ৭০)। ১৮৯৭ সালে বর্ধমান বিভাগে ভারতীয় মালিকানায় ৪০টির মতো কয়লাখনি ছিল। এর মধ্যে অবাঙালিরা যুক্ত ছিল মাত্র দু'টির সঙ্গে। এসব খনির অধিকাংশই ছিল ছোট এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন। তবে কমপক্ষে ৪টি বাঙালি কোম্পানি আর. এল. দত্ত এন্ড কোং, ভোলানাথ ধর এন্ড কোং, যজ্ঞেশ্বর রায় এন্ড কোং এবং নায়েক এন্ড কোং এখানে তৎপর ছিল। অনুরূপভাবে ১৮৯০-এর দশকের শেষ নাগাদ ছোট নাগপুরের মানভূম

৩৮. P. Chatterjee, "Agrarian Structure in Pre-partition Bengal", in *Perspectives in Social Sciences, 2: Three Studies in the Agrarian Structure in Bengal,* (Calcutta 1982), 121-122.

জেলায় বাঙালি মালিকানাধীন ৬২টির মতো খনি ছিল (প্রাগুক্ত)। বাঙালি কয়লাখনিমালিকদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন এ. সি. লায়েক এবং এন. সি. সরকার। যাদব ব্যানার্জির সাথে মিলে এ. সি. লায়েক ঝারিয়ায় সর্বপ্রথম কয়লাখনি চালানোর উদ্যোগ নেন। এন. সি. সরকার তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন বেঙ্গল কোল কোম্পানিতে (একটি বৃটিশ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান) কেরানি হিসেবে। তিনি চারটি কয়লাখনি কিনেন। পরবর্তী বছরগুলোতে এন. সি. সরকার এন্ড সন্স ম্যানেজিং এজেন্ট হিসেবে ৮টি কয়লাকোম্পানির নিয়ন্ত্রণভার লাভ করে এবং আধুনিক ধারার অন্যান্য শিল্পখাতেও প্রভাববিস্তার করে (ইটখোলা, চুনা ও সিমেন্ট কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি)। অবশ্য এ কথা মনে রাখতে হবে যে এসমস্ত কয়লাখনির জন্য বিপুল পুঁজির প্রয়োজন ছিল না। বাঙালি পুঁজির মালিকানাধীন অধিকাংশ খনি ছিল পিট কয়লার ছোট খনি। সবচেয়ে ভাল কয়লাখনিগুলো নিয়ন্ত্রণ করতো বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউজগুলো।

এই সময়ে চা-বাগান খাতেও বাঙালি পুঁজির বিনিয়োগ ঘটেছিল। জলপাইগুড়ি জেলায় ১১টি চা-কোম্পানির অধিকাংশই ছিল বাঙালি মালিকানায়। অধিকাংশ বাঙালি উদ্যোক্তা ছিলেন শহুরে 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর', যেমন আইনজীবী জয় চন্দ্র সান্যাল ছিলেন ১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত জলপাইগুড়ি টি কোম্পানির উদ্যোক্তা-পরিচালক। চায়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন গোপাল ঘোষ (তিনি সরকারি অফিসে কেরানি হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরে ৬টি চা-কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন), তারিনি প্রসাদ রায় (তিনি ১৮৮৯ সালে আঞ্জুমান টি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন এবং পর্যায়ক্রমে ১৬টি কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হন), প্রসন্ন দেব রায়কত (বিশিষ্ট জমিদার এবং একাধিক চা-কোম্পানির উদ্যোক্তা) প্রভৃতি। একাধিক কারণ এই খাতে বাঙালি পুঁজি প্রবেশের সুযোগ এনে দিয়েছিল। খাস জমিতে চাষ হতো, যা নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করা যেতো। এছাড়াও চা-বাগান চালু করতে বড় ধরনের পুঁজি লাগতো না। উৎপাদনপ্রক্রিয়া ছিল সরল ও সস্তা এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ আদিবাসী শ্রমিকের কোনো ঘাটতি ছিল না।

অন্যান্য খাতে বাঙালি পুঁজি একেবারে অকিঞ্চিৎকর ছিল না। এগুলোর মধ্যে ছিল সাধারণভাবে অবাঙালিদের প্রাধান্যপুষ্ট পাট ও সুতীবস্ত্র শিল্প। এ ব্যাপারে কয়েকটি আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

কলকাতা থেকে হুগলী নদীর কয়েক মাইল উজানে রিষড়ায় ১৮৫৪ সালে ভারতের পাটকল স্থাপিত হয়। এই মিল প্রতিষ্ঠায় জর্জ অকল্যান্ডকে সাহায্য করেছিলেন বিশ্বম্ভর সেন; এই প্রথম উদ্যোগে তিনি আধাআধি অংশীদার না হলেও একজন গুরুত্বপূর্ণ শেয়ারহোল্ডার ছিলেন। সে সময়ে বওরিয়া কটন মিল ও ফোর্ট গ্লসটার জুট মিল নামে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মিল স্থাপনে বাঙালি পুঁজি জড়িত থাকার আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন শ্যাম রুংটা (১৯৮৫)। এই বিবরণে দেখা যায় যে, ১৮৭৩ সালের ৯ অক্টোবর বওরিয়া

কোম্পানির মোট ৯৯ জন শেয়ারহোল্ডার ছিলেন। এঁদের মধ্যে ৭ জন ছিলেন বাঙালি।[৩৯] এম.এন. দাস ছিলেন এই কোম্পানির একমাত্র সেলস এজেন্ট। বাঙালি শেয়ারহোল্ডারদের সংখ্যা ১৮৭৩ সালের ৭ জন থেকে বেড়ে ১৮৮০ সালে ৫১ এবং ১৮৯০ সালে ৫৩ জনে দাঁড়ায়। ফোর্ট গ্লসটার জুট ম্যানুফেকচারিং কোম্পানির প্রথম তালিকাতেও অনুরূপ চিত্র দেখা যায়। ১৮৭৪ সালে এর শেয়ারহোল্ডার ছিলেন ১১৯ জন। এঁদের মধ্যে ১৩ জন ছিলেন বাঙালি।[৪০] ফোর্ট গ্লসটার মিলে বাঙালি শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা বেড়ে ১৮৯০ সালে ২০ জনে দাঁড়ায়।

এসমস্ত মিলের হিসাব থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙালি পুঁজির বিশিষ্ট অবস্থান কালের বিবর্তনে ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল এবং ১৮৯০ সাল নাগাদ বিদ্যমান বাণিজ্যের দৃশ্যপটে মাড়োয়ারিদের প্রাধান্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে। 'দেশীয় শেয়ারদালাল'দের পরিবর্তিত অবস্থানের মধ্যেও এই ঝোঁক দৃঢ়ভাবে ধরা পড়ে। থ্যাকারের *বেঙ্গল ডিরেক্টরি* ১৮৭৫-এ 'দেশীয় শেয়ারদালাল'দের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নামগুলোর প্রায় সবাই বাঙালি। এতে ধারণা করা যায় যে, মাড়োয়ারিরা সে সময় পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নি। অবশ্য পরবর্তী দুই দশকে মাড়োয়ারিরা কলকাতার শেয়ারবাজারে দালাল ও ফটকাবাজ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ প্রাধান্য বিস্তার করে।

এই আলোচনা থেকে সাধারণভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বেরিয়ে আসে—কেন বাঙালিদের পরিবর্তে মাড়োয়ারিরা বাংলার সম্প্রসারমান বাণিজ্যিক সুবিধার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে এবং তিন দশকের মধ্যে বাংলার প্রায় সমগ্র অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নেতৃত্বদানকারী, উচ্চতায় পৌঁছতে পেরেছিল? কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (বিশেষকরে পাট) নিয়ন্ত্রণ করতো—একে শুধু দূরকল্পী প্রশ্নরূপে গণ্য করলে চলবে না। বাংলায় মাড়োয়ারি পুঁজির অভ্যুদয় পরিষ্কারভাবে বাণিজ্যিক পুঁজি থেকে শিল্পপুঁজিতে রূপান্তরের একটি প্রক্রিয়াকে ফুটিয়ে তোলে। মড়োয়ারিরা প্রথমে পাট ব্যবসায়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। ১৮৮০ সাল নাগাদ তারা তাতে সফল হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশিষ্ট কাঁচা পাট রপ্তানিকারকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তারা একাধিক জুট প্রেসিং ও বেলিং কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং শেয়ারহোল্ডার হিসেবে ক্রমেই প্রভাবশালী হয়ে উঠে। কলকাতা স্টক মার্কেটে দালাল ও ফটকাবাজ হিসেবে তাদের গুরুত্ব অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে তাদের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। আর. এস. রুংটা (১৯৭০) উল্লেখ

---

৩৯. S. Rungta, "Bowreah Cotton and Fort Gloster Jute Mills, 1872-1900", *The Indian Economic and Social History Review*, 22: 2, (1985), 114.

৪০. ঐ।

করেছেন যে, 'মাড়োয়ারিদের কান মাটিতে ছিল বিধায়' তারা 'শেয়ারবাজারে প্রভাব সৃষ্টিকারী খবর সবার আগে পেতো এবং গুজব ছড়িয়ে বাজারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার কাজে তাদের সাথে কেউ পেরে উঠতো না।'[৪১] সুতীবস্ত্রকলের তুলনায় পাটকলের শেয়ারের ব্যাপারে মাড়োয়ারিদের অধিকতর আগ্রহের কারণও এই ছিল যে, সে সময়ে কলকাতার শেয়ারবাজারে পাটকলের শেয়ার নিয়ে বেশ জোরালো লেনদেন হতো। এর সাথে ফটকাবাজিতে তাদের প্রবাদতুল্য আগ্রহের কথাও যোগ করা যায়। যেমন, ১৮৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে 'যখন কলকাতার শেয়ারবাজার ছিল স্বর্ণখনি কোম্পানিগুলোকে নিয়ে ফটকাবাজিতে ভরপুর, তখন এমনকি ইউরোপীয়রাও বাজার থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা লোটার ব্যাপারে তাদের দক্ষতা দেখে তাজ্জব বনে যেতো।'[৪২]

মাড়োয়ারি পুঁজির উত্থান সমকালীন পর্যবেক্ষকদের নজর এড়িয়ে যায় নি। প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের স্মৃতিচারণে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে : "প্রায় এই সময়ে (১৮৯১-৯২) আরেকটি বিষয় আমার চিন্তাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করতে শুরু করে ... দুঃসাহসী অবাঙালিরা, বিশেষকরে রাজপুতনার বন্ধ্যা মরুভূমি থেকে আগত মাড়োয়ারিরা শুধু কলকাতায় নয়, বরং বাংলার অভ্যন্তরেও ঝাঁকে ঝাঁকে প্রবেশ করছিল এবং আমদানি ও রপ্তানির সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিচ্ছিল।"[৪৩] সে সময়কার উচ্চবর্ণের বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণীর ভাবাদর্শে এর প্রতিক্রিয়া কতটুকু স্থান পেয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

অভ্যন্তরীণ ব্যবসা, বিশেষকরে পাট ব্যবসার ক্ষেত্রে মাড়োয়ারি পুঁজির প্রাধান্যের বিষয়টি (গোড়া থেকে পাট ব্যবসায়ে বাঙালি পুঁজির উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণের কথা বিবেচনায় আনলে) আরও কৌতূহলোদ্দীপক মনে হয়। মধ্যস্থ ব্যবসায়ী হিসেবে তাদের ভূমিকা মূলত সীমাবদ্ধ থাকলেও তারা এক সময়ে এর মধ্যে ভাগ্যের আনুকূল্য বেশ ভালভাবেই লাভ করেছিল। ঢাকা বিভাগ সংক্রান্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৮৭২-৭৩ সাল নাগাদ 'দেশজ উৎপাদিত পণ্য কেনার জন্য বিপুল অংকের টাকা দেশে আসছে। এর একটা বড় অংশ তাদের হাতে চলে যাচ্ছে, যারা চাষীদের কাছ থেকে রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীদের কাছে পণ্য পৌঁছে দেয়।"[৪৪] পাট অর্থনীতির অধিকাংশ মুনাফা ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যেতো। কারণ 'কৃষকরা সচ্ছল এবং শিক্ষিত হলেই কেবল' তাদের পক্ষে 'সঠিক সময়ে বিক্রি এবং সঠিক পরিমাণ জমি চাষ করে' বৈদেশিক বাণিজ্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। সাধারণত বাজারের সংকেত আসতো ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এবং 'ব্যাপারী বা মধ্যস্বত্বভোগীরা প্রায়ই বাংলার সাধারণ কৃষকদের প্রতারণা করতো'।

৪১. Runga, *Rise of Business Corporations*, 166.
৪২. ঐ।
৪৩. Sarkar, *Swadeshi Movement*, 94.
৪৪. A Sen, 'Agrarian Structure and Tenancy Laws in Bengal, 1850-1900", in *Perspectives*, (Calcutta), 17.

এফ. এইচ. বি. স্ক্রাইনের ১৮৯২ সালের মেমোরেন্ডামে উল্লেখ করা হয়েছে উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে পাট ব্যবসা সম্প্রসারণের ফলে কিভাবে পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন শহরের বিকাশ ঘটেছে। দীর্ঘ সময় ধরে অবক্ষয়ের পর ঢাকা 'পাট ব্যবসার মধ্যে তার সাবেক অবলম্বন রেশম ও মসলিনের বিকল্প খুঁজে পেয়েছিল'। নারায়ণগঞ্জ ছিল 'পাট বেলিংয়ের বৃহত্তম কেন্দ্র'। স্ক্রাইন সিরাজগঞ্জকে 'ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে পাট ব্যবসা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কেন্দ্র' বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র করের *Report on the Cultivation of Jute in Bengal*-এর কথা স্মরণ করা যায়। তাতে তিনি ১৮৭৭ সালে পাট উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের মাঝে বিভিন্ন স্তরে অবস্থানকারী মধ্যস্বত্বভোগীসহ বাংলার পাট ব্যবসার সক্রিয় নেটওয়ার্কের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

কয়েকটি কারণে পাট ব্যবসায়ে প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে মাড়োয়ারিদের অভ্যুদয় ঘটে। এক্ষেত্রে নিয়োজিত বাঙালি ব্যবসায়ী পুঁজি ছিল অল্প। তাই তারা ছিল প্রতিকূল অবস্থানে। পক্ষান্তরে বানিয়া মাড়োয়ারির পুঁজি বেশি থাকায় সে একই সঙ্গে মহাজন ও আড়তদারের কাজ করতে পারতো; সে একজন বেলার এবং কলকাতাভিত্তিক পাটকলগুলোতে একজন সরবরাহকারীর ভূমিকা পালন করতে পারতো; এমনকি ডান্ডিভিত্তিক পাট প্রস্তুতকারকদের কাছে সে কাঁচাপাট রপ্তানি করতে পারতো। তদুপরি পাট ব্যবসায়ে নিয়োজিত অধিকাংশ বাঙালি ব্যবসায়ী ছিল সাহা শ্রেণীর নিম্নবর্ণের হিন্দু। পূর্ববঙ্গের কিছু অংশে বাঙালি মুসলিমরাও পাট ব্যবসায়ে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। বিপরীত পক্ষে, অধিকাংশ উচ্চবর্ণের হিন্দু তাদের 'উদ্বৃত্ত' নিয়ে লাভজনকভাবে জমির মালিকানা ও অবাণিজ্যিক পেশাব ক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিল। 'নিচের দিক থেকে পুঁজিবাদ' বিকাশের ক্ষেত্রে এর অন্তত তিনটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। প্রথমত, শহরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 'বৃহৎ' বাঙালি পুঁজি পাট ব্যবসার উচ্চ পর্যায়ে কার্যত অনুপস্থিত ছিল। ১৮৬০-এর দশকের শেষার্ধে ও ১৮৭০-এর দশকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বাইরে থেকে আগত মাড়োয়ারি পুঁজি ব্যাপকভাবে এই শূন্যস্থান পূরণ করে।[৪৫] দ্বিতীয়ত, ১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে জমি ও অবাণিজ্যিক পেশার দিকে ধাবিত 'বৃহৎ' বাঙালি পুঁজি পরবর্তীকালে ভদ্রলোক শ্রেণীর আবির্ভাবের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। জন্ম থেকে বর্ণগতভাবে স্পর্শকাতর এই শ্রেণী সাধারণভাবে উৎপাদক শ্রেণীর সাথে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে থাকে। এমনকি নিম্নবর্ণের ব্যাপারি ও ফড়িয়াদেরকে অচ্ছ্যুৎ বলে গণ্য

৪৫. উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালি *ভদ্রলোক*-সংস্কৃতি থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি *বাবু* সংস্কৃতির পার্থক্য রয়েছে। বাবুরা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত ছিলেন না। নীল ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রথমদিকে বাবুদের অংশগ্রহণ এই সূত্রে মনে পড়বে। পক্ষান্তরে, ভদ্রলোক-সংস্কৃতির মধ্যে শিল্পোদ্যোক্তাবিরোধী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজি ভাষা অধ্যয়নের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা অর্জন করার সুবাদেই ভদ্রলোকের মর্যাদা অর্জন করা যেতো। পাট ব্যবসার ক্ষেত্রে যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিচরণ ছিল নিতান্তই বিরল, তার কারণও সম্ভবত ভদ্রলোকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নিহিত।

করা হতো। সাহা সম্প্রদায়ের লোকদেরকে কিরকম হেয় চোখে দেখা হতো এ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ তারা প্রায়ই বাণিজ্য ও মহাজনির ক্ষেত্রে মাড়োয়ারিদের সাথে প্রতিযোগিতা করতো।[৪৬] এই বর্ণগতভাবে স্পর্শকাতর সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনাতেও বিদ্যমান থাকায় নিম্নবর্ণের বাঙালি ব্যবসায়ীরা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত উচ্চবর্ণের বাঙালিদের কাছ থেকে কোনো কার্যকর সহায়তা বা সম্প্রদায়গত সমর্থন পায় নি। বাঙালি মুসলিম ব্যবসায়ীরাও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছ থেকে কোনো রকম সহায়তা পায় নি। (এখানে উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সংক্রান্ত কোন রকম আলোচনার অনুপস্থিতি স্মরণ করা যেতে পারে।) ব্যাপকভাবে পাট ব্যবসায়ে অর্থ যোগান দেয়ার ব্যাপারে সম্প্রদায়গত সমর্থন ছিল বিশেষভাবে অপর্যাপ্ত। ফলে বাঙালি ব্যবসায়ীদের পক্ষে মাড়োয়ারি পুঁজির কার্যকর প্রতিযোগী হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে হ্রাস পায়।[৪৬] এটা সর্বজনবিদিত যে, মাড়োয়ারিরা তাদের সমাজে বিদ্যমান বানিয়া নেটওয়ার্কের ঘনিষ্ঠ সমর্থন অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পেয়েছিল। তৃতীয়ত, এই দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে নিম্নবর্ণের ব্যবসায়ী ও মহাজনদের ঘৃণার চোখে দেখা হলেও ব্যক্তিগতভাবে তাদের কারও পক্ষে ভদ্রলোক শ্রেণীতে উঠে আসার ব্যাপারটা একেবারে অসাধ্য ছিল না। যেমন, উচ্চশিক্ষা লাভ ও ব্যবসাবহির্ভূত পেশা গ্রহণ করে সাহা সম্প্রদায়ের কোন লোক ভদ্রলোক শ্রেণীতে ঢুকে পড়তে পারতো। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, ভদ্রলোক হবার জন্য নিম্নবর্ণের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অনেকে ব্যবসা থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে জমি ক্রয়ে এবং অন্যান্য অবাণিজ্যিক পেশায় মন দেয়। ফলে মাড়োয়ারি পুঁজির বিপরীতে বাঙালি বাণিজ্যিক পুঁজির অবস্থান আরও নড়বড়ে হয়ে পড়ে।

৪৬. 'বৃহৎ' মাড়োয়ারি পুঁজি প্রাথমিকভাবে কিভাবে সংগৃহীত হয়েছিল সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অবশ্য এ থেকে পাওয়া যায় না এবং বিষয়টি পৃথক গবেষণার দাবি রাখে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে সুতার ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ফটকাবাজির যে ধূম পড়ে যায়, সেটি মাড়োয়ারির পুঁজি সঞ্চয়নের একটি বড় উৎস হতে পারে। এই ফটকাবাজির সুবাদে সঞ্চিত পুঁজির দ্বারাই বোম্বের বস্ত্রকলগুলোতে প্রাথমিক পুঁজির যোগান হয়েছিল (১৮৭০-এর দশকে এসব বস্ত্রকল দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়)। এরকম মনে করার অবকাশ আছে যে, ফটকাবাজির সুবাদে সঞ্চিত পুঁজির একাংশ পাটের অর্থনীতি বিকাশ লাভের সাথে সাথে বাংলায় স্থানান্তরিত হয়ে থাকবে। ১৮৬০-এর দশকে অবশ্য কলকাতার শেয়ারবাজারও চা-কোম্পানির সূত্র ধরে ফটকাবাজির জোয়ারে তেজী হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে এটি সীমিত ছিল মূলত বৃটিশ বেসরকারি পুঁজির মধ্যেই। সুনীল সেনও (১৯৮১) এরকম ধারণাকে প্রকারান্তরে সমর্থন করেন যখন তিনি বলেন যে, মাড়োয়ারিরা, যারা 'লগ্নি ও ব্যবসায়ী পুঁজিপতি' হিসেবে পরবর্তীতে বিকাশলাভ করেছিল, তাদের প্রাথমিক পুঁজির উৎস ছিল ' ব্যাঙ্ক ও মহাজনি ব্যবসা এবং আফিম, সুতা, রূপা এবং সোনার ব্যবসায় ফটকাবাজি'। রাজপুতানায় পুঁজিবিনিয়োগ ক্রমশ অলাভজনক হয়ে পড়ার সাথে সাথে মাড়োয়ারিরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে'(পৃ-৫৭)। দেখুন, S. K. Sen, পাদটীকা, ৭২।

এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও হয়তো কতিপয় বাঙালি ব্যবসায়ী (বিশেষকরে পাট ব্যবসায়ে জড়িত সাহাগণ) মাড়োয়ারি পুঁজির ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিলাভের জন্য সত্যিকারভাবে চেষ্টা করেছিল। এমনকি তাদের কেউ কেউ কলকাতায় বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউজগুলোর সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। কেউ কেউ ডান্ডির প্রস্তুতকারকদের কাছে সরাসরি কাঁচা পাট পর্যন্ত সরবরাহ করেছিল। তবে এসব ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সার্বিকভাবে, প্রাথমিক পর্যায় থেকেই মাড়োয়ারি পুঁজি পাট ব্যবসায়ে উচ্চস্তরে নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে চলেছিল এবং সময়ের বিবর্তনে পাট সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ ও সরবরাহের এক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল। এভাবে ঔপনিবেশিক আমলে উৎপাদিত বাংলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীর জীবনসূত্র তাদের হাতে চলে যায়।

১.৫ বাংলার স্বদেশী উদ্যোক্তাগণ

বিশ শতকের প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলন চলাকালে আধুনিক ধারায় শিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টা বাঙালি শিল্পোদ্যোগের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বর্তমান আলোচনায় বাঙালি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প থেকে ভিন্নতর আধুনিক ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর উপরই মূলত আলোকপাত করা হবে। স্বদেশী আন্দোলন যখন তুঙ্গে সে সময়ে প্রতিষ্ঠিত ফ্যাক্টরিগুলোর (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসহ) উপর এই ইচ্ছাকৃত আলোকপাতের মূল কারণ দু'টি। প্রথমত,স্বদেশী চেতনার শেকড় ১৮৭০-এর দশকে খুঁজে পাওয়া গেলেও 'অর্থনৈতিক স্বদেশী'র ভাবনা সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি লাভ করে বিশ শতকের প্রথম দশকে।[৪৭] পুরোপুরি বাঙালি মালিকানায় এবং জোরালো স্বদেশী চেতনায় ফ্যাক্টরির মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ঘটনা উনিশ শতকের শেষার্ধে গুটিকয়েক মাত্র চোখে পড়ে। ১৮৬৭ সালে হাওড়ার কাছে প্রতিষ্ঠিত কিশোরীলাল মুখার্জীর শিবপুর আয়রন ওয়ার্কস্ এগুলোর অন্যতম। ১৯০৮ সালের স্বদেশী যুগেও ১১০ জন কর্মী নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি চালু ছিল। পরবর্তী সময়ে শিল্পস্থাপনের একমাত্র সফল প্রচেষ্টা হচ্ছে ১৮৯৩ সালে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালস। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন তুঙ্গে উঠার আগে আধুনিক ধারায় একের পর এক স্বদেশী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ঘটনা আর দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক স্বদেশীর ভাবনায় গোড়ার দিকে ক্ষয়িষ্ণু ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের

৪৭. অর্থনৈতিক স্বদেশীবাদের ভাবাদর্শগত ভিত্তি সম্পর্কে সুমিত সরকারের (১৯৭৩) ভাষ্যের সারার্থ নিম্নরূপ : আমাদানিবিকল্প দেশজ পণ্য যদি আমদানিকৃত দ্রব্যের তুলনায় অধিক ব্যয়বহুল এবং অপেক্ষাকৃত নিচু মানেরও হয়, তা হলেও ক্রেতাসাধারণকে দেশজ পণ্যই কিনতে হবে এবং যাদেরই কিছুটা পুঁজি আছে তাদের কর্তব্য হলো এসব আমদানি-বিকল্প পণ্যের উৎপাদনে পুঁজিবিনিয়োগ করা (এমনকি প্রথমদিকে ঐসব শিল্পে মুনাফা অত্যন্ত নগণ্য হলেও) এবং এভাবে তারা তাদের দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে পারেন।

ব্যাপারে গভীর উৎকণ্ঠা থাকলেও ১৯০৫-১৯০৭ সালের স্বদেশী চেতনায় এর আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। এর পাশাপাশি আধুনিক ধারায় শিল্পস্থাপনের প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠে। এ কথা সত্য যে, বিদেশী পণ্য বর্জন আন্দোলনের ফলে তাঁতের কাপড়ের নতুন চাহিদা সৃষ্টি হওয়ায় হস্তচালিত তাঁতশিল্প কিছু সময়ের জন্য চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। তবে ক্রমশ এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে কুটিরশিল্প থেকে শহুরে আধুনিক শিল্পকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। এই সময়কালে জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রায় ঐকমত্য ছিল।

ফ্যাক্টরি ধরনের স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর পূর্ণাঙ্গ তালিকা নেই বললেই চলে। তবে সারণি ২-এ প্রদত্ত উপাত্ত পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করতে পারে। স্বদেশী শিল্পোদ্যোগের ধরন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এর কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট দিক ধরা পড়ে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, সে সময়কার দু'টি প্রধান খাত পাট ও বস্ত্রশিল্পে স্বদেশী উদ্যোক্তাদের উপস্থিতি ছিল একেবারে নগণ্য। পাটকলের ক্ষেত্রে স্বদেশী প্রতিষ্ঠান ছিল পুরোপুরি অনুপস্থিত। সুতীবস্ত্র খাতে গুটিকয়েক স্বদেশী উদ্যোগের মধ্যে ছিল বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল (১৯০৬), কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল (১৯০৮), বেঙ্গল হোসিয়ারি কোং (১৯০৮) এবং আরও কয়েকটি ক্ষুদ্রায়তন সুতাবয়ন প্রতিষ্ঠান।[৪৮] অন্যদিকে স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ব্যাপক প্রাধান্য ছিল বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ শিল্পের। বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পগুলোর মধ্যে ছিল রাসায়নিক শিল্প (রঞ্জনশিল্প, সাবান, প্রসাধন ইত্যাদি) ও ফার্মাসিউটিক্যালস, চামড়া, খনি, ধাতুশিল্প ও অধাতব (কাঁচ, পোরসেলিন ও সিরামিক) শিল্প।

যে ধরনের সামাজিক ভিত্তি থেকে স্বদেশী উদ্যোক্তারা এসেছিলেন, সম্ভবত তারই কারণে তাঁদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট খাতের প্রতি এই বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। প্রায় সব ক'জন উদ্যোক্তাই ছিলেন শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরেজিশিক্ষিত ভদ্রলোক। 'এসোসিয়েশন ফর দি এডভান্সমেন্ট অব সায়েন্টিফিক এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন অব ইন্ডিয়ানস' (১৯০৪) প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল কারিগরি প্রশিক্ষণলাভের জন্য বিদেশ গমনেচ্ছু যুবকদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা। বাংলায় কারিগরি শিক্ষার আন্দোলনকে আধুনিক ধারায় শিল্পস্থাপন, বিশেষকরে বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট শিল্পবিকাশের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে দেখা হয়েছিল।[৪৯] একথা সত্য যে, পূর্ব ভারতে পাট ও বস্ত্রশিল্পের উপর বৃটিশ বাণিজ্যিক

৪৮. ১৯০৬ সালে ঢাকঢোল পিটিয়ে শুরু করা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস প্রকৃতপক্ষে কোন নতুন কারখানা ছিল না। বোম্বের শিল্পপতি গোবর্ধন দাস খাটাও-এর কাছ থেকে মিলটি কেনা হয়; এর পূর্বতন নাম ছিল সিরামপুর লক্ষ্মী তুলসী কটন মিলস। অনুরূপভাবে বেঙ্গল হোসিয়ারি কোম্পানিও (১৯০৮) খিদিরপুরের একটি পুরনো হোসিয়ারির সংস্করণ ছিল।

৪৯. পরবর্তীতে এসোসিয়েশনের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের দ্বারা বেশ কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস-এর সত্যসুন্দর দেব, ক্যালকাটা কেমিক্যালস-এর কে. সি. দাস এবং আর. এন. সেন, বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ কোম্পানির এস. এম. বোস এ প্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য।

প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের কারণে 'বিবিধ' বলে কথিত খাত ছাড়া শিল্পে বিনিয়োগের বিকল্প সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। তবে এ ব্যাপারে সম্ভবত দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যাও এক বড় ভূমিকা পালন করেছে। এসব খাতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজন ছিল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে পূর্বঅভিজ্ঞতা ও চুলচেরা জ্ঞান। উদীয়মান স্বদেশী উদ্যোক্তাদের মধ্যে এর কোনটাই ছিল না। এছাড়া বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট শিল্প খুব সহজেই শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণীর আধুনিক হয়ে উঠার বাসনাকে জাগ্রত করতে পেরেছিল।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, এ সময়ে স্থাপিত একাধিক প্রতিষ্ঠানে মুসলিম পুঁজির সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।[৫০] বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের অন্যতম উদ্যোক্তা পরিচালক ছিলেন বগুড়ার জমিদার আবদুস সোবহান চৌধুরী। টাঙ্গাইলের জমিদার আবদুল হালিম গজনবী বউবাজারের সুপরিচিত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড বেঙ্গল কোম্পানির মালিক ছিলেন। তিনি একাধিক স্বদেশী শিল্পোদ্যোগে অংশ নেন। এম. এন. দত্ত ও বিচারপতি শরফুদ্দিন যৌথ উদ্যোগে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন (ইউরেকা পোরসেলিন ওয়ার্কস)। একক মুসলিম মালিকানার স্বদেশী প্রতিষ্ঠানও ছিল। যেমন আবদুস সোবহান চৌধুরী ও আবদুল হালিম গজনবী দু'লাখ টাকা মূলধন দিয়ে বেঙ্গল হোসিয়ারি কোম্পানি স্থাপন করেন। চট্টগ্রামের মুসলিম ব্যবসায়ী ও জমিদারগণ এক লাখ টাকা পুঁজি দিয়ে বেঙ্গল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি স্থাপন করেন। এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন মুন্সি কালা মিয়া। এই কোম্পানি ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর সাথে তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম থেকে আকিয়াব ও রেঙ্গুনে সাফল্যের সঙ্গে যাত্রিবাহী জাহাজ সার্ভিস চালাতো। এমনকি ১৯০৯ সালে কোম্পানিটি শেয়ারহোল্ডারদের ৭.৫ শতাংশ ডিভিডেন্ড দিয়েছিল।

১৯০৭-০৮ সালের দিকে অর্থনৈতিক স্বদেশী ভাবনায় শিল্প গড়ে তোলার পরিবর্তে ব্যবসা-বাণিজ্য করার দিকে পরিবর্তন স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এ সময় বিশেষ ঝোঁক দেখা যায় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং পরিবহন, ব্যাঙ্ক ও বীমা খাতের প্রতি। সম্ভবত এসব খাতকে বিনিয়োগের জন্য অধিকতর নিরাপদ ও দ্রুত মুনাফা অর্জনকারী রূপে বিবেচনা করা হয়েছিল। অবশ্য ব্যাঙ্ক ও বীমা খাতে স্বদেশী উদ্যোগ তেমন সফল হয় নি। এ খাতের অধিকাংশ উদ্যোক্তা ছিলেন এমন শ্রেণীর (জমিদার ও রাজনীতিবিদ), যাঁদের এসব ব্যবসা সম্পর্কে তেমন কোনো পূর্বঅভিজ্ঞতা ছিল না। তদুপরি তাঁদেরকে ঔপনিবেশিক শাসনের বৈষম্যমূলক বিধি-বিধানের কবলে পড়তে হয়েছিল। যেমন, এই সময়ে বাঙালি

---

৫০. সুমিত সরকারের তথ্য থেকে ধারণা হয় যে, মুসলিম শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশেও স্বদেশী ভাবধারার প্রভাব এসে পড়েছিল। কিন্তু স্বদেশী যুগে পূর্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্যের ঘাটতি থাকায় ধারণা করা শক্ত অর্থনৈতিক স্বদেশীবাদের প্রতি মুসলিম পুঁজি কিভাবে এবং কতটা সাড়া দিয়েছিল। যাহোক, বিষয়টি পৃথক গবেষণার দাবি রাখে।

মালিকানায় একাধিক নৌ-পরিবহন কোম্পানি স্থাপিত হয়েছিল। ইস্ট বেঙ্গল রিভার স্টিম সার্ভিস (১৮৯৭), বেঙ্গল মহাজন ফ্লোটিলা কোম্পানি (১৯০৮) ও কো-অপারেটিভ নেভিগেশন লিঃ (১৯০৮)-এর মতো কোম্পানিগুলো ৭ থেকে ১২ শতাংশ হারে ডিভিডেন্ড শেয়ার হোল্ডারদের দিচ্ছিল। অবশ্য ইংরেজ নৌ-পরিবহন কোম্পানিগুলো গলাকাটা প্রতিযোগিতা (ইচ্ছাকৃতভাবে ভাড়া কমিয়ে গ্রাহক সংগ্রহের তীব্র প্রতিযোগিতা) শুরু করলে এসব কোম্পানি বেশিদিন টিকতে পারে নি। তদুপরি ইউরোপীয় মালিকানাধীন পাটকলগুলো দেশী জাহাজে আনীত মাল গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাদের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এক প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট ১০ কোটি টাকা মূলধনের প্রায় ২০টি দেশীয় নৌ-পরিবহন কোম্পানিকে এভাবে ১৯০৫ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ব্যবসা থেকে হটিয়ে দেয়া হয়।[৫১]

স্বদেশী বাণিজ্যের সাফল্যের সার্বিক প্রভাব মূল্যায়ন করা কঠিন। গুটিকয়েক ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ স্বদেশী প্রতিষ্ঠান বেশিদিন টিকে নি। সুমিত সরকারের মতে, 'নড়বড়ে একগুচ্ছ ভোগ্যপণ্য শিল্প এবং সেইসঙ্গে গুটিকয়েক ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ও বীমা প্রতিষ্ঠান—এই হচ্ছে মোট যোগফল। স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকে শিল্প পুনরুজ্জীবনের যে স্বপ্ন ছিল তার সাথে এটা মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়।'[৫২] অর্থনৈতিক স্বদেশী আন্দোলন ব্যর্থ হবার একটি বড় কারণ হচ্ছে, এ আন্দোলনে স্বদেশী আদর্শ চালু হওয়ার আগে থেকে যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল তারা বাঙালি ব্যবসায়ী ও উৎপাদকদের সমর্থন সুসংহত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সে সময়কার একজন পর্যবেক্ষক এ. জে. জি. কুসিংয়ের মতে, 'এই নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোর পুঁজি বৃহৎ পুঁজিপতিদের কাছ থেকে আসে নি, এসেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঞ্চয় থেকে' (সরকার ১৯৭৩, ১৩৫)। স্বদেশী উদ্যোগের উদ্যোক্তা হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের প্রশ্নটিকে বাংলায় শিক্ষিত বেকারত্বের ক্রমবর্ধমান সমস্যার সাথে যুক্ত করে দেখতে হবে।

তবে, শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য স্বকর্মসংস্থানের ধরন হিসেবেও স্বদেশী উদ্যোগের ভাবনা তেমন একটা সফল হয় নি। ন্যাশনাল ফান্ড বয়ন বিদ্যালয় কয়েক মাসের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। এ ধরনের কেন্দ্রে উন্নততর শ্রেণীর ফ্লাই-শাটল তাঁতের সাহায্যে ভদ্রলোক যুবকদের বয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে তারা এ ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এ ধরনের ব্যাপক ব্যর্থতার পটভূমিতে যথাযথ পণ্যসামগ্রী

---

৫১. Sarkar, *Swadeshi Movement*, 133.

৫২. ঐ, 134.

নির্ধারণ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প উৎপাদকদের দিকে মূলত লক্ষ্য রেখে স্বদেশী অর্থনৈতিক মডেল গড়ে তুললে হয়তো ফল ভাল হতো। প্রধানত ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প উৎপাদকদের সহায়তাদানের লক্ষ্যে জে. সি. ঘোষের সমিতি স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি (দু'লাখ টাকা মূলধন নিয়ে) গড়ে উঠেছিল। এতে উক্ত পরিকল্পনাই ফুটে উঠেছিল স্পষ্টভাবে। কিন্তু 'নতুন এবং উত্তেজনাকর রাজনীতি এর অনেক কর্মীকে আচ্ছন্ন করে ফেলায়'[৫৩] এর কাজকর্ম গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়। উদ্যোক্তা হিসেবে সফল হবার প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন এসব সামাজিক শক্তিকে নতুন সম্পদ, প্রযুক্তিদক্ষতা, তথ্য ইত্যাদি দিয়ে পুষ্ট করার ব্যর্থতাই স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শিল্পায়নের উদ্ভট প্রচেষ্টার জন্য বহুলাংশে দায়ী। এর সাথে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী রাজনীতি। এটা বাংলায় অর্থনৈতিক স্বদেশী আদর্শের উত্থানের পিছনে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। সমাজতান্ত্রিক প্রেক্ষিত থেকে দেখলে বলতে হয়, অর্থনৈতিক স্বদেশী আদর্শ ছিল আসলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালি ভদ্রলোকদের পরিচালনায় এক প্রতিবাদ আন্দোলন। এতে সদ্যোজাত বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশার প্রতিফলন ছিল না।[৫৪]

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকদের পরিচালিত স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সুফলভোগী ছিল অবাঙালি শিল্প ও বাণিজ্যপুঁজি। বাংলার তাঁতীদের ব্যবহৃত সুতা আসতো বোম্বে ও আহমদাবাদের সুতাকলগুলো থেকে। এছাড়াও এসব মিল স্বদেশী বাজারে কাপড় সরবরাহ করতো। মিলে প্রস্তুত স্বদেশী কাপড়ের মান ও দাম নিয়ে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যেতো। এগুলোর দাম ছিল আমদানিকৃত কাপড়ের দামের দ্বিগুণেরও বেশি। এভাবে বোম্বে ও আহমদাবাদের মিলমালিকগণ বাংলার স্বদেশী চেতনার কাছ থেকে গগনচুম্বী মুনাফা লুটে নিতে পেরেছিল (সেসময় এসমস্ত মিলে কর্মসময় বাড়িয়ে দৈনিক ১৫ ঘণ্টা করা হয়েছিল)। এ ছাড়াও, স্বদেশী আন্দোলন ১৯০৬-১৯০৭ সালে এদের মূল্যধ্বস ঠেকাতে সাহায্য করে। এ সময় জাপানী প্রতিযোগিতার ফলে বোম্বের মিলসমূহে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির অন্যতম প্রধান উৎস চীনের সুতার বাজার প্রায় হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। বাংলায় স্বদেশী কাপড়ের পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরাও (তাদের মধ্যে বাঙালি এবং মাড়োয়ারি উভয়েই ছিল) বাড়তি দাম থেকে বেশ ভাল মুনাফা অর্জন করে। বিদেশী পণ্য বর্জনের

---

৫৩. প্রাগুক্ত, 115.

৫৪. অর্থনৈতিক স্বদেশীবাদের লক্ষ্যে যে আন্দোলনের শুরু তার উত্তরোত্তর রাজনীতিলিপ্ততা অনেকেরই মনঃপূত হয় নি। Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education of Indians-এর প্রতিষ্ঠাতা J. C. Ghosh এসোসিয়েশনের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত Small Industries Development Co.-র কাজে হতাশ হয়ে এ. সি. ব্যানার্জীকে লিখেছিলেন : This is the result of leaving everything to one man and enjoying yourself with tamashas, bonfires and speeches on swadeshi and all such futile nonsense' (Sumit Sarkar, *Swadeshi Movement*, 115).

ফলে বাজারে বিক্রেতাদের যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তার সুযোগ নিয়ে অসৎভাবে দাম বাড়িয়ে মুনাফার পাহাড় গড়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত সে সময় ছিল। ম্যানচেস্টারের কাপড় আমদানিকারক এক শ্রেণীর মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী অবশ্য গোটা বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর ম্যানচেস্টার চেম্বারের কাছে পাঠানো এক তারবার্তায় কলকাতার মাড়োয়ারি চেম্বার অব কমার্স বঙ্গভঙ্গ রহিত করার আহ্বান জানিয়ে বলে, অন্যথায় 'আমরা নির্মূল হয়ে যাবো এবং পরবর্তী চুক্তি করতে পারবো না।' ১৯০৬ সালের ২২ মে *বাঙালি* পত্রিকাটি মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদেরকে 'স্বদেশী আন্দোলনের ঘৃণ্যতম শত্রু' বলে নিন্দা করে। কিন্তু উচ্চবর্ণের বাঙালি পুঁজির স্বদেশী স্বপ্ন কখনো পূরণ হয় নি। বরং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে মাড়োয়ারি পুঁজি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর কয়েক বছরের মধ্যে মাড়োয়ারি পুঁজি শুধু বাঙালি পুঁজির উপর আধিপত্যই বিস্তার করে নি, বরং একাধিক আধুনিক শিল্পে এতদিন পর্যন্ত নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তারকারী ইউরোপীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সাথেও গোপন যুদ্ধ শুরু করে।

১.৬ যুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোতে দেশীয় উদ্যোগ : মাড়োয়ারি বনাম বাঙালি পুঁজি

যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে শিল্পখাতে উদ্যোগসমূহের চরিত্রের দিকে গভীরভাবে নজর দিলে দেখা যায় যে, প্রচলিত অর্থে ইউরোপীয় পুঁজির একচেটিয়া আধিপত্য বলে গণ্য করা হতো এমন সব ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দেশীয় পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। পাটশিল্প সম্পর্কে আওয়ালের সমীক্ষা (১৯৮৩) এবং গোস্বামীর কাজ (১৯৯১) থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, আধুনিক শিল্পের অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় পুঁজি ইউরোপীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করেছিল। ১৯২০-এর দশকে পুরোপুরি স্বদেশী মালিকানায় ৭টির মতো পাটকল স্থাপিত হয়।[৫৫] দেশীয় উদ্যোগে পাটকল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি স্থানীয় উদ্যোক্তারা ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সি হাউজসমূহের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত পাটকোম্পানিগুলোতে ব্যাপকভাবে অর্থবিনিয়োগ করে। ফলে বৃটিশ মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোতে দেশীয় পরিচালকদের অংশ সময়ের আবর্তনে বেড়ে যেতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯১১ সালে ৫০টি পাটকোম্পানির সবগুলো নিয়ন্ত্রিত হতো শুধুমাত্র ইউরোপীয় ডিরেক্টরগণ দ্বারা।[৫৬] ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর নাগাদ ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সি পরিচালিত ৫৯ শতাংশ পাটকলকোম্পানিতে মাড়োয়ারি পরিচালকদের অংশগ্রহণ

---

৫৫. ইন্দোরের স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ, কলকাতার বিড়লারা এবং দারভাঙ্গার মহারাজা ১৯২০-এর দশকের শুরুতে পাটকল স্থাপনে এগিয়ে আসেন। উক্ত দশকের শেষার্ধের পাটকলমালিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—আদমজী হাজী দাউদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদমজী জুট মিল, বি. এল ইলিয়াস কর্তৃক স্থাপিত আগ্রাপারা জুট মিল, রাজা জানকী নাথ রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রেমচান্দ জুট মিল, দয়ারাম এ্যান্ড সনস্-এর জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি।

৫৬. Awwal, *Industrial Development*, 142.

ছিল।[৫৭] পাটজাত পণ্য প্রস্তুতকারক শিল্পের পাশাপাশি জুট প্রেসিং শিল্পেও স্থানীয় পুঁজির ব্যাপক প্রয়োগ ঘটে। ১৯২১ সালের শুমারি মোতাবেক ১৮৮টি জুট প্রেসিং কোম্পানির মধ্যে স্থানীয় মালিকানায় ছিল ১১৩টি। ১৯১১ সালে এ সংখ্যা ছিল ৫২টি। এমনকি চা-শিল্পেও, যেখানে ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় পুঁজির আধিপত্য ছিল, দেশীয় উদ্যোক্তারা ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে থাকেন; যেমন, মোট চা-বাগানগুলোতে ১৯১১ সালে দেশীয় মালিকানা ছিল ১৫ শতাংশ। ১৯২১ সালে সেটা বেড়ে ৩২ শতাংশে দাঁড়ায়। তদুপরি ১১টি ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রিত চা-কোম্পানিতে দেশীয় পরিচালকগণও ছিলেন। বাংলায় কয়লাখনি মালিকানার ক্ষেত্রে দেশীয় পরিচালকবর্গের অংশগ্রহণবিশিষ্ট ইউরোপীয় মালিকানাধীন কোম্পানি এবং পুরোপুরি দেশীয় মালিকানাধীন কোম্পানির সংখ্যা ১৯১১ সালের ৫৪ শতাংশ থেকে সামান্য বেড়ে ১৯২১ সালে ৫৮ শতাংশে দাঁড়ায়। দেশী কোম্পানির প্রায় সবগুলো অবশ্য ছিল ছোট কয়লাখনি। ফলে গুটিকয়েক বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত বৃহৎ কয়লাখনি কোম্পানি ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এ শিল্পে প্রাধান্যবিস্তার করে থাকে। সাধারণ প্রকৌশলশিল্পেও অনুরূপ অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৭ সালে বাংলায় ২৫০ জনের বেশি শ্রমিক নিয়ে চালু প্রায় সবক'টি বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম ছিল বৃটিশ মালিকানাধীন। কয়লাখনি ও সাধারণ প্রকৌশলশিল্পের বিপরীতে সুতা ও বস্ত্রশিল্প স্থানীয় পুঁজিকে বিপুলভাবে আকৃষ্ট করে। ১৯৩৭ সালে বাংলায় চালু থাকা ২৬টি কটনমিলের মধ্যে ২৪টির মালিকানা ছিল দেশীয় উদ্যোক্তাদের হাতে। দেশীয় পুঁজি চিনিকলগুলোতেও প্রাধান্য বিস্তার করে। ১৯৩৮-৩৯ সালে যে ১০টি মিল চালু ছিল সেগুলোর মধ্যে ৮টির মতো ছিল স্থানীয় মালিকানাধীন। অনুরূপভাবে থ্যাকারের *ইন্ডিয়ান ডিরেক্টরির* বিবরণ অনুযায়ী ১৯৩৮-৩৯ সালে বাংলায় ৬৯টির মত কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি চালু ছিল, সেগুলোর অধিকাংশের মালিক ছিলেন দেশীয় উদ্যোক্তারা। মৃৎশিল্প, ইট ও টালি প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও দেশীয় পুঁজির একটা বড় অংশ নিয়োজিত ছিল। ১৯২১ সালের শুমারিপ্রতিবেদন মোতাবেক ৪১২টি ইট, টালি ও ফায়ারব্রিক ফ্যাক্টরির মধ্যে ৩৮৭টির মতো ছিল সরাসরি দেশীয় মালিকানায়।

উপরোক্ত হিসাব থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বাংলার দেশীয় উদ্যোক্তারা আধুনিক শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে নি, যদিও তাদেরকে প্রতিকূল নিয়ম-নীতি ও অনিশ্চিত বাজারের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছিল। যুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোতে নবলব্ধ সুযোগগুলো কাজে লাগাতে তারা জোর প্রচেষ্টা চালায়। তারা আধুনিক ধারায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রচুর ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল। ওয়েবারীয় অভিমতে তাদেরকে যেভাবে 'অনুৎপাদনশীল' ভাবমূর্তিতে দেখানো হয়েছে এটা কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

---

৫৭. O. Goswami, *Industry, Trade and Peasant Society : The Jute Economy of Eastern India, 1900-1947*, (Oxford University Press 1991), 107.

এ সময়ের বড় ধরনের উদ্যোগসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেশীয় উদ্যোক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী হিসেবে মাড়োয়ারি পুঁজির উত্থান। ১৯২০-এর দশকের শেষ নাগাদ পাটশিল্পে মাড়োয়ারি পুঁজি ইউরোপীয় পুঁজির অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করে তোলে। ১৯২০-এর দশকের গোড়া থেকে ইউরোপীয় পত্র-পত্রিকায় মাড়োয়ারিদেরকে 'দস্যু', 'বহিরাগত', 'স্বল্পদৃষ্টির শিল্পপতি' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হতো।[৫৮] এখানে যে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে, কেন এ সময়ে বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে ক্রমপ্রসারমান নতুন সুযোগগুলোর প্রায় পুরো ফায়দা বাঙালি পুঁজির পরিবর্তে মাড়োয়ারি পুঁজির থলিতে জমা হলো? এই বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে জানার জন্য দু'টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দিক খতিয়ে দেখতে হবে : এর একটি সেসব কারণগুলোর উপর আলোকপাত করে, যা আধুনিক শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাড়োয়ারি পুঁজির প্রবেশে সহায়তা করেছিল; অপরটি সেসব কারণকে চিহ্নিত করে, যেগুলো বাঙালি উদ্যোগসমূহের বিকাশ বিঘ্নিত করেছিল। যুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোতে দেশীয় উদ্যোগের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এখনো যথেষ্ট ঘাটতি থাকলেও উপরোক্ত বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যামূলক পর্যবেক্ষণ করা যায়।

মাড়োয়ারি উদ্যোক্তাদের উত্থানের পটভূমির প্রতি নজর রাখলে এটি তেমন আশ্চর্যজনক মনে হবে না কেন পাটশিল্পে মাড়োয়ারিরাই ছিল প্রথম 'হামলাকারী'। পাটশিল্পে প্রবেশের আগে মাড়োয়ারিরা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছিল, জুট বেলিং কোম্পানিগুলোর অধিকাংশের মালিকানা দখল করেছিল এবং দালাল ও ফটকা ব্যবসায়ী হিসেবে কলকাতা স্টক-এক্সচেঞ্জের প্রধান চরিত্রে পরিণত হয়েছিল। তাই এটা স্বাভাবিক ছিল যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোয় যখন পাটশিল্পে মুনাফার হার তুঙ্গে উঠে, তখন মাড়োয়ারি পুঁজি পাটকলের উদ্যোক্তা হিসেবে ঢুকে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অবশ্য মাড়োয়ারিদের দ্বারা নতুন ইউনিট স্থাপন ছিল আধুনিক শিল্পে তাদের প্রবেশের একটি ধরন মাত্র। এমনকি এটা পাটশিল্পে মাড়োয়ারি পুঁজি প্রবেশের প্রধান ধরনও ছিল না। গোস্বামী লিখেছেন, ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণের কক্ষপথের বাইরে নতুন ফ্যাক্টরি স্থাপন করার ক্ষেত্রে 'ভারতীয়রা ছিল ঔপনিবেশিক বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রিত খেলায় গুরুত্বহীন লীগ খেলোয়াড় মাত্র। এ প্রসঙ্গে গবেষকরা অনুপ্রবেশের দ্বিতীয় ধরনটি এড়িয়ে গেছেন। ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সিগুলোর নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলোতে অব্যাহতভাবে শেয়ার কিনে এক পর্যায়ে বিশেষকরে মাড়োয়ারিরা পরিচালকমণ্ডলীতে পর্যন্ত স্থান করে নেয়।[৫৯] ২০ ও ৩০-

---

৫৮. O Goswami, "Then Came The Marwaris: Some Aspects of the Changes in The Pattern of Industrial Control in Eastern India", *The Indian Economic and Social History Review*, 22: 3 (1985), 225-250.

৫৯. Goswami, *Industry, Trade*, 100.

এর দশকে পাটখাতে অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতার ক্রমবর্ধমান সমস্যা এ ধরনের পরোক্ষ ও গোপন প্রবেশের বাসনাকে আরও উস্কে দিয়ে থাকবে। ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সি হাউজগুলো কর্তৃক 'নিয়ন্ত্রিত' ব্যবসায়ে উল্লেখযোগ্য শেয়ার অর্জনের জন্য মাড়োয়ারিরা দু'টি প্রধান পদ্ধতি অবলম্বন করে। প্রথম পদ্ধতি ছিল শুধুমাত্র শেয়ার কেনা। এসব শেয়ার কেনা হতো ক্ষুদ্র শেয়ারহোল্ডার বা এমন কারো কাছ থেকে (যেমন অংশীদারের বন্ধু, বয়স্কা বিধবা, পেনশনভোগী ও কোম্পানির বেতনভোগী কর্মকর্তা), যারা এককালীন লাভের জন্য স্বেচ্ছায় এসব শেয়ার বিক্রি করতেন। যুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোয় এটা ব্যাপকভাবে ঘটেছিল। পরিচালকমহলে ঢুকে পড়ার অন্য পদ্ধতি ছিল ইউরোপীয় মালিকানাধীন ম্যানেজিং এজেন্সিগুলোর সাথে দীর্ঘ সময় ধরে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক ও ঋণদান সংক্রান্ত যোগাযোগ গড়ে তোলা। সঙ্কটের সময় মাড়োয়ারিরা এজেন্সিগুলোকে কম সুদে ঋণ দিত এবং বিনিময়ে পাটকলের মোটা অংকের শেয়ার কিনে বিদেশীদের সমকক্ষ পরিচালক হয়ে বসতো। ১৯২০-এর দশকের গোড়ার দিকে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে গেলে এটা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেসময় পাটকলগুলোতে উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অনেক বহিরাগত কোম্পানির বাড়তি তহবিলের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কয়লাশিল্পে প্রাধান্যবিস্তারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঝোঁক দেখা যায়। তবে এক্ষেত্রে পরিচালকমণ্ডলীতে পরিবর্তনের ধারা অনেক কম লক্ষণীয়।[৬০]

মাড়োয়ারিদের বিপরীতে বাঙালি উদ্যোক্তাদের কাজকর্ম মোটেও সন্তোষজনক ছিল না।[৬১] এর জন্যে একাধিক কারণ দায়ী। ১৯২০-এর দশকের গোড়ার দিকে বাঙালি পুঁজি অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের ঊর্ধ্বতন স্তরে কার্যত নিজের উপস্থিতি হারিয়ে ফেলে। দালাল ও ফটকা হিসেবে কলকাতা স্টক-এক্সচেঞ্জেও বাঙালিদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। এটা ছিল মাড়োয়ারি পুঁজির অবস্থানের একেবারে বিপরীত। মাড়োয়ারি পুঁজির ক্ষমতার প্রধান উৎস ছিল ব্যবসাখাতে অর্জিত মুনাফা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মতোই তখনো জমি ও অবাণিজ্যিক পেশাই ছিল বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম বিত্তশালী শ্রেণীর প্রধান বিচরণক্ষেত্র। তদুপরি ব্যবসা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাবের ফলে আধুনিক শিল্পে কার্যকরভাবে প্রবেশ উচ্চাভিলাষী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্যোক্তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। পাটশিল্পের বেলায় এ কথা বিশেষভাবে খাটে। সেই খাতে দেশীয় উদ্যোগের বিকাশ ঘটেছিল প্রথমত ব্যবসা থেকে শিল্পে রূপান্তরের ফল থেকে।

৬০. ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সিনিয়ন্ত্রিত কোম্পানিসমূহের মধ্যে বোর্ডে মাড়োয়ারি পরিচালক আছে এরকম কোম্পানির সংখ্যা ছিল কয়লাশিল্পে মাত্র ১৯ শতাংশ, কিন্তু পাটশিল্পে ৫৭ শতাংশ।

৬১. বলা দরকার যে, এই পর্বের বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা বলতে শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত-উদ্ভূত (এবং অনেকটাই উচ্চবর্ণঘেঁষা) ভদ্রলোক শিল্পোদ্যোক্তাদের উপরই আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

সম্ভাবনাময় বাঙালি উদ্যোক্তাদের আধুনিক শিল্পে প্রবেশের পথে আর একটা অন্তরায় ছিল পুঁজির অভাব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯২০-এর দশকে স্থাপিত পাটকল ইউনিটগুলোর প্রকৃত নির্মাণব্যয় ছিল যুদ্ধপূর্বকালীন মিলগুলোর ব্যয়ের তুলনায় অনেক বেশি (একটি প্রাক্কলন অনুযায়ী তাঁতপ্রতি ব্যয় ৫,৫০০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছিল ৯,৬০০ টাকা)। বেসরকারি শিল্পে রাষ্ট্রীয় আর্থিক সহায়তা ছিল না বিধায় সম্ভাব্য বাঙালি উদ্যোক্তাদের সামনে দু'টি মাত্র পথ খোলা ছিল—শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বিদ্যমান পুঁজির বাজার থেকে কাজ শুরু করার মতো পুঁজি সংগ্রহ এবং অন্যথায় অপ্রাতিষ্ঠানিক শহুরে ঋণদাতাদের কাছ থেকে ঋণগ্রহণ। পুঁজির বাজারের সুযোগ কার্যকরভাবে কাজে লাগানো যায় নি। বাঙালি উদ্যোক্তারা বাঙালি বিনিয়োগকারীদের মনে আস্থা জাগাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আরো কিছু কারণ উল্লেখ করা যায়। যেমন, যুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোতে উচ্চবর্ণের বাঙালি বিত্তশালী শ্রেণীর মাত্র গুটিকয়েক উদ্যোক্তা আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন। স্বদেশী উদ্যোগসমূহের ক্রমাগত অবক্ষয়ের ফলে উচ্চবর্ণের বাঙালি বিত্তশালী শ্রেণী উৎপাদনশীল উদ্যোগে জড়িত হওয়ার ব্যাপারে আগের চেয়ে আরো বেশি অনিচ্ছুক হয়ে পড়ে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা আভিজাত্যে ছিলেন অগ্রগণ্য, তাঁদেরকে ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলোতে 'সাক্ষীগোপাল পরিচালক' হিসেবে কাজ করতে আমন্ত্রণ জানানো হতো। ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালকমণ্ডলীতে প্রবেশের জন্য বছরের পর বছর তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত মাড়োয়ারিদের একেবারে বিপরীতে বাঙালি অভিজাত 'পুতুল পরিচালকগণ' কখনো বৃটিশপরিচালিত প্রতিষ্ঠান দখল করে নেবার প্রেরণা অনুভব করেন নি।[৬২] বেসরকারি ঋণদাতাদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের দ্বিতীয় পন্থাও ছিল সীমিত। ঘরোয়া ঋণদানের বাজারে মাড়োয়ারিদের প্রাধান্য ছিল নিরঙ্কুশ। মাড়োয়ারি মহাজনেরা দালাল ব্যবসায়ীদের অগ্রিম ঋণ দিত, পুঁজির তীব্র সঙ্কটকালে ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রিত ম্যানেজিং এজেন্সিগুলোকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিত এবং মাড়োয়ারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক লগ্নির এক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে বাঙালি উদ্যোক্তাদের সম্ভবত মাড়োয়ারি মহাজনদের উপর ভরসা করার মতো অবস্থা ছিল না। এ ছাড়াও মাড়োয়ারি মহাজনদের কাছ থেকে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নিলে তা

---

৬২. বিভিন্ন কারণে বাঙালি বিনিয়োগকারীরা পুঁজির বাজারে আস্থা অর্জন করতে পারে নি। Awwal(1983)-এ যেমন, ভুয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নামে জনসাধারণের কাছ থেকে পুঁজি সংগ্রহের মনোবৃত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্যবিত্ত-উদ্ভূত ভদ্রলোক-শিল্পোদ্যোক্তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে পূর্বতন অভিজ্ঞতার অভাবও এই অনাস্থার পিছনে কাজ করে থাকবে।

হতো ব্যাপকভাবে শর্তকণ্টকিত।[৬৩] দৃষ্টান্তস্বরূপ, আওয়াল উল্লেখ করেছেন যে, 'যখন হঠাৎকরে টাকার দরকার হতো এবং তহবিল থাকতো শূন্য, তখন উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণকে মহাজন ও মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের দ্বারস্থ হতে হতো। এসব ক্ষেত্রে সুদ দিতে হতো ব্যাঙ্ক ও ঋণদাতা অফিসগুলোর চেয়ে অনেক বেশি হারে, যা উঠানামা করতো বার্ষিক শতকরা ৯ থেকে ২৫ শতাংশের মধ্যে।'[৬৪]

উদ্যোগবিরোধী মানসিকতার মতো দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যাও এক্ষেত্রে একটা ভূমিকা পালন করেছে। পূর্ববঙ্গের সাহা এবং চট্টগ্রামের মুসলিম ব্যবসায়ীদের (সওদাগর) মতো দেশীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অবমাননাকর মনোভাবের মধ্যে এর প্রতিফলন পাওয়া যায়। সওদাগরগণ অভ্যন্তরীণ ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল (বিশেষকরে বার্মা-বাংলা বাণিজ্যপথে)। ১৯৩০-এর দশকের শেষ নাগাদ এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলো যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজির মালিক হতে পেরেছিল, যা আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা যেতো। কিন্তু সরকারের নেতিবাচক মনোভাব এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসনে কর্মরত বাঙালি ভদ্রলোকদের বর্ণবাদী মানসিকতার কারণে তা হতে পারে নি। এমনকি বাংলায় প্রাদেশিক সরকার গঠিত হবার পরও বাঙালি রাজনীতিক ও বেসামরিক আমলাদের মধ্যে শিল্পোদ্যোগবিরোধী প্রবণতা বিরাজমান ছিল। এ ব্যাপারে বাঙালি শিল্পোদ্যোগ চাঙ্গা করার লক্ষ্যে গৃহীত ১৯৩১ সালের বেঙ্গল স্টেট এইড টু ইন্ডাস্ট্রিজ এ্যাক্ট-এর ব্যর্থতা উল্লেখযোগ্য। আওয়াল উল্লেখ করেছেন, এমনকি ১৯৩৫ সালের শেষ নাগাদ বোর্ড অব ইন্ডাস্ট্রিজের প্রথম বৈঠকের প্রায় ২৭ মাস পরও 'একজন দরখাস্তকারী কোনরকম সাহায্য পায় নি।'[৬৫] ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত 'মাত্র দু'লাখ টাকা দেয়া হয়েছিল এবং কোনো ক্ষেত্রেই কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানিকে ১০ হাজার টাকার বেশি দেয়া হয় নি।'[৬৬] বরং, ১৯৩০-এর দশকের শেষভাগে প্রাদেশিক সরকারের পাশকরা কিছু আইন শুধু যে বাঙালি পুঁজির স্বার্থের সহায়ক হয় নি তাই নয়, উপরন্তু ইউরোপীয় পুঁজির জন্য গুরুত্বপূর্ণ

৬৩. প্রথম মহাযুদ্ধ শুরুর পর পর বাঙালি মালিকানাধীন বেশ কিছু ব্যাঙ্ক ও Loan Office প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, শুধুমাত্র ময়মনসিংহেই বাঙালি মালিকানাধীন অন্তত ৫টি ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপিত হয়েছিল। এগুলো হলো গৌরীপুর ময়মনসিংহ ব্যাঙ্ক, ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক, সিলেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা মডার্ন ব্যাঙ্ক, মডেল ব্যাঙ্ক। তবে এসব প্রতিষ্ঠান মূলত মফস্বলেই সক্রিয় ছিল এবং প্রধানত ব্যবসায়ী ও ভূস্বামীদের ঋণ দিত। ঋণের গড় পরিমাণ ছিল স্বল্প অর্থাৎ আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহে ঐসব ব্যাঙ্ক ও Loan Office সম্ভবত সমর্থ ছিল না। যাহোক, ১৯২০-এর দশকে এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই বন্ধ হয়ে যায় এবং এভাবে বাঙালি শিল্পপুঁজির জন্য অর্থ যোগানোর একটি সম্ভাব্য সূত্র অকার্যকর হয়ে পড়ে।

৬৪. Awwal, *Industrial Development*, 128.

৬৫. প্রাগুক্ত, 120.

৬৬. ঐ, 120-121.

আনুকূল্যের বিধান এতে ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মন্দাপরবর্তী বছরগুলোতে ইউরোপীয় পুঁজির প্রভাবাধীন ইন্ডিয়ান জুট মিল্‌স এসোসিয়েশন (আই. জে. এম. এ) একটা কর্মকালীন সময় অধ্যাদেশ জারি করার জন্য বাংলার প্রাদেশিক সরকারের নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে তদ্বির করেছিল। অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অধ্যাদেশটি পাশ হয়। এই সাফল্যের কারণ ছিল অন্যত্র : 'ফজলুল হকের নতুন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব সেই ৩৫ জন সদস্যের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল, যাঁরা বঙ্গীয় বিধানসভায় বহিরাগত পুঁজির প্রভাবাধীন শিল্প ও বাণিজ্যিক সমিতিগুলোর প্রতিনিধিত্ব করতো।'[৬৭] তদুপরি মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যাঁদের সাথে বৃটিশ বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানগুলোর কোন না কোনভাবে যোগাযোগ ছিল। ভূমিরাজস্বমন্ত্রী বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়ের বেশ কিছু শেয়ার ছিল ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রিত পাটশিল্পে। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পাটকল-শেয়ারের মালিক অর্থমন্ত্রী নলিনী রঞ্জন সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, 'বর্তমান সরকার বৃটিশ পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করবেই'।[৬৮] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন এবং বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সি হাউজগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন।[৬৯] মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার শাসনামলেও এক্ষেত্রে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। ১৯৪০-এর দশকে বিরাজমান নীতিগত পরিবেশেও অবাঙালি পুঁজি ছিল প্রধান সুবিধাভোগী। একমাত্র পার্থক্য ছিল এই যে, অবাঙালি মুসলিম পুঁজিও সে সময় কিছুটা সরকারি আনুকূল্য ও সমর্থন লাভ করেছিল। অবশ্য বাঙালি মুসলিম শিল্পোদ্যোগের বিকাশের প্রশ্নটি কখনও মুসলিম লীগ সরকারের পর্যাপ্ত দৃষ্টিআকর্ষণ করতে পারে নি।[৭০]

---

৬৭. Goswami, *Industry, Trade*, 145.
৬৮. ঐ, 146.
৬৯. ঐ।
৭০. কলকাতায় ১৯৩২ সালে মুসলিম ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি পৃথক চেম্বার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চেম্বার প্রথম থেকেই অবাঙালি পুঁজির নিয়ন্ত্রণে ছিল; ইস্পাহানী ও আদমজী গ্রুপদ্বয় ছিল এই চেম্বারের সবচাইতে প্রভাবশালী সদস্য। ১৯৪০-এর দশকে মুসলিম লীগ সমর্থকদের উদ্যোগে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় মুসলিম চেম্বার অব কমার্স গড়ে উঠে। তবে এসব চেম্বারের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। পাকিস্তান আন্দোলনের জন্য ব্যবসায়ীদের এক মঞ্চে সংগঠিত করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই এসব চেম্বার প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজনৈতিক সমর্থন লাভের বাইরে বাঙালি (মুসলিম) শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য অর্থনৈতিক সহায়তাদানের কোন লক্ষ্য এসব চেম্বার গঠনের পিছনে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে নি। আর.তাই দেখা যায় যে, 'পাকিস্তান অর্জনের পর লীগ এই ক্ষেত্রটি পরিত্যাগ করে'। দেখুন, S. A. Kochanek, *Interest Groups and Development: Business and Politics in Pakistan*, (Oxford 1983), 120। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে All-India Federation of Muslim Chambers of Commerce প্রসঙ্গে এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী পরবর্তীতে লিখেছিলেন : "জিন্নাহ সাহেবের আরো একটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। এবার তিনি মুসলিমদেরকে ঐক্যের আরো একটি উপায় হাতে তুলে দিলেন, ব্যবসা ও শিল্পে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করলেন, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যা খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল" (Kochanek 1983, 109)। স্পষ্টতই লীগ নেতৃত্বের কাছে বাঙালি মুসলিম শিল্পোদ্যোক্তা গড়ে তোলা কোন জরুরি বিষয় বলে প্রতিভাত হয় নি, বরং ইস্যুটিকে ভবিষ্যতের পাকিস্তানী রাষ্ট্রের একটি কাজ বলে পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল।

কলকাতার অবাঙালি মুসলিম ব্যবসায়ী এবং মুসলিম লীগেব মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইস্পাহানী পরিবার লীগের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল এবং লীগের দলীয় কাঠামোয় তাদের নেতৃত্বের অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আদমজীর মতো অন্যান্যরা লীগের তৎপরতা ও প্রকল্পসমূহে অর্থ যোগান দেয়ার ব্যাপারে বিড়লাদের ন্যায় ভূমিকা পালন করে। এরা কলকাতার মেমনদের সমর্থন লীগের পিছনে জড়ো করে। পর্যায়ক্রমে মাড়োয়ারি পুঁজির পাশাপাশি এসব পরিবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যের প্রধান সুবিধাভোগীতে পরিণত হয়। যদিও ব্যাপারটা নিয়ে আরো গবেষণা হওয়া প্রয়োজন, তবু মনে হয় যে, লীগের দলীয় কাঠামোর এবং প্রাদেশিক সরকারের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভাবে সম্ভাব্য বাঙালি মুসলিম উদ্যোক্তারা রাষ্ট্রীয় ঋণসাহায্য, লাইসেন্স, পারমিট, টেন্ডার, কন্ট্রাক্ট ও সাপ্লাই অর্ডারের সামান্যই সুযোগ নিতে পেরেছিল।'[৭১]

দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণ থেকেও একাধিক স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ. সি. লায়েক এবং যাদব ব্যানার্জী ছিলেন প্রথম উদ্যোক্তাদের দু'জন, যারা ঝারিয়ায় কয়লাখনি কিনেছিলেন। ১৯১১ সালে এঁদের প্রতিষ্ঠানকে অসচ্ছল ঘোষণা করা হয়। তার বড় কারণ এই যে, 'লায়েক এবং ব্যানার্জীর ছেলে ও নাতিরা কয়লাখনি চালানোর চেয়ে জমিক্রয়ের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছিল।'[৭২] একই কারণ ১৯২০-এর দশকে এন. সি. সরকার এন্ড সন্স (এই প্রতিষ্ঠানটি এক সময় ৮টি কয়লাখনি এবং অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতো)-এর অবক্ষয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাঙালি বিত্তশালী শ্রেণীর দ্রুত বড়লোক হওয়ার মানসিকতাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শ্রেণীর প্রযুক্তি ও বাজার, শিল্পোদ্যোগের প্রচেষ্টা ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ছিল না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে

---

৭১. মুসলিম লীগের দলীয় কাঠামোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত মুসলিম ব্যবসায়ী বৃত্তেও পৃষ্ঠপোষকতা বণ্টনের ইস্যুকে ঘিরে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছিল। ১৯৪৩ সালের পরে কোন সময়ে জিন্নাহকে লেখা এম. এ. এইচ. ইস্পাহানীর একটি চিঠি থেকে এর আভাস মেলে। জিন্নাহ চেয়েছিলেন যে, All-India Federation of Muslim Chambers of Commerce-এর সভাপতির দায়িত্ব যেন আদমজী-দাউদের উপরই বর্তায়। আদমজী এই দায়িত্ব নিতে রাজি ছিলেন না এবং এম. এ. এইচ ইস্পাহানীকে অনুরোধ করা হয় যাতে তিনি তাঁর ভ্রাতা ইস্পাহানীকে এই দায়িত্ব গ্রহণে রাজি কবাতে পারেন। এ প্রেক্ষিতে ইস্পাহানী জিন্নাহকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার সারার্থ নিম্নরূপ : 'আমার ভ্রাতার পক্ষে এই সম্মান গ্রহণ করা সম্ভব হবে না, কেননা এতে করে অনেকেই ফেডারেশনকে হেয় করার নিন্দা ছড়াবে। গত আঠারো মাস ধরেই বিরুদ্ধ পক্ষরা বলে আসছে যে, ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার জন্য ইস্পাহানীরা যে কাজ করছে এবং এই লক্ষ্যে অর্থব্যয় করছে তার কারণ তারা একে কুক্ষিগত করতে চায় এবং নিজেদের স্বার্থে একে ব্যবহার করতে চায়', (Kohanek, *Interest Groups*, 109) ।

৭২. S.K. Sen, *Studies in Economic Policy and Development of India, 1848-1926*, (Calcutta 1966), 71.

যে, ১৮৭৯ ও ১৯৩৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জলপাইগুড়িতে বাঙালি মালিকানায় কয়েকটি চা-বাগান গড়ে উঠে। অবশ্য এসব উদ্যোগের সাফল্য ছিল সীমিত। এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এর উদ্যোক্তাদের (অধিকাংশই আইনজীবী) দ্রুত বড়লোক হবার পাগলামি। একই মানসিকতার কারণে কয়েকটি ভুয়া প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বাজারে ছাড়া হয়, যার ফলে বাঙালি প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের মনে আস্থা আরো কমে যায়। এ সময়কার বাঙালি ব্যবসায়ীদের মধ্যে সাধারণভাবে শিল্পে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের কোন মানসিকতা ছিল না। এই মডেল পরে বাঙালির বাণিজ্যিক চিন্তার অংশে পরিণত হয়। হিন্দু ও মুসলিম বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সমভাবে প্রযোজ্য।

উপরে আলোচিত কারণসমূহ দ্বারা এমন কোন ধারণা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় যে, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের ভূমিকা দেশীয় শিল্পোদ্যোগের বিকাশ বাধাগ্রস্ত করার ব্যাপারে কম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতিমালা বাঙালি ও অবাঙালি উদ্যোক্তাদের মধ্যে তেমন কোন বৈষম্য সৃষ্টি করতো না, যদিও 'প্রথম প্রজন্মের' বাঙালি উদ্যোক্তারা সে সময় অনুকূল পরিবেশের অভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধিকাংশ বাঙালি বিনিয়োগকারী অবাণিজ্যিক পটভূমি থেকে এসেছিল বলে কেবলমাত্র সহায়ক অর্থনৈতিক পরিবেশ তাদেরকে ক্রমশ শিল্পোদ্যোক্তায় পরিণত করতে পারতো। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এ ব্যাপারে চরম নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, এমনকি যেসব ক্ষেত্রে বাঙালিরা বিনিয়োগের কিছুটা আগ্রহ দেখিয়েছিল, সেসব ক্ষেত্রেও মাড়োয়ারি পুঁজি মুখ্য প্রতিযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল কয়লা, চা, চালকল এবং 'বিবিধ' শিল্প, যেসব খাতে প্রথমদিকে মাড়োয়ারি পুঁজির অবস্থান ছিল একেবারে নগণ্য। ১৯৪০-এর দশকে মাড়োয়ারিরা রানীগঞ্জ ও ঝারিয়ার প্রায় অর্ধেক খনির মালিক হয়ে যায়। সে সময় মাড়োয়ারিরা বিদেশী মালিকানাধীন কয়লাকোম্পানিগুলোরও গুরুত্বপূর্ণ শেয়ারহোল্ডারে পরিণত হয়েছিল। ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বলা হতো যে মাড়োয়ারিরা ইঞ্জিনিয়ারিং, লোহা ও ইস্পাত, ফার্মাসিউটিক্যালস ও সিমেন্টের মতো আধুনিক শিল্পতৎপরতা থেকে দূরে থাকতে চায়। কারণ তারা 'নিজেদের জানা ব্যবসাগুলোতেই থাকতে চাইতো।'[৭৩] কিন্তু ১৯৩৫-৩৬ সালের পর মাড়োয়ারিরা এসব শিল্পে ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়ে, যদিও আগে তারা এগুলো এড়িয়ে চলেছিল।

৭৩. Goswami, " Marwaris", 241

এ পর্যন্ত আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে বৃহৎ ফ্যাক্টরি ধারার বাঙালি (হিন্দু) উদ্যোগসমূহের উপর। বাঙালি শিল্পোদ্যোগের ইতিহাসের একাধিক দিক এ আলোচনায় তেমন দৃষ্টিআকর্ষণ করে নি। অন্যান্যের মধ্যে এগুলো হচ্ছে—পূর্ববঙ্গে বাঙালি শিল্পোদ্যোগ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বাঙালি শিল্পোদ্যোগ এবং বাঙালি মুসলিম শিল্পোদ্যোগ। এ সমস্ত দিকের প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ এই রচনার আওতায় প্রদান করা সম্ভব নয়। তবে পূর্ববঙ্গে বাঙালি (মুসলিম) উদ্যোগের ধরন ও গঠন সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা যেতে পারে।

১.৭ পূর্ববঙ্গে বাঙালি উদ্যোগের ধরন ও গঠন

পূর্ববঙ্গে বাঙালি শিল্পোদ্যোগের ধরন ও গঠন সম্পর্কে বিশ্লেষণে যাবার আগে এ ব্যাপারে প্রাপ্ত শিল্পসংক্রান্ত পরিসংখ্যানের মান সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে কিছু বক্তব্য রাখা যথাযথ বলে মনে করি। সারণি ৩ ও ৪-এ শুধু ১৯৩৪ সালের ফ্যাক্টরি এ্যাক্ট-এর ২ (জে) ধারার অধীনে রেজিস্ট্রীকৃত অর্থাৎ ২০ বা ততোধিক কর্মী ও শক্তিচালিত মেশিনপত্র রয়েছে এমন সব শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। তাই এই সংজ্ঞা অনুসারে পূর্ববঙ্গে রেজিস্ট্রীকৃত বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের একটা চিত্র পাওয়া যায়। অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ফ্যাক্টরিজ এ্যাক্ট-এর অধীনে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক হলেও সর্বক্ষেত্রে তা করা হতো না। ফ্যাক্টরি পরিদর্শনের তেমন কঠোর কোন ব্যবস্থা না থাকায় এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দেশবিভাগের আগে শ্রম অধিদপ্তরের অফিসে এমনকি একজনও ফুলটাইম ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টর ছিলেন না।[৭৪] তাই, সারণি ৩ ও ৪-এ প্রদত্ত বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যে আরো বেশি ছিল তা ধরে নিতে হবে। প্রতিষ্ঠানের পুরো সংখ্যা ও খাতওয়ারি বিভাজনের ব্যাপারে দু'টি সূত্রের মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিভাগের উপাত্ত (সারণি ৪) অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। এতে ১৯৪৫ সালের ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ রুলস-এর আওতায় পরিচালিত শুমারির অধীনে প্রাপ্ত ও সংগৃহীত তথ্য দেয়া হয়েছে।

সারণি ৪-এ লক্ষ্য করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। বৃহৎ আধুনিক শিল্পোদ্যোগ কার্যত সুতীবস্ত্রখাতে সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ববঙ্গের আধুনিক উদ্যোক্তাদের মধ্যে সে সময়কার সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন সূর্য কুমার বসু (এবং পরবর্তীতে তাঁর ছেলে

---

৭৪. A. F. A. Husain, *Human and Social Impact of Technological Change in Pakistan*, Vol. 1, (London 1957), 107.

সুনীল কুমার বসু ও অনিল কুমার বসু)। ১৯৪৭ সালে বিদ্যমান ১২টি সুতীবস্ত্রমিলের মধ্যে বৃহত্তম ৪টির মালিক ছিলেন সূর্য কুমার বসু। এগুলো হচ্ছে চিত্তরঞ্জন কটন মিল (ধানঘর), ঢাকেশ্বরী কটন মিল (গোদনাইল) এবং লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল। একই গোষ্ঠী বোস গ্লাস ওয়ার্কস এবং আরো একাধিক প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিল। ১৯৩০-এর দশকের শেষ নাগাদ ঢাকেশ্বরী কটন মিল বাংলার সবচেয়ে লাভজনক মিলগুলোর অন্যতম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, এ সমস্ত সুতীবস্ত্রমিলের প্রায় সবগুলোই ছিল পুরোপুরি বাঙালি মালিকানাধীন। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের ৫৮টি জুট প্রেসিং মিল-এর মধ্যে অধিকসংখ্যক ছিল অবাঙালি পুঁজির অধীন। এগুলোর মধ্যে ল্যান্ডাল এ্যান্ড ক্লার্ক লিঃ একাই কমপক্ষে ১১টি জুট প্রেসিং মিল নিয়ন্ত্রণ করতো। এগুলো ছড়িয়ে ছিল সিরাজগঞ্জ, পাবনা, ঢাকা (মদনগঞ্জ), নরসিংদী, ঢাকা (লোহাগঞ্জ), সরিষাবাড়ি, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, আখাউড়া ইত্যাদি স্থানে। অপর ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রিত কোম্পানি র‍্যালী ব্রাদার্স লিঃ সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, সোনাকান্দা (নারায়ণগঞ্জ), সরিষাবাড়ি, চাঁদপুর ইত্যাদি স্থানে ৮টি জুট প্রেসিং মিল নিয়ন্ত্রণ করতো। আরেকটি বহিরাগত প্রতিষ্ঠান সিম এ্যান্ড কোং লিঃ ৫টি জুট প্রেসিং মিলের মালিক ছিল। এভাবে এ তিনটি গোষ্ঠী একত্রে পূর্ববঙ্গের সকল জুট প্রেসিং মিলের ৪১ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করতো। এতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ঘনীভবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলোর লক্ষণীয় বিচরণের আর একটা ক্ষেত্র ছিল চা-উৎপাদন : পূর্ববঙ্গে (অধিকাংশ সিলেটে) ১১৬টি 'রেজিস্ট্রীকৃত' চা-ফ্যাক্টরির ৯০ শতাংশের বেশির মালিক ছিল বিদেশী পুঁজি। জুট প্রেসিং মিলের ক্ষেত্রে মাড়োয়ারিরা ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। পূর্ববঙ্গে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ রেজিস্ট্রীকৃত চালকলের মালিক ছিল মাড়োয়ারিরা। জুট প্রেসিং, চা-ফ্যাক্টরি ও চালকলগুলোকে বাদ দিলে পূর্ববঙ্গে সে সময়কার মোট আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমে ১১৭-তে দাঁড়াবে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শিল্পায়ন হয়েছিল অত্যন্ত সীমিত মাত্রায়। এতে পূর্ববঙ্গের অর্থনীতির সে সময়কার বৈশিষ্ট্যসমূহও ধরা পড়ে। অধিকন্তু এই ১১৭টি প্রতিষ্ঠানের বড় অংশ মোটেও আধুনিক 'বৃহৎ' ফ্যাক্টরির প্রতিনিধিত্ব করতো না এবং বস্তুত এগুলো ছিল মাঝারি ও ছোট প্রতিষ্ঠানের অবস্থানে।

আগেই দেখানো হয়েছে যে, অধিকাংশ মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মালিক ছিল বাঙালি পুঁজি। সারণি ৫-এ প্রদত্ত উপাত্তের মধ্যে 'রেজিস্ট্রীকৃত' ও 'রেজিস্ট্রিবিহীন' ধরনের প্রতিষ্ঠানকে হিসাবে ধরা হয়েছে। এসমস্ত প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত সামগ্রীর ব্যাপক পরিধি বিবেচনায় আনলে এটা ভাবা অবাস্তব হবে না যে বাঙালির মধ্যে উৎপাদনপ্রবৃত্তির মোটেও

'মৃত্যু' ঘটে নি।[৭৫] বিপরীতপক্ষে ক্ষুদ্র বাঙালি শিল্পোদ্যোগের তাৎপর্যপূর্ণ প্রসার লক্ষ্য করা যায়, যাকে 'নিচের থেকে পুঁজিবাদ'-এর ব্যাপকতর প্রক্রিয়ার অংশ বলে ধরা যেতে পারে। আরো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সারণি ৫-এ প্রদত্ত উপাত্ত বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে 'উদ্যোগ গ্রহণে সহজাত স্পৃহার অভাব' সংক্রান্ত জাতিকেন্দ্রিক ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে।[৭৬] খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ (মেশিনে প্রস্তুত সোডাপানি, লজেন্স/ক্যান্ডি শিল্প, বিস্কুট ও কনফেকশনারি), রঞ্জনশিল্প, তেল ও ময়দার কল, সাবান প্রস্তুতকরণ, বিড়ি বানানো, ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং (বাক্স,ট্রাঙ্ক, কেবিনেট, সিন্দুক তৈরিসহ), মোমবাতি তৈরি, কাঠের আসবাব, ছাপাখানা, হোসিয়ারি শিল্প, ট্যানারি, বাঁশের কাজ ইত্যাদি বিচিত্র সব খাতে বাঙালি মুসলিম উদ্যোগের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। গুটি কয়েক সামগ্রী বাদে শিল্পোৎপাদনের প্রতিটি একক গুরুত্বপূর্ণ খাতে মুসলিম পুঁজির কোন না কোন মাত্রায় বিচরণের তথ্যও এক্ষেত্রে মনে রাখা যেতে পারে।

এখানে তর্ক উঠতে পারে যে, বাঙালি মুসলিম পুঁজির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের একটি বড় অংশ বস্তুত ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, তাই এগুলোকে আধুনিক (পুঁজিবাদী) উদ্যোগের দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করা যায় না। তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বৈদেশিক শাসকদের জন্য কৃষিজ পশ্চাৎভূমিরূপে সেবাপ্রদানকারী পূর্ববঙ্গের অর্থনীতির সার্বিক পশ্চাৎপদতাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনলে বাঙালি মুসলিম শিল্পোদ্যোগের উপরোক্ত খতিয়ান কোনো মতেই তাৎপর্যহীন বলে মনে হবে না। সুতীবস্ত্র ও কাঁচশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু দৃষ্টান্ত বাদ দিলে ক্ষুদ্র উদ্যোগই ছিল বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলিম পুঁজির শিল্পবিনিয়োগের প্রধান পন্থা। আর 'ক্ষুদ্র' থেকে 'বৃহৎ' শিল্পায়নে তাদের পরবর্তী রূপান্তরের সম্ভাবনা ছিল প্রধানত রাষ্ট্র কর্তৃক অনুকূল অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। এটা অবশ্য পরবর্তী সময়ের এক ভিন্ন ইতিহাস, যখন পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব বাংলায় আধা-ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার এক দশকের মধ্যে এসমস্ত উদ্যোক্তার প্রায় সকলকেই পূর্ব বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস থেকে হারিয়ে যেতে হয়েছিল।

---

৭৫. উল্লেখ্য যে, ৫ নং সারণিতে প্রদর্শিত পূর্ব বাংলায় মুসলিম মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের একাংশ অবাঙালি মুসলিম উদ্যোক্তাদের মালিকানায় ছিল বলে মনে হয়। তবে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে এদের আলাদা করে সনাক্ত করা সহজ নয়।

৭৬. বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্যোক্তামূলক দক্ষতা ও সামর্থ্যের অভাবের কারণ হিসেবে অনেক সময় এই যুক্তি দেওয়া হয় যে, মেমন বা চিনিয়টিদের মতো বংশ পরম্পরায় ব্যবসায়ী গ্রুপসমূহ এই অঞ্চলে ছিল না। ৫ নং সারণি থেকে স্পষ্ট হয় যে, বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক শিল্পোদ্যোক্তাসুলভ প্রেষণা (যা প্রতিফলিত হয়েছিল মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে) বিরাজমান ছিল, যা পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাকে প্রশ্নাকীর্ণ না করে পারে না।

সারণি ১ : বাংলায় আধুনিক শিল্পের খাতওয়ারি বন্টন, ১৮১৭-৫০

খাত / নাম	প্রতিষ্ঠাকাল/ স্থায়িত্ব
ক. নৌ-পরিবহণ	
১. বেঙ্গল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ এসোসিয়েশন	কলকাতা (১৮৩৮)
২. ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানি	কলকাতা (১৮৩০)
৩. স্টিম টাগ এসোসিয়েশন	কলকাতা (১৮৩৭)
৪. ইউনিয়ন স্টিম টাগ এসোসিয়েশন	কলকাতা (১৮৫০)
৫. ইস্টার্ন স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি	কলকাতা (১৮৪৮)
৬. বেনারস এন্ড মির্জাপুর স্টিম কোম্পানি	কলকাতা (১৮৪৭)
৭. ক্যালকাটা স্টিম ফেরি ব্রিজ কোম্পানি	কলকাতা (১৮৩৯)
৮. ইন্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি	কলকাতা (১৮৪৪)
খ. কয়লা	
৯. বেঙ্গল কোল কোম্পানি	কলকাতা (১৮২০)
১০. সিলেট কোল কোম্পানি	কলকাতা (১৮৪৭)
গ. নীল	
১১. বেঙ্গল ইনডিগো কোম্পানি	কলকাতা (১৮৪৮)
ঘ. বাগান	
১২. আসাম কোম্পানি	কলকাতা (১৮৩৯)
ঙ. সুতীকল	
১৩. বওরিয়া কটন মিলস	কলকাতা (১৮১৭-১৮)
১৪. নিউ ফোর্টগ্লস্টার মিলস কোম্পানি	কলকাতা(১৮৩০)
চ. অন্যান্য	
১৫. বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি	কলকাতা(১৮৩৮)

উৎস : আর. এস. রুংতা, *দি রাইজ অব বিজনেস কর্পোরেশনস ইন ইন্ডিয়া, ১৮৫১-১৯০০* (কেমব্রিজ ১৯৭০), ২৭৪-২৭৫।

সারণি ২ : বাঙালি ভদ্রলোক উদ্যোক্তাদের কয়েকটি স্বদেশী প্রতিষ্ঠান (১৮৬৭-১৯১৪)

উদ্যোক্তাদের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
১. কিশোরীলাল মুখার্জী	শিবপুর আয়রন ওয়ার্কস (১৮৬৭)
২. প্রফুল্ল চন্দ্র রায়	বেঙ্গল কেমিক্যালস (১৮৯৩)
৩. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	ইনল্যান্ড রিভার স্টিম নেভিগেশন (১৮৮৪)
৪. আনন্দমোহন বসু	তেজপুর চা-বাগান (১৮৮০-এর দশক)
৫. আনন্দমোহন বসু, ভগবান চন্দ্র বসু	ব্যাঙ্ক (১৮৮০-এর দশক)
৬. পার্বতীশংকর চৌধুরী	পিট কয়লা খনি থেকে আলকাতরা ও কালি প্রস্তুত
৭. সত্যসুন্দর দেব, মনীন্দ্র নন্দী, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, হেমচন্দ্র সেন	পোটারি ওয়ার্কস (১৯০৬)
৮. এ. পি. ঘোষ, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়	দিয়াশলাই কারখানা
৯. কে. সি. দাস, আর. এন. সেন	ক্যালকাটা কেমিক্যালস
১০. এস. এম. বোস	বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ কোম্পানি
১১. সি. কে. সেন	জবাকুসুম তেল প্রস্তুত
১২. এইচ. বোস	কুন্তলীন হেয়ার অয়েল প্রস্তুত
১৩. সত্যচরণ বসু	বেঙ্গল পটারি ওয়ার্কস
১৪. এম. এন. দত্ত, বিচারপতি শরফুদ্দিন	ইউরেকা পোরসেলিন ওয়ার্কস
১৫. উপেন্দ্রনাথ সেন, মনীন্দ্র নন্দী সূর্যকান্ত আচার্য্য, সীতানাথ রায় আবদুস সোবহান চৌধুরী নলীনবিহারী সরকার	বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস (১৯০৬)
১৬. মোহিনী মোহন চক্রবর্তী, জগৎ কিশোর চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	মোহিনী মিলস, কুষ্টিয়া (১৯০৮)
১৭. -	ক্যালকাটা উইভিং কোম্পানি (১৯০৭)
১৮. ত্রিপুরা কোম্পানির সাথে যুক্ত উদ্যোক্তাগণ	কটন জিনিং ফ্যাক্টরি (১৯০৭)
১৯. -	জলপাইগুড়ি পাইওনিয়ার উইভিং মিল (১৯০৭)
২০. আবদুস সোবহান চৌধুরী, আবদুল	বেঙ্গল হোসিয়ারি কোং (১৯০৮)

উদ্যোক্তাদের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
হালিম গজনভী	
২১. -	পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী কোম্পানি (১৯০৫)
২২. বিপ্রদাস পাল চৌধুরী, শিশির বসু	ট্যানারি কারখানা
২৩. নীলরতন সরকার,সুরেন্দ্রনাথ রায়, বিরাজমোহন দাস	ন্যাশনাল ট্যানারি (১৯০৫)
২৪. বিপ্রদাস পাল চৌধুরী, নীলরতন সরকার, মধুসূদন দাস, পণ্ডিত মোহন দাস, পণ্ডিত মোহন কৃষ্ণ ধর	বুট এন্ড ইকুইপমেন্ট ফ্যাক্টরি কোং (১৯০৪)
২৫. 'কার এ্যান্ড মহালনবিস'-এর সঙ্গে নীলরতন সরকার	ন্যাশনাল সোপ ফ্যাক্টরি (১৯০৬)
২৬. -	বেঙ্গল সোপ কোম্পানি
২৭. -	ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরি
২৮. -	বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরি
২৯. রাসবিহারী ঘোষ, পি. সি. রায়, এ. পি. ঘোষ	বন্দে মাতরম ম্যাচ ফ্যাক্টরি (১৯৭০)
৩০. রাজা পিয়ারী মুখার্জী, পি. মিটার	ওরিয়েন্টাল ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (১৯০৯)
৩১. -	ম্যাচ ফ্যাক্টরি, নড়াইল (১৯০৭)
৩২. -	গ্লোব সিগারেট কোম্পানি
৩৩. -	ইস্ট ইন্ডিয়া সিগারেট কোম্পানি
৩৪. -	বেঙ্গল সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি
৩৫. প্রমথনাথ বসু, যোগেন্দ্র ঘোষ, বিপ্রদাস পাল চৌধুরী	রংপুর টোবাকো কোম্পানি (১৯০৭)
৩৬. যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ এবং অন্যান্য	স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি (ব্যাঙ্ক) (১৯০৬)
৩৭. যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ এবং অন্যান্য	বেঙ্গল বাটন ফ্যাক্টরি (১৯০৭)
৩৮. যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ এবং অন্যান্য	পেনসিল প্রস্তুতকরণ ইউনিট (১৯০৭)
৩৯. জে. পি. বোস	কালি প্রস্তুতকরণ ইউনিট (১৯০৬)
৪০. -	কাগজকল (টিটাগড়)
৪১. -	কাগজকল (কাঁকিনারা)
৪২. -	কাগজকল (রানীগঞ্জ)
৪৩. ময়ূরভঞ্জের মহারাজা	মডার্ন পেপার প্লান্ট (পরিকল্পিত)

উদ্যোক্তাদের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
৪৪. নগেন্দ্রনাথ মজুমদার	মনোরমা ক্যান্ডল ফ্যাক্টরি (১৯০৭)
৪৫. -	ন্যাশনাল অয়েল মিল (১৯০৭)
৪৬. -	সুগার ওয়ার্কস (১৯০৬)

উৎস : সুমিত সরকার, *দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল*, ১৯০৩-১৯০৮, (নিউ দিল্লী ১৯৭৩) থেকে সংকলিত।

সারণি ৩ : পূর্ববঙ্গ সরকারের শ্রম পরিদপ্তরে রেজিস্ট্রীকৃত বিভিন্ন খাতের কারখানার তালিকা এবং শ্রমিকসংখ্যা (১৯৪৭) *

খাতসমূহ	ডিসেম্বর ১৯৪৭-এ কারখানার সংখ্যা	ডিসেম্বর ১৯৪৭-এ নিযুক্ত শ্রমিকের মোট সংখ্যা
১. সরকারি এবং স্থানীয় অর্থে পরিচালিত কারখানা	১৬	৯,২২০
২. অন্যান্য কারখানা (মৌসুমি) সর্বমোট	১৭০	১৮,৯০২
(ক) খাদ্য,পানীয় এবং তামাক	১১৬	৯,৭০২
(খ) জিন এ্যান্ড প্রেস (পাট, সুতা)	৫৪	৯,১৭২
৩. অন্যান্য কারখানা (স্থায়ী) সর্বমোট		
(ক) বস্ত্রকল	১৭	৯,৮৫০
(খ) প্রকৌশল শিল্প	২৫	২,৯৩৯
(গ) খাদ্য, পানীয় ও তামাক	৬৩	৩,৭৯৮
(ঘ) রাসায়নিক এবং চোলাই কারখানা	৯	৩২৩
(ঙ) কাগজ এবং ছাপাখানা	৩	৭৮
(চ) কাঠ, পাথর এবং কাচ	৬	৯৬১
(ছ) চামড়া	১	২৮২
(জ) বিবিধ	১	৯৮
মোট	৩১১	৪৬.৪৫১

* কেবল শক্তিচালিত এবং কমপক্ষে ২০ জন শ্রমিক নিয়োগকারী কারখানার সংখ্যা উল্লেখ করা হলো।

উৎস : এ. এফ. এ. হোসেন, *হিউম্যান এ্যান্ড সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট অব টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ ইন বাংলাদেশ*, খণ্ড ১, (লন্ডন ১৯৫৬), ১০৯।

সারণি ৪ : পূর্ব বাংলার বিভিন্ন খাতের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের তালিকা (বাণিজ্যিক উপাত্ত অনুসন্ধান বিভাগের তথ্য অনুসারে, ১৯৪৭)

খাতসমূহ / উৎপাদনের প্রকার	ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
১. চাউলকল	৮৩
২. বিস্কুট তৈরি (বেকারি ও কনফেকশনারিসহ)	১
৩. ফল এবং সব্জি প্রক্রিয়াকরণ	২
৪. চিনি	১০
৫. চোলাই কারখানা	১
৬. ভেষজ তেল	৩
৭. সিমেন্ট	১
৮. কাচ ও কাচপাত্র	৩
৯. দিয়াশলাই	৪
১০. সুতী (সুতা কাটা ও বয়ন)	১২
১১. পশমি বস্ত্র	১
১২. ঔষধসহ রাসায়নিক দ্রব্য	১
১৩. সাধারণ প্রকৌশল এবং বৈদ্যুতিক প্রকৌশল	১৯
১৪. জ্বালানি তেল পরিশোধন	২
১৫. করাত কল	৪
১৬. চা-উৎপাদন	১১৬
১৭. মুদ্রণ (লিথোগ্রাফ এবং বই বাঁধাইসহ)	৬
১৮. হোসিয়ারি এবং আন্যান্য বোনা কাপড়	১৩
১৯. কটন জিনিং এবং প্রেসিং	৫
২০. জুট প্রেসিং	৫৮
২১. বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং রূপান্তরকরণ	৮
২২. জাহাজনির্মাণ এবং মেরামত (শিপইয়ার্ড ও ডকইয়ার্ডসহ)	৬
২৩. রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, মেরামত কারখানা এবং রেল ইঞ্জিন কারখানা	১২
২৪. অন্যান্য শিল্প	৩
সর্বমোট	৩৭৪

মন্তব্য : উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা ১৯৩৪ সালের কারখানা আইনের ২ (জে) ধারায় রেজিস্ট্রীকৃত অর্থাৎ যেগুলোতে ২০ বা ততোধিক সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত এবং যার উৎপাদন কার্যক্রমের কোন-না-কোন অংশ শক্তিচালিত।

উৎস : পাকিস্তানের ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠান তালিকা, বাণিজ্যিক তথ্যানুসন্ধান বিভাগ এবং শিল্প পরিসংখ্যান শাখা, (করাচী ১৯৪৯),১-৩।

সারণি ৫ : পূর্ব বাংলার মুসলিম উদ্যোগ (১৯৪৭-৫০)

উৎপাদনের প্রকার	পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পূর্ব বাংলায় মুসলিম মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
১. ঔষধ	৬৪	১৭
২. বিস্কুট এবং কনফেকশনারি	২৯৩	১৯০
৩. সিমেন্ট	২	১
৪. খনিজ এসিড	১	-
৫. সেলুলয়েড	২	-
৬. প্রসাধনী	২	-
৭. চোলাইকৃত মদ ও স্পিরিট	১	-
৮. রঞ্জনশিল্প	২১	১২
৯. ফ্লোরিং টাইলস	৭	১
১০. কাচের জিনিস	৫	১
১১. দিয়াশলাই	১২	৪
১২. তেলকল	৯০	৩৬
১৩. রং এবং বার্নিশ	১	-
১৪. প্লাস্টিক	১৪	১১
১৫. সাবান	১০১	৪২
১৬. সোডিয়াম সিলিকেট	২	১
১৭. লবণ	৫	৪
১৮. চিনি	১১	১
১৯. তামাক	১	-
২০. বিড়ি	১৭৭	৯৯
২১. কৃষিপণ্যাদি	১২	৪
২২. এলুমিনিয়াম শিল্প	৪	-
২৩. বন্দুক মেরামত	১	-
২৪. ব্যাজ ও বোতাম	৪	৩
২৫. ব্যাটারি	১০	৩
২৬. বোল্টু, নাট এবং ওয়াশার	৫	২
২৭. বাক্স, ট্রাঙ্ক ইত্যাদি	১১৬	৪৩
২৮. বালতি	৮	২
২৯. কাঠের আসবাবপত্র ও সিন্দুক	৬৪	২৯
৩০. গরুর গাড়ির চাকা	১	-
৩১. ঢালাই (লৌহ এবং অলৌহ)	১৫	৩

উৎপাদনের প্রকার	পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পূর্ব বাংলায় মুসলিম মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
৩২. খড়কাটা কল	১	-
৩৩. মোমবাতি	৩৯	২৪
৩৪. সুতাকল মেশিন এবং যন্ত্রাংশ	১	-
৩৫. ছুরি, কাঁটা, চামচ শিল্প	৩৬	২
৩৬. ড্রাম	২	১
৩৭. বৈদ্যুতিক পাত	৪	২
৩৮. সাধারণ প্রকৌশল	৭০	২৩
৩৯. বরফকল	১৯	৩
৪০. তালা	১	-
৪১. সোডা লেমনেড	৫২	১৩
৪২. যান্ত্রিক করাত	৩৪	২২
৪৩. মেশিনারি এবং খুচরা যন্ত্রাংশ	১	-
৪৪. বাদ্যযন্ত্র	৩	
৪৫. ছাপাখানা	৭৩	১৯
৪৬. জুট প্রেস	৪৭	৭
৪৭. চাল ভাঙ্গার মেশিন	৫	-
৪৮. রিজেজ	৫	২
৪৯. রিভেট	৪	১
৫০. নির্মাণকাজ	৫	৩
৫১. খেলনা (শিশুদের)	২	১
৫২. ওয়াটার ফিটিংস (পিতল এবং ধাতব)	১	-
৫৩. ট্যানারি	৪৬	৩২
৫৪. জুতা এবং চামড়াপণ্যাদি	৫১	২৩
৫৫. হোসিয়ারি শিল্প	২৭১	২৮
৫৬. বস্ত্রবয়ন শিল্প	৫৫	২৪
৫৭. থ্রেড বল	২	১
৫৮. বেতের জিনিস	১৮১	১৭৯
৫৯. ছাইদানি	১	১
৬০. ব্যায়ামসরঞ্জাম	৩	২
৬১. শঙ্খশিল্প	১	১
৬২. কাঠের আসবাবপত্র	৬৭	৪১
৬৩. হাড়ের কল	২	১

উৎপাদনের প্রকার	পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পূর্ব বাংলায় মুসলিম মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
৬৪. ব্রাশ কারখানা	১	১
৬৫. বুনন কারখানা	৪	১
৬৬. বই বাঁধাই শিল্প	৫	৩
৬৭. সুতাকল	২২	২
৬৮. নারিকেলের ছোবড়ার শিল্প	২	২
৬৯. চিরুনি প্রস্তুতকারক	৫	৫
৭০. ডালকল	১৮	১৭
৭১. ময়দাকল	৭৯	৩৩
৭২. কালি	১	-
৭৩. জামদানী বস্ত্র	১	-
৭৪. রাবারসামগ্রী	২	-
৭৫. গহনাশিল্প	১৪	৪
৭৬. লজেন্স/ মিছরি শিল্প	৬৬	৪৫
৭৭. আয়না কারখানা	১	-
৭৮. কেশ তৈল	১	১
৭৯. গহনা পালিশ	২	২
৮০. কাগজশিল্প (হস্তনির্মিত)	১৩	১২
৮১. চাল, ডাল, আটা এবং তেলকল	১১৫	৩৯
৮২. চালকল	১৭০	৩৯
৮৩. শ্লেট প্রস্তুত	৩	-
৮৪. আখমাড়াই যন্ত্র	২	-
৮৫. সুরকি কল	৮	-
৮৬. টিন ও কামারের কাজ	২২	৫
৮৭. ছাতা কারখানা	১৫	১০

উৎস : পাকিস্তান সরকারের সরবরাহ ও উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত *পাকিস্তান ম্যানুফ্যাক-চারার্স ডিরেক্টরি*, ১৯৫১ থেকে হিসাব করে বের করা হয়েছে।

মন্তব্য :

১. পণ্যসামগ্রীর ধরনের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করায় বিভিন্ন উপখাতের ইউনিটগুলি একাধিক বার হিসাবে এসে পড়া স্বাভাবিক।

২. পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সংখ্যা উল্লিখিত সংখ্যার চেয়ে বেশিই হবে। কেননা প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের মালিকের ধর্মীয় পরিচয় জানা সম্ভব হয় নি।

৩. বড় এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প উভয়ের হিসাব নেওয়া হয়েছে। তবে ধারণা করা যায় যে অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানই ক্ষুদ্র।

১৪

রাষ্ট্র ও শিল্প : ১৮৮০-১৯৪২

ইফতিখার-উল-আউয়াল*

বাংলায় বৃটিশ শাসনের প্রায় দুশ' বছর পরেও শিল্পোন্নয়নের দিক থেকে প্রদেশটির অবস্থা শোচনীয় থেকে যায়। জনগণের উদ্যোগ ও শিল্পপ্রবণতার অভাব, মূলধনের স্বল্পতা, দক্ষ জনশক্তির অভাব, বাজারের সঙ্কীর্ণতা, অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, ধর্মীয় ও সামাজিক কাঠামো, পর্যাপ্ত কাঁচামালের অভাব, জনগণের অন-অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বহু কারণকে প্রদেশটির শিল্পক্ষেত্রে এ স্বল্প অগ্রগতির জন্য দায়ী করা হয়। যাহোক, অধিকাংশ প্রতিকূল কারণ যে একেবারেই দূর করা সম্ভব ছিল না এমন নয়। অসীম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে শুধু শিল্পোন্নয়নের বাধাগুলিই অপসারণ করতে সক্ষম ছিল না, যথাযথ নীতি নির্ধারণব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই শিল্পোন্নয়নের গতিধারা ত্বরান্বিত করতেও সক্ষম ছিল।

জাপান ও পাশ্চাত্যের শিল্পায়নে রাষ্ট্রের উদ্যোগী ভূমিকা এই দিক থেকে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতের জনগণ রাষ্ট্রের ঠিক এই ভূমিকাই দাবি করেছিল। তারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতো যে, সরকার ও জনগণের যৌথ সহযোগিতায় ভারতের তার সব প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বিশ্বের উৎপাদক দেশগুলির উচ্চতর পর্যায়ে না হলেও অন্ততপক্ষে সমপর্যায়ে না পৌঁছার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।[১] কিন্তু তাদের প্রত্যাশা কি পূরণ

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রবন্ধ আকারে এ অংশটি প্রথম প্রকাশিত হয় *Studies in History*, 5, 1 N. S. (1989) জার্নালে। এখানে পুনঃপ্রকাশের অনুমতিদানের জন্য প্রকাশক Sage Publications (New Delhi)-এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

১. Sir Ibrahim Rahimtoola in the *Indian Legislative Council*, 21 March 1916; দেখুন, *India Office Record* (এখন থেকে IOR), L/E/7/855.

হয়েছিল ? সরকারের সকল পর্যায়ের প্রশাসন কি এই শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজন ও সম্ভাবনার দিকে মনোযোগ দিয়েছিল ? যদি দিয়ে থাকে, তবে এই শিল্পোন্নয়নে তারা কতটুকু অংশগ্রহণ করেছিল ?

যাই হোক, এই অধ্যায়ে বাংলায় শিল্পায়নের মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানে রাষ্ট্র কি ভূমিকা পালন করেছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অধ্যায়টি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। শুল্ক, মালামাল ক্রয়, মূলধন সরবরাহ ও শিল্প-উদ্যোগ সম্পর্কিত নীতিগত ব্যবস্থাদি প্রথম চার ভাগে আলোচনা করা হয়েছে। শেষ অংশে রয়েছে আলোচ্য সময়ে সরকারের শিল্প-কর্মকাণ্ডের একটি সাধারণ সমীক্ষা।

১

পৃথিবীর সকল শিল্পোন্নত দেশ কোন না কোন সময়ে শিল্পোন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য যথোপযুক্ত আর্থিক প্রবিধানমালা গ্রহণ করেছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় দেশগুলি উচ্চহারে শুল্ক আরোপনীতি গ্রহণ করে। ফ্রান্সের ছিল নিজস্ব অতিমাত্রায় সংরক্ষণবাদী নীতি। জার্মান রাষ্ট্রসঙ্ঘ শিল্পজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপ করে এবং ১৮৪০-এর দশকে প্রায় সব শুল্কের হার বাড়িয়ে দেয়। আমদানির উপর রাশিয়ার ছিল নানা আরোপনীতি। বেলজিয়াম যখন সংযুক্ত নেদারল্যান্ডের অংশ ছিল, তখন (১৮১৫-১৮৩০) ১৮২১ ও ১৮২২ সালের আইনের অধীনে সংরক্ষণসুবিধা ভোগ করে এবং পরে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে করের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। হল্যান্ড ১৮৪৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বেলজিয়ামের সাথে সংযুক্ত থাকাকালীন সময়ে প্রবর্তিত শুল্কের পরিমাণ হ্রাস করতে শুরু করে নি।[২] ইউরোপ মহাদেশের শুল্কব্যবস্থা ১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়লেও (স্মরণযোগ্য যে শুল্ক কখনো সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নি, তা হ্রাস করা হয় মাত্র) ১৮৭০-এর দশক থেকে তা পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৩]

১৮৭৯ সালে জার্মানি নিশ্চিতভাবে সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করে এবং এই নীতির বদৌলতে দেশটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত শিল্পক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করে।[৪]

২. Shepherd Bancroft Clough and Charles Woolsey Cole, *Economic History of Europe*, (Boston 1968), 479, 608.

৩. ঐ, 610-11. Alcroft and Richardson also testify that 'tariffs, usually at increasingly higher rates were introduced intermittently by most important trading countries in the forty years before 1914. Derek H Alcroft and Harry W. Richardson, *The British Economy, 1870-1939*, (London 1969), 78.

৪. *Report of the Indian Fiscal Commission, 1921-22*, (Simla 1922), 33.

১৮৮১ সালে ফ্রান্সও অবাধ বাণিজ্যপ্রবণতা থেকে সরে দাঁড়ায়, যার প্রতি প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের কোন সমর্থন ছিল না।[৫] মহাদেশের বাইরে গৃহযুদ্ধের সময় থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে অতি সংরক্ষণমূলক শুল্কব্যবস্থা চালু ছিল।[৬] ১৮৯৯ সালে চুক্তির গণ্ডি ও প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি পেয়ে জাপানও সংরক্ষণমূলক শুল্ক প্রবর্তন করার জন্য তার স্বায়ত্তশাসনকে কাজে লাগায়।[৭] বৃটিশ 'উপনিবেশগুলিও ব্যতিক্রমহীনভাবে উচ্চশুল্কের দ্বারা তাদের শিল্পগুলিকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের স্বার্থে শুল্কনীতি প্রণয়ন করার অধিকার কাজে লাগায়।[৮] এমনকি ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় যে, অন্য সকল দেশের মতোই তার শিল্পভিত্তি অতিসংরক্ষণপদ্ধতির আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯] অন্যান্য দেশের উদাহরণ ছাড়াও শুল্কপ্রবিধানমালা অবলম্বনের পশ্চাতে অর্থনৈতিক যুক্তিও ছিল প্রবল।[১০] কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শুরু থেকেই ভারতের শুল্কনীতি ভারত সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় নি (যদিও তা হওয়া উচিত ছিল), নিয়ন্ত্রিত হয়েছে হোয়াইট হল থেকে বৃটিশ-রাজ কর্তৃক। তার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ বৃটিশ স্বার্থের অধীন হয়ে পড়ে। দৃশ্যত যে অবাধ বাণিজ্যনীতি ইংল্যান্ডের জন্য ছিল খুব লাভজনক তা ভারতের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। এ ধরনের বাণিজ্যনীতির ফলাফল সর্বনাশা। যে কয়টি ক্ষুদ্রশিল্প ভারতের ছিল, যেমন তাঁতশিল্প, রেশম ও চিনিশিল্প, সেগুলি বিদেশের শিল্পজাত দ্রব্যের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। এ অসম প্রতিযোগিতা ভারতের কতিপয় শিল্প ধ্বংস করা ছাড়াও আধুনিক শিল্পের উত্থানকে বাধাগ্রস্ত করে এবং আধুনিক শিল্পকে যদি প্রাথমিক

৫. ঐ, 33

৬. ঐ।

৭. ঐ।

৮. প্রাগুক্ত, *The Friend of India* লিখেছে : "The Australian Protectionists have evidently not the slightest desire to encourage inter-imperial trade. What they want to encourage is the development of Australian manufactures, and their programme is to make the Australian taxpayer provide the money for the development Not only will all important categories of manufactured goods be heavily taxed, from whatever part of the world they may come, but also heavy money bounties are to be paid to encourage the export from Australia of iron and steel goods and of textiles It is argued that infant industries can not be expected to struggle unaided against the well-equipped factories and workshops of the old world", *The Friend of India*, 12 July 1900, 5.

৯. দেখুন, Ralph Davis, "The Rise of Protection in England, 1689-1786", in the *Economic History Review*, Second Series, XIX, (1966), 306-317.

১০. Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Vol. I, edited by Edwin Cannan, (London 1904), 422-23.

পর্যায়ে বিদেশের প্রাগ্রসর প্রতিযোগীদের থেকে রক্ষা করা যেতো, তবে তার উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব হতো।

শিল্পের উন্নতিসাধন করতে হলে যে বাণিজ্যিক নীতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন তা উনিশ শতকের শেষ পাদ থেকে ভারতীয় জনসাধারণ উপলব্ধি করতে শুরু করে। ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে মোরারজী গোকুলদাশ সরকারের কাছে লিখিত এক পত্রে বলেন যে, অবাধ বাণিজ্যনীতি থেকে সরে আসা প্রয়োজন যাতে ভারতে নতুন শিল্প ও উৎপাদকদের উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর মতে, রাজনৈতিক অর্থনীতির নীতিমালা থেকে এইরূপ সরে আসাকে বাধ্যতামূলকভাবে এসব নীতির লঙ্ঘন বলে ধরা যায় না, বরং একে ভারতীয় সমাজের অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করা যায়।[১১]

স্যার লোপার সেলপৌনডায়ার ভারতে সদ্য গড়ে উঠা শিল্পের জন্য আর্থিক সংরক্ষণের পক্ষে প্রবল জনমত লক্ষ্য করেন। তিনি নিজেই মত পোষণ করেন যে, যখন কল-কারখানায় তৈরি পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা হয়, যে পণ্যের নিজ দেশে সংরক্ষিত বাজারের প্রাথমিক সুবিধা রয়েছে, তখনই সেই প্রয়াস হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও প্রকৃতই ধ্বংসাত্মক।[১২] মাদ্রাজের স্কুল অব আর্টস্ এ্যান্ড কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আলফ্রেড স্যাটারটন সরকারের কাছে পেশকৃত তাঁর স্মারকলিপিতে পরিস্থিতির নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন :

> বাণিজ্যিক সমস্যাগুলিই হচ্ছে মূল সমস্যা, এবং এমনকি সমস্যাগুলির আংশিক সমাধানও সম্ভবত ভারতে শিল্পবিস্তারের পথ প্রশস্ত করবে এবং এই শিল্পবিস্তার বাস্তবিকই ভারতের উন্নতিবিধানের সহায়ক হবে। ইতিপূর্বে ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ইউরোপ মহাদেশে সুসংগঠিত এবং উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত উৎপাদনসমূহের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠা করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। প্রাথমিকভাবে বিরূপ পরিস্থিতিতে এই শিল্পপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কি করা যেতে পারে তার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে।[১৩]

বিপুল জনমত, অন্য দেশের উদাহরণ এবং বৈধ অর্থনৈতিক যুক্তি সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার ১৯১৬ সাল পর্যন্ত ভারতের শুল্কসমস্যা পুনর্বিবেচনা করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে, যখন ভারতের অধিকতর শিল্পোন্নয়নের সম্ভাব্যতা নিশ্চিত করার জন্য ভারতীয় শিল্প

১১. Notes by Morarji Gokaldas, C. I. E., on the Duty of Government in Fostering Industries দেখুন, IOR. L/PAR/1/176, 217-19

১২. *Industrial India*, Vol. III, No. 10 October 1906, 287

১৩. *The Indian Agriculturist*, 1 May 1901, 145

কমিশন গঠন করা হয়।[১৪] ১৯১৯ সালে যখন সেক্রেটারি অব স্টেট এবং ভারত সরকারের মধ্যে সম্পর্কের বিষয় পরীক্ষা করার জন্য গঠিত যৌথ সিলেক্ট কমিটি তার সুপারিশে এই মর্মে আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, হোয়াইট হল থেকে আর্থিক নীতির নিরবচ্ছিন্ন পরিচালনায় ভারত এবং গ্রেট বৃটেনের মধ্যে সুসম্পর্কের হানি হতে পারে, তখনই বৃটিশ সরকার নতি স্বীকার করে।[১৫] সেক্রেটারি অব স্টেট ১৯২১ সালের ৩০ জুন কমিটির সুপারিশ গ্রহণের বিষয়টি ভারত সরকারকে জানায়। ভারত সরকারের শুল্কনীতি সম্পর্কিত সকল সুবিধা ও স্বার্থ পরীক্ষা করার জন্য ভারত সরকার ১৯২১ সালের ৭ অক্টোবর একটি অর্থনৈতিক কমিশন নিয়োগ করে।[১৬]

ভারতীয় অর্থনৈতিক কমিশন শিল্পোন্নয়নের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে যতদূর সম্ভব জনগণের উপর শুল্কের বোঝা হালকা করার জন্য একটি পক্ষপাতমূলক নীতির পক্ষে মত প্রকাশ করে। সংরক্ষণীয় শিল্প নির্বাচনে তা তিনটি মৌলিক শর্ত আরোপ করে। শর্তগুলো হচ্ছে—প্রথমত, অবশ্যই শিল্পে প্রাকৃতিক সুবিধা, সস্তায় বিদ্যুৎ, যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক সরবরাহ এবং বিপুল দেশীয় বাজার থাকতে হবে; দ্বিতীয়ত, শিল্প হবে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যার দেশের স্বার্থে সংরক্ষণ ব্যতীত মোটেই কিংবা আশানুরূপ ত্বরিত গতিতে অগ্রগতিলাভের সম্ভাবনা নেই ; তৃতীয়ত, শিল্পকে এমন হতে হবে, যা পরিণামে সংরক্ষণ ব্যতীত বিশ্বপ্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে সক্ষম হবে।[১৭] ভারত সরকার সুপারিশগুলি গ্রহণ করে এবং শুল্কনীতিকে কার্যকর করে তোলার জন্য ১৯২৪ সালের জুন মাসে একটি শুল্কবোর্ড গঠন করে। এর প্রধান কাজ ছিল সংরক্ষণের আবেদনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশসমূহ ভারত সরকারের কাছে পেশ করা।

শুল্কবোর্ড বহু আবেদনপত্র পরীক্ষা করে এবং যথাযোগ্য আবেদনগুলি সুপারিশ করে সরকারের কাছে পেশ করে। যেসকল শিল্প সংরক্ষণ অনুমোদন করা হয়, সেগুলি থেকে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২৬-২৭ সালে সুতীবস্ত্র শিল্প সংরক্ষণ অনুমোদন করা হয় এবং কলকারখানার সংখ্যা ও তাদের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৩১ সালে বাংলায় একুশটি কাপড়ের কল ছিল এবং ১৯৩৬ সালে এর সংখ্যা চৌষট্টিতে

১৪. দেখুন, ভারতীয় বিধানসভায় স্যার উইলিয়ম ক্লার্কের বক্তৃতা, ১৯১৬।

১৫. *Report from the Joint Select Committee on the Government of India Bill,* Vol. I, Report and Proceedings (Parliamentary Paper IV of 1919), II, Clause 33.

১৬. *Report of the Indian Fiscal Commission, 1921-22,* iv.

১৭. ঐ, 54-55

বৃদ্ধি পায়।[১৮] ১৯২৬-২৭ সালে বাংলার কাপড়ের কলগুলি ৩১.৫৪ মিলিয়ন পাউন্ড সুতা কাটে এবং ৭.৫ মিলিয়ন পাউন্ড বস্ত্র বয়ন করে। ১৯৩৮-৩৯ সালে এই সুতার পরিমাণ ৪৫.৭০ মিলিয়ন পাউন্ড এবং বস্ত্রের পরিমাণ ৪৩.৮ মিলিয়ন পাউন্ড বৃদ্ধি পায়।[১৯] অনুরূপভাবে প্রধানত বিদেশী প্রতিযোগিতার কারণে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত একটি আধুনিক চিনির কলও বাংলায় ছিল না এবং এই বছর চিনিশিল্প সংরক্ষণ অনুমোদন করা হয়েছিল। যাই হোক, ১৯৩৮-৩৯ সালে বাংলায় দৈনিক মোট ৫০০০ টন পেষণক্ষমতাসম্পন্ন ১০টি চিনির কল ছিল।[২০] সুতীবস্ত্রের ক্ষেত্রে বোম্বে এবং অন্যান্য এলাকা এবং চিনির ক্ষেত্রে যুক্তপ্রদেশ ও বিহার থেকে অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা না হলে এই দু'টি শিল্প—সুতীবস্ত্র ও চিনি সংরক্ষণমূলক শুল্ক থেকে সম্ভবত অনেক উপকৃত হতো।

লৌহ ও ইস্পাত ছিল আরেকটি শিল্প। ১৯২৪ সালে এই শিল্পের যে সংরক্ষণ অনুমোদন করা হয় তাতে এর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। বাংলায় মেসার্স স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ এ্যান্ড কোম্পানি বালীগঞ্জে হুকুমচাঁদ বৈদ্যুতিক ইস্পাত কারখানা চালু করে। এখানে উৎপাদিত ইস্পাত ছিল অতি উচ্চ মানসম্পন্ন এবং বৃটিশ প্রকৌশলমানে প্রথম শ্রেণীর সাথে তা তুলনীয়।[২১] বাংলায় অন্য দু'টি বড় শিল্প—লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানিও উপকৃত হয়। প্রথমটি ছিল বাংলা লৌহ কোম্পানি[২২] এবং এটি কাঁচা লোহা, ঢালাই লোহার পাইপ, বেড়া নির্মাণের খুঁটি এবং সকেট, রেল-চেয়ার ও স্লিপার উৎপাদনে ছিল বিশিষ্ট। এই জাতীয় পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে বাংলা পৃথিবীর কোন দেশের কাছে হার মানে নি।[২৩] অন্যটি ছিল ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানি এবং এটি ১৯১৮ সালের মার্চে তিন কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধন নিয়ে স্থাপিত হয়।[২৪] এ দু'টি কোম্পানি ১৯৩৬ সালে একটি সংযোজিত কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং সমন্বিত কোম্পানি হিসেবে

---

১৮. Report *of the Indian Tariff Board regarding the grant of protection to the Cotton Textile Industry*, Calcutta, 1932, 9-10, and Government of Bengal, Department of Industries, *Bulletin No 75, Cotton Mill Industry in Bengal*, Alipore, 1943, 6

১৯. *Statistical Abstract for British India with Statistics, where available, relating to certain Indian states from 1921-22 to 1930-31,* (London 1933), 754-57, ঐ, 1930-31 to 1939-40, (London 1943), 626-29.

২০. *Sugar Technologist's Association (of India) Year Book, 1939-40,* (Cawnpur n. d), appendices on the List of Sugar Factories and Refineries existing in India in the year 1938-39, list A, 14-15. For a study of the growth of sugar mill industry under tariff protection, see A K. Bagchi, *Private Investment in India*, (Cambridge 1972), 359-90.

২১. *The Indian Railway Gazette*, June 1925, 212-13.

২২. দেখুন, *Report on the Administration of Bengal, 1921-22*, 41.

২৩. *The Englishman* (Annual Financial Review), 4 March 1918, 9

২৪. *Report on the Administration of Bengal, 1921-22,* 41.

এটি বর্তমানে বার্ষিক ৮৫০,০০০ টন কাঁচা লোহা এবং ১০০,০০০ টন ঢালাই লোহার পাইপ, স্লিপার ও সাধারণ ঢালাই লোহা উৎপাদনে সক্ষম।[২৫] ১৯৩৭ সালে কাঁচা লোহা থেকে ইস্পাত উৎপাদনের জন্য স্টিল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল নামে একটি নতুন কোম্পানি গঠন করা হয়। স্টিল কর্পোরেশন প্লান্ট আসানসোলের কাছে ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানির চুল্লীর পাশেই স্থাপিত হয় এবং একটি চুক্তির শর্তানুসারে কর্পোরেশনটি ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানির কাছ থেকে উত্তপ্ত ধাতু লাভ করতো।[২৬] সুস্পষ্ট নির্দেশ অনুসারে কর্পোরেশন ইমারতি দ্রব্য, ভারী রেল, পাত (কালো ও দস্তালিপ্ত), লোহার দণ্ড, ইস্পাত ও যন্ত্রের জন্য ইস্পাত উৎপাদন করতো।[২৭] প্রধানত সংরক্ষণের কারণে লৌহ ও ইস্পাতশিল্প দৃঢ়ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়।[২৮] এর প্রভাবাধীনে জাহাজনির্মাণ শিল্পেরও উন্নতি হয়। যৌথ লৌহ, ইস্পাত ও জাহাজনির্মাণ কোম্পানির মোট সংখ্যা ১৯২০-২১ সালে ছিল ২৯টি। এই সংখ্যা ১৯২৫-২৬ সালে ৩৯টি এবং ১৯৩০-৩১ সালে ৫৯টি পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে বাংলায় এরকম কোম্পানির সংখ্যা ৬৯-এর কম ছিল না।[২৯]

পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন আরো দ্রুত হতে পারতো সরকার যদি এই শিল্পোন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য বাস্তবিক পক্ষে আন্তরিক হতো। বহুক্ষেত্রেই শুল্কবোর্ডের সুপারিশমালা গ্রহণ করা হয় নি কিংবা কেবল আংশিকভাবে গ্রহণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ভারী রাসায়নিক শিল্পের কথা বলা যেতে পারে।[৩০] অনেক সময় সরকার কাচশিল্পের ক্ষেত্রে কঠোর ও অনমনীয় ব্যাখ্যা সম্বলিত শর্ত আরোপ করেছে। এই শিল্প কেবল সোডাভস্মের কারণে সংরক্ষণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই সোডাভস্ম এমন একটি কাঁচামাল, যা এই কাচশিল্পের উৎপাদনের জন্য আমদানি করতে হতো।[৩১]

২

কোন এক সময়ে যখন সংরক্ষণের জন্য ভারতীয় দাবিকে নিশ্চিতভাবে বাতিল করে দেয়া হয়, তখন সরকারের সামরিক-বেসামরিক বিভাগগুলির জন্য সেক্রেটারি অব স্টেটের

---

২৫. *Report of the Indian Tariff Board on the continuance of protection to the Iron and Steel Industry,* (Bombay 1947), 9
২৬. ঐ, 10
২৭. ঐ।
২৮. ঐ, 6
২৯. Department of Industries, *Bengal: Bulletin No 83, Report on the Growth of Joint-Stock Companies in Bengal,* Alipore, 1939, 11.
৩০. IOR Economic and Overseas Department Collections, File No. L/E/9/1027.
৩১. *Bengal Legislative Council Proceedings,* 27 February 1939, Vol. I, 335.

অনুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে ভারত সরকার কর্তৃক প্রণীত স্থানীয়ভাবে গুদামজাতকরণ নীতিমালায় ভারতীয় উৎপাদনস্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা পরিলক্ষিত হয়। উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত এই সব মালের প্রত্যেকটি—সবচেয়ে বড় কলকব্‌জা থেকে শুরু করে দরজার সবচেয়ে ছোট পেরেক পর্যন্ত ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা হতো।[৩২] এই ধরনের অসাধু কারবার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে *দি স্টেটস্‌ম্যান* এবং *দি ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া* বলেছে :

> স্থানীয় প্রস্তুতকারকগণ সুবিস্তৃত সেতু ও ছাদের জন্য ইন্ডিয়া অফিসের মাধ্যমে যেরূপ উন্নতমানের ও সস্তা উপকরণ লাভ করা যায় সেরূপ উন্নতমানের সস্তা উপকরণ যদি উৎপাদন করতে পারে, তবে কাণ্ডজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকে কেন তা করতে দেয়া যাবে না ? এমনকি শুধু যখন তাদের স্বার্থ বিপন্ন হয় এবং যে রাষ্ট্রের শ্রমে তারা আত্মনিয়োগ করে, যে রাষ্ট্রের সাজসরঞ্জাম উৎপাদনে তারা যথাযথভাবে উৎসাহিত হয়ে কালক্রমে নিজেদেরকে কাজে লাগাবে, সেই রাষ্ট্রের স্বার্থ বিপন্ন হয় (যদিও ব্যাপারটি বাস্তবিক পক্ষে তা নয়), তখন তাদেরকে তা কেন করতে দেয়া যাবে না ? সর্বোপরি, একটি কঠিন বিধি হিসেবে এটি কেন প্রতিষ্ঠিত হবে যাতে নির্মাণাধীন রেলপথের ক্ষেত্রে সমগ্র প্রয়োজনীয় সরবরাহ পূর্বেকার মতো সেক্রেটারি অব স্টেটকে ফরমাশ প্রদানের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে বলা হয়েছে ? এক্ষেত্রে কেন ব্যতিক্রম (আকস্মিক বা অদৃষ্টপূর্ব জরুরি বিষয় না হলে) আরোপ করতে পারা যাবে না ? যদি স্থানীয় প্রস্তুতকারকগণ মানসম্পন্ন এবং সেক্রেটারি অব স্টেটের মাধ্যমে যেরূপ সস্তায় স্লিপার কিংবা রেল অথবা এমনকি রেল-ইঞ্জিন পাওয়া যায় সেরূপ উক্ত বস্তুগুলি উৎপাদন করতে পারে, তাহলে তারা সরেজমিনে থেকেও কেন ন্যায্য, সৎ এবং জাতীয় সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে না ? ন্যায়পরায়ণতা ও বিবেকবুদ্ধির স্পর্শ থাকবে এরূপ কোন উত্তরও দেয়া সম্ভব হবে না, তবে এমন উত্তর হয়তো আছে যেটি কখনো দেয়া যাবে না কিংবা যে উত্তরটি যারা ঐ সকল স্টোরবিধি তৈরি করেছিলেন তাঁদের উপর সীমাহীন কলঙ্ক লেপন করবে।[৩৩]

জনগণের সমালোচনার ফলে স্টোরবিধি পরবর্তী সময়ে পরিবর্তন করা হয়। ১৯০৪ সালের পরিবর্তিত বিধিমালার অধীনে ভারত সরকার ও স্থানীয় সরকারের কয়েক জন কর্মকর্তাকে অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ টাকা মূল্যের স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন মাল ক্রয়ের ক্ষমতা দেয়া হয়।[৩৪] যাই হোক, নির্দেশমালায় ক্রটি থাকার কারণে এমনকি সরকারের এই নীতিও সম্পূর্ণ কার্যকর করে তোলা সম্ভব হয় নি। বিধিমালা বরং অনুমতিজনকরূপেই গঠন করা হয় এবং এতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্যের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান প্রয়োজনীয় বিবেচিত

৩২. IOR: L/PAR/1/176. দেখুন *Note* by Moraiji Gokaldas.

৩৩. *The Statesman and Friend of India,* 21 November 1891, 2.

৩৪. IOR: Vol. 7861, *Bengal General Proceedings* (Misc.), November 1908, No. 79, 455.

হয় নি।[৩৫] অধিকন্তু বিধিমালা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে বাস্তব অসুবিধা ছিল, যেক্ষেত্রে অবশ্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ও ইংল্যান্ড থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহের মূল্য ও গুণগত মান তুলনা করার প্রয়োজন হতো।[৩৬] আমদানিকৃত উপকরণ থেকে ভারতে কোন্ দ্রব্য তৈরি বা আংশিকভাবে তৈরি অবস্থায় ভারতে আমদানি করা যাবে না—এরকম শর্তে তা ব্যাখ্যার জটিলতা কম ছিল না।[৩৭] এসব ত্রুটির ফল এই যে, ভারতে সরকারি বিভাগগুলির ব্যবহারের জন্য মাল ক্রয় করতে নির্দেশিত প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করার জন্য গঠিত কমিটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভোক্তা বিভাগগুলির চাহিদা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পায় যে, ১৯০৪-০৫ সালে লন্ডনে ৪৬৭,৩১৯ পাউন্ড মূল্যের ফরমাশ দেয়া হয়, যা সম্ভবত স্থানীয় উৎপাদন দ্বারা মেটানো যেতো।[৩৮] *দি স্টেটস্ম্যান* জানায় :

> কমিটি মনে করে যে, ভারতীয় প্রস্তুতকারকদের শক্তি ও দক্ষতা পরিপূর্ণরূপে কাজে লাগানো হচ্ছে না ... ভারতীয় প্রস্তুতকারকগণ বর্তমানে তাদের উপর সরকারি বিভাগ কর্তৃক অর্পিত কাজের চেয়ে আরো অধিক পরিমাণ কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম ও আগ্রহী বলে কমিটি সন্তোষ প্রকাশ করে ...।[৩৯]

১৯০৮ সালে গভর্নর জেনারেল সম্ভবত ১৯০৬ সালের কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি প্রশাসনিক বিভাগের মাল ক্রয়ের জন্য ২৫০ টাকা পর্যন্ত অর্থসীমা পুনর্নির্ধারণ করেন, যা ভারতে বিভাগসমূহের প্রধান, বিভাগীয় কমিশনার এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃক নির্বাচিতব্য কালেক্টর পদমর্যাদার বা কালেক্টর পদের উচ্চতর পদমর্যাদার অন্যান্য কর্মকর্তা কর্তৃক সংগৃহীত হতে পারে।[৪০] ইন্ডিয়া অফিসে মালের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ফরমাশগুলি অন্তর্ভুক্ত করার আগে সেগুলি সতর্কতার সাথে বাছাই করার উদ্দেশ্যে ১৯০৯ সালে পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়।[৪১] স্টোরবিধিমালায় এসব সংশোধন কিন্তু স্থানীয় উৎপাদন অনুমোদনকারী কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোন প্রশংসনীয় পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। তা করতে না পারার একটি সম্ভাব্য কারণ হয়তো ছিল ১৯২২ সালের আগে ভারতে যথোপযুক্ত ক্রয়এজেন্সিগুলির অনুপস্থিতি। ফলে স্থানীয় উৎপাদিত

৩৫. দেখুন, IOR: Vol. 8139, *Bengal General Proceedings* (Misc.), August 1909, Nos 12-15, 187

৩৬. ঐ।

৩৭. ঐ।

৩৮. *The Statesman,* 22 July 1909, 14

৩৯. ঐ।

৪০. IOR. Vol 7861, *Bengal General Proceedings* (Misc.), November 1908, No. 79, 455.

৪১. *The Statesman,* 22 July, 1909, 14.

দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দকে সেসব দ্রব্যের সন্ধানে থাকতে হতো যেগুলি ছিল মূল্যের দিক থেকে সন্তোষজনক ও অনুকূল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতের সঙ্গে রপ্তানিবাণিজ্য চালিয়ে যেতে ইংল্যান্ডের অক্ষমতার কারণে প্রথমবারের মতো ভারতীয় শিল্পোদ্যোক্তাগণ অস্থায়ীভাবে হলেও উন্নতিসাধনের সুযোগ পায়। মালভাড়া কমানোর জন্য বৃটেন থেকে ভারতে রপ্তানি- নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা তৈরি করা হয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কঠোর নিয়ম-বিধি প্রণীত হয়। বিভিন্ন সরকার ও বিদেশী সেনাবাহিনীর কাছে মাল সরবরাহের সময় যুদ্ধোপকরণ বোর্ড অন্যসব বিভাগ-কর্পোরেশন ও রেল কোম্পানি একত্রে যে পরিমাণ কিনতে পারে তার দ্বিগুণ মাল নিজেই কিনতে থাকে। এতে কিছু কিছু শিল্প-কারখানার উদ্ভব হয়।[৪২]

যুদ্ধের পরে ভারতীয় শিল্প কমিশনের সুপারিশমালা অনুযায়ী রেল বোর্ডের সদস্য এফ. ডি. কোচম্যানের নেতৃত্বে মালক্রয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ভারতীয় স্টোর বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। এতে বলা হয় যে, এই বিভাগ ভারত সরকারের সকল কেন্দ্রীয় বিভাগের পক্ষে কাজ করবে এবং প্রয়োজনে সকল বিভাগ এই কমিটির সহায়তা গ্রহণ করবে।[৪৩] কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার জনসাধারণের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শ্রেণীর মাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতীয় স্টোর বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে।[৪৪] যদিও ভারতীয় স্টোর বিভাগের কাজ দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের বহু বিভাগ উপকৃত হয়, কোম্পানি রেলওয়ে, ভারতীয় রাজ্য এবং আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি এই বিভাগের সাহায্য গ্রহণ করে, তথাপি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এর কাজ ১৯২৯ সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বাধ্যতামূলক ছিল না।[৪৫] ১৯৩৩ সালের ১ জানুয়ারি যে 'রুপী (rupee) টেন্ডার পদ্ধতি' কার্যকর করা হয় তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে। এ সংক্রান্ত বিধিতে নিম্নোক্ত ক্রম অনুযায়ী মাল ক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল :

> প্রথমত, যেসব দ্রব্য কাঁচামালের আকারে ভারতে উৎপন্ন হয় কিংবা ভারতে উৎপাদিত কাঁচামাল থেকে তৈরি হয়, সেসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, মাল ক্রয়ের বেলায় এসব দ্রব্যের মান হবে যথেষ্ট ভাল;

৪২. J. C. K. Peterson, 'Industrial Development in Bengal', *Englishman*, (Annual Financial Review), 4 March 1918, 11

৪৩. *Report of the Stores, Printing and Stationery Sub-Committee of the Retrenchment Advisory Committee*, September 1932, (Simla 1932), 9, A. G. Clow, *The State and Industry*, (Calcutta 1928), 84-85

৪৪. *Administration Report of the Indian Stores Department, 1929-30*, I.

৪৫. ঐ।

> দ্বিতীয়ত, যেসব দ্রব্য আমদানিকৃত উপকরণ থেকে ভারতে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে তৈরি হয়, সেগুলির ক্ষেত্রে শর্ত থাকবে যে, মাল ক্রয়ের লক্ষ্যে এসব দ্রব্যের মান হবে ভাল;
>
> তৃতীয়ত, যেসব বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্য ভারতে মজুদ করে রাখা হয়, সেগুলির ক্ষেত্রে শর্ত থাকবে যে, সেগুলি যথোপযুক্ত ধরনের ও প্রয়োজনীয় মানের হবে;
>
> চতুর্থত, বিদেশে তৈরি দ্রব্যের ক্ষেত্রে শর্ত থাকবে যে, সেগুলি বিশেষভাবে আমদানি করতে হবে।[৪৬]

নতুন বিধিমালা চালু হওয়ার ফলে দিল্লীর ভারতীয় স্টোর বিভাগ এমনকি চাকা ও চক্রনেমী, মোটরগাড়ির যন্ত্রাংশ, বয়লার টিউব, পরিবহন ফ্লাট ও ফেরি-মঞ্চ, বাতিঘর সরঞ্জাম এবং টেলিগ্রাফ বিভাগের জন্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রভৃতির ন্যায় দ্রব্যও ক্রয় করে, যা পূর্বে বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো।[৪৭] স্থানীয় দ্রব্য ক্রয়ের এই প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৩৮-৩৯ সালের মধ্যে দিল্লীর ভারতীয় স্টোর বিভাগ বার্ষিক প্রায় নয় কোটি টাকার মাল ক্রয় করে এবং অধিকাংশ মালই বাংলা থেকে ক্রয় করা হয়, যা ছিল প্রধানত বস্ত্র ও চামড়াজাত দ্রব্য, যান্ত্রিক লোহালক্কড় ও বিবিধ বস্তু।[৪৮]

১৯২৬ সালে ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেট গভর্নরশাসিত প্রদেশগুলিকেও তাদের নিজেদের স্টোরবিধি প্রণয়ন করার অধিকার প্রদান করে। একই বছর আগস্টে প্রকাশিত নতুন বিধিমালার মৌলিক নীতি ছিল স্থানীয় শিল্পকে উৎসাহ প্রদান করা। সরকারি বিভাগ ও কর্মকর্তাগণকে ভারতীয় স্টোর বিভাগ ও দিল্লীর সহায়তা পরিপূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগাবার নির্দেশ প্রদান করা হয়। প্রধানত বিধিমালায় পরিবর্তনের কারণে ভারতে উৎপাদিত মালের সরকারি নিজস্ব ক্রয়ের পরিমাণ ১৯১৪-১৫ সালে ৩,১৭,৮৩৮ টাকা থেকে ১৯১৯-৩০ সালে ২৩,৮১,০০০ টাকায় উন্নীত হয়।[৪৯] ১৯৩৩ সালে বাংলা সরকার 'রুপী টেন্ডার' পদ্ধতিকে আরো কার্যকর করে তোলার জন্য বিধিমালা সংশোধন করে এবং এই সংশোধিত বিধিমালার প্রধান দিকগুলি ছিল বাংলায় উৎপাদিত বা তৈরি দ্রব্যের মূল্যেব দৃষ্টিকোণ থেকে স্থানীয় ক্রয়ের উপর অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা অপসারণ এবং বাংলায় উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যের ব্যাপারে সীমিত পরিমাণ অগ্রাধিকার অনুমোদন।[৫০] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলা সরকারের কোন স্থানীয় ক্রয়এজেন্সি না থাকার কারণে সময়ে সময়ে

---

৪৬. ঐ, 2-3.

৪৭. ঐ, 1931-32, 2

৪৮. Iftikhar-ul-Awwal, *The Industrial Development of Bengal, 1900-1939*, (Delhi 1982), Table 2.3, and *Administration Report of the Indian Stores Department, 1929-30*, 63-64, Appendix-VII.

৪৯. IOR, Vol 12049, *Bengal Revenue Proceedings* (Industries), September 1935, No 22, 57.

৫০. ঐ।

প্রণীত বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয় নি। এরকম একটি এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা নিয়ে ১৯৩০-এর দশকের শেষদিকে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। কিন্তু যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থার জন্য পরিকল্পনাটি বাতিল হয়ে যায়।[৫১]

৩

বাংলার আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি) হাতে প্রচুর আমানত[৫২] থাকা সত্ত্বেও নিজেদেরকে শিল্পক্ষেত্র থেকে কম-বেশি দূরে রাখে, কারণ ব্যাঙ্কের আওতার বাইরে তাদের তহবিলের কোন বৃহৎ অংশ আটকে থাকা তারা যথাযথ বলে মনে করে নি। কেবল যেসব শিল্প সফল বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং পাট, চা ও বৃহৎ কয়লাখনি কোম্পানিগুলির ন্যায় বাঞ্ছনীয় জামিনের ব্যবস্থা করতে পারতো, সেসব শিল্পেরই তাদের চালু মূলধনের একটি অংশ পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। অনুমোদিত নামে কিংবা যে মাল তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রি করা যেতো সেই মাল বন্ধক রেখে জামিনের ব্যবস্থা করতে অক্ষম মধ্যম আকারের শিল্পগুলিকে এমনকি এই ধরনের স্বল্পমেয়াদি ঋণ লাভ করতেও অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। তারা বিশেষ মাত্রায় এই অসুবিধা ভোগ করতো, কারণ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাদের আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে ব্যাঙ্কের চাহিদা পূরণ করা তাদের পক্ষে কঠিন হতো, যে ব্যাঙ্কের পরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছিলেন ইউরোপীয়। এভাবে ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি শিল্পের জন্য অর্থসংস্থানের ব্যাপারে অতিসংরক্ষণনীতি অনুসরণ করতো। অথচ জার্মানি ১৮৭০ সাল থেকে ব্যাঙ্কের সাধারণ লেনদেন (আমানত-জমা আকর্ষণ, টাকা ধার এবং বিল ভাঙানো) ছাড়াও শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ঋণ সরবরাহ করে শিল্পোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[৫৩] এই পর্যায়ে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য আদর্শ উদ্যোগ ছিল ১৮৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত প্যারিস ক্রেডিট মবিলায়ার।[৫৪]

৫১. *Report of the Committee on Public Accounts of the Bengal Legislative Assembly on the Appropriation Accounts and Finance Accounts of the Government of Bengal for the year 1940-41 and the Audit Reports, thereon*, (Alipore 1943), 12

৫২. Some idea of the holdings of the Indian commercial banks can be gauged from the deposits of the Bengal Circle of the Imperial Bank of India for the last week of March 1925 The amounts shown below are in lakhs of rupees:

	European	Indian	Bank's	Total
Current Account Deposits	3.96	7.53	3 95	15.44
Fixed Deposits	2.55	9.96	.5	12.56

দেখুন, *Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee, 1929-30*, Vol. I, (Calcutta 1930), 39

৫৩. Supplementary written evidence of G Findlay Shirras to the Indian Industrial Commission, *1916-18*, Vol V, 804-10.

৫৪. ঐ, 805, 811

সুপ্রতিষ্ঠিত একটি মূলধনবাজারের অনুপস্থিতিতে সরকার তার আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ঋণব্যবস্থা পুনর্গঠনের মাধ্যমে একটি গঠনমূলক উপায় অবলম্বন করে এগিয়ে আসতে পারতো। এ প্রসঙ্গে এম. জি. রণদে যথাযথই মন্তব্য করেন :

> প্রদেশের নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করার প্রয়োজন নেই। প্রদেশ যদি কেবল এজেন্সিকে সংগঠিত করে তাকে কাজে লাগায়, তা হলেই যেকোন পরিমাণ তহবিল পাওয়া যাবে। ডাকঘর ও সঞ্চয়ব্যাঙ্কগুলির আমানত হাতেই আছে। তবে যে কাজটি করা দরকার তা হলো সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় পুঁজিবাদীদের সংগঠিত করা।[৫৫]

কিন্তু সরকার তাদের 'শিল্পে হাত দিওনা' নীতি অব্যাহত রাখলো। তার ফল হলো এই যে, নিরাপদ বিনিয়োগের জন্য মূলধন হাতে মজুদ থাকা সত্ত্বেও মূলধনের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী শিল্পের বিস্তারসাধনের জন্য ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় নি। ভারতীয় শিল্প কমিশনের একটি শিল্পব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব, যে শিল্পব্যাঙ্ককে কমিশন এই সকল অসুবিধা দূরীকরণে এবং শিল্পের প্রতি সাহায্য প্রদানে প্রবলভাবে কার্যকর একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করে, তা ১৯১৯ সালে শিল্পোন্নয়নের বিষয় প্রাদেশিকীকরণের সাথে সাথে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৫৬] বাংলা প্রাদেশিক ব্যাঙ্কব্যবস্থা অনুসন্ধান কমিটি মন্তব্য করে যে, "এধরনের কতিপয় উপায় বা কৌশলের অভাবে 'বাংলার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি' উন্নতিলাভ করছে না। অনেক প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ে এবং অন্যগুলি তাদের কর্মকাণ্ড সীমিত রাখতে বাধ্য হয়।"[৫৭]

১৯৩১ সালে যদিও বাংলা সরকার ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে 'শিল্পে বঙ্গীয় প্রদেশ সাহায্য আইন' পাশ করে, তবুও প্রধানত এই আইন বলবৎ করার জন্য সরকারের প্রতিবন্ধক বিধি প্রণয়ন করার কারণে এ আইন ব্যর্থ হয়। ঋণের জন্য বিভিন্ন আবেদন সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য ১৯৩২ সালের অক্টোবরে একটি শিল্পবোর্ড গঠন করা হয় এবং একই বছর নভেম্বরে কতিপয় বিধি এ বোর্ড কর্তৃক প্রণীত হয়। এই বিধিগুলি অনুমোদনের জন্য সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়। বোর্ডের কাছে

৫৫. Rao Bahadur Mahadev Govind Ranade, 'The Reorganization of Real Credit in India', *Report of the First Industrial Conference held at Poona*, (Poona 1891), 61-62. The amount of money in the Savings Bank in Bengal proper totalled, for example, 5.49 and 5.91 crore rupees in the years 1927-28 and 1928-29 respectively. Besides, Indian Post Offices also dealt with 'Cash certificates' In 1927-28, the amount realized by issue of cash certificates was 1 crore and 12 lakh Rupees, দেখুন, *Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee, 1929-30*, Vol. III, Evidence—Part II, 11-13.

৫৬. *Report of the Indian Industrial Commission, 1916-18*, (London 1919), 182.

৫৭. *Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry committee, 1929-30*, Vol. 1, Report, 122

যখন বিধিগুলি অনুমোদিত হয়ে আসে, তখন বিধিগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন কোনটির ব্যাপারে গুরুতর আপত্তি দেখা দেয়। প্রথমত, বিধিমালায় যেকোন ঋণ বা আগামের জন্য জামানতের প্রশ্নে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এই পর্যায়ে যে নিয়মটি আরোপ করা হয় তা হলো—"এই আইনের অধীনে অনুমোদিত প্রতিটি ঋণের অনুকূলে শিল্পমালিকের সমগ্র পরিসম্পদের বন্ধক বা চলতি ব্যয় অথবা বন্ধক ও চলতি ব্যয় উভয়ের মাধ্যমে জামানত প্রদান করতে হবে।"[৫৮]

বন্ধকের জন্য প্রদেয় সম্পত্তির আদায়যোগ্য মূল্য ঋণের বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি হবে এবং সহজে উসুল করা যাবে এবং দায় থেকে মুক্ত থাকতে এইরূপ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়াও বোর্ডের জন্য প্রয়োজন হতো। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অধিকাংশ আবেদনকারী ঋণের জন্য এই কঠিন শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হয় নি। সম্ভবত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের অক্ষমতার কথা চিন্তা করে মহিশূর প্রদেশ তাদের 'শিল্পে প্রাদেশিক সাহায্য আইনে' ঋণ ও আগামের জন্য জামানতের বিধি অন্তর্ভুক্ত করে নি।[৫৯] এমনকি বাংলায় এই আইন কার্যকর করার সময়ে দেখা যায় যে, আগাম প্রদত্ত ঋণের উল্লেখযোগ্য অংশই অনাদায়যোগ্য ও অপরিশোধ্য ঋণ বলে বিবেচিত হয়।[৬০] দ্বিতীয়ত, কোন শিল্পকে সাহায্য প্রদান করার জন্য বোর্ডকে কোন আর্থিক ক্ষমতা বিধিমালায় প্রদান করা হয় নি। এই ক্ষমতা না থাকার কারণে সাহায্যের নিমিত্ত প্রতিটি আবেদনপত্র সরকার কর্তৃক গ্রহণ কিংবা বাতিলের জন্য প্রেরণ করা হয়। এভাবে বোর্ড কেবল ঋণের আবেদনপত্র প্রেরণের জন্য একটি কমিটিতে রূপান্তরিত হয়।[৬১] তৃতীয়ত, এই বিধিমালায় আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিলের আগে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আপত্তি কিংবা প্রতিবাদ থাকলে তা আহ্বান করার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করা হয়। কলকাতার দু'টি দৈনিক পত্রিকার পরপর তিনটি সংখ্যা ও কতিপয় মফস্বলের পত্রিকায় ঢালাও বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই আপত্তি আহ্বান করা

৫৮. Bangladesh Secretariat Records (এখন থেকে BSR): Bundle No. 3, *Proceedings of the Agriculture and Industries Department (Industries)*, September 1933, No 7, 4

৫৯. BSR Bundle No 8, *Proceedings of the Agriculture and Industries Department* (Industries), B Proceedings, File No 21/20 of 1938.

৬০. BSR· Bundle No. 2, *Proceedings of the Agriculture and Industries Department (Industries)*, B Proceedings, File No 3C/12 of 1936. Perhaps the only case where a sum was granted to one G. G Cruickshank, Prop., Montgomery Dairy, 12 Tapsia Road, Tiljala, Calcutta. দেখুন, Iftikhar-ul-Awwal, "Genesis and Operation of the Bengal State Aid to Industries Act, 1931" in *The Indian Economic and Social History Review*, Vol. XVII No. 4, 415

৬১. In July 1936 although the government did relax rules and delegate to the Board the power to dispose of applications for aid up to a sum of Rs 5,000, it was withdrawn in 1938 to bring it into conformity with the provisions of the Government of India Act, 1935 দেখুন, Iftikhar-ul-Awwal, "*Genesis and Operation*", 415-16.

হয়। এটি ছিল আবেদনকারীদের বিতাড়িত করার একটি নিশ্চিত পন্থা। কাউন্সিলের একজন সদস্য উল্লেখ করেন : "জনসাধারণ এটিকে অত্যন্ত অপমানজনক বিবেচনা করে এবং সাহায্যের জন্য তারা বোর্ডের কাছে আসতে খুব সঙ্কোচ বোধ করে।"[৬২] এছাড়া পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদানও ঋণের আবেদনপত্র বিলিবন্টনে বিলম্বের কারণ ঘটায়, "ফলে অনেক সময় আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন সৃষ্টিকারী পরিস্থিতির সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটে।"[৬৩] অধিকন্তু, অনেক ক্ষেত্রেই আবেদনকারীকে সাহায্য প্রদান করা হবে না বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য অপ্রয়োজনীয় খরচের কবলে পড়তে হয়। সরকার বিভিন্ন সময়ে বোর্ড কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ১৯৩৬ সালে এক হাজার টাকা পর্যন্ত আবেদন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে আপত্তি আহ্বানের বিষয়ে বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রদান করে এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৩৭ সালের নভেম্বরে এর পরিমাণ তিন হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।[৬৪] বিধিমালার ত্রুটি ছাড়াও বোর্ডের সুপারিশসমূহ বিবেচনা করার জন্য সরকার একটি দীর্ঘসূত্রী নীতিও অনুসরণ করে। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত বোর্ডের প্রথম বৈঠকের পর প্রায় ১৭ মাস যাবৎ একজন আবেদনকারীও কোন সাহায্য পায় নি এবং ১৯৪৩-৪৪ সালের মধ্যে প্রাদেশিক সাহায্য হিসেবে ১৩২ জন আবেদনকারীকে (৩৫৮ জন আবেদনকারীর মধ্যে) মাত্র ৩.১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। যারা এই মঞ্জুরি পায় তাদের প্রতি জনের সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২,৩৬৫ টাকা মাত্র।[৬৫] নগদ ঋণসুবিধার দিক থেকে আমাদের জ্ঞাত একটি মাত্র ঘটনা রয়েছে, যেখানে ১০ বছর মেয়াদে রেশমশিল্পের উন্নয়নের জন্য ১৯৩৬ সালে ২৫,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল।[৬৬] আইনটির অন্যান্য বিধি কোন নির্দিষ্ট বা প্রাসঙ্গিক কারণ ছাড়াই অকার্যকর থেকে যায়।

স্থানীয় সরকারও 'শিল্পঋণ সিন্ডিকেট লিমিটেড' নামক একটি শিল্পব্যাঙ্কের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করার একটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার কিছু বেশি 'পেইড-আপ' মূলধন নিয়ে ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সিন্ডিকেট ছিল ভারতীয় কোম্পানি আইনের অধীনে একটি নিবন্ধিত কোম্পানি। সিন্ডিকেটের অন্যান্য বিশেষ দিক ছিল :

৬২. *Bengal Legislative Council Proceedings*, 28 March 1935, Vol XLV, No 2, 683.

৬৩ *Proceedings of the Agriculture and Industries Department (Ind.)*, March 1938, No. 6, 7

৬৪. ঐ, Bundle No 5, B Proceedings, File No. 1R/5 of 1938 and the *Annual Report of the Board of Industries, Bengal for the year 1936-37*, 1-2

৬৫. *Bengal Legislative Council Proceedings*, 28 March 1935, Vol XLV, No. 2, 678; and Awwal, "Genesis and Operation", 417

৬৬. *Proceedings of the Agriculture and Industries Department (Ind.)*, September 1936, Nos. 1-3, 3-8.

ক. পাঁচ বছরের জন্য সরকারকে সিন্ডিকেটের প্রশাসনিক ব্যয়ের জন্যই ২০,০০০ টাকা প্রদান করতে হতো।

খ. সরকারি তহবিল থেকে প্রদত্ত প্রথম ঋণ বাবদ ক্ষতির অর্ধাংশ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরকার পূরণ করতো। অনুরূপভাবে যাদেরকে প্রথম ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছিল তাদের অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ থেকে পরবর্তী যে ঋণ প্রদান করা হবে সেই ঋণের জন্য উদ্ভূত ক্ষতির প্রথম অর্ধাংশের দায়দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে।

গ. ঋণসাহায্য সংক্রান্ত দায়িত্বাবলী সরকার এবং সিন্ডিকেটের সম্মত ব্যবস্থাদির অধীনে নিয়মানুগভাবে পরীক্ষা করতে হবে। এরকম পরীক্ষাকাজের মধ্যে কারিগরি পরামর্শ ও নির্দেশনাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ঘ. সিন্ডিকেট সরকারি সাহায্য নিয়ে কাজ চালিয়ে যাবে অথবা সরকারি সাহায্য না নিয়ে কাজ করে যাবে অথবা অবলুপ্ত হবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়ার উদ্দেশ্যে দশ বছব পরে সিন্ডিকেটের অবস্থা পরীক্ষা করতে হবে।[৬৭]

দুর্ভাগ্যবশত, যে উদ্দেশ্যে সিন্ডিকেট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা অপূর্ণ থেকে যায়। ১৯৩৮ সালের ৩১ মার্চ আর্থিক বছরের শেষে সিন্ডিকেট মাত্র উনিশটি শিল্পে ৯০ হাজার টাকার অধিক অর্থসংস্থান করে এবং এই টাকার মধ্যে ১৮,২১১ টাকা (হাল নাগাদ সুদের পরিমাণসহ) অনাদায়ী থেকে যায়।[৬৮] অধিকন্তু, কোন ক্ষেত্রেই এক ব্যক্তিকে ১৫,০০০ টাকার অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করা হয় নি এবং অনেক ক্ষেত্রেই টাকার পরিমাণ ১,০০০-এর কিছু বেশি ছিল।[৬৯] উদ্দেশ্য সাধনে সিন্ডিকেটের অকৃতকার্যতার কারণ হিসেবে বাংলা শিল্প জরিপ কমিটি সাংগঠনিক দুর্বলতাকে দায়ী করে।[৭০] সরকার নিজের পক্ষ থেকে সিন্ডিকেটের কাজে পরিলক্ষিত ত্রুটি দূরীকরণের কোন প্রয়াস না চালিয়ে সম্মত শর্তসমূহ লঙ্ঘনের জন্য কেবল সিন্ডিকেটের সাথে নিজের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে।[৭১]

সরকারের আরেকটি প্রকল্পের অধীনে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। এটি ছিল আটক রাজনৈতিক বন্দি প্রশিক্ষণ প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে যেসব বিপথগামী রাজবন্দি পিতলের বাদ্যযন্ত্র, কাঁসার দ্রব্য ও ছুরি-কাঁচি, মৃন্ময়পাত্র এবং ছাতা নির্মাণের বিশেষ

৬৭. *Report of the Bengal Industrial Survey Committee, 1948*, 326; and *Report on the Administration of Bengal, 1935-36*, xxii.

৬৮. *Proceedings of the Agriculture and Industries Department (Ind)*, November 1940, Nos. 17-20 16-18

৬৯. ঐ, No. 19-20, 18.

৭০. *Report of the Bengal Industrial Survey Committee*, 326.

৭১. ঐ।

প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো, তাদেরকে ১৯৩৬-৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত চার বছরে সাড়ে ছয় লাখ টাকার বেশি ঋণ প্রদান করা হয়।[৭২] সরকারি অর্থসাহায্য নিয়ে দু'টি মৃন্ময়পাত্রের কারখানা, আটটি পিতলের বাদ্যযন্ত্র, কাঁসা ও ছুরি-কাঁচির কারখানা এবং বারোটি ছাতার কারখানা শুরু করা হয়।[৭৩] কিন্তু প্রধানত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কর্তব্যে অবহেলা ও তত্ত্বাবধানের অভাবে আটক বন্দি প্রকল্পটি সরকারি অর্থের অপচয় করে এবং সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৭৪]

সরকারি বয়ন প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পাশ করা ছাত্রদেরকেও স্বাধীনভাবে তাদের পেশা চালিয়ে যেতে সক্ষম করে তোলার জন্য অল্প পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ১৯২১-২২ সাল থেকে ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য এরকম মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৬০,৪৪৭ টাকা অর্থাৎ গড়ে ৩,৩৫৮ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।[৭৫] প্রতিবছর এসব ঋণের সুদের পরিমাণ ছিল ৬.৫ শতাংশ এবং তা ২৪টি সমান কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ছিল।[৭৬]

এভাবে বেসরকারি শিল্পোদ্যোগে প্রদেশের অর্থনৈতিক সাহায্য ছিল সম্পূর্ণরূপে অপ্রতুল। বঙ্গীয় সরকার প্রদেশে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সাথে শিল্পোদ্যোগের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যাপারে একটি সমঝোতায় আসে। এটি অবশ্য একটি কঠিন ব্যাপার ছিল না, কেননা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি উৎপাদনমূলক উদ্যোগে সাহায্য প্রদান করতে অনিচ্ছুক ছিল না যদি সরকার এসব শিল্পে ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিনিয়োজিত অর্থের অনুপাতে জামিন থাকতে সম্মত হয়।[৭৭] যেহেতু এরকম কোন জামিনের সম্ভাবনা ছিল না, সেহেতু শিল্পসমূহ মূলধনের অন্যতম সুলভ উৎস থেকে বঞ্চিত হয়। সরকারও সমাজের যেসব সম্প্রদায় মূলধন সৃষ্টি করছে তাদের কাছ থেকে সঞ্চয় সহজলভ্য করতে এবং সেই অর্থ তাদেরকে প্রদান করতে পারতো, যাদের উৎপাদনমূলক বিনিয়োগের জন্য ঋণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। দুর্ভাগ্যবশত তখনকার সরকার এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করেছিল, যা ছিল শিল্পায়নের জন্য প্রত্যক্ষ বাধাস্বরূপ।

৭২. Report of the Committee on Public Accounts of the Bengal Legislative Assembly, 1940-41

৭৩. ঐ।

৭৪. A Government investigation was undertaken by M. N. Chatterjee on the financial position of factories and farms started under the Detenu Training and Setting-up Scheme. Mr Chatterjee in his report listed various irregularities responsible for the breakdown of the scheme. ঐ, 30

৭৫. Awwal, *Industrial Development*, 228.

৭৬. ঐ।

৭৭. *Indian Industrial Commission*, Vol II (Evidence), (Parliamentary Paper XVIII of 1919), 132.

৪

ভারতে বৃটিশ ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এই মর্মে অভিযোগ করতেন যে, বাংলার স্থানীয় জনগণের মধ্যে শিল্পোদ্যোগের প্রেরণা কম-বেশি অনুপস্থিত। তাঁদের মতে, এই শিল্পোদ্যোগের অভাবই এলাকার সীমিত মাত্রার শিল্পোন্নয়ন এবং বাংলার অর্থনৈতিক দুর্ভোগের জন্য দায়ী ছিল। ১৮৯০ সালে ই. ডব্লিউ. কলিন তাঁর বাংলায় বিদ্যমান শিল্পকলা ও শিল্প (Industry) সংক্রান্ত প্রতিবেদনে 'শিল্পোদ্যোগের অভাব' এবং নতুন উৎপাদন সৃষ্টিতে ব্যর্থতার জন্য বাংলার পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন।[৭৮] মেসার্স টেলারি কোম্পানির এস. জে. টেলারি ১৯০০ সালে কলকাতার বৃটিশ ভারতীয় এসোসিয়েশনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতীয় জনসাধারণকে এই শিল্পোদ্যোগের অভাবের জন্য দায়ী করেন। টেলারি বলেন, ভারতের স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বেসরকারি উদ্যোগের অভাবই হলো এই অবস্থার প্রধান কারণ।[৭৯] পরবর্তী সময়ে *ক্যাপিটাল* পত্রিকা একই অভিমত প্রদান করে এবং ১৯২৯ সালে মন্তব্য করে যে, শিল্পোদ্যোগে অনুপ্রেরণা এবং এর জন্য দক্ষতার অভাবের কারণে বাঙালিই তার দারিদ্র্যের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী।[৮০] ভারতীয়দের মধ্যে শিল্পোদ্যোগের অভাব রয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হয়, তার সাথে ঐতিহাসিক সত্যের কোন মিল নেই। ইতিহাসে দেখা যায়, এই এলাকার মানুষ প্রচুর শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মতৎপরতা দেখিয়েছে, যা পৃথিবীর কোন জাতির চেয়ে কম নয়। যেমন ১৯১৮ সালে ভারতীয় শিল্প কমিশন লিখে :

> কোন এক সময়ে যখন আধুনিক শিল্পপ্রক্রিয়ার জন্মস্থান পশ্চিম ইউরোপে অসভ্য উপজাতিরা বাস করতো, তখন ভারত তার শাসকদের ধনদৌলত এবং কারিগরদের উৎপাদনদক্ষতার জন্য ছিল বিখ্যাত। এবং এমনকি অনেক পরেও পাশ্চাত্যের বণিকফটকাবাজরা যখন ভারতে প্রথম উপস্থিত হয়, তখন কোন অংশেই এই দেশের শিল্পের অগ্রগতি ও প্রসার উন্নত ইউরোপীয় জাতিদের শিল্পের অগ্রগতি ও উন্নতির তুলনায় কম ছিল না।[৮১]

এমনকি, উনিশ শতকের প্রথমাংশে যখন বৃটিশেরা ভারতে তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, তখন বাঙালিরা তাদের সাথে যৌথ কারবার গড়ে তুলে। কিন্তু বাঙালি ব্যবসায়ীরা বৃটিশ অংশীদারদের প্রতারণা, শঠতা এবং অতি ফটকাবাজির দরুন প্রকৃতপক্ষে কলকাতার এই অনিশ্চিত বা বিপজ্জনক ব্যবসাকর্ম থেকে পরে সরে পড়ে।

---

৭৮. E W Collin, *Report on the Existing Arts and Industries in Bengal*, (Calcutta 1890), 14

৭৯. *The Indian Agriculturist*, 1 October 1900, 305-06

৮০. *Capital*, 21 February 1929, 389

৮১. *Indian Industrial Commission, 1916-18,* Report 1.

"ইউরোপীয় ব্যবসা সম্পর্কে একটি অবিশ্বাস বাঙালির চিন্তাচেতনায় প্রতিষ্ঠালাভ করে।"[৮২] আবার বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে স্বদেশী আন্দোলন বাংলায় শিল্পকর্মতৎপরতার একটি আকস্মিক ও চমৎকার সম্প্রসারণ ঘটায়। যদিও আন্দোলনটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে ব্যর্থ হয়, তথাপি যে আকাঙ্ক্ষা এই আন্দোলনের জন্ম দেয় তা কোনভাবেই হ্রাস পায় নি।[৮৩]

আলফ্রেড চ্যাটারটনের মতে, তিনটি উপায়ে কোন ব্যক্তি শিল্পনায়কের গুণ অর্জন করতে পারেন। প্রথমত তাঁকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। দ্বিতীয়ত অর্জন করতে হবে প্রযুক্তিবিদ্যার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং তৃতীয়ত অর্জন করতে হবে কার্যপরিচালনা ও ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা। তাঁর মতে, শিক্ষা বিভাগ বিজ্ঞান কলেজ ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে প্রথম শিক্ষাটি দিতে পারে। দ্বিতীয় শিক্ষা অর্জন করা যেতে পারে কেবল কর্মশালা ও কলকারখানায় এবং তৃতীয় শিক্ষা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কিংবা ব্যবসা পরিচালনার পর্যায়ে অর্জন করা সম্ভব।[৮৪] চ্যাটারটন শিল্পোদ্যোগমূলক গুণের উন্নয়নে

সারণি ১ : বাংলার প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ, ১ জানুয়ারি ১৯৩৫

	প্রতিষ্ঠানের ধরন	মোট সংখ্যা
ক.	প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়	২
খ.	কলেজিয়েট পর্যায়ের অন্যান্য বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান	২
গ.	সরকারের মালিকানাধীন প্রযুক্তি ও শিল্প স্কুল	৪৯
ঘ.	স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানাধীন প্রযুক্তি ও শিল্প স্কুল	৫
ঙ.	বেসরকারি সাহায্যাধীন প্রযুক্তি ও শিল্প স্কুল	৭৬

উৎস : *Bengal Revenue Proceedings*, (Industries), September 1935, No 22, 42.

যে তিনটি উপায়ের রূপরেখা দিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে প্রথম দু'টির ব্যাপারে সরকারের চূড়ান্ত ভূমিকা ছিল। শিল্প ও প্রযুক্তিশিক্ষা সম্পর্কে যতোই বলা হোক না কেন, সে ব্যাপারে প্রদেশ ততোদূর অগ্রসর হতে পারে নি। যদিও বাংলা সরকার পাঠ্যক্রমে শিল্প ও

৮২. দেখুন, N K Sinha, "Indian Business Enterprise Its Failure in Calcutta (1800-1848)", in *Bengal Past and Present*, Diamond Jubilee Number, 1967, 120.

৮৩. Confidential letter dated 26 November 1915 from the Government of India to the Secretary of State for India in IOR L/E/7/855.

৮৪. Sir Alfred Chatterton, 'Indian Industries', *Capital*, 13 February 1929, 327

প্রযুক্তিশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল, তথাপি সরকার শিক্ষার পাঠক্রমে একটি আলাদা শাখা তৈরি করে বা অন্য কোন উপায়ে সর্বোচ্চ প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারে নি। ১৯২০ সালে প্রযুক্তি ও শিল্পশিক্ষার নিয়ন্ত্রণভার শিল্পবিভাগের কাছে হস্তান্তরের পূর্বে এব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের দশ বছরের কম সময় লাগে নি।[৮৫]

প্রকৃত ফলাফল এই ছিল যে, তখন পর্যন্ত প্রযুক্তিশিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার একটি শাখা বলে মনে করা হতো এবং প্রযুক্তিশিক্ষা নিয়মিত শিক্ষাকর্তৃপক্ষের আয়ত্তাধীন ছিল। এই শিক্ষাকর্তৃপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই পুঁথিগত শিক্ষার প্রতিই মনোনিবেশ করে এবং সে শিক্ষাতেই তাদের দক্ষতা ছিল। এমনকি যখন তারা প্রযুক্তিশিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে, তখন শিল্পের প্রয়োজনীয় বিষয় ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের পুরোপুরি অজ্ঞতা বাস্তব প্রক্রিয়ার উপর শিল্পআন্দোলন পরিচালিত করা তাদের জন্য অসম্ভব করে তোলে। এমনকি প্রযুক্তি ও শিল্পস্কুলগুলি হস্তান্তরের পরও এই প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই কর্মকার ও ছুতারের পেশার মতো বিভিন্ন পেশার জন্য কেবল প্রাথমিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসেবেই থেকে যায়।

প্রাদেশিক রেলকর্মশালাগুলিতেও প্রযুক্তিশিক্ষা ও বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। কিন্তু এগুলি ছাত্রভর্তির ব্যাপারে পক্ষপাতমূলক নীতি অনুসরণ করতো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২০ সালে কাঁচড়াপাড়া রেলকর্মশালায় যে বাহাত্তর জন ভারতীয় ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল, তাদের মধ্যে মাত্র এক জনকে ভর্তি করা হয় এবং অন্য দিকে আট জন এ্যাংলো-ভারতীয় আবেদনকারীর মধ্যে তিন জনকে ভর্তি করা হয়।[৮৬] কর্মশালার বেতনক্রমও ভারতীয়দের কাছে ন্যায্য ছিল না (সারণি ২ দ্র.)। বাংলা-নাগপুর রেলওয়ে টেকনিক্যাল স্কুল আরো পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এ্যাংলো-ভারতীয় শিক্ষানবিসদের বছরে পঁয়ত্রিশ জন করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১৯৩১ সালে অতিরিক্ত ৭০ জন অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভারতীয়কে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৮৭] ১৯৩৯ সালের শেষদিকে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ছিল শিবপুরে দু'টি প্রকৌশল কলেজ ও ঢাকায় আহসানউল্লাহ কারিগরি স্কুল এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে কেবল ওভারশিয়ার ও সাব-ওভারশিয়ারের পাঠ্যক্রম চালু ছিল। স্নাতক (বি. ই.) ডিগ্রি পর্যন্ত পরিচালিত উচ্চ

৮৫. *Annual Administration Report of the Department of Industries, Bengal, 1920,* 4

৮৬. *Bengal Legislative Council Proceedings*, 19 December 1921, Vol. VI, 23-24

৮৭. *Eighth Quinquennial Review on the Progress of Education in Bengal for the years 1927-32*, (Calcutta, 1933), 117.

প্রকৌশল প্রশিক্ষণ কেবল শিবপুর কলেজে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এ কলেজে চার বছরের পাঠ্যক্রমশেষে এক বছরের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স ছিল। কলকাতা ও ঢাকার দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতার একটি কলেজে বাণিজ্যিক বিষয়ে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হতো। বিজ্ঞানশিক্ষা মানবিক শিক্ষার চেয়ে সাধারণত কম প্রচলিত ছিল।

সারাণ ২ : ১৯২১ সালে কাচড়াপাড়া রেল কমশালায় এ্যাংলো-ভারতায় এবং ভারতায় শিক্ষানবিসদের বৃত্তি (প্রতি মাসে টাকায়)

বছর	এ্যাংলো-ভারতীয় শিক্ষানবিসদের জন্য	ভারতীয় (প্রথম শ্রেণী) শিক্ষানবিসদের জন্য
প্রথম	৫০	২২
দ্বিতীয়	৬০	২৬
তৃতীয়	৭০	৩০
চতুর্থ	৮০	৩৪
পঞ্চম	১০০	৩৮
ষষ্ঠ	১২০	প্রযোজ্য নয়

সূত্র : *Bengal Legislative Council Proceedings*, 19 December 1921, Vol VI, 23 25.

প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানশিক্ষা অর্জনের সুযোগ যেখানে কম ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল, সেখানে প্রযুক্তিবিদ্যায় ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করার ক্ষেত্র ছিল আরো সীমিত। যথেষ্ট ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের অভাব থাকার কারণে শিবপুরের ছাত্ররা যথেষ্ট পরিমাণে তাদের অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগে ব্যর্থ হতো।[৮৮] শিল্প ও প্রযুক্তি স্কুল থেকে ছাত্ররা পাশ করে এসে স্থানীয় চাকুরিতে নিয়োজিত হতো এবং গ্রামীণ কারিগরদের দ্বারা নির্মিত সবচেয়ে অমসৃণ দ্রব্যের মতো বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য উৎপাদনের উপযুক্ত প্রশিক্ষণও তারা পেতো না।[৮৯] অন্যদিকে জাপানে ১৮৭০ ও ১৮৮৩ সালের মধ্যে মডেল কারখানাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯০]

৮৮ J G Cumming, *Review of the Industrial Position and Prospects in Bengal in 1908 with Special Reference to the Industrial Survey of 1890*, (Part II of Special Report), (Calcutta 1908), 5

৮৯. *Annual Administration Report of the Department of Industries, Bengal, 1926*, 4

৯০. S Uyehara, *The Industry and Trade of Japan*, (London 1936), 10-11, G. C Allen, 'Factors in Japan's Economic Growth' in C D Cowan edited, *The Economic Development of China and Japan*, (London 1964), 195, Yasuzo Horie, 'Modern Entrepreneurship in Meiji Japan', in William W Lockwood edited, *The State and Economic Enterprise in Japan, Essays in the Political Economy of Growth*, (Princeton 1965), 183-208

এই মডেল কারখানাগুলি থেকেই শিল্পনেতা, ব্যবস্থাপক ও দক্ষ শ্রমিকগণ সমগ্র জাপানে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক হারে শিল্পের প্রসারে অবদান রাখে।[৯১] এধরনের কারখানার গুরুত্ব অনুধাবন করে ভারতীয় শিল্প কমিশন ১৯১৮ সালে এবং এর আগে জি. এম. গুপ্ত ১৯০৮ সালে অনুরূপ কারখানা প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করেন।[৯২] কিন্তু মডেল কারখানার এই প্রত্যয় লর্ড মোর্লি অনুমোদন করেন নি। মাদ্রাজ সরকারের (এই সরকার একটি অগ্রণী কারখানার জন্য তাঁর অনুমোদন চেয়েছিল) কাছে তাঁর একটি পত্রে তিনি লিখেন :

> যে নীতিটি আমি অনুমোদন করতে প্রস্তুত তা হলো এই যে, আধুনিক বিজ্ঞান এবং ইউরোপীয় দেশগুলির উন্নত পদ্ধতির সঙ্গে জনগণকে পরিচিত করার জন্য প্রাদেশিক তহবিল থেকে ব্যয় করা যেতে পারে; এর চেয়ে বেশি ব্যয় করা রাষ্ট্রের উচিত হবে না, তবে বাণিজ্যিক সুবিধার সাথে এই সকল উন্নয়নপদ্ধতি কাজে লাগানো যায় কিনা তা সরেজমিনে দেখার দায়িত্ব বেসরকারি উদ্যোগের হাতে ছেড়ে দেয়াই উচিত। এখানে নির্দেশিত আওতার মধ্যে আমি যতোটুকু মনে করি, শিল্প সম্মেলনে যেসব লক্ষ্য ছিল সেগুলোর সবই শিল্প ও প্রযুক্তি স্কুলের দ্বারা অর্জিত হতে পারে; এবং এই ধরনের স্কুলগুলিতেই নতুন শিল্প ও প্রক্রিয়াসমূহের জ্ঞান প্রদান করা যেতে পারে, নতুন সরঞ্জামাদির ব্যবহার উত্তমরূপে শিখানো যেতে পারে এবং কারিগরদের প্রযুক্তিদক্ষতা বেশ দ্রুত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। চামড়ার স্কুলে ক্রোম ট্যানিং দেখানো ও শিখানো যেতে পারে, বয়ন স্কুলে দেশীয় তাঁতের উন্নতিবিধান করা যেতে পারে এবং এই উন্নয়নের সুবিধা প্রদর্শন করা যেতে পারে। স্কুলগুলি যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা যায়, তবে সেগুলি থেকে বেসরকারি পুঁজিপতিদের বাণিজ্যিক উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিক এবং অন্য সকল তথ্য সরবরাহ করা যাবে। যাতে দ্রব্যসামগ্রী তৈরি এবং জনসাধারণের কাছে বিক্রি করা যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে চামড়া ও বয়ন স্কুলগুলিকে সরকারি কারখানায় রূপান্তরিতকরণ আমার কাম্য। একটি শিল্পতথ্য ব্যুরো প্রতিষ্ঠা অথবা এইরূপ একটি কেন্দ্র থেকে নতুন শিল্প, প্রক্রিয়া বা যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বুদ্ধি-পরামর্শ প্রদানে আমার আপত্তি নেই, যদি বেসরকারি উদ্যোগে হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে কিছু করা না হয়।[৯৩]

এইভাবে ভারতীয় শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে তাদের সীমিত প্রযুক্তিজ্ঞান, বাণিজ্যিক শিক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির সম্মুখীন হতে হয়। তাদেরকে কেবল প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম অর্জন করতে হয় নি, যথেষ্ট আর্থিক সম্পদও লাভ করতে হয়েছিল এবং কেবল তাদের উৎপন্নদ্রব্যের বাজার গড়ে তুলতে এবং দক্ষ সংগঠন বজায় রাখতে হয় নি, তবে

৯১. Yasuzo Horie, 'Modern Entrepreneurship in Meiji Japan'

৯২. G N. Gupta, *A Survey of the Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam for 1907-08*, (Shillong 1908), 112-17; and *Report of the Indian Industrial Commission, 1916-18*, (London 1919), 135-36.

৯৩. দেখুন, Confidential letter dated 26 November 1915 from the Government of India to the Secretary of State for India in IOR. L/E/7/855

প্রত্যাশিত ভোগের চাহিদা মেটাতে এবং ভাল জনসংযোগ রক্ষা করতে নতুন দ্রব্য তৈরি করার পরিকল্পনাও করতে হয়েছিল। তাদেরকে প্লান্টের অবয়ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল এবং নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে, উৎপাদনব্যয় নিরূপণ করতে এবং দক্ষ শ্রমিক সরবরাহ, পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন, পরিবহনসংযোগ স্থাপন এবং মেরামতের দোকান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বহু বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে শুরু থেকেই ভারতীয় শিল্পোদ্যোক্তারা তাদের ইউরোপীয় প্রতিপক্ষের তুলনায় অসুবিধাজনক অবস্থায় ছিল, যাদের প্রযুক্তি-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাড়াও ছিল বহু বছরের ব্যবহারিক ও বাস্তব জ্ঞান।

৫

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত বাংলা প্রদেশ শিল্পোন্নয়নের প্রশ্নে যতোদূর সম্ভব অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের পরিসরে এই দূরে থাকার নীতিটির চমৎকার সমর্থন পাওয়া যায়। গভর্নর জেনারেল-এর কাউন্সিলের অর্থসদস্য সি. ই. ট্রেভেলিয়ানের ভাষায় :

> শিল্পের এই শাখায় ইংল্যান্ডের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়াটা ছিল ভারতের সম্পদরাজিকে ভুল পথে চালিত করার শামিল। অন্যদিকে, ভারতের উর্বর ভূমি ও আবহাওয়ায় উৎপন্ন মূল্যবান কৃষিপণ্য তৈরি করেছে নিজস্ব সম্পদ এবং এই সম্পদের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না প্রয়োজনীয় শ্রম ও মূলধনের অভাবের দরুন। লাভজনক প্রয়াস থেকে অলাভজনক প্রয়াসে উৎপাদনের এই সকল উপাদানকে নিয়ে আসা নিশ্চয়ই একটি ভুল পদক্ষেপ। আমাদের সঠিক কর্মপন্থা হলো বর্ণভিত্তিক শ্রমবিভাগকে অটুট রাখা ... বুরওয়াই অথবা অন্য কোন লৌহকারখানা যদি ভারতে লাভজনকভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে, তবে এজন্য বেসরকারি শিল্পের উদ্যোগ এবং নিয়োজিত মূলধনের অভাব হবার কথা নয়।[৯৪]

স্যার ই. সি. বাক পরবর্তী সময়ে উল্লেখ করেন যে, বেসরকারি উদ্যোগ প্রায় সর্বদাই প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচের ভয়ে ব্যাহত হয়।[৯৫] পুঁজিমালিকরা তাদের অর্থ নিরাপত্তা বিধানকৃত ব্যবসায়ে বিনিয়োগে অগ্রাধিকার দিত এবং যেসকল নতুন শিল্পোদ্যোগের প্রতি সরকার প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সাহায্য প্রদান করতো সেসকল শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করতো।[৯৬] উপরোক্ত পরিস্থিতিতে দেশের শিল্পোন্নয়ন ছিল সামান্য এবং যে কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলি বিদেশী সরবরাহ বা

৯৪. IOR MSS Eur F. 78, File No. 59/8B, Sir Charles Wood Collection দেখুন, Minute by the Hon'ble Sir C. E. Trevelyan on the Burwai Iron Works, Calcutta, 13 June 1863

৯৫. Sir E. C. Buck, *Report on Practical and Technical Education*, (Calcutta 1901), 37-38.

সরবরাহের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল থেকে যায়। তৎকালীন সামরিক ভাণ্ডার নিয়ন্ত্রক জে. সি. কে. প্যাটারসন বিদেশী আমদানির উপর এই নির্ভরশীলতার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি *দি ইংলিশম্যান* পত্রিকায় লিখেন :

> বাংলার দু'টি প্রধান শিল্প, উদাহরণস্বরূপ, পাট ও চা-শিল্প প্রায়ই সম্পূর্ণরূপে ইউরোপের সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন ইংল্যান্ডের কাঁচা চামড়া উৎপাদনকারীদের সরবরাহ যদি বন্ধ হয়ে যেতো, তবে হুগলীর তীরস্থ অধিকাংশ কলকারখানাও বন্ধ করে দিতে হতো। কলকারখানায় ব্যবহৃত অন্য অধিকাংশ চামড়ার বস্তা, যেমন পিকার বেন, বেল আকারে পাকানো চামড়া, চামড়ার কটিবন্ধের উপাদান ইত্যাদি এবং সকল যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতি পর্যায়ের দ্রব্যও ইউরোপ থেকে আসতো।
>
> অনেক ভারতীয় চা-পণ্য বিদেশ থেকে প্রাপ্ত বাক্সে প্যাক করা হতো এবং এখনো তাই করা হয়। রাশিয়া, কানাডা বা জাপান থেকে খোলা বাক্স আমদানি করা হতো এবং ইংল্যান্ড বা আমেরিকা থেকে ধাতুনির্মিত সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন মতো আনা হতো। খোলা বাক্স দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় লৌহনির্মিত আংটা, পেরেক ও ক্লিপও বিদেশ থেকে আনা হতো। এসব সরবরাহ ছাড়া চা প্যাকিং করা সম্ভব হতো না ... বাগানের জন্য ব্যবহৃত গাছের ডালপালা কাটার কাঁচি, নিড়ানি, কাঁটাওয়ালা কুড়াল ও কোদালি এবং বস্তুত চা-উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতিও আমদানি করা হতো। এসব উদাহরণ ভারতে বৈদেশিক সরবরাহের উপর আমাদের নির্ভরশীলতার চিত্র প্রতিভাত করে।[৯৭]

যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থায় ও জনগণের প্রবল দাবিতে ১৯১৮ সালে ভারতে অধিক শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য একটি শিল্প কমিশন নিয়োগ করা হয়। কমিশনের ১৯১৮ সালে পেশকৃত রিপোর্ট পূর্বেকার অবাধ নীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কতিপয় মৌলিক প্রস্তাব ব্যক্ত করে।[৯৮] এসব প্রস্তাবে অন্যগুলির মধ্যে ছিল প্রদেশসমূহের স্থায়ী শিল্পবিভাগ গঠন, শিল্পে প্রদেশের প্রত্যক্ষ সাহায্য, পথিকৃৎ এবং প্রদর্শক কারখানা প্রতিষ্ঠা, রাজকীয় রাসায়নিক কৃত্যক ও রাজকীয় শিল্পকৃত্যক প্রতিষ্ঠা, প্রত্যেক প্রদেশে রাজকীয় শিল্পবিভাগের অধীনে মাল ক্রয়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা সৃষ্টি ইত্যাদি।[৯৯] দুর্ভাগ্যবশত কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশ পরিণামে যুদ্ধ বন্ধের ও ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কারের অধীনে প্রদেশগুলিতে শিল্পোন্নয়নের বিষয়টি হস্তান্তরের সাথে

---

৯৭. J. C. K. Peterson, 'Industrial Development in Bengal', *The Englishman* (Annual Financial Review), 4 March 1918, 11

৯৮. Clive Dewey, 'The Government of India's New Industrial Policy, 1905-25: A Study in Failure', a paper presented at the Institute of Commonwealth Studies (Post-graduate Seminar) on 10 July 1975.

৯৯. *Indian Industrial Commission, Summary of Recommendations*, 229-42.

সাথে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার সুযোগ পায়। রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও রাষ্ট্রের সহায়তাপ্রাপ্ত শিল্পের উন্নয়নের জন্য সকল স্তরের ভারতীয় জনগণের উচ্চাশা এইভাবে প্রতারণার শিকার হয়।

যাই হোক, ভারতীয় শিল্প কমিশনের একটি ইতিবাচক ফল হলো ১৯২০ সালে বাংলায় একটি স্থায়ী শিল্পবিভাগ প্রতিষ্ঠা (পূর্বে ১৯১৭ সালে অস্থায়ীভাবে তা প্রতিষ্ঠিত হয়)।[১০০] কিন্তু এই বিভাগের জন্য অপর্যাপ্ত সম্পদ বণ্টনের দরুন প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এর কর্মকাণ্ড সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে।[১০১] এমনকি যে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রতি এই বিভাগ পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছিল, সেই কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন ঘটেছে যতোটুকুর জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ততোটুকু।[১০২]

যে তাঁতের সুতীবস্ত্রের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশের অধিক কুটিরশিল্পশ্রমিক ও তাদের উপর নির্ভরশীল[১০৩] ব্যক্তিদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হতো, সেই ক্ষেত্রে শ্রমিকদের আয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং তৈরি পণ্যের গুণ ও মান উন্নয়নের জন্য 'উন্নত যন্ত্রপাতিসহ দক্ষ বয়নের কারুকার্য প্রদর্শনের কর্মসূচি সরকার প্রণয়ন করে। উন্নত যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল তাঁতের উড়ন মাকু, পিট তাঁতের জন্য উড়ন মাকুস্লেসমূহ, মোচড়ানো যন্ত্র, অলঙ্করণমূলক কাজের জন্য উন্নত উবিসমূহ এবং এমনকি বয়ন ধাঁচের জন্য জ্যাকুয়ার্ড যন্ত্র।[১০৪] সুতরাং এই বিভাগের কাজকর্মের ফলে এবং জনগণের মাঝে আন্তঃযোগাযোগের দরুন উড়ন মাকু তাঁত এবং অন্যান্য উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২১ সালে পরিচালিত একটি শিল্প জরিপে বাংলায় উড়ন মাকু সংযোজিত আছে এমন প্রায় ৩০ শতাংশ তাঁত দেখা যায়।[১০৫] ১৯৪২ সালে এই পরিমাণ ৬৭ শতাংশে বৃদ্ধি পায়।[১০৬] উড়ন

১০০. With the establishment of a temporary Department of Industries in 1917 a temporary Director was also appointed. But till the end of 1919, the post of the Director of Industries was held by the Controller of Munitions and the combined officer was called Combined Controller of Munitions and the Director of Industries দেখুন *Annual Administration Report of the Department of Industries, Bengal,* October 1917 to December 1919. 1

১০১. Awwal, *Industrial Development,* Appendix I, 239

১০২. *Annual Administration Report of the Department of Industries, Bengal, 1934-35,* 1.

১০৩. Out of nearly a million people supported by the cottage industries of the province, at least half a million were dependent on hand weaving industry alone. দেখুন, *Census of India, 1921,* Vol V, *Bengal,* Part I, Report, (Calcutta 1923), 400, and *Report on the Administration of Bengal, 1917-18,* ii

১০৪. Awwal, *Industrial Development,* 49.

১০৫. *Census of India, 1921,* Vol V, *Bengal,* Part I, Report, 400-01.

১০৬. *Report of the Fact-finding Committee* (Handloom and Mills), (Delhi 1942), 32.

মাকু তাঁতের সাহায্যে শ্রমিকেরা উৎপাদন দ্বিগুণ করে এবং এই সকল তাঁতের মাধ্যমে উৎপাদিত বস্তু অতি শক্ত ও টেকসই প্রমাণিত হওয়ায় বয়নশিল্পীরা এই সকল ব্যবস্থা থেকে লাভবান হওয়ার সুযোগ পায়।[১০৭] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সুতার অনিয়মিত সরবরাহ, তাঁতের স্বতন্ত্র দ্রব্যগুলির বিপণনে অসুবিধা ও আর্থিক সমস্যা তাঁতশিল্পীদের বর্ধিত উৎপাদনের উপকারিতা লাভে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।[১০৮] সমবায় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকার যে-সব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে এতে কোন সন্দেহ ছিল না। তবে আর্থিক কারণে এবং সরকারের দিক থেকে শক্তিশালী ভূমিকার অভাবের দরুন এই চেষ্টা নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত মোট ৫৪৬টি সদস্যপদ সহ ৩৫৫টি তাঁতী সমবায় সমিতি ছিল এবং এই সদস্যপদের সংখ্যা বাংলার মোট তাঁতীসংখ্যার ২.৩ শতাংশ।[১০৯] যাই হোক, বাংলায় শিল্প জরিপের মতামত অনুযায়ী, শিল্প সাধারণত মহাজনের করায়ত্ত থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব মহাজন তাঁতীদের কাছে সুতার ঋণদাতা ও সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করতো এবং বাজারে তৈরি পণ্যের বেচাকেনাও করতো। তাঁতী সম্প্রদায় ও বাজারের মধ্যে মহাজনদের এই হস্তক্ষেপের কারণ হলো তাঁতশ্রমিকদের পেশাগত সংগঠনের অভাব এবং এই তাঁতশ্রমিকদের একমাত্র অসুবিধাই হলো তাদের তহবিল বা মূলধনের অভাব।[১১০]

কলকাতা গবেষণা ট্যানারি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১৯১৯ সালে সরকার চামড়া ট্যানকরণের ক্ষেত্রে শিল্পে সাহায্য প্রদানের জন্য প্রথম এগিয়ে আসে এবং ১৯২৫ সালে এই গবেষণা ট্যানারি বাংলা চামড়া ট্যানিং ইন্সটিটিউটে রূপান্তরিত হয়। এই ইন্সটিটিউট মফস্বলের চর্মকার এবং ভদ্র পরিবারের যুবকদের জন্য শিক্ষানবিশি ক্লাশের ব্যবস্থা করে। এটি প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এর দু'টি ইতস্তত ভ্রমণশীল ট্যানকরণ পরিদর্শক পার্টির মাধ্যমে ট্যানকরণের আধুনিক উন্নত প্রক্রিয়াও প্রদর্শন করে। কিন্তু ইন্সটিটিউটে সম্পাদিত প্রকৃত গবেষণাকর্ম থেকে সবচেয়ে লাভজনক ফল পাওয়া যায়। এতে সকল বাস্তব উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোচ্চ মানের আমদানিকৃত চামড়ার সমান পর্যায়ের চামড়াই প্রচুর পরিমাণে কলকাতায় প্রস্তুত করা হতো।[১১১] ক্রোমিয়াম দ্বারা ট্যানকরণের পাশ্চাত্য পদ্ধতি প্রচলন এবং বাংলার চর্মকারদের দ্বারা ব্যবহৃত প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তে উদ্ভিজ্জ

---

১০৭. Awwal, *Industrial Development*, 211-12

১০৮. ঐ, 222-28

১০৯. *Bengal Legislative Council Proceedings*, 17 February 1943, First Session, 11.

১১০. *Bengal Industrial Survey Committee*, 45

১১১. IOR. Vol 11988, *Bengal Revenue Proceedings (Industries)*, March 1933, Nos 1-2, 15.

দ্বারা ট্যানকরণের উন্নত পদ্ধতি প্রবর্তনের কারণে এ অগ্রগতি সম্ভব হয়। ফলে কলকাতায় অনেক ক্ষুদ্র ও কুটির ট্যানকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এগুলি একত্রে ১৯৩১-৩২ সালে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের পঞ্চাশ লক্ষ বর্গফুট ক্রোমিয়াম দ্বারা ট্যানকৃত উচ্চমানের চামড়া উৎপাদন করে।[১১২] অধিকন্তু, কলকাতার চামড়া ট্যানকারীরা প্রচুর পরিমাণে জুতার তলির চামড়া ও বার্নিশ করা চামড়াও উৎপাদন করে। ১৯৩২ সালে অটোয়া বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের সময় থেকে ক্রোমিয়াম চামড়াশিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রকৃত উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। এই চুক্তিতে বেসরকারি প্রয়াসে গত ত্রিশ বছরে শিল্প যতোটুকু অগ্রগতি লাভ করেছে, মাত্র তিন বছরে তা তদপেক্ষা অনেক বেশি অগ্রগতি সাধন করার সুযোগ লাভ করে।[১১৩] কিন্তু যেহেতু গবেষণা ও বাজার প্রসারণের মাধ্যমে ট্যানকরণ শিল্পে লব্ধ অগ্রগতি থেকে উদ্ভূত সুযোগ-সুবিধা গ্রামে যে বিপুল সংখ্যক চর্মকার থাকে ও কাজ করে তাদের কাছে পৌঁছে নি, সেহেতু তাদের আর্থিক অবস্থা মানবেতর অবস্থায়ই থেকে যায়।

সঠিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় অন্যান্য কুটিরশিল্পের (মৃৎশিল্প, ছুরিকাঁচি শিল্প, সাবান-তৈরি, কাঁসা-পিতল, রং ও বার্নিশকরণ শিল্প) উন্নয়নের জন্য সরকার ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে একজন শিল্পরসায়নবিদ নিয়োগ করে। পরবর্তী বছরে একজন শিল্পপ্রকৌশলীও নিয়োগ করা হয়। এই সকল কর্মকর্তার প্রধান দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল অন্যান্য চালু শিল্পের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, যথা কুটিরশিল্পের শ্রম রক্ষণকারী যন্ত্রপাতির নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং নির্দিষ্ট স্থানে বাজার স্থাপনের উদ্দেশ্যে শিল্প ও বাণিজ্যিক বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ব্যবহার সম্পর্কিত সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি। উন্নত ধরনের কুমারের চাক উদ্ভাবন ছাড়াও শিল্পপ্রকৌশলী নতুন মৃৎপাত্র পোড়ানোর চুল্লী এবং মৃৎশিল্পের জন্য উপযোগী বলে প্রমাণিত অলঙ্করণময় শিল্প চকচকে করার নতুন প্রক্রিয়াও প্রচলন করেন।[১১৪] কুমারদের আয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধি করার জন্য চকচকে মৃৎশিল্প তৈরি করার পন্থা অবলম্বন দ্বারা তাদের অনুপ্রাণিত করার প্রয়াসও নেয়া হয়। অন্যান্য কুটিরশিল্প নিয়ে শিল্পবিভাগ স্বল্পমেয়াদি প্রদর্শন কর্মসূচি প্রণয়ন করে, যার মাধ্যমে প্রস্তুতকরণপ্রক্রিয়া উন্নয়নের বিভিন্ন দিক প্রদর্শন করা হয়। যাই হোক, এসব সংশ্লিষ্ট পক্ষ প্রতিটি স্থানে তাদের নির্দেশ ও পরামর্শের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় নি।[১১৫]

১৯৩২-৩৩ সালে যে বেকারত্রাণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়, তার অধীনে উৎপাদনপ্রক্রিয়ার অতি-প্রসারিত প্রদর্শনীসমূহ পরিচালিত হয়। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল পারিশ্রমিকমূলক পেশা কার্যকর করার জন্য বেকার ভদ্রলোকদের নতুন ও উন্নত পদ্ধতির

১১২. *Annual Administration Report of the Department of Industries, Bengal, 1931-32,* 20
১১৩. ঐ, *1935-36,* 23.
১১৪. ঐ, *1930-31,* 17, *Report on the Administration of Bengal, 1934-35,* 159
১১৫. *Bengal Legislative Council Proceedings,* 29 March 1933, Vol. XLI, No. 2, 710-12

প্রশিক্ষণ নেয়ার সুযোগ দেয়া (এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাসবাদী কাজ প্রতিহত করা)।[১১৬] এই কর্মসূচির অধীনে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় ও দেশীয় শিল্পে আটাশটি প্রদর্শনীদল সৃষ্টি করা হয়েছিল। নির্বাচিত শিল্পগুলির মধ্যে ছিল পাট ও উলের বস্ত্র উৎপাদন, বুট ও জুতা তৈরি ও কাঁসার ধাতুদ্রব্য নির্মাণ, সাবান তৈরি, ছুরি-কাঁচি তৈরি ও মৃৎশিল্প। ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্যন্ত এক হাজারের অধিক ছাত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে ২৪১ জন ছাত্র স্বাধীনভাবে কারখানা খোলে এবং ১৬৬ জন ছাত্র চাকুরি লাভ করে (শিল্পবিভাগ এ সংখ্যাই দাবি করেছিল)।[১১৭] বাংলা সরকারের দাবি অনুযায়ী কর্মসূচিটি যেকোনভাবেই হোক কৃতকার্যতার দোরগোড়ায় পৌঁছেছিল এমনটি বিশ্বাস করা কঠিন। প্রথমত, কর্মসূচির জন্য কেবল বার্ষিক ১০০,০০০ টাকা অনুমোদন করা হয়।[১১৮] এই অল্প পরিমাণ টাকা বেশি এলাকায় প্রশিক্ষণসুবিধার বিস্তার বাধ্যতামূলকভাবে সীমিত করে দেয়। দ্বিতীয়ত, যেসকল ছাত্র ব্যবসা করতে চাইতো তাদেরকে ঋণ প্রদান করার ব্যবস্থা কর্মসূচিতে ছিল না। শিল্পবিভাগ যেকোন ধরনের আর্থিক দায় বা দায়িত্ব গ্রহণ করতো না, তবে আর্থিক অসুবিধার ক্ষেত্রে ছাত্ররা প্রাদেশিক শিল্পসাহায্য আইনের অধীনে শিল্পঋণের জন্য আবেদনের যোগ্য বলে গণ্য হতো।[১১৯] দুর্ভাগ্যবশত আইনের বিধানগুলির সঙ্কীর্ণতার দরুন উক্ত আইনের অধীনে ঋণলাভ করা কষ্টকর হতো।[১২০] আরেকটি অসুবিধা ছিল কুটিরশিল্পদ্রব্যের বিপণনব্যবস্থা নিয়ে। বাংলার শিল্পসমূহের পরিচালক এস. সি. মিত্র বলেন, "যতোক্ষণ পর্যন্ত দু'টি বিষয় অর্থ ও বিপণন এই প্রাদেশিক শিল্পসাহায্য আইনের আওতায় নিয়ে আসা না হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি সাধারণভাবে মনে করি, এ কর্মসূচির কার্যকারিতার ব্যাপারটি অনুসন্ধানযোগ্য হতে পারে না।"[১২১]

ইতিমধ্যেই উল্লিখিত কুটিরশিল্পদ্রব্য বিপণনের লক্ষ্যে নিবেদিত প্রয়াসে আশাব্যঞ্জক অনেক কিছু করা হয়েছিল। সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার সমস্যাটি নিরসনের চেষ্টা করে। কিন্তু দু'টি কারণের জন্য তাদের উক্ত প্রয়াস সফল হতে পারে নি। প্রথমত তাঁতবস্ত্র

---

১১৬. বিস্তারিত দেখুন, Iftikhar-ul-Awwal, "The Problem of Middle Class Educated Unemployment in Bengal, 1912-1942" in *Indian Economic and Social History Review*, XIX, 1, 41-42

১১৭. IOR: Vol. 12075, *Bengal Revenue Proceedings (Industries)*, December 1936, Nos. 13-14, 22

১১৮. Awwal, "Middle Class Unemployment", 42.

১১৯. BSR, Bundle No. 5, *Proceedings of the Department of Agriculture and Industries (Industries)*, B Proceedings, File No 1C/19 of 1937. দেখুন, *Note* on the scheme for helping educated young men in starting small scale industries, 3.

১২০. Awwal, *Genesis and Operation*, 409-19

১২১. BSR, Bundle No. 4, *Proceedings of the Department of Agriculture and Industries (Industries)*, B. Proceedings, March 1938, No. 26B, 2. দেখুন, S. C. Mitter's *minute*, dated 4 January 1938.

বয়নের ক্ষেত্রে কলের সুতার জন্য দাবিকৃত উচ্চমূল্যের কারণে এবং দ্বিতীয়ত সমবায় শিল্পইউনিয়নসমূহের অতিরিক্ত উপরিব্যয়ের দরুন সরকারের প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে তাঁতশিল্পের সুতীবস্ত্রের ন্যূনতম বাজারমূল্য, যে মূল্যে অনুরূপ মানের কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি হতো, সেই মূল্যের চাইতে অনেক বেশি হতে দেখা যায়।[১২২] ১৯২৯ সালে শিল্পইউনিয়নগুলিকে তাদের তৈরি পণ্য বিলিবণ্টন করার ব্যাপারে অসুবিধা দূর করার জন্য 'বাংলা প্রাদেশিক সমবায় শিল্প সমিতি লিমিটেড' নামে একটি প্রাদেশিক সংগঠনে সম্মিলিত করা হয়। কিন্তু 'বাংলা প্রাদেশিক সমবায় শিল্প সমিতি লিমিটেড'-এর ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট তহবিলের অভাবে এবং যে ঋণকৃত মূলধনের জন্য সমিতিকে উচ্চহারে সুদ প্রদান করতে হতো সেই মূলধন নিয়ে প্রধানত কাজ করার কারণে এই প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানটি শিল্পইউনিয়নগুলির সাহায্যে নিজেকে বেশি নিয়োজিত রাখতে সক্ষম হয় নি এবং কলকাতায় কেবল একটি বিক্রয়ডিপো তৈরিপণ্য প্রদর্শনের জন্য চালিয়ে যায়।[১২৩] সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয় নি এরকম সমবায় বিপণনপদ্ধতি ছাড়াও সরকার প্রেসিডেন্সির[১২৪] দেশীয় শিল্পের উন্নতি ও বৃদ্ধির জন্য লেডি কারমাইকেল কর্তৃক ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশীয় শিল্প এসোসিয়েশন এবং সকল প্রকারের গ্রামীণ হস্তশিল্পে উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে গঠিত শিল্পমিশন ও এসোসিয়েশন-এর উৎপন্নদ্রব্য বিক্রি করতে একটি কেন্দ্রীয় ডিপোর ব্যবস্থা করার জন্য উইলিংডনের কাউন্টেস-এর অনুমোদন ও আনুকূল্যে ১৯৩৪ সালের জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত গুড কমপ্যানিওনস-এর মতো এসোসিয়েশনগুলিকে ঋণ ও অর্থসাহায্য প্রদান করে।[১২৫]

উপসংহার

ভারতে বৃটিশ সরকার অর্থনৈতিক জীবনের প্রায় সকল খাতেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্মকাণ্ড সহজতর করার জন্য সরকার রাস্তা-ঘাট প্রসারিত করে, রেলপথ তৈরি করে, খাল খনন করে, উন্নত সামুদ্রিক বন্দর নির্মাণ করে এবং অভ্যন্তরীণ বহিঃশুল্ক রহিত করে। ১৮৭০ সাল থেকে সরকার কৃষির উৎসাহ সৃষ্টি ও উন্নয়নে

---

১২২. Awwal, *Industrial Development,* 224.

১২৩. ঐ, 226.

১২৪. The inaugural ceremony was held at Government House on the 16 December 1916 with Lady Carmichael in the chair. The actual organisation commenced in February 1917 and the working of the Association took a practical form during July 1917 when the Sale Depot was formally opened by Lady Ronaldshay, Lady Carmichael having left India The Headquarters of the Association were then at 3, Hogg Street, Calcutta. দেখুন, *The Bengal Home Industries Association: Annual Report with Accounts for the year ending 31 March, 1935,* (Protiva Press, Calcutta, n d 3) The work of this organisation is detailed in Iftikhar-ul-Awwal, "Activities of the Bengal Home Industries Association, 1917-1940", in the *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* XXIV-VI (1979-81), 179-88

১২৫. IOR Vol 12018, *Bengal Revenue Proceedings (Industries),* September 1934, Nos. 12-14, 21-22

মনোযোগ দেয়। সরকারের এসব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে প্রদেশে কৃষি ও বাণিজ্য বিস্তারলাভ করলেও সরকার জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যর্থ হয়।[১২৬] বস্তুত এ অবস্থার কারণ এই যে, সরকারি নীতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ প্রয়াসটি ছিল ভারতীয় অর্থনীতির সফল উন্নয়নের জন্য কৃত্রিম ও ক্ষতিকর। যে শিল্পোন্নয়ন ছিল তখনকার জন্য অতি জরুরি তাকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করা হয়।[১২৭] শিল্পোন্নয়নকে সরকারি পরিচালনার বাইরে রাখা হয়।[১২৮] বাজার হারাবার ভয়ে বৃটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করার পরিবর্তে বরং শিল্পোন্নয়নের পথে অসংখ্য বাধার সৃষ্টি করে। বিদেশী রাষ্ট্রের পণ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য মুমূর্ষু শিল্পের নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। তুলনামূলক মান ও মূল্যসম্পন্ন দেশীয় দ্রব্য লাভের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ পণ্যদ্রব্যের প্রতি অত্যধিক অগ্রাধিকার প্রদান করা হতো। শিল্পোদ্যোক্তাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হতো না কিংবা প্রদেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠানাদি সৃষ্টি করা হয় নি। বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে অতি সামান্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় অথবা বাস্তব প্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হতো না। এইরূপ বিরুদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিবেশের প্রভাবে প্রদেশে কতিপয় অর্থনৈতিক 'এনক্লেভ' ছাড়া শিল্পোন্নয়নের অগ্রগতি ছিল নগণ্য। পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণ অনুমোদন করার পর শিল্প সম্প্রসারণের পথে গৃহীত কোন প্রয়াস সরকারের পক্ষ থেকে আনুষঙ্গিক উদ্দীপক সমর্থন ও কর্মকাণ্ডের অভাবে কার্যকর হতে পারে নি। এভাবে শক্তিশালী শিল্পঅবকাঠামো সৃষ্টিতে সুদূরপ্রসারী প্রাদেশিক সাহায্যের জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষা বৃটিশ শাসনকালে কেবল একটি অসার কল্পনাই থেকে যায়।

---

১২৬. India's per capita income during the last quarter of the nineteenth century remained one of the lowest in the world. Estimates ranged from Rs. 18 calculated by Digby in 1899 to Rs. 39.5 by Atkinson in 1895. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, V. V Bhatt, *Aspects of Economic Change and Policy in India, 1800-1960,* (Bombay 1963), 18-25 The economic condition of the general masses were still worse due to great inequalities in the distribution of wealth

১২৭. Even the Famine Commission of 1879 agreed that :

. . at the root of much of the poverty of the people of India and of the risks to which they are exposed in seasons of scarcity lies the unfortunate circumstances that agriculture forms almost the sole occupation of the mass of the population, and that no remedy for present evils can be completed, which does not include the introduction of a diversity of occupations through which the surplus population may be drawn from agricultural pursuits and led to earn the means of subsistence in manufactures or some such occupations. *Report of the Indian Famine Commission* (Parliamentary Papers LII of 1880), Part II, 175

১২৮. Agricultural activities, leaving aside industrial development, were undertaken mainly to extract raw materials for British industries and not for industrial use within the country. India had become during this period a kind of complement to western Europe, giving out raw material and food and taking from it manufactured articles Such an expansion of trade based upon primary products of the soil was indeed of questionable benefit to the country. In the second decade of the twentieth century, according to Deole, 73 percent of the export trade was of unfinished goods and 77 percent of the imports of manufactured articles. দেখুন, C. S. Deole, *The State in Relation to Indian Industries,* (Bombay 1916), 7.

গ্রামীণ ঋণিতা

রতন লাল চক্রবর্ত্তী*

বাংলার কৃষকের ঋণিতা সর্বজনবিদিত। প্রাচীনকাল হতেই ঋণের ব্যবস্থা ও ব্যবহার ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ঋণদান, সুদের হার ও ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে বিস্তৃত বিধান রয়েছে, যা তৎকালীন সমাজে ঋণ ও এর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করে। আঠারো শতকের প্রথমার্ধের মঙ্গলকাব্যসমূহে ঋণপ্রদানকে মহাজনি ব্যবসা হিসেবে চিহ্নিত করতে দেখা যায় এবং একই সাথে দ্রব্য ও অর্থ উভয় ঋণের প্রচলন ছিল লক্ষণীয়।[১] বাংলায় বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সময়কালে লিখিত ফার্সি গ্রন্থ *রিসালা-ই-জিরাত* গ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে যে, রাজস্ব প্রদান বা অত্যধিক করভার এবং কখনো কখনো খরা, গবাদিপশু ক্রয়, বিয়ে ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসার জন্য কৃষক ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকে।[২]

ঋণিতার কারণ

ঋণিতার কারণ নিয়ে সমকালীন গবেষক ও লেখকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অন্যদিকে সাধারণভাবে কৃষকের ঋণিতার জন্য বহুবিধ কারণের উল্লেখ করা হয়েছে। ভূমির স্বল্প উৎপাদিকাশক্তি, প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা, উৎপাদনহানি ও পশুশক্তির ক্ষয়, দুর্ভিক্ষ, অবমূল্যায়ন (depreciation), কৃষকের স্বাস্থ্যহানি, ভূমি হতে ধীর ও অনিশ্চিত মজুরি, অমিতব্যয়িতা, পৈতৃক ঋণ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, মামলা-মোকদ্দমা, ভূমিতে

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. এ ব্যাপারে বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন, Ghanaram Chakraborty, *Sri Dharmamangula*, Piyush Kanti Mahapatra (ed.), (Calcutta 1962), 123; Ram Das Adhak, *Annada Mangala* or *Sri Dharma Purana*, Basanta Kumar Chattopadhyaya (ed.), (Calcutta 1345 B.S.), 185, Divz Ram Dev, *Avaya Mangala*, Ashutosh Das (ed.), (Calcutta 1957), 63-65, Kabikankan Mukundaram Chakraborty, *Chandi Mangala*, Bijan Bhattacharji (ed.), (Calcutta 1966), 129

২. Anonymous, *Risala-i-Zirat* (c 1750), উদ্ধৃত Irfan Habib, "Usury in Medieval India", *Comparative Studies in Society and History*, VI, (1963-64), 394.

অধিকারহীনতা, ভূমিরাজস্বনীতি, অধিক সুদের হার, মূল্যবৃদ্ধি, বিকল্প পুঁজির অভাব, বিকল্প পেশার (subsidiary) অভাব, অর্থনৈতিক সমতার ভারসাম্যহীনতা (loss of economic equilibrium) ইত্যাদি বহুবিধ কারণের উল্লেখ সমকালীন রচনা ও বিবরণীতে লক্ষ্য করা যায়। ঔপনিবেশিক যুগে রচিত এসব বিবরণীর অধিকাংশ স্থানেই কৃষকের ঋণের দায়-দায়িত্ব কৃষকের উপরই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে বিশেষভাবে কৃষকের অমিতব্যয়িতা, যেমন বিয়ে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অর্থনৈতিক সামর্থ্যের চেয়ে অধিক ব্যয়ের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত হয়েছে। কৃষকের সার্বিক জীবনে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলাফল এসব আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করে নি।[৩] কেউ কেউ মত পোষণ করেন যে, অত্যধিক রাজস্বদাবি ও অর্থকরী ফসল উৎপাদন ঋণিতার সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। এই দলের মতে, মাত্রাতিরিক্ত রাজস্বদাবি কৃষককে অতিরিক্ত অর্থকরী ফসল উৎপাদনে বাধ্য করে। ফলে কৃষকের জীবিকার জন্য ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। কিন্তু এই অনুমিতি সম্পর্কে অন্য একটি গবেষকদল প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং বক্তব্য রেখেছেন যে, টাকায় রাজস্ব গ্রহণ বা অর্থকরী ফসল উৎপাদন এ দুয়ের সাথে ঋণিতার কোন সম্পর্ক নেই। শেষোক্ত দলের মতে, কতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন গ্রামীণ ঋণিতাকে জটিল করে তুলেছে। নদীর নাব্যতা হ্রাস বাংলার কতিপয় অঞ্চলে জমির উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস করেছে এবং এর ফলে বাংলার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে।[৪]

ঋণিতার সাথে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের বিষয়টি সম্প্রতি বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়াকে যারা আরোপিত ও কৃত্রিম বলে মনে করেন তাদের মতে এই প্রক্রিয়াটি ঋণিতার কারণ হিসেবে বিবেচিত। অন্যদিকে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণকে যারা স্বতঃস্ফূর্ত ও কৃষিঅর্থনীতির অনিবার্য কারণ হিসেবে গ্রহণ করেন, তারা কৃষির বাণিজ্যিকীকরণমাত্রার সাথে কৃষিঋণ ও সুদের হারের কোন নির্দিষ্ট সম্পর্ক লক্ষ্য করেন নি।[৫] বাংলায় ক্ষুদ্র চাষীর সংখ্যা সম্ভবত ছিল বেশি। তারা কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের জন্য ঋণগ্রস্ত হয় নি, প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প উৎপাদনের জন্যই ঋণগ্রস্ত

৩. Daniel and Alice Thorner, *Land and Labour India,* (Bombay 1962), 108.

৪. Ratan Lal Chakraborty, *Rural Indebtedness in Bengal*, Unpublished Ph.D. thesis, Dhaka University, 1988, 18-19.

৫. Akbar Ali Khan, *Some Aspects of Peasant Behaviour in Bengal, 1890-1914: A Neo-Classical Analysis,* (Dhaka 1982), 11; Binay Bhusan Chaudhuri,"Rural Credit Relation in Bengal, 1859-1885", *Indian Economic and Social History Review,* VI: 3 (1968), 204; M. Mufakharul Islam, "Problems of Agricultural Indebtedness in British India: Some Traditional Views Reconsidered", *Calcutta Historical Journal*, VI, (1982), 33; মনোজ কুমার সান্যাল, "ঔপনিবেশিক বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে ঋণ ও জমি হস্তান্তরের সমস্যা : একটি জেলাওয়ারী সমীক্ষা", *ইতিহাস অনুসন্ধান*, ৪র্থ খণ্ড, গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), (কলকাতা ১৯৮৯), ২৫১-৬১।

হয়েছে। তবে এ বিতর্ক অমীমাংসিত রয়ে গেছে। বিনয় চৌধুরী একটি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, যেসব অঞ্চল জীবিকার অর্থনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেসব অঞ্চলে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ কৃষকের উপর অধিকতর ঋণের বোঝা চাপিয়েছে। অবশ্য এসব কৃষকের ঋণলভ্যতার সুযোগও ছিল বেশি। কৃষিঋণের এই অবস্থার সাথে ভূমিঅধিকার ও হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটিকে অনিবার্যভাবেই যুক্ত করা হয়েছে।[৬]

সরকারিভাবে ঋণের কারণ হিসেবে কৃষক সম্প্রদায়ের অমিতব্যয়িতার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভারতের কৃষি সম্পর্কিত রাজকীয় কমিশন (Royal Commission on Agriculture in India) এবং দুর্ভিক্ষ কমিশনের বিবরণীসমূহে কৃষকের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাত্রা ও সাধ্যাতীত ব্যয়ের উপর আলোকপাত করে এগুলোকে কৃষকের ঋণের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[৭] কিন্তু এসব বক্তব্যের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, কৃষিজীবী ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর লোকজনও ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অত্যধিক ব্যয় করে কেন ঋণগ্রস্ত হয় না ? প্রকৃতপক্ষে কৃষকের প্রয়োজনের তুলনায় আয় ছিল কম এবং প্রয়োজনই তাকে ঋণগ্রস্ত হতে বাধ্য করে। এ ছাড়া কৃষক একটি অনিশ্চিত অর্থনৈতিক জীবনে বাস করে, যেখানে খরা, বন্যা, ঝড়, মহামারী তার অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে বিনষ্ট করে বার বার তাকে ঋণগ্রস্ত করে তোলে এবং মহাজন এই অবস্থাটির সুযোগ গ্রহণ করে। ঋণের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ ঋণিতার মাত্রাকে অনুধাবন করা সম্ভব। ১৯৪০-এর দশকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মোট ঋণিতার পরিমাণ, কৃষকপ্রতি ঋণের গড় এবং প্রতি একর চাষযোগ্য জমির উপর ঋণের গড় পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

সারণি ১ হতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বাংলার ঋণিতার অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু উপরোক্ত পদ্ধতির দ্বারা সঠিকভাবে ঋণিতার মাত্রা নিরূপণ করা সমীচীন নয়। কেননা এর সাথে ভূমি অধিকারের পরিমাণও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৬. Binay Bhusan Chaudhuri, "Rural Credit Relation in Bengal, 1859-1885", *Indian Economic and Social History Review*, VI. 3 (1969), 203-57; Rajat and Ratna Roy, "The Dynamics of a Continuity of Rural Bengal under the British Imperium: A Study of Quasy-stable Equilibrium in Underdeveloped Societies in a Changing World", *Indian Economic and Social History Review*, X. 2 (1973), 103-128.

৭. Famine Commission of India, Answer given to the Famine Commissioner of Bengal, 1878, *Proceedings of the Lieutenant Governor General of Bengal*, Revenue Department, December, 1878, Vol 82, para, 9.

সারণি ১ : ভারতের প্রদেশভিত্তিক ঋণিতার সাংখ্যিক বিবরণ, ১৯৪০

প্রদেশ	মোট ঋণের পরিমাণ (টাকায়)	প্রতি কৃষিজীবীর ঋণিতার গড়	প্রতি একর চাষযোগ্য জমির উপর ঋণিতার গড়
বাংলা	১০০ কোটি	৩১	৪৩
আসাম	২২ "	৩১	৩৭
বিহার ও উড়িষ্যা	১৫৫ "	৩১	৬৩
বোম্বে	৮১ "	৪৯	২৫
মধ্য প্রদেশ	৩৬ "	৩০	১৪
মাদ্রাজ	১৫০ "	৫০	৪৪
পাঞ্জাব	১৩৫ "	৯২	৫০
যুক্ত প্রদেশ	১২৪ "	৩৬	৩৬

উৎস : N C Abhyaukar, *Provincial Debt on Legislation in Relation to Rural Credit*, (New Delhi Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, 1940), 5.

সারণি ২ : ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের চাষাবাদকৃত ও চাষযোগ্য ভূমির সাংখ্যিক বিবরণ, ১৯২০

প্রদেশ	প্রতি [illegible] জন সাধারণ চাষীর জন্য চাষযোগ্য ভূমির গড়	প্রতি কৃষিজীবীর চাষাবাদকৃত ভূমির পরিমাণের গড়
বাংলা	৩১২ একর	০.৫৭
আসাম	২৯৬ "	পাওয়া যায় নি
বিহার ও উড়িষ্যা	৩০৯ "	০.৮২
বোম্বে	১২১৫ "	২.০১
মধ্য প্রদেশ	৮৪৮ "	পাওয়া যায় নি
মাদ্রাজ	৪১৯ "	১.১৪
পাঞ্জাব	৯১৮ "	১.৮০
যুক্ত প্রদেশ	২৫১ "	০.৯২

উৎস : N C Abhyaukar, *Provincial Debt Legislation in Relation to Rural Credit*, 6

উপরোক্ত সারণি ২ হতে সহজেই জানা যায় যে, বাংলায় চাষযোগ্য ভূমির গড় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে কম ছিল। বাংলার জমির একরপ্রতি উৎপাদন ভারতের বেশ কয়েকটি প্রদেশের একরপ্রতি উৎপাদনের চেয়ে কম ছিল। অন্যদিকে বাংলায় জনসংখ্যার চাপ ছিল মাত্রাতিরিক্ত। এই অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই গ্রামীণ ঋণিতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাংলার কৃষকের অর্থনৈতিক জীবনে মহাজনের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। পেশাগত মহাজন ছাড়াও দোকানদার, জমিদার ও অন্যান্য ভূস্বামী এবং বিধবা রমণী এই মহাজনি ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলেন।[৮] বিশ শতকের প্রথমদিক হতে এ দেশে কাবুলী মহাজনদের প্রভাব কমতে থাকে এবং দেশীয় মহাজনদের প্রভাব বাড়তে শুরু করে। এর প্রধান কারণ ছিল পাটসহ অর্থকরী ফসলের চাষ। কিন্তু দেশীয় মহাজনদের ঋণদানতৎপরতা ক্রমশ বাংলার কৃষকদের জন্য এক দুর্দশাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। কেননা ঋণের নিরাপত্তা হিসেবে জমি বন্ধক রাখার শর্ত এবং শেষ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের অনিবার্য ফল ভূমিহস্তান্তর গ্রামীণ কৃষককুলের অর্থনৈতিক জীবনে মারাত্মক ফল বয়ে আনে। কেননা ভূমি বন্ধক বা হস্তান্তরের ফলে কৃষক হয় বর্গাদার নয় ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়। কিন্তু ঋণিতার বিষয়টি নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হলেও সমস্যাটি বিশ শতকের অর্থনৈতিক মন্দার পূর্ব পর্যন্ত কোন জটিল সমস্যায় পরিণত হয় নি। এ সম্পর্কে সরকারি পর্যায়ে তথ্যসংগ্রহ এবং সুষ্ঠু ঋণব্যবস্থার জন্য কিছু কিছু আইনগত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও সমস্ত পরিস্থিতি ছিল মহাজন-স্বার্থের অনুকূল।

বাংলার ঋণিতার বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে বিশ শতকের ত্রিশের দশকে সৃষ্ট মন্দার কারণে। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের কৃষিঅর্থনীতিকে অর্থনৈতিক মন্দা বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।[৯] অর্থনৈতিক মন্দার ফলে পাট ও চালসহ কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়, কিন্তু কৃষকের পরিশোধযোগ্য রাজস্ব ও মহাজনি সুদের হার অপরিবর্তিত থাকে। উল্লেখ্য যে, 'বাংলার চাষী' তার উৎপাদিত কৃষিদ্রব্য বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দ্বারাই রাজস্ব ও মহাজনের দেনা পরিশোধ করে। বাংলায় উৎপাদিত কৃষিদ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল ধান ও পাট এবং এ দু'টি কৃষিদ্রব্যের মূল্য অর্থনৈতিক মন্দার ফলে আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। ফলে কৃষক একদিকে জমিদারের রাজস্ব প্রদানে, অন্যদিকে মহাজনের দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ১৯২৮ সালে লক্ষ্য করা গেলেও বাংলায় এর প্রভাব পড়ে ১৯৩০ সাল হতে। সারণি ৩-এ অর্থনৈতিক মন্দার সময় বাংলার ধান ও পাটের মূল্যের ক্রমঅধোগতি লক্ষ্য করা যায়।

উক্ত সারণি হতে জানা যায় যে, ধানের মূল্য ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩২ সালে শতকরা ৫৪ ভাগ হ্রাস পায়। ১৯৩৭ সালে ধানের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তখন তা ১৯২৯ সালের তুলনায় শতকরা প্রায় ৪৩ ভাগ নিচে ছিল। অন্যদিকে পাটের মূল্য ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩৩-৩৪ সালে শতকরা ৫৭ ভাগ হ্রাস পায়। একই সাথে ঐ সময়ে অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়।

৮. Ratan Lal Chakraborty *Rural Indebtedness in Bengal*, Unpublished Ph D. thesis, Dhaka University, 1988, 44-81

৯. Omkar Goswami, "Agriculture in Slump. The Peasant Economy in East and North Bengal in the 1930s", *Indian Economic and Social History Review*, Vol. 21, Part-3, 1984, 338.

সারণি ৩ : ধান ও পাটের মূল্যতালিকা, ১৯২৮-১৯৩৭
(১৯২৯=১০০)

বছর	ধান	পাট
১৯২৮	১১১.৯	১০৭.৩
১৯২৯	১০০.০	১০০.০
১৯৩০	৭৩.১	৫৪.৯
১৯৩১	৫৫.৮	৫৪.৪
১৯৩২	৪৫.৯	৫০.০
১৯৩৩	৫৫.১	৪৩.৯
১৯৩৪	৫৫.১	৪৩.৫
১৯৩৫	৫৩.৩	৬২.২
১৯৩৬	৫৮.৯	৭১.৩
১৯৩৭	৫৭.৬	৭৭.৮

উৎস : *Season and Crop Reports of Bengal*, 1928-1937.

প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস না পেলেও কৃষিদ্রব্যের [illegible]

কৃষক সম্প্রদায় নিয়মিত ভূমিকর প্রদানে অক্ষম হলে ভূস্বামীগণও রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হয়। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক মন্দা বাংলার প্রায় প্রতিটি সম্প্রদায়ের জীবনে বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই মন্দা বাংলার কৃষিঅর্থনীতিতে নতুন ধারার সূচনা করে। এর ফলে মহাজন ঋণসঙ্কোচনের সুযোগ গ্রহণ করে ও ঋণী কৃষকের উৎকৃষ্ট ভূমিসমূহ ক্রয় করতে থাকে। ফলে বহুসংখ্যক কৃষক ভূমিহীন হয়ে বর্গাচাষী ও কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয়। মহাজনরা তাদের ধারের অর্থ ও সুদ আদায়ে ব্যর্থ হয়ে আদালতের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে কৃষকদের জমিজমা হস্তগত করে।

প্রলম্বিত অর্থনৈতিক মন্দা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায় এবং এই অসন্তোষ জমিদার ও মহাজনবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৯১৮-১৯ সালের বার্ষিক ভূমিরাজস্ববিবরণীতে কৃষকঅসন্তোষের তথ্য দেয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক মন্দার ফলে এই অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি পায় এবং কৃষকদের পূর্ববর্তী ভূমি অধিকারের দাবির পরিবর্তে ঋণমুক্তির দাবি প্রাধান্য লাভ করে। ১৯২৮ সালে ঢাকার মানিকগঞ্জের মুসলমান ও নমশূদ্র বর্গাচাষীরা মহাজনি ব্যবসায়ী সাহাদের ভূমি চাষ করতে অস্বীকার করে। ১৯২৯ সালে নারায়ণগঞ্জে হিন্দু মহাজন ও মুসলমান চাষী-খাতকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মহাজনবিরোধী

আন্দোলন গড়ে উঠে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে, যেখানে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারার ধারক যুব কমরেড লীগ কৃষকদেরকে মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে।[১০] ১৯২৯ সালে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া গ্রামের চাষী-খাতকরা সেখানকার ঈশ্বরচন্দ্র শীল নামে জনৈক মহাজনের বাড়ি আক্রমণ করে তার কাছে গচ্ছিত তমসুকপত্রগুলো ফেরত চায়। চাষী-খাতকরা সুদাসল মোট ২৫০ টাকার মধ্যে ৯০ টাকা তমসুকপত্র প্রত্যর্পণের বিনিময়ে ফেরত দিতে রাজি ছিল। একই প্রকৃতির ঘটনা ময়মনসিংহের এগারো সিন্ধু, জাঙ্গালিয়া, মজিদপুর, বাহাদিয়া, মালপাড়া, শুক্রাবাদ, মির্জাপুর, জামালপুর ও গোবিন্দপুরে লক্ষ্য করা যায়। রক্তক্ষয়ী ঘটনার অবতারণা ঘটে জাঙ্গালিয়া গ্রামে, যেখানে তমসুকপত্র ফেরতদানের দাবি অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণচন্দ্র রায় নামে জনৈক জমিদার মহাজন আটজন চাষী-খাতককে হত্যা করে। এই জন্য ক্ষুদ্র চাষী-খাতকরা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে হত্যা করে এবং তমসুকপত্রসমূহ ছিঁড়ে ফেলে।[১১] এসময় মহাজনবিরোধী আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মহাজনের কাছে তমসুকপত্র প্রত্যর্পণ দাবি এবং দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে মহাজনের বাড়ি আক্রমণ। কিশোরগঞ্জের এই মহাজনবিরোধী আন্দোলন এক পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কিশোরগঞ্জে মহাজনবিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে নোয়াখালী ও ঢাকা হতে মুসলমান নেতৃবৃন্দ (মোল্লাগণ) কিশোরগঞ্জে এসে মহাজনবিরোধী আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে রূপ দেয়। ঢাকা ও কলকাতার পত্র-পত্রিকা এই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করলেও সরকারিভাবে এই আন্দোলনকে অসাম্প্রদায়িক হিসেবে গণ্য করা হয়, কেননা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মহাজনই চাষী-খাতক আন্দোলনকারীদের মূল লক্ষ্য ছিল। উল্লেখ্য যে, কিশোরগঞ্জের আন্দোলনে হিন্দু জমিদার অপেক্ষা হিন্দু মহাজনই ছিল চাষী-খাতকদের প্রধান লক্ষ্য। কেননা ভূমিকরের চেয়ে ঋণ ও সুদের চাপই ছিল চাষী-খাতকদের উপর বেশি। মহাজনবিরোধী আন্দোলন ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায় সংঘটিত হবার প্রধান কারণ এই যে, এ দু'টি জেলা ছিল পাট উৎপাদনকারী প্রধান জেলা এবং এ জেলা দুটিতে মহাজন ও খাতকের সংখ্যা অন্যান্য জেলার চেয়ে বেশি ছিল।[১২] সুতরাং অর্থনৈতিক মন্দা অনিবার্যভাবে এ জেলা দু'টিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

অর্থনৈতিক মন্দার সময় চাষী-খাতকের সঙ্গে জমিদার-মহাজনের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ১৯৩৩ সালে রাজশাহীতে মৌলবি আবদুর রশীদের নেতৃত্বে নিখিল বঙ্গ চাষী-খাতক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে চাষীরা মাত্রাতিরিক্ত করভারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জমিদারকে প্রদেয় করের সাথে মূল্যের সামঞ্জস্যবিধানের দাবি উত্থাপন করে। নোয়াখালী

১০. Tajul Islam Hashmi, *Peasant and Politics in East Bengal, 1920-1947*, Unpublished Ph.D thesis, University of Western Australia, 1986.

১১. Tanika Sarkar, *Bengal, 1928-1934 The Politics of Protest*, (Delhi 1987), 104-14

১২. ঐ।

ও ত্রিপুরার কৃষক সমিতিও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, এসময় চাষী-খাতকদের আন্দোলনে রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদানের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে ১৯৩১ সালে কৃষক সমিতি মীরাটের বন্দিদের মুক্তির দাবিটি তাদের ইউনিয়ন বোর্ডের খাজনা ও ঋণের সুদের হার হ্রাসের দাবির সাথে সমভাবে উত্থাপন করে। বাংলার বিভিন্ন স্থানে এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও অবস্থা সমানভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গসংগঠন হিসেবে চিহ্নিত কোন কোন জেলার কৃষক সমিতি এসব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। অন্যদিকে মহাজন ও ভূস্বামীরাও চাষী-খাতকদের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনকে বাধাদানের জন্য অনুরূপভাবে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। কুমিল্লার নবীনগরে জমিদার ও মহাজনরা শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করে এবং তাঁরা কৃষক সমিতির এসব তৎপরতাকে কমিউনিস্ট তৎপরতা হিসেবে আখ্যায়িত করে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে সেখানকার চাষী-খাতক খাজনা প্রদান ও ঋণ প্রত্যর্পণ বন্ধ করে দেয়। ১৯৩২ সালে চাঁদপুর পুরান বাজার মুসলিম যুবক সমিতি বাংলার কৃষক সমিতির উৎসাহে একটি সভা আহ্বান করে, যেখানে রণজিৎ বর্মা নামে জনৈক ব্যক্তি মহাজনি ব্যবসার উপর এক বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৩৩ সালের মে মাসে একদল কৃষক নবীগঞ্জের বলসিদ গ্রামের জনৈক তালুকদার মহাজনকে আক্রমণ করে। উল্লেখ্য যে, এই ঘটনার পর ত্রিপুরা কৃষক ও শ্রমিক সমিতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। সরকার এ পর্যায়ে কিছু নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেও চাষী-খাতক আন্দোলনকে সমূলে বিনষ্ট করতে সক্ষম হয় নি। ১৯৩৪ সালের পুলিশ প্রশাসন বিবরণীতে উল্লেখ করা হয় যে, এসব ঘটনার পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে এবং কৃষক সমিতির পরিচালিত এই আন্দোলনের লক্ষ্য হলো ধনী মহাজনদের সম্পদ লুঠ করা এবং তাদের ঋণ সম্পর্কিত দলিলপত্র বিনষ্ট করা।[১৩] ত্রিপুরার চাষী-খাতকদের এই জমিদার-মহাজনবিরোধী আন্দোলন বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৪ সালে বগুড়ায় প্রজানেতা রজীব উদ্দীন তরফদার চাষী-খাতকদের মধ্যে ঋণ ও কর লাঘবের দাবি প্রচার করে চাষী-খাতকদের এই আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে তোলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩০-এর দশকে পরিচালিত চাষী-খাতকদের আন্দোলন গ্রামীণ ঋণিতা সম্পর্কে সরকারি মনোভাবের পরিবর্তন আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকারও সরকারি সংস্থায় বিদ্যমান অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত হয়। বাংলার সমকালীন লেখক ও চিন্তাবিদরাও চাষী-খাতকের আন্দোলনের সাথে কমিউনিস্ট তৎপরতা ও কমিউনিজমভীতিকে একীভূত করে ফেলেন। কেননা এই আন্দোলনে চাষী-খাতকরা তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, যেমন কৃষক সমিতি, কৃষক প্রজা পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল।

১৩. *Report on the Police Administration on the Bengal Presidency*, 1934, *Proceedings* of the Government of Bengal, Police Department, September, 1935, 19

বাংলায় ব্যাপক চাষী-খাতক আন্দোলন, মহাজন ও খাতকদের সম্পর্কের ক্রমাবনতি এবং এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ সরকারের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করে। ১৯৩৩ সালে বৃটিশ ভারতীয় নিখিল ভারত ভূস্বামীসভার এক সম্মেলনে সভাপতি বিজয় চাঁদ মাহতাব অর্থনৈতিক মন্দার বিষয়টি সামনে রেখে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঋণভার লাঘব ও গ্রামীণ ঋণব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বক্তব্য পেশ করেন।[১৪] এই সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূস্বামীদের ঋণিতার দায় হতে অব্যাহতি দেবার জন্য ঋণসালিশী বোর্ড ও জমিবন্ধকি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ভারতীয় চেম্বার অব কমার্স সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ঋণসালিশী বোর্ড গঠনে প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন ছাড়াও নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সমিতি, কৃষক প্রজা পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস ও সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগের সমর্থন লক্ষ্য করা যায়।[১৫] বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম জরিপকারী জে. সি. জ্যাক চাষী-খাতকের ঋণমুক্তি ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সুদের হার হ্রাস, ঋণের আসল পরিমাণ অর্থ মহাজনকে প্রত্যর্পণ ও নতুন করে ঋণগ্রস্ত না হবার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এস. জি. পানান্দিকার সমবায় ঋণ সমিতি গঠনের মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ লাঘব করার পরামর্শ প্রদান করেন। সমকালীন লেখক এস. সি. মিত্র ঋণকে সর্বদা চাষী-খাতকের পরিশোধক্ষমতার সীমার মধ্যে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[১৬] প্রকৃতপক্ষে এসব প্রস্তাব একটি উত্তম ব্যাঙ্কব্যবস্থা গঠনের দিকনির্দেশ প্রদান করে। এরই ফলে গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি বাংলার ব্যাঙ্কব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য প্রদান প্রসঙ্গে কৃষিঋণিতার উপর মন্তব্য করে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং কমিটির বিবরণীতে উল্লেখ রয়েছে যে, কেবল বর্তমান ঋণভার লাঘবের মধ্যেই ঋণিতার সমস্যা দূরীকরণের প্রচেষ্টা নিহিত নয়, বরং কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজিসরবরাহ বৃদ্ধি করাও একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা।[১৭] ১৯৩৩ সালে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয় অর্থনৈতিক মন্দা ও পাটের মূল্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনার জন্য। একই বছর বাংলা সরকার কেবিনেট অর্থনৈতিক কমিটি গঠন করে প্রশাসনিক ও আইনগতভাবে বিদ্যমান অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করার উদ্যোগ নেয়।

১৪. Resolutions of the All Bengal Landholders Conference, 13 August, 1933, Government of Bengal (hereafter abbreviated as G.O B.), B Proceedings (hereafter abbreviated as B-Prods), Co-operative Credit and Rural Indebtedness, (hereafter Abbreviated as C.C R.I.), Co-operative Societies Branch (hereafter abbreviated as C.S.), Bundle No 1, July 1936, Progs. No. 2-3.

১৫. বাংলায় মুসলিম রাজনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal, 1937-1947,* (New Delhi 1976), 67, B.R. Khan, *Politics in Bengal,* (Dhaka 1987), 19.

১৬. S.C Mitter, *A Recovery Plan for Bengal,* (Calcutta 1934), 159.

১৭ *Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee,* Vol. I, 75

প্রকৃতপক্ষে এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্রমাগ্রসরমান সন্ত্রাসী ও কমিউনিস্ট তৎপরতা প্রতিরোধের জন্য অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করা। কেবিনেট অর্থনৈতিক কমিটি সমবায় সমিতির মাধ্যমে উন্নত ঋণব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে মতপ্রকাশ করে। অর্থাৎ এই কমিটি ঋণিতার মাত্রা হ্রাসের জন্য আইন প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং একই সাথে চাষী-খাতকের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য জমিবন্ধকি ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গঠন, সুষ্ঠু বাজারব্যবস্থা সৃষ্টি, লোন কোম্পানি ও মফস্বল ব্যাঙ্ক পুনর্গঠন, জমিদারি ক্রয় ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মতপ্রকাশ করে। ঋণনিষ্পত্তি, ঋণের সুবিধা ও সুদের হার হ্রাস সম্পর্কে কেবিনেট কমিটির মতামত ছিল এই যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না পেলে এসব বিষয়ে গৃহীত কোন ব্যবস্থা সুচারুরূপে কার্যকর করা সম্ভব হবে না।[১৮] যাই হোক, ১৯৩৩ সালে অর্থনৈতিক মন্দার বিষয়টিকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়, যা ১৯৩৪ সালে বাংলার ঋণিতার উপর বিশদ বিবরণী পেশ করে ও কৃষকের ঋণিতার অবসানের জন্য ঋণসালিশের ব্যবস্থা এবং কৃষকের প্রাপ্তিসাধ্য সম্পদ হতে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মতপ্রকাশ করে। ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের বিষয়টি ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়। সরকারিভাবে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ঋণিতার অবসানের জন্য প্রাদেশিক পর্যায়ে ভারতের সর্বত্র স্বতন্ত্র আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মতপ্রকাশই ছিল এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।[১৯] প্রাদেশিক পর্যায়ে স্বতন্ত্র আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ ছিল, বিভিন্ন প্রদেশে ভূমিব্যবস্থা ছিল ভিন্ন ভিন্ন এবং অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল স্বতন্ত্র। অর্থনৈতিক তদন্ত বোর্ডের সুপারিশক্রমেই ঋণিতার উপর একটি বিল প্রণয়ন করা হয় এবং তা স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।[২০] সিলেক্ট কমিটি এই বিলটিতে সামান্য পরিবর্তন করে এবং আলোচনার জন্য তা বঙ্গীয় আইন পরিষদে উপস্থাপন করে।

বঙ্গীয় চাষী-খাতক বিলের আইনগত দিক সম্পর্কে আলোচনার আগে ঋণিতা ও ভূমিহস্তান্তর সম্পর্কিত ইতিপূর্বে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা সঙ্গত কারণেই প্রয়োজন। বাংলায় কোম্পানিশাসন প্রতিষ্ঠার পর ১৭৭২ সালে ঋণ ও সুদের হারের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য কোম্পানির কমিটি অব সার্কিট মাসিক শতকরা ২ টাকা হারে সুদ

১৮. *The Case for a Comprehensive Plan of Economic Development in Bengal*—A Brochure circulated by the cabinet Economic Committee, 1933-34, G.O.B., B-Prods., C.C.R.R.I., Rural Indebtedness Branch (hereafter abbreviated as R.I.), Bundle No 14, May 1946, Progs. Nos. 149-50.

১৯. Government of Bengal, *Report on the Activities of the Board of Economic Enquiry during the years 1936-37 to 1938-39,* (Compiled by Nihar Chandra Chakraborty), (Alipore 1939), 11

২০. Krishna Kumar Sharma, "The Provincial Economic Conference", *Mysore Journal of Economics*, XX. 7 (1934), 375

ধার্য করে এবং একই সাথে শর্ত আরোপ করে যে, কিস্তি অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য ঋণ ধার্য হলে নতুন কোন সুদ আরোপ করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল এ দেশে ঋণের বিষয় মীমাংসার সর্বপ্রথম আইনানুগ পদক্ষেপ। ১৭৭৩ সালে প্রবর্তিত 'নর্থ রেগুলেটিং এ্যাক্ট' অনুসারে ভারতে অবস্থানরত ইউরোপীয়দের কাছ থেকে ১২% হারে সুদ গ্রহণের নীতি প্রবর্তন করা হয়। ১৮৫৫ সালে ২৭ নং আইন প্রবর্তন করে সুদের হার সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি আদালতের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এর ফলে সুদের হার প্রতিযোগিতামূলক হয়ে পড়ে এবং খাতকের অবস্থান পূর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় হয়।[২১] অন্যদিকে এই আইনবলে ঋণব্যবসায়ের একচেটিয়া বাজার ভেঙে যায়। একই সাথে প্রাচীন ভারতীয় Damdupat আইন কার্যকরী থাকে, যেখানে সর্বমোট সুদের অর্থকে লগ্নীকৃত মূল অর্থের ঊর্ধ্বে কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় নয় বলে বিধি ছিল। একইভাবে ১৯০১ সালে ইংল্যান্ডে প্রবর্তিত মহাজনি আইন অনুসরণ করে ভারতে ১৯১৮ সালে লগ্নি আইন পাশ করা হয়, যেখানে সুদের হার মাত্রাতিরিক্ত হলে এবং ঋণের আদান-প্রদান বিধিযোগ্য না হলে ঋণগ্রহীতাকে সুদ ও আসল হতে অব্যাহতি প্রদানের শর্ত ছিল। এই আইন নগদ অথবা দ্রব্য উভয় ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল এবং বিধি অনুযায়ী ঋণের আদানপ্রদান সম্পাদিত হলে আদালতকে মহাজনের অনুপস্থিতিতেই একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে রাজকীয় কৃষি কমিশন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯২৬ সালে পূর্ববর্তী লগ্নি আইন সংশোধন করা হয়, যেখানে খাতককে ঋণমুক্তির জন্য আদালতের শরণাপন্ন হবার অধিকার প্রদান করা হয়েছিল। ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের পূর্বে খাতক ও মহাজন সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আইনগত পদক্ষেপ ছিল ১৯৩৩ সালের বঙ্গীয় মহাজনি আইন। বাংলার মহাজন, ব্যবসায়ী, কুসিদজীবী, জমিদার, তালুকদার, কৃষক, মজুর ও খাতক সকলেই এই আইনের আওতায় আসে এবং এই আইন ঋণের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম প্রচলন করে সনাতন ঋণসম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনে। মুহম্মদ আজিজুল হক ১৯৩৩ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদে বঙ্গীয় মহাজনি আইনের প্রস্তাব পেশ করেন এবং তা আইন পরিষদের সমর্থন পেয়ে আইনের রূপ লাভ করে। ১৯৩৩ সালের বঙ্গীয় মহাজনি আইন এর আগে প্রদত্ত নিরাপদ ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫% এবং ঝুঁকিপূর্ণ ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫% বেশি সুদ ধার্য করাকে অযৌক্তিক ঘোষণা করে।[২২] প্রাচীন Damdupat আইন অনুসরণ করে বঙ্গীয় মহাজনি আইন শর্ত আরোপ করে যে, মূল ঋণের পরিমাণের অধিক সুদের অর্থদাবিতে আদালতে কোন ডিক্রি জারি করা যাবে না। এক

২১. K G Sivaswamy, *Legislative Protection and Relief of Agriculturist Debtors in India*, (Poona 1939), Publication No 8

২২. *Bengal Board of Economic Enquiry Report*, 1935, Supplement to the *Calcutta Gazette*, 24 January, 1935, 143

কথায় বলা যেতে পারে যে, বঙ্গীয় মহাজনি আইন মহাজনের অপ্রতিহত ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস করে, কেননা এই আইনে খাতককে ঋণগ্রহণ সম্পর্কিত সকল নথিপত্র যথাযথভাবে মহাজন কর্তৃক প্রদানের শর্ত থাকে। অন্যদিকে মহাজনদের লাইসেন্স গ্রহণ এবং নিয়মিত রেজিস্টার সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়। এই আইনে নিরাপদ ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬% এবং ঝুঁকিপূর্ণ ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৮% সুদ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। বঙ্গীয় মহাজনি আইন সমকালীন কায়েমি স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক সমালোচিত হলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এই আইন খাতককে প্রয়োজনে সুবিচার লাভের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ ও অধিকার প্রদান করে।

বাংলার চাষীর চাষাবাদ ও জীবিকানির্বাহের জন্য ঋণের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র চাষী-খাতককে ঋণের ক্ষেত্রে আইনগত নিরাপত্তাদানের পাশাপাশি চাষীর প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানোর ক্ষেত্রে সমবায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াস নেয়। কেননা বাংলার চাষী ক্রমশই অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে এবং তাদের ঘিরে জমিদারের সনাতন প্রভাববলয় ভেঙে পড়ে। ১৮৫৭ সালে দাক্ষিণাত্যে মারাত্মক কৃষকবিদ্রোহ দেখা দিলে 'Deccan Agriculturists Relief Act' আইন পাশ করে বৃটিশ সরকার সেখানে ঋণের জন্য স্থায়ীভাবে ভূমিবিক্রয় বন্ধ করে দেয়। ১৮৮০ এবং ১৯০১ সালের ফেমিন কমিশন ঋণসমস্যার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করলে লর্ড ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন সমবায় সমিতি গঠনের সম্ভাব্যতা নিরূপণের প্রয়াস গ্রহণ করে। এই কমিটির সুপারিশক্রমে রাইফেইসেন মডেলে সমবায় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯০৪ সালে সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাশ করা হয়।[২৩] কিন্তু বঙ্গভঙ্গের সময় এই আইন পাশ হলে জনগণ সমবায় সমিতি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে, যার ফলে সমবায় আন্দোলন প্রয়োজনীয় জনসমর্থন লাভ করে নি। বিভিন্ন সময়ে সমবায় ঋণদান সমিতি আইনের বিভিন্ন সংশোধন সাধিত হলেও বিভিন্ন কারণে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

চাষী-খাতকদের দুর্দশা মোচনের জন্য অবলম্বিত আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং এই আইনের ব্যবহার বাংলার অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী ফলাফল বহন করে। ১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষিজীবীর ঋণ তার পরিশোধক্ষমতার সীমায় কমিয়ে এনে খাতক ও মহাজনের মধ্যে মীমাংসা করা। উল্লেখ্য যে, ১৯৩৫ সালে চাষী-খাতক আইন পাশ হবার আগে পূর্ব বাংলায় কমপক্ষে দুইবার

---

২৩. Unlimited liability, limited area of operation and small membership were the basic features of Raiffeisen model for Co-operative Society. G.O B., B-Prods., C.C.R.I., C.S., Bundle No. 20, July 1947, Progs. Nos. 1-2

অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। ১৯১৮ সালে পাবনায় সমবায় সমিতির অনুপ্রেরণায় কুসিদ আইনের মাধ্যমে ঋণনিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অনুরূপভাবে ১৯৩৪ সালে প্রবল কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে কুমিল্লার চাঁদপুরে মহকুমা প্রশাসক আবদুল আজিজের নিরলস প্রচেষ্টায় ঋণসালিশী বোর্ড গঠন করে স্থানীয়ভাবে চাষী-খাতক ও মহাজনদের মধ্যে মীমাংসার প্রয়াস নেয়া হয়।[২৪] আবদুল আজিজ ব্যক্তিগতভাবে মহাজনদের সাথে বৈঠক করেন এবং জনসভার মাধ্যমে বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার চেষ্টা করেন। চাষী-খাতক ও মহাজন উভয়ের সাগ্রহ সম্মতিতে ঋণনিষ্পত্তির জন্য গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করে বেসরকারিভাবে গঠিত ঋণসালিশী বোর্ডে মহাজন ও খাতক হতে সমান সংখ্যক সদস্য নেয়া হয়। এই বোর্ডের মহাজন-সদস্য মহাজনগণই নির্বাচন করে এবং সদস্যদের মধ্য হতে মহকুমা প্রশাসক দুইজন মহাজনকে চূড়ান্তভাবে মনোনীত করেন। অন্যদিকে খাতক-সদস্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের মধ্য হতে মনোনীত করা হয়। এ পর্যায়ে যেসব ঋণসালিশী বোর্ড বিতর্কিত হয় এবং জনসমর্থন হারিয়ে ফেলে, সেগুলো বাতিল ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে, চাঁদপুরে পরীক্ষামূলক ঋণসালিশী বোর্ডের কার্যক্ষমতার অধীনে খাজনাকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা হয় নি। যাই হোক, কয়েকটি ধাপে ও পদ্ধতিতে সুদাসলে ঋণের পরিমাণ হ্রাস করে খাতকের পরিশোধসীমার মধ্যে আনা হয় এবং কিস্তিবন্দি অনুযায়ী ধার্যকৃত ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উপরোক্ত কর্মতৎপরতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে চাঁদপুরে ৩৯টি ঋণসালিশী বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা খাতকের ঋণের ভার লাঘবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকারিভাবে দাবি করা হয়েছে যে, চাঁদপুরে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত ঋণসালিশী বোর্ড প্রবল কৃষক বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে রহিতকরণ, খাতক ও মহাজনের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি সাধন, ঋণভার লাঘবকরণ, কর ও ঋণ পরিশোধের পরিবেশ সৃষ্টিকরণসহ কৃষি উন্নয়নের পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে ১৯৩৫ সালে প্রস্তাবিত বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ঋণসালিশী বোর্ডের গঠন ও কর্মতৎপরতায় ইতিপূর্বে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত চাঁদপুর ঋণসালিশী বোর্ডের গঠন ও কর্মতৎপরতার নীতিমালা আংশিকভাবে অনুসৃত হয়।

বাংলার রাজনীতিতে সাধারণ মানুষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে স্বীকৃত হয় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণীত হবার পর; কেননা এই আইনে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করে সাধারণ মানুষকে ভোটদানের অধিকার প্রদান করা হয়। অনিবার্যভাবে এই আইনের প্রভাব রাজনীতিতে লক্ষ্য করা যায়, যে পর্যায়ে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের সপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করে। আইন পরিষদে এবং স্বাভাবিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতির

২৪. Debt Conciliation Boards in Chandpur, G.O.B., B-Prods., C.C.R.L., R.L., Bundle No 15, December 1946, 1

লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলার তৎকালীন মুসলমান নেতৃত্ব যদিও ভূমিস্বার্থজড়িত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবুও তাঁরা কৃষকের স্বার্থরক্ষার জন্যে সোচ্চার হন। মহাজন ও খাতকের সম্পর্ক উন্নয়নে সরকারিভাবে ঘোষিত আইন-পরিকল্পনাকে এ. কে. ফজলুল হক ও আবদুর রহিমের নেতৃত্বে গঠিত নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সমিতি সমর্থনদান করে। অনুরূপভাবে হিন্দু নেতা জে. এল. ব্যানার্জী, নরেশ সেনগুপ্ত ও অতুল গুপ্তও কৃষকদের ঋণভার লাঘবের দাবি সমর্থন করেন।[২৫]

সাধারণভাবে ধারণা রয়েছে যে, এ. কে. ফজলুল হক কৃষকদের 'ঘটি-বাটি' উদ্ধারের জন্য ঋণসালিশী বোর্ড গঠন করেছিলেন। এসব বক্তব্য ছিল রাজনৈতিক নির্বাচনে ব্যক্তির নির্বাচনী প্রচারের অংশ, যার কোন ঐতিহাসিক সারবত্তা নেই।[২৬] প্রকৃতপক্ষে এই আইনটির উদ্যোক্তা ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন এবং এই আইনের কিছু অংশ প্রয়োগের সময় মন্ত্রী হিসেবে স্বাভাবিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এ. কে. ফজলুল হক। ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে খাজা নাজিমুদ্দিন বঙ্গীয় আইন পরিষদে বাংলার গ্রামীণ ঋণিতা বিল উত্থাপন করেন। আইন পরিষদে প্রলম্বিত বিতর্কের পর এই বিলটি 'সিলেক্ট কমিটি'তে প্রেরণ করা হয়, যেখানে বিলটিতে কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়।[২৭] বিলটি পুনরায় ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় আইন পরিষদে উত্থাপিত হয় এবং এটি পাশ করতে খাজা নাজিমুদ্দিন প্রবল বিতর্ক ও বিরোধিতার সম্মুখীন হন। যাইহোক, ১৯৩৫ সালের ২৩ নভেম্বর বিলটি আইন পরিষদে গৃহীত হয় এবং ১৯৩৬ সালের ৬ এপ্রিল বাংলার গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন লাভ করে তা বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনে পরিণত হয়। বাংলার ঋণভারে জর্জরিত ধ্বংসোন্মুখ চাষী-খাতককে রক্ষাকল্পে এই আইন ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের নীতিমালা প্রণয়ন করে। ঋণসালিশী বোর্ডকে প্রয়োজনে চাষী-খাতককে দেউলিয়া ঘোষণার ক্ষমতা, নিষ্পত্তির সময় মহাজনকে কিছু নগদ অর্থপ্রদানের শর্ত, ঋণসালিশী বোর্ডের গঠনকে নিরপেক্ষ করা ইত্যাদি নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে এই আইন ঋণসম্পর্কের ক্ষেত্রে এক মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে।[২৮] কেননা বাংলার কৃষিঅর্থনীতিতে মহাজনরাই ছিল প্রয়োজনীয় পুঁজির যোগানদার। মহাজনি পুঁজি কোনক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা অনিবার্যভাবে কৃষিউৎপাদন ব্যাহত করবে, কেননা কৃষিক্ষেত্রে মহাজনের বিকল্প কোন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয় নি, যা প্রয়োজনে কৃষকের পুঁজির চাহিদা পূরণ করবে। সুতরাং মহাজনদের স্বার্থও অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা এই আইনে ছিল।

২৫. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, (ঢাকা ১৯৭৬), ৩য় সংস্করণ, ২৪-২৫।

২৬. G O B., B-Prods, C C R.I, R I, Bundle No 14, May 1946, Progs Nos. 149-50.

২৭. *Report of the Select Committee on the Bengal Relief of Indebtedness Bill*, 1935, উদ্ধৃত A C Chose, *The Bengal Agricultural Debtors Act: Bengal Act VII of 1936*, (Calcutta 1941, second edition), XI-XIII

২৮. Kumud Nath Bhaumik, *The Bengal Agricultural Debtors Act : Bengal Act VII of 1936.*, (second edition, Calcutta 1937), 74-88

বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়, যেমন সংগঠন, প্রশাসন ও কার্যপদ্ধতি। এই আইনের মাধ্যমে দুই প্রকারের ঋণসালিশী বোর্ড গঠন করা হয়। প্রথম প্রকার ছিল সাধারণ ঋণসালিশী বোর্ড, যা ইতিপূর্বে বেসরকারিভাবে চাঁদপুরে প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছামূলক ঋণসালিশী বোর্ডের অনুকরণে গঠিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঋণসালিশী বোর্ড ছিল প্রকৃতপক্ষে বিশেষ ঋণসালিশী বোর্ড, যা বাধ্যতামূলক ঋণনিষ্পত্তির বিষয় বিবেচনা করার ক্ষমতাসম্পন্ন, যখন মহাজন ঋণনিষ্পত্তিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। বিশেষ ঋণসালিশী বোর্ডের বিশেষ কতগুলো ক্ষমতা ছিল। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাথে ঋণনিষ্পত্তির জন্য অন্য একশ্রেণীর বিশেষ ঋণসালিশী বোর্ড ছিল।[২৯] উদ্যোগী, উপযুক্ত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা স্থানীয়ভাবে ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের প্রচেষ্টা প্রথমদিকে লক্ষ্য করা গেলেও ক্রমশ এই নীতি বর্জিত হয়ে নতুনভাবে ঋণসালিশী বোর্ড সংগঠিত হয়।

ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান ও ক্রমবর্ধমান খরার পরিপ্রেক্ষিতে ঋণসালিশী বোর্ডে পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন উঠে। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' প্রদানের পর বিষয়টি দৃঢ়ভাবে জাতীয় চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রেও এর যথাযথ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।[৩০] এমনকি শেষেরদিকে তফসিলী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তিও নিশ্চিত করা হয়। ফলে ঋণসালিশী বোর্ডের প্রতিষ্ঠালগ্নের ধারণার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে উঠে নি।

ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মতৎপরতায় কয়েকটি নির্দিষ্ট বিকল্প ছিল।[৩১] যেমন—

ক. পারস্পরিক সম্মতিতে ঋণনিষ্পত্তি;

খ. মহাজন ও খাতক কেউ সম্মত না হলে মোট ঋণের শতকরা ৬০ ভাগ ঋণের বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তি;

গ. দখলি মর্টগেজ-এর ঋণ বাধ্যতামূলকভাবে নিষ্পত্তি;

ঘ. কোন বিশেষ ও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ঋণের সার্টিফিকেটমাত্র দান;

ঙ. খাতককে দেউলিয়া ঘোষণার মাধ্যমে ঋণনিষ্পত্তি।

জনগণের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে ঋণসালিশী বোর্ডের সহজ ও সরল কার্যবিধি প্রণীত হয়। বারো আনা কোর্ট-ফি প্রদানের মাধ্যমে বা নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে মহাজন বা খাতক ঋণনিষ্পত্তির জন্য আবেদন করতে পারতেন। ঋণনিষ্পত্তির জন্য খাতক আবেদন করলে মহাজনকে ঐ ঋণ সম্পর্কে আনুপূর্বিক বর্ণনা

২৯. Assistant Secretary, C C R.I., R I, to Officer-in-Charge, Reserve Bank of India, Bombay, 31 March 1944, G O B, B-Prods, C C.R i, R I., Bundle No 11, November 1944, Progs Nos 456-57

৩০. G O.B., B Prods, C C R I, R I, Bundle No 2, September, 1940, Progs No 630.

৩১. G.O B, *Rural Indebtedness and how the Law deals with it,* a lecture delivered at the Settlement Training Camp In Mymensingh District in December, 1939 (Alipore 1940), 9

প্রদান করতে হতো এবং একইভাবে মহাজন ঋণনিষ্পত্তির জন্য আবেদন করলে খাতককে আনুপূর্বিকভাবে ঐ ঋণের এবং তার অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিতে হতো। তবে খাতক কর্তৃক ঋণনিষ্পত্তির জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে ঐ ঋণের অংশীদারদের নাম, মহাজনদের নাম, মহাজনদের দাবিকৃত ও আসল অর্থের পরিমাণ, খাতক কর্তৃক স্বীকৃত ঋণের পরিমাণ, ঋণগ্রহণের শর্ত ও বৃত্তান্ত, খাতকের জমিজমা ও অন্যান্য হস্তান্তরযোগ্য সম্পদের এবং এসব সম্পর্কে দীউয়ানি আদালতে কোন মোকদ্দমা থাকলে তার আনুপূর্বিক বিবরণ দেবার অপরিহার্য শর্ত ছিল। অনুরূপ শর্ত ঋণনিষ্পত্তির জন্য মহাজনের আবেদন বা খাতকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহাজন কর্তৃক আনুপূর্বিক বিবরণদানের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হতো। ঋণনিষ্পত্তির জন্য খাতকের আবেদনপত্র পাবার পর ঋণসালিশী বোর্ড তা প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই আবেদনপত্রে বর্ণিত মহাজনদের, অংশীদারি খাতকদের ও ভূস্বামীদের সাধারণভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করতো। সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মতৎপরতার প্রতি সাধারণ জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা।[৩২] ঋণসালিশী বোর্ড কর্তৃক খাতকের কোন আবেদন বিবেচিত হবার পূর্বে খাতক একজন চাষী-খাতক কিনা, ঋণসালিশী বোর্ডে এই আবেদন নিষ্পত্তি হবার যোগ্য কিনা অর্থাৎ আবেদনপত্রে বর্ণিত ঋণের অর্থ পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে কিনা এবং বর্ণিত ঋণ বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনে উল্লেখিত 'ঋণের' সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিনা এসব বিবেচনা করার একান্ত অপরিহার্য শর্ত ছিল। ঋণসালিশী বোর্ডের পরবর্তী কার্যক্রম ছিল ঋণের অর্থ নিরূপণ করা ও রোয়েদাদ প্রদান করা। ঋণের অর্থ নিরূপণের ক্ষেত্রে খাতকের মোট আয়-ব্যয় ও উদ্বৃত্তআয় পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল, কেননা এই উদ্বৃত্তআয়ের উপরই রোয়েদাদ প্রস্তুত করা হতো। খাতক একেবারেই অক্ষম হলে তাকে দেউলিয়া ঘোষণা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, কেননা বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল পরিশোধ্য ঋণ খাতকের পরিশোধক্ষমতার সীমার মধ্যে এনে নিষ্পত্তি করা।[৩৩] যাইহোক, মহাজনদের এক অংশ রাজি হলে বা মহাজনদের কেউই ঋণনিষ্পত্তিতে রাজি না হলেও ঋণসালিশী বোর্ড হয় ঋণনিষ্পত্তি নয়তো ঋণ সম্পর্কিত মোকদ্দমাটি বিশেষ ঋণসালিশী বোর্ডে পাঠাতে পারতো। উল্লেখ্য, ঋণসালিশী বোর্ড কর্তৃক খাতকের আবেদনে বর্ণিত ঋণ নিরূপণ করার পূর্বদিন পর্যন্ত খাতকের বকেয়া রাজস্ব ঋণ হিসেবে গৃহীত হতো।

উল্লেখ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাতকের ঋণ বাবদ বিভিন্ন রকমের ও বিভিন্ন মেয়াদের জমিবন্ধক ছিল। এসব বন্ধকি রেহানি, দাখিল রেহানি, জায়সুদি, কট্-কবলা, বন্ধকি কট্,

৩২. *Lecture Note on the Working of the Bengal Agricultural Debtors Act, 1935,* delivered at the Settlement Training Camp in Barisal District by Deputy Director, D C. E.C., G.O.B , B-Prods , C C.R.I , R. I., Bundle No. 8, June 1942, Progs. Nos 673-74.

৩৩. Extract from a letter of the Collector of Mymensingh, 2 September 1940, G.O.B., B-Prods., C.C R.I , R I., Bundle No. 2 , July, 1941, Progs. No. 6

খাইখালাসি, সুদি কট্ ইত্যাদি নামে ও প্রকৃতিতে পরিচিত ছিল এবং এগুলো হস্তান্তর করার অধিকারবিহীন বা উপস্বত্বভোগের অধিকারসমর্পিত ছিল। ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনীতে দখলিস্বত্ব ভোগের অধিকারী রায়তও উপরোক্ত বন্ধক প্রদানের ক্ষমতাধিকারী হয়।[৩৪] ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনীতে এসব বন্ধকের মেয়াদ ১৫ বছর পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হলে অনেক চাষী-খাতক তাদের বন্ধকিজমি ফেরত পায়। এই আইন একই সাথে খাতকের অতিরিক্ত দেনার প্রবণতা গুণগতভাবেই হ্রাস করে এবং এর অতীতের সকল বন্ধকিজমির ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ খাতকের ঋণনির্ভরযোগ্যতাকেও সীমিত করে। একই সাথে ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের সংশোধনী বন্ধকিজমির বিষয়টিকে ঋণসালিশী বোর্ডের ক্ষমতাধীন করে।

বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। এসব সমালোচনার ভিত্তি ছিল সমকালীন অর্থনৈতিক তত্ত্ব। বলা হয়েছে যে, ঋণনিষ্পত্তিতে ঋণ সরবরাহের বিষয়টি অনুপস্থিত, ফলে ভবিষ্যতে চাষীরা আবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। প্রকৃতপক্ষে এসব সমালোচনা এবং ঋণসালিশী বোর্ডের কার্য পরিচালনাকালে অনুভূত বোর্ডের কতগুলো ত্রুটি বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের সংশোধন অনিবার্য করে তোলে। ফলে ১৯৩৭, ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের সংশোধনী ঋণসালিশী বোর্ডের ক্ষমতাকে অধিকতর শক্তিশালী করে অস্বীকারকারী মহাজনকে বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করে। ঋণনিষ্পত্তির বিষয়ে বিলম্ব সাধারণভাবে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিশেষভাবে কৃষিপুঁজির যোগানকে বিঘ্নিত করে। ফলে দ্রুত ঋণনিষ্পত্তির জন্য ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের সংশোধনীতে ঋণসালিশী বোর্ডকে বিশেষ প্রয়োজনে চাষী-খাতককে দেউলিয়া ঘোষণা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের সংশোধনীর জন্য আইন পরিষদে কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, কিন্তু প্রয়োজনীয় সমর্থনের অভাবে এসব উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৩৫] ১৯৩৭ সালে আইন পরিষদের পাঁচজন সদস্য বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের যে সংশোধনীর প্রস্তাব করেন, সেখানে 'খাতক' ও 'ঋণ'-এর সংজ্ঞা, বন্ধকিজমি ও ঋণসালিশী বোর্ডকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪০ সালে খান সৈয়দ মোয়াজ্জেমুদ্দিন ব্যক্তিগতভাবে আইন পরিষদে চাষী-খাতক আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেন, যেখানে বাধ্যতামূলক ঋণনিষ্পত্তি ও মহাজনদের উপর কতগুলো শর্ত

৩৪ Bengal Tenancy Act of 1938 — Conference to Discuss amendment G O B., A-Progs , Revenue Department, Land Revenue, January 1939, Progs No 2188, I

৩৫. Speech of Hon'ble Mukanda Behari Mallick, 31 March 1939, *Bengal Legislative Assembly Proceedings*, Vol IV, No 5, 209, G O.B , B-Prods., C.C.R.I , R I., Bundle No. 14, May 1946, Progs Nos 36-37, G O B , A-Prods , C C R I , R.I., July 1942, Progs. No 25, Appendix-A; G O B , B-Prods , C C R I , R I., Bundle No 14, May 1940, Progs Nos. 36-37; G O.B., B-Prods , C C R I , R I, Bundle No 6, July 1940, Progs, No. 12º

আরোপ ইত্যাদি বিষয় উত্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে আইন পরিষদে নির্বাচিত কৃষক প্রজা পার্টির সদস্যরাই ব্যক্তিগতভাবে এই আইনের বিভিন্ন সংশোধনীর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে মির্জা আবদুল গোলাম হাফিজের প্রস্তাবিত সংশোধনীতে ইতিপূর্বে দীউয়ানি আদালত কর্তৃক নির্দেশিত ভূমিবিক্রয় বন্ধ, বন্ধকিজমি পুনরুদ্ধার ও ব্যাঙ্কঋণকে চাষী-খাতক আইনে নিষ্পত্তি করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু প্রয়োজনীয় সমর্থনের অভাবে এসব সংশোধনী গৃহীত হয় নি। তবে 'খাতক' শব্দের সংজ্ঞা এবং 'খাতক' হিসেবে অন্তর্ভুক্তির দাবিসমূহ তৎকালীন বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তা ও চাহিদা সম্পর্কে আলোকপাত করে। বন্ধকিজমি পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে চাষী, মহাজন ও রাজনৈতিক দল বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করে। স্বাভাবিকভাবেই মহাজনশ্রেণী ছিল এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে।

ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মতৎপরতার সূচনা হতেই করপ্রদান ও করকে ঋণ হিসেবে গ্রহণের বিষয়টি একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে চাষী-খাতক করপ্রদান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়। বাকেরগঞ্জ ভূস্বামী সভা চাষী-খাতক কর্তৃক করপ্রদান স্থগিতকরণের পর পরই এ বিষয়ে সরকারি তদন্ত হয় এবং জেলা কালেক্টরদের বিবরণীতে চাষী-খাতকদের করপ্রদানে অনীহার কথা বলা হয়। এই পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেন যে, কর পরিশোধ করা না হলে ঋণসালিশী বোর্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আবেদন গ্রাহ্য হবে না। করপ্রদানে অনিচ্ছার ব্যাপারে তৎকালীন কমিউনিস্টদের সাথে যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে বাকেরগঞ্জ ভূস্বামী সভা।[৩৬] জমিদারি ব্যবস্থার অবসান, চাষীকে জমির মালিকানা প্রদান, জমিদারদের উৎখাত ইত্যাদি কমিউনিস্টদের বক্তব্যের সাথে রাজস্ব প্রদানে কৃষকের অনীহার যোগাযোগ রয়েছে বলে মনে করা হয়। করপ্রদান না করার প্রবণতা এত মারাত্মক পর্যায়ে গিয়েছিল যে, বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে কৃষকদের নিয়মিত করপ্রদানের আহ্বান জানান।[৩৭] (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। উল্লেখ্য, করপ্রদান না করার বিষয়টি বাংলার একক ঘটনা নয়, অথবা একে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের প্রয়োগের প্রভাব হিসেবে বিবেচনা করাও সমীচীন নয়। এই সমস্যাটি ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে জমিদার ও কৃষকের সম্পর্কের সাথে জড়িত একটি বিষয়। ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন এবং বিশেষভাবে ১৯২১ সালে বারদৌলীতে প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর 'করপ্রদান না করার' সিদ্ধান্তের প্রভাব লক্ষণীয়। আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে গান্ধীর 'ডান্ডি সল্ট মার্চ' ও ট্যাক্স প্রদানে বিরত থাকার কর্মসূচি শেষ পর্যন্ত করপ্রদান না করার আন্দোলনে পরিণত হয়। চম্পারণ, সরণ, পাটনা, মুঙ্গের, সাহাবাদ ও বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে চৌকিদারি ট্যাক্স প্রদান না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বাংলায় চৌকিদারি ট্যাক্স না

৩৬. Memorial of the Bakerganj Landholders' Association, 25 May 1939, G.O.B., B-Prods., C.C.R.I., R.I. ,Bundle-I, September 1940, Progs No. 541.

৩৭. Collector of Tippera to Secretary to the Board of Revenue, 16 June, 1939, G. O. B., B-Prods., C. C. R. I., R. I., Bundle-I, July 1940, Progs Nos 12-13

দেয়ার আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ভূমিকর প্রদান না করার আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। প্রকৃতপক্ষে আইন অমান্য আন্দোলন বাংলায় কৃষকদের মধ্যে ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব গড়ে তোলে। একই সাথে কৃষক সমিতি, কৃষক প্রজা পার্টি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মতৎপরতা কৃষকদের সচেতন করে তোলে। ১৯৩০-এর দশক হতে বাংলায় কৃষকদের জমিদারবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পায় এবং রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় এই মনোভাব ক্রমশ জমিদার ও মহাজনবিরোধী কার্যকলাপের বিস্তার ঘটায়।[৩৮] এক্ষেত্রে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের প্রবর্তন কেবলমাত্র একটি অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। কিন্তু করপ্রদান না করার মনোভাব ও সিদ্ধান্ত চাষী-খাতক আইনের কার্যকারিতা ও কৃষিক্ষেত্রে পুঁজির যোগানের বিরুদ্ধে কাজ করে।

ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মতৎপরতার সময় উল্লেখযোগ্য ঋণসংঙ্কোচন লক্ষণীয়। অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, কৃষক সম্প্রদায় কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণসংগ্রহে ব্যর্থ হয়। সরকারিভাবে মনে করা হয় যে, ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মতৎপরতার ফলেই এই ঋণসঙ্কোচনসঙ্কটের উদ্ভব হয়েছে। ১৯৩৭ সালে দিনাজপুরের সেটেলমেন্ট অফিসার ফ্রাঙ্ক ওয়েন বেল সরকারি নির্দেশে ঋণসঙ্কোচন সম্পর্কে একটি জরিপকাজ পরিচালনা করেন।[৩৯] এ পর্যায়ে জেলা প্রশাসকদের কাছে প্রেরিত একটি প্রশ্নমালা প্রচারের মাধ্যমে ঋণসংঙ্কোচন সম্পর্কে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেন তাতে দেখা যায় যে, কিছু সংখ্যক জেলা প্রশাসক একে অর্থনৈতিক মন্দাজনিত সাময়িক বিষয় বলে মনে করেন। তবে ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের ফলে ঋণসংঙ্কোচনের বিষয়টি মহাজনদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সৃষ্ট কি-না এবিষয়ে অভিন্ন মতামত পাওয়া যায় নি। যাইহোক, ঋণসঙ্কোচনজনিত অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিরসন করার জন্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও তা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় নি। প্রকৃতপক্ষে ঋণসালিশী বোর্ড গঠন করে কৃষকদের ঋণভার লাঘবের প্রয়াস গ্রহণ করা হলেও কৃষকদের নতুন করে ঋণিতার হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য কৃষিবাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের বিকল্প কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক মন্দার সময় প্রলম্বিত অর্থনৈতিক দুরবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে কৃষকরা জীবিকানির্বাহ ও কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য ভূমিবিক্রয়ে বাধ্য হয়। তৎকালীন ভূমিবিক্রয়ের পরিসংখ্যান হতে এ তথ্য সহজেই অনুমেয়।

ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের পর হতেই ভূস্বামী, মহাজন ও কৃষকদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, যা এই বোর্ডের সঠিক কর্মতৎপরতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ফলে সরকারি প্রশাসন বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে একদিকে গ্রাম পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে

৩৮. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Shirin Mehta, *The Peasantry and Nationalism: A Study of the Bardoli Satyagraha*, (New Delhi 1984); D N. Dhanagare, *Peasant Movements in India, 1920-1950*, (Delhi 1983), 94-95, 105-106 and 199-25; Sunil Sen, *Peasant Movements in India: Mid-Nineteenth and Twentieth Centuries*, (Calcutta 1982), 42-52.

৩৯. Frank Owen Bell, Additional Papers Correspondence with Debt Settlement and Rural Credit India Office Library MSS. Eur. D 733, Sl No 26.

ঋণসালিশী বোর্ডকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করে, অন্যদিকে ভূস্বামী, মহাজন ও খাতকের সনাতন সম্পর্ককে অক্ষুণ্ন রেখে কৃষির উৎপাদন ও উন্নতি অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তৎপর হয়। কেননা কৃষির ক্ষেত্রে মহাজনের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ব্যতীত বাংলা সরকারের পক্ষে পৃথকভাবে অর্থ যোগানো সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় সরকারিভাবে বিভিন্ন প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। একদিকে ঋণসালিশী বোর্ডের বিশেষ কর্মচারীদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সভা আহ্বান করে বক্তৃতার মাধ্যমে ঋণসালিশী বোর্ডের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করে তোলার প্রয়াস ছিল উল্লেখযোগ্য। যাদুলণ্ঠনের সাহায্যে চিত্রপ্রদর্শন ছিল গণসচেতনতা কর্মসূচির একটি বাস্তব পদ্ধতি। এসব চিত্রে ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মকাণ্ড এবং মহাজন ও খাতকের সুসম্পর্কের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঋণসালিশী বোর্ডের বিশেষ অফিসার, পাটচাষ সীমাবদ্ধকরণের জন্য নিয়োজিত অফিসার ও স্বাস্থ্য অফিসার প্রমুখকে এই গণজাগরণমূলক কাজে নিয়োগ করা হয়। বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা *বাংলার কথার* প্রতিটি সংখ্যায় ঋণসালিশী বোর্ডের তৎপরতার তথ্য বিস্তৃতভাবে পরিবেশন করা হয়। ফরিদপুর জেলার 'ঝাসি' নামক ঋণসালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান *খাতক* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ঋণসালিশী বোর্ডের তথ্যাদি প্রচারের মাধ্যমে জনসমর্থন সংগ্রহ করা।[৪০] এ ছাড়া জনগণের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টির জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় এবং এর মধ্যে 'মাটির মায়া' চলচ্চিত্র উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন লাভ করে।[৪১]

অর্থনৈতিক মন্দার ফল হিসেবে রায়তিজমি মহাজন ও অকৃষিজীবীদের কাছে হস্তান্তরিত হয় এবং এর ফলে বর্গাচাষী ও ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এসময় প্রণীত সার্ভে ও সেটেলমেন্ট বিবরণীতে যে তথ্য পাওয়া যায় তা এবিষয়ে সাধারণ ধারণা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। কানুনগোদের বিবরণীতে অর্থনৈতিক মন্দার পর হতে লক্ষণীয়ভাবে ভূমিহস্তান্তরের উল্লেখ রয়েছে। নিবিড় পাটচাষের জেলাগুলোতে ভূমিহস্তান্তরের হারও অনেক বেশি ছিল এবং অর্থনৈতিক মন্দার সময় পাটের মূল্যই সবচেয়ে বেশি কমে যায়। যাইহোক, পরের পৃষ্ঠার সারণি ৫ হতে ১৯২৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে রায়তি ভূমি হস্তান্তরের পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে।

৪০. *Tour Diary* of Khan Sahib Md Raziuddin Ali, Deputy Director, D C , E.C, G O B , B-Prods , C.C R.I., R I Bundle-8, May 1942, Progs Nos 311-12

৪১. Following films were produced by the Publicity Department, Government of Bengal.
   ১. *করিমের কেরামতি*—প্রভাষ চাঁদ পাঠক, মহকুমা কর্মকর্তা, ঠাকুরগাঁও।
   ২. *ঋণমুক্তি*—কেদারনাথ চ্যাটার্জী, স্পেশাল অফিসার, জেলা কর্মকর্তা, পাবনা।
   ৩. *মাটির মায়া*— খান সাহিব এম. আর. আলী, উপ-পরিচালক, জেলা কর্মকর্তা, পাবনা।
   ৪. *ফাতেমার বাজুবন্ধ।*
   Assistant Secretary, C.C R I , to Collector of Dinajpur. 8 November 1941, G.O.B., B-Prods, C C R I , R.I, Bundle -10 July 1943, Progs Nos 196-97.

সারণি ৫ : রায়তি ভূমি হস্তান্তর, ১৯২৮-১৯৪০

জেলার নাম	জরিপকৃত অংশ	বিগত ১২ বছরে হস্তান্তরকৃত জমি		হস্তান্তরকৃত জমি চাষাবাদের প্রকৃতি			
		অংশ	%	স্বত্বহীন ক্রেতা কর্তৃক চাষ	বর্গাদার কর্তৃক চাষ	শ্রমিক দ্বারা চাষ	রায়ত দ্বারা চাষ
বাকেরগঞ্জ	১,৭৫২.৬৬	৯৯.৯৭	৫.৭	৫৬.০৯	৪৩.৮৮	-	-
বাঁকুড়া	৫,৪৭৯.৮৬	৩৬৮.০৫	৬.৭	৪৮.৪৭	৭৭.০৬	৩৬.৯৯	২০৫.৩৩
বীরভূম	৩,৩৭৫.৫৮	২২৬.৩৪	৬.৭	৪৬.৩২	৯২.৮২	৮৭.২০	-
বগুড়া	১,৯৮৪.৪৫	৫৯.২৩	৩	২৮.৩৭	১৮.৬০	০.৫০	১১.৭৬
বর্ধমান	৪,৭৫৯ ১৫	১৮৫.৮৩	৩.৮	৮২.৩২	৩৫.৩৬	৩৮.১৫	-
চট্টগ্রাম	১,৬৯৩.৪৫	১৬৪.৯০	৯.৭	৭৯.৯৭	২০.৫০	৫.৪২	৫৯.০১
ঢাকা	১,০৮২.২৭	৫৩.৪৬	৪.৯	২৩.৩১	২২.৮৬	৫.৯৯	১.৩০
দিনাজপুর	৬,৫১২.২২	২৫০.৮৪	৩.৮	১৪৭.৩১	৮৭.২৩	১৬.১৩	.১৭
ফরিদপুর	১,৭৯৬.৫৪	১২০.১৯	৬.৬	৯০.৭৯	২৪.৫৩	-	৪.৮৭
হুগলী	২,২২৮.০৯	৬০.৮৩	২.৭	২৯.৯৩	২৫.৭২	৫.১৮	-
হাওড়া	১,১৮৬.৩০	২৪.২৯	২.০২	৭.২৯	১৬.৮০	০.২০	-
জলপাইগুড়ি	৪,৬৪৫.০৬	৪৩৯.৯৬	৯.৪	৬৬.০৬	১৮৫.৫৯	১৪.৯৩	১৭৩.৩৮
যশোর	৫,১৩৩.৭৫	৪৩১.০৫	৮.৩	১০২.১৪	১৩৬.৩৫	১৩.৩২	১৭৯.২৪
খুলনা	১,৭০১.৬৮	৭২.৬৩	৪.২	৩১.৫৬	৪১.০৭	-	-
মালদহ	১,১০৭.৯৩	৭৭.০২	৬.৯	৪৮.৫১	১৭.৯৫	-	১০.৫৬
মেদিনীপুর	৪,৬৯৩.৬৪	৩৪৯.৬৪	৭.৪	১২০.০৩	১৭৫.৮১	৩৯.১৪	১৪.০৬
মুর্শিদাবাদ	৫,০৭০.৬২	৬৩৮.৭৪	১২.৫	১২৭.৯৫	১৫২.৬৫	১.০০	৩৫৭.১৪
ময়মনসিংহ	৩,৫৯৭.৫৫	২০১.৯৩	৫.৫	৮৮.৭৮	১০৫.৩৩	-	৭.৮২
নদীয়া	৪,০০৮.৫৭	৮৭৭.৫০	২১.৮	৫৭০.২৪	১৭২.০০	২৭.৬০	১০৭.৬৬
নোয়াখালী	১,২০৮.৪৩	৬৫.৭৪	৫.৫	৬৩.৪২	২.০৬	০.২৬	-
পাবনা	১,৬৭৩.২৮	৬৫.৭৬	৩.৮	৫১.২৩	১৪.৫৩	-	-
রাজশাহী	৫,৬১৭.৮৪	১৯৬.৭৮	৩.৫	৬৮.৬২	৩৭.৮৫	-	৯৯.৩১
রংপুর	৭,৯৬৪.৩০	৩৮০.৬০	৪.৭	৮০.৬০	১৪৪.৯২	১০.৭৩	১৪৪.৩৫
ত্রিপুরা	২,১১২.৯১	৯৯.৩৯	৪.২	৫৯.৬৫	১০.৪১	১৩.৬১	১৫.৭২
২৪-পরগনা	৫,০৮৩.৪২	৪১২.৬৮	৮.১	১৩৩.১৫	১৯০.৪১	২৫.০৫	৬৪.০৭
মোট	৮৫,৪৭০.০৪	৫,৯২৩,৩৫	৬.৯	২,২৫২.১১ অথবা হস্তান্তরিত ভূমির ৩৮%	১,৮৮২.২৯ অথবা হস্তান্তরিত ভূমির ৩১.৭%	৮৪১.৪০ অথবা হস্তান্তরিত ভূমির ভূমির ৫.৭%	১,৪৪৭.৫৫ অথবা হস্তান্তরিত ২৪.৬%

উৎস : *Report of the Land Revenue Commission*, Bengal, (Alipore Bengal Government Press 1940), Vol II, 120-21

উক্ত সারণিতে লক্ষ্য করা যায় যে, জরিপকৃত ভূমির ৭% হস্তান্তরিত হয়েছে ১৯২৮-১৯৪০ সালের মধ্যে। এর মধ্যে ৩৮% ক্রেতা নিজেরাই চাষ করে এবং ৩১.৭% বর্গাচাষ, ৫.৭% শ্রমিক দ্বারা এবং ২৪.৬% স্বত্বহীন রায়ত দ্বারা চাষ করা হয়। অন্যদিকে হস্তান্তরিত ভূমির ৫৩.৩% অকৃষিজীবীদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। ভূমিহস্তান্তরের এই প্রবণতা রোধে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হলেও কিছু বাস্তব বাধা ছিল। প্রথমত, ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন দখলি রায়তকে ভূমিঅধিকারের ক্ষমতা প্রদান করে এবং এই আইন পাশ ছিল প্রলম্বিত আন্দোলনের ফল। এ ছাড়া ভূমিহস্তান্তরের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলে ভূমির মূল্য হ্রাস পেতো, যা ঋণ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়।[৪২] শেষ পর্যন্ত ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় কৃষিজমি হস্তান্তর অর্ডিন্যান্স পাশের মাধ্যমে অকৃষি-জীবীদের কাছে ভূমিহস্তান্তর রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

একদিকে অর্থনৈতিক মন্দা এবং অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই সময় বাংলা পতিত হয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে, যা মনুষ্যসৃষ্ট বলে গণ্য হয়। এসময় ঋণসালিশী বোর্ডের কার্যক্রম যথেষ্ট পরিমাণে বিঘ্নিত হয়, কেননা চাষী-খাতকের পক্ষে কোন নগদ অর্থ বা কিস্তি প্রদান অসম্ভব হয়ে পড়ে। একই সাথে ঋণসংকোচনও উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্য করা যায়। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে বড় চাষীকে সাহায্য করেছে, কেননা ক্ষুদ্র চাষী গুণগতভাবেই বাজারজাত করার জন্য কম উৎপাদন করতে পারে। দুর্ভিক্ষের হাত হতে বাঁচার জন্য শেষ সম্বল হিসেবে মানুষ অতি কম মূল্যে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়।[৪৩] নিচের সারণি হতে বিষয়টি সহজেই অনুধাবন করা যাবে।

সারণি ৬ হতে দুর্ভিক্ষকালীন ভূমিহস্তান্তরের ধারণা পাওয়া যায়। যদিও ব্যক্তিপর্যায়ে ভূমি অধিকার ও হস্তান্তরের কোন তথ্য নেই এবং এসম্পর্কিত কোন তথ্য পাবার সম্ভাবনাও নেই, সেজন্য ভূমিহস্তান্তর সম্পর্কিত পরিসাংখ্যিক তথ্য সতর্কতার সাথে ব্যবহারের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তবে উপরোক্ত সারণি থেকে ১৯৩১ হতে ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সালের ভূমিহস্তান্তরের পরিসাংখ্যিক তথ্য নিঃসন্দেহে ব্যাপকতার দিক হতে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী ৬৫ লক্ষ পরিবারের মধ্যে দুর্ভিক্ষের সময় ২.৬ লক্ষ পরিবার তাদের সমুদয় ভূমি হারায় এবং ৯.২ লক্ষ পরিবার

৪২. *Memorandum of the Revenue Department*, 6 June 1940, (Alipore 1940), 4

৪৩. Collector of Tippera to Secretary, C C.R.I, 22 June 1942, G.O B., B-Prods., C C.R.I., C.S., Bundle -10, July 1942, Progs No 464.

তাদের আংশিক ভূমি হারায়।[৪৪] এর ফলে ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় কৃষিজমি হস্তান্তর অর্ডিন্যান্স পাশের মাধ্যমে নীতি প্রণয়ন করা হয় যে, ১৯৪৩ সালে সর্বোচ্চ ২৫০ টাকা মূল্যের ভূমিহস্তান্তরকারী এই অর্ডিন্যান্স পাশের ২ বছরের মধ্যে সুদসহ ক্রয়মূল্য প্রদান করে হস্তান্তরিত ভূমি ফেরত পাবে; ভূমি হস্তান্তরকারী নগদ অর্থের মাধ্যমে ভূমি প্রত্যর্পণ নিশ্চিত না করতে পারলেও ১০ বছর পর এই ভূমির জন্য কোন প্রকার অর্থ প্রদান ছাড়াই ভূমির মালিকানা ফিরে পাবে।[৪৫]

সারণি ৬ : বাংলার ভূমি হস্তান্তর, ১৯৩১-১৯৪৩

বছর	রেজিস্ট্রীকৃত দলিলের সংখ্যা (১,০০,০০০)			প্রতি দলিলে গড় মূল্য (টাকায়)		
	বিক্রয়	ইজারা	বন্ধক	বিক্রয়	ইজারা	বন্ধক
১৯৩১	২.২১	১.৭২	৩.৭৬	২৫০	৬২.৯	১৭৩
১৯৩২	২.৪১	১.৭৫	৩.৩৮	২১৭	৩৬.৫	১৬২
১৯৩৩	২.৫৫	১.৭৮	৩.১৩	২০৮	৩২.০	১৫৮
১৯৩৪	৩.০১	২.১৪	৩.৪৯	১৮৩	৩২.০	১২৯
১৯৩৫	৩.২৪	২.৪৬	৩.৫৭	১৮১	৫৪.৭	১৪১
১৯৩৬	৩.৪১	২.৭১	৩.৫২	১৭৯	৩৮.৩	১৩৭
১৯৩৭	৩.৩৪	২.৯৯	৩.০২	১৮২	৩৩.৪	১৩৩
১৯৩৮	৪.১২	২.৯৬	১.৬৪	১৭৮	৩৯.৭	১৭৫
১৯৩৯	৬.৫৪	৩.০৬	১.৫৪	১৬৩	৩৫.০	১৪০
১৯৪০	৬.৪৬	৩.৩০	১.৬০	১৮৫	৩৮.৪	১২৫
১৯৪১	৭.৯৪	৩.৪৯	১.৫১	১৫৮	৪২.৩	১২০
১৯৪২	৯.১৬	৩.৪৫	১.০৬	১৭২	৪৭.৬	১১০
১৯৪৩	১৬.৯৮	৫.৬৮	১.৮৩	১৮৭	৫১.৪	১০৬

উৎস : Karunamoy Mukherji. *The Problems of Land Transfer: A Study of the Problems of Land Alienation in Bengal*, (Calcutta Visva-Bharati 1957), 117

৪৪. Binay Bhusan, "The Process of Depeasantization in Bengal and Bihar, 1885-1947", *Indian Historical Review*, II· 1 (1975), 139

৪৫. Assistant Secretary,C.C.R.I., to Officer-in-Charge, Reserve Bank of India, Bombay, 4 December 1944 G O B., B-Progs., C.C.R I., R.I, Bundle-11, November 1944, Progs. Nos 456-57.

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতে প্রদেশব্যাপী যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠন কমিটি গঠিত হয়। বাংলার যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠন কমিটি ঋণিতার বিষয়ে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করে। এই কমিটি ঋণিতার বিষয়টিকে প্রতিষেধক ও আরোগ্যকর এই দু'ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে। প্রতিষেধক হিসেবে সমবায় আন্দোলন ও আরোগ্যকর হিসেবে ১৯৪০ সালে প্রবর্তিত বঙ্গীয় মহাজনি আইন প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন প্রচলিত ছিল বিধায় বঙ্গীয় মহাজনি আইনের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবহার অদ্যাবধি হয় নি। সুতরাং আশা প্রকাশ করা হয় যে, ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মতৎপরতা বন্ধ হলে জনসাধারণ বঙ্গীয় মহাজনি আইনের আশ্রয় নিয়ে নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করবে। অবশ্য এসময় খাতকদের জন্য কিছু করণীয় রয়েছে বলে মনে করা হয়; বিশেষত ঋণের সরবরাহ সম্পর্কে আশাব্যঞ্জক কোন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা হয়। এপর্যায়ে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদানের পক্ষে মতামত লক্ষ্য করা গেলেও তা কার্যকরী করা হয় নি। বাংলার চাষী-খাতকের ভবিষ্যৎ ঋণের বিষয়টি অর্থবিভাগ গ্রহণ করে। এই বিভাগ ঋণসমস্যা সমাধানে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জমিবন্ধকি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় চাষী-খাতকের দুর্দশার সময় কৃষিঋণ প্রদানের বিষয়টি প্রাধান্য পায় এবং সরকারকে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালনের সুপারিশ করা হয়। অন্যদিকে এ বিষয়ে ভূমিরাজস্ব কমিশনের সুপারিশ ছিল সমবায় আন্দোলন জোরদার করার। উল্লেখ্য, বাংলার মহাজনদের ঋণব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি কোনভাবেই আর গুরুত্ব লাভ করে নি। কেবলমাত্র তৎকালীন ঋণ ও সমবায় বিভাগের সচিব ই. ডব্লিউ. হল্যান্ড মহাজনি পুঁজিকে সরকারের অধিকতর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যবহারের পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে হল্যান্ডের উত্থাপিত বিষয়টি ছিল অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা; কিন্তু সঙ্গতকারণেই তা সফল হয় নি।[৪৬] কেননা ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মতৎপরতায় ভীত মহাজনশ্রেণী গ্রামীণ বাজার থেকে তাদের পুঁজি প্রত্যাহার করে নেয়। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত এসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে ঋণনীতি এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একদিকে ঋণ সম্পর্কে গণচেতনা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে কৃষকের আয়বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। কৃষকের আয়বৃদ্ধির জন্য অর্থকরী ফসল নির্বাচন, চাষাবাদ নিয়ন্ত্রণ, উন্নততর কৃষিযন্ত্রপাতি ও সারের ব্যবহার, বাজারব্যবস্থা ও গুদামজাত করার সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ের

৪৬. G.O.B., B-Prods., C.C.R.I., C.S., Bundle-11, December 1942, Progs. Nos. 217.

উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[৪৭] কিন্তু রাউল্যান্ড কমিটির বিবরণীতে মহাজনশ্রেণীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং কোন কোন স্থানে মহাজনদেরকেও আগের মতো খাতকের ঋণের বিষয়ে উৎসাহী হতে দেখা যায়।[৪৮]

১৯৩৬ সালে ঋণসালিশী বোর্ড পাঁচ বছরের জন্য গঠন করা হয় এবং ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের কার্যকাল আরো দুই বছর বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দার জন্য প্রলম্বিত অর্থনৈতিক দুর্দশা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং সর্বোপরি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বাংলার চাষী-খাতককে অধিকাংশ ভূমি বন্ধক বা হস্তান্তর করতে বাধ্য করে। ফলে ঋণসালিশী বোর্ডের কার্যকাল আরো দুই বছর বৃদ্ধি করা হয় এবং ১৯৪০ সালের আগে সম্পাদিত ঋণচুক্তি এই আইনের অধীনে আনা হয়। সবশেষে ১৯৪৪-৪৫ সালে বঙ্গীয় প্রশাসনিক তদন্ত কমিটি বা রাউল্যান্ড কমিটির সুপারিশক্রমে ঋণসালিশী বোর্ডের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। এসময়ে কর্মরত ঋণসালিশী বোর্ডের বিশেষ অফিসারদের দ্রুত ঋণমোকদ্দমার বিষয় নিষ্পত্তি করে বোর্ডের কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং একই সময়ে কলকাতা পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটকে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের কার্যক্রমের ফলাফল অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেয়া হয়।[৪৯] উল্লেখ্য, ভবিষ্যৎ ঋণের বিষয়টি এই কমিটির তদন্তের ফলাফলের উপর নির্ভর করে গৃহীত হবে বলে আশা পোষণ করা হয়।

১৯৩৬ সাল হতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বাংলার ১৬টি জেলায় ঋণসালিশী বোর্ডের অব্যাহত কর্মতৎপরতা ছিল এবং ১৯৪৫ সালে রাউল্যান্ড কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ঋণসালিশী বোর্ড বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বাংলার ঋণসালিশী বোর্ডে ৩৩,৯৪,৬১৪টি ঋণনিষ্পত্তির আবেদন জমা পড়ে, যার ৫৫.২% খাতক এবং ৪৪.৮% মহাজন কর্তৃক জমা দেয়া হয়। এই সব আবেদনপত্রের মধ্যে ২৮,৮৩,৬০৮টি আবেদনপত্র খারিজ ও স্থানান্তর করা হয়। ঋণসালিশী বোর্ডের কাছে পেশকৃত আবেদনপত্রে মোট ৭৮,৪০,২৬,৪৫৬ টাকার ঋণনিষ্পত্তির দাবি উত্থাপিত হয় এবং ঋণসালিশী বোর্ড কর্তৃক মোট ৩২,১৭,১৯,১৩২ টাকা ঋণ দাবিযোগ্য বলে স্বীকৃত হয় এবং ১৮,৬৫,৬৪,১৭৩ টাকার ঋণের অনুকূলে রোয়েদাদ প্রদান করা হয়। লক্ষ্য করা যায় যে, নিষ্পত্তির জন্য দাবিকৃত মোট অর্থের ৫৮.৯% দাবিযোগ্য ঋণ হিসেবে গৃহীত হয় এবং দাবিযোগ্য ঋণের

৪৭. G.O.B., B-Prods, C.C.R.I., C.X Bundle-8, June 1942, Progs. Nos. 673-74

৪৮. Government of Bengal, *Report of the Bengal Administration Enquiry Committee*, 1944-45, (*Rowlands Committee Report*, NIPA reprint series), (Alipore 1945), 74.

৪৯. G.O.B., B-Prods., Agriculture, Co-operative Credit and Rural Indebtedness Department Credit Branch, Bundle-1, October 1951, Progs. No. 23

৭৬.২%-এর অনুকূলে রোয়েদাদ প্রদান করা হয়।[৫০] ঋণসালিশী বোর্ড খুব সচেতনভাবে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের দেউলিয়া ঘোষণার শর্ত ব্যবহার করে নি। এখন প্রশ্ন উঠে বাংলার মোট ঋণ কত ছিল ? ১৯২৮ সালে গঠিত বাংলার প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি বাংলার মোট গ্রামীণ ঋণ ১০০ কোটি টাকা বলে উল্লেখ করে।[৫১] এই মোট ঋণের হিসাবের মধ্যে আসল ও সুদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বাংলার অর্থনৈতিক তদন্ত কমিটি আসল হতে সুদ বাদ দিয়ে মোট ঋণ ধার্য করে।[৫২] বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন পাশ হওয়ার সময় সরকারপক্ষ হতে ধারণা করা হয়েছিল যে, মোট ঋণের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ঋণসালিশী বোর্ডে পেশকৃত আবেদনপত্রে দেখা যায় যে, মোট দাবিকৃত ঋণের পরিমাণ ৭৯ কোটি টাকা। ১৯৪০-এর দশকে দাবিকৃত ঋণ সম্পর্কে পরিচালিত কয়েকটি জরিপে এই ঋণের পরিমাণ অনেক বেশি দেখা যায়।[৫৩] অবশ্য এসব জরিপে কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবী উভয়েরই ঋণ অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কোন কোন জরিপ দুর্ভিক্ষপরবর্তী পরিস্থিতিতে পরিচালিত হয়েছিল বলে এখানে অতিরিক্ত ঋণিতার আভাস পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য একই সাথে মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টিকে মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

ঋণসালিশী বোর্ডের কা্যক্রম সম্পর্কে পরিসংখ্যানগত তথ্য অপ্রতুল। সমগ্র বাংলা সম্পর্কে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পরিসংখ্যানগত তথ্য পাওয়া গেলেও জেলাওয়ারি তথ্য ১৯৪২ সালের পর আর পাওয়া যায় না। ফলে ঋণসালিশী বোর্ডের কার্যক্রমের জেলাওয়ারি পরিসংখ্যানগত আলোচনার ক্ষেত্রে সময়সীমা অনিবার্যভাবে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সীমিত রাখতে আমরা বাধ্য। যাইহোক, ঋণশালিসী বোর্ডে পেশকৃত আবেদনপত্রে দাবিকৃত ঋণের পরিমাণ, স্থিরীকৃত ঋণের পরিমাণ ও রোয়েদাদপ্রদত্ত ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে বাংলার জেলাওয়ারি বিবরণ নিম্নরূপ :

৫০. *G.O B., B-Progs , C.C.R I., R.I.*, Bundle - 12, June, 1945, Progs No 173-75 ঋণসালিশী বোর্ড সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন শ্যামাপ্রসাদ দত্ত, "ঋণ শালিসী বোর্ড (১৯৩৬-৪৭)ঃ একটি সমীক্ষা", *ইতিহাস অনুসন্ধান*, ৪র্থ খণ্ড, ৪১৩-২৭।

৫১. *Bengal Provincial Banking Enquiry Committee Report, 1929-1930,* Calcutta 1930, Vol 1, 65.

৫২. *Preliminary Report of the Board of Economic Enquiry on Rural Indebtedness,* 1935, Supplement to the *Calcutta Gazette*, January - June, 1935, 108.

৫৩. H.S.M. Ishaque, *Agricultural Statistics by Plot to Plot Enumeration in Bengal,* 1944-45, (Alipore 1946), 55

সারণি ৭ : বাংলার ঋণসালিশী বোর্ডের কাছে আবেদনকৃত ঋণের দাবিকৃত, স্থিরীকৃত ও প্রদত্ত রোয়েদাদের বিবরণী

(১৯৪২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত)

জেলা	দাবিকৃত ঋণের অর্থের পরিমাণ (১০ লক্ষ)	স্থিরীকৃত ঋণের অর্থের পরিমাণ (হাজারে)	দাবিকৃত ঋণের % স্থিরীকৃত	প্রদত্ত রোয়েদাদ -এর পরিমাণ	দাবিকৃত ঋণের % রোয়েদাদ	স্থিরীকৃত ঋণের % রোয়েদাদ
বাকেরগঞ্জ	২১.১	১১৪.৮	৫৪.৩	৭৯.৯	৩৭.৪	৬৯.৬
বগুড়া	২১.৬	১৩৫.৮	৬২.৯	৫৮.০	২৬.৯	৪২.৮
চট্টগ্রাম	১৩.০	৫১.৪	৩৯.৫	৩৬.০	২৭.৭	৭০.০
ঢাকা	১৫.৩	৯৭.৪	৬৩.৭	৫৭.৪	৩৭.৮	৫৯.৩
ফরিদপুর	১৫.২	৬৪.৬	৪২.৫	৫৫.২	৩৬.৩	৮৫.৪
খুলনা	৮.৬	৪৫.৯	৫২.৯	৩৫.০	৪০.৪	৭৬.৩
ময়মনসিংহ	১০১.৬	৮৪৮.০	৮৩.৮	১৮২.২	১৭.৯	২১.৫
নোয়াখালী	১৫.৪	৯৫.০	৬১.৩	৫৪.৬	৩৫.৩	৫৭.৫
পাবনা	১৩.২	৮৯.৪	৬৭.৬	৬২.২	৪৭.০	৬৯.৫
রাজশাহী	১০.৯	৬০.৫	৫৫.৫	৪৬.৪	৪২.৬	৭৬.৭
ত্রিপুরা	২৮.৯	১৪৭.৬	৫১.০	৭৬.৩	২৬.৩	৫১.৬
বাকুঁড়া	৫.৪	৩৬.৫	৬৬.৫	৩০.৫	৫৫.৭	৮৩.৬
বীরভূম	৩.০	৩৭.৩	৭৩.৫	২৭.৭	৫৪.৬	৭৪.৪
বর্ধমান	৬.৩	৫০.৪	৭৯.০	৩৭.৯	৫৯.৪	৭৫.২
হুগলী	৩.৭	২৮.৩	৭৫.১	২৩.২	৬১.৭	৮২.১
হাওড়া	২.৫	১৮.৯	৭৫.৪	১৪.৪	৫৭.৮	৭৬.৬
যশোর	১৪.৫	১০২.২	৭০.৩	৪৬.৫	৩২.০	৪৫.৫
মালদহ	৫.৬	৪০.৭	৮০.২	২৭.৭	৫৪.৭	৬৮.২
মুর্শিদাবাদ	৬.৩	৪০.৩	৬৩.১	৩৫.০	৫৪.৮	৮৬.৮
মেদিনীপুর	১৫.৮	৭৯.৪	৫০.০	৬০.১	৩৭.৯	৭৫.৬
নদীয়া	২.৪	১৮.৮	৭৮.০	১৪.৮	৬১.৪	৭৮.৭
২৪-পরগনা	৬.৯	৫০.৬	৭৩.২	৩৯.৬	৫৭.৪	৭৮.৪
দিনাজপুর	১৫.৪	১০৬.১	৬৮.৭	৭১.৫	৪৬.৩	৬৭.৩
জলপাইগুড়ি	৩.৭	৩২.০	৮৫.৫	২৩.৯	৬৩.৯	৭৪.৭
রংপুর	১২.১	৮৮.০	৭২.৬	৬৮.১	৫৬.২	৭৭.৪
মোট	৩৭০.২	২৪৮০.৬	৬৬.৮	১২৬৫.৪	৩৩.৯৬	৫০.৮৫

উৎস : G.O.B., B-Progs., C.C.R.I., R.I., Bundle-10, June 1943, Progs. No. 334-409.

একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঋণনিষ্পত্তির জন্য ঋণসালিশী বোর্ড দু'টি পর্যায়ে দাবিকৃত ঋণ হ্রাস করে খাতকের পরিশোধক্ষমতার সীমায় আনয়ন করে। এ দু'টি ধাপ হলো দাবিকৃত ঋণের পর ঋণ স্থিরকরণ এবং রোয়েদাদ প্রদান। উভয় ক্ষেত্রেই ঋণসালিশী বোর্ড ঋণের পরিমাণকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করে। যাইহোক, উপরোক্ত সারণি হতে লক্ষ্য করা যায় যে, ঋণসালিশী বোর্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাবিকৃত ঋণের মোট ৫১% হতে ৮০% ঋণ হিসেবে ধার্য করে এবং চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, ঢাকা, মালদহ ও জলপাইগুড়ি ব্যতীত অন্যান্য সকল জেলার ক্ষেত্রে এই তথ্য প্রযোজ্য হয়। জেলাভিত্তিক দাবিকৃত ঋণ ধার্যকরণ ও এ বাবদ রোয়েদাদ প্রদানের পরিসংখ্যান আমাদের একটি সাধারণ ধারণা প্রদান করে যে, নিবিড় পাটচাষের সাথে ঋণিতার একটি সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ পাটচাষ যেসব অঞ্চলে বেশি, ঋণিতাও সেখানে বেশি। আর অর্থনৈতিক মন্দা পাটের মূল্যকে বেশি প্রভাবিত করেছে বলেই ঋণিতার বিষয়টি এ সময় সর্বাপেক্ষা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।[৫৪] অন্যদিকে নিবিড় পাটচাষের অঞ্চলসমূহে ঋণসালিশী বোর্ডের কার্যকারিতাও ছিল অনেক বেশি। ঋণসালিশী বোর্ডের কাছে পেশকৃত খাতক ও মহাজনের আবেদনপত্রের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৩৬ সাল হতে ১৯৪১ সালের মধ্যে মহাজনরাই ঋণনিষ্পত্তি করার জন্য ৪৫% আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। বিপুল পরিমাণ আবেদনপত্র মহাজন কর্তৃক জমা দেবার একটি বিশেষ কারণ হলো, রাজস্বকে ঋণ হিসেবে বিবেচনা করার ফলশ্রুতিতে রাজস্বদাবি হিসেবে বহুসংখ্যক ভূস্বামী মহাজন দেওয়ানি মোকদ্দমার আশ্রয়গ্রহণ না করে ঋণসালিশী বোর্ডে আবেদনপত্র জমা দেয়।[৫৫] অন্যদিকে মহাজনরাও ঋণনিষ্পত্তিতে রাজি ছিলেন, কেননা ঋণনিষ্পত্তি ছিল মহাজনের স্বার্থের অনুকূলে—দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ঋণের সুদ হিসেবে আদায়কৃত অর্থ আসলের চেয়ে অনেক বেশি ছিল এবং ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মতৎপরতা ছিল তাদের জন্য লাভজনক। এজন্যই অধিকাংশ মহাজন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ঋণনিষ্পত্তির জন্য আবেদন করে।

ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মতৎপরতার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ঋণসালিশী বোর্ডের কার্যকারিতা সম্পর্কে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার খুবই আশাবাদী ছিলেন। খাতকদের দীর্ঘদিনের ঋণ থেকে মুক্তিদান আপাতত সম্ভব হলেও এই বোর্ডের কর্মতৎপরতা কোন দীর্ঘমেয়াদি সুফল বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়। এই আইনে মহাজন ও ভূস্বামীরাই তুলনামূলকভাবে বেশি লাভবান হয়েছে—একটি প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের সাহায্যে তাদের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের কিয়দংশ আদায় করা সম্ভব হয়েছে। বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন বাংলার কৃষকদের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য প্রণীত হলেও এই আইনের ব্যবহার

৫৪. Deputy Director, D C Presidency Division to Joint Secretary, C.C.R I., G.O.B, B-Prods., C.C.R.I., R I., Bundle - October 1941, Progs. Nos 62-63.

৫৫. District officer of Pabna to Joint Secretary, C.C.R.I., 12 November 1940, G.O.B., B-Prods., C.C.R.I, R.I, Bundle-6, January 1941, Progs. No. 244.

ঋণসঙ্কোচনের জন্য কতকাংশে দায়ী ছিল। কেননা মহাজনরা ক্রমশ গ্রাম হতে তাদের পুঁজি প্রত্যাহার করে মূলত পুঁজির নিরাপত্তার কারণেই। উল্লেখ্য, ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের মাধ্যমে মহাজন ও খাতকের মধ্যে ঋণনিষ্পত্তি করা হলেও খাতকের ভবিষ্যৎ ঋণের বিষয়টিকে কোনভাবেই গুরুত্ব দেয়া হয় নি। অন্যদিকে মহাজনের পুঁজির নিরাপত্তার অভাব হওয়ায় মহাজনও খাতককে ঋণপ্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ফলে খাতকের ভূমিবিক্রয় ব্যতীত অর্থসংগ্রহের অন্য কোন উপায় ছিল না। ১৯২৮ ও ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন দখলি কৃষকের ভূমিহস্তান্তরের সুযোগসহ বিভিন্ন সুবিধার সৃষ্টি করে। ফলে একদিকে কৃষক ভূমির অধিকার পেলেও ভূমিহস্তান্তরের ক্ষমতা তাকে নিঃস্ব করার প্রক্রিয়ার সূচনা করে। ফলে পূর্ববর্তী সময়ের জমিবন্ধকির প্রক্রিয়া ক্রমশ বন্ধ হয়ে যায় এবং ভূমিবিক্রয়ের চাপ সৃষ্টি হয়। নিচের সারণি হতে ভূমিবন্ধক ও ভূমিবিক্রয়ের তুলনামূলক তথ্য পাওয়া যাবে।[৫৬]

সারণি : ৮ বাংলার ভূমিবিক্রয় ও বন্ধক, ১৯৩০-১৯৪২

বছর	বিক্রয়ের সংখ্যা (দলিল)	বন্ধকের সংখ্যা (দলিল)
১৯৩০	১,২৯,১৮৪	৫,১০,৯৭৪
১৯৩১	১,০৫,৭০১	৩,৭৬,৪২২
১৯৩২	১,১৪,৬১৯	৩,৩৮,৯৪৫
১৯৩৩	১,২০,৪৯২	৩,১৩,৪৩১
১৯৩৪	১,৪৭,৬১৯	৩,৪৯,৪০০
১৯৩৫	১,৬০,৩৪১	৩,৫৭,২৯৭
১৯৩৬	১,৭২,৯৫৬	৩,৫২,৪৬৯
১৯৩৭	১,৬৪,৮১৯	৩,০২,৫২৯
১৯৩৮	২,৬৪,৫৮৩	১,৬৪,৮৯৫
১৯৩৯	৫,০০,২২৪	১,৫৪,৭৮০
১৯৪০	৫,০২,৩৫৭	১,৬০,১৫২
১৯৪১	৬,৩৪,১১৩	১,৫১,৫৫৩
১৯৪২	৭,৪৯,৪৯৫	১,০৬,০৮৮

উৎস : *Report on the Administration of the Registration Department for the Years 1930-1940*

৫৬. Sugata Bose, *Agrarian Bengal: Economy, Social Structure and Politics, 1919-1947*, (Cambridge 1986), 146-49.

উপরোক্ত সারণিতে লক্ষ্য করা যায় যে, বঙ্গীয় কৃষিখাতক আইন ও বঙ্গীয় মহাজনি আইনের প্রভাবে ভূমিবন্ধক হ্রাস পায় এবং ভূমিবিক্রয় লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৩৯ সাল হতে ১৯৪৪ সালের মধ্যে ভূমিহস্তান্তরে গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়।[৫৭] ভূমিহস্তান্তরের ফলাফল গ্রামীণ সমাজে ছিল ভয়াবহ। বহুসংখ্যক কৃষক বর্গাদার বা ক্ষেতমজুরে পরিণত হয় এবং ধনী কৃষক বিত্তশালীতে পরিণত হয়। সমবায় আন্দোলন শক্তিশালী না হওয়ার কারণে ভূমিহস্তান্তর রোধ করে কৃষককে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল রাখার কোন উপায়ও ছিল না। মহাজনদের পুঁজিপ্রত্যাহার ও সুনির্দিষ্ট ঋণনীতির অভাবে কৃষক সম্প্রদায় ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। কেননা কৃষকদের ব্যক্তিগত জীবনেও কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য ঋণ ছিল অপরিহার্য। বাংলার চাষী-খাতকদের ঋণিতা দূরীকরণের জন্য ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের মাধ্যমে চাষী-খাতককে সাময়িক সাহায্য প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু এই নীতি ও ব্যবস্থা চাষী-খাতকের ঋণসমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে পারে নি। অধিকন্তু এ সময় বিভিন্ন ব্যবস্থাগ্রহণ ও আইনপ্রণয়ন শেষ পর্যন্ত কৃষকের জীবনে দুর্দশার সৃষ্টি করে এবং গ্রামীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নতুন পরিবর্তনের সূচনা করে। ধনী কৃষক আরও বিত্তশালীতে উন্নীত হয় এবং মাঝারি কৃষক ভাগচাষী ও দিনমজুরে পরিণত হয়।

পরিশিষ্ট

বিজ্ঞপ্তিপত্র

বাঙলা দেশের অনেক স্থান এমন রহিয়াছে যেখানে এ বৎসর বন্যায় কোন ক্ষতি করে নাই কিম্বা অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হয় নাই। সেই সকল অঞ্চলে বেশ ভাল ফসল জন্মিয়াছে এবং শস্যের দামও অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশী। কিন্তু আমি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, ঐ সকল জায়গায়ও কৃষকগণ সরকার, জমিদার ও তালুকদারগণের ন্যায্য পাওনা খাজনা আদায় দিতেছেন না। ইতিপূর্ব্বে কোন কোন বছর কৃষকগণ বন্যায় খুব কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও সরকার, জমিদার ও তালুকদারগণের প্রাপ্য খাজনা শোধ করিতে কিছুমাত্র আপত্তি বা ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু আজ অন্যরূপ হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে? অনেকে মনে করেন যে, সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইন ও ঋণ-সালিসী আইনের জন্যই এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। এই সব আইনের ফলে প্রজাগণ যে সুখ-সুবিধা পাইয়াছেন তাহাতে তাঁহারা নিজেদের দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন। বাকী খাজনার সুদের হার ১২।।০ সাড়ে বার টাকার স্থলে কমাইয়া ৬। সোয়া ছয় টাকা করায় রায়তগণ ঠিক সময়ে তাঁহাদের দেয় খাজনা জমা দিতেছেন না। চৈত্র মাসের শেষ কিস্তিতে নূতন আইনে বিধিবদ্ধ অল্প সুদে খাজনা শোধ করিবেন বলিয়া কৃষকগণ অনেক স্থানে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। ইহা সত্যই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

বাঙলা দেশের বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী প্রজা-সাধারণের উপকার করার জন্য সকল সময়েই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। মন্ত্রিমণ্ডলী কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পরই সকলের আগে প্রজাদের স্বার্থ ও অধিকার বজায় রাখিবার ও বৃদ্ধি করিবার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। ভারতবর্ষে অন্য

৫৭. Binay Bhusan Chaudhuri, "The Process of Depeasantization in Bengal and Bihar, 1885-1947", *Indian Historical Review*, II· 1 (1975), 145

সকল প্রদেশের পূর্ব্বে বাঙলা দেশেই সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইন অনেক বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া আইন সভায় পাশ করিয়া তাহা প্রচলন করা হইয়াছে। এখন এই সুবিধা পাইয়া রায়তগণ যদি মনে করেন যে, খাজনা দিতে হইবে না, বা যখন ইচ্ছা তখন দিলেই হইবে, অথবা না দিলেও চিন্তার কারণ নাই, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ ভুল ও অন্যায় হইবে। সরকার প্রজা-সাধারণের হিতের জন্য তাঁহাদিগের নিকট হইতে সকল রকম সাহায্য ও সহযোগ কামনা করেন। জমিদারগণ যদি ঠিক সময় রায়তগণের নিকট হইতে খাজনা না পান, তাহা হইলে তাঁহারা সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় দিবেন কি করিয়া? যথাসময়ে রাজস্ব আদায় না হইলে সরকারের শাসন ব্যাপারে কি উপস্থিত হইবে? তাহার ফলে জনসাধারণের হিতজনক কার্য্যে আরও অগ্রসর হওয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। বাঙলা দেশে এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়া কেহই কামনা করেন না।

যদি সত্যই এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হয় তাহা হইলে সরকারকে বাধ্য হইয়া উহার প্রতিকারের জন্য নূতন আইন তৈরী করিতে হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী মনে করেন, এখন হইতেই রায়তগণ নিজেদের স্বার্থের কথা বুঝিয়া ন্যায় ও আইনসঙ্গতভাবে কাজ করিবেন যেন মন্ত্রিমণ্ডলীকেও বাধ্য হইয়া কোনরূপ অপ্রীতিকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না হয়।

সালিসী আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? যাহাতে বাঙলা দেশের দরিদ্র ও ঋণজর্জ্জরিত কৃষকগণ তাঁহাদের ঋণভার হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন এবং প্রকৃত ঋণ ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিবার সুযোগ পান সেই উদ্দেশ্যেই এই আইন তৈরী করা হইয়াছে। কিন্তু এই আইনের সুবিধা পাইয়া যদি কেহ জমিদার খাজনা অথবা মহাজনকে দেয় ঋণ ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে তবে তাহা অত্যন্ত ... ও ক্ষতিকর হইবে। আমি আশা করি যে, কৃষকগণ এই আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়া সেই অনুসারে কাজ করিবেন। যে সকল লোক খাজনা ও ঋণ শোধ করিতে নিষেধ করে, রায়তগণ যেন ঐসব আন্দোলনবাজ লোকের কথা না শোনে। নিজ নিজ দেয় খাজনা ও ঋণ যথাসাধ্য সময়মত পরিশোধ করিয়া বাঙলা দেশের কৃষকগণ সুখ-শান্তি ভোগ করুন এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্যে অবহেলা না দেখান ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। সকলেই যেন মনে রাখেন যে, পল্লী অঞ্চলের যাবতীয় মঙ্গল, বিশেষভাবে চাষী ভাইদের অবস্থার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, বাঙলার জনসাধারণের রায়তগণের উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে।

এ. কে. ফজলুল হক

বাঙলা দেশের প্রধান-মন্ত্রী।

সাতচল্লিশ-উত্তর সময়ে শিল্প এবং শিল্পসম্পর্ক

মমতাজ উদ্দিন আহমেদ*

১. ভূমিকা

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পাকিস্তানের কৃষিজমি ছাড়া পরিচিত কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় ছিল না, ছিল না কোনো আধুনিক শিল্প, ব্যাংকিং কিংবা বাণিজ্যিক সংস্থা। নগণ্য পরিমাণ প্রাথমিক স‑াদ নিয়ে পাকিস্তান যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, তা খুবই কঠিন প্রমাণিত হয় দেশের দু'অংশ এক হাজার মাইল (কিংবা সমুদ্রপথে তিন হাজার মাইল) ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বারা ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে পৃথক সম্পদভিত্তি এবং পৃথক আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে উক্ত দু'টি অংশ পাকিস্তানকে নানাবিধ তীব্র আঞ্চলিক উন্নয়নসমস্যার সম্মুখীন করে।

যদিও তৎকালীন পাকিস্তানের দু'টি অঞ্চলের মধ্যে সম্পদ বরাদ্দের অসমতা এবং আরো অনেক জটিল কারণে[১] এই দু'টি অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অসম হয়েছিল, বাংলাদেশের পক্ষে এই প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার প্রশ্নটি থেকে যায় সবচেয়ে দুঃসাধ্য। যদিও পাকিস্তানের শিল্পায়নসাফল্য, বিশেষত ষাটের দশকে তার শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধির চোখে পড়ার মতো উচু হার (লিউইস, এস. আর. ১৯৭০, পাপানেক, পি.এফ. ১৯৬৮, আইবিআরডি, ১৯৭০) ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে, বাংলাদেশে শিল্পপ্রবৃদ্ধি পিছিয়ে ছিল এবং এখানকার অর্থনীতি থেকে যায় প্রধানত কৃষিভিত্তিক। সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির নিম্নহার এবং

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আন্তঃআঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি বহু সংখ্যক পণ্ডিত ও গবেষক কর্তৃক নিবিড় অনুসন্ধানের বিষয় ছিল (দৃষ্টান্তস্বরূপ, আজহার উদ্দিন, ১৯৭৫, এস. আর. লিউইস, ১৯৭০; জে. জে. স্টার্ন, ১৯৬৮; এ, সেনগুপ্ত, ১৯৭২; এ, রহমান, ১৯৬৩, এস. ইসলাম, ১৯৬৩)।

অব্যাহত দারিদ্র্যই ছিল এর বৈশিষ্ট্য। দু'দশকের গোটা সময় ব্যাপী, ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বেড়েছিল মাত্র শতকরা বার্ষিক ০.৪% হারে, যা ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্ন।

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো রয়ে যায় পশ্চাৎপদ, এমনকি ১৯৬৪-৬৫ সালেও গড় জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অবদান ছিল প্রায় ৬০%। বিপরীত দিকে, পণ্যোৎপাদন ও নির্মাণসহ শিল্পখাতের অবদান ছিল জিডিপি-র মাত্র ১২%। শিল্পখাতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদানও রয়ে যায় তাৎপর্যহীন, জিডিপি-র মাত্র ৭%। শিল্পে সরকারি বিনিয়োগ এবং বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য পরিকল্পিত বিশেষ উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের সুচিন্তিত প্রয়াস সত্ত্বেও মধ্য ষাটের দশকে বৃহৎ বেসরকারি শিল্পে মোট কর্মসংস্থানের এক-তৃতীয়াংশেরও কম এবং মোট উৎপাদনের মাত্র এক-চতুর্থাংশ অর্জিত হয় বাংলাদেশে (আইবিআরডি, ১৯৭০)। এভাবেই শিল্পোন্নয়ন এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ পাকিস্তানের জন্য একটি অমীমাংসিত উন্নয়ন সমস্যা হিসেবে থেকে যায়। পাঠক এবং অবহিত পর্যবেক্ষকদের সামনে এটা এই উভয়সঙ্কট হাজির করে যে, যদিও ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ এই বিশ বছরে পাকিস্তানের পর্যায়ক্রমিক সরকারগুলো কর্তৃক অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতির একটি বড় লক্ষ্য ছিল দ্রুত শিল্পায়ন, স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খুব সামন্যই কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছিল কিংবা কোনো গতিশীল শিল্পপ্রবৃদ্ধি ঘটেছিল।

এই অধ্যায়ের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়ন পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করা। একে পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে রেখে চেষ্টা করা হয়েছে শিল্পায়নের জন্য অনুসৃত নীতি ও কৌশলের, প্রাপ্ত ফলাফলের এবং ১৯৪৭-৭১ সময়কালে বাংলাদেশে শিল্পায়নের ধারা পরিচালনা করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলো যেসব বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিল, সেসবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা করার।

এই অধ্যায়টি সংগঠিত করতে গিয়ে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলাদেশ-অর্থনীতির প্রধান বৈষিষ্ট্যগুলোর রূপরেখা দেয়া হযেছে দ্বিতীয় অংশে। পাকিস্তানের পর্যায়ক্রমিক সরকারগুলো কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও কৌশল এবং সেসব বাস্তবায়িত করতে গিয়ে সরকারি সহায়তা কর্মসূচিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তৃতীয় অংশে। শিল্পখাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্প-উৎপাদনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন এবং আয় বণ্টন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানের উপর এর অবদান মূল্যায়ন করা হয়েছে চতুর্থ অংশে। যেহেতু শিল্পপ্রবৃদ্ধির উপর শ্রম আইন এবং শিল্প-সম্পর্কেরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে, এই বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে পঞ্চম অংশে। ১৯৪৭-৭১ সময়কালে গৃহীত শিল্পায়ন প্রয়াসের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা থেকে পরিস্ফুট প্রধান তথ্যগুলোর ভিত্তিতে শেষ অংশে প্রদান করা হয়েছে কিছু উপসংহারমূলক মন্তব্য।

২, দেশভাগের সময় বাংলাদেশ অর্থনীতির অবস্থা এবং শিল্পোন্নয়নের পক্ষে যুক্তি

পাকিস্তানের সঙ্গে পঁচিশ বছরের অংশীদারিত্ব শেষে ১৯৭১ সালের ষোলোই ডিসেম্বর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতাকে দেখতে হবে এমন একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পর্যবসিত হয়।

দেশভাগের সময় বাংলাদেশের ছিল প্রায় পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল ভূমি এবং প্রায় ৪৩ মিলিয়ন অধিবাসী। প্রধানত গ্রামীণ এবং কৃষিজীবী একটি জনগোষ্ঠী নিয়ে এর ছিল দুর্বল পরিবহন, দুর্বল বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সামান্য আধুনিক শিল্প। ১৯৬১ সালেও মোট জনসংখ্যার ৯৫% বাস করতো গ্রামে এবং শ্রমশক্তির ৮৬% নির্ভরশীল ছিল কৃষির উপর। ১৯৪৯-৫০ সালে মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অবদান ছিল ৬৫% এবং শিল্পের অবদান ছিল মাত্র ৩.৯%। মাথাপিছু উৎপাদন ছিল মাত্র ৩০৫.০০ টাকা; ১৯৪৭ সালের পর প্রথম দশকে তা স্থির থাকে কিংবা হ্রাস পায়। দারিদ্র্য এবং স্থবিরতার সকল প্রকার নিদর্শনকে ধারণ করে বাংলাদেশ অনেক বিদেশী কর্তৃক চিহ্নিত হয় অর্ধ-সংগঠিত জলাভূমির বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসেবে (পাপানেক, জি. এফ. ১৯৬৮-এ উদ্ধৃত)।

দেশভাগের সময় আধুনিক শিল্পখাতের মুষ্টিমেয় বৃহদায়তন শিল্প ইউনিট বাংলাদেশের ভাগে পড়েছিল। এর মধ্যে ছিল ২৫৮ টি তাঁত এবং ৯৯,০০০টি মাকু সহ ১০টি সুতার কল, মোট ৩৯,০০০ টন উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন ৫টি চিনিকল, ১,০০,০০০ টন উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন ১টি সিমেন্ট ফ্যাক্টরী এবং বেশ কতগুলো জুট রোলিং প্রসেস (রকিবুদ্দিন, ১৯৭৬)। ঐতিহ্যবাহী উৎপাদক হিসেবে ১৯৫০-এর দশকে বিশ্বের মোট পাটের প্রায় ৭৫% উৎপাদন করা সত্ত্বেও বর্তমান বাংলাদেশের ভূখণ্ডে তদানীন্তন ভারতের ১১২টি পাটকলের একটিও স্থাপিত হয় নি। বাংলাদেশে মূল শিল্প কর্মকাণ্ড বলতে ছিল নানা ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, মুগল আমল থেকে যা গ্রামীণ শিল্প হিসেবে পরিচিত। জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের মোট অবদানের (৩.৯ ভাগ) সিংহভাগ আসতো ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প থেকে; তাতে বৃহদায়তন শিল্পের ভাগ ছিল ৫০%-এর সামান্য বেশি। ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলার মোট শিল্প কারখানাসমূহের মাত্র ১২% আসে বাংলাদেশের ভাগে।

এভাবেই উপকরণ প্রাপ্তি, প্রাথমিক সম্পদ-অবস্থা কিংবা প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনার বিচারে বাংলাদেশে ছিল মূলত একটি মৌসুমি বায়ু প্রভাবিত ধান-পাট অর্থনীতি।শিল্প পটভূমি বলতে কার্যত সেখানে কিছুই ছিলনা। অবশ্য যদিও গোটা পঞ্চাশের দশকব্যাপী পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের তুলনায় বর্তমান বাংলাদেশ শিল্পোন্নয়নের দিক থেকে পশ্চাৎপদ থেকে যায়, শিল্পের সম্ভাব্য বিকাশক্ষমতার বিচারে উভয় প্রদেশ প্রায় সমান পর্যায়ে ছিল। শিল্পের কাঁচামাল এবং খনিজ দ্রব্য প্রাপ্তির বিচারে দু'টিই ছিল দরিদ্র। দু'টি অংশই ছিল প্রায় সম্পূর্ণ কৃষিপ্রধান, আধুনিক শিল্প প্রায় ছিলই না এবং উৎপাদিত ভোগ্য পণ্য এবং

পুঁজিসামগ্রীর জন্য এরা নির্ভর করতো আমদানির উপর। পূর্ব অংশে কাঁচা পাট এবং পশ্চিম অংশে কাঁচা তুলা সংশ্লিষ্ট টেক্সটাইল শিল্পের দ্রুততর বিকাশে সহায়তা করে। এ দু'টি ব্যতীত অন্যান্য কৃষিসামগ্রীর প্রাপ্যতা এবং গ্যাস ও অন্যকিছু খনিজের সঞ্চয় তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়নের অন্য কোনো অধিকতর সুবিধা প্রদান করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (FFYP) উল্লেখ করা হয়েছিল যে, "দু'টি অংশের মধ্যে সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক সুবিধার মাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ কোনো পার্থক্য ছিল না।" (FFYP, ১৯৫৫)। আরো আগ্রহোদ্দীপকভাবে আইয়ুব আমলে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের অন্যতম স্থপতি মাহবুবুল হক কৃষিক্ষেত্রে পশ্চিমের উপর পূর্বকে বরং একটি অগ্রগামী অবস্থান প্রদান করেন এবং পাকিস্তানের পরিকল্পনাপ্রক্রিয়া বিষয়ে তাঁর ব্যাপক প্রশংসিত গ্রন্থে ঘোষণা করেন, "যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হলে পূর্ব অংশ গোটা পাকিস্তানের শস্যভাণ্ডারে পরিণত হতে পারে"। (মাহবুব-উল হক, ১৯৬৩)

অবশ্য কৌতুকাবহ ব্যাপার এই যে পাকিস্তানের সাথে সিকি শতাব্দীর অর্থনৈতিক মেলবন্ধনের কালে কৃষি ও শিল্পে স্থবিরতার কারণে বাংলাদেশ দারিদ্র্য এবং অধঃপতনে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। নিম্ন মাথাপিছু আয় এবং উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্রান্তিকালে যদিও কৃষি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবেই, কিন্তু সমগ্র শ্রমশক্তি ফলপ্রসূভাবে এবং ক্রমবর্ধমান প্রকৃত মজুরিতে কৃষিতে নিয়োজিত হতে পারে না। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সম্ভব নয় যদি না শিল্প ও সেবা খাতের সম্প্রসারণভিত্তিক বিশাল কোন পেশাগত বণ্টনের পরিবর্তন ঘটে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্থানীয় মালিকানায় শিল্পায়নের কিছু অগ্রগতি হয়, টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি থেকে শিল্পে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনে তা সহায়তা করে নি। বিপুল সরকারি সহায়তার আওতায় শিল্পায়নের যে অগ্রগতি ঘটে, তা দুষ্প্রাপ্য সম্পদের অপচয়পূর্ণ ব্যবহার এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের প্রতি সচেতন অবহেলার প্রতিফলন। কিন্তু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নেই বাংলাদেশের ছিল প্রাথমিক তুলনামূলক সুবিধা।

পাকিস্তান আমলে অনুসৃত শিল্পায়ন নীতি এবং কৌশল

দেশভাগের দ্বারা সৃষ্ট অর্থনৈতিক নৈরাজ্য এবং রাজনৈতিক গোলযোগের পটভূমিতে পাকিস্তান গ্রহণ করে পঞ্চাশের দশকের প্রথাগত উন্নয়ন কৌশল, জোর দেয় মাথাপিছু আয়ের দ্রুত প্রবৃদ্ধির উপর, যা অর্জিত হবে দেশীয় বাজারনির্ভর শিল্পোন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে এবং যা সাধারণভাবে বেসরকারি উদ্যোগনির্ভর আমদানিবিকল্প শিল্পায়ন নামে (আইএসআই) পরিচিত। ১৯৫০ ও '৬০-এর দশকে অধিকাংশ বৃহৎ অনুন্নত দেশ কর্তৃক এই উন্নয়ন কৌশলই অনুসৃত হয়, যা যথাযথ সক্রিয় সরকারি হস্তক্ষেপের সহায়তায় আমদানিবিকল্প শিল্পায়নের মাধ্যমে দ্রুততর প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে চেয়েছিল।[২]

২. বিবেচনাধীন সময়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহের শিল্পায়ন–অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণে ব্যবহৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত লিটল প্রমুখ (১৯৭০) এবং বি ব্যালাসা প্রমুখ (১৯৭১) রচিত গ্রন্থ।

শিল্পায়ন সম্পর্কে প্রথম নীতি ঘোষণা

পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে শিল্পনীতি প্রণয়ন করে এবং নভেম্বরে একে আরো বিশদ করে। ঘোষণা থেকে বেরিয়ে আসা শিল্পায়ন এবং পরবর্তী দু'দশকে অনুসৃত শিল্পায়ন নীতির মূল দু'টি বৈশিষ্ট্য ছিল : (১) শিল্পোন্নয়ন অর্জিত হবে বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে এবং (২) সক্রিয় অংশগ্রহণ ও হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই সরকার শিল্পায়নে অগ্রগতি সাধন করবে। প্রাথমিক বছরগুলোতে বেসরকারি উদ্যোগের উপর নির্ভর করার পাকিস্তানী অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয়েছে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৬০) বিধৃত সাধারণ নীতির মধ্যেও। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বেসরকারি উদ্যোগের প্রতি অর্থনৈতিক এবং শিল্পোন্নয়ন নীতির সাধারণ ধারাকে এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করে, "শিল্পে ব্যক্তিমালিকানার প্রসার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন না হলে সরাসরি সরকারি হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলা হচ্ছে একটি প্রতিশ্রুত জাতীয় নীতি।" যেক্ষেত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (SFYP, ১৯৬০-৬৫) প্রধান অর্থনৈতিক খাতসমূহের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকাকে আলাদা করে দিয়েছিল এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি খাতকে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছিল (পৃ. ২২৫), তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (TFYP, ১৯৬৫-৭০) প্রথম দু'টি পরিকল্পনার তুলনায় অধিকতর পরিষ্কারভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি খাতের প্রাধান্যকে তুলে ধরেছিল।[৩]

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরাসরি উৎপাদনমূলক বিনিয়োগকে বিকশিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব দেয়া হয় বেসরকারি খাতকে। সকল পরিকল্পনায়ই শিল্পোন্নয়নের জন্য বেসরকারি খাতের উপর মৌলিক দায়িত্ব অর্পিত হয়। অবশ্য শিল্পোন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা সর্বাধিক পরিষ্কার স্বীকৃতি পায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই বক্তব্যের মাধ্যমে যে, যে গুরুত্বপূর্ণ খাতে বেসরকারি উদ্যোগ সর্বাধিক সঞ্চারিত হতে পারতো, সে হচ্ছে আধুনিক শিল্পখাত (TFYP পৃ. ১০৩)। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিষ্কার বলা হয়েছিল, প্রকৃত অর্থে কোনো সরকারি শিল্পখাত থাকবে না এবং সরকার সরাসরি অংশ নেবে শুধু সেসব খাত ও উৎপাদনব্যবস্থায়, যেখানে বৃহৎ ঝুঁকি এবং কম মুনাফার কারণে বেসরকারি পুঁজি এগিয়ে আসবে না।

সরাসরি সরকারি অংশগ্রহণ কেবল সেসকল আধুনিক শিল্পকলকারখানায় সীমাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা গৃহীত হয়, যেগুলোতে রয়েছে উচ্চ মাত্রার কারিগরি জটিলতা, বৃহৎ পুঁজির প্রয়োজনীয়তা এবং তুলনামূলক নিম্ন মুনাফা এবং যেসব ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ অঞ্চলে

৩. আলোচ্য সময়ে বেসরকারি ও সরকারি খাতের উন্নয়নে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতিমালা আলোচনায় একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান (১৯৮০)।

শিল্পসুবিধাবলী ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। সর্বোপরি, শিল্পে সরকারি বিনিয়োগ হওয়া দরকার ছিল পরিপূরক এবং বেসরকারি বিনিয়োগের সঙ্গে প্রতিযোগিতাবর্জিত।

শিল্পায়নে বেসরকারি উদ্যোগ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীলতার যুক্তি ছিল এই যে, অনুসৃত শিল্পায়ন কৌশল শিল্প ও ব্যবসায়ে উদ্যোগী এবং উদ্যমী ব্যক্তিদেরকে আকর্ষণ করবে, শিল্পোদ্যোগ, প্রেরণা এবং নেতৃত্বকে আকর্ষণ করবে, প্রতিভা ও দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করবে। এটাও বিশ্বাস করা হয়েছিল যে, বেসরকারি উদ্যোগের প্রতি উৎসাহ প্রদান অপেক্ষাকৃত ভালো ব্যবস্থাপনার জন্ম দেবে, পুঁজির উৎপাদনশীল ব্যবহার এবং মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ ঘটাবে, এবং উদ্ভাবন ও নতুন প্রয়োগকে উৎসাহিত করবে। এমন বিশ্বাসে উৎসাহিত হয়ে সরকার প্রস্তুত ছিল শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী বেসরকারি বিনিয়োগকারীদেরকে আর্থিক এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদানে। সম্ভাবনাময় শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে বেসরকারি খাতে শিল্পকারখানা স্থাপনে সাহায্য করার জন্য নিম্নে আলোচিত ব্যাপকধর্মী উন্নতিবর্ধক সহায়তা প্রদান করা হয়, যার মধ্যে ছিল প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন, শিল্পএস্টেট সুবিধা প্রদান, উন্নত ভৌত পরিকাঠামো এবং পর্যাপ্ত ইকুয়িটি ক্যাপিটাল সরবরাহ, ইত্যাদি।

পাকিস্তানে শিল্পবিকাশে উৎসাহ প্রদানকারী প্রধান সরকারি নীতিসমূহ এবং সহায়ক সেবা

১৯৫৮ সালে ক্ষমতাসীন হয়ে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আইয়ুব খানের সরকারপ্রধান থাকার পূর্বে পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাঠামোয় বহু পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও দু'দু'টি দশকব্যাপী পাকিস্তানের শিল্পায়ন নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ অপরিবর্তিতই থেকে যায়। তখন সরকারের একটি মৌল লক্ষ্য হিসেবে শিল্পায়ন অর্জিত হতে পারতো প্রাথমিকভাবে বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে (রেহমান সোবহান প্রমুখ, ১৯৮০)। তদনুযায়ী সরকার অনেকটা ধর্মীয়ভাবে নানা নীতি অনুসরণ করে এবং একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, যার আওতায় বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ শিল্পে বিনিয়োগ করতে পারতেন। অত্যন্ত উদার বেসরকারি শিল্পবিনিয়োগ নীতি এবং উচ্চমানের সংরক্ষণবাদ দ্রুত শিল্পায়ন অর্জনের জন্য প্রদত্ত সহায়তাসেবার ভিত্তি ছিল।

একটি নবজাত রাষ্ট্রের সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীদের শিল্পকারখানা শুরু করার মতো পুঁজি না থাকায় সরকার তাদের সাহায্য করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানের পূর্বে এ্যাড হক ভিত্তিতে ঋণ সরবরাহ করতো (জি.এফ. পাপানেক, ১৯৬৭, পৃ. ৮৭)। পরবর্তীতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় এবং ১৯৪৯ সালে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সংস্থা হিসাবে স্থাপিত হয় পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (PIFCO)। PIFCO প্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানাসমূহে ঋণ প্রদান করতো। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠায় PIFCO কোনো অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে নি, কারণ নতুন শিল্পকারখানা

প্রতিষ্ঠায় PIFCO-এর ঋণ প্রদানের ক্ষমতা ছিল না। PIFCO-কে ১৯৫৭ সালে রূপান্তরিত করা হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান (আইডিবিপি)-এ এবং নতুন ও পুরনো উভয় প্রকার শিল্পকারখানায় ঋণ প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৫৭ সালে আরেকটি অর্থসংস্থা পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন (পিআইসিআইসি) প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন শিল্পকারখানা স্থাপন কিংবা প্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানাসমূহ সম্প্রসারণে ইকুইটি পুঁজি সরবরাহ কিংবা ঋণ প্রদানের জন্য। পিআইসিআইসি-রও উন্নয়নমূলক সহায়তাসেবা প্রদানের কথা ছিল। আইডিবিপি এবং পিআইসিআইসি দুই-ই স্থানীয় এবং বৈদেশিক উভয় ধরনের মুদ্রায় ঋণ দিতে পারতো। ১৯৬৯-এর শেষ পর্যন্ত স্থানীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা মিলে আইডিবিপি ঋণ দিয়েছিল মোট ১৮০.৪ কোটি টাকা, যার ৪৮% অংশ পায় বাংলাদেশ। এই পরিমাণ অর্থ ২২৯টি উৎপাদক ইউনিটের নিকট ১৬২০টি ঋণের মাধ্যমে দেয়া হয়। অবশ্য ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৫৮১টি প্রকল্পে পিআইসিআইসি'র বিনিয়োগকৃত মোট ঋণের (১৩৮৬.১৭ কোটি টাকা) মাত্র ২৭% অংশ পায় বাংলাদেশ। মিলিতভাবে ষাটের দশকে পাকিস্তানের দু'অংশে বিচিত্র ধরনের শিল্পপ্রকল্পে দু'টি সংস্থা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণ-অর্থ প্রদান করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের দু'টি প্রদেশে উৎপাদিত পাটজাত দ্রব্য, বস্ত্র, চিনি, ইস্পাত, কাগজ এবং বোর্ড, রাসায়নিক দ্রব্য, সার, ঔষধ এবং খাদ্য ও তৎসংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি তৈরির শিল্পকলকারখানা ইত্যাদি শিল্পকারখানা উল্লেখযোগ্য (আহমেদ রকিবউদ্দিন, ১৯৭৬)[৪]।

বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পখাতে উন্নয়নের বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদানে আইডিবিপি এবং পিআইসিআইসি যে ভূমিকা পালন করে, তার পরিপূরক হিসেবে কাজ করে আরো কতগুলো ক্ষুদ্রতর সংস্থা, যেমন ইকুইটি পার্টিসিপেশন ফাণ্ড (EPF), ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশান অব পাকিস্তান (আইসিপি) এবং পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশান (ইপসিক)। উদীয়মান ক্ষুদ্র বাঙালি বিনিয়োগকারীদেরকে ইকুইটি সমর্থন প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৬০-এর দশকে ইপিএফ এবং আইসিপি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিনিয়োগকারীদের ব্যাংকঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জনে ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে লিকুইডিটির সমস্যা ছিল। দু'টি সংস্থার মধ্যে উদীয়মান বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তাদের ইকুইটি সমর্থন প্রদানে কমবেশি সফল ছিল আইসিপি, যা স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশে ইকুইটিতে বিনিয়োগ করেছিল ৩.৯১ কোটি টাকা, যা ছিল পাকিস্তানের দু'অংশে মোট বিতরণকৃত টাকার ৬৭% (রেহমান সোবহান প্রমুখ, ১৯৮০)। ইপসিক (বাংলাদেশে যার পুনঃনামকরণ

৪ তবুও জি. এফ. পাপানেক (১৯৬৭) জোর দিয়ে বলেছেন যে এই দু'টি সংস্থা তাদের কাঠামোগত এবং কর্মকাণ্ডগত অনমনীয় ভূমিকার কারণে পাকিস্তানের প্রাথমিক শিল্পায়ন প্রতিষ্ঠায় তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে নি।

হয়েছে বিসিক) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালে বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের শিল্পোদ্যোগমূলক সমর্থন প্রদানের জন্য। অবশ্য নানা প্রকার পরিচালনাগত সীমাবদ্ধতার কারণে এই প্রতিষ্ঠান তার উন্নতিবর্ধক কাজে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারে নি। তবুও তা প্রাক-স্বাধীনতা বাংলাদেশে ১০০৮টি প্রকল্পে অর্থ যোগান দেয়। তাঁত, বেত ও বাঁশের সামগ্রী, চামড়া এবং কাঠের দ্রব্য প্রস্তুতকারী ছোট ছোট বিচিত্র শিল্পকারখানা স্থাপনে এই সংস্থা ৫৭ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করে।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশান (পিআইডিসি), পরে যা দ্বিখণ্ডিত হয় এবং ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন নামে পরিচিত হয়। শিল্পোন্নয়নে সহায়তাদান এবং বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে ইকুইটি অর্থ, ব্যবস্থাপনাগত সমর্থন ইত্যাদি দিয়ে তাদেরকে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায় সক্ষম করে তোলার জন্যই ১৯৫০ সালে পিআইডিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর যুক্তিসূত্র ছিল শিল্পোদ্যোগগত বিকল্পের পরিবর্তে শিল্পোদ্যোগগত সমর্থন প্রদান (রেহমান সোবহান প্রমুখ, ১৯৮৮)। এর সনদ অনুযায়ী যেখানে বেসরকারি বিনিয়োগ এগিয়ে আসছিল না, পিআইডিসি এবং পরবর্তীতে ইপিআইডিসি সেখানে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে এবং তারপর ব্যক্তি-বিনিয়োগকারীরা দায়িত্বভার নিতে সক্ষম হলে তার ইকুইটিস্বার্থ এবং ব্যবস্থাপনাগত সমর্থন প্রত্যাহার করতে।

ইপিআইডিসি বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে শিল্পবিকাশে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি সরকারি খাতেও যেখানে ব্যক্তিপুঁজি এগিয়ে আসছিল না, সেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠায়ও দায়বদ্ধ ছিল। কর্ণফুলী কাগজের কল হচ্ছে একটি প্রধান বৃহদায়তন শিল্প, যা প্রথম ইপিআইডিসি-র মালিকানায় সরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরে বেসরকারি খাতে বিক্রি হয়ে যায়। ১৯৬৯-৭০ সালে আধুনিক শিল্প খাতে মোট স্থায়ী সম্পদের প্রায় ৩৬% সরকারি মালিকানাভূক্ত ছিল।

ইপিআইডিসি একটি মোক্ষম ভূমিকা পালন করে পূর্ব পাকিস্তানে, যেখানে ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পোদ্যোগ ছিল মারাত্মকভাবে কম। প্রকৃতপক্ষে, শুধু আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠায় নয়, বাংলাদেশে ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতের বিকাশেও ইপিআইডিসি ষাটের দশকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। রেহমান সোবহান প্রমুখকে উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে, "বাঙালি পাতি বুর্জোয়া ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে বৃহৎ শিল্পপতি এবং বুর্জোয়া শ্রেণী সৃষ্টির সরকারি নীতির একটি বড় হাতিয়ার ছিল ইপিআইডিসি।"

১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত ইপিআইডিসি হয় নিজে নতুবা যৌথ উদ্যোগ হিসেবে ব্যক্তিখাতের সঙ্গে একযোগে ৭৪টি উৎপাদনকারী শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। স্বাধীনতালাভের সময় বাংলাদেশে আধুনিক

শিল্পখাতে বিনিয়োগকৃত মোট সম্পদের ৩৪% অংশ ছিল ইপিআইডিসি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিল্পখাতসমূহে। ইপিআইডিসি প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পগুলো ছড়িয়ে ছিল ব্যাপক বিচিত্র পরিধির উৎপাদন কর্মকাণ্ডে, যেমন, পাট, টেক্সটাইল, কাগজজাত পণ্য, সার, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধসামগ্রী, জাহাজ নির্মাণ ও প্রকৌশল, চিনি, বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও যন্ত্রপাতি, মেশিনটুলস এবং ডিজেল ইঞ্জিন শিল্পসমূহে।[৫]

প্রবৃদ্ধি এবং মুনাফা বৃদ্ধির সহায়ক নীতিসমূহ

বাংলাদেশে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টিকে লালনের জন্য পরিকল্পিত ইকুইটি এবং ঋণপুঁজির উদার সরবরাহের বাইরেও সরকার বিভিন্ন পরিবর্ধক উদ্দীপক এবং সহায়তাসেবা প্রদান করে, যা শিল্পের বিকাশকে প্রভাবিত করে তাদের মুনাফা অর্জনকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে। শিল্পসমূহকে প্রদত্ত উদ্দীপকের দীর্ঘ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল ত্বরান্বিত ক্ষয়ক্ষতিভাতা, ট্যাক্স মওকুফ এবং পুনর্বিনিয়োগকৃত আয়কে কর্পোরেশন এবং ব্যক্তিগত আয়কর থেকে অব্যাহতি প্রদানের মাধ্যমে ট্রাক্স মওকুফ। অভ্যন্তরীণ বিক্রয় এবং আবগারী কর থেকে রপ্তানিকেও অব্যাহতি দেয়া হয়, রপ্তানি থেকে অর্জিত আয়ের অংশের উপর ছিল কর হ্রাস (এস. আর. লিউইস, ১৯৭০)। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, শিল্পসমূহকে সংরক্ষণসুবিধা দেয়া হয় (স্থানীয় মুদ্রায়) উৎপাদন-উপকরণের মূল্যহ্রাস এবং উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে। এটা করা হতো ইমপোর্ট লাইসেন্সিং সিস্টেম এবং এক্সপোর্ট বোনাস স্কীমের আওতায়।[৬] বিশেষত বড় শিল্পপতিদেরকে যন্ত্র, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য মধ্যবর্তী দ্রব্য আমদানির অনুমতি দেয়া হতো অবমূল্যায়িত বৈদেশিক মুদ্রায়, যা তাদের নিকট পৌঁছে দেয়া হতো আমদানি লাইসেন্সিং এবং এক্সপোর্ট বোনাস ব্যবস্থার মাধ্যমে। সরকারি বিনিময়হার সর্বদা বেশ বড়োভাবে স্থানীয় মুদ্রার অতিমূল্যায়ন করতো, যার ফলে আমদানিকারকরা আমদানিকৃত উপকরণের জন্য স্থানীয় মুদ্রায় বিশ্ববাজারমূল্যের চেয়ে অনেক কম প্রদান করতো।

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি থেকে প্রবর্তিত ব্যাপক আমদানি লাইসেন্সিং ব্যবস্থা শিল্পপতিদেরকে বিপুল সুবিধা দিয়েছিল। সরকার কর্তৃক একটি শিল্প-প্রকল্প অনুমোদনের পরে উৎপাদক অনুমোদিত শিল্পপ্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় আমদানি

৫. বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের শিল্প এবং শিল্পোদ্যোগের বিকাশ ও উন্নতি সাধনে ইপিআইডিসি পালিত পথিকৃতের ভূমিকার খুঁটিনাটি এবং সমালোচনামূলক মূল্যায়নের জন্য রেহমান সোবহান প্রমুখ রচিত গ্রন্থ (১৯৮০) এবং জি. এফ. পাপানেক রচিত গ্রন্থ (১৯৬৭) বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

৬. ইমপোর্ট লাইসেন্সিং সিস্টেম এবং এক্সপোর্ট বোনাস স্কীমের মাধ্যমে শিল্পসমূহ যে বিপুল সংরক্ষণসুবিধা ভোগ করতো, তার একটি অতি চুম্বক বিশ্লেষণ রয়েছে কিউ. কে. আহমদ রচিত গ্রন্থে (১৯৭৮)।

লাইসেন্স পেয়ে যেতো। শিল্পোদ্যোক্তা একজন কোটামালিক (কিংবা শিল্প আমদানিকারক) হিসেবে বিবেচিত হতেন, যা তাকে তার নিজস্ব শিল্পকারখানায় ব্যবহারের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ এবং কাঁচামাল আমদানির নিয়মিত সুযোগ করে দিত শিল্প লাইসেন্সের মাধ্যমে।

১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে প্রবর্তিত এক্সপোর্ট বোনাস স্কীমের আওতায় বোনাস-সুবিধা ভোগকারী একজন রপ্তানিকারক তার বৈদেশিক মুদ্রা আয় পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকে জমা দিত। সম মানের রুপী সে গ্রহণ করতো এবং তার সঙ্গে বাড়তি একটি ভাউচার তাকে ক্ষমতা দিত সরকারি হারে বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে। এই ভাউচার বিক্রি করে সে তার রপ্তানিমূল্যের ২০%, ৩০% কিংবা ৪০% বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয় করতে পারতো। ভাউচারটি অবাধে হস্তান্তরযোগ্য ছিল এবং এটিকে সরকারি হারে বৈদেশিক মুদ্রা কেনার জন্য ব্যবহার করা যেতো (ক) বাণিজ্যিক ও শিল্প সামগ্রী আমদানির জন্য, (খ) ব্যবসায়িক ভ্রমণের জন্য এবং (গ) বিদেশে বাণিজ্যিক অফিস খোলা এবং পরিচালনার জন্য (কিউ. কে. আহমদ, ১৯৭৮)। বোনাস সুবিধাদি প্রধানত রপ্তানিশিল্পের বিকাশে সুযোগ প্রদান করে রপ্তানির বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রা প্রাপ্তিতে সুবিধাদানের মাধ্যমে। যদিও স্কীমটি সাধারণভাবে সকল রপ্তানিশিল্পকে সাবসিডি দেয়,পাটজাত শিল্পই ছিল প্রকৃতপক্ষে সর্বাধিক লাভবান।[৭]

শিল্পবিকাশ প্রভাবিত করার জন্য প্রদত্ত নীতি এবং উদ্দীপকের প্রতি শিল্প-উদ্যোক্তাদের প্রতিক্রিয়া

১৯৫০ ও '৬০-এর দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দ্রুততর হার অর্জনের জন্য পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করার সরকারি নীতির মূল তাগিদের সঙ্গে সংগতি রেখে আর্থিক এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়ক সুবিধাদির একটি ব্যাপক বিন্যাস সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোক্তাদের নিকট সহজলভ্য করে তোলা হয় শিল্পকারখানা শুরু ও পরিচালনায় তাদেরকে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে। অবশ্য যেহেতু পাকিস্তান প্রাথমিকভাবে শিল্পোদ্যোক্তাদের সংখ্যাস্বল্পতায় ভুগেছিল, শুরুতে বেসরকারি ব্যক্তিখাতের তরফ থেকে সাড়াটা ছিল অসন্তোষজনক। তাছাড়া, দেশভাগের পরের বছরগুলোতে নবজাত পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিল অনিশ্চয়তা। তথাপি, ভারত, বার্মা এবং পূর্ব আফ্রিকা থেকে পাকিস্তানে আগত মুসলমানদের দ্বারা গঠিত এক দল শিল্পোদ্যোক্তা তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল পরিমিত পুঁজি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের শিল্প ও ব্যবসায়ী উদ্যোগের সাথে তাদের অতীত সংযোগের সূত্রে সঞ্চিত কিছু কারিগরি দক্ষতা ও শিল্পোদ্যোগমূলক দক্ষতা। তারা পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে বিনিয়োগ করতে শুরু করলো। উপরন্তু কোরীয় যুদ্ধের তেজি ভাবের সময় যে পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা ভাগ্য গড়ে নিয়েছিল, তাদের কেউ কেউ প্রথম দলে যোগ দেয়। কিন্তু এদের দু'দলই

৭. স্কীমটির পরিচালনা এবং এ থেকে রপ্তানিকারকদের প্রাপ্ত লাভের খুঁটিনাটির জন্য দেখুন, কিউ. কে. আহমদ (১৯৬৬) এবং এইচ, জে, ব্রুটোন প্রমুখ (১৯৬৩) রচিত বই।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগ করতে অনিচ্ছুক ছিল সম্ভবত ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঘনিষ্ঠতার অভাব এবং সরকারি সিদ্ধান্ত ও সুযোগসুবিধাসমূহের সহজলভ্যতার সুযোগের অভাবের কারণে। পাকিস্তানের তৎকালীন রাজধানী করাচী থেকে দূরে অবস্থান করলে করাচীতে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলোর সঙ্গে দূরত্বের সৃষ্টি হতো এবং সুযোগ-সুবিধাদি সহজলভ্য হতো না।[৮]

যাই হোক, বহিরাগত পরিবারদের অন্যতম আদমজী পরিবার পূর্ব পাকিস্তানে পাটশিল্পে বিদ্যমান মুনাফা লাভের আকর্ষণীয় সুযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। ১৯৪৯ সালে সরকার প্রতিটি ১০০০ তাঁতের তিনটি পাট শিল্পের ইউনিট প্রতিষ্ঠার আদমজী কর্তৃক প্রস্তুত একটি প্রকল্প অনুমোদন করে। সরকার এ প্রকল্পের প্রাথমিক বাধাগুলো সহজেই অতিক্রম করার লক্ষ্যে আদমজীদেরকে প্রকল্পের জন্য আমদানিখাতে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করে এবং এতে একটি ইকুইটি-স্বার্থ গ্রহণ করে (যা পরে মালিকদের নিকট হস্তান্তরিত হবে) এবং এইভাবে তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রদান করে। এভাবেই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে সফল অংশীদারিত্বের আওতায় পাটজাত দ্রব্য তৈরির মধ্য দিয়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়, যা পরবর্তী দু'দশকে প্রাক-স্বাধীনতা বাংলাদেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলে।

অবশ্য ১৯৫০-এর দশক এবং ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে বাংলাদেশের ব্যক্তিখাতে অস্থানীয়গণ (পশ্চিম পাকিস্তানারা) প্রাধান্য বিস্তার করে। আধুনিক পুঁজিবাদী খাতেই তাদের প্রাধান্য আরো প্রকট ছিল। রেহমান সোবহান প্রমুখের (১৯৮০) মতে, স্বাধীনতালাভের সময় অবাঙালি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো আধুনিক শিল্পখাতে স্থায়ী শিল্প মূলধনের ৪৭% এবং বেসরকারি শিল্পসম্পদের ৭২% অংশের মালিক ছিল। বাংলাদেশের অর্থনীতির ব্যাংকিং, বীমা এবং অন্যান্য খাতেও অবাঙালিদের সমান প্রাধান্য ছিল। বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি এবং শিল্পোদ্যোগমূলক দক্ষতার মালিক হওয়া ছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ঢুকে পড়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠায় সরকারপ্রদত্ত উদার সহায়তা ও সমর্থনসেবার সুযোগ গ্রহণেও তারা ভালো অবস্থানে ছিল। দেশটি পশ্চিম পাকিস্তানীদের রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে থাকায় এটাই প্রত্যাশিত ছিল যে অস্থানীয় বিনিয়োগকারীরাই বাংলাদেশে শিল্পকলকারখানার পাকিস্তানী মালিকানা পরিবর্ধনে আমলাদের অনুসৃত পক্ষপাতদুষ্ট সক্রিয় নীতি থেকে লাভবান হবে।[৯]

৮. ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের দ্রুত শিল্পোন্নয়নে বিবিধ ব্যক্তি শিল্পোদ্যোক্তাদের দ্বারা পালিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিশদ বিশ্লেষণের জন্যে দেখুন, জি. এফ. পাপানেক রচিত গ্রন্থ (১৯৬৮)।

৯. সমগ্র পাকিস্তানে এবং বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পখাতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অবাঙালিদের হাতে পুঁজি সঞ্চয়ন ও কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটির জন্য দেখুন রেহমান সোবহান প্রমুখ রচিত গ্রন্থ (১৯৮০, পঞ্চাশ অধ্যায়)।

বাংলাদেশী শিল্পে অবাঙালি মালিকানার সংখ্যাধিক্য বাঙালিদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং মধ্য-ষাটের দশক থেকে তা অব্যাহত থাকা অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে। ষাটের দশকের শুরুতে আঞ্চলিক উন্নয়নে বর্ধিত বৈষম্যের দরুন প্রবল রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া যখন তুঙ্গে, তখন সরকার পূর্ব পাকিস্তানে একটি শক্ত শিল্পভিত্তি গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। রেহমান সোবহান এবং মুজাফফর আহমদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটা ছিল পূর্বাঞ্চলে আইয়ুবের জন্য একটি নিরাপদ ক্ষমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বাঙালি পাতি বুর্জোয়াদের মধ্য থেকে একটি পুঁজিপতি শ্রেণী গড়ে তোলার জন্য আইয়ুব সরকারের সচেতন প্রয়াস। এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত এবং রাজনৈতিক প্রসঙ্গেই লেখকদ্বয় ইপিআইডিসি এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাঙালি পাতি বুর্জোয়াদের মধ্য থেকেই পুঁজিপতি শ্রেণী গড়ে তোলার প্রয়াসকে বিচার করতে চান।

কিছু কিছু ঘটনায় বিশেষ অর্থায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাঙালিদের মধ্যে ব্যক্তিমালিকানায় বৃহদায়তন শিল্প গড়ে তোলার সচেতন প্রচেষ্টা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।[১০] প্রত্যক্ষ সরকারি উদ্যোগ এবং তাগিদে ৬০ কোটি টাকা মূল্যের ৩৪টি বাঙালি নিয়ন্ত্রিত পাট শিল্পকারখানা সৃষ্টি করা হয়, ২১ কোটি টাকা মূল্যের ২৪টি টেক্সটাইল সংস্থা সৃষ্টি করা হয়। গড়ে পাটকলগুলোতে বিনিয়োগের ২৪% অংশ যোগায় বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তাগণ, পাবলিক ইকুইটি থেকে আসে ১৯% এবং অগ্রিম সরকারি ঋণ থেকে আসে ৫৭%। এইভাবে ইপিআইডিসি প্রদত্ত প্রবল উৎসাহ ও সমর্থনের আওতায় মধ্য-ষাটের দশক থেকে শিল্পে বাঙালি উদ্যোগ বিকশিত হতে শুরু করে। বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তাদের মধ্যে যারা আগে থেকে ব্যবসায়ে এবং ক্ষুদ্র শিল্প কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিলেন এবং সেভাবে কিছু পুঁজি সঞ্চয় করেছিলেন, তারা শিল্পোদ্যোগে যথেষ্ট বিশেষ প্রবণতা প্রদর্শন করেন। যদিও মধ্য-ষাটের দশক থেকেই বাঙালি শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠে এবং তখন থেকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে, সামগ্রিক শিল্পোন্নয়ন স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক বেশি এগিয়ে যায়।

৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে অর্জিত শিল্পোন্নয়নের একটি সামগ্রিক চিত্র

পূর্বের অংশে আমরা আধুনিক শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশকে উৎসাহিত করায় সরকারের মূলনীতি এবং উন্নয়নমূলক সহায়ক সেবা সম্পর্কে আলোচনা করেছি, যা ছিল পাকিস্তান সরকারের অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতির একটি মূল ভিত্তি। এই অংশে আমরা শিল্পায়নে অর্জিত প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নমাত্রা পরীক্ষা করে দেখবো এবং শিল্পের কাঠামো এবং

১০. ২৭২টি শিল্প ইউনিট সৃষ্টিতে আর্থিক সংস্থাসমূহকে নেতৃত্ব দানের ভূমিকা পালন করে আইডিবিপি এবং পিআইসিআইসি এবং ক্ষুদ্র বাঙালি বুর্জোয়াদের মালিকানায় ১০০৮টি শিল্প ইউনিট স্থাপনে সমর্থন যোগায় ইপসিক।

কার্যকারিতার সঙ্গে সেগুলোকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত নীতিমালার মধ্যে সম্পর্ক সন্ধানে প্রয়াসী হবো।

আধুনিক শিল্পের বিকাশ

যদিও ১৯৪৭ সালের একটি নিম্ন পর্যায় থেকে শুরু করায় কিছুটা বাড়িয়ে বলা হয়, তথাপি ১৯৬০-এর দশকের শেষে এসে বাংলাদেশের শিল্পখাতের ভিত্তি যথেষ্ট ব্যাপ্ত হয়েছে বলা যায়। (সারণি ১.১)। আধুনিক শিল্পখাতের অবদান (বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প খাত মিলিয়ে) ১৯৫৯-৬০-এর উপকরণ-খরচে হিসাব করলে ১৯৪৯-৫০-এর ৩.০% থেকে বেড়ে ১৯৬৯-৭০-এ দাঁড়ায় ৭.৭৮%-এ। বিপরীতভাবে একই সময়কালে কৃষিখাতের অবদান কমে যায় ৬৫% থেকে ৫৩%-এ, গোটা অর্থনীতিতে তা একটি পরিবর্তনশীল উৎপাদনকাঠামোকে নির্দেশ করে। অবশ্য নীচের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাবে, সামগ্রিক শিল্পপ্রবৃদ্ধির গতি ছিল ধীর এবং তা শিল্পোৎপাদনকাঠামোর আধুনিকতামুখী রূপান্তরের উপর সামান্যই প্রভাব ফেলে।

সারনী ১.১ : খাতওয়ারী মোট জাতীয় উৎপাদন (১৯৫৯-৬০-এর উপকরণ মূল্যের হিসাবে মিলিয়ন টাকায়)

	১৯৪৯-৫০	১৯৬৯-৭০
কৃষি	৭৩৯২	১১৪৬৯
	(৬৫.৪৩)	(৫৩.৩৩)
উৎপাদন	৩৩৯	১৬৭২
	(৩.০০)	(৭.৭৮
বৃহদায়তন শিল্প	৬৯	৭৮৩
	(০.৬১)	(৩.৬৪)
ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	২৭০	৮৮৯
	(২.৩৯	(৪.১৩)
অন্যান্য কর্মকাণ্ড	৩৫৬৭	৮৩৬৩
	(৩১.৫৭)	(৩৮.৮৯)
সর্বমোট :	১১২৯৮	২১৫০৪
	(১০০.০০)	(১০০.০০)

উৎস : আলমগীর এবং বার্লেজ. (১৯৭৪)

দ্রষ্টব্য : বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলো স্তম্ভের শতকরা হার

বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশ

স্বাধীনতার পূর্বে শিল্পায়নের একটি মন্দা হারের মধ্য দিয়ে বিকশিত বাংলাদেশের শিল্পকাঠামোর দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল : (১) অল্প কয়েকটি বড় শিল্পের প্রাধান্য এবং (২) স্থায়ীভাবে প্রাপ্ত কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের উন্নয়ন। ১৯৬৮-৬৯ সালে বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত ৩,১৩০টি শিল্পের মধ্যে ৭৯১টি ছিল টেক্সটাইল, ৫৭৬টি রাসায়নিক, ৪০৬টি খাদ্য, ২৫৭টি ধাতব, ২০৭টি পাদুকা, ১৪৯টি চামড়াজাত এবং ১৪৩টি মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্পর্কিত শিল্প। এই নিবন্ধনকৃত ইউনিটগুলোর মধ্যে টেক্সটাইল, খাদ্য এবং রসায়নিক দ্রব্য ছিল তিনটি প্রধান ধরন, মোট শিল্প কারখানার প্রায় ৫৭% ছিল এদের আওতায়। সারণি ১.২-এর তথ্য থেকে যেটা বেরিয়ে আসে তা হলো, এগুলোই ছিল সেই সব শিল্প, শিল্পোৎপাদনে অবদানের দিক থেকে যেগুলো ছিল প্রধান। এভাবেই শিল্পকাঠামো সেই সব শিল্পের প্রাধান্যকে নির্দেশ করে, যাদের উৎপাদন ছিল স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কাঁচামালভিত্তিক। কার্যত তা পাকিস্তানে অনুসৃত অতীত প্রবৃদ্ধিনীতির প্রতিফলন, যার আওতায় গুরুত্ব পায় পাট, বস্ত্র, চা-প্রক্রিয়াকরণ, চিনি, উদ্ভিজ্জ (vegetable) তেল, সিগারেট, কাগজ এবং নিউজপ্রিন্ট, দিয়াশলাই, ইউরিয়া সার এবং সিমেন্টের মত এমন সব শিল্পের উন্নয়ন, যা কৃষিজ কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের ভিত্তিতে পরিচালিত।[১] এই শিল্পগুলো ঐতিহ্যবাহী উৎপাদন কর্মকাণ্ডের প্রতিনিধি, যা পাকিস্তানের সাথে দু'দশকের অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের সময়কালে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করে নি।

নিবন্ধনকৃত বৃহদায়তন শিল্পের বাইরে অনেক অনিবন্ধনকৃত ইউনিটও ছিল, যেগুলোর অধিকাংশ ছিল কুটির শিল্প ইউনিট। বাংলাদেশ (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত ১৯৫৯ সালের একটি সমীক্ষা মোতাবেক, গ্রামীণ এলাকায় ছিল ৩৩০,৪০০ টি শিল্প ইউনিট, যার ৮২% ছিল কুটির শিল্প ধরনের। প্রাক-বাংলাদেশ সময়ের অর্থনীতি প্রবলভাবে নির্ভরশীল ছিল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর, যা ছিল শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগসুবিধা প্রদানকারী এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অখাদ্য ভোগ্য দ্রব্য বস্ত্রের সরবরাহকারী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৬০-এর দশকে ক্ষুদ্র ও বৃহদায়ন শিল্প মিলিতভাবে যে শ্রমশক্তি নিয়োগ করতো, কুটির শিল্প করতো তার তিন গুণেরও অধিক শ্রমশক্তি এবং তা যোগান দিত কাপড়ের ৬৪% অংশ, ক্ষুদ্র শিল্প যোগান দিত ২৬% এবং বৃহদায়তন কারখানা যোগান দিত মাত্র ১০% (এ. আর. খান. ১৯৭২)।

[১] সমর্থন করেছে একটি IBRD (১৯৭০) সমীক্ষা, যা ষাটের দশকে পাকিস্তান কর্তৃক অনুসৃত শিল্পায়ন নীতির প্রধান উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছে দেশীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নকে।

সারণি ১.২ : বাংলাদেশের কতিপয় আধুনিক শিল্পের উৎপাদন

	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৯-৬০	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৯-৭০	গড় বার্ষিক উৎপাদনহার (১৯৫৪-৫৫ থেকে ১৯৬৯-৭০)
পাট উৎপাদনকারী (০০০টন)	১০৩	২৬৫	২৮৯	৫৮০	১২.২
সুতো (মিলিয়ন পাউন্ড)	২৩	৪৯	৬৪	১০৬	১০.৭
সুতীবস্ত্র (মিলিয়ন পাউন্ড)	৬৫	৬২	৪৯	৫৯	-০.৫
চা (মিলিয়ন পাউণ্ড)	৫৩.৮	৫০.৩	৬২.৩	৫৯.৬	১.৭
চিনি (০০০ টন)	৪৭	৬১	৭৭	৮৯	৪.৩
ভোজ্য তৈল (০০০ টন)	-	১.৮	৪.৯	৬.৪	১৩.৫
সিগারেট (মিলিয়ন)	০.৪	১.১	৫.৫	১৭.৮	২৮.৮
কাগজ এবং নিউজপ্রিন্ট (০০০ টন)	১৯.২	৩৯.২	৭৮.৮	৭৭.৯	৯.৮
রেয়ন কাপড় (মিলিয়ন গজ)	-	০.৩	০.১	৫.০	৩২.৫
দেশলাই (মিলিয়ন গ্রাম)	২.৪	৮.৬	১০.৭	১৩.০	১১.৯
সার (ইউরিয়া) (০০০ টন)	-	-	৭২	৯৪	৫.৫
সিমেন্ট (০০০ টন)	৫০	৬১	৫৬	৫৩	০.৪
ইস্পাত (০০০টন)	-	-	-	৫৪	-
ডিজেল ইঞ্জিন (সংখ্যা)	-	-	-	১২৮৪	-
মোটর যান সংযোজিত (সংখ্যা)	-	-	-	৪৫৫	-
মোটর সাইকেল (সংখ্যা)	-	-	-	৯৩৫	-
বাই সাইকেল (সংখ্যা)	-	-	-	৭২৯৫	-
রেডিও (সংখ্যা	-	-	-	৬০০০	-

উৎস : পাকিস্তান সরকার (অর্থ মন্ত্রণালয়), *পাকিস্তান ইকনোমিক সার্ভে, ১৯৭০-৭১;* বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ ইকনোমিক সার্ভে, ১৯৭৩-৭৪*, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস, *স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ারবুক অব বাংলাদেশ,* ১৯৮২।

অবশ্য পাকিস্তানী শাসনামলে উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পরিপূর্ণ সম্ভাবনা সন্ধান করে, দেখা হয় নি। পাকিস্তান সরকার একটি শিল্পায়ন নীতি অনুসরণ করে, যা আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের উন্নয়নকে উৎসাহিত করে এবং সুবিধা প্রদান করে, এবং অবহেলা করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে, যদিও পূর্ব বাংলার প্রাথমিক অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সম্পদপ্রাপ্তি এই সব শিল্পের উন্নয়নের জন্যই বেশি উপযোগী ছিল।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতি সরকারের কেবল গতানুগতিক দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল। এই সব শিল্পের সম্ভাবনাময় গুণের প্রতি পর পর সকল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যাপক স্বীকৃতি প্রদান সত্ত্বেও পরিকল্পনাগুলোতে তারা সমগ্র সরকারি খাতের আর্থিক বরাদ্দের মাত্র ১/২% লাভ করে। সারণি ১.৩-এ প্রদত্ত তথ্যে এটা পরিষ্কার প্রমাণিত হয়। পরিহাসের ব্যাপার এই যে, এতদসত্ত্বেও সরকারি খাতের মোট ব্যয়বরাদ্দের অংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবস্থার তেমন উন্নয়ন ঘটে নি।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতি সরকারের কেবল গতানুগতিক দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল। এই সব শিল্পের সম্ভাবনাময় গুণের প্রতি পর পর সকল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যাপক স্বীকৃতি প্রদান সত্ত্বেও পরিকল্পনাগুলোতে তারা সমগ্র সরকারি খাতের আর্থিক বরাদ্দের মাত্র ১/২% লাভ করে। সারণি ১.৩-এ প্রদত্ত তথ্যে এটা পরিষ্কার প্রমাণিত হয়। পরিহাসের ব্যাপার এই যে, সরকারি খাতের মোট ব্যয়বরাদ্দের অংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবস্থা স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশ আমলেও কোনো উন্নতি লাভ করে নি।[১২] তারপরও আবার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে যে যৎসামান্য বিনিয়োগের পরিকল্পনা হয়েছিল, সময়মত তহবিল অবমুক্ত না করায় তা বাস্তব কাজে লাগানোটা ছিল লক্ষ্য থেকে আরো অনেক পিছিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্বাধীনতাপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বরাদ্দ অর্থ কাজে লাগানোর সীমা ছিল যথাক্রমে ২৫% এবং ৫২%। এর সঙ্গে সংগঠিত পুঁজি বাজারে এবং সাবসিডি প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ ও আমদানিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ধরনের ইউনিটসমূহের সীমিত প্রবেশাধিকার, কাঁচামালের অভাব, কারিগরি পশ্চাৎপদতা, বিপণন সমস্যা, বাণিজ্যিক এবং কারিগরি সম্ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি সমস্যা যুক্ত হয়ে এই সব শিল্প দীর্ঘকাল ধারাবাহিক ধীরগতি প্রবৃদ্ধির সমস্যায় ভুগতে থাকে। এই সেক্টরের প্রবৃদ্ধিকে পরিবর্ধন ও সমর্থন দানের প্রধান সংস্থা হিসেবে ইপসিক তাৎপর্যপূর্ণভাবে কার্যকর হয় নি।

সারণি ১.৩ : প্রাক-স্বাধীনতা বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য সরকারি খাতের বরাদ্দ (মিলিয়ন টাকায়)

পরিকল্পনাকাল	সরকারি খাতে বরাদ্দ	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বরাদ্দ	১ এর % হিসেবে ৩
প্রপপ (১৯৫৫-৬০)	৭৫০০	৮৬.৫	১.১৪
দ্বিপপ (১৯৬০-৬৫)	১১৫০০	১৫০.০	২.১৭
তৃপপ (১৯৬৫-৭০)	৩০০০০	৩১৬.৭০	১. ০৫

উৎস : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

১২ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালেই (১৯৮৫-১৯৯০) শুধু ১৯৮৬ সালের সংশোধিত শিল্পনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পকে একটি "অগ্রাধিকার খাত" হিসেবে প্রথম বার স্বীকার করে নেয়া হয় এবং এই খাতের বিকাশ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শিল্পঋণের সরবরাহ বাড়ানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বিস্ময়কর নয় যে, যদিও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহ কর্মসংস্থানের অধিকাংশ যোগান দেয় (ইতিপূর্বে উদ্ধৃত ১৯৬৯-৭০-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৬৯-৭০-এ ৮৭%), বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় তাদের যোগকৃত মূল্য ছিল দুঃখজনকভাবে কম। শিল্পখাতে বিরাজমান কাঠামোগত দ্বৈততার প্রমাণ এটা। তিন ধরনের শিল্পের মধ্যকার উৎপাদনগত দক্ষতার পরিমাণে পার্থক্যের কারণে এ. আর. খান একে বলেছিলেন শিল্পগত ত্রিভুজতা। এই তিন ধরনের শিল্পের মধ্যকার সংগঠনগত এবং কারিগরি ভিন্নতা থেকে উদ্ভূত বৃহদায়তন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে কড়াকড়ি আন্তঃতুলনার সমস্যাগুলোকে বাদ দিলেও এ আর খানের ১৯৭২) হিসাব দেখিয়েছিল যে কুটিরশিল্পে মাথাপিছু প্রত্যেক শ্রমিকের যোগ করা মূল্য অত্যন্ত কম, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে $\frac{১}{৯}$ এবং বৃহদায়তন শিল্পে $\frac{১}{১০}$। যদিও এত কম শ্রম উৎপাদনশীলতা অর্থনৈতিকভাবে তাদের অব্যাহত টিকে থাকার সামর্থ্যকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ প্রায় করেই না বলা চলে, তাদের অব্যাহত ক্রিয়াশীলতা নির্দেশ করে যে সেখানে নিয়োজিত প্রমশক্তিকে অবশেষে কর্মসংস্থানের একটি উৎস হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যাদের নিজেদের মধ্যে ঘটতে থাকে অনেক কাজ ভাগ করে নেয়া। পরিবারভিত্তিক শিল্প ইউনিট হিসেবে কুটির শিল্প ভাড়াকৃত শ্রম সামান্যই ব্যবহার করে। তারা ঐতিহ্যগত প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং খুব স্বল্প মাত্রার অর্থলগ্নি করে বিধায় এদেরকে কৃষির অধিকতর কাছাকাছি উৎপাদন ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

যদিও তুলনামূলকভাবে কম স্পষ্ট, তবুও বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যেও তাৎপর্যপূর্ণ বৈপরীত্য ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রমিকপ্রতি যোগকৃত মূল্য বৃহদায়তন শিল্পে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের চেয়ে ২.৩ গুণ বেশি। বিপরীতভাবে, পুঁজিক্ষমতা বৃহদায়তন শিল্পে সর্বোচ্চ, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের তুলনায় পুঁজি-শ্রম অনুপাত সেখানে সাত গুণেরও বেশি। এটা বৃহদায়তন শিল্পের উচ্চতর শ্রমউৎপাদনশীলতার সুবিধাকে নস্যাৎ করে দেয়, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পুঁজিউৎপাদনশীলতা (কিংবা পুঁজি/যোগকৃত মূল্যের অনুপাত)-কে করে তোলে বৃহদায়ন শিল্পের তিন গুণ। পুঁজির প্রতিটি এককপ্রতি সৃষ্ট উদ্বৃত্তও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় প্রায় ৩.৩০ গুণ বেশি।

উচ্চতর পুঁজিউৎপাদনশীলতা এবং বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত এই দু'টি এককেই ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কর্তৃক অধিকতর অর্থনৈতিক দক্ষতা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও ব্যক্তিপুঁজি বৃহদায়তন শিল্পে কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতাই দেখাতে থাকে। তুলনামূলক উপকরণমূল্যের এককেই কেবল বৃহদায়তন শিল্পের অধিকতর আকর্ষণহীনতার আপাতগ্রাহ্য কারণ দেখানো যেতো। ওভারইনভয়েসিং, ইমপোর্ট লাইসেন্সের দুষ্প্রাপ্যতা প্রিমিয়াম, সস্তা ব্যাংক ঋণ ইত্যাদি থেকে যেসব বাড়তি সুযোগ বৃহদায়তন শিল্প ভোগ করতো, তা-ই বৃহৎ শিল্পপতিদের জন্য পুঁজির মূল্যকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের তুলনায় কমিয়ে রাখে। অবশ্য বৃহদায়তন শিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য প্রদত্ত উৎসাহসমূহ মূলত নির্দিষ্ট ছিল তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানী

শিল্পপতিদের জন্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়নের জন্য, পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) শিল্পায়নের জন্য নয়। আমদানি লাইসেন্স বিতরণ, বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি, বিনিয়োগবণ্টন নিয়ন্ত্রণ এবং সরকার গৃহীত অন্যান্য নীতিসমূহও বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পের কাঠামো

সারণি ১.৪ ১৯৬৯-৭০ সালে কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং মূল্য সংযোজনের এককে ২০টি আধুনিক শিল্পের অবদান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পসমূহের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এ সারণিতে দেখা যাবে। সারণির তথ্য থেকে দেখা যায় যে কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং মূল্য যুক্ত হওয়ার একটি বড় কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে অল্প কয়েকটি শিল্পখাতে। এভাবেই টেক্সটাইল (পাট এবং তুলা একত্রে), খাদ্য, তামাক, রসায়ন, কাগজ এবং কাগজজাত সামগ্রী ইত্যাদি শিল্পে ১৯৬৯-৭০ সালে ঘটেছে শিল্পের মোট কর্মসংস্থান এবং মূল্য সংযোজনের ৮৭% এবং উৎপাদনের ৮২% অংশ। যদিও পাট এবং টেক্সটাইলের জন্য পৃথক তথ্য পাওয়া যায় না, টেক্সটাইলের মধ্যে পাটই ছিল বৃহত্তম শিল্প, যা উৎপাদন করেছে প্রায় সবটাই রপ্তানিবাজারের জন্য। যেখানে অনেকগুলো সমীক্ষাতে রপ্তানিমুখিতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের দ্রুত শিল্পায়নের একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য হিসেবে (যেমন, আইবিআরডি, ১৯৭০; এস আর লিউইস, ১৯৭০), পাটই (কাঁচামাল এবং পাটজাত পণ্য দুই-ই) এখানে পালন করেছিল প্রধান ভূমিকা। বাংলাদেশের পাটশিল্পের সাফল্যের চাবিকাঠি নিহিত ছিল এক্সপোর্ট বোনাস স্কীমের ক্রিয়াশীলতার মধ্যে এবং প্রকৃত অর্থে কোন প্রতিযোগিতামূলক ব্যয়কাঠামোর মধ্যে নয় (কিউ. কে. আহমদ, ১৯৭৮)।

পাটের পরে সুতীবস্ত্রই (সুতা এবং বস্ত্র তৈরি) ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম বৃহদায়তন শিল্প, যা প্রাথমিকভাবে অভ্যন্তরীণ চাহিদা অনুযায়ী চালিত এবং এর উৎপাদন ছিল আমাদানিকৃত কাঁচামালভিত্তিক।[১৩] টেক্সটাইলের পরে স্থান খাদ্যশিল্পের, যা শিল্প কর্মসংস্থানের ১৩%, মোট উৎপাদনের ২০% এবং মূল্য সংযোজনের ১৫% যোগান দিচ্ছিল। এর পর ছিল চা-প্রক্রিয়াকার্য, যা ছিল অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় বাজারের অনুবর্তী। এর পর ছিল চিনি এবং ভোজ্য তৈল, যা ছিল মূলত দেশীয় বাজারমুখী। তামাক ছিল পরবর্তী বৃহত্তম বৃহদায়তন শিল্প, যা যোগান দিত মূল্য সংযোজনের ১০.৩% অংশ এবং এর পরেই স্থান ছিল রসায়ন শিল্পের, যা যোগান দিত উৎপাদনের ৯.৩%, মূল্য সংযোজনের ১০.৭% এবং মোট শিল্প কর্মসংস্থানের ৭.৭%। রসায়ন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত ছিল সার, দেশলাই এবং দেশীয় ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য।

১৩. ১৯৪৭-৭৬ সময়কালে বাংলাদেশের বৃহদায়ন সুতাবস্ত্র কলের গুরুত্ব, বিকাশ এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের একটি অত্যন্ত খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের জন্য দেখুন এন. চৌধুরী রচিত গ্রন্থ, ১৯৭৭।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে মূলধনদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল খুবই কম। দেশের একমাত্র ইস্পাত কলটি ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রামে স্থাপিত হয় ১,৫০,০০০ টনের ক্ষুদ্র উৎপাদনক্ষমতা নিয়ে (ভূঁইয়া প্রমুখ, ১৯৯৩)। যন্ত্রপাতি উৎপাদনের মধ্যে ১৯৭২ সালে ঢাকার নিকটে একটি মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। যানবাহন সরঞ্জামের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ক্ষমতা গড়ে তোলা হয়েছিল কিছু ভারী যান, মটর সাইকেল এবং বাইসাইকেল ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে সংযোজনের মাধ্যমে।

শিল্পসামগ্রীর চূড়ান্ত ব্যবহারের বিচারে ১৯৬৯-৭০ সালে বাংলাদেশে আধুনিক শিল্প খাতের কাঠামো বিশেষায়িত ছিল মধ্যবর্তী সামগ্রী (intermediate goods) শিল্পের প্রাধান্য দ্বারা। সারণি ১.৫-এর তথ্য যেমন দেখিয়ে দেয়, মধ্যবর্তী সামগ্রীশিল্পেই ছিল শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের ৭৫%, মোট উৎপাদনের ৫৩% এবং সংযুক্ত মূল্যের ৫৮%। মধ্যবর্তী সামগ্রীশিল্পের মধ্যে প্রধান শিল্প ছিল টেক্সটাইল এবং রসায়ন। ভোগ্যদ্রব্য শিল্প আসে এর পরে এবং শিল্প কর্মসংস্থানের ১৯.৩% অংশ, মোট উৎপাদনের ৩৪.৭% এবং মূল্য সংযোজনের ৩৪.৫% ঘটে এই খাতে। এই ধরনের শিল্পইউনিটসমূহের মধ্যে প্রধান ছিল খাদ্য এবং তামাক। মূলধনদ্রব্য উৎপাদন ছিল ক্ষুদ্রতম ধরন। আলোচ্য সময়ে দেশে যে একটি সংকীর্ণ এবং প্রাক-আধুনিক শিল্পভিত্তি ছিল, ক্ষুদ্র পর্যায়ের মূলধনদ্রব্যের উৎপাদন তারই প্রতিফলন নির্দেশ করে।

সারণি ১.৫ : বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পখাতে কর্মসংস্থান, সংযুক্ত মূল্য এবং মোট উৎপাদনকাঠামো (১৯৬৯-৭০ সালে শতকরা হারে)

	কর্মসংস্থান	মোট উৎপাদন	সংযুক্ত মূল্য
ভোগ্য সামগ্রী	১১.৩	৩৪.৭	৩৪.৫
খাদ্য	২৩.০	২০.৩	১৫.১
তামাক	২.০	১০.৩	১৩.৫
মধ্যবর্তী সামগ্রী	৭৫.০	৫৩.৫	৫৭.৬
টেক্সটাইল	৬৩.৫	৩৮.৩	৪৪.২
রসায়ন	৭.৭	৯.৩	১০.৭
পুঁজি দ্রব্য	৪.৫	৭.৭	৬.০
অন্যান্য	১.২	৪.০	১.৯
মোট :	১০০.	১০০.০	১০০.০

উৎস : সারণি ১.৪ এর অনুরূপ

বৃহদায়তন শিল্পের অর্থনৈতিক দক্ষতা

একটি সীমিত সম্পদের দেশের উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে শিল্পায়নপ্রক্রিয়ায় একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে উৎপাদনগত দক্ষতার মাত্রা এবং সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে প্রবৃদ্ধি কতটা ব্যয়বহুল হচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই দিক থেকে বৃহদায়তন শিল্পসমূহের দক্ষতা অনেকটা হতাশাব্যঞ্জক হয়েছে। অনেকগুলো সমীক্ষা (এ. আর. খান ১৯৭২, কিউ. কে. আহমদ ১৯৭৮, এইচ. জে. ব্রুটন ১৯৬৩, ডব্লিউ. সি. গর্ডন ১৯৭০ এবং বি. বালাসা ১৯৬৫ প্রভৃতি) উপাদানঘনত্ব, উপাদান-উৎপাদনশীলতা এবং বৃহদায়তন শিল্পের মুনাফা অর্জন বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত বৃহদায়তন শিল্পসমূহের উৎপাদনদক্ষতা এবং বাস্তব উপযোগিতা প্রতিফলিত করেছে সম্পদের মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ বণ্টন, যা চালিত হয়েছে অনভিপ্রেত সহায়তাসেবা প্রদান দ্বারা। শিল্পকারখানাসমূহ সর্বদা তুলনামূলক মুখ্য সুবিধার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অনেক বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে উপকরণঘনত্ব ও উপকরণপ্রাপ্তির প্রতি ব্যাপক ব্যবধান লক্ষ্য করা গেছে। যেখানে থাকা উচিত ছিল শ্রমের প্রাচুর্য এবং পুঁজির স্বল্পতা, সেখানে শিল্পগুলো ছিল পুঁজিঘন। অধিকাংশ শিল্প ভুগেছে উৎপাদনক্ষমতার স্বল্প ব্যবহারজনিত সমস্যায় (ডব্লিউ. সি. গর্ডন, ১৯৭০)। উপরন্তু, অধিকাংশ শিল্পের ক্ষেত্রে সামাজিক উপযোগিতা ব্যক্তিগত উপযোগিতা থেকে কেবল নীচুই ছিল না, কখনও কখনও তাদের সম্প্রসারণ যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করার জন্য অত্যধিক নীচু ছিল।

বৃহদায়তন শিল্পগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মতো অদক্ষ উৎপাদনকাঠামো ছিল সম্পূর্ণ অনুপযোগী একটি সহায়ক সেবাকাঠামোর ফলাফল। কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত দেশীয় মূল্যকাঠামো এবং অতিরিক্ত সংরক্ষণের আওতায় শিল্পকারখানাসমূহ অতি মূল্যায়িত মুদ্রা, আমদানি লাইসেন্সিং ব্যবস্থা, ইমপোর্ট বোনাস স্কীম, উচু ট্যারিফ প্রোটেকশন ইত্যাদি সহায়তা বৃহদায়তন শিল্পের জন্য একটি অনুপযোগী পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল।

এভাবেই স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে ব্যাপক সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছিল নানাভাবে ত্রুটিপূর্ণ। শিল্পগুলো বিপুল সংরক্ষণসুবিধা ভোগ করতো, যা বিশ্ববাজারে বিভাজিত মূল্যস্তরের চেয়ে অনেক উপরে আভ্যন্তরীণ দামকে বাড়িয়ে দিত। শিল্পগুলোকে প্রদত্ত বিপুল এবং অসঙ্গতিপূর্ণ সংরক্ষণ একটি বিকৃত মূল্যকাঠামোর জন্ম দিয়েছিল, যার সাথে সামাজিক বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল সম্পদের অগ্রহণযোগ্য খাতওয়ারী বণ্টন। বিভিন্ন সংরক্ষণ এবং সমর্থনব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিপুল ভর্তুকি এবং সংরক্ষণ অত্যন্ত অদক্ষ এবং ব্যয়বহুল শিল্পের জন্যও আকর্ষণীয় মুনাফা নিশ্চিত করেছিল, যাতে করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনক্ষমতার সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে উদ্যোক্তারা খুব শিথিল মনোভাব গ্রহণ করতে পারতো। ফলে, কৃত্রিমভাবে অধিক

অভ্যন্তরীণ দামে জাতীয় উৎপাদনে শিল্পগুলোর অবদান জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারের মাধ্যমে প্রকাশিত হারের তুলনায় কম ছিল। এইভাবে বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতির ফল দাঁড়ায় একটি অদক্ষ শিল্পকাঠামোর উৎপত্তি। অবশ্য, এটা ছিল এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার আরো অনেক দেশের অভিজ্ঞতার অনুরূপ, যারা অত্যধিক সংরক্ষণের ভিত্তিতে আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল অবলম্বন করে।

প্রকৃতপক্ষে, পাকিস্তানের জন্য লিউইস এবং গুইসিঙ্গার হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, কার্যকর সংরক্ষণের এমন মাত্রা কতিপয় শিল্প ভোগ করছিল যে তা ব্যবহৃত উপকরণের মূল্যে কিছুই যোগ করে নি। অন্য কথায়, এই সব শিল্পে (চিনি, ভোজ্য তেল, মোটর যান) মূল্য সংযোজন ছিল ঋণাত্মক (২.৭ সারণি, ভূঁইয়া প্রমুখ, ১৯৯৩)।

যদিও স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের জন্য শিল্পদক্ষতা পরিমাপে সংরক্ষণের কার্যকর হার সম্পর্কিত কোনো প্রায়োগিক সমীক্ষা পাওয়া যায় না, পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক শিল্পখাতের অদক্ষতার অস্তিত্ব প্রকাশিত হয় এ. আর. খান (১৯৭২) কর্তৃক পরিচালিত একটি সমীক্ষায়, যা প্রকৃত মূল্যের ভিত্তিতে করা হয়েছিল। বিভিন্ন শিল্প কর্তৃক অর্জিত সামাজিক ও ব্যক্তিগত মুনাফার তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে সমীক্ষাটি উপসংহার টানে যে বিভিন্ন শিল্পের (সার ব্যতীত) সামাজিক উপযোগিতা তাদের ব্যক্তিগত উপযোগ অর্জনের তুলনায় অনেক কম ছিল। কাতপয় শিল্পের ক্ষেত্রে পরিচালিত ঋণের হিসাব থেকে দেখা যায় যে চিনি, সিগারেট এবং কাগজ শিল্প ঋণাত্মক সামাজিক উপযোগিতার সৃষ্টি করে, অর্থাৎ সমাজের প্রকৃত আয়ে এ সকল শিল্পের অবদান ছিল ঋণাত্মক।

শিল্প প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনে এর প্রভাব

কোনো অর্থনীতির কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের উপর শিল্পায়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হচ্ছে দেশীয় পণ্যের গঠন ও পরিমাণের উপর এর মারাত্মক প্রভাব। সারণি ১.৬-এ উপস্থাপিত তথ্য দেখায় যে, বাংলাদেশে ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৬৯-৭০ সময়কালের মধ্যে জিডিপি-র খাতওয়ারী গঠনে অনেক পরিবর্তন ঘটে। জিডিপি-তে শিল্প-উৎপাদনের অংশ ১৯৪৯-৫০-এ ৩.৯% থেকে ১৯৬৯-৭০-এ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮.৯%-এ। জিডিপি-র খাতওয়ারী অংশ থেকে দেখা যায়, আধুনিক শিল্পখাতের তুলনামূলক প্রবৃদ্ধি মূলত চালিত হয়েছিল বৃহদায়তন শিল্পের সম্প্রসারণ দ্বারা, যা ১৯৪৯-৫০-এর ০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৯-৭০-এ ৬.০%-এ পৌছায়। বিপরীতভাবে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অবদান ১৯৪৯-৫০-এর ৩.৩% থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৬৯-৭০-এ ২.৯%-এ পৌঁছায়। যদিও বৃহদায়তন শিল্পের প্রবৃদ্ধি ছিল নির্মাণ এবং উপযোগ শিল্পের প্রবৃদ্ধির দ্বিগুণ এবং অন্যান্য খাতের প্রবৃদ্ধির ৬/৭ গুণ, জিডিপি-তে আধুনিক শিল্পের মোট অংশকে কোনোভাবেই আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশ কর্তৃক অর্জিত শিল্পের দ্রুত প্রবৃদ্ধির হারের একটি নির্দেশক হিসেবে নেয়া যাবে না।

সারণি ১.৬ : বাংলাদেশে জাতীয় আয় এবং জিডিপি-র খাতওয়ারী বণ্টনে পরিবর্তন (১৯৫৯-৬০-এর দামের এককে)

	১৯৪৯-৫০	১৯৫৪-৫৫	১৯৬০-৬১	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৯-৭০	১৯৪৯-৫০ / ১৯৬৯-৭০ সময়কালে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (%)
জিডিপি (মিলিয়ন রুপী)	১২.২৭৪	১৩.৮১৬	১৫.৩১০	১৮.৭৩৪	২২.৩১৭	৩.০
জিডিপি (মাথাপিছু রুপী)	-	২৯৩২৯০	২৮৭	২৯০	৩১৬	০.৩৮
জিডিপি-র খাতওয়ারী অংশ (%) :						
কৃষি	৬৫.২	৬৩.০	৬২.৬	৫৫.৯	৫৫.৩	২.১
পণ্যোৎপাদন	৩.৯	৪.৭	৬.৪	৮.২	৮.৯	৭.৩
বৃহদায়তন	০.৬	১.৪	৩.০	৫.০	৬.০	১৫.৫
ক্ষুদ্রায়তন	৩.৩	৩.৩	৩.৪	৩.১	২.৯	২.৩
নির্মাণ এবং উপযোগ	৫.৬	৬.৬	৭.৫	১২.২	১২.৮	৭.৩
সেবা	২৫.৩	২৫.৭	২৩.৫	২৩.৭	২৩.০	২.৫
মোট জিডিপি	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস : ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫৪-৫৫-এর জন্য টি. এম. খান এবং এ বার্গানের " মেজারমেন্ট অব স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ ইন দা পাকিস্তান ইকনোমি", পাকিস্তান ডেভেলপমেন্ট রিভিউ, গ্রীষ্ম ১৯৬৬; ১৯৬০-৬১ থেকে ভবিষ্যতের জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ইস্ট পাকিস্তান ইকনোমিক সার্ভে, ১৯৬৯-৭০।

অবশ্য, ১৯৫০ এবং '৬০-এর দশকের শিল্পায়নের প্রভাবে অর্থনীতিতে উৎপাদন-কাঠামোর সামান্য পরিবর্তন ঘটে, যার নির্দেশক ছিল জিডিপি-তে কৃষির হ্রাসপ্রাপ্ত অবদান। যদিও উৎপাদনকাঠামোর অনুরূপ পরিবর্তন সচরাচর মাথাপিছু বৃদ্ধির সঙ্গে একযোগে ঘটে, একই সময়ে মাথাপিছু আয়ে তেমন লক্ষণীয় কোন পরিবর্তন ঘটে নি। এটা নির্দেশ করে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে দু'দশকের শিল্পায়ন অর্থনীতির সামগ্রিক বিকাশে অত্যন্ত প্রান্তিক কিছু প্রভাব ফেলে। সারণিটি থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৫০

থেকে ১৯৭০ এই বিশ বছর সময়কালে মাথাপিছু আয় ২৯৩ রুপী থেকে ৩১৬ রুপীতে দাঁড়ায়। এটা ছিল খুব নিম্ন পর্যায় থেকে ৮% বৃদ্ধি, গড়ে বার্ষিক বৃদ্ধি ০.৪%-এর কম।[১৪] বৃহদায়তন শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির সঙ্গে মাথাপিছু আয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। এই সত্যটি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় যে কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল (এ. আর. খান, ১৯৭২)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৪৯-৫০/১৯৬৯-৭০ সময়কালের এই তিনটি খাত যথাক্রমে ২.১%, ২.৩% এবং ২.৫% হারে বিকাশ লাভ করে একই সময়ে, যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় বার্ষিক ২.৬% হারে।

তথাপি অর্থনীতির কাঠামোর উপর শিল্পায়নের অপর একটি প্রত্যাশিত তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব শ্রমশক্তির পেশাগত কাঠামোয় পরিবর্তনকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। ১৯৫১-১৯৭৪ সময়কালে শ্রমশক্তি গঠনের ক্ষেত্রে সাধিত পরিবর্তনকে আদমশুমারির তথ্যের ভিত্তিতে (১৯৬৯-৭০ সময়ের ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির তথ্যের অনুপস্থিতিতে) বিশ্লেষণ করে ভূঁইয়া উপসংহারে পৌছান যে সমগ্র জনশক্তির ক্ষেত্রে আধুনিক শিল্প খাতের অবদান কমে গিয়ে অথবা অপরিবর্তিত থেকে ১৯৬১-র ৪.৮% রয়ে যায়। এর অর্থ এই যে ১৯৬১-৭৪ সময়কালে বর্ধমান শ্রমশক্তির খুব সামান্য অংশ আধুনিক শিল্পখাত কর্তৃক আত্মীকৃত হয়। যদিও জিডিপি-তে আধুনিক শিল্পখাতের একটি বর্ধমান অবদান, কর্মসংস্থানে অবদানের ক্ষেত্রে স্থবিরাবস্থার বিপরীতে বর্ধমান উৎপাদনশীলতাকেই নির্দেশ করে, মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধিতে এর কোনো তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পড়ে নি।

আয় বণ্টনের দিক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের এবং ইমপোর্ট লাইসেন্সিং-এর ব্যবস্থার ফলে কৃষিখাত থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ চলে যায় শিল্পখাতে এবং শহরে ভোক্তাদের কাছ থেকে নতুন শিল্পপতিদের কাছে, যারা সুযোগমূল্যের অনেক কম দামে বৈদেশিক মুদ্রা হাতে পায়। সুবিধাভোগী নতুন শিল্পপতিরা অত্যন্ত সংরক্ষিত দেশীয় বাজারে তাদের পণ্য বিক্রি করার সুযোগ লাভ করায় অস্বাভাবিক উচ্চ মুনাফা উপার্জনে সক্ষম হয়। এছাড়াও ইমপোর্ট লাইসেন্সিং, উচ্চ ডেপ্রিসিয়েশন এবং কর মওকুফ থেকে নানাবিধ অপ্রত্যাশিত লাভ তো ছিলই।

অতএব, উপসংহারে বলা যেতে পারে, পাকিস্তানের সাথে দু'দশকের অধিক সময়ের অংশীদারিত্বের সময়কালে বাংলাদেশে একটি মৃদু হারের শিল্পায়ন ঘটে, যা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়। আধুনিক শিল্পখাতে অস্থানীয় মালিকানায় শুধু গুটি কয়েক বৃহদায়তন শিল্প গড়ে উঠে, যেগুলো অত্যন্ত উদার সরকারি

---

১৪. প্রশ্নমূলক পদ্ধতি গ্রহণ থেকে সৃষ্ট জিডিপি-র অতিমূল্যায়নের কারণে এমনকি এই সংখ্যাটিকেও অতিরঞ্জিত বিবেচনা করা হয়। এ ব্যাপারে পাঠক ভূঁইয়া প্রমুখের (১৯৯৩) রচনা ব্যবহার করতে পারেন।

পৃষ্ঠাপোষকতা লাভের ফলে একটি বিকৃত মুল্যকাঠামোর জন্ম দেয়। এর ফলে উপকরণ ব্যবহারে মারাত্মক অদক্ষতা এবং সম্পদের অযৌক্তিক বরাদ্দ ঘটে। ফলে আধুনিক শিল্পখাতের প্রকৃত অবদান দৃশ্যমান অবদান থেকে অনেক নীচে থেকে যায়। ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদ্রায়তন এবং কুটির শিল্পসমূহ পর্যাপ্ত সহায়তার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বৈষম্যমূলক সরকারি নীতির অধীনে অবনতি কিংবা স্থবিরতার সম্মুখীন হয়।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে শিল্পসম্পর্ক

শিল্প বিকাশের উপর শ্রম আইন এবং শিল্পসম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। শ্রমিক এবং ব্যবস্থাপনার মধ্যে স্থিতিশীল এবং সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্কের দ্বারা প্রভাবিত সুস্থ শিল্পসম্পর্কে আজকাল শিল্পের অধিক উৎপাদনশীলতা এবং উন্নত শিল্পদক্ষতা বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত বিবেচনা করা হয়। যদিও শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সহযোগিতাই হচ্ছে ফলপ্রসূ শিল্পসম্পর্কের ভিত্তি, বাংলাদেশে শ্রমসম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে ছিল সংঘাতমূলক। শ্রমসম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য সঙ্গত আইনী এবং নীতিগত ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতাপূর্ব এবং পরবর্তী বাংলাদেশে শ্রমসম্পর্ক ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিকদের মধ্যে একটি সহযোগিতার চেতনা বিকশিত করার পক্ষে অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়। শিল্পশান্তি এবং অগ্রগতির পক্ষে নিবর্তনমূলক হওয়া ছাড়াও দেশেব শ্রমসম্পর্কের দৈন্য তার তুলনামূলকভাবে দুর্বল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার জন্য দায়ী হয়েছে বলে মনে করা হয়। প্রবন্ধের এই অংশে আমরা স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে শিল্পসম্পর্ক চর্চার প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে শিল্পসম্পর্কের আইনগত ভিত্তি

বাংলাদেশে শ্রমআইন প্রণয়নের ইতিহাস শুরু হয় বৃটিশ ভারতে। ১৮৮১ সালে জারিকৃত এবং বহু সংশোধনীর পর ভারত সরকার কর্তৃক শেষ পর্যন্ত প্রবর্তিত প্রথম ইন্ডিয়ান ফ্যাক্টরীজ এ্যাক্টের পরে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ শ্রমআইন প্রণীত হয়, যেমন মাইনস এ্যাক্ট, পেমেন্ট অব ওয়েজেস এ্যাক্ট, ওয়ার্কম্যানস কমপেনসেশান এ্যাক্ট, মেটারনিটি বেনিফিটস এ্যাক্ট, এমপ্লয়মেন্ট অব চিলড্রেন এ্যাক্ট, ট্রেড ডিসপিউটস্ এ্যাক্ট ইত্যাদি, যা নিয়োগের শর্তসমূহ বেঁধে দেয়। পাকিস্তান সরকার বৃটিশ ভারতের সকল শ্রমআইন উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ ও প্রবর্তন করে।[১৫] পাকিস্তানের প্রদেশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান সেগুলো উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করে এবং এখানে শ্রম প্রশাসন ও শিল্পসম্পর্ক বিষয়ক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শ্রমআইনগুলো প্রাসঙ্গিক পূর্বতন আইন সংশোধনীর

১৫. বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিবর্তন, সমসাময়িক শিল্পসম্পর্ক ব্যবস্থা ও আচরণ এবং দেশের শিল্প বিকাশের প্রক্রিয়ার উপর তাদের প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন এম. ইউ. আহমেদ (১৯৬৬) রচিত গ্রন্থ।

পর ১৯৬৫ সনে পুনঃপ্রণীত হয়।[১৬] এগুলো ছিল ১৯৬৫ সালের ফ্যাক্টরীজ এ্যাক্ট, ১৯৬৫ সালের এমপ্লয়মেন্ট অব লেবার (স্ট্যান্ডিং অর্ডারস্) এ্যাক্ট, ১৯৬৫ সালের ট্রেড ইউনিয়নস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৫ সালের লেবার ডিসপিউটস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৫ সালের ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট (রেগুলেশন অব এমপ্লয়মেন্ট) এ্যাক্ট। ১৯৬৯ সালে ১৯৬৫ সালের ট্রেড ইউনিয়নস্ এ্যাক্ট এবং লেবার ডিসপিউটস্ এ্যাক্টকে সমন্বিত করে একক একটি আইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ তৈরি করা হয়। শ্রমআইনসমূহের পৃথক বাস্তবায়ন সংস্থা হিসেবে ডিপার্টমেন্ট অব ইন্সপেকশন অব ফ্যাক্টরীজ অ্যান্ড এস্টাব্লিশমেন্টস্ ১৯৭০ সালে গঠিত হয় শ্রম এবং জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে।

১৯৬৯ সালের ১৩ নভেম্বর জারিকৃত শিল্পসম্পর্ক অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯ শিল্পসম্পর্কসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং শিল্পবিরোধ সমাধানের ব্যবস্থা করে। যদিও পরবর্তীকালে বহুবার সংশোধিত হয়, আইআরও, ১৯৬৯ই বাংলাদেশে শিল্পসম্পর্ক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, কারণ এটি নিম্নোক্ত বিষয় সংক্রান্ত সকল আইনকে সংহত করেছিল :

(ক) ট্রেড ইউনিয়ন গঠন;

(খ) নিয়োগকর্তা এবং শ্রমজীবী মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণ; এবং

(গ) তাদের মধ্যে কোনো বিবাদ কিংবা পার্থক্য এড়ানো এবং নিরসন ।

আইআরও, ১৯৬৯-এর ধারাগুলো মোতাবেক শ্রমিক-কর্মচারীরা তাদের স্ব-স্ব ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হতে পারতো। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, নিবন্ধন এবং ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধনবহি সংরক্ষণ, নিবন্ধনসনদ প্রদান এবং বাতিলকরণ, নিয়োগকর্তাদের অন্যায় শ্রম-আচরণ, শ্রমিকদের অন্যায় শ্রম-আচরণ এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত ধারা অর্ডিন্যান্সে রাখা হয়েছিল।

ট্রেড ইউনিয়নকে এবং ট্রেড ইউনিয়নের ফেডারেশনসমূহকে ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধকের নিকট নিবন্ধন করাতে হতো। কোনো শিল্পকারখানায় নিয়োগকৃত শ্রমিকদের কমপক্ষে ৩০% ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হলে এই ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন পাওয়ার যোগ্য। ব্যাঙের ছাতার মতো ট্রেড ইউনিয়ন গজানোকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যেই নিবন্ধনের জন্য এই ন্যূনতম প্রয়োজনের সীমারেখা নির্ধারিত রাখা হয়েছিল।

---

১৬. শ্রমিক শক্তির কর্মকাণ্ড এবং নিয়োগকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করার জন্য স্বাধীনতার সময় প্রযোজ্য সকল আইন এবং অর্ডিন্যান্সকে উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ ঐভাবে পায় ১৯১৯-১৯৭১ সময়কালে অনুমোদিত ২৯টি আই এল ও কনভেনশন, পরবর্তীকালে বাংলাদেশ অনুমোদন করে আরো দু'টি কনভেনশন এবং এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১-এ।

আইআরও, ১৯৬৯-এর আওতাধীন আইনসমূহে শ্রমিকদের জন্য মজুরি, ফ্রিঞ্জ বেনিফিট, চাকুরির অবস্থা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, কল্যাণসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে শিল্পবিরোধ উত্থাপনের সুযোগ রয়েছে। তাদের অভিযোগ প্রচার-প্রকাশের জন্য তারা ধর্মঘটের পথও গ্রহণ করতে পারে।

এ আইনের আওতায় নিয়োগকর্তাদেরও বিশেষ পরিস্থিতিতে লকআউট ঘোষণার অধিকার রয়েছে। আলাপ-আলোচনা, আপোসরফা, সালিশ এবং মামলার মাধ্যমে শিল্পবিরোধ নিষ্পত্তির বিধানও আইআরও, ১৯৬৯-এর আইনসমূহে রয়েছে। এতে শ্রমিকদের পক্ষে শ্রমবিরোধ উত্থাপন এবং আলাপ-আলোচনার জন্য কালেকটিভ বারগেনিং এজেন্ট (সিবিএ)-কেই একমাত্র বৈধ সংস্থা হিসেবে রাখা হয়।

যদিও আইআরও, ১৯৬৯-ই বাংলাদেশে শিল্পসম্পর্কের ব্যাপারে এবং একে নিয়ন্ত্রণের প্রধান আইন হিসেবে ছিল এবং এখনও রয়েছে, কাজের পরিবেশ, কাজের অবস্থা, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ এবং নিয়োগের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শর্তাদি সম্পর্কে শ্রমিকস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ বহু আইন বিভিন্ন সময়ে প্রণীত হয়েছে। ১৯৩১ সালে শ্রম বিষয়ক রয়্যাল কমিশন কর্তৃক তার প্রতিবেদন জমা দেয়ার সময় থেকেই সংসদীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রম বিষয়ক আইন প্রণয়ন শুরু হয়। বৃটিশ ভারত এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান থেকে ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শ্রম আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশে বর্তমানে শ্রমিকদের অধিকার, নিয়োগকর্তার অধিকার এবং দায়িত্ব[১৭] সম্পর্কিত ২৩টি বিষয়ে[১৮] শ্রম আইন রয়েছে। এগুলির আওতায় প্রণীত আইন এবং নিয়ম এখন বাংলাদেশে ৪৬টি আইন এবং অর্ডিন্যান্সে বিধৃত, যেগুলো একত্রে সংগঠিত শিল্পখাতে কর্মচারীদের জীবন ও কাজের শর্ত নির্ধারণ করে।

শ্রমসম্পর্কের জন্য শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় হচ্ছে সমন্বয়কারী সংস্থা, শ্রম বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট অব লেবার) প্রদান করে শ্রমসম্পর্কে সেবা। শ্রমসম্পর্কের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব চারটি শ্রমসম্পর্ক ইনস্টিটিউটের উপর অর্পিত রয়েছে।

বাংলাদেশে শ্রমসম্পর্ক এবং শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সহযোগিতার অবস্থা

অগণিত আইন এবং নিয়ম দ্বারা প্রদত্ত ব্যাপক আইনী সমর্থন সত্ত্বেও বাংলাদেশে শ্রমসম্পর্ক একটি সুষ্ঠু শ্রমসম্পর্কের পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং শ্রমিক, ব্যবস্থাপনা এবং সরকারের মধ্যে একটি সহযোগিতার চেতনা বিকশিত করার পক্ষে অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়েছে। ফলে, দেশের অধিকাংশ বড় শিল্পে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।

---

১৭. এসব আইনকানুন এবং তাদের বিষয় ও পরিধির খুঁটিনাটি পাওয়া যাবে খান রচিত গ্রন্থে (১৯৮১)।

১৮. এগুলো এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শ্রম আইনের ধারাগুলোর খুঁটিনাটি বিষয়ে জানার জন্য দেখুন আই এলও প্রদত্ত তথ্য (১৯৯৫)।

নৈরাজ্যবাদী শিল্পসম্পর্কের জন্য যেসব উপাদানকে কারণ বলে মনে করা হয় সেগুলো হচ্ছে—অতিমাত্রায় বিভক্ত এবং রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন, ব্যবস্থাপনা এবং ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে স্বাস্থ্যকর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিকাশের অন্তরায় আদর্শগত সংঘাত, কালেকটিভ বারগেনিং প্রসেস এবং শিল্পবিরোধ নিষ্পত্তিতে আইনবহির্ভূত সরকারি হস্তক্ষেপ, শ্রমআইনের যথাযথ বাস্তবায়নের অভাব এবং বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির অপর্যাপ্ততা।

খণ্ডীকৃত এবং অতি-রাজনৈতিকীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো

বৃটিশ ভারত থেকে বাংলাদেশ উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করে একটি ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো, যা পূর্ববর্তী একশত বছর বিবর্তিত হয় গণআন্দোলন এবং শ্রমিকবিক্ষোভকে কেন্দ্র করে, যার সাথে সম্পর্ক ছিল রাজনৈতিক দলসমূহের। ১৯৪৭-এর পূর্বেকার স্বাধীনতা সংগ্রাম দেশে ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামোর বিন্যাস নির্ধারণ করে দেয়, যা শিল্পকারখানাসমূহে অত্যন্ত বেশি সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দ্বারা সাধারণভাবে চিহ্নিত।[১৯]

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা এবং সামরিক শাসনসমূহ একটি গঠনমূলক এবং শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামোর বিকাশকে ব্যাহত করে। বাঙালি শ্রমিক এবং তাদের নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সর্বদাই একটি প্রবল অনাস্থা ছিল, কেননা শেষোক্তদের অধিকাংশ ছিল অস্থানীয়। ১৯৭১-এর স্বাধীনতার পরও কারখানা এবং জাতীয় পর্যায়ে শ্রমিকদের মধ্যে বিভক্তির কারণে ট্রেড ইউনিয়নের কোনো গঠনমূলক কাঠামো গড়ে উঠে নি। ফলে, স্বাভাবিক সময়ে শ্রমিকদের কল্যাণ বৃদ্ধিতে ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো থেকে যায় দুর্বল এবং তারা রাজনৈতিক জাগরণের সময়ে বিক্ষোভ, ধর্মঘট এবং অন্যান্য একপেশে কর্মকাণ্ড সংগঠিত করে হয়ে উঠে শক্তিশালী। প্রকৃতপক্ষে বহু সংখ্যক দুর্বল, অত্যন্ত রাজনৈতিকীকৃত এবং তীব্রভাবে দ্বিধাবিভক্ত ইউনিয়নসমূহই হচ্ছে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য অধিকাংশ দক্ষিণ এশীয় দেশে শিল্পসম্পর্ক কাঠামোর একটি ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্য (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ১৯৯৬)।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের রাজনৈতিক সংযোগ (যেমন, স্বাধীনতাপূর্ব সময় থেকেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে "শ্রমিক লীগ"-এর সংযোগ) সামগ্রিক শিল্পসম্পর্ক ব্যবস্থায় টানাপড়েন সৃষ্টি করে এবং শিল্প ও ফ্যাক্টরীতে সুষ্ঠু পরিচালনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বলে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়। রাজনৈতিক পার্থক্যজনিত রাজনৈতিক বিরোধ থেকে উদ্ভূত আন্তঃইউনিয়ন এবং অন্তঃইউনিয়ন বিরোধ, উৎপাদনে বিঘ্ন, ঘন ঘন হরতাল এবং ধর্মঘট ইত্যাদি গভীর শ্রমিকবিশৃঙ্খলা এবং একটি উত্তেজনাকর শ্রমবাজার পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

---

১৯. এই বিষয়গুলোর বিস্তারিত পাওয়া যাবে এম. ইউ. আহমেদ রচিত গ্রন্থে (১৯৯৬)

বিশেষত রাষ্ট্রীয় খাতের শিল্পগুলোতে মজুরি বিষয়ে সরকারি হস্তক্ষেপ নিয়োগকর্তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনাকে অবহেলা করতে শ্রমিকদেরকে উৎসাহিত করে। এটা কারখানা পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিকদের মধ্যে সংলাপকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে এবং অনেক রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিখাতের শিল্পকে ট্রেড ইউনিয়নের চাপের মুখে অবিহিত মজুরি বৃদ্ধির দিকে ঠেলে দেয়।

জনসংখ্যার সাক্ষরতার সামগ্রিক নিম্নহার (৩৮%)-এর ফল হিসেবে গড় বাংলাদেশী শ্রমিকের নিম্নমানের শিক্ষা হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনের রাজনৈতিকীকরণ এবং বিভক্তিকরণের আর একটি কারণ। ট্রেড ইউনিয়নসমূহের অতিরিক্ত রাজনৈতিকীকরণ বিশেষত কারখানা পর্যায়ে শিল্পের ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। শেষ ফল এই দাঁড়ায়, শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক সর্বদা উত্তেজনাপূর্ণ থাকে এবং পরিকল্পনা মাফিক স্বাভাবিক উৎপাদন কর্মসূচি পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আদমজী পাট কলে ইউনিয়নের জঙ্গিপনার ফলে পুনঃপুনঃ উৎপাদন ব্যাহত হওয়া এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

সময়োচিত এবং যথাযথভাবে বিভিন্ন শ্রম আইন কার্যকরকরণের অভাবে শিল্পখাত ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড দ্বারা অহেতুক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারের পরিদর্শনযন্ত্র সর্বদাই শ্রম আইন কার্যকরকরণ এবং একটি কার্যকর শিল্পসম্পর্ক সৃষ্টিতে অপর্যাপ্ত ও দুর্বল প্রমাণিত হয়েছে। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর অভাবে কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের কল্যাণসুবিধাদি সংক্রান্ত আইনী ধারা বাস্তবায়নকে মনিটরিং-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিপার্টমেন্ট অব ফ্যাক্টরীজ এ্যাক্ট এস্টাব্লিশমেন্ট কখনোই কার্যকর এবং যোগ্য হতে পারে নি।

একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্পসম্পর্কযন্ত্রকে রক্ষা ও বিকশিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে কারখানা পর্যায়ে কালেকটিভ বারগেনিং-এর সুষ্ঠু চর্চার উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, উচ্চতর দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য কারখানা পর্যায়ে শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সহযোগিতা সম্ভব যদি বর্ধিত দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতার লাভ কার্যকর কালেকটিভ বারগেনিং ব্যবস্থার চর্চার মাধ্যমে উভয় পক্ষ ন্যায্যভাবে ভাগ করে নেয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সাংগঠনিক দক্ষতা (কারখানা পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার স্বায়ত্তশাসন), আইনগত ব্যবস্থা (সিবিএ প্রতিনিধিদের কার্যকর কাজ নিশ্চিতকরণ) এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত উপাদানের (প্রতিপক্ষীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গি) মতো পূর্বশর্তগুলোর কোনো একটিও বাংলাদেশে ক্রিয়াশীল নেই। কালেকটিভ বারগেনিংকে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিকাশের কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত করার পরিবেশও নেই।

নানা কারণে নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিকপ্রেষণার মাধ্যমে উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আইআরও, ১৯৬৯ প্রদত্ত "অংশগ্রহণ পরিষদ"গুলোও ঠিকভাবে কাজ করে নি। ব্যবস্থাপনা ও

শ্রমিকদের মধ্যে সহযোগিতার চেতনার বিকাশ এবং বৃদ্ধির পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত বাধাসমূহ হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর অতিরিক্ত রাজনৈতিকীকরণ, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সমঝোতার অভাব, সিবিএ-র মাত্রাতিরোক্ত হস্তক্ষেপ, শ্রমিকদের উচ্চহারে নিরক্ষরতা এবং তাদের প্রেষণা ও অঙ্গীকারের অভাব ইত্যাদি।

সর্বশেষে বলা যায় যে, সংঘাতমুখী শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক যেখানে বহু শিল্প-বিরোধে ইন্ধন যোগায়, সেখানে বিরোধ নিরসনের বর্তমান ব্যবস্থাও সন্তোষজনক কিংবা কার্যকর নয়। বিরোধ নিরসন প্রক্রিয়ার বর্তমান পদ্ধতিসমূহ বাংলাদেশে শ্রমিক এবং নিয়োগকারীদের মধ্যে সৌহার্দ্য এবং সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই বিবেচনা করা হয় (আইএলও / বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৩, আহমেদ প্রমুখ, ১৯৯৩ এবং মেহেরুল্লা, ১৯৯৬)। আপোসের মাধ্যমে শিল্পবিরোধ নিরসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রম-আদালতগুলোর অসন্তোষজনক কাজকর্মের পেছনে চিহ্নিত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো জটিল কর্মপদ্ধতি, আপোসব্যবস্থাকারীদের নিম্ন পদমর্যাদা এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে অত্যধিক বিলম্ব।

উপসংহারমূলক মন্তব্য

১৯৪৭-১৯৭১ কালপর্বে পাকিস্তানের সঙ্গে সিকি শতাব্দী ব্যাপী অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের কালে বাংলাদেশ কেবল মৃদু শিল্পোন্নয়ন অর্জন করেছিল। যদিও জিডিপি-তে আধুনিক শিল্পখাতের অবদান ১৯৪৯-৫০ সালের সামান্য ৩.০% থেকে বেড়ে ১৯৬৯-৭০ সালে ৭.৭৮% হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের দুর্বল শিল্পভিত্তি যথেষ্ট প্রশস্ত হয়, সামগ্রিক শিল্পবিকাশের গতি ছিল ধীর এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর আধুনিকায়নধর্মী রূপান্তরে তার প্রভাব ছিল সামান্য।

১৯৬০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প দেশীয়ভাবে প্রাপ্ত কাঁচামাল আহরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্যেই সীমিত ছিল। এই বৃহদায়তন শিল্পগুলো বিকাশলাভ করে অধিকাংশ অবাঙালি মালিকানায় এবং বিপুল সংরক্ষণসুবিধার আকারে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভের মাধ্যমে। ফলে সামাজিক ত্যাগের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি বিকৃত মূল্যকাঠামোর উন্মেষ ঘটে, যা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত বণ্টনের জন্ম দেয়। এতে উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অদক্ষতা সৃষ্টি হয় এবং জাতীয় উৎপাদনে আধুনিক শিল্পখাতের অবদান দৃশ্যমান অবদানের তুলনায় অনেক কমে যায়।

সম্পদের সামান্য বরাদ্দ এবং অপর্যাপ্ত উন্নয়নমূলক সমর্থনসেবা ও উৎসাহ প্রাপ্তির ফলে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প অর্জন করে অতি সামান্য প্রবৃদ্ধি। যদিও ভারতবিভাগের সময়কার প্রাথমিক অবস্থা এবং সম্পদ প্রাপ্তির অবস্থা ছিল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতির পক্ষে, সরকারঅনুসৃত নেতিবাচক নীতির আওতায় এই শিল্পগুলো স্থবিরতায় ভুগতে থাকে।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে শিল্পায়নের নিম্নহার মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির উপর কোনো তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে নি। ১৯৫০-৭০ সময়কালে এ দেশে মাথাপিছু আয় অর্জন করে বার্ষিক ০.৪% প্রবৃদ্ধি, যা জাতীয় অর্থনীতি এবং সাধারণ জনতার জীবনযাত্রার মানের সামগ্রিক বিকাশের উপর সামান্য প্রভাবকেই নির্দেশ করে ।

স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশে বিকশিত আধুনিক শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির হার, উৎপাদনকাঠামো এবং মালিকানাবিন্যাস নিশ্চিতই ছিল পাকিস্তান সরকারের অনুসৃত নীতির ফল। তৎসত্ত্বেও কতগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বিশেষত ১৯৫০-এর দশকে নীতি নির্ধারকদের গৃহীত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়নের ধারা সৃষ্টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আধুনিক শিল্পের কাঠামো এবং তাদের ভৌগোলিক অবস্থান— এ দুই-ই তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল পাকিস্তানের রাজধানী (করাচী) এবং অভিবাসী ব্যবসায়ী ও বণিকদের অবস্থান দ্বারা। এসব ব্যবসায়ী ও বণিক দেশবিভাগের সময়ে ভারত থেকে পাকিস্তানে এসে করাচীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রশাসনিক চরিত্রটিও পালন করে একটি মোক্ষম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, যা পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পোদ্যোক্তাদের সহায়তা করে। পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পোদ্যোক্তাদের পক্ষে বাণিজ্যিক আমদানি বণ্টনের একটি সচেতন পক্ষপাতপূর্ণ নীতি, বিনিয়োগদ্রব্য (capital goods) আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তিতে তাদের অধিকতর সুবিধালাভ এবং প্রাথমিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানে উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার প্রকৃত আয় পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তর ইত্যাদি ছিল পশ্চিম পকিস্তানে আধুনিক শিল্পের দ্রুত বিকাশের উপায়স্বরূপ।

বাংলাদেশ শ্রম সম্পর্কিত আইনকানুনের একটি ব্যাপক কাঠামো উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে, যা তাকে দেয় একটি সুষ্ঠু শিল্পসম্পর্ক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য একটি দৃঢ় আইনগত ভিত্তি। কিন্তু, কর্মচারীদের জীবন ও কাজ এবং নিয়োগকর্তাদের অধিকার নিয়ন্ত্রণের একটি ব্যাপক অস্থায়ী ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শিল্পসম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সংঘাতপূর্ণ। শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা এবং সরকার ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সহযোগিতা এবং সমঝোতার অভাব কারখানা ও জাতীয় উভয় পর্যায়েই কার্যকর দ্বিপক্ষীয় এবং ত্রিপক্ষীয় শিল্পসম্পর্ক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। একটি আগ্রাসী ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো, ট্রেড ইউনিয়নের বহুমাত্রিকতা এবং অতি রাজনৈতিকীকরণ, কালেকটিভ বারগেনিং ব্যবস্থার অকার্যকর পরিচালনা এবং সর্বোপরি শ্রমিক এবং অস্থানীয় নিয়োগকর্তাদের মধ্যে অবিশ্বাসের অনুভূতি ইত্যাদি একটি বৈরী শিল্পসম্পর্ক সৃষ্টি করে। শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার অভাবজনিত বৈরী পরিবেশ রক্ষণশীল ও ভীরু বাঙালি উদ্যোক্তাদের শিল্পে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে অবাঙালি উদ্যোক্তার প্রতি সর্বদাই একটি ক্ষোভের অনুভূতি এবং শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটি সংঘাতময় সম্পর্ক অবাঙালিদের ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ প্রসারের জন্য বাংলাদেশকে আরো প্রকটভাবে অস্থিতিশীল এবং ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

১৭

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

সুনীল কুমার মুনশি*

ভারতে বৃটিশ শাসনের শুরুতে বাংলা প্রদেশের মূলভাগটি গড়ে উঠেছিল বাংলা নামক ভৌগোলিক এলাকাটি নিয়ে, যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত ব-দ্বীপ। বাংলা ব-দ্বীপটি হলো আরো বড় অঞ্চলের অংশ, যার নাম বাংলা অববাহিকা, তার অপর দু'টি অংশ হলো উত্তর বাংলা অববাহিকা ও সিলেট অববাহিকা।

কেবল আয়তন ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যেই নয়, কয়েক হাজার নদী, শাখানদী ও স্রোতস্বী প্রণালীর মধ্যেই নিহিত ছিল প্রকৃতপক্ষে এই বিশাল অঞ্চলটির বৈশিষ্ট্য, যা এই অঞ্চলের পরিবহনব্যবস্থা ও তার বিকাশের ধরন নির্ধারণ করেছে। বাংলা অববাহিকাটি এত সমতল ও নিচু যে কোথাও তা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০ ফুটের (৬ মিটার) বেশি উঁচু নয়। বর্ষার সময় এটি এমন এক ব্যাপক জলাবদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হয় যে, বিভিন্ন মাপের ও আকারের নৌকাকেই বহু বছর ধরে এখানকার একমাত্র সম্ভাব্য পরিবহন হিসেবে ধরা হতো। এই ধরনের অঞ্চলে সবসময়ের উপযোগী রাস্তা ও রেলপথ গড়ে তোলা কেবল সম্ভব ছিল উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে। কারণ জলভাগগুলোর বাধা পেরোনোর জন্য জলভাগের উপর এ বাঁধে রয়েছে সেতু ও কালভার্ট। স্বভাবতই এটি ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল পরিকল্পনা।

অতীতের উত্তরাধিকার

বাংলা অববাহিকার সড়ক ও অভ্যন্তরীণ জলপথ সম্বন্ধে আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরী* (১৫৯৮) গ্রন্থে সর্বপ্রথম নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। ইরফান হাবিব তাঁর

অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, সেন্টার ফর সোশাল সাইন্সেস, কলকাতা।

এই অধ্যায়টি লিখতে আমি প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করেছি আমার রচিত গ্রন্থ *Geography of Transportation in Eastern India under the British Raj*, (Calcutta 1980)-এর উপর।

An Atlas of the Mughal Empire[১] (1982) গ্রন্থে বাংলা অববাহিকাস্থ বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে বিভিন্ন সময়ে নির্মিত উঁচু সড়ক ও বাঁধের যে বিবরণ *আইন-ই-আকবরী*তে রয়েছে, তা এভাবে পুনরুল্লেখ করেন :

১. ক১ ঢাকা থেকে উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে সংগ্রামগড় (নোয়াখালী জেলাধীন ?) পর্যন্ত বিস্তৃত সড়ক। আওরঙ্গজেবের শাসনামলের প্রথমদিকে বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান কর্তৃক এটি নির্মিত হয়।

২. ক১ ভগদ্বার থেকে কুচবিহার পর্যন্ত বিস্তৃত সড়ক, যা মুগল শাসনের বহু পূর্বে প্রাচীনকালে নির্মিত। এটি উত্তর বাংলার কামতাপুর থেকে ভোটমারী, ধাপ, মালং, পীরগঞ্জ ও ভগদ্বার হয়ে ঘোড়াঘাট গিয়ে শেষ হয়েছে।

৩. ক১ রাঙ্গামাটি থেকে কুচবিহার পর্যন্ত বিস্তৃত সড়ক।

শেষ সড়ক দু'টি কুচবিহারের অধিকাংশ অঞ্চল সংযুক্ত করে ২৪ ক্রোশ (সম্ভবত ভুলক্রমে ৬৪ ক্রোশের স্থলে ২৪ ক্রোশ বলা হয়েছে) পরিমাণ বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ও উঁচু বাঁধ ধরে নির্মিত প্রতিরক্ষাদুর্গকে যুক্ত করার দিক বিবেচনায় রেখে তৈরি। হাবিবের মতে, এ সড়ক হচ্ছে দুর্গ এলাকার দুই প্রান্তিক সীমানা ও বাহারবান্দ ও বিটারবান্দের মধ্য দিয়ে নির্মিত বাঁধ, যা প্রতিরক্ষাদুর্গ এলাকাকে অন্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একে একটি সুচিহ্নিত ভৌগোলিক রূপ দিয়েছে। কিন্তু এ দু'টি সড়কের উল্লেখ ছাড়া উল্লিখিত বাঁধের কোন বাস্তব অস্তিত্ব আধুনিক বিবরণীতে পাওয়া যায় না।

আকবরের শাসনামলে যে অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও সামুদ্রিক যোগাযোগব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, হাবিব তাঁর গ্রন্থে তাও তুলে ধরেছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁর বিবরণ অতিশয় সাধারণধর্মী এবং গঙ্গা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রধান প্রবাহপথ ও 'ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গার প্রবাহপথের' বাইরে তিনি নতুন কোন তথ্য সংযোজন করতে পারেন নি।

আইন-ই-আকবরীতে চারটি সমুদ্রবন্দরের উল্লেখ রয়েছে—(১) ঢাকার নিম্নদেশে শ্রীপুর, (২) চট্টগ্রাম, (৩) পতেঙ্গা ও (৪) রামু।

আইন-ই-আকবরী ও অন্যান্য তথ্যসূত্রকে ভিত্তি করে ইরফান হাবিব বিভিন্ন নদীর উপর ৯টি সেতুর কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো মুগল আমলের যোগাযোগব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে আমাদের সাহায্য করবে। এর মধ্যে ছিল : (১) উত্তর রাজমহল সেতু, (২) দক্ষিণ দুগাছী সেতু, (৩) দিনাজপুরের দু'টি প্রস্তরনির্মিত সেতু, (৪) পাগলা সেতু (যা মীর জুমলার সময় ইট দ্বারা নির্মিত), (৫) পাগলা ও ঢাকার মধ্যকার সেতু, (৬) সোনারগাঁর নিকটস্থ সেতু, (৭) শ্রীপুরের পশ্চিমের সেতুদ্বয় (প্রথমটি মীর কাদিমে এবং অপরটি তালতলায় অবস্থিত। উভয়ের তিনটি করে প্রধান ফটক ছিল। মীর কাদিম সেতুটি দৈর্ঘ্যে ছিল ১৭৩ ফুট)।

১. Irfan Habib, *An Atlas of the Mughal Empire*, (Delhi 1982).

আমরা পরবর্তীতে দেখব যে, সে সময়ে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম ছিল জলপথে নানা ধরনের দেশীয় নৌকা এবং সড়ক বা উঁচু বাঁধ কিংবা গ্রামীণ পথে মালামাল বহনকারী পশুচালিত যান এবং মানুষ স্বয়ং নিজে। বিত্তবান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের, বিশেষকরে মহিলাদের যাতায়াতের জন্য মানুষবাহিত পালকি ব্যবহার করা হতো। অবশ্য ঘোড়ার গাড়ির প্রচলনও ছিল। প্রাক-বৃটিশ যুগের এক সড়কযানবাহনশুমারি থেকে যাতায়াতের মাধ্যম সংক্রান্ত উপরোক্ত তথ্যসমূহ পাওয়া যায়।

সেসময়ে এমন বহু সড়ক ছিল, যার উপর দিয়ে কদাচিৎ যানবাহন চলাচল করতো। গুরুত্বপূর্ণ নগরের চতুর্দিক ঘিরে কিছু কিছু স্বল্পদৈর্ঘ্য রাস্তাঘাট ছিল বটে, কিন্তু এগুলোর মধ্যে খুব কম সংখ্যকই পাকা ছিল।

বাংলা অববাহিকায় বৃটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ব্যবহৃত সড়ক এবং খালগুলির প্রথম নির্ভরযোগ্য বিবরণ দেন মেজর জেমস রেনেল।[২] তিনি ছিলেন ১৭৬৭ থেকে ১৭৭৭ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলার জরিপকাজের প্রথম অধিকর্তা (সার্ভেয়র জেনারেল)। তৎকালীন বাংলার সর্বপ্রথম জরিপকাজ সুসম্পন্ন করার কৃতিত্ব রেনেলেরই প্রাপ্য। তিনি এ জরিপশেষে ১২ মাইল স্কেলের মানচিত্র প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে প্রধান প্রধান সড়কগুলি এবং অন্তর্দেশীয় জলপথগুলি দেখিয়ে রেনেল দু'টি পৃথক মানচিত্র প্রস্তুত করেছিলেন। দু'টি মানচিত্রই বাংলা অববাহিকায় প্রাক-বৃটিশ পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

হিন্দুস্থানের এই মানচিত্রে রেনেল কলকাতাকে কেন্দ্র করে এর সঙ্গে দূরবর্তী অঞ্চলগুলির সংযোগ সৃষ্টিকারী প্রধান ৬টি স্থলপথের উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে ২টি স্থলপথ আজকের বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম পথটি মুর্শিদাবাদ থেকে উত্তরাঞ্চলে সমতলভূমির উপর দিয়ে রাজশাহী হয়ে পদ্মা নদী অতিক্রম করে গেছে। দ্বিতীয় পথটি গেছে বাংলা ব-দ্বীপের দক্ষিণ অঞ্চল অতিক্রম করে ঢাকা ও সিলেটে। অসংখ্য নদী ও খাল অতিক্রম করায় এটিই ছিল সবচেয়ে দুরতিক্রম্য স্থলপথ। রেনেলের হিসাবে কলকাতা থেকে ঢাকার সঠিক দূরত্ব ১৭৭ মাইল, আর চট্টগ্রামের দূরত্ব ৩১৭ মাইল। কিন্তু এসব পথের অধিকাংশই ছিল উন্নত ধরনের পায়ে চলার রাস্তা মাত্র, যা কেবল শুষ্ক আবহাওয়ার দিনগুলোতেই ব্যবহার করা যেতো। ফ্রানসিস বুকানন[৩] উল্লেখ করেছেন, বর্ষার সময় রাস্তাগুলি এমন খারাপ হয়ে যেতো যে পিঠে বোঝা নিয়ে গরু-ঘোড়া পর্যন্ত তা দিয়ে চলতে পারতো না, ফলে অভ্যন্তরীণ সমস্ত বাণিজ্যই বন্ধ হয়ে যেতো।

২. James Rennell, *Memoir of a Map of Hindoostan or the Moghul Empire*, (London 1788) It was a supplement to his *Bengal Atlas* (1781).

৩. Francis Buchanan, *An Account of the Districts of Bihar and Patna in 1811-12*, Book III, (Patna 1928), 705.

উনিশ শতকের মধ্যভাগে সড়কের অবস্থা সম্পর্কে মিলিটারি বোর্ড[৪] বলে যে, ঢাকা ও বাউলিয়ার মধ্যে এমন এক মাইল সড়কও পাওয়া যাবে না, যাকে পাকা বলা যায়।

ইংরেজ রাজত্বের পূর্বকালে সড়কের অবস্থা ও এজন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়ননীতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৯০৮ সালে *ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার* লিখছে :

> ১৮৩৯-এ দিল্লীর সঙ্গে কলকাতার সংযোগ ঘটাতে যখন চক্রযান-উপযোগী বাঁধানো রাস্তা নির্মাণের কঠিন উদ্যোগ নেয়া হয়, তখন ভারতে বলা যায় তেমন কোন আধুনিক সড়কই ছিল না। পূর্ব ভারত ছাড়া বিভিন্ন এলাকার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে সমভূমিপ্রধান ভারতে তেমন কোন প্রতিবন্ধকতাই ছিল না। এমনকি সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও ভারতীয় সেনারা রাস্তা ছাড়াই ও খুব একটা কষ্ট না করেও কার্য সম্পাদন করতে শিখেছিল।[৫]

তবে, স্যার জি. চেসনে তাঁর *ইন্ডিয়ান পলিটিতে* লিখেছেন :

> রাস্তাহীন একটি দেশের অবস্থা অনুযায়ী সমগ্র সামরিক পরিবহন ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় শান্তিকালীন মামুলি প্রয়োজনের সঙ্গে যুদ্ধের পরিস্থিতির তেমন বাস্তব পার্থক্য ছিল না। সমস্ত আনুষঙ্গিক সামরিক ব্যবস্থাপনাগুলি সেইদিকে দৃষ্টি রেখে করা হতো যাতে সেনাবাহিনীকে দেশের যেকোন দিক অতিক্রম করতে প্রস্তুত রাখা যায়। তাছাড়া প্রায় কোন অবকাশ ছাড়াই বাহিনীগুলিকে এক ঘাঁটি থেকে অন্য ঘাঁটিতে বদলি করা হতো আর তাদেরও এই কাজ করতে হতো যুদ্ধ চালানোর মতো সমান কষ্ট করেই।[৬]

সড়ক চলাচলোপযোগী রাখা ও সড়কে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা কিন্তু মুগলদের মতো বৃটিশদেরও চোখ এড়ায় নি। কোম্পানিশাসনের গোড়ার দিনগুলিতে সড়ক উন্নয়নের বিষয়টি শুরু হয় প্রধানত সামরিক বাহিনীর চলাচল ও ডাকব্যবস্থার স্বার্থে। চক্রযান চলাচলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল একমাত্র গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড পুনর্নির্মাণ ও মেরামত করার পরে। বাংলায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে সড়কনির্মাণ ও তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয় জমিদারদের উপর ১৮২২ সালের সপ্তম ও ১৮৩৩ সালের নবম রেগুলেশন অনুযায়ী। সড়কনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় খরচের তহবিল গড়ার জন্য প্রতিটি জমিদারির সম্পত্তির উপর এক শতাংশ হারে কর ধার্য করা হয়। দেশের প্রতিটি প্রেসিডেন্সি এলাকার জন্য ১টি করে প্রধান সড়ক নির্মিত হয়, যেগুলি ছিল মিলিটারি বোর্ডের অধীনে।

আগেই বলা হয়েছে যে, পূর্ব ভারতের, বিশেষকরে বাংলা অববাহিকার পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। এই অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বঙ্গ-অববাহিকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নদীগুলিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মুগলশাসনের শেষভাগে যখন

---

৪. *Note* from the Military Board to Hon'ble J. A. Dorin, Deputy Governor General of Bengal, 1854

৫. *Imperial Gazetteer of India*, 1908, Vol. III, 402.

৬. ঐ।

ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা এই অঞ্চলে আসতে শুরু করলো, তখন নদীগুলি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। সতেরো, আঠারো ও উনিশ শতকে এই অঞ্চলের নদীতীরবর্তী অঞ্চল বরাবর বাণিজ্য উন্নয়ন এখানকার অন্তর্দেশীয় জলপথের উন্নতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল।

পদ্মাই ছিল প্রাথমিক যোগসূত্র—পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মধ্যে ও পশ্চিমে গঙ্গার সঙ্গে। রেলপথ নির্মিত হওয়ার আগে এটিই ছিল ঢাকা, পাটনা ও কলকাতার মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম, যা বাণিজ্যিক পণ্যপরিবহনে ব্যবহৃত হতো। আঠারো শতকের শেষে একেবারে সন্ন্যাসিকাটা পর্যন্ত মহানন্দাকে সাংবাৎসরিক নৌ-চলাচলের প্রধান ব্যবস্থা বলে রেনেল দেখিয়েছিলেন। এর অল্পকাল পরেই এই নদীটি সম্পর্কে বুকানন তাঁর বিবরণে বলেছেন যে, বাণিজ্যের বিবেচনায় নদীটি সেই সময়ে জাতীয় মর্যাদার অধিকারী ছিল।

উত্তরবঙ্গের সুরমা উপত্যকা, উত্তর কাছাড়ের পাহাড়ী এলাকা ও চট্টগ্রামে যোগাযোগের জন্য রেলপথ নির্মাণের আগে ব্রহ্মপুত্র নদীই উত্তর-পূর্ব ও অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল। চা ও পাটশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাতীয় পথের মর্যাদা পেলো।

জলধারণক্ষমতার দিক থেকে মেঘনা ছোট ছিল বটে, কিন্তু বর্ষার সময় এ নদী যে পরিমাণ জল ছাড়তো তা গঙ্গার প্রায় ১৫-২০ শতাংশ। মারকুলি পর্যন্ত মেঘনার জোয়ার-ভাটা প্রবাহিত হতো।

জলপথে মাল চলাচলের দিক থেকে মেঘনা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উনিশ শতকের শুরুর দিকে এটিই ছিল ত্রিপুরা পর্যন্ত একমাত্র জলপথ, যেখান দিয়ে সারা বছর ধরে ১০০ মণ পণ্যপরিবহনে সক্ষম নৌকা চলতে পারতো। মেঘনার শাখানদীগুলির মধ্যে সুরমা ও কুশিয়ারা জলপথের দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গোমতি, ডাকাতিয়া ও তিতাসের উপর দিয়েও অনেক দূর পর্যন্ত একশ' মণ ভারবাহী নৌযান চলতে পারতো। বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী সেদিক থেকে ছোট শাখানদী ছিল, যে দু'টি ঢাকা জেলার সন্নিকটে মেঘনায় মিশেছে। কিন্তু ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের নদীতীরবর্তী এলাকার বাণিজ্যিক গুরুত্বের কারণে এই শাখানদী দু'টির গুরুত্ব ছিল ঐ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি।

পদ্মার শাখানদীগুলি বয়ে গেছে পদ্মা-মেঘনা ও ভাগীরথী-হুগলীর মধ্যবর্তী বিশাল ত্রিকোণাকার অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের অন্তর্দেশীয় জলপথে এই অঞ্চলটি স্বর্গ হিসেবে গণ্য হয়।

বাংলার অন্তর্দেশীয় জলপথের বিবরণে কলকাতার সঙ্গে ঢাকা, দিনাজপুর ও রংপুরের সংযোগস্থাপনকারী ৮টি পথের উল্লেখ করেছেন রেনেল। এগুলি হলো জলঙ্গী,

সুন্দরবনাঞ্চল, বেলেঘাটা ও চিচুন্দি খাড়িগুলি দিয়ে ঢাকা অভিমুখী পথ ও ট্যাঙ্গন, পুনর্ভবা ও জাফরগঞ্জ দিয়ে দিনাজপুর অভিমুখী পথ। রংপুরের ক্ষেত্রে শুকনো ও বর্ষার মওসুমে দু'টি পথকে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হতো।

রেনেল উল্লেখ করেছেন যে, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তাদের শাখানদীগুলির জলপথ দিয়ে প্রায় ৩০ হাজার মাঝির কর্মসংস্থান গড়ে উঠেছিল। এই পথে বছরে ২০ লক্ষ পাউন্ড স্টারলিং মূল্যের বাণিজ্যিক পণ্যের আমদানি-রপ্তানি চলতো। লবণ ও বিপুল পরিমাণ খাদ্যই ছিল বাণিজ্যের প্রধান উপাদান। কিন্তু অভ্যন্তরীণ জলপথ দিয়ে পরিবহন অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কলকাতা থেকে নৌকায় ঢাকা পৌঁছুতে পুরো মাস লেগে যেতো।

১৭৯২ সালে প্রকাশিত রেনেলের *নেভিগেশন অব বেঙ্গল* মানচিত্রে বলা হয়েছে : ঠিক ব-দ্বীপ এলাকা দিয়ে নৌ-চলাচলের প্রধান পথগুলির মধ্যে ছিল বনগাঁর ভাটিতে ইছামতি, কোটচাঁদপুরের ভাটিতে কাবাডাক, মুরলির ভাটিতে ভৈরব, নলডাঙ্গার ভাটিতে চিত্রা, মাগুরা এবং মধুমতির মধ্যকার নবগঙ্গা, চন্দনা-মধুমতি-বালেশ্বর-হরিণঘাটার সমুদ্র পর্যন্ত পুরো দৈর্ঘ্য, আড়িয়াল খাঁ, বরিশাল, গলাচিপা ও নলছিটি। এই এলাকায় প্রতিটি নদী সব মওসুমে ব-দ্বীপের উজানের অংশের সঙ্গে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশের সুন্দর যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব করেছিল।

আঠারো শতকের পরে ব-দ্বীপের দক্ষিণ অংশে নদীগুলির মধ্যে সংযোগ থাকার ফলে সেখানে একটি প্রকৃত অর্থে জলপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। সারা বছরের বাণিজ্যিক কাজকর্ম প্রধানত উত্তর-দক্ষিণ অভিমুখী ছিল। দক্ষিণমুখী বাণিজ্যপথ সুন্দরবনে আসার পর পূর্বদিকে বাঁক নিয়ে বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রাম অভিমুখে, নতুবা পশ্চিমে কলকাতা অভিমুখে যেতো। পূর্ব-পশ্চিমে বাণিজ্য দু'টি সমান্তরাল পথে হতো—একটি ছিল ভিতর দিকে, অপরটি বাইরের দিকে।

সুন্দরবনে নদী দিয়ে নৌ-চলাচল সবসময়েই ছিল যেমন কষ্টসাধ্য তেমন দুঃসাহসিক ব্যাপার, বিশেষকরে জঙ্গলের জন্য। একদিকে যেমন বন্যজন্তুর উপদ্রব ছিল, তেমনি ছিল না কোন আশ্রয়স্থল এবং প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল জলস্রোত।

কর্ণফুলী লুসাই পাহাড় থেকে এসে দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এই পথে এর বাম তীর বরাবর ৫টি ও ডানদিকেও ৫টি শাখানদী যুক্ত হয়েছে। কিন্তু কর্ণফুলীর খাড়া ঢালের দরুন রেনেল কখনো একে অন্তর্দেশীয় জলপথের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসেবে গণ্য করেন নি। তবে হান্টার লিখেছেন যে, উৎপত্তিস্থল থেকে একশ' মাইল দূরে রাঙ্গামাটির উজানে কাসালঙ পর্যন্ত এই নদীটি জলপথের উপযোগী ছিল। এই দূরত্ব পর্যন্ত মোটামুটি বছরের সব সময়ই ৪ টনী দেশী নৌকা যাতায়াত করতে পারতো। আর কাসালঙ ছাড়িয়ে আরো ২০ মাইল পর্যন্ত এ নদীতে ছোট ছোট নৌযান চলতো।

বৃটিশ রাজ আমলে সড়ক

বৃটিশ রাজত্বকালের প্রথম কয়েক বছর পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সরকারি ব্যয় মূলত প্রধান সড়কপথগুলির জন্যই করা হতো সম্ভবত এই কারণে যে, পূর্ব ভারতে তখনো বাণিজ্যিক পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলপথ বা বাষ্পচালিত নৌযান চলাচলের তেমন প্রসার ঘটে নি। তার উপর রেলপথ ও বাষ্পচালিত নৌ-চলাচলের উপযোগী জলপথের উন্নয়নে সরকার বেসরকারি অর্থসংস্থানের উপরই প্রধানত নির্ভর করতো। গোড়ার দিকে এ দু'টি উন্নয়নকাজই সাধারণ সড়কনির্মাণের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়বহুল ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৬৭-৬৮ সালের রিপোর্টে[৭] উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৃটিশ রাজের খরচের বড় অংশই ব্যয়িত হয়েছে দীর্ঘ সড়কপথগুলির জন্য।

১৮৬০-৬১ সালের বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রশাসন সংক্রান্ত বার্ষিক রিপোর্টে[৮] পূর্বাঞ্চলীয় বাংলার রেলপথের সংযোগ-সড়কগুলি সম্পর্কে জানা যায়। নীচে সেগুলির তালিকা দেয়া হলো :

সারণি ১ : পূর্বাঞ্চলীয় বাংলার রেলপথের বিবরণ

	যেখান থেকে	যেখান পর্যন্ত	দৈর্ঘ্য (মাইলে)
১.	কৃষ্ণনগর	বগুলা স্টেশন	১১
২.	শান্তিপুর	রানাঘাট স্টেশন	১১
৩.	কামারখালি	কুষ্টিয়া স্টেশন	১৩
৪.	যশোর	বগুলা স্টেশন	৪০
৫.	বনগাঁ	হামিদপুর (চাকদা স্টেশনের কাছে)	২০
৬.	ফরিদপুর	কোটচাঁদপুর স্টেশন	৭০
৭.	কোটচাঁদপুর	কিষেণগঞ্জ স্টেশন	২৩
৮.	বাউলিয়া ফেরী	জিয়াগঞ্জ স্টেশন	২৪
৯.	বহরমপুর	আলমডাঙ্গা স্টেশন	৫৫
১০.	ঈশাপুর	বাজার খাল স্টেশন	৮
১১.	ঝিনাইদহ	চুয়াডাঙ্গা স্টেশন	২৩$\frac{১}{২}$
১২.	গোরাকালা ঘাট	আলমডাঙ্গা স্টেশন	৩১
	সর্বমোট		৩২৯$\frac{১}{২}$

৭. *Annual Report on the Administration of Bengal Presidency, 1867-68*, Government of Bengal, Revenue Department, Calcutta.

৮. *Annual Report, 1860-61*

১৮৭০-৭১ সালের রিপোর্টের[৯] অন্তর্ভুক্ত মানচিত্রে পূর্ব ভারতে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক দেখানো হয়েছে। সেগুলি সম্পূর্ণ বাঁধানো ছিল না। প্রতিটির উৎপত্তি প্রধানত কলকাতা থেকে ও প্রতিটি সড়ক অন্তত আধ ডজন করে সাবেকি সড়ককে নিজের সঙ্গে যুক্ত করেছিল।

পূর্ব ভারতের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের মধ্যে তিনটির উপর বাংলাদেশের সড়কগুলির উন্নয়ন নির্ভরশীল ছিল। সেগুলি হলো : (ক) দার্জিলিং ট্রাঙ্ক রোড, যা কলকাতা ও দার্জিলিংকে বহরমপুর, ভগবানগোলা, গোদাগরি, দিনাজপুর এবং শিলিগুড়ি অঞ্চলের মাধ্যমে যুক্ত করেছে; (খ) যশোর রোড, যা কলকাতা থেকে বনগাঁ ও যশোর দিয়ে ফরিদপুর গেছে; (গ) চট্টগ্রাম ট্রাঙ্ক রোড, এটি দাউদকান্দি, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামকে সংযুক্ত করেছে, যার দৈর্ঘ্য ২৪ মাইল। বাঁধানো না হলেও এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ছিল। এই তিনটি ট্রাঙ্ক রোডের পাশাপাশি আরেকটি উল্লেখযোগ্য রাস্তা ছিল, যেটি দার্জিলিং ট্রাঙ্ক রোড থেকে দিনাজপুর দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী পর্যন্ত গেছে।
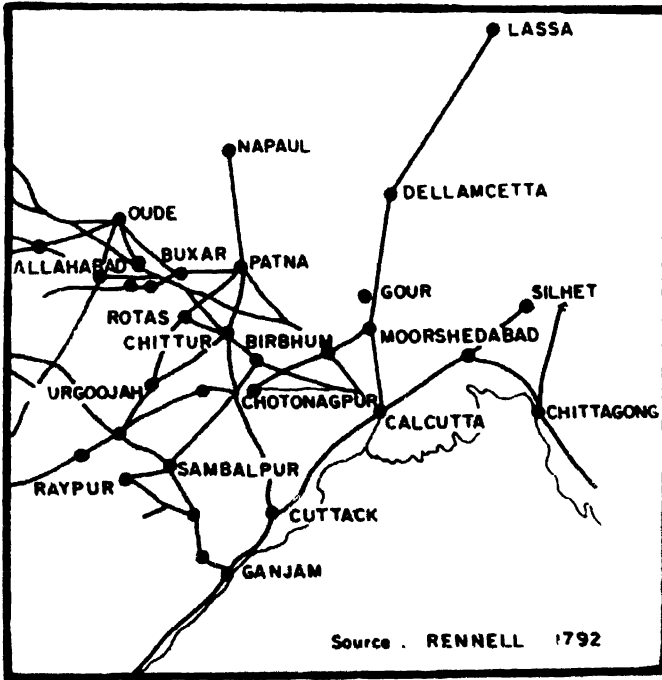
চিত্র ১ : পূর্বভারতের সড়কসমূহ

৯. *Annual Report, 1870-71.*

১৮৮০-৮১ সাল নাগাদ সড়ক সংক্রান্ত নীতিমালার ক্ষেত্রে সরকার যে চিন্তাভাবনা করেছে তা স্পষ্ট হলো। ক্রমাগত কৃষক ও আদিবাসী বিদ্রোহের ফলে ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছে দুর্গম অঞ্চলগুলিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংহত করে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব এই প্রথম অনুভূত হতে লাগলো।

১৯০০ সাল নাগাদ বাংলার পাবলিক কর্তৃপক্ষ যেসব সড়ক সংরক্ষণ করতো তাতে রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের সড়কের দৈর্ঘ্য নিম্নরূপ :

সারণি ২ : বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষণকৃত সড়কসমূহের দৈর্ঘ্য

বিভাগ	পূর্তবিভাগের বাঁধানো রাস্তার দৈর্ঘ্য (মাইলে)	পূর্তবিভাগের অ-বাঁধানো রাস্তার দৈর্ঘ্য (মাইলে)	আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের দেয়া বাঁধানো রাস্তার দৈর্ঘ্য (মাইলে)	আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের অ- বাঁধানো রাস্তার দৈর্ঘ্য (মাইলে)	মোট বাঁধানো রাস্তা (মাইলে)	মোট অ-বাঁধানো রাস্তা (মাইলে)
রাজশাহী	১৫১ ১/২	২২২	১৩৩ ১/৮	৪,৮০৩ ৩/৪	২৮৪ ৫/৮	৫,০২৫ ১/৪
ঢাকা	-	-	৬০ ১/৪	১,৩৯৫ ৩/৮	৬০ ১/৪	১,৩৯৫ ৩/৪
চট্টগ্রাম	-	-	১৫	১,৩৬১ ১/৪	১৫	১,৩৬১ ১/৪
প্রেসিডেন্সি	১৪ ৫/১২	-	৫২০ ১/৮	৪,৫১৫ ৩/৪	৫৩৪ ১৩/২৪	৪,৫১৫ ১/৪

সূত্র : *বাৎসরিক প্রতিবেদন*, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি প্রশাসন, ১৯০০-০১।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সব আবহাওয়ার উপযোগী নতুন সড়ক নির্মাণ এবং অন্য সড়কগুলো বাঁধানোর কাজ বিঘ্নিত করেছিল। নির্মাণসামগ্রী বহনের উপযোগী রেল ওয়াগনের যোগান হ্রাস পেয়েছিল। এছাড়া, ইংল্যান্ড থেকে আসা বিপুল পরিমাণ স্টিল জয়েন্টগুলির যোগানও যুদ্ধের ফলে আটকা পড়েছিল। অবশ্য, কিছু প্রধান সড়ক বাঁধানোর এবং চওড়া করার কাজ চলেছিল মন্থরগতিতে। যেমন কলকাতা-যশোর রোড ও চট্টগ্রাম জেলার ট্রাঙ্ক রোড।

বাংলা সরকার তার স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সচিবের মাধ্যমে ১৯৩৪ সালের ২৬ এপ্রিল বিভাগীয় কমিশনারদের কাছে, জেলা সদরসমূহে, বাংলার রেল প্রশাসন ও অন্যান্য দপ্তরে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছিল। তাতে এ. জে. কিংকে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করা হয় ও তাঁকে একটি সড়ক সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রস্তাব করার নির্দেশ দেয়া হয়। ঐ নির্দেশনামায় বলা হয়, "এপর্যন্ত নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অর্থের

যোগান দেয়ার সম্ভাবনা ছিল না বলে এই প্রদেশে সড়ক উন্নয়নের নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয় নি।" এ পরিপ্রেক্ষিতে সড়কনির্মাণের সময় যাতে জল জমে না যায় সেজন্য জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় মনে রেখে যেন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় এবং যে যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে তার সম্ভাবনার বিষয়টি যেন বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করা হয়। এমনভাবে সড়কগুলি নির্মাণ ও উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হয় যাতে সেগুলি ইতিমধ্যে গড়ে উঠা পাকা বা প্রধান সড়ক, স্টেশন, নগর ও গুরুত্বপূর্ণ বাজার বা হাটে গিয়ে মেশা শাখাপথ হয়ে উঠে। রেলপথের সঙ্গে প্রতিযোগিতা যতোদূর সম্ভব পরিহার করতে বলা হয়।
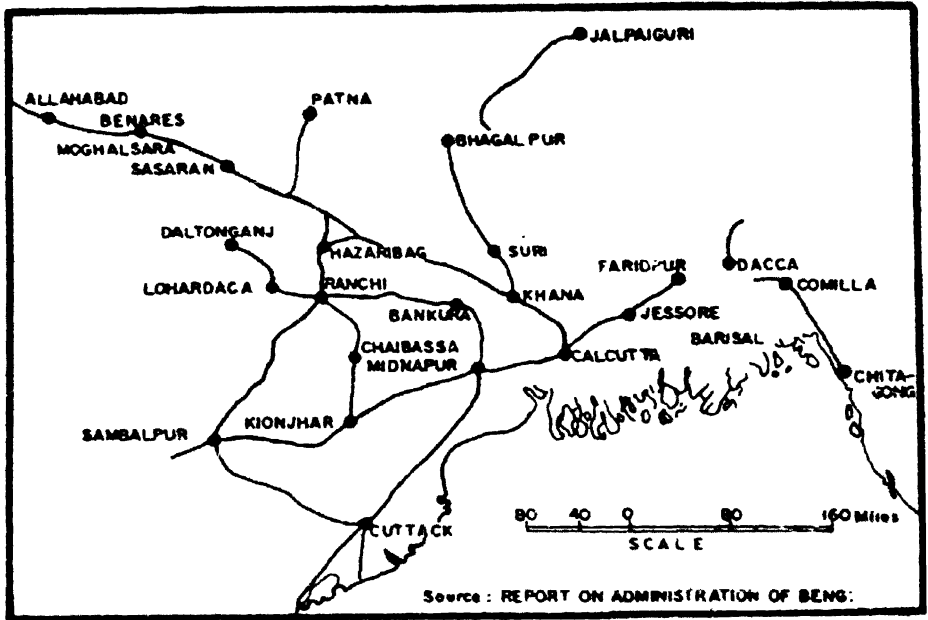
চিত্র ২ : পূর্বভারতের সড়কসমূহ, ১৯০০ সন

বাংলা সরকারের কাছে এ. জে. কিং-এর পেশকৃত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের বিশদ রিপোর্টটি[১০] ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। তাতে বাংলা সম্পর্কে বলা হয়, "বলা যেতে পারে যে, দেশের প্রতি ২ মাইলের জন্য পাকা বা কাঁচা যাই হোক না কেন, রাস্তা আছে।" কাজেই সেদিক থেকে একথাও বলা যেতে পারে যে, বাংলা অববাহিকায় রাস্তার প্রয়োজন ভালোই মিটেছে। কিন্তু রিপোর্টে এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে যে, এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ উক্ত সড়কগুলির অধিকাংশই কেবল যাতায়াত বা পরিবহনের অনুপযুক্ত ছিল না, দেশী দু'চাকার গাড়ি দিয়েও সারা বছর এতে চলাচলে অসুবিধা হতো। সড়কগুলির এই করুণ অবস্থার ৪টি কারণ হলো: (ক) যে মাটি দিয়ে সড়কগুলি নির্মিত হয়েছিল তা অনুপযুক্ত ছিল, (খ) সংযোগবিহীন বড় বড় বিচ্ছিন্ন অংশ ছিল (বিভিন্ন জেলায় ৬৫০টি স্থান এরকম ছিল), যেসব স্থানে পারাপার করার প্রয়োজন হতো, (গ) বর্ষার সময়ে রাস্তার নিম্নাংশগুলি প্লাবিত হয়ে যেতো, (গ) রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে উপেক্ষা প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছিল।

অন্তর্দেশীয় নৌ-চলাচলব্যবস্থা

বাংলা ব-দ্বীপের নদীপথে স্টিমার চলাচল শুরু হয় বৃটিশ নৌবিভাগের প্রাক্তন অফিসার জেমস জনস্টনের উদ্যোগে। ১৮২৫ সালে তিনি ইংল্যান্ড থেকে 'এন্টারপ্রাইজ'কে নিয়ে এসেছিলেন। ১৮২৯ সালে বাংলার নদীপথে মেরিন বোর্ড চালিত সকল স্টিমারের অস্থায়ী কমান্ডার নিযুক্ত হন জনস্টন। ১৮৩০ সালে তাঁকে ভারতীয় নদীপথে চলাচলের উপযুক্ত স্টিমারের নকশা প্রণয়নের পরামর্শদানের জন্য দেশে পাঠানো হয়। কিন্তু জনস্টনের আগেও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে গঙ্গার উপর দিয়ে বাষ্পচালিত নৌযান চলাচলের উদাহরণ আছে। তবে এগুলোর অধিকাংশই পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হতো।

গঙ্গার উপর দিয়ে নিয়মিত স্টিমার চলাচল শুরু হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এবং সেটি ১৮৩৪ সালের আগে নয়। তখন স্টিমারের সংখ্যা খুবই কম ছিল এবং দীর্ঘ সময় অন্তর এগুলো যাতায়াত করতো, যার ফলে ভাড়াও ছিল বেশি এবং বুকিং পাওয়াও অনিশ্চিত ছিল। এগুলি প্রধানত একমাস অন্তর যাতায়াত করতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের বহন এবং কলকাতা ও দেশের অনেক ভিতরে পণ্যপরিবহনের কাজেই এগুলি ব্যবহৃত হতো।

দি ইন্ডিয়ান জেনারেল স্টিম নেভিগেশন (আই. জি. এস. এন.) কোম্পানি নামে একটি বৃটিশ ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানির কাজ শুরু হয় ১৮৪৪ সালে। আরো অনেকে এই ধরনের উদ্যোগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। ফলে ১৮৬০-এর মধ্যে বাংলা অববাহিকায় নৌ-পরিবহনের ক্ষেত্রে আরো ৫টি প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি গড়ে উঠে।

আলফ্রেড ব্রেম[১১] উল্লেখ করেছেন ১৮৫৭ সালে ভারতীয় বিদ্রোহের সময় এই নবগঠিত স্টিমার চলাচল ব্যবস্থা কিভাবে শাসকদের কাছে অতি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল।

১০. A. J. King, *Comprehensive Report on Road Development Projects in Bengal,* Vol. I, Government of Bengal, (Calcutta 1938), 85.

১১. Alfred Brame, *Indian General Navigation and Railway Company Limited Bengal, Assam, Bihar and Orissa,* compiled by Playne and Wright, (London 1917).

অন্তর্দেশীয় বাষ্পচালিত নৌযান চলাচলের ক্ষেত্রে এই বিস্ময়কর সাফল্যের পর্বটি অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। যোগাযোগের ব্যবস্থা হিসেবে এই অন্তর্দেশীয় নৌ-চলাচলের একচেটিয়া অবস্থার পরিবর্তনের একাধিক কারণ রয়েছে। দ্রুততর এবং আরো নির্ভরযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে ১৮৬০ সাল নাগাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে বহু সেচপ্রকল্প শুরু হওয়ার ফলে গঙ্গার উজানের দিকের অঞ্চলে নৌ-চলাচল ব্যবস্থা হ্রাস পেতে লাগলো এবং নদীখাতের ক্রমাগত পরিবর্তন হওয়ার কারণে প্রণালীগুলির রক্ষণাবেক্ষণ উপেক্ষিত হতে থাকলো।

এই সবকিছুর ফলে আই. জি. এস. এন. কোম্পানিকে ১৮৬৮-৭০ সময়কালে তার একাধিক জাহাজকে বসিয়ে দিতে হলো।
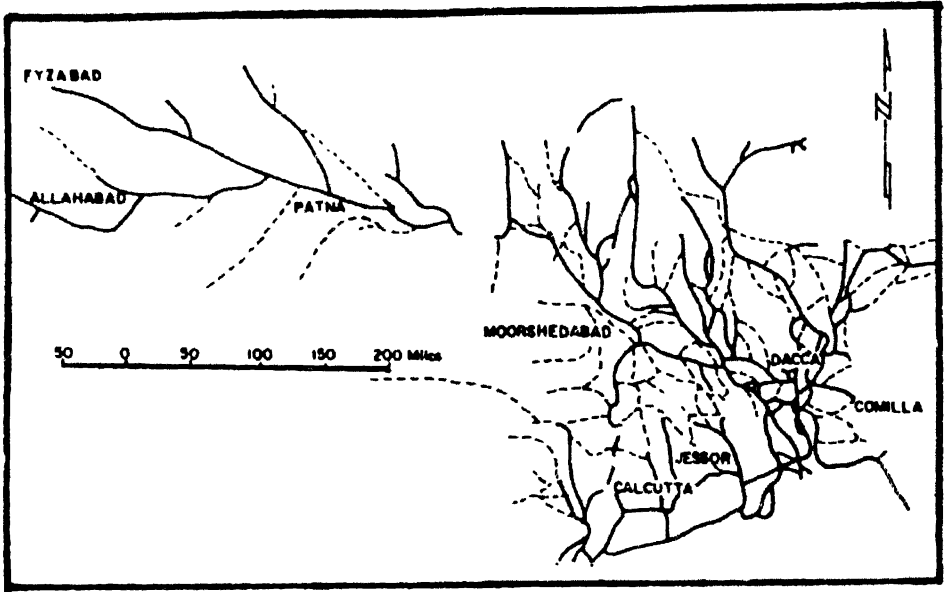
চিত্র ৩ : ভারতীয় নৌপথ

ব্রহ্মপুত্র দিয়ে নিয়মিত স্টিমার চলাচল শুরু হয়েছিল ১৮৬০ সালে। এর সাফল্যে ১৮৬৩ সালে সুরমা উপত্যকায় বাষ্পচালিত নৌযান চলাচল শুরু হয়। ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকার এই ব্যবস্থা বেশি বেশি করে আই. জি. এস. এন. কোম্পানির নজর কাড়তে লাগলো। ফলে গঙ্গার নৌ-চলাচল ব্যবস্থায় মন্দা আসে এবং অবশেষে ১৮৭৪ সালে সেটি বন্ধ হয়ে যায়।

আই. জি. এস. এন. কোম্পানি ছাড়া আরেকটি উল্লেখযোগ্য কোম্পানি হলো রিভার স্টিম কোম্পানি। ১৮৭৩ সালে এটি রিভার স্টিম নেভিগেশন কোম্পানিতে (আর. এস. এন.) পরিণত হয়। অন্তর্দেশীয় নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে ১৮৬২ সালে এর অনুপ্রবেশ। আর. এস. এন. কোম্পানি শীঘ্রই আই. জি. এস. এন. কোম্পানির অনুরূপ নৌ-চলাচলের সমস্ত পথই প্রতিষ্ঠা করলো। সেগুলি হলো কলকাতা ও আসামের মধ্যে বাংলাদেশ হয়ে যোগাযোগের পথ। কিন্তু উনিশ শতকের আশির দশকের শেষদিকে একই পথ দিয়ে দু'টি সংস্থার স্বাধীনভাবে জাহাজ চালানোর ক্ষেত্রে ক্রমাগত অসুবিধা দেখা দিতে লাগলো। এই পরিস্থিতি ঐ দু'টি সংস্থাকে একটি চুক্তি সম্পাদনের দিকে চালিত করলো ১৮৮৯ সালে। এতে বলা হয় যে, সকল প্রধান পথে যৌথভাবে কাজ চালানো হবে। ভবিষ্যতের সব রকম সম্প্রসারণ, বোঝাপড়া এবং চুক্তির নিয়মগুলিকেও যৌথ উদ্যোগে আনা হয়। তবে কোম্পানি দু'টি নিজেদের পৃথক সত্তা বজায় রেখেছিল।
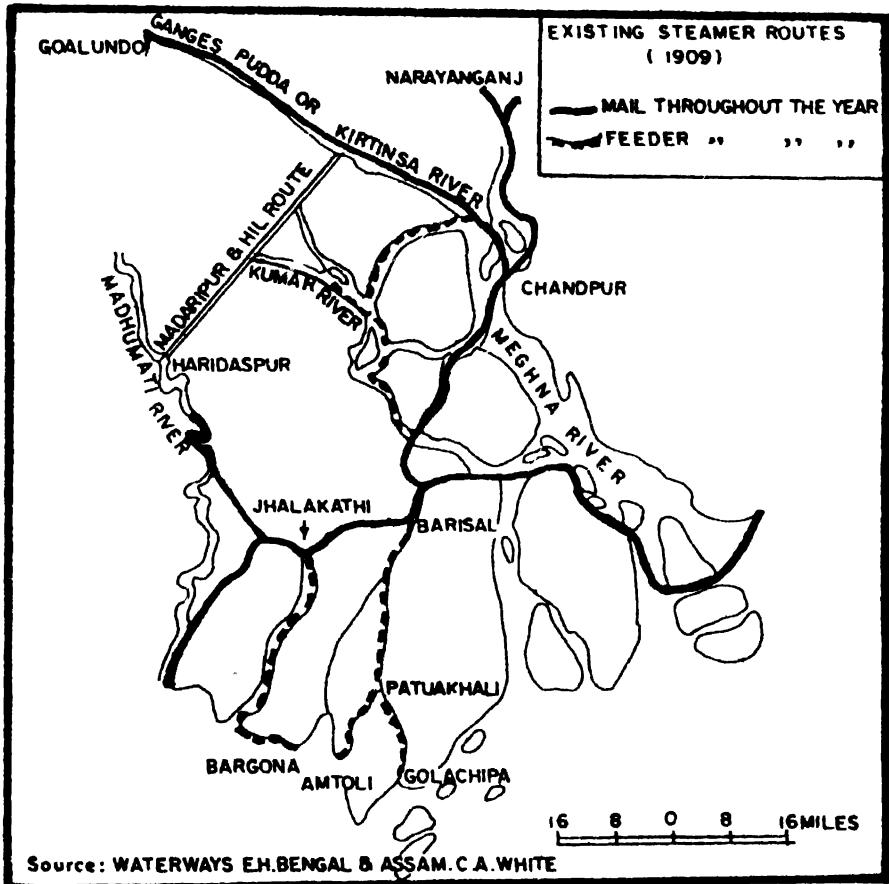
চিত্র ৪ : স্টিমার চলাচল পথ, ১৯০৯

১৮৯৬ সালে আই. জি. এস. এন. কোম্পানি ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গে ময়মনসিংহকে সংযুক্ত করার রেলপথ নির্মাণের এক মঞ্জুরি পায়। ১৮৯৯ সালে এটি এর সদর দপ্তর লন্ডনে নিয়ে যাবার অনুমতি পায় এবং নাম পরিবর্তন করে এর নতুন নাম রাখে ইন্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন এ্যান্ড রেলওয়ে কোম্পানি লিমিটেড।

স্টিমারগুলি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পথ ও সেগুলোর শাখাপথ ধরে চলাচল করতো। প্রথমটি হলো কলকাতা ও পাটনার মধ্যে গঙ্গা ডেসপ্যাচ সার্ভিস, যা সারাবছর ধরেই চলতো। দ্বিতীয় পথটি ছিল ব্রহ্মপুত্র দিয়ে গঙ্গা ও ডিব্রুগড়ের মধ্যে।

কলকাতা-ডিব্রুগড় পথটি সারাবছর ধরে খোলা থাকতো। এটি দিয়ে দৈনিক যাতায়াত ও সাপ্তাহিক পণ্যপরিবহন চলতো। এগুলি যেতো সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে।

সপ্তাহে তিনবার যাতায়াতের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম এবং বরিশালের মধ্যে আরেকটি প্রধান পথ ছিল, যা দিয়ে সারাবছর যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকতো। কাছাড় বিভাগে প্রধান পথটি সারাবছর চালু থাকতো, যা কলকাতা থেকে প্রসারিত হয়ে শিলচর পর্যন্ত গিয়েছিল। প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্য জমা হলে এতে সাপ্তাহিক সার্ভিস দেয়া হতো। এই পথটিই কলকাতা-নারায়ণগঞ্জ সরাসরি সাপ্তাহিক সার্ভিস হিসেবে মেঘনা নদীতে গিয়ে সামান্য বাঁদিকে বেঁকে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছাতো।

একটি প্রধান পথ ছিল নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুরের মধ্যে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পথগুলি খুলনা ও নারায়ণগঞ্জের সংযোগ ঘটাতো সারাবছর, আর খুলনা ও চাঁদপুরের যোগাযোগ ঘটাতো কেবল বর্ষার সময়। পূর্বাঞ্চলীয় বাংলা ও আসাম মিলিয়ে ৫টি পথ ছিল—আসাম পথ, চট্টগ্রাম পথ, কাছাড় পথ, উত্তর-পশ্চিম পথ ও বরিশাল পথ।

প্রধান নদীপথের সাথে যেসব শাখাপথ যুক্ত ছিল, সেগুলো ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নৌ-পরিবহনের গুরুত্ব তুলে ধরে।

ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ারে আছে, বিশ শতকের প্রথম দশকে পদ্মা দিয়ে স্টিমার চলতো দামুকদিয়া ঘাট, রামপুর-বোয়ালিয়া ও গোদাগারির মধ্যে, আর ইংলিশ বাজার পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে চলতো ইংলিশ বাজার ও সুলতানগঞ্জের মধ্যে। পদ্মার নিম্নভাগে যেখানে নদীটি মেঘনার সঙ্গে যৌথ মোহনায় মিলিত হয়েছে, সেই অংশ দিয়ে নদীপথে স্টিমার ও দেশী নৌকা চলতো সব ঋতুতে। গোয়ালন্দে যেখানে পদ্মা উত্তর থেকে আগত যমুনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সেখানে স্রোত এত তীব্র ছিল ও জলরাশির মিলনের ফলে "এত অসংখ্য ঘূর্ণির সৃষ্টি হতো যে, বিশালকায় ও শক্তিশালী স্টিমারগুলি আসামের পথে প্রায়ই এগুতে পারতো না এবং নদী শান্ত হওয়া পর্যন্ত ... দিনের পর দিন ... দাঁড়িয়ে থাকতো।"[১২]

১২. W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal, 1878,* 20 Vols., Vol V, reprinted in India by D K Publishing House, (New Delhi 1974), 261

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্দেশীয় নৌ-চলাচল ব্যবস্থার সামান্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কমিটির রিপোট[১৩] অনুযায়ী সেই সময় থেকেই পরিবহন ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে কয়েকটি জলপথের উন্নত রক্ষণাবেক্ষণের পদক্ষেপ নেয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও এই উদ্যোগ নেয়া হয়। তখনো একইভাবে রেলপথের ঘাটতির কারণে জলপথের প্রতি দৃষ্টি পড়ে।

এই শতকের গোড়ায় বড় বড় স্টিমারস্টেশনগুলি দিয়ে প্রতি মাসে যাতায়াতের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, নারায়ণগঞ্জ ছিল তালিকার শীর্ষে (২৩২ বার); এরপর ছিল যথাক্রমে খুলনা (১৯২ বার), গোয়ালন্দ (১৭৮), বরিশাল (১১৮),কলকাতা (১০৮), পটুয়াখালী (৯০), চাঁদপুর (৭৬), মারকুলি জং (৬০), শিলচর (৪৬), ডিব্রুগড় (৪৪), সিরাজগঞ্জ (৩৮), সিলেট (৩৮) এবং গৌহাটি (৩৪)।

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার[১৪] নারায়ণগঞ্জকে 'দেশী সামগ্রী বেচাকেনার এক উৎকৃষ্ট গঞ্জ' বলে বর্ণনা করেছেন। খুলনা শহরকে *ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার* বলেছে সুন্দরবন অঞ্চলের রাজধানী। গোয়ালন্দ ছিল পূর্ববাংলার রাষ্ট্রীয় জলপথ ও বহু গুরুত্বপূর্ণ স্টিমারপথের সমাপ্তিস্থল ও বিপুল পরিমাণ পরিবহনযোগ্য বাণিজ্যপণ্যের মজুদ- কেন্দ্র। বাংলা ও আসামের মধ্যে নদীতীরবর্তী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাজার হিসেবে বরিশালের স্থান ছিল চতুর্থ। চাঁদপুর ছিল অতি দ্রুত গড়ে উঠা শহর এবং পাট- ব্যবসার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। জনসংখ্যার বিচারে এটি খুব বড় কিছু না হলেও মেঘনার বুকে নৌযান বদলের জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

সিরাজগঞ্জ ছিল উত্তর-পূর্ব বাংলার জেলাসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ মজুদ ও সরবরাহকেন্দ্র। এর ঠিক পশ্চাৎদেশে পাবনা ছিল উৎপাদন ও পণ্যভোগের দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। বাকেরগঞ্জের ঝালকাঠি ছিল পূর্ববাংলার সর্ববৃহৎ কাঠব্যবসাকেন্দ্র। রাজশাহী জেলায় পদ্মার তীরে রামপুর বোয়ালিয়া ছিল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এভাবে তালিকা অনেক বাড়ানো যায়। আমরা সেদিকে না গিয়ে বরং এটুকু বলতে পারি যে, অন্তর্দেশীয় নৌ-চলাচল এভাবে বাংলা ব-দ্বীপের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং তার কেন্দ্রগুলি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল।

রেলপথ যখন এলো

লর্ড ডালহৌসির[১৫] ১৮৫৩ সালের *মিনিট অন রেলওয়েজ*-এ বড় বড় শহর ও সেনাছাউনিস্থলগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপনকারী প্রধান পথগুলির প্রথম পূর্ণাঙ্গ নকশা আছে।

১৩. *Report of the Inland Water Transport Committee*, (Chairman: Gokhale), Government of India, (New Delhi 1959).

১৪. W. W Hunter, *A Statistical Account of Bengal*.

১৫. Lord Dalhousie, *Minute* by the Most Noble the Governor General dated the 20th April, 1853.

ইতিমধ্যে ১৮৬৯ সাল থেকে লর্ড মেয়ো প্রধান পথগুলির সঙ্গে সংযুক্ত উপপথগুলি নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদনশীল জেলাগুলিকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে সমগ্র দেশকে উন্মুক্ত করা। ভারতে রেলপথের সূচনার প্রথম দুই দশকের মধ্যে প্রধান পথের মৌলিক কাঠামোটি নির্মাণ শেষ হয়েছিল ও তারপর শাখাপথগুলি গড়ে তোলার এবং কম প্রশস্ত ছোট ছোট পথ সস্তায় নির্মাণের পর্ব শুরু হয়।

পূর্ববাংলার বাণিজ্যের জন্য ১৮৬২ সালে রাষ্ট্রীয় রেলপথ চালু হয়। কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া ও দামুকদিয়া পর্যন্ত নর্দান বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে নামে একটি পথ, পরে যেটি ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের সঙ্গে মিশে যায়, তা কুষ্টিয়ার বিপরীত দিকে গঙ্গার উত্তরকূল থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল। তারপর একটি পূর্বদিকে ধুবরি পর্যন্ত এগিয়ে যায়, আর পশ্চিমদিকে কাটিহার পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে উত্তর বিহারের সঙ্গে আসাম ও উত্তরবাংলার সংযোগ ঘটায়। রেলপথের আরেকটি সম্প্রসারণ কলকাতাকে যশোর ও খুলনার সঙ্গে ব-দ্বীপের উত্তরাংশের মধ্য দিয়ে যুক্ত করে। কিন্তু ভূখণ্ড সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার দরুন দু'টি পৃথক বিভাগ এই অঞ্চলে গড়ে উঠে। একটি ময়মনসিংহের মধ্য দিয়ে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ও অপরটি চট্টগ্রামের সঙ্গে চাঁদপুর, কুমিল্লা ও লাকসামকে যুক্ত করে।

১৮৯০-৯১ সালের মধ্যে ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে সিস্টেমের ৭৮২$\frac{২}{৫}$ মাইল রেলপথের প্রসার ঘটে। পূর্বাঞ্চলীয়, দক্ষিণাঞ্চলীয় ও বর্তমানে সংযুক্ত নর্দার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে লাইনের অংশসহ বাংলার উত্তরাঞ্চল জুড়ে এই প্রসার ঘটে। এর মধ্যে ২৫৪$\frac{২}{৫}$ মাইল ব্রডগেজ, ৪৯১ মাইল মিটারগেজ ও ৩৭ মাইল রেলপথ ২ ফুট ২ ইঞ্চি গেজসম্পন্ন ছিল।

আসাম-বাংলা রেলপথটি রাষ্ট্রীয় পথ হিসেবে নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয় ১৮৯১ সালে এবং নির্মাণ কোম্পানিটি গঠিত হয় ১৮৯২ সালে। ১৯০৩ সালের মধ্যে প্রায় ৩৪২ মাইল রেললাইন স্থাপন করা হয় মৈশাসন থেকে করিমগঞ্জ হয়ে তিনসুকিয়া পর্যন্ত। এই পথটি শিলচর থেকে দক্ষিণ দিকে বর্ধিত হয়েছিল সুরমা উপত্যকার পূর্বাঞ্চলীয় প্রান্ত চট্টগ্রাম পর্যন্ত। এই পথেরই দ্বিতীয় শাখাটি আসাম উপত্যকার দক্ষিণে গৌহাটি থেকে তিনসুকিয়া পর্যন্ত গিয়েছিল ও সুরমা উপত্যকার শাখার সঙ্গে উত্তর কাছাড় পাহাড়ে প্রবিষ্ট লাইনটি দ্বারা লুমডিং-এ সংযোজিত হয়েছিল। রেলপথটির কাজ ১৮৯১ সালে শুরু হওয়ার পাঁচ বছর পর চাঁদপুর থেকে বদরপুর পর্যন্ত প্রায় ১১৫ মাইল যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৯০৩ সাল নাগাদ। পুরনো নোয়াখালীর রেলপথটি ওল্ড আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির দ্বারা ১৯০৫ সালের শেষভাগ নাগাদ তৈরি হয়েছিল। সরকার এটা কিনে নেয় ও ১৯০৬ সালে একে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের অঙ্গীভূত করা হয়।

এল. এস. এস. ও'মালী[১৬] তাঁর *বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা এ্যান্ড সিকিম* নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ১৯১২ সালের মধ্যে প্রদেশভিত্তিক চালু রেললাইনের দৈর্ঘ্য নিম্নরূপ ছিল।

সারণি ৩ : রেলপথের দৈর্ঘ্য (মাইলে)

রেলপথ	বাংলা	বিহার ও উড়িষ্যা
আসাম-বাংলা	২১৭	-
বাংলা-ডুয়ার্স	১৫৩	-
বাংলা-নাগপুর	৩৩৩	৮৩৩
বাংলা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল	-	৯২৮
পূর্বাঞ্চলীয় বাংলা	১২৬৪	১৭০
পূর্ব ভারত	৩৯৪	১০৪০
মোট	২৩৬১	২৯৭১

[illegible]
ব্রডগেজ। মিটারগেজ ছিল পদ্মার উত্তরে আর ব্রডগেজ ছিল পদ্মার দক্ষিণে। গঙ্গার উপর সারার কাছে একটি সেতু নির্মিত হবার ফলে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়েতে সান্তাহার পর্যন্ত ব্রডগেজের প্রসারণ ঘটেছিল। অন্যত্র এ দুই ব্যবস্থার মধ্যে স্টিমারফেরি দিয়ে সংযোগ ঘটানো হতো।

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে মিটারগেজ লাইন চালু হয়েছিল ১৮৯৫ সালে। এটি আসামকে চট্টগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। কলকাতার সঙ্গে সংযোগ ঘটতো চাঁদপুরগামী একটি শাখা লাইন দিয়ে; আর ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে ট্রেন ধরার জন্য গোয়ালন্দ পর্যন্ত স্টিমার যেতো।

বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ে চালু হয় ১৮৯৫ সালে। এটি ছিল মিটারগেজে এবং তা ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের সঙ্গে জলপাইগুড়ি ও লালমনিরহাটে যুক্ত ছিল।

ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কলকাতা থেকে উত্তরাঞ্চল, বাংলার পূর্বাঞ্চল ও আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আগে এটিকে বলা হতো ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে। এটি কুচবিহার রেলওয়েকে (৩৩ মাইল) চালু রেখেছিল এবং কলকাতা থেকে খুলনা পর্যন্ত বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ের লাইনটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

ইম্পেরিয়াল গেজেটের মানচিত্র[১৭] খণ্ডে ১৯৩১ সালের 'রেলওয়েজ এ্যান্ড ইনল্যান্ড নেভিগেশন' সম্পর্কিত একটি মানচিত্র আছে। এটি বাংলাদেশের মধ্যে রেলপথের বিস্তার পর্যায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগেকার পরিস্থিতি দেখিয়েছে। ততোদিনে প্রায় সমগ্র

১৬. L S S O'Malley, *Bengal Bihar, Orissa and Sikkim*, 254
১৭. *The Imperial Gazetteer of India* Vol. XXVI. new (revised) Edition, Oxford. 1931.

দক্ষিণ ও উত্তর বাংলা ব্রডগেজ লাইনের আওতায় এসে গিয়েছিল। মিটারগেজ লাইন চাঁদপুর, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামকে লাকসাম, আখাউড়া, বদরপুর ও শিলচরের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। আরেকটি ছোট মিটারগেজ পথ চালু ছিল নেত্রকোণা-ময়মনসিংহ-ঢাকার মধ্যে।

এই রেলপথগুলি যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উল্লেখযোগ্যভাবে লাভজনক হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন বিবরণে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। যেমন এর উল্লেখ আছে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংক্রান্ত রিপোর্টে। ১৮৮০-৮১ সালের রিপোর্টটি[১৮] নর্দার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে সম্বন্ধে বলেছে :

> এর যাতায়াতব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে, এবং শাখাপথগুলি সদ্য কাজ শুরু করলেও এই পথে পণ্যপরিবহনের মোট পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটেছে ১৮৭৮-৭৯তে ২১.৩৯ শতাংশ ও ১৮৭৯-৮০তে ৮৬.৯১ শতাংশ হারে। লেনদেনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

দশ বছর পরে ১৮৯০-৯১ সালের রিপোর্ট[১৯] ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের কাজ নিয়ে একটি সাধারণ সমীক্ষার ফল প্রকাশ করে ও সন্তোষ প্রকাশ করে বলে, "গঙ্গার উত্তরের রেলপথগুলির সম্ভাবনা দারুণ আশাব্যঞ্জক। আসাম-বিহার বিভাগ দিয়ে যাতায়াত দ্রুত বেড়ে চলেছে। ঢাকা লাইনে এখন মুনাফা হচ্ছে ও আরো উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।"

১৯২১-২২ সালের মধ্যে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে রেলপথে উপার্জনতালিকার শীর্ষে উঠে এলো চক, চুন, চুনাপাথর, কয়লা ও কোক, ইউরোপীয় সুতীর সামগ্রী, কাঁচা পাট, থলে, কাপড়, মসলাপাতি, চা ও তামাক পরিবহন করে।

ভারতীয় উপমহাদেশে রেলপথ উন্নয়নের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ১৯২৩ সালে কেন্দ্রীয় সংসদ কর্তৃক সমস্ত রেলপথকে আবশ্যিকভাবে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার অধীনে আনার সিদ্ধান্তটি। অবশেষে ঠিক হয়েছিল যে, চুক্তির মেয়াদকালের শেষে সমস্ত রেলপথকে ভারত সরকার অধিগ্রহণ করবে।

রেলপথ স্থাপনের ফলে অর্থনীতি ও জনবসতির বিস্তার ও সংযোগস্থলগুলির প্রসারের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এলো, তাতে বাণিজ্যসঙ্কটের দরুন কয়েকটি মাত্র শহরই পথে বসলো। ১৯১১ সালে *দি সেনসাস অব ইন্ডিয়া* লিখেছে যে, বেশ কিছু শহরের লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো 'নদীভিত্তিক না হয়ে রেলভিত্তিক বাণিজ্যের প্রসার'।

কলকাতা বন্দরের সঙ্গে পূর্বভারতের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিকে যুক্ত করে রেলের এক নতুন পণ্যচলাচলব্যবস্থা কায়েমের ফলে বহু শহরের উপর এর পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল। পূর্বভারতের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী দেশী শিল্পে কর্মরত বা তার উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যার ভয়াবহ হ্রাসের মধ্যেই এই ব্যাপারটা অনুমান করা যায়।

১৮. *Annual Report 1880-81*
১৯. *Annual Report, 1890-91*

১৯২১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে দেখা যায় যে, বাংলার রেশম, পশম, পিতল, তামা, ধাতু, সুতা তৈরি, তাঁত বুনন, চামড়া ও বাস্কেট তৈরি শিল্পে শ্রমিক ও তাঁদের উপর নির্ভরশীলদের সংখ্যা ১৯০১ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত সময়ে অত্যন্ত হ্রাস পেয়েছে।

শেষ পর্যায়

ক্ষমতা হস্তান্তরের চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলা ব-দ্বীপের রেলপথ ও সড়ক উন্নয়নের চিত্রটি দিয়েছেন এ. জে. কিং তাঁর *কমপ্রিহেনসিভ রিপোর্ট অন রোড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টস ইন বেঙ্গল*-এ। কিং-এর ১৯৩৮ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৩৮ সালে স্টিমারচলাচলের মোট পথের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ২০০০ মাইল। প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগব্যবস্থায় মোট ১৪টি রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৩৩৫৭ মাইল। সড়ক সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রদেশের মধ্যে তৎকালীন বাঁধানো ও কাঁচা সব রকমের রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৯১৯৩৬ মাইল। এর জেলাওয়ারি হিসাব নিম্নরূপ :

সারণি ৪ : সড়ক ও রেলপথসমূহ

জেলা	রেলপথ	রাস্তা (মাইলে)	
		(ক) সরকারি	(খ) জেলা বোর্ডের
যশোর	৬৬.০	৩৮.০	৩৯০.৯
খুলনা	৩৬.০	-	২১৯.১
ঢাকা	১১৮.০	-	২৫৩.৮
ময়মনসিংহ	২৩০.০	-	৪১৬.১
ফরিদপুর	৯০.০	-	২৮৯.৬
বাকেরগঞ্জ	-	-	৩৬৬.৪
চট্টগ্রাম	৯৭.০	৪৮.৯	২৩৮.৪
পার্বত্য চট্টগ্রাম	-	-	-
নোয়াখালী	৪৮.০	১৩.৯	২০২.৮
দিনাজপুর	১৩১.০	১৪.০	৪৩১.৩
রাজশাহী	১০১.০	-	৫৯০.৬
রংপুর	২০৫.০	-	৭৬৩.০
বগুড়া	৮৬.০	-	৩৪২.৮
পাবনা	৬৯.০	-	৩৯৬.৬
মালদহ	৮৫.৫	-	৩১৭.৬
২৪-পরগনা	১৪৭.০	৬০.১	৪০৬.১
নদীয়া	১৮০.০	-	৪৯১.২
মর্শিদাবাদ	১৩৪.০	-	২০৯.৪

১৯৩৮ সালে প্রদেশে ৮টি স্টিমারকোম্পানি ছিল। এগুলি হলো (১) ইন্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন এ্যান্ড রেলওয়ে কোম্পানি লিমিটেড, (২) রিভার স্টিম নেভিগেশন

কোম্পানি লিমিটেড, (৩) বেঙ্গল-আসাম স্টিম সার্ভিস কোম্পানি, (৪) বেঙ্গল রিভার সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেড, (৫) ইস্ট বেঙ্গল রিভার স্টিম সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেড, (৬) ঘাটাল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি লিমিটেড, (৭) চাঁদবালি রিভার সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেড এবং (৮) বঙ্গীয় ইনল্যান্ড স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি লিমিটেড।

এইভাবে, বৃটিশরা যখন এই দেশ ত্যাগ করে, তখন বাংলা ব-দ্বীপটি বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের এক সারি কেন্দ্রসহ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার একটি মৌলিক কাঠামো লাভ করেছিল। অন্তর্দেশীয় নৌ-চলাচল থেকে রেলপথ পর্যন্ত পরিবহন ব্যবস্থার ধরনের পার্থক্যসহ মৌলিক সব পার্থক্যের উপর ঐ কেন্দ্রগুলির বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে।

এটা এখন সবাই মানেন যে, রেলপথের প্রচলন ও নতুন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার সাবেকি শিল্পের অধঃপতনের শুরু। ১৮১৭ সালে এককভাবে ১৫২ লাখ টাকার সূক্ষ্ম মসলিনের রপ্তানিকারক ঢাকা বিকাশলাভ করেছিল এর উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবে। কেবল উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবে নয়, জমজমাট বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবেও গড়ে উঠেছিল ঢাকার মতো আরো কয়েকটি কেন্দ্র। এটি এখন আর তর্কের ব্যাপার নয় যে, কলকাতার সঙ্গে একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে রেলপথ বাংলা ব-দ্বীপটির যে ব্যাপক সংখ্যক শহরের বাণিজ্যকে দখল করে নিল, সেগুলি ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিকাশরুদ্ধ অবস্থায় পৌঁছালো। রেলপথের মধ্যে না পড়ার দরুন আরো অনেক শহর আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু রেলপথ উন্নয়নের এই পর্যায়ে কলকাতারই পশ্চাৎভূমির অন্তর্গত বেশ কিছু ছোট নগরকেন্দ্রকে পরোক্ষভাবে শিল্পহীনতা ও জনসংখ্যার ঘাটতির জন্য ক্ষতিস্বীকার করতে হয়।

কিন্তু বাংলা ব-দ্বীপটি একটি সুবিধার ব্যাপারে অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা ছিল। সেটি হলো, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য এই ভূখণ্ডে রেলপথ প্রকৃতপক্ষে কখনো নৌ-চলাচল ব্যবস্থার স্থান দখল করতে পাবে নি এবং ফলশ্রুতিতে তা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক আমলের সবচেয়ে প্রভাবশালী শহর কলকাতার একচ্ছত্র প্রভাব থেকে এই অঞ্চলের অনেক কেন্দ্রকেই মুক্ত থাকতে ভৌগোলিকভাবে সাহায্য করেছে।

১৮

মজুর শ্রেণীর অর্থনীতি

ভেলাম ফান স্বেন্ডেল[*]

উপক্রমণিকা[১]

গ্রামীণ মজুরদের কথা কেন আমরা এত কম জানি ?

বাংলাদেশ তার দারিদ্র্যের জন্যই আজকাল বেশি পরিচিত। তীব্র সম্পদসঙ্কটের ফলে তার কোটি কোটি নাগরিক আজ মানবেতর জীবনের মুখোমুখি। বেঁচে থাকার জন্য তাদের অপরিমেয় সংগ্রামের ভয়াবহ পরিণতিতে পরিবেশের অবনতি, আর্থিক প্রবৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি হারে জনসংখ্যাবৃদ্ধি, পুরাতন আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভাঙন, রাজনৈতিক অভ্যুত্থান এবং সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বেশিকরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দেশের বিশিষ্ট জমিদারদের বংশধর এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি ও সামরিক বাহিনীতে প্রতিষ্ঠিত ভুঁইফোড়দের নিয়ে গঠিত এলিট শ্রেণীকে বিদেশী সরকারেরা তথাকথিত উন্নয়নের জন্য দেশের অভিভাবকের আসনে বসিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিকদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য এক জীবনধারা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ব্যর্থ দেশ হিসেবেই থেকে গেল।

বাংলাদেশের সমাজবিষয়ক সমীক্ষাও একইভাবে অনুন্নত। অবশ্য গত বিশ বছর ধরে 'উন্নয়নের জিগির' অনেক সমীক্ষার জন্ম দিয়েছে; তার বেশির ভাগই নীতিসমস্যার সঙ্কীর্ণ গলিতে আবর্তিত হয়েছে। খুব অল্পসংখ্যক সমীক্ষা প্রকৃত গবেষণার ফসল। ফলে বেশিরভাগ সমীক্ষায় দেশের বহুবিধ সমস্যার কারণসমূহ সঠিকভাবে নিরীক্ষা না করেই তার সমাধানের পথ দেখাতে ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের এবং বিদেশের

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, এরাসমাস বিশ্ববিদ্যালয়, রটারডাম, নেদারল্যান্ড।

১. Faraizi এবং আমার কৃত গবেষণার আর এক সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই প্রবন্ধ। সেখানে বাংলার গ্রামীণ মজুরদের বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে। দেখুন Willem Van Schendel and Aminul Haque Faraizi, *Rural Labourers in Bengal, 1880 to 1980,* (Rotterdam 1984); Willem Van Schendel, "Rural Transformation in Bangladesh and West Bengal, 1880-1980", *Journal of Social Studies,* 28 (1985), 17-41

সামাজিক ঐতিহাসিকবৃন্দ বর্তমানে সত্যিকার অর্থে এদেশের গণদারিদ্র্যের কারণ ও ফলাফলের সমীক্ষায় অবদান রাখছেন, যা যথার্থ বলে প্রমাণিত হতে পারে। ক্রমে ক্রমে আমরা বাংলাদেশে বহুদিন বিরাজমান ধারাকে লক্ষ্য করতে এবং ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছি। অনুন্নত অবস্থায় মূল নিয়ামক নির্ধারণে ঔপনিবেশিকতাবাদকেন্দ্রিক সহজ-সরল ও অগভীর ব্যাখ্যা অথবা বিপরীতে বাঙালি সংস্কৃতির অসম্পূর্ণতাব নিছক অনুমাননির্ভর ধারণাভিত্তিক ব্যাখ্যাকে অতিক্রম করে আরো গভীরে আমরা যাবো। নতুন ব্যাখ্যায় বাংলাদেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে সারা পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা হবে, যে প্রক্রিয়ার ফলে 'দরিদ্র পৃথিবী' গত দুশ' বছরেরও বেশি সময় ধরে 'তৃতীয় বিশ্বের' সীমানার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আরো নিরীক্ষা করবো কোন্ বিশেষ সামাজিক বৈশিষ্ট্যের জন্য এবং কিভাবে বাংলাদেশে ঐ প্রক্রিয়া সহজে প্রবেশ করেছে বা ব্যাহত হয়েছে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিকেও সমীক্ষার আওতায় এনে এই নতুন ধারায় বাংলাদেশের সামাজিক রূপান্তরেব বৈশিষ্ট্যগুলোও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হবে।

আমার এ আলোচনায় সেই রূপান্তরের একটি দিক আমি তুলে ধরতে চাই। তা হচ্ছে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে একটি গ্রামীণ সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব। বাংলাদেশের বিশাল গ্রামীণ জনসংখ্যা এবং বৃটিশ আমলের পর্যাপ্ত সহজলভ্য তথ্যাবলীর উপস্থিতি সত্ত্বেও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই সময়ের গ্রামীণ মজুর এবং গ্রামীণ বাজারের উদ্ভব সম্পর্কে আমরা খুবই কম জানি। এর পেছনে তিনটি কারণ আছে। প্রথমত, গ্রামীণ মজুরেরা ঔপনিবেশিক শাসকদের চিন্তার বিষয় ছিল না। কেননা পূর্ব বাংলা এমন কোন উপনিবেশ ছিল না, যেখানে ইউরোপীয় খামারমালিক ও শিল্পপতিদের জন্য বিরাট সংখ্যক এদেশীয় মজুরের প্রয়োজন ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনামলে প্রারম্ভিক পর্যায়ে নীলচাষের জন্য স্থাপিত খামারগুলো ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ শিল্প (প্রথমে রেশম ও পরে পাট) পূর্ব বাংলায় বিদ্যমান ছিল না, ছিল পশ্চিম বাংলার কলকাতায়।

দ্বিতীয়ত, ভারতে বা অন্য কোন দূরান্তে নয়া বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপনকালে বাংলার মজুরেরা বহির্গমনে আদৌ অংশগ্রহণ করে নি বিধায় ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষও তাদের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার মতো কোন কিছু পায় নি। আসাম ও সিলেটের[২] চা-বাগানগুলোর জন্য বেশিরভাগ মজুর সংগ্রহ করা হয় পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার উপজাতীয়[৩] অধিবাসীদের থেকে। যদিও ইতিমধ্যে ক্যারিবীয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলে

বাংলাভাষী সিলেট জেলা ১৮৭৪ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আসাম প্রদেশেব অংশ ছিল।
ভারতীয় উপমহাদেশে অল্পসংখ্যক লোকগোষ্ঠীকে (যাদের ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতি উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রধান জনগোষ্ঠীগুলো থেকে আলাদা) 'উপজাতি' নামের পুরনো রীতিতে চিহ্নিত কবা হয়। এই শব্দটি ভুল এই কারণে যে এই অভিধাটি এই কল্পকথাকেই স্থায়িত্বদান করে যে, এসব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী প্রধান জাতিগুলোর চেয়ে কম সভ্য এবং সমজাতিক বৈশিষ্ট্যেব অধিকারী পৃথক জাতিগোষ্ঠী তথা উপজাতি। দক্ষিণ এশিয়ার সমাজে এই শব্দের খুব বেশি সহজ ব্যবহারেব ফলে সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনও সৃষ্টি হয়ে চলেছে এমন এক মানসিকতা, যা তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করা থেকে হত্যা পর্যন্ত করতে প্রণোদিত করতে পারে। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ইতিহাস বর্ণনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। আজকের প্রভাবশালী জাতি হচ্ছে বাঙালি এবং সংখ্যালঘু হচ্ছে সাওতাল, ওঁরাও, কোচ, গারো, হাজং, খাসী, মনিপুরী, চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা, সাক, বাউম, পংখুয়া, লুসাই, টংগচেঙ্গিয়া, ক্রুংগবিয়াংগ, খিয়াংগ, খুমী এবং ম্রু।

মজুর প্রেরণের বন্দর হিসেবে কলকাতা উল্লেখযোগ্য হয়ে পড়ে, তথাপি মজুরদের প্রায় সবাই ছিল বিহার এবং উত্তর প্রদেশের।

তৃতীয়ত, পূর্ব বাংলার গ্রামীণ মজুরদের বিষয়ে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের কোন আগ্রহই ছিল না; কেননা নিবিড় তদারকি ছাড়াই জমিদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রচুর ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। পরিশেষে যখন বৃটিশেরা কৃষি বিষয়ে অধিক মনোযোগ দিতে শুরু করে, তখন তাদের দৃষ্টি ছিল ভূমিমালিক কৃষকদের দিকে, মজুরদের দিকে নয়।

এই সমস্ত কারণে ঔপনিবেশিক দলিলপত্রে গ্রামীণ মজুরদের বিষয়ে ধারাবাহিক বা সম্পর্কযুক্ত তথ্য পাওয়া যায় না এবং বিক্ষিপ্ত তথ্য থেকে সে বিষয়ের স্বরূপ উদঘাটন ছিল এক দুরূহ কাজ। এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক ঐতি হাসিকগণ প্রথমে উন্নততর তথ্যের দিকেই ঝুঁকে পড়েন। ফলে, ঔপনিবেশিক গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে আমাদের ধারণায় ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থারই প্রতিফলন ঘটতে থাকে, বিশেষকরে এর ভূমিস্বত্ব ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে।

কিন্তু এতে কি লাভ হতে পারে? এমন অবস্থায় বিদ্যমান উৎস-দলিলসমূহ কি ঐতিহাসিকদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না? তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ইতিহাসের ছাত্ররা বহুলাংশে এই সনাতন উৎসের উপর, বিশেষকরে বিপুল সরকারি দলিলের উপর বেশিকরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অথচ বিদেশে, বিশেষকরে আফ্রিকায় এমনটি দেখা যায় না। কিন্তু যেসমস্ত সমস্যা আজ পৃথিবীব্যাপী সামাজিক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, তার সবগুলোকে বিবেচনায় আনতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে সরকারি দলিলের বাইরেও যেতে হবে। সাধারণ মানুষ, নারীসমাজ, মজুর এবং সংখ্যালঘুশ্রেণী (উল্ফের আখ্যা অনুযায়ী[৪] এখনো যাদের বেশিরভাগ 'ইতিহাসহীন মানুষের দল') সম্পর্কে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা তথা ধারণা পুনর্গঠন নতুন উৎস-দলিল পরীক্ষার এবং নতুন গবেষণার দাবি রাখে। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের দ্বারা উপেক্ষিত এক প্রয়োজনীয় দলিল হচ্ছে পুঁথি-সাহিত্য, যাকে ভিত্তি করে রফিউদ্দিন আহমেদ গ্রামীণ মুসলিম পরিচিতির এক অনুপম সমীক্ষা পরিবেশন করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নৃবিদ্যার বিকাশের উপস্থাপনার জন্য অলিখিত উৎসসমূহকে আরো ব্যাপক ও গভীরভাবে ব্যবহার করতে হবে।[৫] শুধু এভাবেই যেসব ধারণা মজুর, নারী, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে তাদের সামাজিক জীবনে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী হিসেবে তুলে না ধরে পরিস্থিতির নগণ্য শিকারে পরিণত করেছে, সেসব ধারণা পরিত্যাগ করা সম্ভব হবে।

৪. Eric R Wolf, *Europe and the People without History*, (Berkeley, etc. 1982)

৫. Rafiuddin Ahmed, *The Bengal Muslims 1871-1906: A Quest for Identity*, (Delhi 1981) ঐতিহাসিক পুনর্গঠনে মৌখিক উৎসের ব্যবহার সম্বলিত সমীক্ষার জন্য দেখুন, Adrienne Cooper, *Sharecropping and Sharecoppers' Struggles in Bengal, 1930-1950*, (অপ্রকাশিত Ph D থিসিস, University of Sussex 1984), বা আমার *Peasant Mobility The Odds of Life in Rural Bangladesh*, (Assex 1981/Delhi 1982).

বাংলাদেশের গ্রামীণ মজুরদের ইতিহাসের বেশিরভাগই আরো অজানা রয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে মৌলিক ইতিহাস প্রণয়ন (অলিখিত উৎসের ব্যবহার) আমাদের অভিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে পারে। এই লক্ষ্যে গ্রামীণ মজুরদের সমীক্ষা অত্যন্ত জরুরি, যা হবে এদের ইতিহাসের প্রধান নিয়ামক।

কেন এই মজুরদের সমীক্ষা ?

ধনতান্ত্রিক বিশ্বঅর্থনীতির উদ্ভব আধুনিক ইতিহাসে প্রাধান্যবিস্তার করেছে। তাই পুঁজিবাদের শেকড়, এর গতিশীলতা, পর্যায়সমূহ ও সম্ভাব্য পতন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক সমাজের এবং উপনিবেশোত্তর সমাজের সমীক্ষা ইউরোপীয় সমাজসমূহে ক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের অনেক প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে। শুরুতে পুঁজিবাদের প্রভাব দেখা যায় সমাজের আংশিক এলাকায়, এর পর পুরো সমাজে এবং পরিশেষে সারা পৃথিবীতে। কিন্তু এর প্রভাব সব সময় সমান ছিল না।

পুঁজিবাদী অগ্রগতির বহুমুখী চরিত্র গবেষণার নতুন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, যার বেশিরভাগ জড়িত ঔপনিবেশিক এবং উপনিবেশোত্তর সমাজের কৃষিখাতের দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন ও বিশ্লেষণের সঙ্গে। অধিকাংশ ঔপনিবেশিক সমাজে কৃষিকে দূরবর্তী বাজারমুখী পণ্যউৎপাদনের উদ্দেশ্যে ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, এই ব্যবস্থা পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের উদ্ভব সম্পর্কে অর্থাৎ ভূমিহীন কৃষক বা গ্রামীণ সর্বহারা ও উৎপাদন-উপকরণের মালিক বা গ্রামীণ ধনীদের মধ্যে বিভাজন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। বরঞ্চ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অনেক সমাজেই কৃষিউৎপাদন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাঠামোগতভাবে অধনতান্ত্রিক থেকে যায়। এই অবস্থাকে পুঁজির অধীনে শ্রমের 'সত্যিকার' অবলুপ্তি না বলে 'বাহ্যিক' অবলুপ্তি বলা চলে। এই সমাজগুলোতে খামার, মহাল, খনি বা কারখানায় নিয়োজিত কৃষিমজুরদের শ্রমকে 'প্রত্যক্ষ' আত্মসাতের মাধ্যমে শোষণ করা হতো না, কিন্তু শ্রমের পরিবর্তে কৃষক-মজুরদের সৃষ্ট বস্তুকে আত্মসাতের মাধ্যমে 'পরোক্ষভাবে' শোষণ করা হতো।[৬]

ঔপনিবেশিক শাসন বিলুপ্তির পর এই ধরনের সমাজগুলোতে কি পরিমাণ পুঁজিবাদ প্রসারলাভ করেছিল ? দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে অনুসন্ধানীদের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে প্রাণবন্ত বিতর্ক হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গগুলো ছিল কৃষির উৎপাদন-উপকরণের মালিকানা, প্রজাস্বত্ব, উৎপাদনকারীর বাজারমুখী চেতনা, ঋণ, ভূমি ও শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি, পুঁজির অধিকারভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার বৃদ্ধি এবং পুঁজি সংগঠন।

---

৬. Waterbury দেখিয়েছেন যে, এই ধরনের বিপরীতমুখী শোষণপ্রক্রিয়া একই উপনিবেশের অঞ্চলসমূহে প্রভাবশালী হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তুসংস্থানগত, সামাজিক কাঠামোগত, ব্যবসায়িক এবং রাজনৈতিক অবস্থার প্রভাবে। দেখুন, Ronald Waterbury, "Non-Revolutionary Peasants : Oaxaca Compared to Morelos in the Mexican Revolution", *Comparative Studies in Society and History*, (1975), 410 441

এই বিতর্কে প্রকাশ পায় যে, সমসাময়িক দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামীণ অঞ্চলে পুঁজিবাদী চেতনার বিকাশ ঘটেছে, যদিও আকারে ও গতিতে এলাকাগত বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।[৭] কিন্তু এই চেতনার গুরুত্ব সম্পর্কে বেশ মতভেদ রয়েছে। উৎপাদনের পুঁজিবাদী সম্পর্ক কোন্ মাত্রায় দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিতে আধিপত্য বিস্তার করতে চায় ? উৎপাদনের কি কোন পুঁজিবাদী পদ্ধতি আছে ? যদি তাই হয়, তবে আমরা উৎপাদনের অপুঁজিবাদী সম্পর্কের বিদ্যমানতাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবো ? এই প্রশ্নগুলো শুধুমাত্র জ্ঞানার্জনের জন্যই প্রয়োজনীয় নয়, এসব সমাজের উন্নয়ননীতিতেও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

দক্ষিণ এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে পুঁজিবাদী প্রবণতা স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আগেই ধারণা করা ভুল হবে যে, অপেক্ষাকৃত উন্নত কৃষিপুঁজির এলাকাগুলো (যেমন পাঞ্জাব, গুজরাটের কিছু অংশ এবং তামিলনাড়ু) 'পথপ্রদর্শক' এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল ধীরগতিসম্পন্ন হলেও মোটামুটিভাবে একই ধারা অনুসরণ করছে। শুধুমাত্র সমগ্র বিশ্বের পরিমাপে বলা যেতে পারে যে, পুঁজিবাদ ক্রমাগত উন্নতির পথ দেখিয়েছে। কিন্তু কোন বিশেষ সমাজের বা সমাজের অংশের গতিশীলতা সর্বদাই বৈসাদৃশ্য, অস্থিরতা এবং বিপরীতমুখিতার দ্বারা চিহ্নিত। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সুদীর্ঘকালের পুঁজিবাদী উন্নয়নের এক তুলনামূলক সমীক্ষা করা দরকার। বিশ্ব পুঁজিবাদের প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে কেবল আঞ্চলিক বা সাম্প্রতিক চেহারার বিশ্লেষণ বর্তমানে বহুমুখী প্রসারতা প্রদর্শনকারী এলাকাগুলোর অব্যাহত পুঁজিবাদী উন্নয়নের গভীরে দৃষ্টিনিক্ষেপের সুযোগ করে দিতে পারে। বিপরীতভাবে এই ধরনের বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং বর্তমানে পিছিয়ে থাকা কয়েক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী উন্নতির নবপ্রচেষ্টার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতে পারে।

যাই হোক, 'অনগ্রসরতা'র এই ধারণা স্বয়ং গতিশীলতাকে অবমূল্যায়ন করে, যা ঐ এলাকাগুলোতে উচ্চকিত পুঁজিবাদী উন্নয়ন ব্যতিরেকেই বহমান ছিল। এই ধরনের অঞ্চলে কখনো সামাজিক স্থিরতা দেখা যায় না, এমনকি পুঁজিবাদী উন্নয়নে কিছুটা বদ্ধতা দেখা দিলেও স্থানীয় সমাজে রূপান্তরের জন্য নানাবিধ প্রক্রিয়া কাজ করে এবং এই প্রক্রিয়াগুলোকে দক্ষিণ এশিয়ায় পুঁজিবাদের সম্যক বিশ্লেষণ থেকে বাদ দেয়া যায় না।

এই বিতর্কে উত্তর-পূর্বের এক বিরাট অঞ্চলকে আলাদা করে অপেক্ষাকৃত বদ্ধ এবং উৎপাদনের পুঁজিবাদপূর্ব কাঠামোর কেন্দ্রভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা রয়েছে। কতিপয় গ্রন্থকার এই এলাকার গ্রামীণ সমাজকে আধাসামন্ততান্ত্রিক আখ্যায় আখ্যায়িত করার পক্ষে মত প্রকাশ

---

৭. D McEachern-এর "The Mode of Production in India", *Journal of Contemporary Asia*, 6 4 (1976), 444-457; এবং Alice Thorner-এর "Semi-Feudalism or Capitalism ? Contemporary Debate on Classes and Modes of Production in India", *Economic and Political Weekly*, (December 4-18, 1982), 1961-1968, 1993-1999 and 2061-2066-এ উৎপাদনপ্রক্রিয়ার উপর বিতর্কের সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যেতে পারে।

করেছেন এবং তাঁরা সেসব বৈশিষ্ট্যের উপরই বেশি জোর দিয়েছেন, যেগুলোকে ভূমিসংক্রান্ত পুঁজিবাদের শ্বাসরুদ্ধকর সূচনা হিসেবে ধরা হয়। অন্যেরা আবার এই আধাসামন্ততান্ত্রিক ধারণাকে সমালোচনা করেছেন এই বলে যে উত্তর-পূর্বের কৃষিতে পুঁজিবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অভাব ছিল না এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলো সাম্প্রতিককালে আরো বিকশিত হয়েছে।[৮] আবার এটা স্থবিরতা বনাম গতিশীলতার কোন সমস্যা নয়, আর বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করারও কোন যৌক্তিকতা নেই। আসলে যা দরকার, তা হচ্ছে উত্তর-পূর্বের সমাজগুলো রূপান্তরের যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা বিশ্লেষণ করা এবং বুঝতে চেষ্টা করা কিভাবে এই রূপান্তর বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের সাথে এবং স্থানীয় ভূমিসংক্রান্ত বিধানগুলোর সাথে সম্পর্কিত।

গ্রামীণ মজুরদের সমীক্ষা বাংলাদেশে এই রূপান্তরের মাত্র একটা মাত্রার উপর আলোকপাত করে। তা এযাবৎ পুঁজিবাদী কৃষকদের উদ্ভবকে ঘিরে যে আলোচনা চলেছে এবং যা আশ্চর্যজনকভাবে তাদের যুক্তিসম্মত প্রতিপক্ষ গ্রামীণ মুক্ত সর্বহারা শ্রেণী সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে, সেই আলোচনাকে ব্যাপকতা দিতে সাহায্য করতে পারে।

১৮৮০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যবর্তী গ্রামীণ মজুর

এই আলোচনার সময়কাল ১৮৮০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। বেশ কয়েকটি কারণেই ১৮৮০ সালকে আমি প্রারম্ভিক সময় হিসেবে নির্বাচিত করেছি। পূর্ব বাংলার কৃষি গত শতাব্দী থেকে উন্নতির পথে পা বাড়ায় এবং ১৮৮০ সালের দিকে রেলযোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবার পর কৃষিজ পণ্য বাজারজাতকরণে এবং পরিকল্পিত উৎপাদনে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগে। এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতির সাথে বিশ্বঅর্থনীতির সংযোগসাধন ত্বরান্বিত হয়। এ এমন এক চূড়ান্ত সময়, যখন আন্তর্জাতিক ব্যবসার তরঙ্গ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে বেশ কয়েকটা কারণে ; যেমন সুয়েজ খাল উন্মোচন, বাষ্পীয় জলযানের উন্নয়ন, তারবার্তায় যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং শুল্কনীতির ব্যাপারে বৃটিশ ভারতীয় সরকারের উদার মনোভাবগ্রহণ। এই উন্নতির ফলে গ্রামীণ পূর্ব বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে বলা যেতে পারে।

আমাদের অনুসন্ধানের প্রারম্ভিক সময় হিসেবে ১৮৮০-এর দশককে নির্বাচনের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, এই সময় বহুবিধ আইন ও পদ্ধতি প্রবর্তনের সন্ধিক্ষণ এবং অবশেষে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশে তা সহায়ক হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল সামন্তপ্রভুদের অত্যাচার বন্ধ করা এবং প্রজাবর্গের কয়েক ভাগকে মিলিত হবার অনুমতি

৮. Amit Bhaduri, "A Study in Agricultural Backwardness under Semi-Feudalism", *Economic Journal*, 38, 329 (1973), 120-137, James K Boyce's *Agrarian Impasses in Bengal Institutional Constraints to Technological Change*, (Oxford 1987), 41-44 , B K Jahangir, *Differentiation, Polarisation and Confrontation in Rural Bangladesh*, (Dacca 1979)

দিয়ে উৎপাদনকারী কৃষকের দীর্ঘতর সময়ব্যাপী পণ্যবপ্তানির ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা। যারা এতদিন ধরে ভূমিরাজস্ব ও খাজনার মাধ্যমে গ্রামীণ উদ্বৃত্ত ভোগ করছিল (যেমন জমিদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগী), এই ব্যবস্থা তাদের কিছুটা ক্ষতিসাধন করে, কিন্তু আর এক ধনী কৃষকগোষ্ঠী সৃষ্টি করে, যারা ব্যবসা ও ঋণের এই নতুন পথে সম্পদশালী হতে থাকে। এইসব নীতির ফলেই ১৮৮০-এর দশক থেকে পরবর্তীকালে গ্রামীণ শ্রেণীভেদের এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয় এবং পরিণতিতে প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকেরা আংশিকভাবে ভূমিচ্যুত হতে থাকে।

সর্বশেষে, এই প্রারম্ভিক সময় নির্বাচনের কিছু পদ্ধতিগত কারণও রয়েছে। ১৮৮০ সালের আগেকার গ্রামীণ পূর্ব বাংলা সম্পর্কে তথ্য খুবই অপর্যাপ্ত এবং তার মান সর্বদাই সন্দেহজনক। এমনকি অতি সাম্প্রতিককালের বিষয়েও তথ্যের উৎস সম্পর্কে আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হচ্ছে। কিন্তু ১৮৮০ সালের পর গ্রামীণ মজুরদের সম্পর্কে প্রায়শ এবং কিছুটা বিশদভাবেই তথ্য পাওয়া যেতে থাকে। প্রথম দিকে তথ্যের বেশির ভাগ আসে সরকারি রেকর্ড থেকে। কিন্তু আলোচ্য সময়ের শেষভাগে অধিকতর স্বাধীন উৎস-দলিল পাওয়া যায়। তা হলেও বেশির ভাগ সময়েই প্রামাণ্য দলিলের অভাব থেকে যায়। অধিকন্তু বিভিন্ন প্রকারে যেসব উৎসের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়, তার তুলনামূলক বিচার করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাদের দেয়া তথ্যের মধ্যে শুধু যে সময় ও স্থানের পার্থক্যই থাকে তাই নয়, তা"র ধাবণার মাত্রারও পার্থক্য থাকে ছোট্ট গ্রাম থেকে সারা বাংলা জুড়ে। কিন্তু এর চেয়েও বড় সমস্যা মজুরের সংজ্ঞার পার্থক্য। এমনকি লোকগণনার মতো উৎস থেকে গৃহীত তথ্যের মাত্র একটি ধারার মধ্যেও সংজ্ঞার এই সমস্যা দেখা যায়। এব পরে থেকে যায় মানের প্রশ্ন। নিম্নমানের গবেষণার জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ মজুরদের সম্পর্কে প্রাপ্ত অনেক তথ্যই বিকৃত। এক্ষেত্রে যে গ্রামীণ মজুরদের উপর নির্ভর করা হয়েছিল তাদের তথ্য গোপন করার বা তারা যে মজুরির উপর নির্ভরশীল তা গোপন করার প্রবণতা দেখা দেয়। পরিশেষে, বাংলাদেশের মজুর শ্রেণীর উপর আগেকার সমীক্ষাগুলোতে ঐতিহাসিক প্রামাণ্য তথ্যাবলীর সমন্বয়ের অভাবের কারণে বাধ্য হয়ে বর্তমান সমীক্ষাকে এক সাধারণ অনুসন্ধানের পর্যায়ে অবনমিত করতে হয়েছে, যাব মধ্যে কিছু চূড়ান্ত বিষয় শুধু উল্লেখ করা সম্ভব।[৯]

৯. ১৮৮০ সালের পূর্বেকার বাংলার গ্রামীণ মজুবদের উপর প্রাথমিক গবেষণার কাজ অনেক বাকি বয়েছে। প্রাক-ঔপনিবেশিক সময়ে এবং ঔপনিবেশিক আমলের প্রাবম্ভিক সময়ের শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহেব সমীক্ষায় গ্রামীণ কাবখানার মজুরদের সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত তথ্য পাওয়া যেতে পাবে। (দেখুন, Prakash, Mitra, Baru এবং Mohsin)। এই সমস্ত কারখানায় সর্বহারার উদ্ভব সম্পর্কে কোন সমন্বিত চিন্তাধারা এবং কয়েকটি কারখানা বিলুপ্তির পর মজুরদের ভাগ্য সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। দাসমজুর এবং দাসপ্রথার প্রামাণ্য তথ্যের জন্য দেখুন, Chattopadhyay and Sarkar ঐ সময়ের পূর্ণ কালের জন্য বাংলাদেশের শহুরে মজুরদের ঐতিহাসিক গবেষণার ব্যাপারে ঐ একই সত্য দেখা যায়।

পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব আরো বেশি করে চোখে পড়ে, যখন দেখা যায় যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে শ্রমের প্রয়োজনীয়তা অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার বিবরণ লোকগণনার মতো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত উৎসের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। লোকগণনার পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯০০ সালের দিকে সারা বাংলাদেশে মাত্র ৬ লক্ষ গ্রামীণ লোক ছিল, যাদের মূল পেশা ছিল মজুরগিরি। ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে এই সংখ্যা ১২ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ লক্ষে পৌঁছায়। যা প্রকাশ পেয়েছে, বাস্তবে আনুপাতিক বৃদ্ধি ছিল তার চেয়েও বেশি। এই শতাব্দীর আদমশুমারির হিসাবে প্রতি ১৪ জন কৃষকের মধ্যে ১ জন ছিল সম্পূর্ণভাবে মজুরগিরির উপর নির্ভরশীল (বা ৭%)। ১৯৭০-এর দশকে অনুরূপ ৪ জনে কমপক্ষে ১ জন উল্লেখ করা হয়েছে (বা ২৭%)।[১০]

এই সংখ্যাগুলো নিশ্চয়ই সন্দেহাতীত নয় এবং এগুলোর সমালোচনামূলক নিরীক্ষার সুযোগ আছে। কিন্তু সাধারণভাবে এগুলো থেকে প্রতিফলিত হয় যে, গ্রামীণ বাংলাদেশের জনজীবনে শ্রমের চাহিদা বছরের পর বছর নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুখ্য পেশা হিসেবে শ্রমে নিযুক্ত জনসংখ্যার সাথে আরো রয়েছে অসংখ্য গ্রামীণ শ্রমজীবী, যাদের সহায়ক আয়ের উৎস হচ্ছে শ্রমমজুরি। যদিও সারা বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নির্ভরযোগ্য সংখ্যা পাওয়া যায় না, তথাপি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭০-এর দশকের মধ্যপর্যায়ে গ্রামীণ উপার্জনক্ষম মানুষের অর্ধেকের মতো লোক জীবনধারণে হয় মুখ্য আয়ের জন্য, নয় সহায়ক আয়ের জন্য শ্রমমজুরির উপর নির্ভরশীল।

এই তথ্যগুলোর ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত ধারণা করা যেতে পারে যে, গ্রামীণ বাংলাদেশে জীবনধারণের উপায় হিসেবে শ্রম দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাম্প্রতিক-কালের বাংলাদেশে

বাংলাদেশের শহুরে মজুরদের উপর প্রায় সব সমীক্ষাই বাংলাদেশের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল কলকাতার (যা বর্তমানে ভারতে) শ্রমিকদের নিয়েই পরিচালিত। পশ্চিম বাংলার চেয়ে প্রথাগতভাবে শিল্পে অনুন্নত দেশ বাংলাদেশের শহুরে শ্রমিকদের এক সমন্বিত ইতিহাস লেখা এখনও বাকি রয়েছে। চক্রবর্তীর কলকাতার উপর সমীক্ষার মধ্যে অনেক তথ্য আছে, যা ১৮৯০ সাল থেকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে।

Om Prakash *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal 1630-1720*, (Princeton, N J 1985) Debendra Bijoy Mitra, *The Cotton Weavers of Bengal 1757-1833*, (Calcutta 1978) Balai Barui, *The Salt Industry of Bengal, 1757-1800 A Study in the Interaction of British Monopoly Control and Indigenous Enterprise*, (Calcutta 1985), Khan Mohammad Mohsin, *A Bengal District in Transition: Murshidabad, 1765-1793*, (Dhaka 1973). Amal Kumar Chattopadhyay, *Slavery in the Bengal Presidency, 1772-1843*, (London 1977), Tanika Sarkar, "Bondage in the Colonial Context" in Utsa Patnaik and Manjari Dingwaney (eds), *Chains of Servitude Bondage and Slavery in India*, (Madras 1985), 97-126 Dipesh Chakrabarty, *Rethinking Working-Class History Bengal 1890-1940* , (Princeton, N J. 1989)

১০. *Census of India, 1901*, Vol IV, *Report on the Census of Assam, 1901*, (Shillong 1902), 72 Volume IV /A Tables I, II, XV, Volume VI, *The Lower Provinces of Bengal and their Feudatories*, Part I , *The Report*, by E A Gait, (Calcutta 1902), 488-497, Part II, Table XV, Government of West Bengal, *Economic Review, 1979-80*, (Alipore 1980), 8-9, 191-195: Government of the People's Republic of Bangladesh, *Population Census of Bangladesh, 1974*, National Volume Report & Tables, (Dacca 1977), 34 35, 555-558

সামাজিক রূপান্তরে শ্রম এক চূড়ান্ত মাত্রা যুক্ত করেছে। আমরা এই বৃদ্ধির উপর সমীক্ষা চালাবো আর আমাদের সংজ্ঞায় গ্রামীণ মজুর হবে কৃষিতে বা অন্য কোন গ্রামীণ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত শ্রমিক, যারা উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপায়কে নিয়ন্ত্রণ করে না বা শ্রমপ্রক্রিয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করে না এবং যারা শুধু তাদের কাজের বিনিময়ে নগদ টাকা বা অন্য কোন দ্রব্য পায়। আমরা আরো দেখবো যে, সর্বদা শ্রমিক শ্রেণীকে খুব তীক্ষ্ণভাবে ভাগ করা যায় না, বিশেষকরে যেখানে ভাগচাষী এবং চাষী আছে। অতএব আমাদের এই সংজ্ঞা কাজ চালানোর সংজ্ঞা হিসেবেই থাকবে।

উনিশ শতকের শেষভাগে 'নিম্নশ্রেণী' : ডাফরিন রিপোর্ট

উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলাদেশের ঘটনাবলীর বহুলাংশ এখনো লিখিত দলিলের আওতার বাইরে রয়ে গেছে। তাই বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, অন্তত এই সময়ের গ্রামীণ মজুর ও গ্রামীণ দারিদ্র্যের উপর একটা বিশদ বিবরণের উৎস আছে আর তা হচ্ছে বাংলাদেশের নিম্নশ্রেণীর জনগণের অবস্থার উপর রিপোর্ট, যা 'ডাফরিন (তৎকালীন ভাইসরয়) রিপোর্ট' নামেই বেশি পরিচিত। এতে ছিল বৃটিশ ভারতীয় সরকারের গোপন অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যাবলী। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল :

> ভারতের অধিকাংশ জনগণ দৈনন্দিন খাদ্যাভাবে ভুগছে— অবিরাম উত্থাপিত এই দাবির পিছনে আদৌ কোন ভিত্তি আছে কিনা তা নির্ধারণ করা।[১১]

এই অনুসন্ধানের সময় সারা বাংলাদেশের প্রায় ১০০টি গ্রামে সরকারি কর্মচারীরা তথ্যসংগ্রহের জন্য ব্যাপক সমীক্ষা চালায় এবং তা প্রতিনিধিত্বমূলক হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কথা। অনুসন্ধানের প্রারম্ভে গ্রামীণ জনগণকে ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : চাষী, কারিগর, মজুর ও ভিক্ষুক। অনুসন্ধানকারীদেরকে প্রত্যেক শ্রেণী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হয়। এই ধরনের গবেষণায় অনুসৃত নীতির দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও (যা কতিপয় অনুসন্ধানকারীর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি)[১২] বাংলা-দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য ও তুলনামূলক বিবরণ পাওয়া যায়। সম্ভবত কৃষিমজুরদের বিষয়ে রিপোর্টটিতে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক উপসংহার টানা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত প্রাপ্ত মতামতের পরিপন্থী নিম্নরূপ বক্তব্য সেই অনুসন্ধানে পাওয়া যায় :

> যেখানে বিশদভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে সেখানেই দেখা গেছে যে, অনুরূপ মজুরেরা অগণিত এবং এ বিবরণ প্রায়ই সরকারিভাবে দেওয়া হয়ে থাকে ... যে বাংলাদেশে সাধারণভাবে বা বিশেষ কয়েকটি জেলায় খুবই কম সংখ্যক ভূমিহীন মজুর আছে, এমন বক্তব্যের আদৌ কোন ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না।[১৩]

১১. *Dufferin Report (Report on the Conditions of the Lower Classes of Population in Bengal,* (Calcutta 1888), *India Office Records* IOR L/E/7/185, Covering Statement by P. Nolan, 1882, 12

১২. *Dufferin Report,* Presidency Division Report by A. Smith, 1888, Chittagong Division Report by D. R. Lyall, 1

১৩. *Dufferin Report,* Covering Statement By P. Nolan, 1888.

বাস্তবিকই, গ্রামনিরীক্ষায় দেখা যায় যে, গ্রামীণ বাংলাদেশের গৃহস্থালির শতকরা ২৬ ভাগের একমাত্র বা মূল পেশা হচ্ছে মজুরি। গরিষ্ঠতম অনুপাত দেখা যায় পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে, বিশেষকরে মেদিনীপুর (৪৩%), মালদহ (৪২%) ও মুর্শিদাবাদে (৩০%) এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম জেলাতে (২৩%)। লঘিষ্ঠতম অনুপাত দেখা যায় উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে। শেষোক্ত এলাকায় তার অনুপাত বিশেষভাবে কম—ময়মনসিংহে ৪%, ত্রিপুরায় ৬% ও নোয়াখালীতে ৬%। এই সংখ্যাগুলো যদিও অনুমিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি, তবু তা সম্পূর্ণ চিত্র প্রকাশ করে নি। গ্রামীণ বাংলাদেশে মজুরি ছাড়া আরো আয়ের উৎস ছিল। কেননা নিরীক্ষিত গ্রামগুলোর শতকরা ১৪ থেকে ৬৩ ভাগ সংসারে মজুরির পাশাপাশি অন্য যে আয়ের উৎস ছিল তা সাধারণত চাষাবাদ। একমাত্র মুখ্য বা সহযোগী আয়ের উৎস হিসেবে সারা বাংলাদেশে মজুরির উপর নির্ভরশীল গৃহস্থালির অনুপাত ছিল ৩৯%। আবার অঞ্চলগত পার্থক্যও দেখা গেছে ত্রিপুরায় প্রায় ২০% থেকে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে ৫০%-এর অধিক পর্যন্ত। কিন্তু এই তথ্যের মান বিচার করলে তা আয়ের উৎস হিসেবে মজুরির এই আঞ্চলিক তারতম্যের বিষয়ে সুস্পষ্ট অভিমত প্রদানের অনুমোদন দেয় না।

ডাফরিন রিপোর্টে গ্রামীণ মজুরদের সংখ্যা যা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা যায়। রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর বিবেচনা করে বিষয়টি গোপন রাখা হয়েছিল এবং এর ফলে পর্যবেক্ষকদের মনে গ্রামীণ বাংলাদেশে মজুরদের সংখ্যা খুবই নগণ্য বলে ধারণা বিদ্যমান থাকে। এই ধারণাকে আরো দৃঢ় করেছিল লোকগণনাসহ পরবর্তী সময়ের অনেক রিপোর্ট। এগুলোর কোনটাই ১৮৮০ সালের সমীক্ষার মতো বিশদ তথ্যসম্বলিত ছিল না এবং পূর্বেকার আদমশুমারির বিবরণের উপর ডাফরিন রিপোর্টের মন্তব্য পরবর্তীকালের রিপোর্টগুলোর উপরেও বর্তাতে পারে। ফলে তাদের (কৃষিমজুরদের) সংখ্যা সম্পর্কে তথ্য খুবই অপ্রতুল এবং সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়।[১৪]

শ্রমশক্তির গঠনপ্রণালী

এই শ্রমশক্তি কিভাবে গঠিত হয়েছিল ? ডাফারিন রিপোর্টে লিঙ্গ, বয়স এবং অংশগ্রহণের মাত্রাকে ভিত্তি করে বিভাগ দেখানো হয়েছিল। শুধু চাষীদের মধ্যে নয়, মজুরদের মধ্যেও লিঙ্গভেদে বিভাজন স্পষ্ট ছিল। যেসব মহিলা নিজ গ্রামে বা বাড়ির আশেপাশে কাজ খুঁজতো, তাদেরকে ধানক্ষেতের কাজে লাগানো হতো না। অবশ্য এর ব্যতিক্রম মাঝেমধ্যে ঘটতো উত্তরবঙ্গে। মহিলাদের ধান রোপন এবং কাটার সময় কাজে লাগানো হলেও কখনো লাঙল চালনার কাজে লাগানো হতো না। অপরপক্ষে অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে ধান ভেনে নারীমজুরদের অর্থ আয় করা ছিল সাধারণ নিয়ম আর এই

১৪. ঐ

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দ্বার পুরুষদের জন্য ছিল বন্ধ। অবশ্য মজুরির বিনিময়ে ধান মাড়াইয়ের কাজ, ধান সিদ্ধ করার কাজ, গৃহস্থালিতে চাকরানীর কাজ এবং তসরের সুতো বা চট বোনার কাজে মেয়েদের নিয়োগের কথা খুব কমই উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে, পুরুষ মজুরেরা তাদের আয়ের প্রায় সবটুকুই ক্ষেতের কাজ থেকে উপার্জন করতো বলে বর্ণিত। এই আয়ে যখন কুলাতো না, তখন ফসল তোলার মরসুমের পর তারা ঘরামির কাজে, পুকুর কাটার কাজে বা কুলির কাজে লেগে যেতো। কয়েক এলাকায় আমরা ভিন্ন ধরনের কাজের সাক্ষাৎ পাই—পাটকলে, ইটের ভাটায় বা রেশম কারখানায় অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে বা নৌকার মাঝি বা দাঁড়ি হিসেবে, গাড়োয়ান বা কাঠুরিয়া হিসেবে, সমুদ্রগামী জাহাজে নাবিক হিসেবে, ইঞ্জিনে কয়লা যোগানদার হিসেবে বা সরকারি হস্তীশিকারে ঢুলি হিসেবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও দিনমজুর হিসেবে আয়ের যোগান দিত। সাধারণত তারা তাদের পিতা-মাতার সাথে একই কাজে নিযুক্ত থাকতো। এই সাথে ছেলেরা প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই গবাদি পশুর রাখালি করে আয় করতে পাবতো।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে ভূমিহীন বা দিনমজুরির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল লোকের হার বেশ কম ছিল। তবে প্রামাণ্য তথ্যে দেখা যায় যে, কৃষক শ্রেণীর এক বিরাট অংশ খণ্ডকালীন মজুব ছিল। পূর্বাঞ্চলের গৃহস্থালির সঙ্গে যুক্ত জনগণের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মজুরগিরির সাথে নিজের জমিতে বা বর্গায় নেয়া জমিতে চাষ করতো এবং মাঝেমধ্যে কারিগরি কাজ বা ব্যবসাও করতো। ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা এবং নোয়াখালীর কয়েকটি গ্রামের উপর বিশদ সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ঐ সমস্ত গ্রামের বাসিন্দার ৬% ছিল ভূমিহীন (অর্থাৎ তাদের চাষাবাদের জমি ছিল না, কিন্তু বসতবাটি ছিল) এবং তারা কৃষিমজুর হিসেবে জীবনযাপন করতো। আর ৩৩% একসঙ্গে মজুর ও চাষী হিসেবে অথবা কোন কোন সময়ে কারিগর হিসেবে কাজ করে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আয় করতো। মজুরিআয়ের প্রয়োজনীয়তার তারতম্যও ঘটতো ব্যাপকভাবে। কিন্তু গড়পড়তায় সারা বছরের আয়ের অর্ধেকের সামান্য কিছু বেশি আয় আসতো মজুরি থেকে। এতে দেখা যায় যে, মজুরিআয়ের উপর নির্ভরশীল বাসিন্দার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ ছিল ভূমিহীন এবং শ্রমমজুরি বাবদ সমগ্র আয়ের তিন-চতুর্থাংশ আয় করতো খণ্ডকালীন মজুরেরা। স্পষ্টত বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের গ্রামীণ মজুরদের বিষয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুধু ভূমিহীনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে না। বাংলাদেশের পশ্চিম অঞ্চলের সকল প্রতিবেদন থেকে একই চিত্র পাওয়া যায়। সেখানকার গ্রামীণ মজুরদের মধ্যে ভূমিহীন মজুরেরা সমগ্র আয়ের মধ্যে পূর্বাঞ্চলের মজুরের চেয়ে বেশি অংশ আয় করতো।[১৫] একমাত্র ব্যতিক্রম সুদূর দক্ষিণাঞ্চলের চট্টগ্রাম, যেখানে ভূমিহীনের সংখ্যার হার অনেক বেশি (জরিপকৃত ১১টি গ্রামের বাসিন্দার ২৩% এবং অন্য

১৫. ব্যতিক্রমের জন্য দেখুন, *Dufferin Report*, Burdwan Division Report by N.S Alexander, 1888, 2.

৯টি গ্রামের বাসিন্দার ৪৪%) এবং মজুরগিরির উপর চরমমাত্রায় নির্ভরশীল ছিল যথাক্রমে ৫৫% এবং ৭৪% বাসিন্দা।[১৬]

শ্রমিক সম্পর্ক

যদিও ডাফরিনের অনুসন্ধানের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য ও অভাবের পরিমাণ নির্ণয় করা, তথাপি ঐ রিপোর্টে বিশদভাবে বলা হয়েছিল যে, গ্রামবাংলায় তিন ধরনের মজুরের সহাবস্থান ছিল : নৈমিত্তিক দিনমজুর, বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক মজুর এবং নানা ধরনের মরসুমি মজুর। ১৮৮০-এর দশকে নৈমিত্তিক দিনমজুরিই ছিল গ্রামীণ মজুর নিয়োগের প্রধান ধরন। কিন্তু মওসুমভিত্তিতে এবং স্থানীয় শস্যফলানোর রীতির হেরফেরে তাদের নিয়োগধরনেও তারতম্য ঘটতো। আবার শ্রমচাহিদা সব সময়ে মজুরি দিয়ে মেটানো হতো না। মজুরিব্যবস্থা না রেখে শুধু সুযোগসুবিধার পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমেও শ্রমিক পরিবর্তনের রীতি ক্ষুদে কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত (স্থানীয়ভাবে এদেরকে বদলা, গান্টু ইত্যাদি বলা হতো) ছিল। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী মজুরিশ্রমিকদের কাজের পরিবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে ছিল একই রকম; পার্থক্য ছিল শুধু মজুরির পরিমাণে এবং তা প্রদানের মাধ্যমের মধ্যে।[১৭] পুরুষ মজুরদের বেলায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মজুরি নগদ টাকায় দেয়া হতো। সেই সাথে মনিব দুপুর বেলার খাবারও দিত। অনেক সময় তামাক, গোসলের জন্য তেল এবং সকালের নাশতার জন্য চিড়া-মুড়িও দেয়া হতো। প্রদেয় সমগ্র মজুরির মধ্যে জিনিসের চেয়ে নগদ টাকার অংশ সাধারণত বেশি থাকতো। কিন্তু মহিলাদের কম হারে মজুরি দেয়া হতো। তাদের মজুরি দ্রব্য দিয়েই মেটানো হতো, কোন খাবার বা অন্য কিছু দেয়া হতো না। সাধারণত ধান ভানার জন্য চালের দশ ভাগের এক ভাগ হিসেবে মজুরি দেয়া হতো।

১৮৮৮ সালের প্রথমদিকের মাসগুলোতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষেত-মজুরদের মজুরির পরিমাণ ছিল মোটা পরিষ্কার চাল ২ সের থেকে ৯ সের পর্যন্ত।[১৮] লঘিষ্ঠ হার

---

১৬. *Dufferin Report*, Chittagong Division Report by D. R. Lyall, 1888,13, Chittagong District Report by A. Manson,2, Chittagong Tehsildar Report by Babu Haripada Ghose, I

১৭ দেখুন, Van Schendel and Faraizi, *Rural Labourers*, 14.

১৮ বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মজুরির হার নিয়ে তুলনা করা খুবই কঠিন। এই সমীক্ষায় আমি মজুরির হারকে চাউলের তুল্যে প্রকাশ করেছি। নগদ টাকা ও জিনিসপত্র প্রদানের মূল্যও হিসাব করে যোগ করা হয়েছে। এইভাবে সমগ্র পরিমাণকে মোট পরিষ্কার চাউলের দাম দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। এইভাবে দৈনিক মজুরি মোটা চাউলের সেরের তুলনায় প্রকাশ করা হয়েছে (১সের=০.৯ কেজি), যেহেতু চাল ছিল সমগ্র সমীক্ষাকালে গরিব বাঙালির প্রধান খাবার। অবশ্য একথা বলতে চাওয়া হয় নি যে, মজুরেরা বা তাদের পরিবারের লোকেরা ঐ পরিমাণ চাউল খেয়ে ফেলতো, সংসারের অন্য খরচও মিটাতো ঐ দৈনিক মজুরি থেকে।

দেখা যায় পশ্চিম বাংলায় এবং গরিষ্ঠ হার দেখা যায় পূর্ব বাংলায়। এর ফলে পূর্বাঞ্চলের চাষীরা তুলনামূলকভাবে অধিক সচ্ছল ছিল। যতোই পশ্চিম দিকে যাওয়া যেতো এই সচ্ছলতার হার ততোই হ্রাস পেতে পেতে বিহারে এসে ন্যূনতম হারে পৌঁছাতো। ডাফরিন রিপোর্টের অনুসন্ধানকারীরা পূর্ব বাংলার কৃষকদের আর্থিক অবস্থা অনেক সময় অতিরঞ্জিতভাবে বর্ণনা করেছেন। লারমিনি বলেন, চাহিদা অনুযায়ী পূর্ব বাংলার কৃষকেরা সম্ভবত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সচ্ছল ছিল।[১৯] লায়াল বিশেষভাবে বলেন :

> একথা দিবালোকের মতো সত্য যে বাংলাদেশের রায়তদের অবস্থা বিহারের রায়তদের চেয়ে ভালো। বাংলাদেশের রায়ত ও বিহারের রায়তের অনুপাত হচ্ছে চট্টগ্রাম বিভাগের বেশিরভাগ অংশের রায়তের সাথে বাংলাদেশের রায়তের অনুপাত। সে প্রভূত পরিমাণে সচ্ছল, ভালভাবে জীবনযাপন করে, ভাল পোশাক পরে এবং সবদিক দিয়েই মধ্যবাংলা বা এমনকি ঢাকা ও ফরিদপুরের রায়তের চেয়েও আরামদায়ক অবস্থায় আছে। আবামের সাধারণ মাত্রার এই বিভাগের রায়তদের সাথে শুধু বাকেরগঞ্জের রায়তদের তুলনা করা যেতে পারে।[২০]

পূর্ব বাংলার মজুরেরা পশ্চিম বাংলার মজুরদের তুলনায় প্রায়ই অধিকতর জমাজমির অধিকারী থাকায় স্পষ্টত এক ভালো অবস্থানে থেকে তাদের মনিবদের সাথে বেশি মজুরির বিষয়ে দরকষাকষি করতে পারতো এবং তাদের মনিবেরাও অধিকতর সচ্ছল থাকায় তা প্রদানে সক্ষম ছিল।

ডাফরিনের অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, অধিকাংশ জেলায় দিনমজুরেরা বছরে মাত্র ছয় থেকে নয় মাস পর্যন্ত কৃষি বা অকৃষিকাজ জোটাতে পারতো। বিবরণে দেখা যায়, বিশেষকরে পশ্চিম বাংলায় ও চট্টগ্রামে কাজকর্ম পাওয়ার সমস্যা মেটানোর প্রয়োজনে মজুরদের মওসুমি স্থানান্তর ঘটতো। পূর্ব বাংলায় এই প্রচরণশীলতা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই গ্রাম থেকে গ্রামের মধ্যে এবং মাটি কাটার বা শীত মওসুমে ধান কাটার কাজের মধ্যে সীমিত ছিল। প্রতি বছরেই এই কাজ না পাওয়ার দিনগুলোতে টিকে থাকার জন্য মজুরেরা ভিন্ন এক উপায় অবলম্বন করতো। তা হচ্ছে ভরণপোষণের জন্য কর্জ করা। ডাফরিন রিপোর্টে এই রীতির উল্লেখ রয়েছে। আগত বছরের সবচেয়ে ভরা মওসুমে সবচেয়ে কম হারের মজুরিতে শ্রম দিয়ে আসল ও সুদ পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতিতে ধান বা অন্য কোন খাদ্যশস্য কর্জ নেয়াই ছিল সাধারণ রীতি। এভাবে ঋণিতা নৈমিত্তিক দিনমজুরি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থানের অধিকতর স্থায়ী পদ্ধতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করে। ডাফরিন রিপোর্টের তথ্য অনুসারে বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক বা বারোমেসে মজুরগিরি ছিল দ্বিতীয় প্রধানতম শ্রমিকসম্পর্ক। এর সাধারণ ভিত্তি ছিল ঋণিতা এবং তা একমাত্র দিনাজপুর ব্যতীত

---

১৯. *Dufferin Report*, Dacca Division Report by W R Larminie, 1888, 1.

২০. *Dufferin Report*, Chittagong Division Report by D. R Lyall, 1888,1 আরো দৃষ্টান্তের জন্য দেখুন, Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 16

বাংলাদেশের সর্বত্রই বর্তমান ছিল। অবশ্য বংশগত ঋণদানের উল্লেখ ছিল না।[২১] কিন্তু বারোমেসে মজুরদের সংখ্যার মাত্রা নির্ধারণে এই রিপোর্ট আমাদেরকে খুব বেশি সাহায্য করে না। অবশ্য এতে এই জটিল সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক তারতম্যের বিবরণ পাওয়া যায়। পুরুষ ভূমিদাসদের বার্ষিক মজুরি নগদ টাকায় (যার বেশিরভাগ আগাম দেয়া থাকতো) এবং খাবার, তামাক, তেল ও কাপড়চোপড় দিয়ে মেটানো হতো। এই রিপোর্টে কোন নারীমজুরের উল্লেখ নেই। অবশ্য পরবর্তী রিপোর্টে তার উল্লেখ দেখা যায়। পশ্চিম বাংলার জেলাগুলোর কোন কোন অঞ্চলে ভূমিদাসদের চাষাবাদের জন্য চাকরান নামে কিছু জমি দেয়া হতো। এই ব্যবস্থা এই শ্রেণীর মজুর থেকে ভাগচাষীর পার্থক্য নিরূপণে সমস্যা সৃষ্টি করে। কিন্তু পূর্ব বাংলার কোন কোন জেলার বেলায় ঐ ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয় নি।[২২] মজুরদেরকে মনিবদের গৃহেই থাকতে হতো, অবশ্য আলাদা ঘর করে। অনেক সময় তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদেরকে গৃহস্থের কাজে সাহায্য করতে হতো। সারা বছরে সবকিছু মিলিয়ে ভূমিদাসেরা ১২০০ সের থেকে ১৫০০ সের পর্যন্ত মোটা পরিষ্কার চাউলের তুল্য অর্থ উপার্জন করতো, যা দৈনিক হারে ৩ থেকে ৪ সের পরিমাণ দাঁড়ায়। বালক মজুরেরা শুধুমাত্র থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার বিনিময়েই কাজ শুরু করতো। তার বয়স বারো বছর পার হলে নগদ টাকা মজুরি হিসেবে যোগ হতো এবং তখন থেকে তার আয় সর্বসাকুল্যে বছরে দাঁড়াতো ৭০০ থেকে ১১০০ সেরের সমান।[২৩] ডাফরিন রিপোর্ট অনুযায়ী মওসুমি মজুরগিরি ছিল তৃতীয় প্রধানতম শ্রমিকসম্পর্ক। শীতকালে এদের প্রয়োজনীয়তা ছিল বেশি। মওসুমি কাজ দুই থেকে ছয় মাস স্থায়ী হতো এবং ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ফসল পাকার মওসুম অনুযায়ী প্রচরণশীল মজুরদেরকে সাধারণভাবে কাজে লাগানো হতো। কিন্তু মাটি কাটার কাজ, যানবাহনের কাজ, তামাকে ঘাঁট বাঁধার কাজ এবং আরো নানা ধরনের কাজ এই মওসুমি ভ্রাম্যমান মজুরদের উপর খুব বেশি নির্ভর করতো। ডাফরিনের অনুসন্ধান অনুসারে অর্ধেক কাজের বেলায় ধান ও খাবার দিয়ে এবং বাকি অর্ধেকের বেলায় নগদ টাকা ও খাবার দিয়ে মওসুমি মজুরদের মজুরি মেটানো হতো। ধানের অংশ সাধারণভাবে কাটা ফসলের পরিমাণের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হতো। তবে তারতম্যও ছিল—কোন সময় বারো ভাগের এক ভাগ, কোন সময় পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

২১. উত্তর বাংলায় কিছু বংশগত দাসশ্রমিকের সন্ধান পাওয়া যায়। Lowis জানান যে, ঋণ ও কাজের বোঝা পিতা থেকে পুত্রে বর্তাতো; Nolan জানান যে, দিনাজপুরে মজুর শ্রেণী প্রায়ই ঋণভারে জর্জরিত এবং মহাজনের কাছে সারাজীবনের জন্য দাস হয়ে থাকতো। এই দাসগিরি অনেক সময়ে উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তাতো পিতার ঋণকে নিজের ঋণ হিসেবে স্বীকৃতির মাধ্যমে। বিপরীতক্রমে *Dufferin Report*-এ বিহারের দাসশ্রমিক (কামাইয়া) সম্পর্কে বহু বিবরণ রয়েছে। *Dufferin Report*, Rajshahi Division Report by E. E. Lowis, 1888, 4, Covering Statement by P. Nolan,4.

২২. *Dufferin Report*, Report for Burdwan, Birbhum, Nadia, Murshidabad, Dinajpur and Malda.

২৩. দেখুন, Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 18-19.

মওসুমি মজুরেরা মাসে ৯০ থেকে ২৬০ সের পর্যন্ত মোটা পরিষ্কার চালের তুল্য আয় করতো। পূর্ব বাংলায় অবশ্য আয়ের হার বেশি ছিল। চট্টগ্রাম থেকে আরাকানে বা সংলগ্ন বার্মার উপকূলে গিয়ে কর্মরত ফসল কাটার মজুরেরা অনেক বেশি আয় করতো, চট্টগ্রামের চালের তুলনায় যা ছিল ৩২০ থেকে ৬০০ সেরের সমান।[২৪] এই ভ্রাম্যমান মজুরদের অনেকেই ছিল নিজ বাড়িতে জমির মালিক। একই ধারায়—

> দক্ষিণভাগের চেয়ে আগেই ধান পেকে যাবার কারণে খুলনা জেলার উত্তরভাগের অনেক চাষী নিজেদের ধান কাটার পর সুন্দরবন এলাকায় চলে যেতো এবং সেখানে ফসল কাটার কাজ করে আয় করতো।[২৫]

এই তথ্য অনুসারে মওসুমি মজুরদের এই প্রচরণশীলতাকে তাদের নিজেদের এলাকায় জীবিকা অর্জনের সুযোগের অভাবের নিদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করলে সুস্পষ্টভাবে ভুল করা হবে। উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে বাংলাদেশে মোটামুটি সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকেরাও এই মওসুমি মজুরদের প্রচরণশীলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করেছে বছরের এমন সময়ে, যখন তাদের বসে বসে দিন কাটানো ছাড়া উপায় থাকতো না। এই ব্যাপারে গ্রামীণ মজুর ও চাষীদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গেলে বিভ্রান্তি ঘটতে পারে।[২৬]

গ্রামীণ মজুরদের উত্থান : ১৮৮০-১৯৮০

বাংলাদেশে কৃষকবিনাশ প্রক্রিয়া

গত একশ' বছর ধরে গ্রামীণ সচ্ছলতার সাধারণ অবনতি সম্পর্কে বাংলাদেশের ইতিহাসের সকল গবেষকই একমত। উনিশ শতকের শেষভাগে কৃষকদের সত্তাবিনাশী বেশ কয়েকটা প্রক্রিয়া শুরু হয়। 'কৃষকবিনাশ' শব্দটির দ্বারা সেই প্রক্রিয়াসমূহের সমষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে সামাজিক ভেদাভেদ সৃষ্টি এবং স্বাধীন কৃষিউৎপাদন ক্রমান্বয়ে অবহেলার মাধ্যমে স্বাধীন কৃষককে অনুৎপাদনশীল করে তোলা।

২৪ *Dufferin Report*, Chittagong Division Report by D R Lyall, 1888,1

২৫. *Dufferin Report*, Presidency Division Report by A Smith,1888,20 স্থানবদলকারী মজুর এইভাবে অতিরিক্ত ৫০০ সের ধান (বা ৮ মণ চাল) পেতে পারতো। উত্তর বাংলার জন্যও ঐ একই ধরনের ব্যবস্থা ছিল।

২৬. নদীয়ার কালেক্টর জোর দিয়ে বলেন : কোন শ্রেণীর জন্য সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না। চাষীদের বিরাট দল নিজেদের জমিতে এবং অপরের জমিতেও মজুরের কাজ করতো। মজুরদের নিজেদেরই জোত ছিল। কারিগরেরাও সাধারণ মজুরের কাজ করতো এবং ছোটোখাট চাষাবাদ দ্বারা আয়ের সম্পূরণ ঘটাতো। যারা ভিক্ষে করে দিন কাটাতো, সারা বছর ধরে তারা ঐভাবে চলতো না। *Dufferin Report*, Presidency Division Report by A. Smith, 1888; cf I, ঐ, 20; Chittagong Division Report by D R Lyall, I.

অধিকাংশ কৃষক ক্রমান্বয়ে চাষাবাদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে, গ্রামীণ সমাজে মেরুকরণ দেখা দেয়—একদিকে অল্প সংখ্যক শক্তিশালী ভূস্বামী/মহাজন/বণিকদের দল অন্যদিকে কোন না কোনভাবে ভূমিচ্যুত বিপুলসংখ্যক ভাগচাষী/মজুর/ভিক্ষুকদের দল। যে মাত্রায় এই শ্রেণী গ্রামীণ উৎপাদকদের (যাদেরকে বলা যেতে পারে স্বাধীন এবং পরিবারখামারমুখী কৃষক সম্প্রদায়) স্থান দখল করছিল, সেই মাত্রায় সমাজে কৃষকদের বিনাশ সাধিত হচ্ছিল বলা যেতে পারে। আমাদের সময়ের শুরুতে বাংলাদেশে এই কৃষকবিনাশ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হতে দেখা যায়।[২৭] এই সময়ে আন্তর্জাতিক ব্যবসা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং বাংলাদেশের কৃষিপণ্য বেশিকরে ব্যবসায়িক পণ্যে রূপান্তরিত হয় বিশেষকরে পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে, যেখানে 'নগদ টাকার নতুন ফসল' পাট প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। এই প্রবৃদ্ধি নতুন এক গ্রামীণ ক্ষমতাধর গোষ্ঠী সৃষ্টি করে, যাদের ক্রমবর্ধমান ঋণ ও পণ্যের বাজারে প্রবেশাধিকার ছিল এবং তারা খাজনার মাধ্যম ব্যতিরেকেই উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করতো। এই দলকে কোন কোন সময়ে জোতদার বলা হতো এবং তারা সনাতন জমিদারদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতো। ক্রমে ক্রমে উদ্বৃত্ত ভোগের আর্থিক কর্মকাণ্ড বহির্ভূত ধারা (বিশেষকরে জমির খাজনা এবং বেআইনি টাকা আদায় বা আবওয়াব আদায়, যা জমিদারি প্রথার বিশেষত্ব ছিল) পরিবর্তিত হয়ে আর্থিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে থাকে। জোতদারদের বিজয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যদিও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তাদেরকে সমর্থন দিয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্র জমিদারদের হাতছাড়া করতে পারে নি, কেননা তাদের কাছ থেকেই ভূমিরাজস্ব আদায় হতো। তথাপি নতুন আইন এবং আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা জোতদারদের প্রভাবাধীনে গ্রামীণ সামাজিক বৈষমের এক নতুন ধারার সূচনা করেছিল।

কৃষকবিনাশ বা স্বাধীন কৃষকশ্রেণীর অবনতি তিন ধরনের প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত ছিল; যথা গ্রামীণ ঋণিতা বৃদ্ধি, ভূমিবদলের ব্যাপকতা এবং শস্য ভাগাভাগির মাত্রাবৃদ্ধি। গ্রামীণ ঋণিতাকে কৃষকবিনাশের সাথে সম্পর্কিত করা ঠিক নয় (তা হয়তো প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদক কৃষকের ঋণগ্রহণক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারতো এবং সেই সাথে কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারতো[২৮])। কিন্তু বাংলাদেশে তাই ঘটেছিল। ভূমি-কৃষকের উৎপাদন অনুপাত হ্রাস, কৃষির চেয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবণতা, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং কোন কোন অঞ্চলে নদীসিকস্তির জন্য জমিতে উৎপাদনহার হ্রাস এবং মহামারী ইত্যাদি কারণসমূহ ঋণিতাকে ক্রমান্বয়ে ভোগমুখী করে তোলে এবং এইভাবে তা স্বাধীন চাষাবাদে

---

২৭ Binay Bhusan Chaudhuri কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ দেখুন, "The Process of Depeasantization in Bengal and Bihar, 1888-1947," *Indian Historical Review*, (July 1975), 105-165; Alan Smalley, "The Colonial State and Agrarian Structure in Bengal", *Journal of Contemporary Asia*, 13 2 (1983), 176-197 Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 27-36, Sugata Bose, *Agrarian Bengal. Economy, Social Structure and Politics 1919-1947*, (Cambridge 1986)

২৮. তুলনীয় Chaudhuri, 1975

অবহেলার এক মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নগরায়ণ এবং নগদ টাকার ফসলের উদ্ভব উভয়েই খাদ্যশস্যের বাজার বৃদ্ধি করে। কৃষিউৎপাদনে দেখা দেয় স্থবিরতা। যাই হোক, ঋণব্যবস্থা গ্রামীণ এক উঠতি দলের খাদ্য যোগাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ঐ একই সময়ে ভূমিহস্তান্তর ও ভূমিবাজার বৃদ্ধি পায়। ১৮৮৫ সালের পর প্রশাসনিক সংস্কারের ফলে আইনত ভূমিহস্তান্তর করা সহজতর হয়। কৃষিপণ্যের ব্যবসার ফলে জমির মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ঋণিতা কৃষককে জমি হাতছাড়া করতে বাধ্য করে। কিন্তু তখনো কৃষকদের সম্পূর্ণভাবে ভূমিহীন হয়ে যাবার প্রক্রিয়া খুব বেশি করে শুরু হয় নি, বরঞ্চ শস্যভাগাভাগির দ্রুত বিস্তার এই সময়ের গ্রামীণ বাংলাদেশে পরিবর্তনের প্রভাব ফেলে। প্রধানত নির্ধারিত খাজনার পরিবর্তে এবং নতুন চাষকৃত জমির বেলায় এই শস্যভাগাভাগি হতো।

উৎপাদকদের সর্বহারা করার কার্যকর পদ্ধতির চেয়ে এই শস্যভাগাভাগির পদ্ধতি ভূস্বামী মহাজনদের চার রকমের সুবিধা সৃষ্টি করে। প্রথমত, বিক্ষিপ্ত এবং খণ্ডিত ধানী জমিতে চাষাবাদে কোন বিনিয়োগ ছাড়াই শ্রমের বিনিময়ে ধনী কৃষকের ঋণআদায়ের ব্যবস্থা থাকে। দ্বিতীয়ত, চাষাবাদের ঝামেলা ভাগচাষীদের পোহাতে হয়। শস্যহানি হলেও এই ভাগাভাগির ফলে মহাজনের শস্যের অংশ ভাগচাষীদের শোধ করতে হতো। তৃতীয়ত এই ব্যবস্থা মজুরির বিনিময়ে শ্রমবিনিয়োগের চেয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের উৎপাদক কৃষকদের অধিক হারে শ্রমবিনিয়োগ নিশ্চিত করে। চতুর্থত, পুরাতন ঋণব্যবস্থার কোন পরিবর্তন না করেই শস্যভাগাভাগি অব্যাহত থাকে, কেননা উৎপাদক চাষীরা আরো অধিক হারে ঋণের উপর নির্ভরশীল হতে থাকে।[২৯] ধার্যকৃত নগদ টাকার চেয়ে শস্যভাগাভাগির ব্যবস্থা আরো আকর্ষণীয় ছিল, কারণ, টাকার মানের ক্রমঅবমূল্যায়নেও শর্তের কোন পরিবর্তন করা হতো না। অপরদিকে চাষাবাদে টিকে থাকার অন্য কোন উপায় না থাকায় ধনীরা বাধ্য হতো শস্যভাগাভাগির ব্যবস্থা মেনে নিতে। তারা চাষাবাদের বাইরে কোথায় কাজ পাবে ? তাদের জন্য এই ভাগচাষব্যবস্থা তাদেরকে দিনমজুরগিরি করার চেয়ে অনেক দীর্ঘমেয়াদি নিশ্চয়তা দিত, একটু বেশি মর্যাদা দিত এবং হয়তো বা একটু বেশি উপার্জনও দিত।

ঔপনিবেশিক যুগের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশের ভূমির উপরিকাঠামোর উপর অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক বিতর্ক এই জোতদার ও ভাগচাষীদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে বেশি করে দৃষ্টিগোচর করেছে।[৩০] কিন্তু এই সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তাকে খুব বড় করে দেখা উচিত

২৯. 'Dependency Web'-এর বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে Adrienne Cooper-এর "Share-croppers and Landlords in Bengal, 1930-50 The Dependency Web and its Implications", *Journal of Peasant Studies*, 10 2-3 (January- April 1983), 226-255.

৩০. দৃষ্টান্তস্বরূপ, Rajat and Ratna Ray, "The Dynamics of Continuity in Rural Bengal under the British Imperialism: A Study of Quasi-Stable Equilibrium in Underdeveloped Societies in a Changing World", *Indian Economic and Social History Review*, 10 2 (June 1973), 103-28, Binay Bhusan Chaudhuri, "Rural Power Structure and Agricultural Productivity in Eastern India, 1757-1947," in Meghnad Desai et al (eds), *Agrarian Power and Agricultural Productivity in South Asia*, (Dellhi 1984), 100-170; Rajat Kanta Ray, "The Retreat of the Jotdars ?" *Indian Economic and Social History Review*, 25·2 (1988), 237-247.

নয়। ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে জোতদারদের অনিশ্চিত অবস্থানের জন্য তাদের পক্ষে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে ভূমিব্যবস্থার সংস্কারসাধন করে পুঁজিবাদী ধারা অনুসরণের পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করানো অসম্ভব ছিল। জমিদারি কর আদায় এবং পাট ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের ও তাদের প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর ধার্য কর আদায় রাষ্ট্রের রাজস্বের মূলভিত্তি থাকায় রাষ্ট্র কৃষক সম্প্রদায়কে তখনো রক্ষা করে চলতে থাকে। এই কারণেই উঠতি কৃষিপুঁজির দ্বারা কৃষকদের উচ্ছেদসাধন বাধাগ্রস্ত হয়। গ্রামীণ শ্রমশক্তির ব্যাপকভাবে সর্বহারা হবার প্রক্রিয়া নয়, বরং শস্যভাগাভাগির বিস্তারই ঔপনিবেশিক বাংলাদেশে কৃষকবিনাশ প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধ প্রকৃতির ইঙ্গিত প্রদান করে।

অধিকন্তু এই ভাগচাষব্যবস্থা সর্বত্র ছিল না। তখনো এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাথমিক চাষী খুব বেশি ঋণের শিকার হয়ে পড়ে নি এবং স্বনির্ভর চাষাবাদব্যবস্থা চালিয়ে যেতে থাকে। পরিশেষে, এটাও উপলব্ধির বিষয় যে গ্রামীণ মজুরদের বিশেষ এক শ্রেণীর উপস্থিতিকে নিবিড় কৃষকবিনাশের পরিণতি বলে গণ্য করা চলে না। ডাফরিন রিপোর্টেও দেখা যায় যে, উনিশ শতকের শেষভাগে এই কৃষকবিনাশের ত্বরান্বিত অবস্থার অনেক আগেও ঐ মজুরশ্রেণীর উপস্থিতি ছিল। যখন জোতদারগণ তাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করে এবং জমিতে শস্যভাগাভাগির ব্যবস্থা লাভ করে, তখন কিভাবে মজুরশ্রেণী খেয়ে পরে বেঁচে থাকতো সে সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। ১৮৮০-এর দশক থেকে তাদের ইতিহাসের কিছু চিত্ররূপ নিচে তুলে ধরা হলো।

গ্রামীণ মজুরদের অনুপাত : বৃটিশ আমল

ডাফরিন রিপোর্টের ভিত্তিতে আমরা দেখেছি যে, ১৮৮৮ সালে সমগ্র গ্রামীণ বাসিন্দার প্রায় ২৬%-এর মজুরগিরি ছিল মুখ্য বা একমাত্র পেশা, অপরদিকে অন্য ১৩%-এর বেঁচে থাকা নির্ভর করতো মজুরগিরির সহায়ক আয়ের উপর। এই হিসেবে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ গ্রামীণ মানুষের জন্য শ্রমমজুরি ছিল জীবনধারণের সম্পূর্ণ বা আংশিক উপায়। তারপর গ্রামীণ মজুরদের ব্যাপারে তুলনামূলক কোন নিরীক্ষা আর করা হয় নি এবং গ্রামীণ মজুরদের বিষয়ে আদমশুমারির তথ্য কমই কাজে লাগে; কেননা এর মধ্যে সংজ্ঞা, ক্রমবিন্যাস, অবগণনা ও বিকৃতির সমস্যা দেখা দেয়।[৩১] এই কারণে আদমশুমারিতে প্রতীয়মান অনুপাত ও গতিধারা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়, এমনকি বিভ্রান্তিও সৃষ্টি হয়। দুর্ভাগ্যবশত ঔপনিবেশিক যুগের শেষ আমলের বাংলাদেশের গ্রামীণ মজুরদের অনুপাত সম্পর্কে লোকগণনার তথ্য ব্যতীত অন্য কোন তথ্য একেবারে নেই বললেই চলে। গ্রামীণ

৩১. Surendra J. Patel, *Agricultural Labourers in Modern India and Pakistan* (Bombay 1952), 25-28, Nripendra Bandopadhyaya, "Causes of Sharp Increase in Agricultural Labourers, 1961-71: A Case Study of Social-Existence Forms of Labour in North Bengal", *Economic and Political Weekly*, (Reveiw of Agriculture, December 1977), A 111-A 126; M Mufakharul Islam, *Bengal Agriculture 1920-1946 A Quantitative Study*, (Cambridge 1978), 139-141

বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি থেকে (যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভূমিহীনতা, মজুরগিরির উপর নির্ভরশীলতা এবং অভাবের পার্থক্য নিরূপণে ব্যর্থ) এবং মাঝেমধ্যে জেলা গেজেটিয়ার বা ভূমিজরিপ ও বন্দোবস্ত রিপোর্ট থেকে আমরা কিছু না কিছু তথ্য জানতে পারি। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তথ্য প্রতিনিধিত্ব এবং নির্ভরশীলতার বিষয়ে আমাদেরকে বরং আরো ঝামেলায় ফেলে।

সাধারণভাবে বাংলাদেশের শ্রমনির্ভর জনগোষ্ঠীর আয়তন সম্পর্কে অনাগ্রহই ছিল এই আমলের বিশেষ প্রবণতা। এই অনাগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবেই এক বিপরীত ধারা, যেখানে ঔপনিবেশিক সরকার কৃষকের ঋণিতা এবং অকৃষিকাজে কৃষিজমি হস্তান্তরের বিষয়ে তন্দ্রালস আগ্রহ দেখিয়েছে। কর আদায় এবং কৃষিউৎপাদন বিঘ্নিত হতে পারে এমন ধরনের বিষয়ে কৃষকবিনাশমূলক সরকারি স্বার্থ সুস্পষ্টভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল। এক ধরনের গ্রামীণ মজুরের উদ্ভব তখন পর্যন্ত কোন ভয়ের কারণ হয়ে দেখা দেয় নি। ঔপনিবেশিক শাসন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকারি রিপোর্টে বা সাধারণ অভিমতে বাংলাদেশে গ্রামীণ মজুরদের দুর্লভতার কল্পচিত্রের প্রকাশ অব্যাহত থাকে। অবশ্য সঠিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা কিছুটা ইঙ্গিত পাই। বাকেরগঞ্জ জেলায় ভূমিজরিপ ও বন্দোবস্ত (১৯০০-১৯০৮) প্রক্রিয়া চলাকালে বেশ বড় একটি অঞ্চলের গ্রামগুলোর প্রতিটি পরিবারের আর্থিক অবস্থা ও পরিবেশ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান চালানো হয়েছিল। সেই অনুসন্ধানে দেখা যায় যে :

> প্রতি পাঁচটি কৃষকপরিবারের মধ্যে একটি সচ্ছল অবস্থায়, তিনটি আরামদায়ক অবস্থায় এবং একটি সংগ্রামরত অবস্থায় আছে। এই শেষভাগের মধ্যে রয়েছে সেই সব পরিবার যারা নিজেদের খায়খোরাকি অর্জন করার মতো যথেষ্ট জমি ইজারায় নিতে পারে না এবং শ্রম বিক্রয়ে বাধ্য হয়। অবশ্য তাদের সব সময়েই পর্যাপ্ত খাবার ও আশ্রয় আছে।[৩২]

আরো বিশদ তথ্য পাওয়া যায় ফরিদপুর জেলার জরিপে। ১৯০৬ থেকে ১৯১৯ সাল অবধি পরিচালিত এক বিখ্যাত সমীক্ষায় জ্যাক লক্ষ্য করেছিলেন যে, জনসংখ্যার ২৮% কৃষিমজুরিতে নিয়োজিত। অকৃষিমজুর সম্পর্কে তথ্য ছিল অসম্পূর্ণ। কিন্তু কৃষি পরিবারের ৪৪%-এর কোন না কোন অকৃষি সহায়ক আয়ের উৎস ছিল, যার মধ্যে বেশিরভাগ ছিল বাড়ির কাজ ও চাকরবাকরের কাজ, মাছ ধরা ও তাঁতের কাজ। এভাবে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা তাদের আয়ের কিছু অংশের জন্য শ্রমের উপর নির্ভর করতো এবং তারাই যে সবসময়ে দরিদ্রতম ছিল, তাও নয় :

> গরিব পরিবারগুলোর মধ্যে কৃষিমজুরের অনুপাত স্বাভাবিকভাবেই ধনী পরিবারদের অনুপাতের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তাই বলে যে মাত্রায় চিন্তা করা হচ্ছে তা নয়। পাটচাষের মজুরিতে ভালো আয় নিঃসন্দেহে ধনীদের যোগদান ঘটায় এবং মোটামুটিভাবে অবস্থাসম্পন্ন কৃষকদের অধিকাংশকে নিজ গ্রামে প্রতিবেশীদের সামনে মজুরের কাজ করার সঙ্কোচ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য পার্শ্ববর্তী জেলায় ফসল তোলার কাজে দেখা যেতো। সচ্ছল কৃষকের ২২%,

৩২. J C, Jack, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in Bakarganj District, 1900-1908*, (Calcutta 1915), 77

কর্মসচ্ছল কৃষকের ৩২% এবং যারা অভাবের উর্ধ্বে তাদের ৩৬% এবং অভাবগ্রস্তদের ৩৭% গণনায় কৃষিমজুর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সম্ভবত এমনও হতে পারে যে, এদের কেউই সম্পূর্ণভাবে কৃষিমজুর ছিল না অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় 'labour' শব্দের অর্থে মজুর ছিল। সকলেরই জমি ছিল, হয়তো পরিমাণে কারো খুবই কম ছিল আবার কারো হয়তো অধিক সংখ্যক ছেলেমেয়ের অনুপাতে কম ছিল। ইংল্যান্ডে ভূমিহীন মজুর সাধারণ ব্যাপার, অথচ ফরিদপুরে এমন মজুর একেবারে অজ্ঞাত এবং পূর্ব বাংলার অন্যত্রও খুবই দুর্লভ ছিল। কৃষিমজুরির উপর নির্ভরশীল অভাবি মজুরদের অনুপাত খুব বেশি ছিল না। কেননা এই শ্রেণীর মধ্যে ছিল বৃদ্ধদের দল, যারা কাজের অনুপযুক্ত এবং তেমন পরিবারসমূহ, যাদের উপার্জনক্ষম লোকটি অসময়ে মারা গেছে। প্রতি ১০০ পরিবারে দেখা যায় যে, ৩৫টি পরিবার তাদের নিজেদের জমির ফসল দিয়েই সম্পূর্ণ অন্নসংস্থান করতো, ২৫টি পরিবারে সম্পূর্ণ খরচ চালাতে বাড়তি উপার্জনের প্রয়োজন হতো এবং ৪০টি পরিবার খাদ্যশস্য কিনে খেতো, কেননা, তারা পাটচাষ করা পছন্দ করতো এবং তা করতে না পারলে তাদের খাবারের সঙ্কুলান হয় না; কিন্তু নিশ্চিতভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা পাটচাষ করা বেশি পছন্দ করতো বলে তাদের এমন অবস্থায় পড়তে হতো।[৩৩]

১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে মজুরদের অনুপাত জানার জন্য তথ্যানুসন্ধান করা হয় নি। ভূমিরাজস্ব কমিশন প্রতি জেলার আদর্শ গ্রামগুলোতে প্রায় ২০,০০০ পরিবারের মধ্যে তথ্যানুসন্ধান চালায় এবং দেখতে পায় যে, তাদের ২২.৫% মুখ্যত বা সম্পূর্ণত কৃষিমজুরির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে।[৩৪] আবারো অকৃষি শ্রমমজুরির উপার্জনের ক্ষেত্রটি অনাবিষ্কৃতই থেকে গেল। অধিকন্তু, পরিসংখ্যানগুলো শুধু সেই পরিবারদেরকেই গণ্য করেছে, যাদের মুখ্য বা সম্পূর্ণ আয়ের উৎস হচ্ছে কৃষিমজুরি। ফলে মজুরি যাদের সহায়ক পেশা তাদের সংখ্যা বাদ পড়ে গেল।

পঞ্চাশ বছর আগের ডাফরিন রিপোর্টে প্রকাশিত আঞ্চলিক তারতম্যের সত্যতা ভূমিরাজস্ব কমিশন প্রতিপাদন করেছিল। বাংলাদেশের পশ্চিম সীমানার জেলা-গুলোতে মজুরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং পূর্ব বা উত্তরে সবচেয়ে কম। কিন্তু মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাগুলোর তথ্য ততো পরিষ্কার নয়। উদাহরণস্বরূপ, যশোর জেলার বিবরণে দেখা যায় যে, পরিবারগুলোর মাত্র ৮% মুখ্যত বা সম্পূর্ণত কৃষিমজুরির উপর নির্ভরশীল, অথচ পার্শ্ববর্তী জেলা খুলনায় এই হার ৪২%-এ দাঁড়িয়েছিল এবং তা ১৯৩৯ সালে বাংলাদেশের যেকোন জেলার জন্য সর্বোচ্চ সংখ্যা।[৩৫]

৩৩. J C Jack, *The Economic Life of a Bengal District ; A Study*, (Delhi 1975), (Reprint, original date of publications 1916), 84-86 ১৯২৭ সালে ফরিদপুরের তালমা গ্রামের সমীক্ষার দ্বারা এই সাধারণ ধারণা সত্যায়িত। Government of Bengal, *Royal Commission on Agriculture in India, Report*, Volume V. Evidence Taken in the Bengal Presidency, (Bombay 1927), 487-490. তুলনীয় Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 39.

৩৪. Government of Bengal. Report of the *Land Revenue Commission, Bengal* (Alipore), Vol I ,117, (এই রিপোর্ট Floud Report নামে পরিচিত)।

৩৫. সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ত্রুটি দেখা যায় দুটো জরিপের মধ্যে : মেদিনীপুরে (১৮৮৮ : ৪৩% এবং ১৯৩৯ : ২৫%) খুলনায়, (১৮৮৮ : ২০%-এর কম এবং ১৯৩৯ : ৪২%) এবং চট্টগ্রামে (১৮৮৮ : ২৩% এবং ১৯৩৯ : ১২%)। আরো তথ্য ব্যতীত এই সংখ্যা সম্পর্কে কোন রকম বিচার করা বা তারতম্য ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

পরিশেষে, ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ার অর্থনৈতিক কারণসমূহ এবং এই দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়া[৩৬] সম্পর্কে সঠিক ধারণালাভের জন্য ১৯৪৪ সালে শেষবারের মতো সারা বাংলাদেশে জরিপ করা হয়েছিল। ১৫০০০-এরও বেশি পরিবারের এক নমুনার ভিত্তিতে এই জরিপে দেখা যায় যে, দুর্ভিক্ষের ঠিক আগে এদের ৩৪% আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে মজুরগিরির উপর নির্ভরশীল ছিল। তার মধ্যে ১৬.৫% যুক্তভাবে চাষাবাদ ও কৃষিমজুরির উপর, অপর ১৬.৫% সম্পূর্ণভাবে কৃষিমজুরির উপর এবং বাকি ১% শুধুমাত্র অকৃষিমজুরির উপর নির্ভরশীল ছিল।[৩৭] দুর্ভিক্ষের পর ১৯৪৪ সালের মে মাসে এই মাত্রার পরিবর্তন খুব সামান্যই হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক আমল শেষ হলে বাংলাদেশের গ্রামীণ বাসিন্দাদের কমপক্ষে এক পঞ্চমাংশ সম্পূর্ণভাবে বা প্রধানত শ্রমমজুরির উপর নির্ভরশীল হয়, আর যদি এর সাথে সহযোগী পেশা হিসেবে শ্রমের তথ্য যোগ করি, তবে এই অনুপাত কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশে বা প্রায় দুই কোটি মানুষে পৌঁছায়।[৩৮] এই চিত্র ১৮৮৮ সাল থেকে গ্রামীণ মজুরদের অনুপাতের এক অটল অবস্থান প্রকাশ করে। মাঝারি ধরনের কৃষকবিনাশপরিস্থিতির মধ্যে এই অনুপাতের আশানুরূপ বৃদ্ধি তো ঘটেই নি, বরং হ্রাস পেয়েছে। ১৮৮৮ সালে সম্পূর্ণভাবে বা মুখ্যত শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল সকল বাসিন্দার ২৬% এবং মজুরি যাদের সহযোগী পেশা ছিল তাদের যোগ করলে এই হার দাঁড়ায় ৩৯%। তথ্যের মান এবং মিশ্র জরিপের ভিন্নধর্মী জরিপের তুল্যমূল্য বিচারের পদ্ধতিগত অসুবিধার কথা বিচার করলে এই হ্রাস প্রকৃতপক্ষে বাস্তব নাও হতে পারে। ঔপনিবেশিক আমলের শেষভাগে বাংলাদেশের গ্রামীণ মজুরদের অনুপাতের অটল অবস্থানের উপর জোর দেয়া অধিকতর বিচক্ষণতার এবং অধিকতর যথার্থতার পরিচায়ক। অঙ্কের পূর্ণমানের হিসেবে অবশ্য ১৮৮০-এর দশক থেকে ১৯৪০-এর দশকের মধ্যে সংখ্যার বেশ বৃদ্ধি ঘটে; খুব কম করে হিসেব করলেও প্রায় ৭০ লক্ষ বাঙালি শ্রমমজুরিনির্ভর দলের সাথে যোগ দেয়।

১৯৪৭ সালের পর গ্রামীণ মজুরদের অনুপাত

১৯৪৭ সালের পরে বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয় এবং বাংলা বিভক্ত হয়। বাংলার পশ্চিমাংশের জেলাগুলো পশ্চিম বাংলা নামে ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত হয় এবং বাংলার পূর্বাংশের জেলাগুলো (বাংলার ও

৩৬. P.C. Mahalanobis et al., "A Sample Survey of After-Effects of the Bengal Famine of 1943", *Sankhya, The Indian Journal of Statistics*, 7·4 (1946), 337

৩৭. প্রাগুক্ত, 365.

৩৮. জনসংখ্যার সংখ্যাগুলো দেখুন, *Census of India, 1941*, Vol IV. Bengal. Tables by R. A. Dutch, (Delhi 1942), 6.

বাংলার জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ) পাকিস্তানে যোগদান করে এবং পূর্ব পাকিস্তান নাম ধারণ করে। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালের পরে বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন পূর্ববর্তী সময়ের সাথে তুলনার ব্যাপারে অসুবিধা সৃষ্টি করে বিশেষকরে এই কারণে যে এই সময়ে অনেক জেলার সীমানায় পরিবর্তন ঘটানো হয় এবং পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানে অনেক এলাকা যুক্ত হয়। এই জটিলতার ফলে ঔপনিবেশিক আমল এবং পরবর্তী আমলে সর্বহারা হবার ধারার সমীক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯৩৯ সালের ভূমিরাজস্ব কমিশন দেখতে পায় যে, সমগ্র গ্রামীণ বাসিন্দাদের ২২.৫% প্রধানত বা সম্পূর্ণ কৃষিমজুরির উপর নির্ভরশীল। আর আট বছর পরের পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় এই সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৮% এবং ২৯%।[৩৯] ১৯৪৭ সালের পরে পূর্ব বাংলার মজুরদের অনুপাতের পরিবর্তন ব্যাপক জরিপ এবং সেই সাথে অনেক ছোট ছোট সমীক্ষা থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

১৯৬৫-৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কৃষিবিষয়ক মহাজরিপের তথ্যাবলী প্রকাশ করে। প্রথম দফায় দেখা যায় যে, নমুনা গ্রামগুলোর জনসংখ্যার ১৩%-এর প্রধান পেশা হচ্ছে কৃষিমজুরি। এলাকাভিত্তিক সামান্য তারতম্যও দেখা যায়। উপকূল এলাকায়, সিলেটে এবং উত্তর অঞ্চলে এই হার ছিল ১০% থেকে ১২% এবং পূর্বের পাহাড়ী অঞ্চলে, পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলে এই হার দেখা যায় ১৪% থেকে ১৫%। এই পরিসংখ্যান অনুসারে বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের তুলনায় (যেখানে জেলা হিসেবে মজুরগিরির অনুপাত ছিল কম) মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলের (যেখানে ঐ অনুপাত ছিল বেশি) মধ্যে বিরাজমান এলাকাভিত্তিক পূর্বেকার পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে গেছে।[৪০] ঐ একই জরিপের ষষ্ঠ দফায় ১৯৬৩-৬৪ সালে এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে চাষীদেরকে জমির সাথে সম্পর্কিত করে শ্রেণীভুক্ত করা হয়। বিবরণে প্রকাশ যে, চাষীদের ২৫% মজুরগিরি করে উপার্জন করে, ১৮% ছিল পুরোপুরি সার্বক্ষণিক মজুর, ৪% যৌথভাবে মজুর এবং ভাগচাষী এবং ৩% গৃহস্থবাড়ির চাকরবাকর। এই উপার্জনকারী চাষীদের তিন-পঞ্চমাংশ ছিল ভূমিহীন।[৪১]

---

৩৯. সবচেয়ে জরুরি সতর্কসঙ্কেত এখানে যে, ১৯৩৯ সালের সংখ্যায় বেশ কয়েকটি জেলা বাদ দেয়া হয়, ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর যেগুলো পশ্চিম বাংলায় (কুচবিহার, পরে পুরুলিয়া) এবং পূর্ব বাংলায় (সিলেট এবং চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল) যুক্ত হয়। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার আনুপাতিক হিসেবের পদ্ধতির জন্য দেখুন Karunamoy Mukherjee, *The Problems of Land Transfer A Study of the Problems of Land Alienation in Bengal,* (Santiniketan 1957) 133-134.

৪০. Government of East Pakistan, East Pakistan Bureau of Statistics, *Master Survey of Agriculture in East Pakistan . Report on First Round: A Sample Survey of the Basic Characteristics of Villages in East Pakistan,* (Dhaka 1965). 25.

৪১. Government of East Pakistan,East Pakistan Bureau of Statistics, *Master Survey of Agriculture in East Pakistan (Sixth Round): Report on the Composition of Rural Households in East Pakistan and their Production, Distribution and Marketing of Agricultural Crops in 1964-65,* (Dhaka 1966). 28

১৯৬০-এর দশকের শেষভাগ থেকে পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ জরিপ প্রায়ই চালানো হতো। কিন্তু তাদের বেশির ভাগের মধ্যে উপার্জনকারী জনসংখ্যা সম্পর্কে হয় স্বল্প তথ্য আছে, না হয় কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই বা সেগুলো পাওয়া যায় আদমশুমারিতে প্রাপ্ত খুবই বিতর্কমূলক তথ্য থেকে। যাই হোক, ১৯৭৭ সালে আর একটা কৃষিজরিপ হয়। ততোদিনে দেশটি 'বাংলাদেশ' রূপে বিশ্বমানচিত্রে স্থান পেয়েছে। এতে দেখা যায় যে, ৪২% গ্রামীণ গৃহস্থালিতে কৃষিকাজের একটা অংশ ভাড়াকরা মজুর দিয়ে সম্পন্ন করা হতো এবং বেশির ভাগের কাজ ছিল পারিবারিক শ্রম। আরো দেখা যায় যে, ৭% গৃহস্থালিতে এই ভাড়াটে মজুরেরা প্রায় সব কাজ করতো। জরিপের আগের সপ্তাহে (১৯৭৭ সালের এপ্রিল ও মে মাসে জরিপ করা হয়েছিল) সমগ্র ৪ কোটি ৬০ লক্ষ কৃষিজীবী জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ মজুর ভাড়া খাটিয়েছে, যার মধ্যে ৯% (বা ১৬ লক্ষ, ১৯৬০ সালের হিসাবে ৩৯% বৃদ্ধি) ছিল সার্বক্ষণিক মজুর, ১৯% ছিল অস্থায়ী এবং ৭২% নৈমিত্তিক। সমগ্র কৃষিমজুর বাসিন্দার ২৯% তাদের নিজেদের কোন জমি চাষ করতো না এবং এই বিষয়ে কোন আঞ্চলিক তারতম্যের উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নি।[৪২] ব্যাপক ভিত্তিক জরিপে সংগৃহীত তথ্যের সাথে ১৯৭১ সালের পর পরিচালিত বেশ কিছু গ্রামীণ সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিশদ প্রামাণ্য তথ্য যোগ করা যেতে পারে। ১৯৭৩ সালে ঢাকা জেলার এক গ্রামসমীক্ষায় আনোয়ারউল্লাহ্ চৌধুরী প্রকাশ করেন যে, যাদের মুখ্য পেশা কৃষির সাথে সম্পর্কিত ছিল এমন বাসিন্দার ২৫% ছিল ভূমিহীন মজুর।[৪৩] ১৯৭৪ সালে কুমিল্লা (পূর্বের ত্রিপুরা) জেলার মতলব থানার এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৯ বছরের বেশি বয়স্ক প্রায় ৯২০০০ গ্রামবাসীর ২৬%-এর মূল পেশা ছিল মজুরগিরি, যার মধ্যে ১৬% কৃষিমজুর এবং ১০% অকৃষিমজুর।[৪৪] দুর্ভাগ্যবশত উভয় সমীক্ষাতেই সহযোগী পেশা হিসেবে মজুরগিরির উপর কোন তথ্য নেই।

ঐ একই বছরে পাবনা জেলার ৪০০০ গ্রামের উপর এক সমীক্ষা চালানো হয়। তাতে দেখা যায় যে, পরিবারের কর্তাদের ৩৬%-এর মূল পেশা হচ্ছে মজুরগিরি এবং মজুরদের সংসারগুলোর প্রতি পাঁচটির মধ্যে একটি ভূমিহীন।[৪৫] বরিশাল (পূর্বের বাকেরগঞ্জ) জেলার এক গ্রামের মোট পরিবারের ২৭%-এর একমাত্র পেশা মজুরগিরি এবং মজুরগিরির খণ্ডকালীন পেশায় রয়েছে আরো ২৮%।[৪৬] বগুড়া জেলার এক গ্রামে ওয়েস্টারগার্ড সমীক্ষায় এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামের কয়েকটি গ্রামে খান এবং তাঁর সহযোগীদের সমীক্ষায়

৪২. Government of the People's Republic of Bangladesh, *Report on the Agricultural Census of Bangladesh, 1977*, (Dacca 1981), National Volume, 36-38, 47,49,294.

৪৩. Anwarulllah Chowdhury, *A Bangladesh Village . A Study of Social Stratification*, (Dacca 1978), 57.

৪৪. K.M Ashraful Aziz, *Kinship in Bangladesh*, (Dacca 1979), 139.

৪৫. Benchmark Survey—এর উদ্ধৃতি থেকে John P Thorp, *Power Among the Farmers of Daripalla A Bangladesh Village Study*, (Dacca 1978), 121.

৪৬. ১৯৭৪ সনে স্বপন আদনান ও অন্যান্যদের কৃত গবেষণা : *Differentiation and Class Structure in Village Shamaj*, Working Paper No. 8, (Dacca 1977), (mimeo), 22.

ঐ একই ধারা লক্ষ্য করা যায়।[৪৭] যশোর জেলার গ্রামগুলোতে সিদ্দিকীর[৪৮] প্রাপ্ত নিম্নহারের সাথে ১৯৭৭-৭৯ সালে পরিচালিত রংপুর, বগুড়া ও কুমিল্লার সাতটি গ্রামের সমীক্ষায় প্রাপ্ত নিম্নহারের মিল রয়েছে। এসব গ্রামে সমস্ত পরিবারের শতকরা ১৬ থেকে ৩৮ ভাগ তাদের সম্পূর্ণ আয় বা আয়ের বেশি অংশ উপার্জন করে মজুরগিরির মাধ্যমে (কৃষি এবং অকৃষি উভয়বিধ)। সেই সময়ে দেখা যায়, পরিবারগুলোর শতকরা ২১ থেকে ৬৬ ভাগ কৃষিমজুরির মাধ্যমে কিছু না কিছু আয় করেছে।[৪৯] এই বিক্ষিপ্ত তথ্যাবলী এই দাবি রাখে যে, দেশভাগ হবার পর থেকে পূর্ব বাংলায় মজুরিশ্রম আরো অধিক প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে এবং মূল পেশা হিসেবে তা ১৯৩৯ সালের ১৮% থেকে ১৯৬০-এর দশকে ২১% এবং ১৯৭০-এর দশকের শেষভাগে ২৫% থেকে ৩৮%-এ দাঁড়ায়। সহযোগী পেশা হিসেবে মজুরগিরির সংখ্যাগত অবস্থান সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ১১ থেকে ২৪ ভাগের মধ্যে এ সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল।[৫০] এই তথ্যগুলো সমন্বিত করলে এই যুক্তিগ্রাহ্য উপসংহার টানা যেতে পারে যে, ১৯৮০ সালের মধ্যে গ্রামীণ পরিবারের প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় ৪ কোটি লোক হয় সম্পূর্ণভাবে না হয় আংশিকভাবে মজুরগিরির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই সময়ে ১৮৮৮ সাল ও ১৯৩৯ সালের অঞ্চলভিত্তিক পার্থক্যের প্রায় সব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে গেছে।[৫১]

গ্রামীণ মজুরদের সচলতা

বাংলাদেশে যে শুধু স্থানীয় লোকরাই শ্রমকে পণ্য হিসেবে কাজে লাগাতো তাই নয়, মওসুমি বা স্থায়ী কর্মসংস্থানের স্থলগুলোতে গ্রামীণ মজুরেরা যাতায়াত করতো এবং

৪৭. ১৯৭৫-৭৬-এর এক গবেষণায় Westergaard দেখতে পান যে, ২৬% গৃহস্থালি সম্পূর্ণভাবে এবং ২৭% আংশিকভাবে শ্রমমজুরির উপর নির্ভরশীল । খান এবং অন্যরা চট্টগ্রাম ও ঢাকা শহরের কাছাকাছি দুটো গ্রামের বিবরণে জানিয়েছেন যে, সমগ্র শ্রমশক্তির এক চতুর্থাংশের দিনমজুরি ছিল মুখ্য পেশা এবং এর অর্ধেক ছিল কৃষিমজুর। Kirsten Westergaard, *Boringram An Economic and Social Analysis of a Village in Bangladesh*, (Bogra n. d), 12,15, 17-18, 48, Azizur R Khan et al , *Employment, Income and the Mobilisation of Local Resourses A Study of Two Bangladesh Villages*, (Bangkok 1981),13.

৪৮. তিনি জানান, ১৩% গৃহস্থালি প্রধানত মজুরির উপর নির্ভরশীল, যার দুই-তৃতীয়াংশের কিছু কৃষিজমি আছে। কামাল সিদ্দিকী, *The Political Economy of Rural Poverty in Bangladesh* , (Dhaka 1982), 169-170

৪৯. Willem Van Schendel, *Peasant Mobility: The Odds of Life in Rural Bangladesh,* (Assex 1981), (New Delhi 1982), 303, 314-315, 321-22

৫০. ঐ, 302, 315 322.

৫১. জেলার অভ্যন্তরের তারতম্য আন্তঃজেলা তারতম্যের মতোই ব্যাপক বলে বর্তমানে জানানো হচ্ছে এবং শ্রমের উপর বেশি বা কম নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে এখন আর অঞ্চলবিভাগ সম্ভব নয়। আরও দেখুন Government of the Peoples Repubulic of Bangladesh, *Population Census of Bangladesh 1974*, National Volume ; Report, Tables (Dacca 1977), 555-558.

এইভাবে চলাচলের এক দীর্ঘমেয়াদি ধারা সৃষ্টি করেছিল। যদিও প্রকাশিত প্রবন্ধাদিতে এই মজুর স্থানান্তরের অনেক কারণ বর্ণিত হয়েছে, তবু বাংলাদেশের মজুরদের স্থানান্তরে যাবার এই ঐতিহাসিক ধারা সম্পর্কে এখনো পূর্ণ সমীক্ষা চালানোর কাজ বাকি রয়ে। আমরা বলেছি যে, শুধু দীর্ঘমেয়াদি এবং দূরপাল্লার স্থানান্তর গমন, বিশেষকরে বৃটিশ .বতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশান্তরে যাবার বিষয়ে সরকারি স্বার্থ পরিলক্ষিত হয়। দূরত্ব যতো কমে আসে, তথ্যও ততো কমে যায়। তাই জেলার অভ্যন্তরে চলাচ: চেয়ে আন্তঃজেলা চলাচলের তথ্য আরো সম্পূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত বিভিন্ন ধরনের মজুরদের এই চলাচলের পরিমাণগত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি আমাদেরকে কোন হিসাব দিতে পারে না।

সুদূরে চলাচল

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি (রেলপথ, স্টিমার) উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশ থেকে সুদূরে চলাচলের সুবিধা সৃষ্টি করে। আমাদের সমীক্ষায় আলোচ্য সময়ের শুরুতে নিয়মিত মজুর চলাচলের চার ধরনের স্রোতোধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত ভিনদেশী বা বিহারী মজুরদের কথা উল্লেখ করা যায়। বিহার, উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশ (বর্তমানে যা উত্তরপ্রদেশ) থেকে লোকেরা শীতকালে বাংলাদেশে মজুর-গিরির জন্য আসতো এবং বসন্তকালে বা গ্রীষ্মকালের প্রথমদিকে বাড়ি ফিরে যেতো। প্রায়ই তারা দলে দলে চলাচল করতো এবং সারা বাংলাদেশেই তাদেরকে দেখা যেতো, বিশেষকরে উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলোতে। তারা সাধারণ মজুরের কাজ করতো, সামনে যে কাজই পেতো তাতেই লেগে যেতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা বাংলাদেশের প্রধান ফসল আমন ধান কাটার কাজে শ্রম বিক্রয় করতো। কিন্তু অনেকে আবার কুলিগিরির কাজ, মাটি কাটার কাজ এবং পাল্কী বহনের কাজও করতো। মেয়েরাও ধান কাটার কাজ এবং মাটি কাটার কাজ করতো। তারা বিশেষকরে ধান ভানার কাজ এবং ধান রোপার কাজ করতো। অনেকে আবার দীর্ঘমেয়াদিভাবে স্থানান্তরী হয়ে বাংলাদেশে অনেক বছরের জন্য বসবাস করতো এবং তাদের অনেকে বাড়িতে চাকরবাকরের কাজে, বরকন্দাজ হিসেবে, পাইক হিসেবে, গ্রাম চৌকিদারিতে, রেলশ্রমিক হিসেবে এবং কারখানাশ্রমিক হিসেবেও নিয়োজিত থাকতো। শুধুমাত্র কলকাতার শিল্পকেন্দ্রসমূহে এবং বর্ধমানের কয়লা ও লৌহখনিগুলোতেই ভিনদেশী মজুরেরা স্থায়ী বাসিন্দা হয়।[৫২] বাংলাদেশে সর্বত্র স্থানীয়

৫২. অনেক Statistical Accounts, District Gagetteers and Survey এবং Settlement Reports-এ এই ধরনের দেশান্তরীদের কথা বর্ণিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ O' Donnell, Sachse, and Bell । আরো তথ্যের জন্য দেখুন, Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 47. শিল্প শ্রমিকদের পরিবেশ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে, Das Gupta, C. J. O'Donnell, *Statistical Account of the District of Bogra* in W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, (London 1876), VIII 67-68; F A. Sachse, *Bengal District Gazetteers ; Mymensingh*, (Calcutta 1917), 34, 68, 86-87; and F.O. Bell, *Final Report in the Survey and Settlement Operations in the District of Dinajpur, 1934-1940*, (Alipore 1942), 23; Ranajit Das Gupta, "Factory Labour in Eastern India : Sources of Supply, 1855-1946, Some Preliminary Findings", *Indian Economic and Social History Review*, 13 (1976), 277-329).

মজুরদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে এই ভিনদেশী মজুরদের নিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ সীমিত হয়ে পড়ে। দেশভাগের ফলে হঠাৎ করেই পূর্ব পাকিস্তানে এই আগমন থেমে যায় এবং পশ্চিম বাংলাতেও ১৯৪৭ সালের পরে ভিনদেশী মজুরের গুরুত্ব কমে যায়।[৫৩]

দার্জিলিং, সিলেট এবং চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় চা-বাগান প্রতিষ্ঠার পর এই সমস্ত চা-বাগানের কুলিদেরকে ঘিরে গড়ে উঠে দ্বিতীয় স্রোতোধারা। অধিকাংশ বৃটিশ মালিকানায় এই চা-বাগানগুলোতে বহুদূরের লোক লাগানো হতো। এদের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, বিহার, নেপাল, সংযুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, এমনকি মাদ্রাজের লোকও ছিল। চা-বাগানের কুলিদেরকে এক বিন্যস্ত পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হতো এবং বিশেষ চা-বাগানের জন্য এক বা একাধিক অঞ্চলের লোকদের সাথে স্থায়ী সম্পর্ক সৃষ্টি করা স্বাভাবিকভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। স্থানীয় মজুরেরাও কোন কোন সময়ে বাগানে কাজ করতো এবং চা-বাগানের কুলিরাও চুক্তিবদ্ধ হবার পর অনেক সময় স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যেতো। কিন্তু এই বিশেষ ধরনের নিয়োগব্যবস্থায় তাদের সাথে স্থানীয় কৃষকদের সম্পর্ক খুব কমই থাকতো। পুঁজিবাদী বাগানএলাকা এবং আশেপাশের কৃষিঅর্থনীতি এই দুই ধরনের পৃথক মজুরবাজার সৃষ্টি করে, যেখানে মজুর চলাচল দুই ধরনের বৃত্তের বৈশিষ্ট্য আনয়ন করে।[৫৪] দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের চা-বাগানে অবস্থানরত মজুরেরা তাদের জন্মভূমির সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং বন্দি সর্বহারায় পরিণত হয়। প্রয়োজনবোধে চা-বাগানগুলো তখন স্থানীয়ভাবে নৈমিত্তিক মজুর নিয়োগ করতো।[৫৫] সুদূরে চলাচলের তৃতীয় ধরনের ধারা ছিল দেশান্তরী হওয়া। এর মধ্যে ছিল দুই ধরনের মজুর—চুক্তিবদ্ধ মজুর এবং বার্মা বা অপর কোন বৃটিশ উপনিবেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে গমনকারী মজুর। বাংলাদেশ থেকে স্থায়ীভাবে দেশান্তরে গমনে, বিশেষকরে বার্মায় গমনে ঔপনিবেশিক সরকার উৎসাহ যোগাতো :

> বার্মায় যেকোন মজুর কয়েক বছরের মধ্যে কৃষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার মতো পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করতে পারতো। তাদেরকে বেশ অনুকূল হারে শুধুমাত্র সরকারি রাজস্ব দিতে হতো এবং তারা সমস্ত ঝক্কিঝামেলা থেকে দূরে থাকতে পারতো। এই বিবেচনা চট্টগ্রামবাসীদের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। ফলে, তারা প্রবাসী বাঙালীদের সংখ্যার ব্যাপক যোজনাকারী হয় এবং সম্ভবত সবচেয়ে বড় অংশে পরিণত হয়।[৫৬]

৫৩. দৃষ্টান্তস্বরূপ, Chattopadhyaya, A 199-A 120.

৫৪. তুলনীয় B.C. Allen, *Assam District Gazetteers*, Volume 11: Sylhet, (Calcutta 1905), 68; J.B. Kindarsley, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Chittagong 1923-1933*, (Alipore 1939), 12; Bondyopadhyaya, A 114-A 115, Sharit Bhawmik, *Class Formation in the Plantation System* ,(New Delhi 1981).

৫৫. A.B.M Khalid, "Some Problems of the Tea Industry in Post-Liberation Bangladesh." *The Dacca University Studies* 23, Part (June 1975), 61-82; Dan Jones, *Tea and Justice. British Tea Companies and the Tea Workers of Bangladesh* , (London 1986)

৫৬. Philip Nolan, *Report on Emigration from Bengal to Burma and How to Promote it*, (Calcutta 1888),5, তুল্য A. Narayana Rao, *Indian Labour in Burma*, (Rangoon 1933). বিশেষকরে চতুর্থ অধ্যায়।

কিন্তু বাংলাদেশ থেকে এভাবে স্থায়ী অভিবাসী হওয়ার প্রবণতা আরো বৃদ্ধি করার পরবর্তী প্রচেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয় এবং তা ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষকে অন্য কোন অঞ্চলে, বিশেষকরে মাদ্রাজে এরকম চেষ্টা চালাতে বাধ্য করে।[৫৭] কিন্তু তাই বলে চট্টগ্রাম থেকে অভিবাসী হওয়ার ধারা থেমে যায় নি। এখানকার মানুষ পায়ে হেঁটে বার্মায় যেতো। অনুরূপভাবে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলা থেকে পার্বত্য ত্রিপুরায় (যা বর্তমানে ভারতের ত্রিপুরা) এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চল থেকে এবং ময়মনসিংহ ও পাবনা থেকেও আসামে অভিবাসী হবার প্রবণতা অধিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

চুক্তিবদ্ধ মজুরদের দল কলকাতা বন্দর দিয়ে বিরাট সংখ্যায় বাংলাদেশ ত্যাগ করতো। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই ছিল বিহারী, বাঙালি নয়। অবশ্য বিপুল সংখ্যক মজুরের দেশান্তরে যাবার ঘটনা বাংলাদেশেও ঘটেছিল। তা হলো চট্টগ্রাম এলাকার গ্রামীণ মজুদেরর মওসুমি কাজে বার্মায় যাওয়া, যেখানে তারা আরাকানের উর্বর উপকূলভাগে প্রধানত ফসল কাটার কাজই করতো এবং তাদের সাহায্য ছাড়া আরাকানের ধান রপ্তানির জন্য প্রস্তুত এবং সংগ্রহ করা যেতো না।[৫৮] বার্মার বন্দরে তারা কুলির কাজ এবং অনেক সময় মাঝিমাল্লার কাজও পেতো। শতাব্দীশেষে বার্মায় প্রায় ৭৯,০০০ চট্টগ্রামবাসী ছিল।[৫৯] ১৯৩০-এর দশকে বার্মায় ভারতীয়বিরোধী দাঙ্গার ফলে এবং ১৯৪৮ সালে সে দেশটির স্বাধীনতার ফলে মওসমি ও স্থায়ীভাবে দেশান্তর গমনে ভাটা পড়ে। তথাপি অবৈধভাবে বাঙালীরা ততোদিন পর্যন্ত চুপিসারে আরাকানে ঢুকতে থাকে (যেখানে বাংলাদেশের রোহিংগা উপজাতির বিপুল সংখ্যক প্রবাসীরা সনাক্তকরণ এড়িয়ে যায়) যতোদিন বার্মা সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না করে। ১৯৭৮ সালে এ নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করা হয়। এর ফলে প্রায় ২ লক্ষ রোহিংগা উপজাতীয় শরণার্থী চট্টগ্রামের জেলাসমূহে ভীড় জমায় এবং ছয় মাস ধরে ক্যাম্পে বাস করতে থাকে এবং ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ও বার্মা সরকার এই সমস্যা সমাধানের প্রয়াস চালাতে থাকে।[৬০]

পূর্ব বাংলা থেকে অন্যভাবে অন্যান্য দেশে অভিবাসী হতো নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও সিলেটের মজুরেরা, যারা বহুকাল ধরে সমুদ্রগামী জাহাজে নাবিক, কয়লাযোগানদার ও বাবুর্চির কাজ করতো।[৬১] এদের কেউ কেউ যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে থেকে যায় এবং ঐ দেশে তারাই ছিল বাঙালি জাতির আদি প্রবাসী।

---

৫৭. Cheng Siok-Hwa. *The Rice Industry of Burma 1852-1940*, (Kuala Lumpore 1968), 118-120

৫৮. Nolan. *Report on Emigration*, 7.

৫৯. এই স্থানবদলকারীদের ৮২% ছিল পুরুষ, যা মওসুমি স্থানান্তরের আধিক্য বুঝায়। L. S. S. O'Malley, *Eastern Bengal Distrct Gazetteers Chittagong*, (Calcutta 1808), 51.

৬০. দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন *Far Eastern Economic Review*, ১৯৭৮ সালের মে ১৯ ও ২৬, জুন ৯ ও ২১ এবং নভেম্বরের ৩ তারিখে প্রকাশিত সংখ্যাসমূহ।

৬১. Dinkar D. Desai, *Maritime Labour in India*, (Bombay 1940)

সর্বশেষ এবং সুদূরে প্রবাসী মজুরদের চতুর্থ ধারার মধ্যে ছিল জঙ্গল কাটার দিশারী দল—প্রধানত দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা, বিহারের দক্ষিণ অঞ্চল, উড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশের সাঁওতাল, ওঁরাও এবং মুণ্ডা উপজাতীয় বাসিন্দারা। উত্তর বাংলায় বিশেষকরে বরেন্দ্রভূমিতে কাজের জন্য তাদেরকে আনা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণত তাদেরকে জমির উপর কোন স্বত্ব দেয়া হতো না। ফলে এরা জমি আবাদ করার পরপরই মজুর হয়ে যেতো বা কোন নতুন জমি উদ্ধারের কাজের জন্য অন্যত্র চলে যেতো। দক্ষিণ বাংলার সুন্দরবনে ঐ একই ধারা দেখা যায়, যেখানে এই জঙ্গলকাটার দলের অধিকাংশই ছিল বাঙালী।[৬২]

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মজুরদের চলাচল

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মজুরদের স্বাভাবিক চলাচল ছিল। অধিকাংশ চলাচল ছিল মওসুমি। শীতকালে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ে ফসল পাকার মওসুমকে অনুসরণ করে তারা চলাচল করতো। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকেই ছিল সাধারণভাবে চলাচলের ধারা, যেখানে মজুরি বেশি হারে পাবার সম্ভাবনা থাকতো। কিন্তু এই চলাচলের ভিন্ন ভিন্ন পথ ছিল। কোন কোন সময় এক পথ আর এক পথকে আড়াআড়িভাবেও অতিক্রম করতো। এইভাবে এক উল্লেখযোগ্য দলের প্রবাহ ছিল নদীয়া, পাবনা এবং রাজশাহী থেকে রংপুরের পথে। আর এক ধারা ছিল নোয়াখালী থেকে ত্রিপুরার পথে। আরো একটা ধারার যাত্রাপথ ছিল ফরিদপুর থেকে ঢাকা হয়ে ময়মনসিংহ বা সিলেট পর্যন্ত। ঐ একই সময়ে ফসল কাটার দল উত্তর থেকে দক্ষিণে যেতো। তারা নদীয়া, যশোর এবং ফরিদপুর জেলা থেকে বাকেরগঞ্জ, খুলনা এবং ২৪-পরগনায় যেতো। যদিও তথ্যের প্রাচুর্য রয়েছে, তবুও ফসল কাটার মজুরদের এই চলাচলের বিষয় ঔপনিবেশিক আমলে বা তারপরে কখনই বিশ্লেষণ করা হয় নি এবং এই বিষয়ে কাজ করা এই সমীক্ষার আওতার বাইরে ছিল।[৬৩] বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিম্নবর্ণিত চার ধরনের চলাচলের প্রত্যেকটা সম্পর্কে আরো গভীর নিরীক্ষা প্রয়োজন।

দক্ষিণ বাংলার মওসুমি মজুরদের ভাষায় ভাটিতে যাওয়ার অর্থ সুন্দরবনের জলাভূমিতে যাওয়া। ষোল শতকে গঙ্গার মোহনার কাছে নৌচলাচলের প্রদেশের নাম ছিল 'ভাটি', যে নাম আজো টিকে আছে।[৬৪] উনিশ শতকে সুন্দরবন এলাকায় জমি উদ্ধারের

৬২ দেখুন, 'Donnell, 167-168, L.S S O'Malley, *Bengal District Gazetteers. Rajshahi,* (Calcutta 1916). 51-52, 76-77, Sirajul Islam, *Bengal Land Tenure: The Origin and Growth of Intermediate Interests in the 19th Century,* (Rotterdam 1984)

৬৩. ১৯০৫-১৯২৫-এর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে মওসুমি স্থানান্তরের ধারার বিষয়ে রেখাচিত্র আছে এবং ১৮৯৯-১৯৪২-এর জরিপ এবং বন্দোবস্ত বিবরণীতেই দেখা যায় খুবই ঘন পরস্পর অতিক্রমকারী গতিধারা, কিন্তু প্রত্যেক ধারার মাত্রা সম্পর্কে খুবই কম তথ্য আছে। সূত্রের জন্য দেখুন, Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 51

৬৪. *Principal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division,* (Calcutta 1864), 129 n.

কাজে ভাটিতে যেতে তিন ধরনের দলকে লক্ষ্য করা যেতো—মওসুমি ফসল কাটার দল, মওসুমি চাষীর দল এবং বসতিস্থাপনকারীর দল। ১৮৭৬ সালে প্রথমোক্ত দুই দলের বর্ণনা দেয়া হয়েছে নিম্নরূপে :

> ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জের উত্তরাংশের রায়তেরা ফসল কাটার মওসুমে পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে ঠিক সেভাবেই যাতায়াত করে যেভাবে আইরিশ মজুরেরা ফল সংগ্রহ ও খড় তৈরির কাজে ইংল্যান্ডে আসতো এবং কাজের শেষে ফিরে যেতো। বাকেরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানের মজুরেরা জুন মাসে ধান বোনার কাজে সুন্দরবনে যেতো এবং ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকতো। তারপর হয় তাদের পাওনা ধান নিয়ে, না হয় ধানগুলো ঐখানেই বিক্রি করে তারা বাড়ি ফিরে আসতো। আমার মনে হয়েছে, একথা আমি যোগ করতে পারি যে এই জেলার এটাই ছিল প্রায় সর্বজনীন রীতি যে, যদি পরিবারে একজনের বেশি পুরুষ থাকে, তাহলে সেই পরিবার বছরে এক বা একাধিক জনকে সুন্দরবন পাঠাবে।[৬৫]

শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে যখন স্থায়ীভাবে মজুরদের স্থানান্তরে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে এবং জলাভূমিতে চলাচলকারী এসব মজুর দিয়ে চাষাবাদ করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন চলাচলকারী মজুরেরা মওসুমি ফসল কাটার কাজের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে এবং এইভাবে সুন্দরবন এলাকায় ফসল কাটার উপর কৃষিমজুরগণ নির্ভরশীল হয়ে যায়। ১৯১৪ সালের দিকে বাকেরগঞ্জে শ্রমপরিস্থিতি সম্পর্কে রমেশচন্দ্র সেন নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন :

> প্রাচুর্য থাকার ফলে অধিকাংশ লোক, বিশেষকরে হাওলাদার ও জোতদারেরা কায়িক পরিশ্রমের প্রতি জন্মগতভাবে বিরূপ ছিল এবং একে মানহানিকর মনে করতো। ধান রোপার মওসুমে অর্থাৎ জুলাই-আগস্ট মাসে লোকদের মধ্যে কিছুটা কাজ করার প্রবণতা দেখা যেতো। সাধারণ মাত্রার উপরে যাদের অবস্থান এবং যারা জনমজুর দিয়ে তাদের জমিতে চাষাবাদ ও ধান রোপার কাজ করাতে সক্ষম ছিল, তারা ব্যতীত এই সময়ে অন্য লোকেরা লাঙ্গল, গরু, বীজধান ও ধানের চারা নিয়ে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়তো। যে মুহূর্তে এই মওসুম শেষ হতো, তারা হাত-পা ধুয়ে হাল্কা হয়ে পরবর্তী মওসুম না আসা পর্যন্ত সুদীর্ঘ আরামের আমেজে নিমগ্ন থাকতো। ফসল কাটার মওসুমে চাষীরা তাদের জমিতে খুবই কম যেতো। এই সময়ে ঢাকা ও ফরিদপুর থেকে জনমজুরেরা এসে ফসল কাটার সব কাজ করে দিত।[৬৬]

'ভাটি' এলাকায় দ্রুত জন্মহার বৃদ্ধির ফলে স্পষ্টত স্থানান্তরীদের গঠনকাঠামো বদলে যায় এবং অবশেষে মওসুমি জনমজুরেরাই প্রাধান্য পেতে থাকে।[৬৭]

ভাটি এলাকায় মওসুমি স্থানান্তরের সাথে সম্পর্কিত হয়ে সম্ভবত বাংলাদেশের অন্য এলাকাতেও দুই ধরনের স্থানান্তর দেখা যায়, যে প্রক্রিয়া বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারী

৬৫. Bengal General Proceedings (Miscellaneous), September, 1876 (IOR P/871), 281 (p 7 of *Annual General Administration Report*, Dacca Division, 1875-76)

৬৬. Ramesh Chandra Sen, *Final Report of the Survey and Settlement of the Tushkhali Government Estate in the District of Bakarganj, 1912-1916*, (Calcutta 1916), 17.

৬৭. আরো দেখুন, Harun-er-Rashid, *Geography of Bangladesh*, (Dacca 1977), 511 -514

কৃষক এবং গ্রামীণ মজুরদের পার্থক্য নিরূপণের ব্যাপারে এক সমস্যা সৃষ্টি করে। এই দ্বিবিধ স্থানান্তর সম্পর্কে ১৯১৬ সালে জ্যাক খুব তীক্ষ্ণভাবে মন্তব্য করেন :

> ফরিদপুরের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের অনেক গ্রামে ধান কাটার সব কাজ নদীয়া জেলার মতো আশেপাশের জেলা থেকে আগত কৃষিমজুরদের দিয়ে করানো হতো। কার্যকালীন সপ্তাহ বা পক্ষকালব্যাপী মনিবেরাই তাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতো। ইতিমধ্যে সেই মনিব নিজে তার কয়েকজন প্রতিবেশীকে সাথে নিয়ে নৌকাযোগে বাকেরগঞ্জ ও ময়মনসিংহের উর্বর জমিতে চলে যেতো। সেখানকার কৃষকদের বেশ সম্পন্ন অবস্থা ছিল এবং নিজেদের ফসল কাটার ব্যাপারে তাদের আত্মম্ভরিতা ছিল এবং তারা সর্বদাই অন্য জেলা থেকে আগত জনমজুর দিয়ে কাজ চালাতো। এখানে মজুর তার খাবার পেতো এবং মজুরি হিসেবে পেতো ফসলের এক-পঞ্চমাংশ। এখানে ফসল এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো যে তার প্রাপ্ত অংশ দিয়ে তার পরিবারের সারা বছরের চালের সমস্যা মিটে যেতো এবং তার নিজের জমির ফসলকাটার মজুরি বাবদ যে পরিমাণ শস্য দিতে হতো তার চেয়ে তা ছিল অনেক অনেক বেশি।[৬৮]

মওসুমি মজুরদের বাজার, এমনকি ফসল কাটার মজুরদের বাজারও টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তা না হলে নদীয়ার মজুরেরা ফরিদপুরের নিম্নহারের মজুরিতে সন্তুষ্ট থাকবে কেন, যখন তার চেয়ে খুব বেশি দূরে না গিয়েই বেশি আয় করা যেতো? মনে হতে পারে যে, এই মওসুমি নিয়োগের ব্যাপারে ফরিদপুরের ফসলকাটিয়েদের সাথে বাকেরগঞ্জ ও ময়মনসিংহের মনিবদের বহুদিনের সম্পর্ক ছিল, যা হয়তো নদীয়া থেকে আগত মজুরদের কাজ দিতে বাধার সৃষ্টি করতো। কিন্তু বর্তমানে এই দ্বিবিধ স্থানান্তর সম্পর্কে এত কম জানা যায় যে কোন উপসংহারে আসা যায় না।

বড় বড় নদীতে চর জেগে কৃষিজমির উদ্ভব হতো। সেই চরে যাওয়া ছিল স্থানান্তরের তৃতীয় ধরনের উল্লেখযোগ্য ধারা। নদীতে যখন বিশাল জলরাশি ভেদ করে চর জেগে উঠতো, তা মূলভূমির লোকদের মধ্যে ঐ চরে যাবার আকর্ষণ সৃষ্টি করতো। প্রথম প্রথম তারা মূলভূমিতে থেকেই চরে চাষাবাদ শুরু করতো। কিন্তু পরে চরেই ছোট ছোট কুঁড়েঘর বানিয়ে তারা নতুন আবাস গড়ে তুলতো। এই ধরনের আবাদিদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীন। কেউ কেউ তাদের এই নতুন চরের জমিতে ভালো ফসল ফলাতো, যে কারণে তারা আয়ের জন্য মজুরির কাজ ছেড়ে দিত। অন্যেরা চাষাবাদ এবং ছোটোখাট ব্যবসা করতো বা ফসল কাটার মওসুমে দ্বিবিধ স্থানান্তরের রীতি বহাল রাখার জন্য জনমজুর আমদানি করতো।[৬৯] কিন্তু চরের চাষাবাদ ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীনদের জন্য একটা ব্যবস্থা হিসেবে কখনো দেখা দেয় নি। পক্ষান্তরে, স্থানীয় প্রভাবশালীদের মধ্যে ঐ জমির দখল নিয়ে তীব্র সাংঘাত শুরু হতো এবং দাঙ্গা-ফ্যাসাদের উৎসভূমি হিসেবেই চর চিহ্নিত হতে থাকে। এই অবস্থা চলতে থাকে এবং আরো

৬৮. Jack, *The Economic Life* 42

৬৯ দৃষ্টান্তস্বরূপ, J. C Jack, *Report on the Survey and Settlement Operations in the Faridpur District 1904 to 1914*, (Calcutta 1916), 14, G.E Lambourn, *Bengal District Gazetteers: Malda*, (Calcutta 1918),33, 58, 65, L. S. S O "Malley, *Bengal District Gazetteers, Faridpur*, (Calcutta 1925), 79

ধানীজমির অভাবে তিক্ততাও অব্যাহত থাকে। চরে যাওয়ার এই ধারার প্রভাবে বাংলাদেশের লোকেরা উত্তরে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে আসামে চলে যায় এবং দক্ষিণের বহু নদনদী বেয়ে বঙ্গোপসাগরের ভয়ঙ্কর চরগুলোতে উপস্থিত হয়।[৭০]

যদিও গ্রাম থেকে শহরে গমন হচ্ছে চতুর্থ ধরনের স্থানান্তরী হবার ধারা এবং যার উপর অনেক গবেষণা হয়েছে, তথাপি কলকাতা মহানগরীর বাইরে এই গ্রাম-শহরে স্থানান্তরের ঐতিহাসিক ধারা সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়। এমনকি কলকাতার ক্ষেত্রেও বেশির ভাগ তথ্যই কিছু সীমাবদ্ধ শিল্পকারখানায় শ্রমিক সরবরাহের সাথে এবং সর্বহারা মজুরে পরিণত হবার সাথে সম্পর্কিত।[৭১] বিশ শতকের শুরুতে শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল ভিনদেশী, যদিও মওসুমি মিলশ্রমিক হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে, যথা মেদিনীপুর ও পাবনা থেকে তারা আসতো।[৭২] এতে মনে হয়, কলকাতায় আগত অধিকাংশ বাঙালিশ্রমিক সম্ভবত কম সুবিধার কাজ পেতো, যেমন কুলি, বাড়ির চাকর, ডকশ্রমিক, মাঝি-মাল্লা, রিকশাওয়ালা, বেশ্যা, পিওন ও পাহারাদারের কাজ বা গৃহভিত্তিক বা ছোটখাটো কারখানায় শ্রমিকের কাজ। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ, পরে দেশভাগ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পর পূর্বাঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী কলকাতায় গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু কলকাতার নোংরা বস্তিতে বা রাস্তায় বসবাসকারীদের উপর চালানো জরিপে দেখা যায় যে, এদের অধিকাংশই আগমন করেছিল আশেপাশের জেলা থেকে, বিশেষকরে ২৪-পরগনা থেকে।[৭৩] ১৯৬০ সাল পার না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় শহরে যাবার ঐ ধারা পরিলক্ষিত হয় নি। কিন্তু এই সময়ে স্থানবদলকারী দুঃস্থ মানুষদের ঢাকা আগমনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কলকাতার মতো ঢাকা শহরেও বেশির ভাগ লোক আশেপাশের জেলা থেকে এসেছিল এবং এরা ইতিপূর্বে গ্রামে মজুরি

৭০. Shapan Adnan et al., 'Land, Power and Violence in Barisal Villages", Dacca The Village Study Group 1976 (Mimeo); Nilufar Matin, *Landless Mobilization and Development of Coastal Areas in Bangladesh*, (Dhaka/London) 1986), Michael Nebelung, *Mobilization and Organization of Small Peasants and Agricultural Labourers in Rural Bangladesh, Importance and Perspectives of a Development Strategy employed by Non-Governmental Organisations*, (Berlin 1988)

৭১. দাসগুপ্ত, ১৯৭৬, এই প্রবন্ধতে উল্লেখ করেন। আরো দেখুন, চক্রবর্তী এবং রণজিৎ দাসগুপ্ত, "Material Conditions and Behavioral Aspects of Calcutta Working Class 1875-1899", *Occassional Paper No 2*, (Calcutta 1979), (Mimeo).

৭২. দেখুন, B Foley, *Report on Labour in Bengal*, (Calcutta 1906) আরও সূত্রের জন্য দেখুন Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 53

৭৩. দাস এবং প্রকাশ পূর্ব বাংলা থেকে শরণার্থী সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন; Singh, De Souza ও Sinha রাস্তার বস্তিবাসীদের কথা বলেছেন। Tarakchandra Das, *Bengal Famine (1943) as Revealed in a Survey of the Destitutes in Calcutta*, (Calcutta 1949); Kauti B. Pakrasi, *The uprooted A Sociological Study of the Refugees of West Bengal, India*, (Calcutta 1971), Andrea Menefee Singh and Alfred De Souza, *The Urban Poor , Slum and Pavement Dwellers in the Major Cities of India*, (New Delhi 1980) , 30,32, 36-37 and Dikshit Sinha, *Life in a Calcutta Slum*, S. Sinha (ed), *Cultural Profile of Calcutta*, (Calcutta 1972), 88.

খেটে বা ভিক্ষে করে দিন চালাতো এবং তাদের অধিকাংশের বাড়ি বৃহত্তর ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বরিশাল এবং ময়মনসিংহ জেলায়।[৭৪]

স্থানবদলের ধারা পরিবর্তন

উনিশ শতকের শেষে বাংলাদেশের গ্রামীণ মজুরেরা খুবই গতিশীল ছিল। অধিক হারে মজুরির জন্য মজুরদের খুব বেশি পূর্বমুখী মওসুমি চলাচল ছিল। তখন মজুর বিহার থেকে বাংলাদেশ হয়ে আসামে যেতো। বাংলাদেশের আঞ্চলিক আর্থিক অবস্থায় শস্যউৎপাদন এবং ভূমি-মানুষের হারের তারতম্যের ফলে স্থানবদলের এই স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত হয় এবং বাংলাদেশেরই কোন কোন অঞ্চল তাদেরকে আকৃষ্ট করে। এরকম তিনটি প্রধান অঞ্চল ছিল—উত্তর বাংলা (জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, কুচবিহার, রংপুর ও বগুড়া), দক্ষিণের ভাটি অঞ্চল (বাকেরগঞ্জ, খুলনা এবং ২৪-পরগনা) এবং উত্তর-পূর্বে বোরো ধান চাষের অধীনে মেঘনার নিম্নাঞ্চল (ময়মনসিংহ ও সিলেট)। এ অঞ্চলগুলোর আকর্ষণ এবং সেই সাথে দ্বিবিধ স্থানবদলের উন্নত ধারা পূর্বমুখী শুধু মজুরিভিত্তিক মওসুমি স্থানবদলের আকর্ষণের জন্য ছিল এক সতর্কসংকেত।

স্থায়ী স্থানবদলের ধারা প্রায়ই মওসুমি স্থানবদলের রূপ নিতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে স্থায়ীভাবে বসতিস্থাপনের সুযোগ হ্রাস পেয়ে যায়। স্থায়ীভাবে বসতির আশায় যারা যেতো তারা দেখতে পেলো যে জনমজুরি ছাড়া আর কোন কাজ নেই। 'যে যায় পাবনা, তার নেই ভাবনা'[৭৫] -এর মতো স্থানবদলের উৎসাহব্যঞ্জক প্রবাদবাক্য বিলীন হতে থাকে। বিশ শতকের বাংলাদেশে অনেক কারণ এই স্থানবদলের ধারাকে আরো পাল্টে দেয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, গ্রামীণ লোকসংখ্যার মধ্যে মজুরদের অধিক হারে বৃদ্ধি, ঔপনিবেশিক আমলেও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন এবং সবচেয়ে সাম্প্রতিককালের উচ্চফলনশীল ধানের প্রবর্তন সম্পর্কিত যৌক্তিক পরিবর্তন। ফলে ১৯৭০-এর দশকের মধ্যে মওসুমি মজুর চলাচলের পূর্বমুখী ধারা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তার চেয়েও বেশি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মওসুমি মজুরদের চলাচলেরই কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে যায়।

এখন যেহেতু সর্বত্রই মজুরের আধিক্য রয়েছে এবং চাষাবাদচক্রের মওসুমের বিশেষ তুঙ্গ পর্যায়েই শুধু এর স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই মজুর চলাচলের সাফল্য সংগঠন ও পরিকল্পনার উপর বেশি নির্ভরশীল হতে থাকে। বাংলাদেশে ভাসমান, বাস্তুহারা, সর্বকালীন ভবঘুরে শ্রেণীর উদ্ভব এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে, যারা হয় ভিক্ষাবৃত্তি না হয় ছোটখাটো কাজের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। এই 'ভাসমান' লোকের দল শুধু যে নিয়মিত

৭৪. Sayeda Rowshan Qadir, *Bastees of Dacca: A Study of Squatter Settlement* (Dacca 1975), 20-26, *The Vagrants of Dacca City A Socio- Economic Survey, 1975,* (Dacca 1978) 46-48.

৭৫. L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers, Pabna* (Calcutta 1923), 31.

স্থানবদলকারী মজুরদের কাজ পাবার ক্ষেত্রেই হার মানায় (এরা খুবই নিম্নহারে কাজ নিতে পারে, কেননা এদের আর যাতায়াতখরচ মিটাতে হয় না) তাই নয়, এই মজুরেরা মওসুমি কাজের জন্য স্থানত্যাগের সাথে সাথে ভাসমান লোকেরা তাদের স্থান ভালভাবেই দখল করে। মওসুমি চলাচলে অভ্যস্ত অনেক মজুর স্থানবদল করা বন্ধ করে বাড়িতে থেকেই কাজ সামলায়। অন্যেরা আরো দক্ষ সংগঠনের মাধ্যমে ও সুদূরের মালিকদের সাথে অগ্রিম মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে তাদের মওসুমি কাজের সামাল দেয়।

উৎপাদনশীল শ্রমশক্তির উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের অভাবজনিত বিশেষ পরিস্থিতিতে সম্পদ খুবই সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে মজুরিভিত্তিক শ্রমিকদের চাপ ধীরে ধীরে মজুরদের স্থানবদলের ধারাকে কোণঠাসা করে ফেলে, যে চলাচলের ধারা শতাব্দীব্যাপী গ্রামীণ মজুরদের আয়ের জন্য এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে শুধু বাঁচার তাগিদেই লোকেরা স্থানবদল করতো। অধিকন্তু লাভের চেয়ে চলাচলের খরচও বেড়ে যায়। ফলে স্থানবদলকারী মজুরেরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভাসমান শ্রেণী আয়ের জন্য চলাচল করতে থাকে এবং পরিকল্পিত শ্রেণী আরো বেশি সংগঠিত হতে থাকে এবং চলাচলের ব্যাপারে আর্থিক ঝুঁকি বিবেচনায় নিতে থাকে।[৭৬] সম্পূর্ণভাবে অসংগঠিত এবং সুসংগঠিত এই দুই চরম মাত্রার স্থানবদলকারী মজুরশ্রেণীর সাথে খোলা বাজারে স্থানবদলকারী মজুরদের এক তৃতীয় শ্রেণীকে নতুন নতুন ফসল এবং নতুন প্রযুক্তি সংযোগের ফলে কোন কোন স্থানে বর্ধনশীল অথচ এক অনিশ্চিত মওসুমি নিয়োগের সাথে জড়িত থাকতে দেখা যায়। স্থানবদলকারী এই মজুরের দলকে গ্রামের হাটবাজারে শ্রম বিক্রয়ের জন্য জমায়েত হতে দেখা যায় এবং এরা আশেপাশের এলাকার মধ্যে সর্বোচ্চ মজুরি প্রদানকারীর খামারে কাজে যায়। কতদিনের কাজ এবং কি ধরনের মজুরি পাওয়া যাবে তা নিয়ে দরাদরিশেষে চুক্তি হয়।[৭৭]

এই শতাব্দীর প্রথম দিকে পর্যবেক্ষকগণ জানান যে, পূর্বেকার দশকগুলোতে কথিত মজুরদের ভৌগোলিক স্থানান্তরের মাত্রা বাড়তে থাকে।[৭৮] একই সাথে ভিনদেশীদেরকে বাঙালি মজুরেরা উৎখাত করে। মজুর চলাচলের ধারা সীমিত এবং পৃথক হতে খুব বেশি দেরি হয় না। যা থাকে তা হলো, গ্রামীণ মজুরেরা সহজেই কৃষিকাজের সাথে অকৃষিকাজে রপ্ত হয়ে যায় এবং গ্রামীণ নিয়োগ থেকে শহুরে নিয়োগের জন্য চলাচল করতে থাকে। বিশেষ এক সময়ে বা মওসুমকে অন্যের চেয়ে বেশি করে কাজ দিতে পারছে এবং কে

৭৬. সূত্রের জন্য দেখুন, Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 55-56। ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট ও ঢাকার মধ্যে মজুর স্থানান্তরের জটিল ধরন সম্পর্কে বিশদ গবেষণা আমিনুল হক ফরায়জির Ph D থিসিসে প্রকাশিত হবে, La Trobe University (Australia)

৭৭. Van Schendel, *Peasant Mobility*, 211-212, তুল্য Bandyopadhyaya, A,120

৭৮. দৃষ্টান্ত J. N. Gupta, *District Gazetteers of Eastern Bengal and Assam : Bogra,* (Allahabad 1910), 91

বেশি মজুরি দিতে পারছে, তার বাইরে স্থানবদলকারী মজুরদের কাছে অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্রের সীমানা অর্থহীন হয়ে যায়।

কর্মসংস্থান এবং মজুরি

আলোচ্য সময়ে গ্রামীণ মজুরদের সমাগম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তা ১৮৮০ সালে একজনের স্থলে ১৯৭০ সালে চারজনে দাঁড়ায়। কিন্তু শ্রমের চাহিদার কি অবস্থা? কারা এদের কাজ দিয়েছিল এবং কোন্ শর্তে? কিভাবেই বা অবশেষে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল? এসব প্রশ্নের প্রতিই আমরা এখন দৃষ্টি দেবো।

নিয়োগকর্তা

বাংলাদেশের কৃষিমজুরদের নিয়োগকর্তারা যে কোন সংগঠিত শ্রেণী তা মনে করা ভুল হবে। বরং আমাদের তথ্যে দেখা যায় যে, এদের প্রায় সবাই কোন না কোন সময় জনমজুর খাটিয়েছে। বড় বড় ভূস্বামী ১৮৮০-এর দশকের সময় থেকে পরবর্তী সময়ে জনমজুরদের পরিবর্তে ভাগচাষীদের দিয়ে তাদের জমি চাষাবাদ করাতো।[৭৯] কিন্তু তারা নিজ জোতের জমি প্রায়ই জনমজুর দিয়ে চাষাবাদ করাতো। বেগারশ্রম বা ভূস্বামীদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে শ্রম দেবার রীতি এই সময় একেবারেই উঠে গিয়েছিল। যে প্রামাণ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মনিবের দ্বারা নিয়োগের পরিমাণ হিসাব করা যায় না। কিন্তু সর্বশেষ গবেষণায়ও এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে বড় বড় জমিদার, ঊর্ধ্বতন মধ্যস্বত্বভোগী বা জোতদারেরা গ্রামীণ মজুরদের সবচেয়ে বড় নিয়োগকর্তা ছিল।[৮০] স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা হয় যে, সাধারণ চাষীরাই বেশিরভাগ জনমজুর খাটাতো, বিশেষকরে ভরা মওসুমে, যখন পরিবারের সদস্যদের দ্বারা কাজ আর কুলানো যেতো না।

শ্রমবিনিময়পদ্ধতিতে চাষীরা বিনা মজুরিতেও লোক খাটাতে পারতো এবং জমিতে চাষ দেয়া, মই দেয়া এবং পাট জাগ দেয়া, আঁশ ছড়ানো ও শুকানোর সময়ে এই ব্যবস্থার বেশ প্রচলন ছিল। ১৯০০-এর দশকের প্রথমদিকে ছোট ছোট চাষীদের মধ্যে জনমজুর খাটানোর পরিবর্তে মনে হয় এই শ্রমবিনিময়ই বেশি প্রচলিত ছিল। কিন্তু সস্তায় জনমজুর খাটানোর সুযোগ বেশি হতে থাকার ফলে শ্রমবিনিময়রীতি কমতে থাকে।[৮১] পাটের ভাল দাম পাওয়ার ফলে সার্বিকভাবে অর্থনীতির প্রসার ঘটে। এই শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে

৭৯. এই ব্যাপারে বিরাট আঞ্চলিক তারতম্যের জন্য দেখুন, Bose

৮০. নজিরের জন্য দেখুন Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 58; কিন্তু তুলনীয় M. A. Momen, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Jessore, 1920-1924,* (Calcutta 1925), 49

৮১. আরো বিশদ আলোচনার জন্য এবং গ্রামীণ বাংলায় শ্রমবিনিময়ের উপর বিপুল নজিরের জন্য দেখুন Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 58-59.

মজুরগিরি গ্রামীণ বাংলাদেশে বিস্তারলাভ করে। অনেক চাষী জনমজুরের মজুরি মিটানোর জন্য টাকা কর্জ নিত এবং গ্রামীণ ঋণদানপদ্ধতিতে মজুরনিয়োগ একটা উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮২] ১৯৩০-এর দশকের মন্দার সময়ে ঋণ পাওয়ার সুযোগ হঠাৎ করে খুবই কমে যায় এবং কিছুকালের জন্য শ্রমবিনিময়রীতির পুনঃপ্রচলন করে নিয়োগকারীরা জনমজুরের খরচ কমানোর প্রয়াস পায়।[৮৩] কিন্তু দেশভাগের পর শ্রমবিনিময়ের ক্ষেত্রে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা শ্রম সম্পর্কিত বিষয়ে খুবই নগণ্য।[৮৪]

পরিবারখামারভিত্তিক স্বত্বাধিকারী চাষীরাই জনমজুর নিয়োগকারীদের বিরাট অংশে পরিণত হয়। তাদের অধিকাংশ মওসুমের সময় পারিবারিক শ্রমশক্তির ঘাটতি পূরণের জন্য নৈমিত্তিকভাবে মজুর নিয়োগ করতো। কিন্তু অনেকে আবার আরো স্থায়ীভাবে জনমজুর খাটাতো। এইভাবে অধিকতর সম্পন্ন কৃষকপরিবার, বিশেষকরে যেসব পরিবার চিন্তায় ও কাজে জোতদার হবার পথে, সেসব পরিবার বাৎসরিকভাবে ক্ষেতমজুর নিয়োগ করতো। এ এমন এক সামাজিক উন্নতির মনোভাব, যেখানে কায়িক পরিশ্রম পরিহার করা আবশ্যক। কিন্তু ক্ষেতমজুরদের নিয়োগকারীদের আরো অনেক গৃহস্থালি ছিল, যাদের পারিবারিক ঐতিহ্য তাদের নিজেদের লাঙ্গল ধরার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতো (হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদের জন্য এবং মুসলমানদের মধ্যে অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণের জন্য, যাদেরকে সাধারণত শরিফ হিসেবে চিহ্নিত করা হতো)।[৮৫]

জনমজুর যে শুধু জোতদার, মধবিত্ত কৃষক বা বিশেষ শ্রেণীরাই খাটাতো তাই নয়, অবিশ্বাস্যভাবে যাদের নিজেদেরই ভরণপোষণ চলতো না, এমন ছোট ছোট চাষীও খাটাতো। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, ভাগচাষীরা, এমনকি খণ্ডকালীন জনমজুরেরাও জনমজুর খাটাতো।[৮৬] এর ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ছোট ছোট

৮২. তুল্য Binay Bhushan Chaudhuri,' "Rural Credit Relations in Bengal, 1859-1885," *Indian Economic and Social History Review,* (September 1969), 204-257 এবং তাঁর "The Process of Depeasantization."

৮৩ M. O Carter, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Malda, 1928-1935,* (Alipore 1939), 51

৮৪. দৃষ্টান্ত, Betsy Hartmann and James Boyce, *A Quiet Violence · View from a Bangladesh Village,* (San Fransisco /London 1983), 206.

৮৫. তুল্য, Marvin Davis, *Rank and Rivalry. The Politics of Inequality in Rural West Bengal,* (Cambridge 1983) , 50-69, 206 Van Schendel, *Peasant Mobility* 212-214; Ashok Rudra and Madan Mohan Mukhopadhyaya, "Hiring of Labour by Poor Peasants" *Economic and Political Weekly,* (January 10 1976), 34.

৮৬. ভাগচাষীদের জন্য দেখুন Sachse, Rudra এবং Clay; মজুরদের জন্য দেখুন, Prance, Jack, Habibullah এবং Farouk Rudra, এবং Rudra and Mukhopadhyaya, F. A, Sachse, *Mymensingh,* 70; Ashok Rudra, 'Sharecropping Arrangements in West Bengal", *Economic and Political Weekly,* 10, 39 (September 27, 1975), Edward J Clay, "Institutional Change and Agricultural Wages in Bangladesh," *Bangladesh Development Studies,* 4:4 (October 1976), 434-436;. B C Prance, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Riparian Areas of District Pabna Surveyed in the Course of the Faridpur District Settlement,* (Calcutta 1916),5, Jack, *Economic Life,* 42; M Habibullah and A. Farouk, *The Pattern of Agricultural Unemployment: A Case Study of an East Pakistan Village,* (Dacca 1962), 17; Rudra and Mukhopadhyaya, প্রাগুক্ত, 34.

গৃহস্থালিতেও ভরা মওসুমে লোক লাগানোর প্রয়োজনীয়তা ছিল অথবা ছোট গৃহস্থরা খরচ চালানোর জন্য এবং পূর্বের কৃত দেনা পরিশোধের জন্য প্রতিশ্রুত শ্রম দিতে বাধ্য হতো এমন সময়ে, যখন তাদের নিজেদের গৃহস্থালিতে কাজও বন্ধ রাখার উপায় নেই। গ্রামীণ মজুরদের বিভিন্নমুখিতা তৃতীয় উপাদান হতে পারে। কোন কোন কাজে কোন কোন মজুর অন্যের চেয়ে বেশি দক্ষ এবং কোন এক বিশেষ সময়ে কোন মজুর যে শ্রম বিক্রয় করেছে, পরিবর্তে সেই মাত্রাতেই শ্রম ক্রয় করেছে, ঠিক এমন নয়।[৮৭]

বাংলাদেশের কৃষিতে বছরের পর বছর কিভাবে জনমজুর নিয়োগের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলা কঠিন। একদিকে ছোট ছোট চাষীর মধ্যে শ্রমবিনিময়ের অবনতি ঘটায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির মোকাবেলায় নিবিড় চাষের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায়[৮৮] সর্বজনীনভাবে দুটো শস্য উৎপাদনব্যবস্থার উদ্ভব হয়। পাট-আখের মতো অধিক হারে শ্রমনিয়োজিত অর্থকরী ফসলের প্রসার ও উচ্চফলনশীল ধানের প্রচলন হয়েছে এবং শীতকালে সেচব্যবস্থার জন্য কৃষিমজুরদের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে এই যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, প্রণিধানযোগ্য কৃষকবিনাশ, কৃষিউৎপাদনের স্থবিরতা এবং অপ্রতুল সম্পদের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার সমন্বিত প্রতিক্রিয়ায় গ্রামবাংলার সবচেয়ে বড় নিয়োগকারী মধ্যবিত্ত কৃষকদেব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, যার ফলে মজুরনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এই ইঙ্গিতও রয়েছে যে, বিভিন্ন মাত্রার ক্ষেত-খামারে সমগ্র শ্রমনিয়োগের তুলনায় মজুরনিয়োগের অনুপাতে কমই তারতম্য ঘটেছে।[৮৯] তা হলে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে এই ধারণা করা চলে যে, ১৮৮০ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে মূলত স্থবির অর্থনীতি সত্ত্বেও কৃষিমজুরনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কৃষিমজুরির বিষয়টা পুরুষদের দখলেই বেশি দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, মেয়েদের দ্বারা ধান ভানার ব্যবস্থা থেকে ছোট ছোট যন্ত্রপাতি দ্বারা বা ধানকলে ধান ভানার মতো যান্ত্রিক পরিবর্তনের সাম্প্রতিক ধারার সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে শুধু পুরুষমজুর নিয়োগের ব্যবস্থা হয়।[৯০]

৮৭. Rudra and Mukhopadhyaya, প্রাগুক্ত, 36, Khan, 20-21 R, C, Dutt (1882), L S S O' Malley, *Bengal District Gazetteers Bankura*, (Calcutta 1908), 70

৮৮. তুল্য Boyce, *Agrarian Impasse*

৮৯. রুদ্র ও মুখোপাধ্যায় (১৯৭৬,৩৪) এর সত্যতা দেখতে পান ১৯৭০-এর দশকের প্রথমদিকে পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলায়। বর্তমানে এই তথ্য সমগ্র বাংলার জন্য প্রযোজ্য কিনা বলা অসম্ভব।

৯০ মেয়েদের ধান ভানা পেশার ব্যাপক নজির দিয়ে জেলার বিবরণী পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত, O' Donnell, 204, Jack, *Final Report Bakarganj*, 73; F.W Strong, *Eastern Bengal District Gezetteers. Dinajpur*, (Allahabad 1912), 79 আরও দেখুন S. V Ayyar and A K. Ahmed Khan," The Economics of a Bengal Village", *Indian Journal of Economics*, 4 3 (1926) 204, Mead Cain et al., "Class, Patriarchy and Women's Work in Bangladesh ", *Population and Development Review*, 5·3 (1979), 405-438, ধান ভানা এবং চালকলের জন্য দেখুন, Ramkrishna Mukherjee, *Six Villages of Bengal*, (Bombay 1971), Susan Fuller Alamgir, *Profile of Bangladesh, Women. Selected Aspects of Women's Roles and Status in Bangladesh*, (Dacca 1977)), 66 ; Jahanara Huq," Economic Activities of Women in Bangladesh The Rural Situation", Women for Women Research and Study Group (ed.) *The Situation of Women in Bangladesh*, (Dacca 1979), 139-182

কিন্তু অকৃষিমজুর নিয়োগের ব্যাপারটা কি ? অকৃষিমজুর নিয়োগকারীদেরকে তিনটি বড় শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—সরকার, প্রাইভেট কোম্পানি এবং ব্যক্তিমালিক। আমাদের আলোচ্য সময়কালে সরকার অনিয়মিতভাবে গ্রামীণ মজুরদেরকে প্রধানত মাটি কাটার কাজে লাগিয়েছিল। প্রত্যেক শীতের সময় মওসুমি বৃষ্টিতে বিনষ্ট কাঁচা রাস্তা ও বাঁধ সংস্কার করতে হতো। ১৯৬০-এর পর অনেক মজুরই সেচকাজের এবং পানিব্যবস্থাপনার প্রকল্পসমূহে কাজ করে বেশ টাকা পায় এবং সরকারি বহু বিভাগ কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করিয়ে থাকে। সরকার খাদ্যমজুরি দেয়, কিন্তু সাধারণত মজুরদের নিয়োগকারী একজন ঠিকাদার থাকতো, যাকে মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে নিযুক্ত করা হতো।[৯১] অনুরূপভাবে, দেশবিভাগের পরে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের প্রসার কুলি, ডাকপিওন, রেলশ্রমিক, পিওন, চৌকিদার, পুলিশ ও সৈন্য হিসেবে গ্রামীণ মজুরদের নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।[৯২]

প্রাইভেট কোম্পানিগুলো সম্ভবত সরকারের ন্যায় গ্রামীণ মজুর নিয়োগের ব্যাপারে ততোখানি সুযোগ দেয় নি। তবে শহুরে বা গ্রামীণ কারখানার কাছাকাছি এলাকায় গ্রামীণ মজুরেরা কারখানাশ্রমিক হিসেবে, বাস ও ট্রাকের শ্রমিক হিসেবে, ইটের ভাটার শ্রমিক হিসেবে এবং পিওন ও কুলি হিসেবে কাজ পেতো।[৯৩] কিন্তু আলোচ্য সময়ে অকৃষিমজুরদের বিরাট অংশকে কাজ দিয়েছে ব্যক্তিমালিকগণ। ঔপনিবেশিক আমলে ধনী মধ্যস্বত্বভোগীরা তাদের বাড়িতে চাকর রাখতে, কাছারিতে কেরানি-পিওন রাখতে এবং স্থানীয় কৃষকদের ভয় দেখানোর জন্য সশস্ত্র রক্ষী রাখতে এবং লোকলস্করবাহিনী রাখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল।[৯৪] যেখানে পতিত জঙ্গল পাওয়া যেতো, মধ্যস্বত্বভোগীরা সেখানে শিকারী ও কাঠুরের দল নিয়োগ করতো। আর এই শ্রেণীর লোকেরা সেচের কাজে বা বাঁধসংরক্ষণের জন্য বা বড় বড় দীঘি খননের জন্য বিপুল সংখ্যক মাটিয়াল মজুর নিয়োগ করতো। এগুলো ছিল এক ব্যয়বহুল মর্যাদাকর এবং আবহাওয়া শীতলকারী প্রকল্প।[৯৫] ১৯৫০-এর দশকের প্রথমদিকে জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদের ফলে এই ধরনের নিয়োগ

৯১. মাটির কাজের পূর্বনজিরের জন্য দেখুন "Bengal Village Biographiers", *Calcutta Review*, 31, (July-December 1858), 195-197; O' Donnell, 167-168 এবং অন্যান্য জেলা গেজেটিয়ারসমূহ (বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন, Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 63 n); আধুনিক সমীক্ষার মধ্যে রয়েছে Rehman Sobhan, *Basic Democracies, Works Programme and Rural Development in East Pakistan*, (Dacca 1962), Stefan De Vylder and Daniel Asplund, *Contradictions and Distortions in a Rural Economy: The Case of Bangladesh*, (n p. 1979), 191-210 and Eirik G Jansen, *Rural Bangladesh , Competition for Scarce Resources*, (Oslo 1986),46-47, 262-265.

৯২. নজিরের জন্য দেখুন, Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 63n.

৯৩. ঐ।

৯৪. ঐ।

৯৫. Cf J. L. Sherwill, *A Geographical and Statistical Report of the Dinajpore District, 1863*, (Calcutta 1865), 4.

বহুলাংশে ব্যাহত হয়। গ্রামীণ সমাজের শিখরে যে নব্য এলিট সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলো তারা কম জাঁকজমকপূর্ণ জীবনধারার দিকে ঝুঁকে পড়লো, যার ফলে অকৃষিমজুরদের নিয়োগ অত্যন্ত হ্রাস পায়।[৯৬] জমিদারগণ ছাড়াও অনেক সম্পন্ন কৃষক অকৃষিকাজে মজুর লাগাতো। সহভৃত্য, কুলি, মাটিয়ালমজুর এবং ঘরামিরা এই কৃষকদের দ্বারা নিয়োজিত হতো।[৯৭] কারিগর, মাঝি, জেলে, দোকানদার এবং স্থানীয় বাজারের ব্যবসায়ীরাও মজুরির বিনিময়ে সহকারী নিয়োগ করতো।

এইভাবে দেখা যায় যে, অকৃষিমজুরদের নিয়োগের ব্যাপারে এক বিরাট সংখ্যক ভিন্নমুখী নিয়োগকারী ছিল। সাধারণত কৃষিকাজে যখন আয় হতো না, তখনই এই ধরনের কাজের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। তাই শীতকালে যখন ক্ষেতমজুরদের প্রকৃতপক্ষে কর্মহীন দিন কাটাতে হতো, তখন মাটি কাটার কাজ, দালানতৈরির কাজ, ঘরামির কাজ এবং ইট তৈরির কাজের মতো নানাবিধ কাজের বিকাশ দেখা যেতো। কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি অবনতিতে মজুরিনির্ভর লোকদের কাছে উপার্জনের প্রধান উৎস হিসেবে কৃষিকাজ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, এর মওসুমি প্রকৃতি হারিয়ে গিয়ে তা স্থায়ী সংস্থানে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ বাংলাদেশের অনেক মজুরের এখন এই ধরনের কাজ পাওয়াও বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষি ও অকৃষিকাজের পার্থক্য তাদের কাছে অর্থহীন। তাই তারা আংশিকভাবে বিনা মজুরির কাজের উপর নির্ভর করেও জীবনে বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়। তারা ফসল তোলার পর মাঠে পড়ে থাকা ধান ও আলু সংগ্রহ করে, কুঁড়ো ঝেড়ে, গোবর, ছোবড়া ও শন যোগাড় করে বা গ্রামের পুকুর থেকে বেআইনিভাবে ছোট ছোট মাছ মেরে আপতিক আয় করে থাকে। উপার্জনের অভাবহেতু এই ধরনের পেশা তাদেরকে আরো দুর্বিনীত করে, ছোটখাটো চুরি, বেশ্যাবৃত্তি ও ভিক্ষা করার দিকে ঠেলে দেয়, যার সবগুলোই তখন বেড়েছে যখন গণদারিদ্র্য হয়ে উঠেছে সর্বগ্রাসী।[৯৮]

কর্মসংস্থান এবং ঊনকর্মসংস্থান

উনিশ শতকের মধ্যসময়ে অনেক পর্যবেক্ষক মজুরির জন্য কাজ করার ব্যাপারে গ্রামবাংলার মানুষের অনীহার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। ১৮৬০-এর দশকে দিনাজপুর ও বগুড়ার অবস্থা পর্যালোচনা করার সময়ে শেরউইল মন্তব্য করেন :

> যদিও দেশটিতে যথেষ্ট লোকসংখ্যা আছে, কুলি বা মজুর পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। এমনকি বেসামরিক কেন্দ্রসমূহেও কর্তৃপক্ষের সাহায্য ব্যতীত কোন কাজের লোক বা কুলি পাওয়া বা

---

৯৬. Van Schendel, *Peasant Mobility*, 173, 178

৯৭. ঘর ছাওয়ায় অসামান্য দক্ষতা প্রয়োজন। কিন্তু ঘরামিরা অঘরামিদের সহায়তায় দলবদ্ধভাবে কাজ করে। তুলনীয় Jenneke Arens and Jos Van Beurden, *Jagrupur, Poor Peasants and Women in a Village in Bangladesh,* (Calcutta 1980), 98-99

৯৮. Van Schendel, *Peasant Mobility*, 79-81, 87-89, 106, 142 154-159,167-171, 226 230, 237 239-240 Siddiqui 355-375

টানাগাড়ি পাওয়া খুবই দুষ্কর ব্যাপার। আর যদি লোক পাওয়াই যায়, তবে লোকটি দিনের অর্ধেক সময় কাজ করে আর বাকি অর্ধেক সময় বোঝা টানে। যেকোন ধরনের কাজের প্রতি তারা ছিল বিমুখ।[৯৯]

ঐ একই সময়ে ত্রিপুরার (বর্তমানে কুমিল্লা) উপর আলোচনাকালে আরো স্পষ্টভাবে ব্রাউন মন্তব্য করেন :

একটা কুলির মাসমাইনে পাঁচ টাকার কম ছিল না। কিন্তু যে কাজ সে করতো তার পরিমাণ এত কম যে তার জন্য দু'টাকা দিলেও বেশি দেয়া হতো। এই ধরনের উচ্চমূল্যের কারণ খুঁজতে বেশিদূর যেতে হয় না। চাষাবাদের জন্য জমির প্রাচুর্য এবং কৃষিকাজের বিপুল উপার্জনের মধ্যেই সেই কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। স্বাভাবিক হিসেবে একথা ধরে নিতে হবে যে কুলিরা তাদের কুলিগিরির প্রতি বা কুলিগিরি চালিয়ে যাওয়ার প্রতি সম্পূর্ণভাবে অমনোযোগী ছিল এবং অতি সত্বরই সে সেকাজ পরিত্যাগ করে আধুনিক বাঙালি কৃষকের আসর ও বাবু শ্রেণীর দলে যোগ দিত।[১০০]

একথা বলা ঠিক হবে না যে, সব সময়ে গ্রামীণ শ্রীবৃদ্ধির কারণেই মজুর পাওয়া দুর্লভ ছিল। বাংলাদেশের পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলের বহু এলাকায় এর কারণ ছিল বর্ধমান জ্বর (ম্যালেরিয়া)-এর প্রকোপে উচ্চহারে মৃত্যু, যা উনিশ শতকের শেষার্ধ ব্যাপী আঞ্চলিক রোগ হিসেবে থেকে যায়। বর্ধমান, বীরভূম, হুগলী ও রংপুর জেলার সমগ্র এলাকায় এবং পাবনা ও বাঁকুড়া জেলার কিয়দংশে জনসংখ্যা হ্রাস পেতে দেখা যায়। কিন্তু দিনাজপুর, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও যশোরে তা ছিল স্থির। গ্রামীণ গরিবদের মধ্যে যাদের অপর্যাপ্ত খাবার ছিল, মনে হয় তারা অতি সহজেই এই জ্বরে মারা যেতো। যারা বেঁচে যেতো তাদের প্রাণশক্তিও কমে যেতো এবং এর ফলে চাষাবাদএলাকারও বেশ অবনতি দেখা দেয়। এমনকি ফসল কাটার মজুরের অভাবে মাঠেই ফসল নষ্ট হবার দৃশ্যও দেখা যায়।[১০১] শতাব্দীর শেষদিকে এই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে শুরু করে।

সক্ষম লোক এবং ইচ্ছুক মজুরের অভাব সম্পর্কে আগ্রহী নিয়োগকর্তাদের অভিযোগ ক্রমে ক্রমে কমতে থাকে এবং ১৯১০-এর দশকের মধ্যে এই অভিযোগ লোপ পায়। এই সময়ের মধ্যে নিয়োগব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। গ্রামীণ মজুরের অভাব বা

৯৯. Sherwill, 11, তুলনীয় J N. Gupta বগুড়ার মজুরদের উপর মন্তব্য, *District Gazetteers of Eastern Bengal and Assam : Bogra*, (Allahabad 1910), 28.

১০০. J. F. Browne, *General Report on the Tipperah District*, (Calcutta 1866), 7.

১০১. L. S. S. O' Malley and Monomohan Chakravarti, *Bengal District Gazetteers: Hooghly*, (Calcutta 1912), 170; L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Jessore*, (Calcutta 1912), 84 ; Benay Chowdhury, "Agrarian Economy and Agrarian Relations in Bengal, 1859-1885," Narendra K Sinha (ed.) *The History of Bengal*, (1757-1905), (Calcutta University 1967), 241-244, Chaudhuri, "Rural Credit Relation", 163-164.

বেশি মজুরি দিয়ে মজুর যোগাড় করার সমস্যা নিয়ে কর্তৃপক্ষকে আর ব্যস্ত হতে হতো না। বরং লোকদের পুরোপুরি কর্মসংস্থান করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তখনকার প্রবন্ধাদিতে প্রকাশ্য অলসতার বিষয়ও উল্লেখিত হয়। কিন্তু তা এই কারণে নয় যে, যখন তাদের কিছুই করার থাকতো না তখন বেশ উচ্চহারে মজুরি দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও দিনমজুর হিসেবে কাজ করার ব্যাপারে তাদের সাধারণ অনীহা থাকতো।[১০২] বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে কর্মসংস্থানের অভাব গ্রামীণ মজুরদেরকে বহুকাল ধরে মওসুমি স্থানান্তরে যেতে বাধ্য করে। কিন্তু ১৮৮০-এর দশক থেকে মজুরের স্থানান্তরে গমনের যে প্রসার ঘটে তা অনেক বড় সমস্যার নিদর্শন বহন করে। প্রত্যেক স্থানেই জনমজুরের চাহিদার চেয়ে মজুরিআয়ের উপর নির্ভরতা আরো দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অসমঞ্জস ধারা দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে প্রমাণিত হয় এবং বিশ শতকের বাংলাদেশের সমগ্র সামাজিক বন্ধনকে তা প্রভাবিত করেছিল।

কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্বহারের হিসাব দেয়া অত্যন্ত কষ্টকর। বিশ শতক যতো অতিক্রান্ত হতে থাকে, গ্রামীণ মজুরের চাহিদা ও সরবরাহের ভারসাম্যের ততোই অবনতি হতে থাকে। বিশেষকরে দেশবিভাগের পরে বাংলাদেশে এরূপ অবস্থা দাঁড়ায়, যা একদা অধিকতর ধনী অর্ধাংশ হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৭০ সালের দিকে বাংলাদেশে বেকারত্ব ও উনকর্মসংস্থানের হার ছিল সমগ্র গ্রামীণ শ্রমশক্তির ৩০% থেকে ৪০% অংশ।[১০৩] কিন্তু তখন বেকারত্ব ছিল খুবই সাময়িক ব্যাপার। তাই সমগ্র হিসাব সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে।[১০৪] অধিকন্তু, প্রাপ্ত সংখ্যাগুলো সাধারণভাবে নির্ধারিত এবং এতে গ্রামীণ মজুরদের অসম্পূর্ণ কর্মসংস্থানের পৃথক তথ্যের অভাব রয়েছে।

শ্রমমজুরি

গ্রামীণ বাংলাদেশে মজুরিমাত্রা সম্পর্কে যেকোন আলোচনায় সমস্যা দেখা দেয়। ভিন্নধর্মী উৎস থেকে গ্রামীণ শ্রমমজুরির তথ্য সংগৃহীত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় মজুরির পার্থক্য নিরূপণে পদ্ধতিগত সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় পৃথক ভাবে সমীক্ষা

---

১০২. W W Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Volume II; *Tipperah*, (London 1876), 387

১০৩. Iftikhar Ahmed,"Unemployment and Underemployment in Bangladesh Agriculture", *The Dacca University Study*, 22, Part A (June 1974), 79-94, Mohiuddin Khan Alamgir, *Bangladesh : A Case of Below Poverty Level Equilibrium Trap*, (Dacca 1979), 28-32; Mohiuddin Khan Alamgir, *Development Strategy for Bangladesh*, (Dacca 1980), 43-44 ; Government of the People's Republic of Bangladesh, *The Second Five Year Plan, 1980-1985* (Dacca 1980), Chapter VI, Barket-e-Khuda, "Measurement of Underemployment in Rural Bangladesh—An Alternative Approach." Wahiduddin Mahmud (ed), *Development Issues in an Agrarian Economy—Bangladesh* (Dhaka 1981); Khan et al , 9-28. Hartmann and Boyce (202) জাতিসংঘের এক সমীক্ষার (১৯৭৭)-র উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেখানে হার দেখানো হয়েছে ৪২%।

১০৪. খান এবং অন্যান্য, ২২-৩০; Mukherjee, *Six Villages* ,118-125

করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।[১০৫] প্রধান প্রধান অসুবিধার মধ্যে রয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামীণ মজুরিতে নগদ টাকা ও জিনিসের সংমিশ্রণ, দীর্ঘমেয়াদি মুদ্রাস্ফীতি এবং মজুর ও নিয়োগকারী শ্রেণীর মধ্যে ভিন্নমুখিতা, যা মজুরিহারের তারতম্য ঘটায়। ফলে, মজুরিহারের তথ্য সর্বদাই কাছাকাছি মাত্রার।

এই সব সতর্কসঙ্কেত থাকা সত্ত্বেও প্রাপ্ত পরিসংখ্যানকে ভিত্তি করে কিছু প্রাথমিক মন্তব্য করা যেতে পারে। যেমন এটা স্পষ্ট যে, ১৮৮০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে মজুরিহারের অবনতি দেখা গেছে। কিন্তু ঐ অবনতি ঔপনিবেশিক আমলে খুবই কম ছিল। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ২২টি জেলার গেজেটিয়ারে প্রকাশিত বিবরণ থেকে গ্রামীণ মজুরি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এটা সর্বদা পরিষ্কার ছিল না ঐ তথ্য কি শুধু নগদ টাকার বিবরণ দিচ্ছে, নাকি সম্পূর্ণ মজুরির পরিমাণ উল্লেখ করছে। যদি আমরা ধরে নিই যে, ঐ তথ্যের মধ্যে জিনিসপত্র (যেমন খাবার, নাস্তা ইত্যাদি) প্রদানও গণ্য করা হয়েছে এবং যদি আমরা আমাদের অনুসন্ধানকে অদক্ষ মজুরদের দৈনিক মজুরির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি[১০৬], যা ঐ তথ্যে ভালই প্রকাশিত হয়েছিল, তা হলে জেলাওয়ারি মজুরির হার আমরা নিম্নরূপ দেখতে পাই :

অঞ্চল	দৈনিক মজুরির হার
পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহ	পরিষ্কার মোটা চাউলের ২.৫ সেরের সমান
উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে	প্রায় ৪ সের
মধ্যাঞ্চলের জেলাসমূহ	প্রায় ৪-৫ সের
পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহ	প্রায় ৬ সের।[১০৭]

এই তথ্য ১৮৮৮ সালে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, যখন ডাফরিন রিপোর্টে দৈনিক মজুরির মানে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের ২ সের থেকে পূর্বাঞ্চলের ৯ সেরের মধ্যে তারতম্য থাকতো বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯১১ ও ১৯১৬ সালে বাংলাদেশের মজুরিশুমারিও[১০৮] এই প্রাপ্ত তথ্যকে মোটামুটিভাবে সমর্থন করে।

১০৫. যদিও কোন সময় পরস্পববিরোধী তথ্য পাওয়া যাবে স্থানীয় মজুরির হার সম্পর্কে জেলা গেজেটিয়ারে এবং জরিপ ও বন্দোবস্ত বিবরণীতে।

১০৬. দক্ষতার সাধাবণ মাপকাঠিতে 'দক্ষ' হিসেবে বিবেচিত না হলেও চাষাবাদে নিযুক্ত কৃষিমজুরদের বেশ দক্ষ হতে হয়। পরিসংখ্যানে তাদেরকে অদক্ষ মজুর হিসেবে দেখানো হয়েছে। যাদেরকে দক্ষ হিসেবে দেখানো হয়েছে (কাঠমিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী, কামার, ঘরামি) তাদের কোন নিয়মমাফিক প্রশিক্ষণ নেই। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তাই দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের ভেদাভেদটা সম্পূর্ণভাবে ইচ্ছানির্ভব।

১০৭. Van Schendel and Faraizi. প্রাগুক্ত, 68n

১০৮. *Bengal Wage Census* অনুসারে চাউলের তুল্য মজুরিহার (সম্পূর্ণ মান মোটা চাউলের সেবে প্রকাশিত) এবং স্থানীয় চাউলের গড়পড়তা বাজারদর :

ঔপনিবেশিক আমলের শেষদিকে মজুরিহারের উঠানামা দেখা গেলেও পরিষ্কার কোন ধারা লক্ষ্য করা যায় না। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে প্রকৃত মজুরি ১৯১৬ সালের মাত্রার তুলনায় নীচে নেমে যায়। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে তা আবার বৃদ্ধি পেয়ে ঐ মাত্রার উপরে চলে যায়। কিন্তু ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে তা আবার নীচে নেমে যায়। ১৯৪৫-৪৬ সালে আবার তা একবার উপরে উঠে।[১০৯] যদিও সমগ্র সময়ব্যাপী মজুরির নিম্নহারই বেশি করে দেখা দিত, তবু দেশবিভাগ না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত অবনতি দেখা যায় নি। এই অবনতি প্রধানত দেখা যায় পূর্ব বাংলায়, যেখানে প্রকৃত মজুরির ধারা পরিষ্কারভাবে নিম্নমুখী ছিল, শুধুমাত্র দু'বারের জন্য (১৯৬০-৬৪ এবং ১৯৬৮-৭০) স্বল্পকালের বৃদ্ধি দ্বারা তা বাধা পেয়েছিল। ১৯৭০ সালের পর বাংলাদেশে মজুরিমাত্রা অভূতপূর্বভাবে সরাসরি নিম্নমুখী ধারায় নেমে এলো। এইভাবে ১৯৭৪-১৯৮২ সাল ব্যাপী গ্রামীণ বাংলাদেশের গড় দৈনিক মজুরি ছিল মাত্র দু'সের চাউল।[১১০] এখন এই মাত্রা পশ্চিম বাংলার মাত্রার নীচে নেমে যায়, যা ১৯৭০-এর

	এপ্রিল/আগষ্ট ১৯১১	ডিসেম্বর ১৯১৬	গেজেটিয়ারসমূহ ১৯০৮-১৮
পশ্চিমাঞ্চলের জেলায়	৩.১ সের*	২.৯ সের	২.৫ সের
মধ্যাঞ্চলের জেলায়	৩.৬ "	৩.৪ "	৪.৫ "
উত্তরাঞ্চলের জেলায়	৫.৪ "	৩.৮ "	৪.০০ "
পূর্বাঞ্চলের জেলায়	৪.৮ "	৩.৫ "	৬.০০ "

১০৯ পশ্চিম বাংলার সত্যিকার মজুরির জন্য দেখুন, Kamal Kumar Ghose . *Agricultural Labourers in India : A Study in the History of their Growth and Economic Condition,* (Calcutta 1969). Government of Bengal. *Report of the Land Revenue Commission Bengal* ('Floud Report') Volume II, 117

১১০. ১৯৭৪-১৯৮২ বাংলাদেশে চালের তুল্য গ্রামীণ মজুরির হিসাব ঃ

১৯৭৩-৭৪	১.৫ সের	১৯৭৮-৭৯	২.৪ সের
১৯৭৪-৭৫	১.৪ সের	১৯৭৯-৮০	১.৯ "
১৯৭৫-৭৬	২.৪ "	১৯৮০-৮১	২.৪ "
১৯৭৬-৭৭	২.৩ "	১৯৮১-৮২	২.২ "
১৯৭৭-৭৮	২.১ "		

*এক সের=০.৯ কেজি।

উল্লেখ্য, Government of Bengal. Department of Agriculture, *Second Wage Census of Bengal* নেওয়া হয়েছিল ১৯১১ সালের এপ্রিলে (Calcutta 1912). 9, Government of Assam. Department of Agriculture, *Report on the Wages Census of Eastern Bengal and Assam in August 1911,* (Calcutta 1912), 16, Government of Bengal, Department of Agriculture,*Report on the Third Wage Census of Bengal in December 1916,* (Calcutta 1918).4, Government of Bengal Department of Land Records *Average Prices of Staple food Crop (Rice) in Bengal from 1887 to Date* (Calcutta 1924). 4-5, 10-11, 16-17, *জেলা গেজেটিয়ার, ১৯০৮-১৯১৮*।

দশকের শেষদিকে ৩.৪ সেরের কাছাকাছি উঠানামা করতো।[১১১] বাংলার উভয় অংশেই মওসুমি আয় ও বার্ষিক আয়ের একই রকম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

জীবনযাত্রার মান

স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের মজুরেরা খুব কষ্টের মধ্যে জীবন কাটায়। এক শতাব্দী আগে কতিপয় মজুরের না খেয়ে থাকা আশ্চর্যের বিষয় ছিল না, কিন্তু অনশন তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠে নি এবং বিবরণ পাওয়া যায় যে, মজুরেরা সাধারণভাবে জীবনযাপন করার মতো যথেষ্ট আয় করতো এবং বাড়তি কাজে অনীহা প্রকাশ করতো। আজকের দিনে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর কাছে মজুরিআয়ের উপর নির্ভরতা প্রকট সমস্যার আকার নিয়েছে এবং শ্রমের নগণ্য পারিশ্রমিক তাদের জীবনযাত্রার অবিশ্বাস্য নিম্নমানের মাধ্যমে প্রতিফলিত।[১১২] পার্শ্ববর্তী দেশের সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকার সরকারিভাবে দরিদ্র্যসীমা নির্ধারণে মোটেও মাথা ঘামায় নি। এর মাত্রা যাই হোক না কেন, জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সেই সীমার নীচে থেকে যাবে।[১১৩] আমরা বাংলাদেশে পরিলক্ষিত গ্রামীণ দারিদ্র্য সম্পর্কে অসংখ্য হৃদয়বিদারক বিবরণ উদ্ধৃত করা থেকে বিরত থাকবো। দারিদ্র্য সম্পর্কে শুধু এইটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে, যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় এবং অধিকাংশ সময়ের জন্য কাজ জুটেও যায়, তাহলেও বাংলাদেশের গ্রামীণ মজুরেরা প্রতি বছরই কোন না কোন সময়ে অনশনের কবল থেকে কখনো রেহাই পায় না। সময়ে সময়ে তাদের একমাত্র খাদ্য 'ভাত' তাদের কাছে বিলাসী খাদ্যে পরিণত হয় এবং এক খণ্ডের বেশি কাপড় তাদের থাকা আশীর্বাদ বলে তারা ধারণা করতে শুরু করে। অপুষ্টিকর খাবার খেয়ে, নগণ্য কাপড় পরে, জীর্ণশীর্ণ ঘরে থেকে এবং সামান্য যত্নে লালিত হয়েও তাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয়। তাই তাদের আয়ু হতে থাকে স্বল্প এবং তারা যতোটুকু বাঁচে, বড় তিক্তভাবেই বাঁচে।

শ্রমিকসম্পর্ক : ১৮৮০-১৯৭০

ডাফরিন রিপোর্ট পর্যালোচনাকালে আমরা দেখেছিলাম যে, ১৮৮০ সালের দিকে ঋণিতা শ্রমিকসম্পর্কের ক্ষেত্রে এক চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছে। নৈমিত্তিক দিনমজুরদের সাথে ভোগের জন্য ঋণ জড়িয়ে থাকতো এবং বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ মজুরদের ঘাড়ে থাকতো

হিসাব করার গ্রন্থপঞ্জী : Government of People's Republic of Bangladesh. *Economic Indicators of Bangladesh*, (Dacca Bangladesh Bureau of Statstics, May 1977), 51,65, Government of People's Republic of Bangladesh, *Statistical Pocket book of Bangladesh 1981*, (Dhaka 1982), 332-333, 348-349 তুলা Rizwanul Islam. "What Has Been Happening to Rural Distribution in Bangladesh"? *Development and Change*, 10:3 (1979), 385-401.

১১১. Government of West Bengal, *Economic Review 1979-80*, (Alipore 1980) Volume 1, 32

১১২. দৃষ্টান্তস্বরূপ, Arens and Van Beurden, 100-104.

১১৩. তুল্য, Bengal, *Second Five Year Plan*, I, I

বড় আকারের ঋণের বোঝা। মওসুমি নিয়োগে যদি স্থানবদলকারী মজুরেরা স্থান পেতো, তবে সেখানে কোন ঋণ থাকতো না। কিন্তু স্থানীয় মজুরদের যদি মওসুমিভাবে নিয়োগ করা হতো, সেখানে নগদ টাকা অগ্রিম নেবার প্রবণতা থাকতো।

সেই সময় হতে আমরা দেখেছি, না গ্রামীণ মজুরদের, না গ্রামীণ মনিবদের কোন সুনির্দিষ্ট শ্রেণী ছিল। ফলে, শ্রমিকসম্পর্ক ছিল বহু ধারায় বিভক্ত এবং তাদেরকে কোনভাবেই একমাত্র চিহ্নিত শ্রেণীতে সমন্বিত করা যাবে না। আমরা অনুভব করি যে, গ্রামবাংলায় কোন কোন শ্রমিকসম্পর্কের (বা আরো ব্যাপকভাবে উৎপাদনসম্পর্কের) প্রাধান্য সম্পর্কে বিতর্ক এই বহুমুখী সম্পর্কের ঐতিহাসিক অবস্থান সম্পর্কে গভীর নিরীক্ষা থেকে অনেক লাভবান হবে। প্রবন্ধাদিতে গবেষণালব্ধ প্রামাণ্য তথ্য আহরণের দিকে মোটেই নজর না দিয়ে গ্রামীণ বাংলাদেশের বিষয়ে এক তত্ত্বমূলক ধারণা চাপিয়ে দেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে যেসব প্রবন্ধে মাঠ পর্যায়ের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে, সেসব প্রবন্ধে তথ্যাবলীকে ঐতিহাসিক এবং তত্ত্বমূলক কাঠামোর মধ্যে আনার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা হয়েছে। ফলে যেসব প্রবন্ধকে ভিত্তি করে আমরা আলোচনায় এসেছি, সেসব প্রবন্ধ অনেক প্রাথমিক সমস্যাকে প্রকাশ করে নি। এখানে তারই কিছু অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

উৎপাদনের উপায়ে মজুরদের প্রবেশাধিকার

এটা এমন এক ক্ষেত্র, যা সাধারণত খুবই সৌজন্যহীনভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। আমাদের আলোচ্য সময়ে সর্বদাই এই অবস্থান জটিল ছিল। তথাপি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয় নি। আংশিকভাবে এই জটিলতা এসেছে গ্রামবাংলার সীমিত কৃষকবিনাশের ধরন থেকে, যার ফলে অনেক মজুরই ছিল খণ্ডকালীন সময়ের জন্য। উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন চাষ, ভাগচাষ, হাতের কাজ, ছোটখাটো ব্যবসা, মাছ ধরা এবং এই ধরনের আরো অনেক উপায়ে মজুরির আয় যোগ করা। এসব বিবিধ কর্মকাণ্ডই তাদেরকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার দিতে পারতো। কিন্তু এখানে আমাদের লক্ষ্য শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক নির্ণয় করা। খণ্ডকালীন মজুরও মজুর হিসেবেই প্রবেশাধিকার পেয়ে থাকে এবং নিয়মিত মজুরদের অবশ্যই উৎপাদনে পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

এখানেও অনেক ভিন্নমুখিতা বিদ্যমান। একদিকে আমরা পাই এমন মজুর, যারা সম্পূর্ণভাবে উৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু অপরদিকে, এমন মজুরও রয়েছে, যাদের ভাগচাষী থেকে পৃথক করা খুবই কঠিন। সম্পূর্ণভাবে সর্বহারায় পরিণত হয়েছে এমন মজুরের উদাহরণ হচ্ছে সিলেটের চা-বাগানের মজুর (যাদের মধ্যে নারীমজুরের সংখ্যাই বেশি), যে তার শ্রমশক্তিকে পুঁজিবাদী মাত্রায় বিক্রি করে বেঁচে থাকে। আরো এক ধরনের মজুর হচ্ছে ধান ভানার নারী, যারা তাদের মনিবের বাড়িতেই ঢেঁকিতে ধান ভানে। তৃতীয় ধরনের মজুর হচ্ছে বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক নিবাসী ক্ষেতমজুর,

যার নিজস্ব কোন কৃষিযন্ত্রাদি নেই এবং সে মালিকের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। কিন্তু গ্রামীণ মজুরদের অধিকাংশের কাছে কিছু কিছু উৎপাদনযন্ত্র থাকে। এদের মধ্যে ফসল কাটার মজুরেরা নিজেদের কাস্তে নিয়ে আসে এবং মাটি কাটাব মজুরেরা নিজেদের ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে আসে। এই উপকরণগুলোর দাম খুব বেশি নয় এবং এগুলো অনেক দিন টিকে থাকে। অবশ্য মজুরদের মালিকানায় বেশি দামি যন্ত্রপাতি খুব কম থাকে আর তাই সেগুলো মনিবদের কাজে ব্যবহার করার প্রশ্ন উঠে না। কৃষিকাজে লাঙ্গল ও লাঙ্গল টানার পশু (এ দুটো মিলে 'হাল' বলা হয়), মই, আঁচড়া, গরুগাড়ি ইত্যাদি মনিবেরাই দিয়ে থাকে এবং সেই সাথে তারা দেয় চাষের জমি, বোনার জন্য বীজ, রোপার জন্য চারা, সেচের জন্য পানি এবং ঝাড়া ও ভানার জন্য উপকরণাদি। চাষাবাদে এবং শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে এই যন্ত্রাদি ব্যবহারে মজুরেরা বুদ্ধি খাটিয়ে থাকে।

উৎপাদনের বৃহৎ উপায়ের মালিকানা, বিশেষকরে জমির মালিকানা লাভ গ্রামীণ মজুরদের জন্য সংজ্ঞার ভিত্তিতে অসম্ভব। তবে চুক্তিবলে তাদের কেউ কেউ সেখানে প্রবেশাধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়। বীরভূমের কিষাণী বা কিষেণী ব্যবস্থা, ক্ষেতমজুরকে চাষাবাদের জন্য চাকরান জমি দেবার রীতি (বাংলাদেশের মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী), কংকর রীতি (বাঁকুড়ায় ক্ষেতমজুরদেরকে ধান মাড়াইয়ের পর বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধান দেবার প্রথা) এখানে আলোচ্য।[১১৪] এই সুযোগ বাংলাদেশের সামান্য এক অঞ্চলের মজুরদের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু আজকাল বাংলাদেশ থেকে এসব উধাও হয়ে গেছে এবং পশ্চিম বাংলাতেও এগুলো অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে।

নিয়োগের স্থিতিকাল

অর্ধেক দিন থেকে সারা জীবন পর্যন্ত নিয়োগের স্থিতিকালের তারতম্য ঘটে থাকে। বিভিন্ন গবেষণায় প্রায়ই চার রকমের ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদি নিয়োগের কথা উল্লেখ করা হয় : ক্রীতদাস, যারা সারাজীবনের জন্য এমনকি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তিসাধ্য ছিল; ভূমিদাস, যারা বার্ষিক ভিত্তিতে নিয়োজিত ছিল; মওসুমি মজুর, যারা দু'থেকে চার মাস থাকতো এবং নৈমিত্তিক দিনমজুর, যাদের স্থিতি কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত। কেন এই ভেদাভেদ, নিয়োগের স্থিতিকাল কিভাবে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলেছিল এবং ১৮৮০ সাল থেকে কি কি পরিবর্তন ঘটেছিল ?

ক্রীতদাস

উনিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলাদেশে গ্রামীণ এবং পারিবারিক ক্রীতদাসপ্রথা সর্বজনীন ছিল। ক্রীতদাসেরা হচ্ছে এমন লোক, যাদেরকে প্রয়োজনের তাগিদে জোর করে ধরে এনে বা বিক্রি করে ক্রীতদাস বানানো হতো এবং সেই সাথে তাদের সন্তানেরাও ঐ

১১৪. Van Schendel and Faraizi প্রাগুক্ত, 86-90

অবস্থার শিকার হতো।[১১৫] ১৮৪৩ সালে ক্রীতদাসপ্রথা উচ্ছেদের পর এই লোকগুলোর ভাগ্য সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায় এবং একথা বলা কঠিন অতি সাম্প্রতিককালের কথিত ভূমিদাসেরা কি মাত্রায় অতীতের ক্রীতদাসপ্রথার প্রশাখা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে (যাদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাস হিসেবে দেখা গেছে) বা এটা একটা ভিন্ন ব্যাপার কিনা।[১১৬] উনিশ শতকের শেষের দিকে দাসমজুর বললে মজুর ও মনিবের মধ্যে লিখিত দাসখত আছে ঠিক তা বুঝাতো না। এটা ছিল রীতিবিরুদ্ধ ব্যবস্থা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা হতো বাধ্যতামূলক। ১৮৭৬ সালে রংপুরে এই সম্পর্ক যেভাবে বিদ্যমান ছিল তার মূলকথা নিম্নরূপ পাওয়া যায় :

> এই জেলার মধ্যে এটা কোন একজন মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় যে, সে কিছু টাকা কর্জ করে এবং পরে কাজ করে দিয়ে তা শোধ করে। এমন দৃষ্টান্তও দেখা গেছে, যেখানে লোকেরা তাদের পিতৃঋণ পরিশোধের জন্যও কাজ করছে।[১১৭]

এই ধরনের ঋণদাসের সন্ধান দিনাজপুর ও বর্ধমানেও পাওয়া যায়। কিন্তু পার্শ্ববর্তী বিহারের তুলনায় বাংলাদেশে তারা বিরল ছিল বলা যায়। বিহারে এই ক্রীতদাসকে বলা হয় *কামিয়্যা*।[১১৮] ১৯০০ সালের দিকে ক্রীতদাসেরা বাংলাদেশ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু বিহারে ক্রীতদাসপ্রথা এখন পর্যন্ত প্রচলিত। দ্রুতহারে শ্রমিকজনগোষ্ঠীর উদ্ভব, মধ্যবর্তী একদল নিয়োগকারীর আবির্ভাব, যারা তাদের পূর্বসূরিদের রাজনৈতিক নখর ত্যাগ করেছিল এবং সম্ভবত বেশি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাসপ্রথাকে সমর্থনকারী জাতিভেদের কঠোর ব্যাখ্যার অনুপস্থিতির কারণে এর অন্তর্ধান ঘটে থাকতে পারে।

বার্ষিক ক্ষেত পরিচর্যা

প্রকৃতিবিচারে এই কাজ যদিও মেয়াদের দিক থেকে দাসপ্রথার পরেই স্থান পায়, তবু তা একেবারে ভিন্নধর্মী। এর সঙ্গে জড়িত ঋণিতা এবং চুক্তির অলঙ্ঘনীয় শর্তাবলী। কিন্তু চুক্তিটি ছিল একটা সুনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। ভূমিদাসেরা ঠিক দাসমজুরদের মতো নয়। তাদের বার্ষিক চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে অন্য মালিকের কাছে চলে যেতে বাধা নেই। কিন্তু তাদের স্বাধীনতাকে অতি উচ্চ স্থান দেয়া ঠিক হবে না। মালিকের আরোপিত

১১৫. Chattopadhyaya, *Slavery,* 11 ff

১১৬. বিশ শতকের গোড়ার দিকের দাসপ্রথার বিরল নজিরের জন্য দেখুন, Malley's *Report of Muslim Slaves* (খানেজাদ গোলাম বন্দি) in Birbhum district, L S S O'Malley, *Bengal District Gazetteers; Birbhum*, (Calcutta 1910), 66

১১৭. W W Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Volume VII, Rangpur, (London 1876), 272

১১৮. আমরা এখানে দাসমজুরদেরকে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেছি, যার অর্থ ছিল দীর্ঘমেয়াদি ঋণের দায়ে ঋণদাস। অন্যান্য সংজ্ঞার জন্য দেখুন, H V Nagesh "Forms of Un-free Labour in Indian Agriculture", *Economic and Political Weekly*, (September 26,1981 Review of Agriculture, A 109-A 115

দরকষাকষির ক্ষমতা তাদের সীমাবদ্ধ। বার্ষিক চুক্তি মজুরদের জন্য বেশ আকর্ষণীয় প্রস্তাব, কেননা এতে সম্পূর্ণ কৃষিউৎপাদনচক্রে নিয়োজিত থাকার নিরাপত্তা বিধান করা হয়, আগাম টাকা পাবার সম্ভাবনা থাকে এবং মালিক-মজুরের সম্পর্কের নিশ্চয়তার ব্যবস্থা থাকে। এর প্রধান অসুবিধা এই যে, চুক্তির সময়ে মজুরদের কোন স্বাধীনতা থাকে না, চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত তারা একজন মালিকের অধীনেই কাজ করতে বাধ্য। গ্রামবাংলার মনিবেরা বহুদিন ধরে বার্ষিক চুক্তিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, কেননা এই পদ্ধতি তাদেরকে স্থায়ী, সস্তা এবং সদা প্রস্তুত মজুর পাবার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। অধিকন্তু কৃষিমওসুমের প্রারম্ভে তুলনামূলকভাবে খুব কম মনিবই বিরাট অঙ্কের টাকা আগাম দিতে পারে। তাই এক বা একাধিক ভূমিদাস নিয়োগ করা সঙ্গতিসম্পন্নতা এবং বিশেষ মর্যাদার পরিচায়ক। কিন্তু বার্ষিক চুক্তিপদ্ধতি মজুরদেরকে সুশৃঙ্খল এবং সবচেয়ে উৎপাদনমুখী করার ক্ষেত্রে অধিকতর অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। যদি ভূমিদাসদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়, তবে তারা পালিয়ে যায় এবং আগাম প্রদত্ত টাকা অনাদায়ী ঋণ হিসেবে খাতা থেকে বাদ দিতে হয়। যথাযথ তথ্যের অভাবে ১৮৮০-এর দশক থেকে বর্ষভিত্তিক খামার পরিচর্যা বেড়েছে না কমেছে তা বলা কঠিন। গ্রামসমীক্ষাগুলো বিশেষকরে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অবনতির ইঙ্গিত প্রদান করে। কিন্তু বার্ষিক চুক্তি গ্রামবাংলায় এখনো অব্যাহত রয়েছে।[১১৯]

মওসুমি মজুর

মওসুমি মজুরের সুবিধা-অসুবিধা বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক মজুরদের মতো। শুধু পার্থক্য এই যে, এখানে চুক্তির মেয়াদ কয়েক মাসের জন্য এবং সর্বদাই ভরা মরসুমে মজুরকে কাজে লাগানো হয়। বারোমেসে মজুরদের চেয়ে মওসুমি মজুরদের আরো কঠোর পরিশ্রম করতে হয় এবং অনেক বেশি সময় ধরে কাজ করতে হয়। কিন্তু এদের মজুরিও বেশি। সাধারণত পাট কাটার সময়ে, আমন ধান কাটার সময়ে এবং শীতকালে মাটি কাটার জন্যে এই মওসুমি চুক্তি করা হয়ে থাকে। এখানেও তথ্যের অভাবে বলা কঠিন ১৮৮০-এর দশক থেকে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা। তবে এই ধরনের চুক্তি কখনো বিরল হয় নি। যাইহোক, ১৯৬০-এর দশকের দিকে পূর্ব পাকিস্তানে গ্রামীণ কর্মসূচির প্রথম ধাপ শুরু হলে এই পদ্ধতির বৃদ্ধির হার পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হয়।[১২০]

---

১১৯. কুমিল্লায় এক গ্রামে ক্ষেতমজুর ব্যবহারকারী গৃহস্থালির অনুপাত ১৯৬০ সালের ৩৫% থেকে ১৯৭৮ সালে ২১% এ নেমে আসে। বীরভূম জেলার গ্রামে কৃষাণী/মহিনদারী চাকরদের দ্বারা চাষ করা গৃহস্থালির অনুপাত অনুরূপভাবে ১৯৩৯-৪০ সালের ৪৩% থেকে ১৯৭৪ সালে ৩৬%-এ নেমে যায়। Van Schendel, *Peasant Mobility*, 210,213. Khoda Newaj and Ashuk Rudra,"Agrarian Transformation in a District of West Bengal", *Economic and Political Weekly*, (March 29 1975, Review of Agriculture, A 23-A 23.

১২০. দেখুন, Just Faaland And J.R Parkinson, *Bangladesh, The Test Case of Development*, (Dacca 1976) 149 151. De Vylder and Asplund, 191-210. Alamgir, *Development Strategy*, 280

নৈমিত্তিক দিনমজুর

বাংলাদেশের সবচেয়ে কম মেয়াদি মজুরিচুক্তি হচ্ছে অর্ধেক দিন বা এক বেলা থেকে কয়েক দিন (এক হাট বা বাজার মেয়াদি[১২১]) পর্যন্ত। কিন্তু সাধারণত এক দিনের জন্য বা কাজভিত্তিক মজুরি দেয়া হয়।[১২২] দৃশ্যত নৈমিত্তিক নিয়োগে মজুরদের সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু সেই সাথে সবচেয়ে বেশি অনিশ্চয়তাও থাকে। ব্যস্ত মওসুমে দিনমজুরেরাও মজুরিবৃদ্ধির সুযোগ পেয়ে থাকে, কিন্তু অলস মওসুমে তারা অনশনে কষ্ট পায়। বাস্তবে ঋণিতা দিনমজুরদের স্বাধীনতাকে অর্থাৎ মজুরবাজারে স্বাধীন সত্তা হিসেবে দরকষাকষির ক্ষমতাকে প্রচণ্ডভাবে খর্ব করে। পুনঃ পুনঃ বেকারত্ব ও অনশনের হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা বাধ্য হয়ে ঋণ করে থাকে, যা শুধু দাদন হিসেবেই পাওয়া যায়। প্রত্যেক ঋণ নির্দিষ্ট কয়েক দিনের মজুরিশ্রমের দ্বারা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি থাকে এবং নিশ্চিতভাবে ভরা মওসুমেই তা দাবি করা হয়, যখন মজুর পাওয়া দুর্লভ এবং মজুরি সর্বোচ্চ থাকে। মজুরেরা এই দাদনের সম্পর্ক বিভিন্ন নিয়োগকারী বা ঋণদাতার সাথে একই সময়ে গড়ে তুলতে পারে। সবচেয়ে ভাল মওসুমে তাদের কর্মসংস্থানের স্বাধীনতা নানাভাবে ও নানা মাত্রায় খর্বিত হয়। ১৮৮০ সাল থেকে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিরাট সংখ্যায় দিনমজুরের আর্বিভাব এর প্রমাণ। এখানেও যথাযথ তথ্য নেই, কিন্তু সমীক্ষাগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, এদেশে নৈমিত্তিক নিয়োগপদ্ধতির মাধ্যমেই মজুরনিয়োগ প্রসারতা লাভ করেছে অত্যধিকভাবে। আমাদের সমীক্ষার সময়ব্যাপী তাই নৈমিত্তিক দিনমজুরিই মজুরিচুক্তির একমাত্র ধরন, যা সুনির্দিষ্টভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রমিকবিরোধ

মজুরিহারের ক্রমাবনতির অবিরাম ধারা এবং চাহিদার চেয়েও মজুর সরবরাহের আরো দ্রুত বৃদ্ধি সম্পর্কে গ্রামীণ মজুরদের উপলব্ধি সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি। তাদের অনেকে হয়তো এমন চিন্তা করতে পারে যে, তারা নৈর্ব্যক্তিক বাজারশক্তিকে প্রভাবিত করতে না পারার ফলে তাদের অবস্থার অবনতি ঘটেছে। মজুরপর্যায়ের যেকোন দল উপলব্ধি করবে যে, এই অবস্থায় তাদের নিয়োগের আরো ভাল ও স্থিতিশীল শর্ত আদায়ের জন্য সংগ্রাম করা কঠিন। কিন্তু সমবেত প্রচেষ্টা চালানো সব সময়েই কষ্টসাধ্য এবং বাংলাদেশের গ্রামীণ মজুরদের জন্য তা বিশেষভাবে কষ্টসাধ্য। কেননা তারা কোন একক শ্রেণী সৃষ্টি করতে পারে নি এবং এই কারণে তারা সহজে সংগঠিত হতেও পারতো না। অধিকন্তু, তাদের অনেকেই মনিবের সাথে এমন পোষক-পোষ্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, যা একাধারে তাদের পোষণ এবং নিরাপত্তাবিধান করে। অনুরূপ পৃষ্ঠপোষকতা

---

১২১ Van Schendel, *Peasant Mobility*, 212

১২২. পার্যচুক্তি করে কোন কাজ বা কাজের অংশ করার বিষয়ে বিবরণ দিয়েছেন Clay, 429, 431, 436; Arens and Van Beurden, 95-114, and Hartmann and Boyce, 197

তাদের তাৎক্ষণিক স্বার্থ উদ্ধারের সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা। কিন্তু ঐ একই সময়ে তা তাদেরকে পৃথক করে ফেলেছে এবং মনিবের সাথে যৌথ দরকষাকষির যেকোন প্রচেষ্টা থেকে বিরত রেখেছে। এই কারণে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রকে এই সর্বহারাদের বিরুদ্ধে পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণে খুবই কম উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়েছে।[১২৩]

যখন শ্রমিকসম্পর্ক পোষক-পোষ্য সম্পর্ক হারাতে শুরু করে এবং আরো নৈর্ব্যক্তিক ও চুক্তিবদ্ধ রূপ গ্রহণ করে, তখন শ্রমিকদের সমবেত প্রচেষ্টা আরো কার্যকর হতে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের ঐতিহাসিকগণ দুঃখজনকভাবে এই সংগ্রামের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছেন। ফলে, গ্রামীণ মজুরদেরকে এখনো পরিস্থিতির সাধারণ শিকার বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। কৃষক আন্দোলনের উপর বর্ধিত হারে গবেষণার ফলে দেখা যায় যে, কৃষকেরা বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আমরা গ্রামীণ বিরোধে মজুরদের ভূমিকা সম্পর্কে খুবই কম জানতে পারি। তারা কি গ্রামীণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নি ? তারা কি সুনির্দিষ্ট দাবি তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল ? তারা কি এই ধরনের আন্দোলনের নেতাদের দ্বারা অবহেলিত ছিল ?[১২৪] অথবা গবেষণাকারীরা কি তাদের ভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত করে নি ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে গ্রামবাংলার ইতিহাসের ব্যাপক সীমানার গভীরে প্রবেশ করতে এবং তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম করবে। এসব প্রশ্নের উত্তর কৃষক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ভূমিকার উপর, বিশেষকরে গ্রামীণ সংঘর্ষে 'মধ্যকৃষক'দের ভূমিকার উপর সাম্প্রতিক বিতর্কেও ইতিবাচক তথ্য-প্রমাণ প্রদান করবে।[১২৫] গ্রামীণ যৌথ কার্যাবলীতে মজুরদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অবাধ সমন্বয়ের অভাবে আমাদেরকে ছোটখাটো সংঘর্ষের ছিটেফোঁটা তথ্যের দিকেই ঝুঁকে পড়তে হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৫০-এর দশকের দিকে রংপুরের এক গ্রামে মজুরেরা আশেপাশের গ্রামে প্রদত্ত হারে মজুরি পাবার জন্য ধর্মঘট করে এবং তারা স্থানীয় মনিবদেরকে স্থানীয় মজুরি বৃদ্ধি করে এলাকার হার উন্নীত করতে বাধ্য করে।[১২৬] এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, কাজের পরিবেশ এবং মজুরি বিষয়ে দরাদরির চলমান

১২৩. আধুনিক ইউরোপের বৈসাদৃশ্যের জন্য দেখুন, Catharina Lis and Hugo Soly, "Policing the Early Modern Proletariat, 1450-1850'; David Levine সম্পাদিত *Proletarianization and Family History* (New York 1984), 163-228

১২৪. Sunil Sen এটা ধরে নিয়েছেন তার *Peasant Movement in India Mid-Nineteenth and Twentieth Century* গ্রন্থে (Calcutta 1982), 196-209, 250.

১২৫. Neil Charlesworth , The "Middle Peasant Thesis" and "The Roots of Rural Agitation in India, 1914-1947," *Journal of Peasant Studies* 7:3 (1980), 259-280, Daid Hardlin, "The roots of Rural Agitation in India, 1914-1947 A Rejoinder to Charlesworth," *Journal of Peasant Studies*, 8 3 (1981), 367-380 Neil Charlesworth, "The Roots of Rural Agitation in India, 1914-1947 A Reply to Hardiman", *Journal of Peasant Studies*, 9,4 (1982), 266-276.

১২৬. Van Schendel, *Peasant Mobility*, 112

প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের বহু গ্রামে ঐ রকম ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু এই ঘটনাগুলো প্রবন্ধাদিতে স্থান পায় নি।[১২৭] প্রকাশিত প্রবন্ধাদিতে অবশ্য দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল প্রতিফলিত হয়েছে, যেমন বাংলাদেশের গ্রামীণ মজুরেরা তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সেইসাথে মনিবেরাও সে স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। মজুরিহার ও কাজের পরিবেশের ক্রমাবনতি তাদেরকে আরো ভঙ্গুর করে তোলে, অবশ্য তাদের মনিবদের ভাষায় তারা আরো 'ব্যবহারযোগ্য'। এরপর মালিকদের দ্বারা মজুরদের পৃষ্ঠপোষকতা করার প্রবণতা হ্রাস পায়। ফলে শ্রমিকরা শ্রেণীসচেতন হয়ে উঠে এবং শ্রমিকসঙ্ঘ গড়ে তোলে। ১৯৮০-এর দশকের মধ্যে কয়েকটি বড়ো শ্রমিকসঙ্ঘ গঠিত হয়। যদি এসব সঙ্ঘ সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করতে পারতো, তা হলে এগুলো গ্রামের শ্রমিক সমাজকে এক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতো এবং যুগ যুগ ধরে স্থবির বাংলার গ্রামীণ সমাজকে এক গতিময় ও প্রগতিশীল সমাজের রূপ দিতে পারতো।

নিঃস্ব থেকে সর্বহারা

ঋণিতা এবং অর্থনৈতিক স্থবিরতার সাথে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সর্বহারার সৃষ্টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু তা ছিল ধীর গতিবিশিষ্ট। যখন ১৮৮০-এর দশক থেকে ১৯৭০-এর দশকের মধ্যে মজুরিভিত্তিতে নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তখন সকল গ্রামীণ মজুর উৎপাদনের উপায়ের উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে নি। ভূমিহীন এবং লাঙ্গলহীন মজুরদেরকে প্রথমদিকে পশ্চিম বাংলায় সাধারণভাবে দেখা যায়, পরে ক্রমে ক্রমে বিপুল সংখ্যায় সর্বত্র দেখা যেতে থাকে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রামীণ মজুর তাদের ছোট্ট জমিকে আঁকড়ে ধরেই টিকে থাকে এবং আজো উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তাদের সংযোগ পুরোপুরি ছিন্ন হয়ে যায় নি।

শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নতার এই শ্লথগতি এই বহুল প্রচলিত ধারণার প্রতি সতর্কসঙ্কেত হিসেবে কাজ করছে যে, দীর্ঘমেয়াদি ঋণগ্রস্ততার সাথে শ্রমমজুরির উপর নির্ভরতা যুক্ত হয়ে স্বাভাবিকভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে ঋণগ্রস্তদের সম্পূর্ণ ভূমিহীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। গ্রামবাংলার মহাজনেরা ঋণ আদায়ের জন্য খাতকের জমি নিলাম করা ছাড়াও প্রায়ই ভিন্ন পথ ধরতো। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরাজমান অবস্থায় তাদের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদি বন্ধকি ও ভাগচাষের কৌশল অবলম্বনের পথে যাওয়া স্বাভাবিকভাবেই বেশি বুদ্ধির পরিচায়ক। যদি গ্রামীণ ঋণিতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হতো, তা হলে এতদিনে বিরাট সংখ্যক গ্রামীণ সর্বহারা বাংলাদেশে দেখা দিত। পরিবর্তে প্রাথমিক আবাদকারী থেকে বিচ্ছিন্নতা কখনো শ্রমমজুরির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধির সমহারে দেখা দেয় নি, এমনকি আমাদের সমীক্ষার শেষ সময়কাল পর্যন্ত অবস্থা এরকম। ভূমিহীনতাকে বাংলাদেশে

১২৭. ১৯৬৯ সালে পশ্চিম বাংলার গ্রামে গ্রামীণ মজুরদের সংঘাত সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, Davis, 202-209

সর্বহারা হওয়ার প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় সূচক হিসেবে ধরে নেবার বিষয়ে জোর তর্ক থাকলেও ১৯৭৭ সালে ভূমিহীনতা ছিল ৩৩%, অথচ কমপক্ষে অর্ধেক গ্রামীণ লোক মূল আয় বা সহায়ক আয়ের জন্য মজুরগিরির উপর নির্ভরশীল ছিল।[১২৮] অন্য কথায়, দুই-তৃতীয়াংশ মজুর সম্পূর্ণভাবে সর্বহারা এবং এক-তৃতীয়াংশ তখনো কিছু জমির মালিক ছিল। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই অনুপাত ছিল জমির মালিকানার মাত্রা সংক্রান্ত। কিন্তু অনেক ভূমিহীন পরিবার ইজারায়, ভাগচাষে, এমনকি বন্ধকগ্রহীতা হিসেবে জমি দখলে রাখে এবং চাষাবাদ করে। এইভাবে তারা সম্পূর্ণভাবে সর্বহারা হয়ে যাবার কার্যকরী অনুপাতকে হ্রাস করে দেয়।[১২৯] বিশ শতকের বাংলাদেশে যদিও সর্বহারা হওয়াটা গড়মাত্রায় ধারাবাহিক ও চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা দিয়েছিল, তবু স্বতন্ত্র পরিবারে এই প্রক্রিয়া অতো সহজগ্রাহ্য ছিল না। আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি যে, পরিবার পর্যায়ে সর্বহারা হওয়ার এবং সর্বহারা থেকে বিচ্যুত হওয়ার দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া ভিন্নমুখী কারণের প্রভাবে জটিল পথে পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয়েছে।[১৩০] গ্রামীণ পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতার উপর এই উপাদানগুলোর সমবেত প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে আরো গবেষণা বাংলাদেশের সর্বহারার ধীর গতিধারা সম্পর্কে ধারণা লাভের ক্ষমতাকে আরো বৃদ্ধি করবে। অধিকন্তু, অনেক পরিবারে মজুরিআয়ের উপর নির্ভরতার মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন মওসুমে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং এটা মওসুমি নিয়োগের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে ঘটে থাকে। পারিবারিক পর্যায়ে পরিলক্ষিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিময়তার ধারায় অনেক মজুরিনির্ভর পরিবারের অসম্পূর্ণ সর্বহারাত্ব এবং মজুর নিয়োগের সুনির্দিষ্ট মওসুম থাকার কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, উদ্বৃত্ত মজুর যে গ্রামীণ বাংলাদেশের এক বৈশিষ্ট্য এই সাধারণ ধারণাকে সমর্থন করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।[১৩১]

শ্রমিকসম্পর্কের ক্রমবর্ধমান চুক্তিভিত্তিক এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রকৃতিকে ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদের প্রভাবে গ্রামীণ জীবনের সবকিছুকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে দাঁড় করানোর কারণ হিসেবে বর্ণনা করা যাবে না। যেভাবে আমরা দেখেছি, উৎপাদনের পুঁজিবাদী সম্পর্ক আমাদের সমীক্ষার সময়কালে গ্রামীণ বাংলাদেশে কোন নাটকীয় উন্নয়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। গ্রামীণ মনিবদের দারিদ্র্যের ফলেই ব্যক্তির অংশগ্রহণ ও মেয়াদের মাত্রায়

---

১২৮. ভূমিহীন বসতবাটি বলতে সেগুলোকেই ধরা হয়েছে যেগুলো বসতবাটি ছাড়া আর কোন জমির মালিকানার দাবি করে না এবং এই ধরনের গৃহস্থালি বসতবাটির মালিকানা দাবি কবতেও পারে, আবার নাও করতে পারে। A K. M Ghulam Rabbani et al *Summary Report of the 1977 Land Occupancy Survey of Rural Bangladesh* (Dacca 1977), Table III

১২৯. রংপুরে দেখা গেল সাধারণভাবে ভূমিহীনদের গৃহস্থালির ৫০% প্রকৃতপক্ষে ভূমিনিয়ন্ত্রণ করতো। Van Schendel, *Peasant Mobility*, 300-311, 304-311, 318 319.

১৩০. Van Schendel, *Peasant Mobility*

১৩১. তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ পর্যবেক্ষণের জন্য দেখুন, Hans P Binswanger and Mark R. Rosentsweig *Contractual Arrangements, Employment, and Wages in Rural Labour Markets A Critical Review* in Hans P. Binswanger and Mark R Rosenzweig (eds), *Contractual Arrangements, Employment, and Wages in Rural Labour Markets in Asia* , (New Haven and London 1984), 1-40

শ্রমিকসম্পর্কের উল্লেখযোগ্য সঙ্কোচন ঘটে অর্থাৎ পোষক-পোষ্য সম্পর্কের অবনতি ঘটে। আমরা দেখিয়েছি যে, সমীক্ষার সময়ে ছোট ছোট জমির মালিক আরো বেশি করে জনমজুর নিয়োগ করেছে এবং তাদের দীর্ঘমেয়াদি মজুরসংগ্রহের ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা ক্রমে হ্রাস পেয়েছে। তারা দিনমজুর দিয়েই কাজ চালিয়েছে এবং তাদেরকে উৎপাদনঋণ/আগাম মজুরি দিয়ে সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছে। গ্রামীণ নিয়োগ এবং শ্রমিকনিয়ন্ত্রণের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি ছোট ছোট নিয়োগকারীদের স্বার্থ যে পরিমাণে জড়িত সেই পরিমাণে টিকে আছে।

১৮৮০ সালের পরে বাংলাদেশে তাই এক দীর্ঘমেয়াদি নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার কারণে প্রধানত সর্বহারার সৃষ্টি হয়েছে, কৃষিতে পুঁজিপতিদের দ্বারা বড় বড় জোতকে একীভূত করার বা ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের দ্বারা গ্রামীণ কারিগরদের শোষণের ফলে নয়। বাংলাদেশের দারিদ্র্য পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় অসম বিনিময়ের সাথে নিজেই সম্পর্কিত, যেখানে গ্রামীণ অর্থনীতি প্রধানত পাট এবং অন্যান্য নিম্নমূল্যের নগদ টাকার ফসল ও ভূমিরাজস্ব যুগিয়েছে উপযুক্ত প্রতিদান ছাড়াই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, বাংলাদেশের প্রধান দু'টি ব্যবসায়িক ফসল পাট ও ধান 'বাগানের ' ফসল নয়। এ দুয়ের জন্য বহুল পরিমাণে পুঁজি লাগে না এবং এই কারণে কৃষকের দ্বারাই লাভজনকভাবে তা উৎপন্ন করা যেতে পারে। এর ফলে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পক্ষে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে পরোক্ষভাবে শোষণের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা সম্ভবপর হয়েছে এবং তা লাভজনক হয়েছে, যাতে শ্রমকে আত্মসাৎ না করেও কৃষিমজুরদের উৎপাদিত পণ্য আত্মসাৎ করা যায়। পরবর্তীকালে উপনিবেশোত্তর সরকারসমূহ ঐ একই নীতি গ্রহণ করে এবং তাতে অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা রয়েছে যতো দিন পর্যন্ত কৃষকেরা অনবরত তাদেরকে কম দাম দেয়া সত্ত্বেও বাজারে ধান ও পাট বিক্রি করতে থাকবে। ব্যবসা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাজনা আদায় করে যারা উপার্জন করে, তাদের জন্য এই নীতি কম ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু এই নীতি বহু গ্রামীণ উৎপাদনকারীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করছে, বিশেষকরে বিশ শতকের মধ্যভাগে, যখন থেকে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকায় জমি দুর্লভ হতে থাকে। সেই সময় থেকে পরোক্ষ শোষণের অবিরাম উঁচু মাত্রা কৃষি-উৎপাদনকারীদের জীবনযাত্রার মানকে ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী করতে সাহায্য করেছে এবং এইভাবেই কৃষিতে স্থবিরতা এসেছে। কিন্তু সেই সাথে তা গ্রামীণ শ্রমসম্পর্কেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে এবং জনমজুরদের দীর্ঘমেয়াদি সর্বহারাকরণের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতির উদ্ভব সম্পর্কে আরো অনুসন্ধান করে বাংলাদেশের সমাজে তার সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া সনাক্ত করা এবং সেই সাথে বিশ্বপুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে তা ব্যাখ্যা করা বাংলাদেশী ঐতিহাসিকদের নতুন প্রজন্মের সামনে চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে মাত্র দু'টি।

১৯

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশ

এম. আতাহারুল ইসলাম*

উনিশ শতকের বাংলার জনসংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা দরূহ, কারণ সেই সময়ের জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাদি দুস্প্রাপ্য। তাই প্রাপ্ত খুবই সীমিত উপাত্তের ভিত্তিতে জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতির বিভিন্ন নিয়ামকেব পারস্পারিক সম্পর্কের, বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে, জনসংখ্যার পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলার মোট জনসংখ্যা বৃটিশ উপনিবেশের প্রারম্ভকাল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাপরবর্তী কাল পর্যন্ত কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে।

ভারতের জনসংখ্যা খ্রিস্টীয় যুগের পূর্ববর্তীকালীন সময়ে ১০০ থেকে ১৪০ মিলিয়নের মধ্যে ছিল বলে ধারণা করা হয়। খ্রিস্টীয় যুগের প্রারম্ভকাল থেকে বৃটিশ উপনিবেশের শুরু পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কালে এই মোট জনসংখ্যার কিছু সাময়িক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলেও সামগ্রিকভাবে তা অপরিবর্তিত ছিল। ধারণা করা হয় যে ভারতের জনসংখ্যা খুবই ধীরগতিতে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে উনিশ শতকের প্রথমদিক থেকে। সারণি ১-এ ১৬০০ থেকে ১৯৪১ সন পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যার হিসাব দেখানো হয়েছে। ১৯২১ সনেব পূর্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নগামী থাকার মূল কারণ ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগব্যাধি। দত্তের হিসাব অনুযায়ী, ১৭৭০-১৯০০ সময়কালে বিশটিরও বেশি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল।[১] আগরওয়ালের মতে, ১৯২১ সনকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বিভাজন বৎসর হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[২] ১৯২১ সনের পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি

*. অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. R C Dutt, *Famines and Land Assesment in India*, (London 1900), 16-17.

২. S. N Agarwal, *Inida's Population Problems (Bombay* 1972),41

পেয়েছে মূলত মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ার কারণে। পূর্ববর্তী সকল সময়ের চেয়ে দ্রুত হারে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে ১৯২১ সন থেকে। একই সময়ে ভারতের অংশ হিসেবে বাংলার জনসংখ্যাও একইভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

যদিও ১৮৬৭-৭২ সনে ভারতে আদমশুমারি শুরু হয়, তার পূর্ববর্তী সময়ের জনসংখ্যার প্রাককলনও করা হয়েছে। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ামকসমূহের পটভূমি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই পটভূমি বিশ্লেষণ করলে বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহও নির্ধারণ করা সহজতর হবে। সারণি ২-এ ১৮৭১-১৯৪১ সময়কালে জন্মের সময় প্রত্যাশিত জীবনকাল দেখানো হয়েছে। এই সারণি থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে গড় প্রত্যাশিত জীবনকাল ১৯২১-৩১ সময়কালে পূর্ববর্তী সব সময়ের চেয়ে বেশি ছিল এবং এই ধারা পরবর্তী সময়কালেও অব্যাহত থাকে। ভারতের মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ার কারণ হিসেবে নিম্নলিখিত কারণসমূহ চিহ্নিত করা যায় : (১) যুদ্ধ এবং ডাকাতির ঘটনা হ্রাস পেয়েছিল, (২) দুর্ভিক্ষাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল, (৩) মহামারীজনিত রোগসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল।[৩] যুদ্ধ এবং ডাকাতির ঘটনা হ্রাস পাওয়ার কারণে ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছিল অনেকাংশে। কিন্তু এই পরিবর্তনের প্রতিফলন মৃত্যুহার হ্রাসে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারেনি বৃটিশ শাসনকালে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ঘটার প্রেক্ষাপটে। ভাটিয়ার তথ্য অনুযায়ী প্রাক-বৃটিশ রাজত্বকালে প্রতি পঞ্চাশ বছরে একটি বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ দেখা দিত।[৪] কিন্তু ১৭৬৫ থেকে ১৮৫৮ সময়কালে ভারতে অন্তত বারোবার দুর্ভিক্ষ ও চারবার খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিয়েছে। দুর্ভিক্ষাবস্থার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮৬০-১৯০৮ সময়কালে। ১৮৬৭ সনের দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিশনের মতে, এই ধরনের দুর্ভিক্ষ ও দুষ্প্রাপ্যতার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষিকাজে নিয়োজিত মজুর ও ক্ষুদ্র চাষী।[৫]

১. প্রাকৃতিক পরিবেশগত অবস্থা

প্রধান নদীসমূহের গতিপথ পরিবর্তনের ফলে মুগল ও কোম্পানি আমলে বাংলার ভৌগোলিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে শহর, নগর ও ব্যবসাকেন্দ্রগুলোর গুরুত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। পর্তুগীজরা বাংলায় আসে ১৫১৭ সনে। এ সময় মেঘনা নদী হয়ে বাংলার রাজধানী গৌড়ে যাওয়ার যে নৌ-পথ ছিল, চট্টগ্রামকে মনে করা হতো তার প্রবেশপথ। গৌড়ের পতনের সাথে সাথে চট্টগ্রামেরও গুরুত্ব হ্রাস পায়, আর নতুন বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে উত্থান ঘটে সাতগাঁও-এর; তবে হুগলী

---

৩. K. Davis, *The Population of India and Pakistan* (New Jersey 1951), 38.

৪. B. M. Bhatia, *Famines in India-A Study in Some Aspects of Economic History of India*, 1860-1945 (Bombay 1963) 7.

৫. প্রাগুক্ত, ৪.

নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে সাতগাঁও তার গুরুত্ব হারায়। অতএব, বড় নদীগুলোর যথার্থ ভূমিকার দিকটি বিবেচনা না করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না।[৬]

পূর্ব বাংলা ব্যাপকভাবে অসংখ্য নদ-নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। পর্যাপ্ত পানিসম্পদের সহজপ্রাপ্যতার ফলে এখানে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হতো। ফসল উৎপাদনের জন্য বলতে গেলে তেমন কোন শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন হতো না এবং কৃষিউৎপাদন প্রকৃতির কৃপার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল। ফসলহানির জন্য দায়ী ছিল অনাবৃষ্টিজনিত খরা ও অতিবৃষ্টিসৃষ্ট বন্যা। বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে নতুন ভূমি জেগে উঠলে সেখানে নতুন নতুন জনবসতি গড়ে উঠে এবং কৃষিকাজে এসবের নতুন যথোপযুক্ত ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[৭] অষ্টাদশ শতক থেকেই বাংলায় ব-দ্বীপাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। গোটা উনিশ শতক জুড়ে উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চল এবং মধুপুর ও সুন্দরবনের বনাঞ্চলে নতুন নতুন ভূমি চাষাবাদের আওতায় আনা হয়। ১৮৯১-১৯৪৭ সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষিভূমি হ্রাসের ফলে ভূমি ব্যবহারের ধরনও পাল্টে যায়।[৮]

প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, ব-দ্বীপ অঞ্চল ক্রমশ পূর্ব দিকে সরে আসে। নবগঠিত ব-দ্বীপ অঞ্চলের পূর্বমুখী ক্রমাপসরণের ফলে পশ্চিমের ব-দ্বীপ অঞ্চল উৎপাদনশীল হয়ে পড়ে। সাংবাৎসরিক প্লাবণ দ্বারা বিধৌত ও পলিনিষিক্ত হওয়া থেকে মরা ব-দ্বীপ অঞ্চল বঞ্চিত হয়। খুলনার ব-দ্বীপ অঞ্চল সম্বন্ধে ফাওকাস[৯] লিখেছেন, 'গোটা জেলাটাই একটা খাঁটি ব-দ্বীপ, যা ভাগীরথী ও পদ্মা এ দু'টি প্রধান নদী কর্তৃক বাহিত হিমালয়ের Ineiss চুনা পাথর সমৃদ্ধ গঙ্গার কাদামাটিপ্রবাহ থেকে সৃষ্ট। ভাগীরথী হচ্ছে গঙ্গার দক্ষিণ প্রবাহী আদি শাখা, আর পদ্মা হলো গঙ্গারই পূর্বমুখী পরবর্তীকালীন আরেকটি শাখা। ষোল শতকের কোন এক সময়ে গঙ্গার বেশিরভাগ পানি ভাগীরথী থেকে পদ্মায় প্রবাহিত হতো। কিন্তু ভাগীরথী ও তার আদি মুখ সরস্বতী আদি গঙ্গা ও যমুনা হয়ে দক্ষিণ দিকে সাগরমুখী প্রবাহিত হলে গঙ্গা তার বাম তীরে পলিসঞ্চারী এক শক্তিমান শাখার জন্ম দেয়। ভৈরব (ভয়ঙ্কর) নামে অভিহিত দক্ষিণ–পূর্ব দিকে প্রবহমান এ নদীই খুলনা জেলার ব-দ্বীপ অঞ্চল সৃষ্টির মূখ্য উৎস হয়ে উঠে। ফরিদপুর জেলার ব-দ্বীপ অঞ্চলের অবস্থান বদলের প্রসঙ্গে জ্যাকও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[১০] রেনেলের জরিপের সময় (১৭৬৯) ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহের মধ্য দিয়ে পূর্বমুখী প্রবাহমান ছিল, আর ১৭৮৭ সালের মহাপ্লাবনের সময় গতিপথের পরিবর্তন ঘটে।

---

৬. J J A Campos, *History of the Portuguese in Bengal*, (Calcutta, 1919) 21

৭. A A Khan, *Some Aspects of Peasant Behaviour in Bengal—A Neo-Classical Analysis* (Dhaka 1982), 32.

৮. প্রাগুক্ত, 19

৯. L R Fawcus, *Final Report on the Khulna Settlement 1920-1926* (Calcutta 1927), 17 43-44

১০. *J C. Jack, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Faridpur District 1904-1914, (Calcutta 1916), 2-8.*

নোয়াখালীতে ভূমির ভাঙা-গড়া পালাক্রমে সংঘটিত হয়। ১৯১৪-১৯১৯ সময়কালের তুলনায় ১৯৭০, ১৮৩৬ ও ১৮৬৪ সনে নোয়াখালীতে স্থলভাগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি ছিল। ১৭৬৯ থেকে পদ্মা ও মেঘনা সম্মিলিত ধারায় পরিণত হয়। বর্ধিত মাত্রায় গঙ্গার পানি মেঘনায় প্রবেশের ফলে মেঘনা বৃহত্তর রূপ পরিগ্রহ করে। ১৭৯৪ সন নাগাদ লক্ষ্মীপুরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ক্রমশ সম্প্রসারিত হতে থাকে। থমসনের মতে, এই ব-দ্বীপাঞ্চলটি বঙ্গোপসাগরের গর্ভে ক্রমশ জেগে উঠছিল।[১১]

১৯৬৯ ও ১৭৭১ সনের মধ্যে সম্পন্ন জরিপের ফসল যে রেনেলের মানচিত্র, তাতে রাজশাহীর বর্ণনা রয়েছে এক বন্ধুর জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল হিসেবে। "লেটার্স অব স্পোর্টস ইন ইস্টার্ণ বেঙ্গল" থেকে ১৮৫০ সনে নেলসন উদ্ধৃত করেন[১২]:

> কৃষি-আবাদি অঞ্চলের পরে ছিল বারিন্দ, যার গঠনোপাদান ছিল শুষ্ক ও প্রায় অকেজো মাটি; আর নদীর অববাহিকাব তুলনায় এর অবস্থান এত উর্ধ্বে ছিল যে, কোন কোন সময় লোকমুখে এটি বারিন্দ-টিলা বলে কথিত হতো। এর বিশালতা, অনমনীয়তা ও শিকারের পক্ষে অনুপযোগিতা এবং অসন্তোষজনক পরিবেশ শিকারীদের কাছে এটিকে অনাকর্ষণীয় করে তোলে। তা সত্ত্বেও হরিণ, কুকুর, বাঘ, চিতাবাঘ প্রভৃতির লালনক্ষেত্র হিসেবে এটি বিকশিত হতে থাকে।

নেলসনের সাক্ষ্যানুসারে কিছু অপরিসর ঝোপঝাড় বাদে জঙ্গলগুলো ১৯১২ সনের আগেই নির্মূল করা হয়।

১৮৯৭ সনের ভূমিকম্পের ফলে ময়মনসিংহের কিছুসংখ্যক গ্রাম বালি ও পানিতে আচ্ছাদিত হয়ে যায়। এতে বোঝা যায় যে, সমগ্র দেওয়ানগঞ্জ ও শেরপুরের বৃহদংশ তখন ব্রহ্মপুত্রের গর্ভে নিমজ্জিত ছিল।[১৩] দিনাজপুরের জঙ্গল সাফ করে নতুন ভূমিতে জনবসতি গড়ে তোলা হয় ঊনিশ শতকে। অনুরূপ বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল হল পাবনা, ময়মনসিংহ, উত্তর ঢাকা, যশোর, খুলনা ও বাকেরগঞ্জ। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এই সব জঙ্গল সাফ করে জনবসতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারীরূপে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতো বাংলায়। এসবের সঙ্গে যুক্ত হয় দুর্ভিক্ষ ও অনটনের মত মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম সঙ্কট, যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও বৃটিশ রাজের শাসনামলে ক্রমবর্ধমান বিনাশী ভূমিকা পালন করে। বাংলার লক্ষ লক্ষ জীবনসংহারী কয়েকটি মহাদুর্যোগের উল্লেখ ২নং সারণিতে করা হয়েছে।

---

১১. W H Nelson, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Noakhali, 1914 1919*, (Calcutta 1919), 12,15, 20-21.

১২. W H Nelson, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Rajshahi, 1912-1922*, (Calcutta 1923), 25 26

১৩. F A. Sachse, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Mymensingh, 1908-1919*, (Calcutta 1920), 15-16.

জনসংখ্যা বৃদ্ধি

বর্তমান অনুচ্ছেদে বাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি চারটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে : (ক) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগ (১৬০০-১৭৬০); (খ) অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ ও অনটনের যুগ (১৭৬০-১৯২১); (গ) মৃত্যুহার হ্রাসের সূচনাপর্ব (১৯২১-১৯৪৭) এবং (ঘ) জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির যুগ (১৯৪৭ থেকে পরবর্তীকাল)। এসব পর্যায়ের ঐতিহাসিক পটভূমি পরবর্তী চতুর্থ অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। এসব পর্যায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃতি-প্রবণতা নিম্নে আলোচিত হলো।

২.১ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগ

বাংলায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্রমবিকাশ ঘটে মুগল শাসনামলে। কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের সমন্বিত ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতির সুফল যেমন বিদেশীদের আকর্ষণ করে, তেমনি ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও বহিরাগতদের আকৃষ্ট করে। ষোল শতক থেকে কিছু সংখ্যক বৃহৎ নদীর পূর্বমুখী গতিপথে পরিবর্তন সূচিত হয়। পর্যাপ্ত কৃষি উৎপাদন ও উন্নততর স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ অন্যান্য অঞ্চলের বাস্তুত্যাগীদেরকে নবগঠিত এই ব-দ্বীপাঞ্চলে বসতি স্থাপনে প্রলুব্ধ করে। ১৮০০-১৯৪১ সময়কালে ভারতের জনসংখ্যার সাথে তুলনার ভিত্তিতে বাংলার জনসংখ্যার শতকরা অনুপাত ৩ নং ছকে দেখানো হয়েছে। বাংলার জনসংখ্যার হার ১৮০০ সনের ১২.০৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৮৪৫ সনে ১৪.৯২-তে দাঁড়ায়, আবার ১৮৭১ সনে তা নেমে আসে ৯.১০ শতাংশে। ১৮৬৭ সনে ও তৎপরবর্তী বছরগুলোতে ভারতের জনসংখ্যার অবগণনাই হয়তো এর জন্য দায়ী[১৪]। যদি ধরা যায় যে, ১৬০০-১৯৪১ সময়কালে ভারত ও বাংলার জনসংখ্যার অনুপাত প্রায় সমান ছিল, তাহলে বাংলার জনসংখ্যা ৯.১০ মিলিয়নে ও ১২.০৮ মিলিয়নের মধ্যেই স্থিতিশীল থাকার কথা। বাংলার জনসংখ্যার আনুপাতিক হার ১৮৩৪ এবং ১৮৪৫ সনে বেশি বলে মনে হয় (যথাক্রমে ১৩.৯ ও ১৪.৯ শতাংশ) মূলত ভারতের প্রাককলিত মোট জনসংখ্যার অবগণনার কারণে। বিসারিয়া ও বিসারিয়ার তথ্যেও এ ধরনের যুক্তির সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৫] তাঁদের মতে, ভারতের জনসংখ্যা ১৮০০ এবং ১৮৫০ সনে যথাক্রমে ১৩৯-২১৪ এবং ১৮৩-২৪৭ মিলিয়নের মধ্যেই ছিল। অথচ সারণি ৪-এ দেখানো হয়েছে যে ভারতের জনসংখ্যা ১৮০০ সনে ছিল ১২০ মিলিয়ন এবং ১৮৫০ সনে ১৭৫ মিলিয়ন। মনে করা হয়ে থাকে যে, বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে এই উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছিল রাজস্ব কর্মকর্তাদের সহায়তায়। তাই এই ধরনের সূত্রে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যার প্রাককলিত হিসাবে বড় ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় গুণগত মানের

১৪. K. Davis, *The population of India and Pakistan* (New Jersey 1951), 25-26.

১৫. L. Visaria and P. Visaria, *The Cambridge Economic History of India* (New Delhi 1982) Volume II c 1757-c 1970, Capter V, 463-532

পার্থক্যের কারণে। বাংলার জনসংখ্যার হিসাবও করা হয়েছে ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটদের দেয়া রাজস্বের তথ্যের ভিত্তিতে। শুধু জন্ম-মৃত্যুর হারকেই যদি বাংলার জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ বলে স্বীকার করা হয়, তাহলেই কেবল উক্ত নির্ধারিত সংখ্যা সঠিক হতে পারে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক লোকের বাংলায় অভিবাসন সাপেক্ষে উক্ত সংখ্যা নিম্নমাত্রার কাছাকাছি বলে ধরে নেয়াই অধিক সমীচীন। ডেভিসের মতে, ভারতের অভ্যন্তরে ব্যাপক আন্তঃস্থানান্তর সংগঠিত হয়েছিল। ভারতের পুরুষদের এই আন্তঃস্থানান্তর ছিল পূর্বমুখী। ডেভিস দেখিয়েছেন যে, ১৮৯১-১৯৩১ সময়কালে এ আন্তঃস্থানান্তরের ফলে ভারতের অন্য সব আন্তঃপ্রদেশের তুলনায় বাংলারই ভাগে পড়ে সর্বাধিক সংখ্যক স্থানান্তরকারী।[১৬] পক্ষান্তরে রাব্বী যুক্তি দেখান যে, ১২০৩ সনে প্রথমবারের মত বাংলায় মুসলিম শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সময় থেকে ১৭৬৫ সন পর্যন্ত এখানে মুসলমানরা এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে।[১৭] আর বহিরাগতদের বাংলায় আসার পশ্চাতে যে কারণগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে বাংলার সুরক্ষিত অবস্থান ও বাংলার ভূমির ব্যাপক উৎপাদিকাশক্তি। শপ্তদশ শতকের পরে বাংলায় আন্তঃস্থানান্তর প্রক্রিয়ার ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছিল বলে ধারণা করা যায়। বহিরাগত এ জনগোষ্ঠীকে হিসাবে ধরলে ১৬০০ সনে বাংলার মোট জনসংখ্যা প্রায় ৯ মিলিয়নের কাছাকাছি হওয়াই সমীচীন।

রায় ও দাসগুপ্তের হিসাব অনুযায়ী ১৮০১ ও ১৮১১ সনে বাংলার জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪.০৫ ও ১৫.০৫ মিলিয়ন (৪নং সারণি দ্রষ্টব্য)।[১৮] ১৮০১-১৮১১ দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি ১৭৭০ সন পর্যন্ত প্রযোজ্য হয়, তবে সে হিসাবে ১৭৭০ সনে বাংলার জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১১.৭৮ মিলিয়নে। ১৬০০-১৮০০ সময়কালে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় স্থিতিশীল ছিল, কেননা উক্ত সময়ে জন্মহার ও মৃত্যুহার প্রায় সমান ছিল। বাংলার ক্ষেত্রে এ কথা বলা যায় যে, যদি ১৬০০-১৮০০ সময়কালে বাংলায় মাঝারি মাত্রার অভিবাসনও ঘটে থাকে, তাহলেও উক্ত সময়ে এখানকার জনসংখ্যা আপেক্ষিকভাবে ক্ষুদ্রায়তনই থেকে থাকবে। অধিক সংখ্যক লোকাগম সংঘটিত হওয়ার বেলায় মুখ্য নিয়ামকই ছিল নদীসমূহের গতিপথ পরিবর্তনের ফলে জেগে উঠা নতুন ভূমি, যা সতেরো শতকের পরবর্তীকালেরই ঘটনা। এতে বোঝা যায় যে, ১৬০০-১৮০০ সময়কালে বাংলার জনসংখ্যার যে বৃদ্ধি, তার মুখ্য কারণ ছিল প্রকৃত অভিবাসন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে ১৬০০ সালে বাংলার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৯ মিলিয়ন।

১৬ প্রাগুক্ত, 111

১৭. K F Rubbee. *The Origins of the Mussalmans of Bengal,* (Calcutta 1895), 6

১৮. S B Roy and A Das Gupta, "Population Estimates for Bangladesh", *Population Studies,* XXX 3 (1976) 17

২.২ অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ ও অনটনের যুগ

বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা ও বৃটেনে শিল্পবিপ্লব ছিল সমকালীন ঘটনা। প্রাক-শিল্পবিপ্লব যুগে বাংলায় কৃষি ও শিল্পউৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে আসছিল।

৪ নং সারণিতে ১৮০১-১৯৭৪ সময়কালে বাংলার জনসংখ্যার পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে, ১৭৭০ সনে বাংলার জনসংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণাটি ছিল এই যে, ১৮০১-১৮১১ সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে হার, তা ১৭৭০-১৮০১ সময়কালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ১৬০০-১৮০০ সময়কালে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় অপরিবর্তিত ছিল, কিন্তু বাংলার বেলায় এমনটি হওয়ার কোন তথ্য-প্রমাণ নেই; বরং উক্ত সময়ে বাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির একাধিক প্রমাণ বিদ্যমান। বাংলার জনসংখ্যা ১৭৭০ সনের ১১.৭৯ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ১৮০১ সনে দাঁড়ায় ১৪.৫ মিলিয়নে এবং তা আরো বেড়ে ১৮৭১ সনে উন্নীত হয় ২৩.০২ মিলিয়নে। ১৮০১-১৯০১ সময়কালে এ সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে উঠে। ১৮০১-১৯২১ সময়কালে এ বৃদ্ধির হার ০.৫২ ও ০.৮৯ শতাংশে সীমিত থাকে। ১৮০১-১৮৮১ কালপর্বে বৃদ্ধির এ হার ছিল ০.০০৬৭ শতাংশ এবং পরবর্তী তিন দশকে এর লক্ষণীয় বৃদ্ধি ঘটে। ১৯১১-১৯২১ আন্তঃশুমারিকালে বাংলার জনসংখ্যার বৃদ্ধি ছিল সর্বনিম্ন।

১৮৭২-১৯২১ সময়কালে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ৫ নং সারণির হিসাব থেকে সুস্পষ্ট বোধগম্য হয়। ১৯১১-১৯২১ দশক ও ১৮৭২-১৯২১ সময়কালে পূর্ব বাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৮.৩ ও ৭২.৪ শতাংশ। পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে শতকরা ৮.৩ হারের জনসংখ্যাগত যে অর্জন সে তুলনায় পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে শতকরা ৪.৯ হারে হ্রাস যথার্থই অর্থবহ। তবে এ থেকে মৃতপ্রায় ব-দ্বীপাঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর অবস্থাজনিত কারণে পশ্চিম বাংলা থেকে পূর্ব বাংলায় অভিগমনের ব্যাপ্তির মাত্রা পরোক্ষভাবে হলেও ধারণা করা যায়। তবে এ হ্রাসপ্রাপ্তির সিংহভাগের জন্য প্রধানত দায়ী ঐ অঞ্চলে মহামারীর আকারে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব। ১৮৭২-১৯২১ সময়কালে পশ্চিম বাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার মাত্র ৫.৯; আর সে তুলনায় পূর্ববঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে এ বৃদ্ধির শতকরা হার যথাক্রমে ৭২.৪, ২৭.৮ ও ২৫.১।

১৯০১-১৯২১ সময়কালে স্থূল জন্মহারের তেমন অবনতি ঘটে নি, এবং ১৭৭০-১৯০১ সময়কালের জন্মহারের কোন উপাত্ত পাওয়া যায় না। তবুও ধারণা করা যেতে পারে যে, উক্ত কালে জন্মহার প্রায় পূর্ববর্তী মাত্রায় স্থির ছিল। ১৮৮১-১৯৭৪ সময়কালের জন্মহার ও মৃত্যুহার ৭ নং সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সারণি থেকে সুস্পষ্টই বোঝা যায় যে, ১৮৮১-১৯২১ সময়কালে স্থূল মৃত্যুহারের প্রবণতা ছিল ঊর্ধ্বমুখী আর সর্বোচ্চ স্থূল মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৪৭. ৩ লক্ষ্য করা যায় ১৯১১-২১ সময়কালে। এ সর্বোচ্চ মৃত্যুহারের জন্য সম্ভবত দায়ী ১৯১৮ সালের মহামারীরূপী ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব,

যার ফলে কমপক্ষে ৪০০,০০০ লোকের মৃত্যু ঘটে। ১৭৭০-১৯২১ সময়কালে বাংলায় উচ্চ মৃত্যুহারের জন্য দায়ী সুস্পষ্ট নিয়ামক ছিল তিনটি— (১) উপর্যুপরি মহামারীর প্রাদুর্ভাব, (২) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুশাসন ও (৩) উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটন।

বাংলার অধিবাসিরা ছিল মহামারীরূপী বিভিন্ন রোগের সহজ শিকার। কিছু রোগ আবার অনেক অঞ্চলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হতো। যক্ষা, প্লেগ প্রভৃতি ব্যাধি বৃটিশ শাসনপূর্বকালে ভারতে খুব একটা দেখা যায় নি।[১৯] তবে মারাত্মক মহামারীরূপে কলেরা, গুটিবসন্ত, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি ব্যাধি মাঝে মাঝে বাংলার জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিত। মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধীয় যেসব তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া যায় তা অপ্রতুল ও অনির্ভরযোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য যে, ৬ নং সারণিতে মৃত্যুর কারণভিত্তিক যে মৃত্যুহার দেখানো হয়েছে তাতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯০১-১৯১১ দশকে সংঘটিত মৃত্যুর তিন-চতুর্থাংশই ম্যালেরিয়াজনিত মৃত্যু ছিল। এসব মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক কর্তৃপক্ষকে তা সরবরাহ করার দায়িত্ব ছিল গ্রামসর্দার অথবা চৌকিদারের। ডেভিস উল্লেখ করেছেন যে, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে অপারগ হলে তথ্য সরবরাহকারীরা সেক্ষেত্রে মৃত্যুর অজ্ঞাত কারণকে জ্বর বলে চালিয়ে দিত।[২০] এক্ষেত্রে টাইফয়েড, গুটিবসন্ত, নিউমোনিয়া ও ইত্যাকার কারণকেও হয়তো নিউমোনিয়ার শ্রেণীভুক্ত করা হয়ে থাকবে। একই সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সর্বমোট মৃত্যুর ৭.৪ শতাংশের জন্য দায়ী ছিল কলেরা। ভারতে বিপুল সংখ্যক লোকের মৃত্যুর কারণ বলে চিহ্নিত গুটিবসন্ত নামক রোগটি পুরনো ব্যাধিসমূহের অন্যতম বলে বিবেচিত হতো এবং ভারতের প্রায় সর্বত্র এটি সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। উনিশ শতকের শেষভাগে এ রোগের টিকা ভারতে চালু করা হয়, যদিও এটি ইউরোপে উদ্ভাবিত হয় এর প্রায় একশত বছর আগে, ১৭৯৮ সনে।[২১] তবে ভারতে টিকা প্রবর্তিত হওয়ার অল্প ক'বছরের মধ্যেই গুটিবসন্ত রোগজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।

কলেরা ছিল আরেকটি পুরানো ব্যাধি, যা বাংলায় বিপুল সংখ্যক লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী। কলেরার সর্বপ্রথম ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটে সম্ভবত ১৮১৭-১৯ সনে এবং সম্ভবত বাংলাতেই এটি শুরু হয়ে থাকবে। মহামারীরূপী কলেরার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ১৮৬৩-১৮৬৫, ১৮৭৫-১৮৭৭, ১৮৯১-১৮৯২, ১৮৯৪-১৮৯৭, ১৯০০, ১৯০৫-১৯০৮, ১৯১৮-১৯১৯ ও ১৯২১ সনে ঘটেছিল বলে ডেভিস উল্লেখ করেছেন।[২২]

আরেকটি ছোঁয়াচে রোগ ছিল কালাজ্বর। কলেরার তুলনায় এর বিস্তার কম হলেও এর প্রাণঘাতী ভূমিকা ছিল অধিকতর মারাত্মক। ১৮৯১-১৯০১ সালের এক দশক মেয়াদে

১৯. K. Davies, *Population*, 45-47

২০. প্রাগুক্ত, 42

২১. প্রাগুক্ত, 47

২২. প্রাগুক্ত, 48

পশ্চিম বাংলার বহু গ্রাম কালাজ্বরের প্রকোপে উজাড় অথবা পবিত্যক্ত হয়ে যায়। ১৮৫৪ ও ১৮৭৫ সনে মহামারীরূপী কালাজ্বর পশ্চিম বাংলায় ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করে এবং ১৮৯১ সন নাগাদ তা পূর্বমুখী ছড়িয়ে পড়ে। এর আরেক দফা প্রাদুর্ভাব ঘটে ১৯১৭-২৭ দশকে। তুলনামূলকভাবে কম মারাত্মক হলেও এতে বহুসংখ্যক লোক প্রাণ হারায়। এ রোগের মারাত্মক ছোবল থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয় ১৯২০-এর দশকের পর, যখন কালাজ্বরের সার্থক ঔষধ আবিষ্কৃত হয়।[২৩]

উনিশ শতক নানা মারাত্মক মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও অনটনের প্রাদুর্ভাব নিয়ে বাংলার জন্য দুঃসময় হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু বিশ শতকের সূচনা ঘটে যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের তুমুল তৎপরতার মধ্য দিয়ে। কলকাতা হয়ে উঠে আমদানি ও রপ্তানি কর্মকাণ্ডের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ১৮৮৯-১৯০৮ সময়কালে ভারতে রেলপথের সম্প্রসারণ ঘটে আরও দশ হাজার মাইল। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য এবং খরার কবল থেকে ফসল রক্ষার লক্ষ্যে প্রায় অনুরূপ সময়ে সেচপ্রকল্প চালু করা হয়।[২৪] এসবের ফলে সৃষ্ট খাল, সড়ক ও রেলপথের বেড়ি ও বাঁধ পরিণত হয় মশার প্রজননক্ষেত্রে, যার মাধ্যমে বাংলায় ম্যালেরিয়ার বিস্তার ঘটে। ভারতের সর্বমোট মৃত্যুর বিশ শতাংশই ছিল ম্যালেরিয়াজনিত এবং সারণি ১০ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ম্যালেরিয়াজনিত মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি হওয়া বিচিত্র নয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুশাসনের ফলে বাংলার জনজীবনে অতিশয় আর্থিক দৈন্য নেমে আসে। আর এ কারণে ১৯৭০ সনে প্রথম দেখা দেয় মহাদুর্ভিক্ষ। বৃহত্তর বঙ্গের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ (দশ মিলিয়নেরও অধিক) এ দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করে।[২৫] বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পূর্ব পর্যন্তও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আপেক্ষিক হারে উচ্চ ছিল না। অতএব জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দুর্ভিক্ষ হওয়ার জন্য দায়ী করা যায় না। বারংবার দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবের জন্য দায়ী ছিল কৃষকদের স্থায়ী দারিদ্র্য, যা ছিল অধিক মাত্রায় ভূমির খাজনা নির্ধারণের কুফল। দুর্ভিক্ষ কমিশনের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকাল যাবৎ সে অনুপাতে দিনমজুরের মজুরি বৃদ্ধি করা হয় নি।[২৬] দ্রব্যমূল্য ও মজুরির এ ব্যবধান উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতএব দুর্ভিক্ষ ও অনটনের সহজ শিকার হয় এই দিনমজুর শ্রেণী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

২৩. J. E. Park and K. Park, *Preventive and Social Medicine*, (Jabbalpur 1985), 2-7

২৪. B. M. Bhatia, *Famines in India —A Study in Some Aspects of Economic History of India, 1860-1945*, (Bombay 1963), 196-200, 210

২৫. W.B. Arthur and G. McNicoll, "Analytical Survey of Population and Development in Bangladesh", *Population and Development Review*, IV · II (1976), 29

২৬. B. N. Bhatia., *Famines in India*, 24-26

বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজে মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়।[২৭] এর মাধ্যমে সূচিত দীর্ঘমেয়াদি ইজারাব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট যে অকৃষক জমিদার শ্রেণী, তারই নিয়ন্ত্রণে চলে যায় গ্রামীণ সম্পদ। এর প্রভাব এত ব্যাপক ছিল যে, এটি প্রবর্তনের মাত্র দু'দশক কালের মধ্যেই অর্ধেক ভূ-সম্পত্তিরই মালিকানাসত্ব হাতবদল হয়ে যায়। কৃষিরায়তদের কাছ থেকে খাজনা উসুল করতে শুরু করে মধ্যস্বত্বভোগী একটি শ্রেণী। নতুন এ ব্যবস্থার আওতায় ভূমির উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপের ফলে সৃষ্টি হয় এক নব্য শোষক শ্রেণীর। গ্রামীণ এলাকার কৃষিব্যবস্থায় এ প্রক্রিয়ায় এক সদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। সঞ্চয়ের অভাবে ক্ষুদ্র কৃষক ও কৃষিমজুর সম্প্রদায় যেকোন দুর্ভিক্ষ ও অনটনের ছোবলে নেতিয়ে পড়ে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রবর্তিত হওয়ার আগে পূর্ব বাংলা শুধু যে খাদ্যের ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল তা-ই নয়, বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অক্ষুণ্ন ছিল। এমনকি কোম্পানি শাসনের প্রথম দিকে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে চাউল রপ্তানি করা হতো।[২৮] ১৭৪৭ সনে ঢাকা থেকে রপ্তানিকৃত সুতীবস্ত্রের মূল্য ছিল ২৮.৫ লক্ষ রুপী। ১৮১৩ সন নাগাদ সুতীসামগ্রীর রপ্তানিমূল্যের পরিমাণ মাত্র ৩.৫ লক্ষ রুপীতে নেমে আসে।[২৯] কোম্পানির শাসনামলে বাংলার নিজস্ব শিল্পক্ষেত্রে অবনতির গতি যে কত দ্রুত ছিল তা বোঝার জন্য এ তথ্যই যথেষ্ট।

২.৩ ক্রমহ্রাসমান মৃত্যুহারের সূচনা

বাংলার জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ১৯২১-১৯৪১ সময়কাল একটি সুচিহ্নিত পর্যায়। পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত ১৭৭০-১৯২১ সময়কালে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয় ছিল প্রায় সমান। তবে গুটিবসন্ত ও কালাজ্বরসহ কিছু কিছু রোগ নতুন টিকা ও ঔষধ প্রবর্তনের ফলে নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াভুক্ত হচ্ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান প্রবণতার এই প্রাথমিক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যের লক্ষণীয় দিকটি ছিল ১৯২১-১৯৪৭ সময়কালে মৃত্যুহারের ক্রমহ্রাসের প্রবণতা।

৪ নং সারণিতে দেখা যায় যে, ১৯২১ সনে বাংলার লোকসংখ্যা ছিল ৩৩.৩ মিলিয়ন আর এর মাত্র বিশ বছর পরেই ১৯৪১ সনেব আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা আরও ৯ মিলিয়ন বৃদ্ধি পায়। ১৯২১-১৯৩১ সনের মধ্যবর্তী আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা আরো ৯ মিলিয়ন বৃদ্ধি পায়। ১৯২১-১৯৩১ সনের মধ্যবর্তী আন্তঃশুমারিকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার ০.৬৭ থেকে বেড়ে গিয়ে ১৯৩১-১৯৪১ সময়কালে দ্বিগুণ হয়ে যায়। ৭ নং

২৭. S Islam, *Rent and Raiyat · Society and Economy of Eastern Bengal, 1859· 1928,* (Dhaka 1989), 12.

২৮ N. Ahmed. *A New Economic Geography of Bangladesh,* (New Delhi 1976), 55.

২৯. B C Allen, *Eastern Bengal District Gazetteers—Dhaka* (Allahabad 1912), 21.

সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ সময়ে জন্মহারের মাত্রা মোটামুটি ১৯২১ সনের মতোই ছিল, কিন্তু মৃত্যুহার ব্যাপকভাবেহ্রাস পায়; যেমন, ১৯১১-১৯২১ সনে হাজারপ্রতি ৪৭.৩ জনের স্থলে ১৯২১-১৯৩১ দশকে এ হার কমে হয় ৪১.৭ আর পরবর্তী দশকে (১৯৩১-১৯৪১) তা আরো কমে গিয়ে হয় প্রতি হাজারে ৩৭.৮ জন।

১৯৪১ সনের আদমশুমারিতে অতি-গণনাবশত ১৯৩১-১৯৪১ দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নির্ধারিত হিসাব প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে বেশি বলেই মনে হয়। ১৯৪০ সনে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব অনুসারে ভারতীয় রাজ্যসমূহের হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতের ভিত্তিতে ভারতবিভক্তির যে প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এ মাত্রাতিরিক্ত গণনা প্রশ্রয় পায়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই অধিক জনসংখ্যা দেখায়। জন্মহার ও মৃত্যুহারের হিসাব দেখে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৩১-১৯৪১ দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কেবল মৃত্যুহারের অধোগতিই দায়ী নয়।

২,৪ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির যুগ

১৯২১-১৯৪৭ সময়কালে মৃত্যুহারের অধোগতি লক্ষ্য করা গেছে। বাংলার ইতিহাসে ভয়াবহতম মহাদুর্ভিক্ষসমূহের একটি সংঘটিত হয় ১৯৪৩ সনে। এতে প্রাণহানি ঘটে ২ থেকে ২.৫ মিলিয়ন লোকের।[৩০] অতএব, ১৯৫১ সনের পরবর্তী আদমশুমারিতে মোট জনসংখ্যার ক্ষেত্রে অধোগতি লক্ষ্য করা যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ অধোগতির মূল কারণগুলো ছিল ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষ এবং কলেরা ও গুটি বসন্তের মহামারী।

বাংলার জনসংখ্যা ১৯৫১ সনে ছিল ৪১.৯ মিলিয়ন, যা বেড়ে ১৯৬১ সনে হয় ৫০.৮ মিলিয়ন এবং তা আরো বেড়ে ১৯৭৪ সনে দাঁড়ায় ৭১.৩ মিলিয়ন। মাত্র তিনশ' বছরে ৭০ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ ঘটনা বাংলার ইতিহাসে অভূতপূর্ব। আরো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হলো, নিরঙ্কুশ সংখ্যার ভিত্তিতে বলতে গেলে, মাত্র ২৩ বছরের যে বর্ধিত লোকসংখ্যা (প্রায় ২৯.৪ মিলিয়ন), তা ১৯০১ সনের হিসাবকৃত মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি।

১৯৪৭ সনে ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতা-উত্তরকালে পূর্ব বাংলা ও ভারতের মধ্যে ব্যাপক শরণার্থী বিনিময় ঘটে। হিসাবে দেখা গেছে যে, ১৯৪১-১৯৫১ দশক ও ১৯৫১-১৯৬১ দশকে দেশত্যাগপূর্বক যথাক্রমে কমপক্ষে ১.৮ মিলিয়ন ও ১.১ মিলিয়নেরও বেশি লোক পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে গমন করে।[৩১] বাংলাদেশের স্বাধীনতাপরবর্তী যুগেই কেবল জন্মহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিঞ্চিত ভাটা নজরে পড়ে। কিন্তু প্রাক-স্বাধীনতা যুগের হিসাব

৩০. W. B. Arthur And G. McNicoll, *Population and Development in Bangladesh*, 29.

৩১. S. G. Roy and A. Das Gupta, "Population Estimates", 18

থেকে জানা যায় যে, ১৯৫১-১৯৭১ সময়কালে জন্মহারের মাত্রা প্রায় স্থির ছিল। তবে হাজারপ্রতি যে মৃত্যুহার ১৯৪১-১৯৫১ দশকে ৪০.৭ জন ছিল, তা হ্রাস পেয়ে ১৯৬২-৬৫ সময়ে হয় প্রতি হাজারে ১৮.৫ জন। ১৯৭১ সনের স্বাধীনতাযুদ্ধের ফলে মৃত্যুহারের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় ১৯৭৪ সনে । প্রায় দু'দশকের মধ্যে মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় বাংলার জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। মৃত্যুহারের এ নিম্নমুখী গতি অর্জন সম্ভব হয়েছে স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক ব্যবস্থাদির ক্রমাগত সাফল্যের ফলে, আর এগুলোর শুভ সূচনা ঘটে বিশ শতকের গোড়ার দিকে। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, উদরাময় প্রভৃতির মতো ছোঁয়াচে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে টিকা, উন্নতমানের ঔষধ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অন্যান্য পদক্ষেপের সফল বাস্তবায়নের ফলে।

সারণি ৮ ও ৯-এ দেখানো হয়েছে বাংলার জনসংখ্যার জেলাওয়ারী তারতম্য। ১৯০১-১৯৭৪ সময়কালে জনসংখ্যার এক চমকপ্রদ শ্রেণীবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। জেলাসমূহে জনসংখ্যার তারতম্যগত প্রকৃতি সুচিহ্নিত করার জন্য তিনটি পৃথক পর্যায়ে তা বিবেচনা করা হয়েছে : (১) উচ্চ জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহারের যুগ (১৯০১-১৯২১), (২) ক্রমহ্রাসমান মৃত্যুহারের সূচনাপর্ব (১৯২১-১৯৪১) এবং (৩) মৃত্যুহার হ্রাসের যুগ (১৯৫১-১৯৭৪)। সংশ্লিষ্ট সারণির ভিত্তিতে নিম্নরূপ শ্রেণীপ্রকরণ করা হয়েছে :

ক. সব ক'টি পর্যায়েই খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড়পড়তা হারেব চেয়ে অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে;

খ. বাকেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার জনসংখ্যা ১৯৫১ সনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিব গড়পড়তা হারেব চেয়ে অধিক বৃদ্ধি পায়, তবে ১৯৫০ সনের পববর্তীকালে এসব জেলাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার সমগ্র দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিব শতকরা হারের নীচে নেমে যায়।

গ) রংপুর ও বগুড়ার জনসংখ্যা ১৯০১-১৯২১ দশক ও ১৯৫১-১৯৭৪ সময়কালে উচ্চতর হারে বৃদ্ধি পায়; তবে ১৯২১-১৯৪১ সময়কালে এ বৃদ্ধি তেমন বেশি ছিল না।

ঘ. যশোর, কুষ্টিয়া ও পাবনার জনসংখ্যা ১৯০১-১৯২১ সময়কালে হ্রাস পায় এবং ১৯২১-১৯৪১ সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শ্লথ গতিতে। কিন্তু ১৯৫১-১৯৭৪ সময়কালে তা বেড়ে যায় দ্রুততম গতিতে, বিশেষকরে যশোর ও কুষ্টিয়া জেলায়।

জেলাসমূহের জনসংখ্যার তারতম্যের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট প্রবণতা লক্ষণীয়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ নগর হিসেবে ১৯০১-১৯৭৪ সময়কালে তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখে। ফলে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের গ্রামত্যাগী মানুষ শহরমুখো হওয়ায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলায় বাড়তি লোকজনের সমাবেশ ঘটে। সুন্দরবনের জলাবদ্ধতা দূরীভূত হওয়ায় খুলনাতেও বাড়তি লোকের আগমন ঘটে। বাকেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালী প্রভৃতি কৃষিপ্রধান জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি ১৯৫১ সনের পূর্ব পর্যন্ত বেশ লক্ষণীয় ছিল। বিশ শতকের গোড়া থেকেই এই জেলাগুলো অধিক জনসংখ্যায় ভারাক্রান্ত ছিল।

জনসংখ্যাধিক্যের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে এসব জেলা ছেড়ে বাস্তুত্যাগীরা অন্য জেলায় বসতি স্থাপন করে। এ অবস্থায় ময়মনসিংহ জেলা থেকে বহু লোকের আসামে পাড়ি জমানোর ঘটনাটি সহজেই নজরে পড়ে। উক্ত সাধারণ নিয়মেরই আরেকটা ফল হচ্ছে এই যে, ১৯৫১-১৯৭৪ সময়কালে এসব জেলায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি ক্রমাগত নিম্নমুখী ছিল।

১৯২১-১৯৪১ সময়কালে রংপুর ও বগুড়ায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির গতি বাংলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কম ছিল। বাংলা থেকে আসামগামী দেশত্যাগীদের মধ্যে ময়মনসিংহের লোক ছাড়াও ছিল রংপুর, বগুড়া ও পাবনার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাস্তুত্যাগী। ১৯৩১ সন নাগাদ বাংলা ছেড়ে আসামে পাড়ি জমায় ৪,০০,০০০ লোক। এদের মধ্যে ১,০০,০০০ লোক ছিল শুধু ময়মনসিংহ থেকেই।[৩২] অত্যধিক ঘনবসতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ১৯২১-১৯৪১ সময়কালে এসব জেলার অধিবাসিদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ চলে যায় আসাম, কুচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। রংপুরকে গণ্য করা হতো বাংলার অন্যতম প্রধান ইক্ষু উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসাবে আর বগুড়া ছিল বাংলার ইতিহাসখ্যাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহের অন্যতম। ১৯০১ সনের আগে এ দু'টি জেলায় জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে এবং তা ১৯০১-১৯২১ সময়কাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অতঃপর কিছুকাল এ বৃদ্ধির গতি নিম্নমুখী ছিল। কিন্তু পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর নতুনকরে এসব জেলার গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং রংপুরের সৈয়দপুর ও লালমনিরহাটে রেলওয়ে কারখানা ও আবাসিক ইমারতাদি নির্মিত হয়। এর ফলে অনেক লোক অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভীড় করে রংপুরে।[৩৩]

নদীর মৃতপ্রায় অবস্থা, নতুন পলির অভাব, বিস্তীর্ণ মাঠের অনুর্বরতা প্রভৃতি কারণে ১৯০১-১৯২১ সময়কালে যশোর, কুষ্টিয়া ও পাবনার জনসংখ্যা হ্রাস পায়। ১৯৫১ সনের পর ঐসব জেলার যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন ঘটে এবং কৃষিখাতের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেয়া হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবে এসব জেলার জনসংখ্যাও খুব উচ্চহারে বৃদ্ধি পায়।

১৮৯০-এর দশকের আগে পর্যন্ত দিনাজপুরের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে নি। অতঃপর সাঁওতাল অভিবাসনকারীরা দিনাজপুরে বসতি স্থাপন শুরু করলে সেখানে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯২১ সনের পর বাংলার জনসংখ্যা ক্রমশ দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও দিনাজপুরের কোন কোন অঞ্চলে জনসংখ্যার হ্রাসপ্রাপ্তি লক্ষ্য করা যায়।[৩৪] অপরপক্ষে, বাংলাদেশের সামগ্রিক বিবেচনায় রাজশাহীতে জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব

৩২. N Ahmed, *Economic Geography*, 118 119

৩৩ প্রাগুক্ত, 179

৩৪. F O Bell, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Dinajpur, 1934-40*, (Alipore 1942), 1-9

মোটামুটিভাবে বজায় ছিল। ১৭৬৯-১৭৭১ সময়কালে রেনেলের জরিপ-প্রতিবেদনে রাজশাহীর বর্ণনা রয়েছে একটি জঙ্গলাকীর্ণ বন্ধুর অঞ্চল হিসেবে। রাজশাহীর জনসংখ্যা ছিল প্রায় অপরিবর্তিত। নেলসনের মতে, রেশমশিল্পের অবক্ষয় ও ভূমির উর্বরতার ক্রমাবনতির ফলে ১৮৭২ সনের পর থেকে রাজশাহীর জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।[৩৫] ১৯২৩ সন নাগাদ অধিকাংশ জঙ্গল সাফ করা হয় এবং এর ফলে জলবায়ুগত পরিবর্তনও ছিল লক্ষণীয়। ১৯৫১ সনের পর উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, নবতর বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড ও কৃষির উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে দিনাজপুর ও রাজশাহীর জনসংখ্যা ৮৫ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পায়।

মৃত্যুহার হ্রাসের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় ১৯২১-১৯৪৭ সময়কালে এবং তা ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময়ে জন্মহারের মাত্রা স্থির থাকে। ১৯১১-১৯২১ দশকে জন্ম ও মৃত্যুর স্থূলহার ছিল যথাক্রমে ৫২.৯ ও ৪৭.৩ শতাংশ আর ১৯৬২-১৯৬৫ সময়কালে স্থূল জন্মহার ছিল ৫৫.০; কিন্তু স্থূল মৃত্যুহার ১৮.৫ শতাংশে হ্রাস পায়। অতএব, ১৯২১-১৯৭১ সময়কালে জনসংখ্যার যে বৃদ্ধি, তার কারণ ছিল ক্রমহ্রাসমান মৃত্যুহার। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে ক্রমহ্রাসমান মৃত্যুহার লক্ষ্য করা যায় সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে।

৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অভিবাসন

জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল মুখ্য উপাদানসমূহের মধ্যে অভিবাসন অন্যতম। বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির বেলায় অভিবাসনের ভূমিকা দু'টি আলাদা পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা যায়। মুসলিম শাসনকালে বাংলায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা ছিল। আর প্রধান প্রধান নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন ভূমি জেগে উঠে। বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যেমন অন্যান্য দেশ থেকে, তেমনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও বহিরাগতদেরকে আকৃষ্ট করে। তবে বাংলার কোন কোন জেলায় বিশ শতক থেকে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কৃষিভূমির উপর চাপ এতই বেড়ে যায় যে, এসব জেলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাসিন্দা বাস্তুত্যাগ করে প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে চলে যায়। অভিবাসন সংক্রান্ত প্রাপ্ত উপাত্ত নিতান্তই অপ্রতুল। এ তথ্যের একমাত্র উৎস হচ্ছে আদমশুমারি সূত্রে প্রাপ্ত জন্মস্থান বিষয়ক উপাত্ত। ডেভিসের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ভারতের ক্ষেত্রে এই অভিবাসন প্রক্রিয়ার প্রবণতা পূর্বমুখী।[৩৬] উত্তর ভারতে পুরুষদের পূর্বমুখী এই অভিবাসনের মুখ্য কারণ ছিল বাংলার শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ও নগর জীবনব্যবস্থার বিকাশ। ১৮৯১-১৯৩১ সময়কালে জনসংখ্যার জন্মস্থানভিত্তিক যে উপাত্ত

---

৩৫. W H Nelson, *Survey Operations in Rajshahi*, 25-26

৩৬. K Davis, *Population*, 118-119

তা থেকে ভারতের প্রধান প্রধান রাজ্য ও বৃটিশ ভারতের মধ্যকার জনসংখ্যার বাটোয়ারা ও আপেক্ষিক হ্রাস-বৃদ্ধির বিন্যাসগত অবস্থান সারণি ১০-এ দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে, মহীশুর, পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশসহ বাংলা প্রদেশের উপরই সর্বাধিক অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ ছিল। ১৮৯১-১৯৩১ সময়কালে এসব প্রদেশে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির সাথে বিপুল সংখ্যক অতিরিক্ত লোকসংখ্যাও যুক্ত হয়েছিল। আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাপুঞ্জের অধিকাংশই ঘটেছিল ১৮৯১ সন পর্যন্ত। পরবর্তী দশকগুলোতে এ প্রবণতায় ভাটা পড়ে। তবে ১৯১১ সন থেকে জনসংখ্যার নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকে।

পূর্ব ও উত্তরবঙ্গসহ বাংলায় ১৮৮১-১৯২১ সময়কালে যে প্রকৃত অভিবাসন ঘটে,তা সারণি ১১-তে দেখানো হয়েছে। ১৮৮১ সনে প্রকৃত অভিবাসনকারীর সংখ্যা যেখানে ছিল ০.২৮ মিলিয়ন, ১৯১১ সন নাগাদ তা বেড়ে ০.৭১ মিলিয়নে উন্নীত হয়। আবার ১৯১১-১৯২০ সময়কালে প্রকৃত অভিবাসনকারীর সংখ্যা পূর্ববর্তী ০.৭১ মিলিয়ন থেকে অকস্মাৎ হ্রাস পেয়ে ০.১৩ মিলিয়নে নেমে আসে।

বাংলার কোন কোন জেলায় জনসংখ্যার নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধির ফলে বাংলা থেকে বহির্গমনের সূচনা হয় ১৯০০ সনের পরে। বাংলায় জন্মগ্রহণকারী যে বাস্তুত্যাগী জনগোষ্ঠী আসামে বসতিস্থাপন করে, ১২ নং সারণিতে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে। বাংলার এসব বাস্তুত্যাগীর অধিকাংশই ছিল কৃষক এবং এদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ময়মনসিংহ থেকেই সেখানে গমন করে। ডেভিসের মতে, ১৯৩১ সনের পরে আসামমুখী এ বহির্গমন দ্রুত হ্রাস পায়। প্রায় একই সময়ে অনুরূপ বহির্গমন ঘটে রংপুর, পাবনা ও বগুড়া থেকে আসাম, কুচবিহার ও জলপাইগুড়িতে, চট্টগ্রাম থেকে বার্মার আরাকানে এবং কুমিল্লা ও নোয়াখালী থেকে ত্রিপুরায়।[৩৭]

৪. জনসংখ্যার সম্প্রদায়ভিত্তিক বাটোয়ারা

১২০৩ সনে মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের সময় থেকেই বাংলার জনসংখ্যার গঠনপ্রক্রিয়ায় ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে আবির্ভূত হয়ে এসেছে, আর এর লক্ষণীয় ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ে এখানকার আর্থ-সামাজিক ও জনসংখ্যাগত কাঠামোর উপর। বাংলার জনসংখ্যার যে বৃদ্ধি, তার সাথে ধর্মের একটি কৌতুহলোদ্দীপক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। বাংলার জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতির সম্যক উপলব্ধির জন্য তাই ধর্মকেও অন্যতম মানদন্ড রূপে বিবেচনায় নেয়া উচিত।

১৮৭২ সনের আদমশুমারির আগ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় মুসলিম সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি অজ্ঞাত ছিল।[৩৮] ১৯০১-১৯৬৯ সময়কালে বিভিন্ন আদমশুমারির ভিত্তিতে জনসংখ্যার

৩৭. N. Ahmed, *Economic Geography*, 178-80

৩৮. F A Saches, *Survey Operations in Mymensingh*, 15-16

ধর্মভিত্তিক অবস্থান সারণি ১৩তে দেখানো হয়েছে। ১৯০১ সনে বাংলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬১ শতাংশ মুসলমান, প্রায় ৩১ শতাংশ হিন্দু এবং অবশিষ্ট ৭ শতাংশ ছিল অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ১৯৩১-১৯৬১ সময়কালে মুসলমান জনসংখ্যার আনুপাতিক ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে হিন্দুদের সংখ্যা ১৯০১ সনের ৩১.৪৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৪১ সনে হয় ২৮ শতাংশ এবং ১৯৬১ সনে তা আরো হ্রাস পেয়ে হয় ১৮.৪৫ শতাংশ। মুসলমানদের অনুপাত ১৯০১ সনের ৬১.৩৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৪১ সনে হয় ৭০.০৪ শতাংশ এবং ১৯৬১ সনে তা আরো উন্নীত হয় ৮০.৪৩ শতাংশে। পূর্ব বাংলা থেকে অন্যান্য ভারতীয় প্রদেশে বহির্গামীদের প্রকৃত সংখ্যা ১৯৪১-১৯৫১ দশক ও ১৯৫১-১৯৬১ দশকে ছিল যথাক্রমে ১.৮ ও ১.১ মিলিয়ন। তবে মুসলমান জনসংখ্যার আনুপাতিক সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য শুধু অভিবাসনই এককভাবে দায়ী নয়।

প্রতি দুই আদমশুমারির অন্তর্বর্তীকালে মুসলমান জনসংখ্যার আনুপাতিক বৃদ্ধির বিষয়টি প্রামাণ্য নথিতে লিপিবদ্ধ আছে। এক্ষেত্রে তিনটি নিয়ামক বিবেচ্য : (১) বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চতর হারের কারণ ছিল এখানকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, উন্নততর স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও নবগঠিত ব-দ্বীপাঞ্চল; (২) মুসলমানরা প্রধানত কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল এবং (৩) ইসলামের অনুকূলে বেশিরভাগ ধর্মান্তর প্রাক-বৃটিশ যুগেই ঘটেছিল এবং বৃটিশ যুগে খুবই নগণ্য সংখ্যক হিন্দু ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল।[৩৯] এসব নিয়ামক ও তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ থেকে পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক সংখ্যাধিক্যের কারণ বোধগম্য হয়। ১৯৪১ সনের আদমশুমারির উপাত্তের ভিত্তিতে ডেভিস দেখিয়েছেন যে, পূর্ব বাংলার ৭৫ শতাংশ পুরুষই নিয়োজিত ছিল কাঁচামাল উৎপাদনে, যা ছিল মুখ্যত কৃষিজ ও গবাদিপশুজাত, অথচ পশ্চিম বাংলায় এ হার ছিল ৫৩.৩ শতাংশ।[৪০] ফাউকাস মন্তব্য করেন যে, খুলনা জেলার কৃষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যকই ছিল কঠোর পরিশ্রমী মুসলমান আর সেখানকার মোট অধিবাসিদের মধ্যে মুসলমান ছিল শতকরা ৭৭ ভাগ।[৪১] অন্যান্য জেলার ভূমি জরিপ ও খাজনা নির্ধারণী প্রতিবেদনসমূহেও অনুরূপ মন্তব্যাদি প্রামাণ্য নথিতে লিপিবদ্ধ আছে। লুইস মন্তব্য করেন যে, মোট মুসলমান জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশই কৃষিতে নিয়োজিত ছিল, অথচ হিন্দু জনসংখ্যার মাত্র ৬৭ শতাংশ অনুরূপ কাজে নিয়োজিত ছিল।[৪২]

কৃষি পেশা সচরাচর সম্প্রসারিত পারিবারিক কাঠামোর ঐতিহ্যের ধারক-বাহক। এ মন্তব্যের সমর্থন মেলে প্রাক-বিপ্লব যুগের বিভিন্ন দেশের পারিবারিক কাঠামো পর্যবেক্ষণে।

৩৯. W. W Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. VIII (London 1876), 48.

৪০. K Davis, *Population*, 202

৪১. L R Fawcus, *Report on Khulna Settlement*, 43

৪২. A L. Clay, *Principal of the Heads— History and Statistice of the Dhaka Division* (Calcutta 1868) 2, 138

কল্ডওয়েলের মতে, সব আদিম সমাজ এবং প্রায় সকল প্রাচীনপন্থী সমাজে সম্পদের প্রকৃত প্রবাহ সন্তান থেকে পিতা-মাতার দিকেই গড়ায়।[৪৩] এমন অবস্থায় উচ্চ জন্মহারই হলো এর যৌক্তিক পরিণতি। পূর্ব বাংলার কৃষকদের মধ্যে আপেক্ষিক উচ্চ জন্মহারের ব্যাখ্যা এই মূলনীতির কার্যকারণ সম্পর্কের বিশ্লেষণের মধ্যে পাওয়া যায়। মুসলমান সম্প্রদায় আনুপাতিকভাবে অধিকতর সংখ্যায় কৃষিকর্মে নিয়োজিত থাকায় পূর্ব বাংলার কৃষিপ্রধান এই পরিবেশে তাদের মধ্যে উচ্চতর মাত্রার জন্মহার বিদ্যমান থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক।

১২০৩-১৭৬৫ সময়কালে বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য দু'টি কারণকে দায়ী করা যায় : (১) বাংলার ভূমির উর্বরতা ও উৎপাদনের প্রাচুর্যে আকৃষ্ট হয়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাস্তুত্যাগী মুসলমানরা বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করে[৪৪] এবং (২) মুসলিম শাসনামলে হিন্দুদের স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করারও কিছু কিছু ঘটনা ঘটে। ধর্মান্তরের অনুপাত বৃটিশ শাসনকালে দ্রুত হ্রাস পায়। উল্লেখিত কারণগুলোসহ আরো কিছু নিয়ামক বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল; যেমন : (১) হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যদের মধ্যে বহুবিবাহের ঘটনা নিতান্তই বিরল, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রতি প্রশ্রয় ছিল উদারভিত্তিক; (২) হিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ছিল নিষিদ্ধ; কিন্তু ইসলামে বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকায় মুসলিম সমাজে বিধবাবিবাহে বাধা ছিলনা; (৩) মুসলমানদের উন্নত খাদ্যাভ্যাসও তাদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ছিল, যা মুসলিম নারীদের প্রজননগত আচরণের সাথে স্বাভাবিকভাবেই সম্পর্কযুক্ত।[৪৫]

৫. উপসংহার

আধুনিক যুগের সূচনাকাল থেকে বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক উপাদানগুলোর ক্রমপরিবর্তনের যে প্রকৃতি, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপাদানগুলোতে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের নিরিখে চারটি পর্যায় সুস্পষ্টভাবে সনাক্ত করা যায়। যেমন : অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগ; অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ ও অনটনের যুগ; মৃত্যুহার সঙ্কোচনের যুগ ও জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির যুগ।

১৬০০-১৭৬০ সময়কাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভরাজোয়ার লক্ষণীয়। জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই ছিল খুব বেশি এবং বাংলায় জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিও ছিল খুবই সামান্য। তবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির এই যুগে ভারতের অন্যান্য

---

৪৩. J. C. Caldwell, "Toward a Restatement of Demographic Transition Theory" *Population and Development Review*, 11. 3 &4, 321-66.

৪৪. K. F. Rubbee, *Mussalmans of Bengal*, 6.

৪৫. B. C. Allen, *District Gazetters–Dhaka*, 60-63.

অঞ্চল থেকে বাস্তুত্যাগীদের বিপুল সংখ্যায় বাংলায় বসতিস্থাপনের ফলে এখানকার জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেড়ে যায়। কয়েকটি বড় নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে নতুন ভূমি জেগে উঠে এবং পূর্ব বাংলায় কৃষি-উৎপাদন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের ফলে বাংলায় বৈষয়িক সমৃদ্ধি আরো ব্যাপকতা লাভ করে। যুগপৎ কৃষিজ ও শিল্পজ উৎপাদনের সুসমন্বয়ের ফলে বাংলায় অর্থনীতি হয়ে উঠে ভারসাম্যপূর্ণ।

১৭৬০ সনের মহাদুর্ভিক্ষে বাংলার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ করে। ১৭৭০ সন থেকে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ও তীব্রতা দুই-ই দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিজস্ব শিল্পের ধ্বংসসাধন ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তনের ফলে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই এই নিয়ামকগুলির সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে এমন একটি নতুন সামাজিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে, যারা তাদের মজুরি ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের মধ্যকার বিরাজমান দুস্তর ব্যবধানের কারণে দুর্ভিক্ষের দুঃসহ আঘাত প্রতিহত করতে অপারগ ছিল। ক্ষেতমজুর, তাঁতী এবং ক্ষুদে কৃষকদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল এই দুর্ভাগা সামাজিক শ্রেণীটি। এভাবেই বাংলার অধিবাসিদের এক বিরাট অংশ দুর্ভিক্ষের করুণ শিকারে পরিণত হয়। কৃষিভূমির উপর চাপ বেড়ে যায় দারুণভাবে। ১৭৭০ সালের আগে জন্মহার ও মৃত্যুহারের মাত্রা উভয়ই নির্ভরশীল ছিল প্রধানত পরিবেশগত অবস্থার উপর। কিন্তু বৃটিশ শাসনকালে মনুষ্যসৃষ্ট অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে উদ্ভূত নতুন যে চালিকাশক্তি, তা ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এরই ফলে মৃত্যুহার হয় অপরিবর্তিত থাকে অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে জৈব চিকিৎসাবিজ্ঞানে একাধিক্রমে বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী উদ্ভাবনের ফলে অতি অল্প সময়ে বিশ্বজুড়ে মৃত্যুহারে এক ব্যাপক শুভ পরিবর্তন সূচিত হয়। বেশিরভাগ ঘাতক ছোঁয়াচে রোগ উপযুক্ত গণস্বাস্থ্য কর্মসূচির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ভারতের জনসংখ্যার ইতিহাসে ১৯২১ সন একটি বিভাজন বছর হিসেবে চিহ্নিত। ১৯২১ সনের পরে ক্রমহ্রাসমান মৃত্যুহারের সূচনা সহজেই নজরে পড়ে। ১৯০০ সনের পরে দুর্ভিক্ষের উপর্যুপরি প্রাদুর্ভাব কমলেও মৃত্যুহার হ্রাসের মুখ্য কারণ হিসেবে রোগ প্রতিষেধক ও প্রতিরোধ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নকেই চিহ্নিত করতে হয়।

স্বাধীন দেশ হিসেবে পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পর থেকে বাংলার জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়ে চলছিল। স্থূল মৃত্যুহার ১৯১১-১৯২১ দশকে ৪৭.৩ শতাংশ থেকে ১৯৬২-৬৫ সময়ে ১৮.৫ শতাংশে নেমে আসে। তবে স্থূল জন্মহার উক্ত পর্বে প্রায়ই অপরিবর্তিত থাকে। মৃত্যুহারের দ্রুত হ্রাসের ফলে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে।

দু'টি কারণে বাংলা থেকে বহির্গমন ও বাংলায় অভিগমন ঘটে—(১) মুসলিম শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অন্যান্য রাজ্য থেকে বহিরাগতদেরকে বাংলার প্রতি আকৃষ্ট করে এবং (২) ১৮৮১-১৯১১ সময়কালে অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে বাংলা থেকে বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয়। কৌতুহলের ব্যাপার এই যে, বাংলা থেকে বহির্গমনকারীরা অধিকাংশই ছিল কৃষক এবং এমনকি নতুন গন্তব্যে বসতিস্থাপনের পরও তারা কৃষিতেই নিয়োজিত থেকেছে। পূর্ব বাংলায় মুসলিম সংখ্যাধিক্যের বাস্তবতা ১৮৭২ সনের আদমশুমারি পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। ঐ সময় থেকে পরবর্তী প্রতিটি আদমশুমারিতে বাংলার মুসলিম জনসংখ্যার আনুপাতিক বৃদ্ধি প্রামাণ্যভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কৃষিভিত্তিক সমাজে প্রাক-শিল্পবিপ্লব পরিস্থিতিতে যৌথপরিবার প্রথা টিকেছিল। কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সন্তানের উপার্জন পিতা-মাতার হাতে বর্তানো সাপেক্ষে অধিক সন্তান আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচিত হয়। তদুপরি, সন্তানদেরকে গণ্য করা হয় বার্ধক্যে নিরাপত্তার নিশ্চয়তারূপে। বর্তমান সময়ে বাংলার জনসংখ্যার মৃত্যুহার উচ্চপর্যায়ে নেমে এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকাল (১৯৭১) পর্যন্ত ক্রমহ্রাসমান জন্মহারের কোন সূচনা উল্লেখযোগ্য রূপ পরিগ্রহ করে নি।

সারণি ১ : ভারতের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান, ১৬০০-১৯৪১সন পর্যন্ত

সন	জনসংখ্যা (মিলিয়ন হিসাবে)
১৬০০	১০০
১৮০০	১২০
১৮৩৪	১৩০
১৮৪৫	১৩০
১৮৫৫	১৭৫
১৮৬৭	১৯৪
১৮৭১	২২৫
১৮৮১	২৫৭
১৮৯১	২৮২
১৯০১	১৮৫
১৯১১	৩০৩
১৯২১	৩০৫
১৯৩১	৩৩৮
১৯৪১	৩৮৯

উৎস : K. Davis, *The Population of India and Pakistan*, 1951, 15-27.

সারণি ২ : বিগত দুশ' বছরে বাংলায় সংঘটিত বিপর্যয় ও দুর্যোগ

সন	ঘটনা	মৃতের সংখ্যা
১৭৬৯-১৭৭৬	বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ	পূর্ব বাংলায় এর পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম ভয়াবহ হলেও এটি বাংলার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশকে ছিনিয়ে নেয়।
১৭৮৪-১৭৮৮	বন্যা ও দুর্ভিক্ষ, ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথে আমূল পরিবর্তন	অজ্ঞাত
১৮২২	বাকেরগঞ্জে জলোচ্ছ্বাস	২৭০০
১৮৭৩-১৮৭৪	দুর্ভিক্ষ	অজ্ঞাত
১৮৭৬	বাকেরগঞ্জে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস	৪,০০,০০০ জন
১৮৮৪-৮৫	দুর্ভিক্ষ	অজ্ঞাত
১৮৯৭	চট্টগ্রামে ঘূর্ণিঝড়	১৭৫,০০০ জন
১৯১৮-১৯১৯	মহামারীরূপী ইনফ্লুয়েঞ্জা	৪,০০,০০০ জন
১৯৪৩	বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ	২ থেকে ২.৫ মিলিয়ন

উৎস : W B Arthur and G McNicoll, *An Analytical Survey of Populaion and Development in Bangladesh*, 1976, 29.

সারণি ৩ : ১৮০০-১৯৪১ সন পর্যন্ত ভারতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে বাংলার মোট জনসংখ্যার সংখ্যাভাত্তক অবস্থানও তার শতকরা হার

সন	মোট জনসংখ্যা ভারত (মিলিয়ন হিসাবে)	মোট জনসংখ্যা বাংলা (মিলিয়ন হিসাবে)	বাংলার জনসংখ্যার শতকরা হার
১৮০০	১২০	১৪.৫	১২.০৮
১৮৩৪	১৩০	১৮.১	১৩.৯২
১৮৪৫	১৩০	১৯.৪	১৪.৯২
১৮৫৫	১৭৫	২০.৯	১১.৯৪
১৮৬৭	১৯৪	২২.৬	১১.৬৫
১৮৭১	২২৫	২৩.২	৯.১০
১৮৮১	২৫৭	২৪.৮	৯.৬৫
১৮৯১	২৮২	২৬.৯	৯.৫৪
১৯০১	২৮৫	২৮.৯	১০.১৪
১৯১১	৩০৩	৩১.৬	১০.৪৩
১৯২১	৩০৫	৩৩.৩	১০.৯২
১৯৩১	৩৩৮	৩৫.৬	১০.৫৩
১৯৪১	৩৮৯	৪২.০	১০.৭৯

উৎস : ১. ভারতের জনসংখ্যার জন্য সারণি ১ দ্রষ্টব্য।

২. S G Roy and A Das Gupta, *Population Estimates for Bangladesh, Population Studies*, XXX: 1(1976), 17

সারণি ৪ : আদমশুমারপূর্ব ও আদমশুমারী ভিত্তিক বাংলার মোট জনসংখ্যার দশকওয়ারী পরিসংখ্যান ও বৃদ্ধির হার

সন	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন হিসাবে)	বৃদ্ধির হার%
১৮০১	১৪.৫	
১৮১১	১৫.৫	০.০০৬৭
১৮২১	১৬.৫	০.০০৬৩
১৮৩১	১৭.৭	০.০০৭০
১৮৪১	১৮.৯	০.০০৬৬
১৮৫১	২০.৩	০.০০৭১
১৮৬১	২১.৭	০.০০৬৭
১৮৭১	২৩.২	০.০০৬৭
১৮৮১	২৪.৮	০.০০৬৭
১৮৯১	২৬.৯	০.০০৮১
১৯০১	২৮.৯	০.০০৭২
১৯১১	৩১.৬	০.০০৮৯
১৯২১	৩৩.৩	০.০০৫২
১৯৩১	৩৫.৬	০.০০৬৭
১৯৪১	৪২.০	০.০১৬৫
১৯৫১	৪১.৯	-০.০০২
১৯৬১	৫০.৮	০.০১৯৩
১৯৭৪	৭১.৩	০.০২৬১

উৎস : সারণি ৩-এর সূত্র দ্রষ্টব্য।

সারণি ৫: প্রাকৃতিক বিভাজনভিত্তিক বাংলার জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে আঞ্চলিক তারতম্যের পরিসংখ্যান : ১৯১১-১৯২১ মেয়াদে

প্রাকৃতিক বিভাগ	শতকরা হিসাবে জনসংখ্যার তারতম্য ১৯১১-১৯২১	শতকরা হিসাবে জনসংখ্যার তারতম্য ১৮৭২-১৯২১
পশ্চিম বাংলা	-৪.৯	-৫.৯
মধ্যবঙ্গ	+১.৪	+২৭.৮
উত্তরবঙ্গ	+১.৯	+২৫.১
পূর্ববাংলা	+৮.৩	+৭২.৪
বাংলা	+২.৮	+৩৭.২

উৎস : B. Narayan, *Population in India*, (1925), 157.

সারণি ৬ : মৃত্যুহারের পরিসংখ্যান এবং বাছাইকৃত কয়েক বছরের সুনির্দিষ্ট কারণজনিত মৃত্যুর তুলনামূলক শতকরা হিসাব

সুনির্দিষ্ট কারণ	হাজারপ্রতি মৃত্যুর হার ১৯৫০-১৯৬০	মোট মৃত্যুর শতকরা হার ১৯০১-১৯১১	মোট মৃত্যুর শতকরা হার ১৯৫০-১৯৬০
ওলাওঠা (কলেরা)	০.৫	৭.৪	২.৫
গুটিবসন্ত	০.২	-	১.০
ম্যালেরিয়া	৩.০	৭২.৩	১৪.৮
টাইফয়েড	৩.০	-	১৪.৯
সন্তান প্রসব সংক্রান্ত	২.০	-	৯.৯
যক্ষ্মা	২.৫	-	১২.৪
শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত রোগ	১.০	০.৫	৯.৯
উদরাময় (ডায়রিয়া)	৩.০	২.৫	১৪.৯
অন্যান্য কারণ	৫.০	১৭.৩	২৪.৭
মোট	২০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস : ESCAP, *Population of Bangladesh*, (1981), 59.

সারণি ৭ : ১৮৮১-১৯৭৪ সময়কালে বাংলার জনসংখ্যার জন্ম ও মৃত্যুর স্থূলহারের হিসাব (দশকওয়ারী)

সন	স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)
১৮৮১-১৮৯১	-	৪১.৩
১৮৯১-১৯০১	-	৪৪.৪
১৯০১-১৯১১	৫৩.৮	৪৫.৬
১৯১১-১৯২১	৫২.৯	৪৭.৩
১৯২১-১৯৩১	৫০.৪	৪১.৭
১৯৩১-১৯৪১	৫২.৭	৩৭.৮
১৯৪১-১৯৫১	৪৯.৪	৪০.৭
১৯৫১-১৯৬১	৫১.৩	২৯.৭
১৯৬২-১৯৬৫	৫৫.০	১৮.৫
১৯৬৫-১৯৭৪	৪৮.৩	১৯.৪

উৎস : ESCAP, *Population of Bangladesh*, (1981), 45-65.

সারণি ৮ : জেলাওয়ারী প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব, ১৯০১-১৯৬১

জেলা	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭৪
দিনাজপুর	৪৪৭	৪৬৭	৪৮৭	৪৯৩	৫৩৪	৫৪১	৬৮৩	৯৮৫
রংপুর	৬৫৫	৭২৫	৭৬১	৭৮৮	৮৭১	৮৬৯	১১৩০	১৪৮৬
বগুড়া	৬০৪	৬৯৫	৭৪০	৭৬৬	৮৬১	৮৭৩	১০৭৩	১৪৭২
রাজশাহী	৫৩৩	৫৬০	৫৬৮	৫৫৮	৬১৬	৬১৮	৭৮৭	১১৬৮
পাবনা	৮৩৭	৮৪২	৮১৮	৮৪৯	১০০১	৯৩৬	১১৫৭	১৪৭৭
কুষ্টিয়া	৬৬৯	৬৩৬	৫৯২	৬১১	৬৯৫	৬৬৮	৮৮২	১৩৭৪
যশোহর	৬৪৮	৬২৮	৬২৪	৬০৯	৬৬৫	৬৫৬	৮৭৭	১২৮৭
খুলনা	৩১১	৩৩৮	৩৬১	৩৯৯	৪৭৭	৫০৯	৬০০	৭৬৮
বাকেরগঞ্জ	৬৯২	৭২৮	৭৯২	৮৯০	১০৬১	১০১৪	১১৮৭	১২৯১
ময়মনসিংহ	৬৩৮	৭৩৬	৭৮৭	৮৩৫	৯৮০	৯৪০	১১৪১	১৫১৩
ঢাকা	৯৮০	১০৯৭	১১৮৭	১২৯২	১৫৮২	১৫২৫	১৯০৯	২৬৪৩
ফরিদপুর	৭৪৬	৮০৭	৮৪৯	৯০৪	১১০৭	১১৪৪	১৩১১	১৫০৭
সিলেট	৪২৯	৪৭৩	৪৮৫	৫২১	৫৯৮	৬৪৬	৭৩৭	৯৯৫
কুমিল্লা	৮৭৪	১০০৪	১১০২	১২৫০	১৫৭৮	১৫৫০	১৭৯৪	২২৪৫
নোয়াখালী	৬৩৩	৭২৯	৮৩০	৯৬৬	১২৫৬	১২৭৬	১৪৬৮	১৫৯১
চট্টগ্রাম	৫৬০	৬২২	৬৬৫	৬৩৯	৮৯০	৯৫৯	১১৩৯	১৯৭১
পা. চট্টগ্রাম	২৫	৩০	৩৪	৪২	৪৯	৫৭	৭৫	১০০
বাংলাদেশ	৫৫৭	৬০৮	৬৪০	৬৮৫	৮০৯	৮০৮	৯৭৯	১২৮৪

উৎস : ESCAP, *Population of Bangladesh*, (1981), 21.

সারণি ৯ : ১৯০১-১৯২১, ১৯২১-১৯৪১ ও ১৯৫১-১৯৭৪ সময়কালে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার লোকসংখ্যার তারতম্য

জেলা	শতকরা হিসাবে তারতম্য ১৯০১-১৯২১	শতকরা হিসাবে তারতম্য ১৯২১-১৯৪১	শতকরা হিসাবে তারতম্য ১৯৫১-১৯৭৪
রাজশাহী	৯.৮০	১৩.৮৩	৮৫.৫৯
দিনাজপুর	৮.৩৫	৯.৫০	৮৯.৭৮
রংপুর	১৬.০২	১৪.৪৩	৮৬.৭৬
বগুড়া	২২.৪৭	১৬.৪১	৭৪.৫৪
রাজশাহী	৬.৫৮	৮.৪০	৯৩.৫৭
পাবনা	-২.২৯	২২.৪৩	৭৭.৬৫
খুলনা	৬.৩৯	২৫.২৫	৭২.২৬
কুষ্টিয়া	-১১.৫৩	১৭.৪৩	১১৩.০৪
যশোহর	-৩.৭৭	৬.৭৫	১০৩.০৫
খুলনা	১৬.১০	৩২.১০	৭১.৪০
বাকেরগঞ্জ	১৪.৪৪	৩৪.০০	৪৯.০১
ঢাকা	২০.৬৪	২৮.৪২	৬৮.৭৪
ময়মনসিংহ	২৩.৪৬	২৪.৫১	৬৬.৭২
ঢাকা	২১.১৭	৩৩.১৭	৮৬.৮৯
ফরিদপুর	১৩.৭৭	৩০.৩০	৪৬.৩২
চট্টগ্রাম	২১.৫৬	৩৭.০০	৫৮.৯৮
সিলেট	১৩.১৩	২৩.২৪	৫৫.৫৬
কুমিল্লা	২৬.০৪	৪৩.১৯	৫৩.৪৫
নোয়াখালী	৩১.১৪	৫১.২৮	৫৬.১৪
চট্টগ্রাম	১৮.৫১	৩৩.৯৬	৭১.৮০
পা. চট্টগ্রাম	৩৮.৮৫	৪২.৬০	৭৬.৯০
বাংলাদেশ	১৪.৯৫	২৬.০৯	৭০.৪৬

উৎস : ESCAP Country Report, *Population of Bangladesh*, (1981), 16,21

সারণি ১০ : জন্মস্থানগত সংখ্যার ভিত্তিতে ১৮৯১-১৯৩১ সময়কালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যকার জনসংখ্যার সংযোজন/বিয়োজনের হিসাব (হাজারে)

রাজ্য	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	মোট
মহীশূর	৪৪	১৬৮	১৭৪	২০৫	২১১	৮০৭
পাঞ্জাব ও আগ্রা	৮	-	৩৪	৮৪	১৮৭	৩১৩
বাংলা	৪৪১	-	৯৮	১২৬	১৫৫	৮২০
মধ্য প্রদেশ	৫৫০	-	৭৫	৫৪	১৩৫	৮১৪
বিহার ও উড়িষ্যা	-	-	২৩২	১৫৩	১০৫	৪৯০

উৎস : K. Davis, *The Population of India and Pakistan,* 111.

সারণি ১১ : ১৮৮১-১৯২১ সময়কালে বাংলায় আগত বাস্তুত্যাগীদের প্রকৃত সংখ্যা

সময়	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	মোট বহিরাগত (মিলিয়ন
১৮৮১	২১.৬৪	০.২৮
১৮৯১	২৩.৮৪	০.৫২
১৯০১	২৫.৯৩	০.৫৫
১৯১১	২৬.৬৬	০.৭১
১৯২১	৩০.৩৭	০.১৩

উৎস : A. A. Khan, Some Aspects of Peasant Behaviour in Bengal-A New-Classical Analysis (1982), 121.

সারণি ১২ : আসামে বসতিস্থাপনকারী বঙ্গজ বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যাবৃদ্ধির হিসাব, ১৯১১-১৯৩১.

বছর	বাংলায় জন্ম মোট (হাজারে)	ময়মনসিংহ (হাজারে)	আসাম উপত্যকায় গনণাকৃত	ময়মনসিংহে জন্ম ও আসাম উপত্যকায় বসবাসরত বাঙালির শতকরা হিসাব
১৯১১	১৯৪	৩৭	১২০	৩০.৮
১৯২১	১৭৬	১৭২	৩০১	৫৭.১
১৯৩১	৫৭৫	৩১১	৪৯৬	৬২.৭

উৎস : K. Davis, *The Population of India and Pakistan,* (1951), 118.

সারণি ১৩ : আদমশুমারি অনুযায়ী ১৯০১-১৯৬১ সময়কালে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক তুলনামূলক অবস্থান

আদমশুমারির বছর	মুসলমান(%)	হিন্দু(%)	অন্য ধর্মাবলম্বী (%)
১৯০১	৬১.৩৪	৩১.৪৬	৭.২০
১৯১১	৬১.৬৭	৩১.২৯	৭.০৪
১৯২১	৬৪.৪৯	৩১.৪৮	৪.০৩
১৯৩১	৬৮.৩৮	২৮.৮৬	২.৭৬
১৯৪১	৭০.০৪	২৮.০০	১.৯৬
১৯৫১	৭৬.৮৫	২২.০৪	১.১১
১৯৬১	৮০.৪৩	১৮.৪৫	১.১২

উৎস : M. A. Rahim, *An Appraisal of Census Populations of Pakistan from 1901 to 1961* (1969), 25

ভূমি সংস্কার

কামাল সিদ্দিকী*

ভূমি সংস্কারের বিষয়বস্তু

একটি দেশের ভূমি সংস্কার দ্বারা (ক) জমির মালিকানা ও আবাদি জমির একক এবং (খ) জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের অংশ সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হবে তা নির্ধারিত হয়। এ দু'টি উপাদান আবার জমির উৎপাদনক্ষমতা এবং উৎপাদনসংগঠন ও উৎপাদনকৌশলকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। যাহোক, যেখানে কৃৎকৌশলগত উন্নয়ন সীমিত সেখানে ভূমিই (এবং ফলস্বরূপ শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ) সম্পদের প্রধান উৎস। ফলে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ এলাকায় ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণের মাত্রা দ্বারা সম্পদের বণ্টন নির্ধারিত হয়। যেহেতু শ্রম ব্যতীত ভূমি থেকে আয় সম্ভব নয়, তাই ভূমিতে শ্রম প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আন্তঃসম্পর্কের ব্যবস্থা অপরিহার্যভাবে সম্পত্তির মালিকানার ধরনের সাথে জড়িত। ভূমিস্বত্ব-সম্পর্ক তাই ক্ষমতা-সম্পর্কের অনুরূপ হয়ে থাকে, যেখানে ক্ষমতা হলো "একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদ এবং অন্যান্য মৌলিক উপাদান, যেমন আনুগত্য, রাজনৈতিক দায়িত্ব প্রভৃতিসহ সমাজের সম্পদরাজি সমাবেশ করার সাধারণ সামর্থ্য।[১]

সুতরাং একটি ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার কার্যক্ষমতা নিম্নোক্ত মানদণ্ডের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় :

ক. বিদ্যমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক কিনা ;

খ. এ ব্যবস্থা উৎপাদনের সাথে যারা প্রকৃতই জড়িত তাদের স্বার্থের অনুকূল কিনা ;

* সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১. T Parsons and N Smelser, *Economy and Society*, (New Delhi 1956), 115

গ. এ ব্যবস্থা ক্ষমতার সমবণ্টন নীতি স্বীকার করে কিনা ;

ঘ. এ ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে (ধরে নেয়া যাক যে, সংশ্লিষ্ট দেশটি কৃষিপ্রধান ও উন্নয়নের নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নয়) পর্যাপ্ত অর্থ যোগানোর নিশ্চয়তা দেয় কিনা যাতে দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের পক্ষে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়।

বিদ্যমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার যেকোন পরিবর্তনকে সঙ্কীর্ণ অর্থে ভূমি সংস্কার বলা যেতে পারে। কিন্তু ভূমি সংস্কারকে অর্থপূর্ণ করতে হলে একে অবশ্যই উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ পূরণ করতে হবে। এ বিষয়টির উপর জোর দেয়া প্রয়োজন, কেননা ইদানিং ভূমিসংক্রান্ত সব ধরনের কর্মসূচি ও কার্যাবলীকেই ভূমি সংস্কার হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এসবের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরার লক্ষ্যে নিচে কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করা হলো।

'ভূমি সংস্কার'-এর উদ্যোগ যেসব ক্ষেত্রে নেয়া হয় সেখানে বাস্তব অবস্থার কারণে অর্থাৎ ভূমি-ব্যক্তি সম্পর্কের স্বরূপ বিরোধমূলক হওয়ায় ভূমিব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, কিন্তু সচরাচর কিছু লোকদেখানো সংস্কার সাধন করা হয় সেখানকার প্রকৃত ভূমিসংস্কার ঠেকিয়ে রাখার লক্ষ্যে। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন দেশের ভূমি সংস্কার ও পুনঃবন্দোবস্ত কর্মসূচি।

ভূমি সংস্কারকে দেখা হয় দারিদ্র্য ও পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি 'সমাজকল্যাণমূলক' কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবং সম্পূর্ণভাবে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এ ধরনের ভূমি সংস্কার সমাজে বিদ্যমান অসমতা ও অবিচারের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে সমাজকাঠামোর আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয় না। সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য পশ্চিমা দাতারাও তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের জন্য অনুরূপ 'সীমিত' সংস্কারের পক্ষে সুপারিশ করে থাকে। দাতাদের বিবেচনায় বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর রাষ্ট্রের গোটা কাঠামো ভেঙে পড়বে যদি না ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর 'যন্ত্রণার উপশম' হয়। কিছু পরিমাণ ভূমি সংস্কার ব্যতীত খাদ্য উৎপাদন স্থবির হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। আর এর ফলে এমনকি পি.এল. ৪৮০ বা অন্য ধরনের সাহায্য প্রদানের মাধ্যমেও বিশ্বব্যাপী খাদ্যসঙ্কটজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব না হওয়ার দরুন অনুন্নত কৃষিনির্ভর দেশসমূহে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। ভূমি সংস্কারকে দেখা হয় একটি কৌশল হিসেবে যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো উৎপাদন বৃদ্ধি। সাধারণত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র খামার বড় খামারের তুলনায় অধিকতর দক্ষ ও উৎপাদনশীল এবং এটাই ভূমিবণ্টনের পক্ষে সাধারণ বড় যুক্তি। বহু পেশাদার অর্থনীতিবিদও এ ধরনের যুক্তি সমর্থন করে থাকেন। তৃতীয় বিশ্বের শিল্পপতিদের কেউ কেউ ভূমি সংস্কারকে কৃষিউৎপাদনে অধিকতর

সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন এবং ধরে নেয়া হয় যে, কৃষি ও অন্যান্য খাতে খাদ্যশস্য ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য এর ফলে হ্রাস পাবে, যা তাদের মুনাফা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে। তারা কোনক্রমেই ভূমি সংস্কারকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসম সম্পর্ক ও অবস্থা দূরীকরণের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন না।

ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব

যে ভূমিব্যবস্থায় ভূমির মালিকানা স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেখানে জমির পুনর্বণ্টন সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের জন্য যে শুধু জীবিকা ও কর্মসংস্থানের সুযোগই সৃষ্টি করে তাই নয়, এর ফলে তাদের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতার বাস্তব ভিত্তিও তৈরি হয়ে থাকে। কেননা এর ফলে তারা জমি লাভ করে ও সম্পদ অর্জন করে এবং তাদের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য হ্রাস পায়, যা তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ঐক্য গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাদের দীর্ঘমেয়াদি ঐক্য যৌথখামার চালু, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ এবং আদর্শ উৎপাদন ইউনিট গঠন ইত্যাদি বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হয়, যা সংস্কারপূর্ব কৃষিকাঠামোতে অর্জন করা সম্ভবপর নয়। এই স্বল্পমেয়াদি সহযোগিতার পরিবেশকে স্বেচ্ছাক্রিয় শ্রমঘন কাজের মাধ্যমে অবকাঠামোর সার্বিক উন্নয়নে ব্যবহার করা সম্ভব, যেমন :

ক. চাষাবাদে, বিশেষকরে ফসলের মওসুমে, কৃষকদের মধ্যে সহযোগিতা এবং শ্রমবিনিময় ;

খ. সংযোগ-রাস্তা, সেচ-খাল, জলাধার এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপযোগী অবকাঠামো বিনির্মাণ ;

গ. মাছের চাষ, জলসেচ এবং নৌচলাচলের জন্য মজাপুকুর, মরানদী ও খাল পুনঃখনন ;

ঘ. সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড।

যেসব দেশ ঔপনিবেশিক, নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে মূলধন সংস্থান করতে অক্ষম হয়েছে, কিন্তু অধিকতর উৎপাদন এবং 'স্বনির্ভরতা' অর্থাৎ বৈদেশিক সাহায্য ও বেসরকারি বিদেশী বিনিয়োগের উপর ন্যূনতম নির্ভরতা এবং শুধুমাত্র সমশর্তে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূলধন সৃষ্টি করতে আগ্রহী, সেসব দেশের জন্য এই কৌশল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের খাজনা এবং রাজস্ব হ্রাস করা হলে তারা অধিকতর উৎপাদনে উৎসাহী হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোন কোন ভাগচাষ ব্যবসাতে মোট উৎপাদনের ৫০ শতাংশ ভূমিমালিকেরা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে উৎপাদনব্যয় ভাগাভাগি করা হয় না।

গ. এ ব্যবস্থা ক্ষমতার সমবন্টন নীতি স্বীকার করে কিনা ;

ঘ. এ ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে (ধরে নেয়া যাক যে, সংশ্লিষ্ট দেশটি কৃষিপ্রধান ও উন্নয়নের নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নয়) পর্যাপ্ত অর্থ যোগানোর নিশ্চয়তা দেয় কিনা যাতে দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের পক্ষে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়।

বিদ্যমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার যেকোন পরিবর্তনকে সঙ্কীর্ণ অর্থে ভূমি সংস্কার বলা যেতে পারে। কিন্তু ভূমি সংস্কারকে অর্থপূর্ণ করতে হলে একে অবশ্যই উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ পূরণ করতে হবে। এ বিষয়টির উপর জোর দেয়া প্রয়োজন, কেননা ইদানিং ভূমিসংক্রান্ত সব ধরনের কর্মসূচি ও কার্যাবলীকেই ভূমি সংস্কার হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এসবের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরার লক্ষ্যে নিচে কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করা হলো।

'ভূমি সংস্কার'-এর উদ্যোগ যেসব ক্ষেত্রে নেয়া হয় সেখানে বাস্তব অবস্থার কারণে অর্থাৎ ভূমি-ব্যক্তি সম্পর্কের স্বরূপ বিরোধমূলক হওয়ায় ভূমিব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, কিন্তু সচরাচর কিছু লোকদেখানো সংস্কার সাধন করা হয় সেখানকার প্রকৃত ভূমিসংস্কার ঠেকিয়ে রাখার লক্ষ্যে। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন দেশের ভূমি সংস্কার ও পুনঃবন্দোবস্ত কর্মসূচি।

ভূমি সংস্কারকে দেখা হয় দারিদ্র্য ও পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি 'সমাজকল্যাণমূলক' কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবং সম্পূর্ণভাবে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এ ধরনের ভূমি সংস্কার সমাজে বিদ্যমান অসমতা ও অবিচারের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে সমাজকাঠামোর আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয় না। সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য পশ্চিমা দাতারাও তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের জন্য অনুরূপ 'সীমিত' সংস্কারের পক্ষে সুপারিশ করে থাকে। দাতাদের বিবেচনায় বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর রাষ্ট্রের গোটা কাঠামো ভেঙে পড়বে যদি না ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর 'যন্ত্রণার উপশম' হয়। কিছু পরিমাণ ভূমি সংস্কার ব্যতীত খাদ্য উৎপাদন স্থবির হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। আর এর ফলে এমনকি পি.এল. ৪৮০ বা অন্য ধরনের সাহায্য প্রদানের মাধ্যমেও বিশ্বব্যাপী খাদ্যসঙ্কটজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব না হওয়ার দরুন অনুন্নত কৃষিনির্ভর দেশসমূহে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। ভূমি সংস্কারকে দেখা হয় একটি কৌশল হিসেবে যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো উৎপাদন বৃদ্ধি। সাধারণত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র খামার বড় খামারের তুলনায় অধিকতর দক্ষ ও উৎপাদনশীল এবং এটাই ভূমিবন্টনের পক্ষে সাধারণ বড় যুক্তি। বহু পেশাদার অর্থনীতিবিদও এ ধরনের যুক্তি সমর্থন করে থাকেন। তৃতীয় বিশ্বের শিল্পপতিদের কেউ কেউ ভূমি সংস্কারকে কৃষিউৎপাদনে অধিকতর

সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন এবং ধরে নেয়া হয় যে, কৃষি ও অন্যান্য খাতে খাদ্যশস্য ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য এর ফলে হ্রাস পাবে, যা তাদের মুনাফা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে। তারা কোনক্রমেই ভূমি সংস্কারকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসম সম্পর্ক ও অবস্থা দূরীকরণের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন না।

ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব

যে ভূমিব্যবস্থায় ভূমির মালিকানা স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেখানে জমির পুনর্বণ্টন সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের জন্য যে শুধু জীবিকা ও কর্মসংস্থানের সুযোগই সৃষ্টি করে তাই নয়, এর ফলে তাদের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতার বাস্তব ভিত্তিও তৈরি হয়ে থাকে। কেননা এর ফলে তারা জমি লাভ করে ও সম্পদ অর্জন করে এবং তাদের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য হ্রাস পায়, যা তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ঐক্য গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাদের দীর্ঘমেয়াদি ঐক্য যৌথখামার চালু, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ এবং আদর্শ উৎপাদন ইউনিট গঠন ইত্যাদি বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হয়, যা সংস্কারপূর্ব কৃষিকাঠামোতে অর্জন করা সম্ভবপর নয়। এই স্বল্পমেয়াদি সহযোগিতার পরিবেশকে স্বেচ্ছাক্রিয় শ্রমঘন কাজের মাধ্যমে অবকাঠামোর সার্বিক উন্নয়নে ব্যবহার করা সম্ভব, যেমন :

ক. চাষাবাদে, বিশেষকরে ফসলের মওসুমে, কৃষকদের মধ্যে সহযোগিতা এবং শ্রমবিনিময় ;

খ. সংযোগ-রাস্তা, সেচ-খাল, জলাধার এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপযোগী অবকাঠামো বিনির্মাণ ;

গ. মাছের চাষ, জলসেচ এবং নৌচলাচলের জন্য মজাপুকুর, মরানদী ও খাল পুনঃখনন ;

ঘ. সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড।

যেসব দেশ ঔপনিবেশিক, নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে মূলধন সংস্থান করতে অক্ষম হয়েছে, কিন্তু অধিকতর উৎপাদন এবং 'স্বনির্ভরতা' অর্থাৎ বৈদেশিক সাহায্য ও বেসরকারি বিদেশী বিনিয়োগের উপর ন্যূনতম নির্ভরতা এবং শুধুমাত্র সমশর্তে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূলধন সৃষ্টি করতে আগ্রহী, সেসব দেশের জন্য এই কৌশল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের খাজনা এবং রাজস্ব হ্রাস করা হলে তারা অধিকতর উৎপাদনে উৎসাহী হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোন কোন ভাগচাষ ব্যবসাতে মোট উৎপাদনের ৫০ শতাংশ ভূমিমালিকেরা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে উৎপাদনব্যয় ভাগাভাগি করা হয় না।

ফলে দেখা যায়, একজন ভাগচাষী আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করে জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ভূমিমালিকের চেয়ে কম উৎসাহী হয়, কেননা যদিও উপকরণের অধিকতর ব্যবহার করে সে যে বাড়তি উৎপাদন করবে তার অংশ মালিককে দিতে হবে, উৎপাদনব্যয়ের বর্ধিত অংশটুকু তাকে একাই বহন করতে হবে। তবু যদি ভোগ্যদ্রব্যের অভাবের চাপে এবং জমি থেকে উৎখাত হওয়ার ভয়ে সে উৎপাদন বাড়াতে সচেষ্ট হয়, তাহলে সেই বর্ধিত উৎপাদন হবে তার অতিরিক্ত নিজস্ব শ্রম বিনিয়োগের ফসল। অনুরূপভাবে, যখন খাজনা ফসলের বদলে টাকায় দেয়ার ব্যবস্থা থাকে এবং খাজনা ও রাজস্ব প্রদানের সময় এবং এদের কিস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অধিকতর নমনীয়তার সুযোগ থাকে, তখন এবং সেক্ষেত্রে অত্যধিক খাজনা আদায় এবং আদায়কারীর স্বেচ্ছাচারিতা হ্রাস পায় এবং একই কারণে অধিকতর উৎপাদন ও বিনিয়োগে কৃষকদের উৎসাহ ও উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায়।

কৃষিতে মধ্যস্বত্বভোগীর খাজনা আদায় ব্যবস্থার অবসান হলে জমির প্রকৃত মালিকরা চাষাবাদের ঝুঁকি এবং দায়িত্ব নিতে উদ্যোগী হয়। এর ফলে ব্যক্তির স্থলে সমষ্টির হাতে কৃষি-উদ্বৃত্ত জমা হয় এবং সেই সাথে এর সামাজিক ব্যবহারের পরিধিও বেড়ে যায়। ভূমির উপর প্রকৃত চাষীদের স্থায়ী স্বত্বাধিকার তাদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করে, যা দীর্ঘমেয়াদে কৃষিউৎপাদন ও বিনিয়োগবৃদ্ধির সহায়ক হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি ভূমিখণ্ডের একত্রীকরণ এবং কৃষিসমবায় গঠন করা হলে ফসল কাটার যন্ত্র, ট্রাক্টর, বিদ্যুৎচালিত পাম্প, সেচের জল, কীটনাশক যন্ত্র এসব উন্নততর উৎপাদন-উপকরণের ব্যবহারের ফলে অধিকতর উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে বর্তমানে পাম্প মেশিনের দ্বারা কম জমিতে জলসেচের কারণ হলো জমির খণ্ডিত অবস্থান। জমি একত্রীকরণের অর্থ হচ্ছে, সীমানানির্দেশক সনাতন আলব্যবস্থার অবসানের মাধ্যমে জমি পুনরুদ্ধার এবং যেসব দেশে ভূমি-ব্যক্তি অনুপাত প্রতিকূল, সেসব দেশের জন্য এরকম ব্যবস্থা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। অন্যদিকে, জমির বিক্ষিপ্ত অবস্থান চাষাবাদে অদক্ষতা ও অসুবিধার সৃষ্টি করে এবং এর ফলে উৎপাদনব্যয়ও অনেক বৃদ্ধি পায়।

ভূমি পুনর্বণ্টন ও খাজনা হ্রাস অধিকতর উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ বাড়াতে পারে যদি সংস্কারপূর্ব ভূমিকাঠামোর সাথে যুক্ত ভূস্বামীরা অপচয়জনিত ভোগ, ফটকা ব্যবসা, চড়া সুদের কারবার এবং জমিক্রয়ের মতো উৎপাদনবিরোধী কর্মকাণ্ড সামাজিকভাবে পরিত্যাগ করে।

বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশে ভূমি হচ্ছে উৎপাদনের প্রধান উপাদান। তা ছাড়া ভূমি সামাজিক মর্যাদারও উৎস। ফলত ভূমিবণ্টন এবং ভূমিস্বত্বের সংস্কার সমাজে

বিদ্যমান রাজনৈতিক ক্ষমতার সমীকরণ এবং আদর্শগত আধিপত্য এবং চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র পরিবর্তনে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করতে পারে। এর অর্থ হলো, পরিবর্তিত রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় নতুন নীতিমালা গ্রহণ করবে এবং নতুন কাঠামো গড়ে তুলবে। যেহেতু সংস্কারোত্তর সমাজের প্রবল শ্রেণীগুলি হবে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী এবং যেহেতু এরা পূর্বতন প্রবল শ্রেণীগুলির তুলনায় অধিকতর উৎপাদনক্ষম, সেহেতু এসব নীতি ও প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের গতি বৃদ্ধি করবে এবং একই সাথে সামাজিক উৎপাদনে অধিকতর সমতাপূর্ণ বণ্টন নিশ্চিত করবে।

ভূমি সংস্কারের প্রক্রিয়া

ভূমি সংস্কার প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত পদক্ষেপসমূহ হলো (ক) ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে এবং পরে রাজনৈতিক দল কর্তৃক ভূমি সংস্কার নীতি ঘোষণা, (খ) সংসদীয় আইন, অর্ডিন্যান্স, রেগুলেশন্‌স ইত্যাদি আকারে অধিকতর সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন এবং (গ) ভূমি সংস্কার কার্যকর করার জন্য এর বাস্তবায়নকাল, বাস্তবায়নকৌশল, বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া সম্পর্কিত নীতিকাঠামো সুনির্দিষ্টকরণ।

এমন ক্ষেত্রে একদিকে ভূমি সংস্কারের মতাদর্শ এবং অন্যদিকে ভূমি সংস্কার কর্মসূচির মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করা প্রয়োজন।[২] কেননা এমনও হতে পারে, যখন ভূমি সংস্কারের মতাদর্শ হয় বাহ্যত ভূস্বামীবিরোধী ও কৃষকদের স্বার্থের অনুকূল, তখন ভূমি সংস্কার কর্মসূচি হয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিপরীতে ধনী কৃষক এমনকি ভূস্বামীদের স্বার্থের পক্ষে। মিরডালের ভাষায়, "ভূমিতে ভূস্বামীদের স্বত্বাধিকার বা ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা—এ দুই অবস্থার যে-কোনটির চেয়ে খারাপ হচ্ছে সেটি, যেখানে কৃষকদের হাতে জমি দেয়ার মতো বৈপ্লবিক কর্মসূচি রয়েছে কিন্তু সেই কর্মসূচি বাস্তবায়নের আইনগত দিক খুবই দুর্বল ও অকার্যকর। কেননা, এরকম পরিস্থিতিতে ভূমিমালিকানার রূপ সম্বন্ধে সৃষ্টি হয় এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।"[৩] মিরডাল যা বলেন নি, অথচ বাস্তবে যা ঘটে, তা হচ্ছে, এমনি পরিস্থিতিতে কৃষকদের জন্য ভূস্বামীদের চেয়ে অধিকতর না হলেও তাদের মতোই এক অনিশ্চিত ও নিরাপত্তাহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

---

২. P C Joshi, *Land Reform and Agrarian Change in India and Pakistan Since 1947*, (Delhi 1970), 11-12.

৩. G. Myrdal, Address to the Second Plenary Meeting, *Report of World Land Reform* , (1966), 66

উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার ভূমিব্যবস্থা এবং পরবর্তী সংস্কার

বাংলাদেশের ভূমি সংস্কারের একটি সঠিক চিত্র তুলে ধরতে হলে উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার কৃষিকাঠামো কিরকম ছিল সর্বাগ্রে তা আলোচনা করা প্রয়োজন। বাংলায় বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে তাত্ত্বিকভাবে জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে অর্পিত থাকলেও জমির প্রকৃত দখলিস্বত্ব ছিল সাধারণ চাষীদের হাতে।[৪] বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বৃটিশ সরকার ১৭৯৩ সালে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে। এই নতুন ব্যবস্থাধীনে ইংল্যান্ডের অনুকরণে ভূমি ব্যবস্থাপনা, হস্তান্তর এবং ইচ্ছামতো ইজারা দেবার অধিকারসহ ভূমির মালিকানা জমিদারদের হাতে অর্পণ করা হয়। কৃষকরা তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব হারিয়ে বৃটিশ কর্তৃক সৃষ্ট জমিদারদের অধীনস্থ প্রজায় পরিণত হয়। এই কৃষকদের কাছ থেকে আদায়কৃত রাজস্বের নয়-দশমাংশ জমিদারদেরকে রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা দিতে হতো। কিন্তু রাষ্ট্রকে তারা একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারের পরিবর্তে একটি স্থির অঙ্কের অর্থ প্রদান করতো, যার ফলে ভবিষ্যতে জমিদারির মূল্য যাই হোক না কেন (মূল্যবৃদ্ধি ছিল অবধারিত, কেননা জমিদারির সাথে বিরাট বন এবং চাষাবাদযোগ্য বিস্তৃত পতিত জমিও জমিদারদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল), জমিদাররা স্থায়ীভাবে ধার্যকৃত অঙ্কের অর্থ প্রদান করার শর্তে বংশ পরম্পরায় তাদের জমিদারি ভোগ করতে পারতো। প্রজাদের উপর নিপীড়ন করার ব্যাপক ক্ষমতাও জমিদারদের ছিল।[৫]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পিছনে বৃটিশদের দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। রাজনৈতিকভাবে বৃটিশ শাসন ছিল এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে নিপতিত এবং তাদের প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক মিত্রের। এই রাজস্ব আদায়কারী শ্রেণীকে কোম্পানি একটি স্থানীয় শক্তিশালী গোষ্ঠী হিসেবে তৈরি করতে চেয়েছিল, যারা স্থায়ীভাবে ভারতে বৃটিশ স্বার্থের সাথে সংযুক্ত থাকবে। অর্থনৈতিকভাবে প্রথমদিককার বৃটিশ শাসন (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি) বাংলার অর্থনীতির ভিত্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। ফলে তাদের প্রয়োজন ছিল এমন একটি শ্রেণীর সৃষ্টি করা, যারা বর্ষশেষে বৃটিশদের নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করে যাবে।[৬] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বৃটিশরা জমিদারি ব্যবস্থা (অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) সমগ্র ভারতব্যাপী প্রবর্তন করে নি। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক সুবিধা এবং স্থানীয় অবস্থাই তাদের প্রধান বিবেচ্য

৪. R Mukherjee, *Land Problem in India,* (Calcutta 1933), 16.

৫. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Sirajul Islam, *Permanent Settlement in Bengal. A Study of its Operation, 1790-1819,* (Dhaka 1978)

৬. Bipan Chandra, *The Rise and Growth of Economic Nationalism in India,* (New Delhi 1966), 456 66

ছিল। যেমন, দক্ষিণ ভারতে তারা 'রায়তওয়ারি' ব্যবস্থার প্রবর্তন করে, যে ব্যবস্থায় জমিদার শ্রেণী সৃষ্টির পরিবর্তে জমির বন্দোবস্ত সরকারি রাজস্ব কর্মকর্তাদের দ্বারা চাষীদের দেয়া হয়। অন্যদিকে, উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের অনেক অঞ্চলে 'মহলওয়ারি' ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এর অর্থ হলো জমির বন্দোবস্ত গ্রামের ব্যক্তি-চাষীদের মধ্যে না দিয়ে সমগ্র গ্রামীণ সম্প্রদায়কে দেয়া। এ ব্যবস্থায় গ্রামীণ সম্প্রদায়কে সমষ্টিগতভাবে (মোড়লের মাধ্যমে) জমির রাজস্ব প্রদান করতে হতো। এ ধরনের ব্যবস্থা মূলত যেসব এলাকায় গ্রামসংগঠন বিশেষভাবে শক্তিশালী ছিল এবং যেখানে জমির সম্প্রদায়গত মালিকানার দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল, সেসব এলাকায় প্রবর্তন করা হয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সাধারণভাবে বাংলার অর্থনীতি এবং বিশেষকরে বাঙালি কৃষকশ্রেণীর জন্য একটি ভয়ানক ক্ষতিকর ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত হয়। এর দ্বারা সৃষ্ট কৃষিকাঠামোর বৈশিষ্ট্যসমূহকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যায় :

ক. ফসলের অবস্থা নির্বিশেষে অত্যধিক খাজনা আরোপ (যেমন আবওয়াব, অবৈধভাবে খাজনা আদায়, ঘন ঘন কৃষকদের দেয় খাজনা বৃদ্ধি ইত্যাদি) এবং তা আদায়ে জবরদস্তিমূলক পন্থা অবলম্বন;

খ. চরম অসম ভূমিমালিকানা ব্যবস্থা;

গ. উৎপাদন ও বিনিয়োগের ঝুঁকি ও দায়িত্ব থেকে মুক্ত অনুপস্থিত ভূস্বামী-ব্যবস্থা ;

ঘ. জমিদার এবং প্রকৃত চাষীর মধ্যে বিভিন্ন স্তর ও ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীর অবস্থান :

ঙ. নিরাপত্তাহীন প্রজাস্বত্ব (অর্থাৎ দখলহীন রায়ত, নিম্ন-রায়ত এবং বর্গাদার);

চ. চাষীদের উপর অর্থনীতির নিয়মবহির্ভূত চাপ;

ছ. চরম সুদখোর মহাজন এবং ব্যবসায়ীদের হাতে কৃষকদের অতি সহজে শোষিত হওয়ার অবস্থা বিরাজ করা।[৭]

অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও বণ্টনের উপর এধরনের একটি কৃষিকাঠামোর অনিষ্টকর প্রভাব সম্পর্কে এখানে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই।[৮] অধিকন্তু, সম্পত্তি সম্পর্কিত এই নতুন আইনের সমগুরুত্বপূর্ণ আরেকটি দিকও ছিল। জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জমিদার শ্রেণী তাদের অনর্জিত সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে দেশের মধ্যে বৃটিশ শাসন সুদৃঢ়করণে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। এই অবস্থা আবার অন্যদিকে অসম বাণিজ্য, ভারতে বিনিয়োগকৃত বৃটিশ পুঁজির মুনাফা পাচার, লন্ডনে ভারতসচিবের অফিস পরিচালনার জন্য

---

৭. কামাল সিদ্দিকী, *বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, (ঢাকা ১৯৮১), ২২-২৩।

৮. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Sirajul Islam, *Bengal Land Tenure*, (Calcutta 1988).

ব্যয়িতব্য অর্থের যোগান এবং ভারতে নিযুক্ত বৃটিশ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, আয় ও সঞ্চয় থেকে কর্তন ইত্যাদি উপায়ে বৃটিশ কর্তৃক ভারতে অব্যাহত লুণ্ঠনের প্রকৃত ভিত্তি তৈরি করে।[৯] বস্তুত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বাংলায় কৃষকসম্পর্কের মাঝে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়, যার ফলে অনেক আন্দোলন দেখা দিতে থাকে এবং এসব আন্দোলন ক্রমান্বয়ে অধিকতর সংগঠিত জঙ্গি রূপ লাভ করে। এ ধরনের আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো, উনিশ শতকের প্রথমভাগের ওহাবী এবং ফরায়জী আন্দোলন ১৮৫০ দশকের নীল বিদ্রোহ, ১৮৭২-৭৩ সালের পাবনা এবং বগুড়া বিদ্রোহ প্রভৃতি। কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় বক্তব্যের প্রাধান্য থাকলেও এসব আন্দোলন ছিল মূলত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরূপ প্রভাব, জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে (যা কার্যত বৃটিশবিরোধীও) কৃষক-অসন্তোষেরই বহিঃপ্রকাশ। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, পরবর্তীকালে ভূমি সম্পর্কিত যে কতিপয় আইন পাশ করা হয়েছিল সেগুলো ছিল প্রধানত ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ শান্ত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রচেষ্টারই অংশবিশেষ।[১০]

১৭৯৩ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা এবং ন্যায্য খাজনা এই দ্বিবিধ বিষয় নিশ্চিত করার ব্যাপারে ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন, ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন ইত্যাদির মাধ্যমে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।[১১] কিন্তু জমিদার শ্রেণীর চাপের মুখে এসব পদক্ষেপ প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং কদাচিৎ কৃষক শ্রেণীর উপকারে আসে। ১৯৩৮ সালে ফজলুল হক সরকার স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে একটি ভূমিরাজস্ব কমিশন নিয়োগ করে। কমিশন ১৯৪০ সালে পেশকৃত এর রিপোর্টে ক্ষতিপূরণসহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থের বিলোপ এবং বিদ্যমান ভাগচাষ ব্যবস্থার উন্নয়নের সুপারিশ করে। কিন্তু পরবর্তী সাত বছর বিভিন্ন কারণে, যেমন, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে জটিল ও তিক্ত রাজনৈতিক সম্পর্ক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, 'ভারত ছাড়' আন্দোলন এবং এধরনের অন্যান্য ঘটনার জন্য এ রিপোর্ট কার্যকর করা সম্ভব হয় নি।

এদিকে ১৯৪৬-৪৭ সালের 'তেভাগা আন্দোলনের' পটভূমিতে বঙ্গীয় সরকার 'বঙ্গীয় বর্গাদার নিয়ন্ত্রণ বিল, ১৯৪৭' নামে একটি বিল উত্থাপন করে, যা ফসলের উপর

৯. Bipan Chandra. *Economic Nationalism in India*

১০. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, (কলকাতা ১৯৭২)।

১১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Sirajul Islam, *Rent and Raiyat: Society and Economy of Eastern Bengal, 1859-1928*, (Dhaka 1989)

ভাগচাষীর অর্ধেকের পরিবর্তে দুই-তৃতীয়াংশ এবং আরো অধিক সুবিধাজনক প্রজাস্বত্ব অনুমোদন করে। কিন্তু আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লে এ উদ্যোগও শেষ পর্যন্ত অকার্যকর থেকে যায়।[১২]

বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক পটভূমি

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির পর মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলায় প্রথম সরকার গঠন করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও অন্যান্যদের নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্টের কাছে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পর রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হলে সরকারের পক্ষে কোন সংস্কার সাধন করাও সম্ভব হয় নি। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়। যদিও ১৯৬২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়, তবুও ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত স্বৈরাচারী কায়দায় পূর্ব বাংলা শাসিত হতে থাকে। অভ্যুত্থানের পর দেশে আবার সামরিক আইন জারি হয় এবং এর পরে সংঘটিত হয় '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ।

উল্লেখযোগ্য ভূমি সংস্কার : ১৯৪৭-উত্তরকালে

১৯৪৭ সাল থেকে বাংলাদেশে অন্তত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমি সংস্কার আইন প্রণীত হয়। এগুলি হচ্ছে—

ক. পূর্ব বাংলা জমিদারি দখল এবং প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০;

খ. ১৯৭২ সালে ঘোষিত রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন ভূমি সংস্কার আদেশ;

গ. বাংলাদেশ ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪।

পূর্ব বাংলা জমিদারি দখল এবং প্রজাস্বত্ব আইনের পশ্চাতে দু'টি আশু বিবেচ্য দিক ছিল : (১) এ পর্যন্ত ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন সম্ভবপর না হওয়া এবং ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলার আইনসভায় উপস্থাপিত জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব বিল এবং বর্গাদার বিল শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত না হওয়া; (২) পাকিস্তান সৃষ্টির পর জনগণের মধ্যে ব্যাপক আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় ভূমি সংস্কারের অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। তাই ভূমি সংস্কারের পক্ষে কিছু

S. K. Sen, *Agrarian Struggle in Bengal* (1946-47), (New Delhi 1942); D. N. Dhanagare, "Peasant Protest and Politics, The Tebhaga Movement in Bengal (1946-47)", *Journal of Peasant Studies*, London, 3.3, (April 1976), 360-78.

সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা তাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। ফলে, ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলা সরকার আইনসভায় 'পূর্ব বাংলা জমিদারি দখল এবং প্রজাস্বত্ব বিল' উপস্থাপন করেন। ১৯৫০ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছর ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা এবং সংশোধনীর পর পূর্ব বাংলা আইন পরিষদে বিলটি আইনে পরিণত হয়। এ আইনের প্রধান শর্তসমূহ নিম্নরূপ :

ক. রাষ্ট্র কর্তৃক জমিতে সব ধরনের খাজনা আদায়কারী স্বার্থের বিলোপ করা হবে, যাতে জমির প্রকৃত চাষীরা সরকারের প্রত্যক্ষ প্রজায় পরিণত হয়। সকল রায়তকে (এখন থেকে 'মালিক' নামে আখ্যাত) তাদের পছন্দ মতো জমির ব্যবহার নিশ্চিত করতে জমির উপর উত্তরাধিকার এবং হস্তান্তরের অধিকার প্রদান করা হবে।[১৩]

খ. ভবিষ্যতে জমি ভাড়া দেওয়া নিষিদ্ধ করা হবে। তবে ভাগচাষকে ভাড়া হিসেবে বিবেচনা না করে মজুরি-শ্রমের মাধ্যমে চাষের সমতুল্য গণ্য করা হবে। অন্যকথায়, উল্লিখিত 'বর্গাদার বিলে'র মাধ্যমে ভাগচাষীদের যে রকম সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল এ আইন ঠিক তদ্রূপ সুবিধাই প্রদান করবে।

গ. পরিবারপ্রতি ৩৩.৩ একরের অধিক চাষযোগ্য জমি দখল রোধ করা হবে। কিন্তু বৃক্ষ রোপণ, বাগান, ফলচাষ, শক্তিচালিত বৃহৎ খামার এবং বৃহদাকারের দুগ্ধখামারের ক্ষেত্রে এই সর্বোচ্চ সীমা শিথিল করা হবে। অধিকৃত অতিরিক্ত জমি তিন একরের কম জমির মালিক প্রকৃত চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

ঘ. মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (ওয়াকফুল লিল্লাহ ও ওয়াকফুল আওলাদ) এবং হিন্দুদের দেবোত্তর সম্পত্তির ক্ষেত্রে খাজনা গ্রহণকারী সম্পত্তিকে সরকারি অধিগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য রক্ষিত ধর্মীয় সম্পত্তির (ওয়াকফুল আওলাদ) ক্ষেত্রে ১২৫ একর পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণ করা হবে না, তবে যেখানে এরকম সম্পত্তি জনসাধারণের কল্যাণে (অর্থাৎ 'ওয়াকফুল লিল্লাহ') ব্যবহৃত হয়, সেখানে কোন সর্বোচ্চ সীমা থাকবে না।

ঙ. খাজনা আদায়কারী স্বার্থ অধিগ্রহণ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক পর্যায়ক্রমিকভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত ধর্মীয় সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে ঐ সম্পত্তি থেকে অর্জিত বার্ষিক প্রকৃত আয়ের সমতুল্য অর্থ স্থায়ীভাবে প্রতি বছর প্রদানের নীতি গৃহীত হবে। কিন্তু ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্টকৃত ধর্মীয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের হার অন্যান্য সাধারণ সম্পত্তির মতো হবে।

চ. রাষ্ট্র কর্তৃক 'অতিরিক্ত' জমি অধিগ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে ঐ জমি থেকে অর্জিত বাৎসরিক প্রকৃত আয়ের ৫ গুণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান থাকবে। পূর্বের মতো সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে ব্যবহৃত ধর্মীয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে বাৎসরিক প্রকৃত লাভের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে স্থায়ীভাবে প্রতি বছর প্রদান করার নিয়ম থাকবে। অন্যদিকে ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের হার সাধারণ সম্পত্তির মতো হবে।

---

১৩ Government of East Pakistan, *Report of the Land Revenue Commission*, (Dhaka 1959).

ছ. ক্ষতিপূরণ নগদ টাকায় অথবা ঋণপত্রে অথবা উভয় উপায়ে পরিশোধ করার ব্যবস্থা থাকবে। ঋণপত্র হবে অ-হস্তান্তরযোগ্য এবং সর্বোচ্চ চল্লিশটি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য এবং এর জন্য শতকরা ৩ ভাগ হারে সুদ আদায় করা হবে।

জ. জমির সর্বোচ্চ খাজনা বাৎসরিক মোট উৎপাদনের এক দশমাংশের অধিক হবে না। উৎপাদনের পরিমাণ নির্বিশেষে বাৎসরিক ফসল-খাজনা যা ময়মনসিংহে প্রচলিত এবং 'টংক' নামে খ্যাত, তা বাতিল হবে। কার্যত এর অর্থ হলো, ফসল-খাজনার পরিমাণ উৎপাদনেব অর্ধেকের বেশি হবে না।

ঝ. 'মজুবিহীন শ্রম' ব্যবস্থা, যা সিলেটে 'নানকার' নামে পরিচিত, তা বিলোপ করা হবে। এ ব্যবস্থাধীনে জমিদারদের জমি ব্যবহার করার বিনিময়ে নানকারদের জমিদাবকে বেগার শ্রম প্রদান করতে হতো।

ঞ. গ্রামের দুই-তৃতীয়াংশ লোক যারা গ্রামের তিন-চতুর্থাংশ আবাদি জমির মালিক, তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক গ্রামেব সমস্ত জোত একত্রীকরণের বিধান কবা হবে।

ট. কোন জোতকে এমনভাবে খণ্ডিত করা যাবে না, যার কোন অংশেরই খাজনা এক টাকার কম।

ঠ. জমিব হস্তান্তর শুধুমাত্র প্রকৃত কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ে ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়। এ সময় জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেক বেশি এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনী জনসভা এবং দলীয় মেনিফেস্টোতে আওয়ামী লীগ জনগণের সম্মুখে অনেক উদার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। সুতরাং নতুন সরকার ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত রাষ্ট্রপতির কতিপয় আদেশ ঘোষণা করে। এসবের মাধ্যমে পরিবারপ্রতি জমির সর্বোচ্চ সীমা পুনরায় ১ শত বিঘায় (৩৩.৩ একর) নামিয়ে আনা, ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বণ্টন, ২৫ বিঘা (৮.৩ একর) পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, নতুন জেগে উঠা চরের দখল লাভের ক্ষেত্রে কৃষকদের দেয়া পূর্বের কতিপয় অধিকার সরকারের হাতে ফিরিয়ে নেয়া, 'সায়ের মহলের' সরকারি খাস জমির (যেমন হাট-বাজার, জলাশয়, ফেরিঘাট, ছোট ছোট খনি ইত্যাদি) 'ইজারাদারি' বিলোপ এবং শোষণমূলক শর্তে কৃষিজমি বন্ধক রাখা নিষিদ্ধ করা হবে বলে স্থির হয়।

বাংলাদেশ ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর আওতায় ১৯৮৪ সালে তৃতীয় দফা ভূমি সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। এরশাদ সরকারের ক্ষমতা দখলের অব্যবহিত পরে ১৯৮২ সালে প্রথম ভূমি সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। এক্ষেত্রে সরকারের দু'টি আশু বাধ্যবাধকতা ছিল : (১) একটি নির্বাচিত বৈধ সরকারকে উচ্ছেদ করে জারিকৃত সামরিক শাসনকে বৈধতার প্রলেপ দান এবং (২) দাতাদের পক্ষ থেকে অন্তত ন্যূনতম ভূমি সংস্কারের জন্য অব্যাহত চাপ।

ভূমি সংস্কার কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রণীত এই অধ্যাদেশের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

ক. পরিবারপ্রতি বিদ্যমান জমির সর্বোচ্চ সীমা কমানো হবে না। তবে যেসব পরিবারের ৬০ বিঘা (২০ একর) পর্যন্ত জমি রয়েছে তারা আর নতুন জমির মালিক হতে পারবে না।

খ. জমির উপর ভাগচাষীর স্বত্বাধিকার স্বীকৃত হয়। ভাগচাষী জমির মালিকের সাথে ৫ বৎসর মেয়াদি একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ হারে বর্গাদার ও জমির মালিক লাভ করবে, বাকি এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদনের ব্যয়ভার বহনের আনুপাতিক হারে বর্গাদার ও মালিকের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

গ. 'বেনামী' মালিকানাকে অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়।

ঘ. কৃষিশ্রমিকের ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ৩.৫ কিলোগ্রাম চাউল অথবা এর সমমূল্যের নগদ অর্থ স্থির হয়।

ঙ. কাউকে তার বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না বলে ঘোষণা করা হয়।

চ একমাত্র ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে খাসজমি বণ্টনের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।[১৪]

'৪৭-উত্তর ভূমি সংস্কার আইনসমূহের প্রভাব

'৪৭-উত্তর ভূমি সংস্কার আইনগুলি যদি আদৌ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে, তবে দুর্ভাগ্যবশত তা হয়েছে আংশিকভাবে। প্রতিবারই দেখা গেছে বাস্তব অবস্থার প্রকৃত প্রয়োজন এবং প্রণীত ভূমি সংস্কার আইনের মধ্যে একটি বিরাট ব্যবধান। মূল আইনেও অনেক দুর্বল দিক ছিল, যেমন প্রথমত ভূমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে নতুন করে 'পরিবার'কে সংজ্ঞায়িত করা হয়। দ্বিতীয়ত পরবর্তীকালের সংশোধনীর মাধ্যমে আইনের কোন কোন ধারাকে গুরুত্বহীন এমনকি সম্পূর্ণ উল্টো করে দেয়া হয়। এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হলো ১৯৬১ সালে পরিবারপ্রতি জমির সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘা থেকে ৩৭৫ বিঘায় উন্নীতকরণ। শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়ন কর্মকৌশল ও কাঠামোর অভাবে সমাজের একেবারে নিম্নস্তর পর্যন্ত প্রণীত ভূমি সংস্কার আইন খুব কমই বাস্তবায়িত হয়েছে।

সুতরাং, প্রকৃত অর্থে ভূমি সংস্কার আইনসমূহের দ্বারা কেবল নিম্নোক্ত বিষয়গুলিই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে —

ক. জমিদারি ব্যবস্থা এবং মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থের বিলোপ সাধন;

খ. খুবই সামান্য পরিমাণ খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন;

১৪. Kamal Siddiqui, *Land Reforms and Land Management in Bangladesh and West Bengal A Comparative Study*, (Dhaka 1988)

গ. অধিক সংখ্যক কর্মকর্তার নিয়োগ নিশ্চিত করে ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস এবং একটি স্বতন্ত্র ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠন।

'৪৭-উত্তর বিভিন্ন ভূমি সংস্কার কর্মসূচির ফলাফল

ক. ব্যক্তি জমিদারদের স্থলে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাধীনে এক বিশেষ ধরনের জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সাধারণভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় ব্যাপক অদক্ষতা, দুর্নীতি এবং দৈনন্দিন ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ভূমি-কর্মকর্তাদের দ্বারা সাধারণ জনগণকে হয়রানি। অধিকন্তু, জমিদারি ব্যবস্থা চালু থাকাকালীন সময়ে অত্যাচারী জমিদাররাও সাধারণ কৃষকদের প্রতি যে রকম ব্যক্তিগত আগ্রহ ও দায়িত্বের পরিচয় দিত তা থেকেও এসব কৃষক বঞ্চিত হয়।

খ. ভূমি সংস্কারের পদক্ষেপসমূহ গ্রামাঞ্চলের ক্রমাবনতিশীল ভূমি-ব্যক্তি সম্পর্ক রোধ করতে ব্যর্থ হয় যার ফলে দেখা দেয় ব্যাপক ভূমিহীনতা (যেখানে ভূমিই উৎপাদনের প্রধান উপায় সেখানে গ্রামের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ লোকই ভূমিহীন হয়), বর্গাচাষী ও মজুরি-শ্রমিকের দরকষাকষির ক্ষেত্রে অধিকতর ক্ষমতাহীনতা, চরম সুদখো১'র মহাজন, ফটকা ব্যবসায়ী এবং সরকারি কৃষি কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি এবং মাথাপিছু উৎপাদন ও উৎপাদিকা শক্তির শ্লথ প্রবৃদ্ধি।

গ. ভূমির উপর একচেটিয়া মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগে গ্রামের ধনিক শ্রেণী মজুরিশ্রমিক, বর্গাচাষী, প্রান্তিক চাষী এবং ঋণগ্রস্তদের তাদের উপর আরো নির্ভরশীল করে তোলে। এই অবস্থা আবার ধনিক শ্রেণীকে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে গ্রাম এলাকায় সহজেই রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে।

সংক্ষেপে, ভূমি সংস্কার সত্ত্বেও ভূমি-ব্যক্তি সম্পর্কের প্রধান দ্বন্দ্ব সেই অবস্থায়ই রয়ে গেছে, যেমনটি ছিল ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করার পর। অর্থাৎ, যারা প্রকৃতই কৃষিউৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত, তারা সাধারণভাবে মালিকানা ও জমির উপর নিয়ন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত হয় এবং যারা জমির মালিক এবং ভূমিনিয়ন্ত্রণক্ষমতা চর্চা করে থাকে, তারা উৎপাদনের ঝুঁকি এবং দায়িত্ব থেকে দূরে অবস্থান নেয়। অবশ্যই এ সমস্যার একটি বৈজ্ঞানিক সমাধান ছাড়া বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থায় উৎপাদন এবং বণ্টন সমতার দ্বৈত সমস্যা নিরসন সম্ভব নয়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি

রেহমান সোবহান*

পরিধি

এ অধ্যায়ে ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সে সময় পূর্ব বাংলার বাঙালিরা পাকিস্তানের নাগরিক ছিল। তবে এটা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে, বাঙালি জাতীয় চেতনার বিকাশের ইতিহাস পূর্ববর্তী আরো কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ পর্যায়ে অর্থনৈতিক বঞ্চনার অনুভূতি বাঙালিদের চেতনায় সংক্রমিত হতে শুরু করে। এ চেতনার প্রাথমিক অভিব্যক্তি ঘটে পাকিস্তানের জন্য বাঙালি মুসলমানদের সংগ্রামের মাধ্যমে। পূর্ব বাংলার জনমন থেকে আপেক্ষিক বঞ্চনার অনুভূতি দূর করতে পাকিস্তান সরকার ব্যর্থ হয় এবং এ ব্যর্থতা ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের শক্তিগুলোকে জোরদার করে তোলে এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটাতে সহায়তা করে। এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তির বিভিন্ন দিক। কাজেই এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রাক-১৯৪৭ কালপর্ব সম্পর্কে মাত্র ভাসাভাসাভাবেই আলোচনা করা হবে।

এ কথা বলা যায় যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলে ছিল আপেক্ষিক অর্থনৈতিক বঞ্চনার অনুভূতি। পূর্ব বাংলার বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসন অর্জনের সংগ্রাম এ বিশ্বাসকে ভিত্তি করে অগ্রসর হয় যে, বাঙালিদেরকে নিজেদের অর্থনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা না দেয়াতেই অঞ্চলটি আপেক্ষিক বঞ্চনার শিকার হয়েছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বাঙালিদের ক্ষমতার হিস্যা

ফেলো, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

পাওয়ার এবং পূর্ব বাংলা অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন লাভের লড়াইকে ঘিরে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে পাকিস্তানে যে একটি সম্মিলিত জাতিরাষ্ট্র গড়ে উঠে নি তার কারণ ছিল বাঙালিদেরকে ক্ষমতার অংশ প্রদান কিংবা স্বায়ত্তশাসন দানে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর অস্বীকৃতি। ক্ষমতা বহুল পরিমাণে পশ্চিম পাকিস্তানে রেখে দেয়ার এ বাধ্যবাধকতার উদ্ভব হয় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদ বিলিবণ্টনের উপর নিয়ন্ত্রণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে ন্যস্ত থাকার ফলে। পাকিস্তানে রাজনৈতিক ক্ষমতার এ বাস্তবতা এবং ক্ষমতার চাবিকাঠি হাতে না পাওয়ায় বঞ্চনার প্রতিকারে অপারগতাজনিত হতাশা বাঙালিদের মনে সদাজাগ্রত ছিল। এটাই তাদের বঞ্চনাবোধকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তোলে।

বর্তমান অধ্যায়টি ছয়টি অংশে বিভক্ত। সূচনায় রয়েছে বঞ্চনা ও জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত কিছু ধারণাগত বিষয়ের উপর আলোচনা। দ্বিতীয় অংশে পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালিদের অংশগ্রহণের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে রয়েছে ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে বঞ্চনা যে আকার ধারণ করে তার বস্তুগত মাত্রা বা পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা। বাঙালিদের মধ্যে বঞ্চনার অনুভূতি তীব্রতর করে তোলার ব্যাপারে পাকিস্তান রাষ্ট্র ও তার নীতিসমূহ কি ভূমিকা পালন করেছে তা-ই চতুর্থ অংশের আলোচ্য বিষয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতাবাদী মনোভাব কিভাবে প্রভাববিস্তার করেছে এবং তা বাঙালিদের বঞ্চনার অনুভূতিকে কিভাবে প্রবলতর করেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে পঞ্চম অংশে। বাঙালিদের এ বঞ্চনাবোধ দূরীকরণে পাকিস্তান সরকারের ব্যর্থতা রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামকে কতটুকু ত্বরান্বিত করেছে সেটা আলোচিত হয়েছে ষষ্ঠ ও শেষ অংশে।

ধারণাগত বিষয়সমূহ

জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে জাতীয়তাবাদ কথাটা দ্বারা কি বোঝাতে চাই সেটাই আগে উপলব্ধি করতে হবে। এ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জাতীয়তাবাদকে ভৌগোলিকভাবে সীমাবদ্ধ একটি স্থানে বসবাসরত একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর জাতীয় পরিচয়ের অনুভূতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। অনুরূপ জনগোষ্ঠীকে অবশ্যই চিন্তাচেতনা, সমৃদ্ধি, গোষ্ঠীগত ক্রিয়াকলাপ, সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া, নিজ ভূখণ্ডের সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নিজেদেরকে অপর জনগোষ্ঠীগুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখতে হবে। এ রকম সংজ্ঞায়নে স্পষ্টত অনেক দুর্বলতা রয়েছে, যেহেতু গোষ্ঠীগত চেতনা বা অনুভূতি উপরে বর্ণিত সকল বিষয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। একটা জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিকভাবে সমপ্রকৃতির হলেও তার মধ্যে জাতি, বর্ণ, গোত্র, ধর্ম ও পৃথক সামাজিক শ্রেণী থেকে উদ্ভূত অসঙ্গতি থাকা সম্ভব। একটি ভূখণ্ডের অন্তর্গত অঞ্চলসমূহের মধ্যেও অসঙ্গতি থাকতে পারে, যা গ্রামকে গ্রাম থেকে, জেলাকে জেলা

থেকে, কিংবা প্রদেশকে প্রদেশ থেকে বিভক্ত করতে পারে। একটি জাতিসত্তা অপর জনগোষ্ঠীর তুলনায় পণ্যসম্পদ, সরকারি চাকুরি, উৎপাদনী সম্পদ, উৎপাদনের উপায়সমূহ নিয়ন্ত্রণ, নীতিনির্ধারণ ও বন্টনপ্রক্রিয়ায় কতটুকু পরিমাণে হস্তক্ষেপ করতে পারে বা করার ক্ষমতা রাখে তা থেকেই বঞ্চনার ধারণা সৃষ্টি হয়। কাজেই জাতীয় একত্ববোধ হচ্ছে একটি জনগোষ্ঠী অপর জনগোষ্ঠীর তুলনায় কতটা বঞ্চিত হচ্ছে সেটা নিরূপণের অনেক উপায়ের অন্যতম।

পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালিদের অংশগ্রহণের অর্থনৈতিক ভিত্তি

বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নিরূপণ

এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য যেহেতু জাতীয়তাবাদের তত্ত্বীয় বিষয়ে নতুন কিছু সংযোজন নয়, সুতরাং আমরা কেবল আমাদের ধারণাগত সমস্যাটিকে বাংলাদেশের ইতিহাসের মধ্যেই সীমিত রাখতে চাই। বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক আন্তসম্পর্কগুলোর দিকে তাকাতে গেলে বাংলাদেশের বাংলাভাষী জনগণের ইতিহাস এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরার বাংলাভাষী জনগণের ইতিহাসকে এর অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হবে। আসলে কিন্তু এ অঞ্চলের বাংলাভাষী মুসলিমরা একটি পৃথক জাতীয় পরিচিতির দাবি তুলেছিল, যা তাদেরকে বিভাগপূর্ব (প্রাক-১৯৪৭) ভারতের মুসলিম জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে স্থান করে দেয়। তবে রাজনৈতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য বাঙালি মুসলিমদের জাতীয় পরিচিতির একটা স্থানগত ভিত্তির দরকার ছিল। গোড়ার দিকে বাংলা ও আসামকে নিয়ে এ ভিত্তি গঠিত বলে মনে করা হতো। ভারতবিভাগের প্রাক্কালে এখানে মুসলিমরা ছিল সংখ্যাগুরু।[১] প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতার ভিত্তি হিসেবে তৎকালীন শাসক বৃটিশ সরকারের তৈরি ১৯৪৬-এর কেবিনেট মিশন পরিকল্পনায় এরকমই অনুমান করা হয়েছিল।[২] ঐ পরিকল্পনায় উত্তর-পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর-পূর্ব ভারতে তিনটি উপরাষ্ট্রের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং কেন্দ্রের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, জাতীয় যোগাযোগব্যবস্থা ও কিছু অর্থনৈতিক বিষয়ে যৎসামান্য ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়েছিল।

কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় এবং মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকাগুলোকে নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতবিভাগের ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অবস্থায় মুসলিম বাঙালি জাতীয়তাবাদ তার ভূখণ্ডগত সীমানা নতুনভাবে নির্ধারণ করে, যার মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশ ও আসামের

১. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936-1947*, (Dhaka 1987).

২. H. V. Hodson, *The Great Divide*, (London 1969).

মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকা পড়ে।[৩] প্রস্তাবিত ভূখণ্ডে মুসলিম বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতো। মুসলিম বাঙালি জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত আবাসস্থল হিসেবে বাংলা ও আসামের মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকাগুলোর 'কীটদষ্ট ও খণ্ডিত' পাকিস্তানে যোগদানের চিন্তাটা মেনে নেয়া হয় একমাত্র তখনই, যখন কংগ্রেস হাইকমান্ড ঐক্যবদ্ধ ও সার্বভৌম বাংলার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গোটা সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও রাজধানী লাহোরসহ পাঞ্জাবের সেরা অংশগুলো নিয়ে গঠিত পশ্চিম পাকিস্তানের কথা চিন্তা করে 'কীটদষ্ট ও খণ্ডিত' পাকিস্তানের কথা বলেন নি। তিনি তখন ভাবছিলেন বাংলার কথা, যা তার রাজধানী হারিয়েছে, ভারতের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চলগুলোর অন্যতম সমৃদ্ধ শিল্পএলাকাটি ও ভারতের বৃহত্তর নৌ-বন্দরগুলোর অন্যতম প্রধান নৌ-বন্দরটি হারিয়েছে এবং বাংলার অনগ্রসর কৃষিপ্রধান পশ্চাৎভূমি আর আসামের চা-উৎপাদনকারী জেলা সিলেটকে পাকিস্তানে নিয়ে এসেছে। পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে অভিব্যক্তি ঘটেছিল তাকে এভাবে শেষপর্যন্ত র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ কর্তৃক পুনর্নির্ধারিত সীমানায় পূর্ব বাংলা ও সিলেটের অন্তর্গত ভূখণ্ডে ধর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হিসেবে নিজের জাতীয় পরিচিতি তুলে ধরতে হয়। এ সীমানার মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে স্বীকার করে নিতে হয় বিপুল সংখ্যক অমুসলিমকে, যারা ছিল ভারত ও বাংলা ভাগের সময় পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার ২০%।[৪] ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎস যা-ই থাকুক না কেন, ঐ তারিখের পরে বাঙালি জাতীয়তাবাদ কেবল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ভূভাগের জাতীয়তাবাদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। জাতীয়তাবাদের এ সংজ্ঞার মধ্যে অমুসলিমরাও অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগ—ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত লোকেরা সংজ্ঞায়নের দরুন নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাক্রমে বাদ পড়ে যায়। আমাদের জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আর বর্তমান বাংলাদেশের গারোপাহাড় এলাকার স্বল্প সংখ্যক অবাঙালি উপজাতিগুলোর অবস্থান অস্পষ্ট থেকে যায়।

অর্থনৈতিক বঞ্চনা

এ অধ্যায়ে জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নিরূপণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের কিছু প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে যেহেতু এতে বাংলার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বঞ্চনার চেহারা তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সাধারণভাবে পূর্ব বাংলার জনগণ এবং বিশেষত বাঙালি মুসলিমরা কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা ও হিন্দু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের তুলনায় নিজেদেরকে বঞ্চিত বোধ করতো। ঐ বঞ্চনার মূলে ছিল এ সত্য যে, পশ্চিম বাংলা ছিল পূর্ব বাংলার চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। পূর্ব বাংলাতেও মুসলিমরা অনুভব করতো যে, অর্থনৈতিক জীবনে তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য নেই, সেখানে রয়েছে অপর

---

৩. Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*

৪. Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration*, (USA 1972), Table 11 7

সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য। ভূমির মালিকানা ছিল প্রধানত হিন্দু জমিদারদের হাতে। মুসলিমরা ছিল হিন্দু জমিদারদের রায়ত কিম্বা ক্ষুদ্র চাষী। মধ্যবর্তী আর্থিক কায়-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গ্রামীণ শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রধানত বাঙালি হিন্দুদের হাতে এবং কোনো কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যের উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ ছিল মাড়োয়ারিদের হাতে। পুঁজিবাদী শিল্প বলতে যা-কিছু ছিল তার মালিকানা ছিল বৃটিশদের হাতে। যেমন, সিলেটের চা-শিল্প এবং পূর্ব বাংলার নদীপথে সংযোগ রক্ষাকারী যান্ত্রিক নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা; কয়েকটি কাপড়ের কল ও একটি চিনিকল নিয়ে যে সামান্য আধুনিক পণ্যউৎপাদনশিল্প গড়ে উঠে তার মালিক ছিল বাঙালি হিন্দুরা। শহরাঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যও তারাই নিয়ন্ত্রণ করতো। আমলাতন্ত্র, শিক্ষকতা ও আইন ব্যবসাতেও তাদেরই প্রাধান্য ছিল। পূর্ব বাংলার সামাজিক স্তরবিন্যাসের এ প্রক্রিয়াটি তুলে ধরা হচ্ছে তথ্য হিসেবে বাঙালি মুসলমানদের নিজেদেরকে একটি বঞ্চিত শ্রেণী হিসেবে দেখার যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের জন্য। এ গ্রন্থের অন্যান্য অধ্যায় প্রাক-১৯৪৭ পূর্ব বাংলার সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে অধিকতর সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদানে সক্ষম হবে এবং সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত অধ্যায়সমূহে লক্ষ্য করা যাবে যে, ১৯৪৭ সাল নাগাদ বাংলায় একটি মধ্যস্বত্বভোগী মুসলিম জোতদার শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে আর সরকারি চাকুরিতে মুসলিম বাঙালিদের অনুপাত পদমর্যাদার দিক থেকে না হোক, অন্তত সংখ্যার দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে।[৫]

বাঙালি মুসলমানরা এমন একটা শাসনব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হতে চাচ্ছিল, যেখানে তারা রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তারা আশা করছিল ভূমিস্বত্বলাভের, রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে শিক্ষা, সরকারি চাকুরি ও বিভিন্ন পেশায় নিজেদেরকে এগিয়ে নেয়ার, পূর্ব বাংলায় শিল্পের অবকাঠামো গড়ে তোলার এবং এ অঞ্চলে শিল্পায়ন ঘটাবার। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে বাঙালি মুসলিম উদ্যোগের অস্তিত্ব কার্যত ছিল না বলে তারা আশা করছিল যে, সম্পদ সংগ্রহ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া এবং কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের দুটো কাজ রাষ্ট্রই শুরু করবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল উদ্যোক্তা হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে যে দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তার জন্য মুসলিম জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বাধিক জোর দেয়। ভারতের মুসলিমরা ধর্মের ভিত্তিতে তাদের জাতীয় পরিচয় বেছে নিয়েছিল বলে তাদের পক্ষে জাতীয় ক্ষমতার কেবল এমন একটা কাঠামোই কল্পনা করা সম্ভব ছিল, যেখানে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের প্রাধান্য নেই। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও পেশাসমূহে হিন্দু প্রাধান্য থাকায় রাষ্ট্রশক্তির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করার উপায় হিসেবে দেখা হতো। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা ভারতের শ্রেণী, জাতি, বর্ণ অথবা ভূখণ্ডগত বৈষম্যগুলোর প্রতি খুব সামান্যই নজর দিয়েছে। ভারতের উত্তর-

৫. Ahmad Kamal, "The Decline of the Muslim League and the Ascendancy of the Bureaucracy in East Pakistan, 1947-54", Ph D Thesis, (Australian National University, Canberra 1989)

পশ্চিমাংশে মুসলিমরা রাজনৈতিকভাবে প্রবল ছিল এবং অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত ছিল না। সেখানকার মুসলিম সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীকে ভারতের অপরাপর অংশের সংখ্যালঘু মুসলিমদের বা আপেক্ষিকভাবে বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ বাংলার মুসলিমদের সাথে এক নৌকায় তুলে দেয়া হয়। অথচ তখনকার পরিস্থিতিতে একজন বাঙালি প্রজা বা রায়তের পরিপ্রেক্ষিত আর পাঞ্জাবের নুন-তিওয়ানা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের উপজাতি সর্দার ও সিন্ধুর ওয়াদেরা বা অভিজাত ভূস্বামীদের পরিপ্রেক্ষিত ছিল কিছুটা ভিন্ন। বাঙালি প্রজা আইন পরিষদের নির্বাচনে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল তার দৈনন্দিন জীবনের উপর থেকে হিন্দু জমিদার-মহাজনদের কর্তৃত্ব অপসারণের জন্য। পক্ষান্তরে পাঞ্জাবের নুন-তিওয়ানা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের উপজাতীয় সর্দার এবং সিন্ধুর ওয়াদেরা ভূস্বামীরা চেয়েছিল হিন্দু প্রাধান্যযুক্ত কেন্দ্রের অনধিকারমূলক হস্তক্ষেপ থেকে তাদের প্রাদেশিক ক্ষমতাকাঠামোর প্রাধান্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক ক্ষমতা।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিম ভূস্বামী ও পূর্ব বাংলার কৃষকরা এমন একটা রাষ্ট্র চেয়েছিল, যা তাদেরকে স্ব স্ব অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিচালনার সুযোগ এনে দেবে। এক্ষেত্রে পাকিস্তান আন্দোলন তাদেরকে জাতীয় ক্ষমতা না হোক, অন্তত স্থানীয় ক্ষমতা দখলের জন্য হাত মেলাবার একটা সুবিধা এনে দেয়। ভারতের মুসলিমদের স্বাধীন জাতীয় ক্ষমতালাভের সংগ্রামের উদ্ভব ঘটেছিল নিজস্ব বিষয়াদি পরিচালনার জন্য যথাযথ রাজনৈতিক স্বাধিকার নিশ্চিতকরণে মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলির ব্যর্থতা থেকে। কিন্তু বাংলার মুসলিমদের জন্য এ স্বায়ত্তশাসনক্ষমতার লক্ষ্য ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক প্রাধান্য খর্ব করে নিজেদের অর্থনৈতিক বঞ্চনার অবসান ঘটানো। লাহোর প্রস্তাবে দু'টি স্বতন্ত্র মুসলিম সংখ্যাগুরু রাষ্ট্রের কথা বলা হয়। কাজেই প্রস্তাবটি ছিল পরিকল্পিত অথবা আকস্মিকভাবে ভারতের এ দুটো অঞ্চলের[৬] মুসলিমদের উদ্বেগের ফসল।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ব বাংলার বাঙালিরা যে রাষ্ট্রটির উত্তরাধিকার লাভ করে তার অংশীদার হয় উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিমরা এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু সংখ্যক লোকসহ ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলো থেকে আগত উদ্বাস্তুরা। নতুন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে এ উদ্বাস্তু নাগরিকরা ভারতের নানা অঞ্চল ও পটভূমি থেকে এসে পাকিস্তানে প্রবেশ করে। যেসব সামাজিক শক্তিকে নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়, সেগুলোর মধ্যে বাঙালিদের উচ্চাভিলাষী প্রত্যাশা ছিল সর্বাধিক। ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোতে এবং দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন পেশা ও কারিগরি বৃত্তির ক্ষেত্রে মুসলিমদের বেশ ভালো অবস্থান ছিল। হিন্দিভাষী উত্তরাঞ্চলে মুসলিমরা ছিল প্রধান শ্রেণী ভূস্বামী ও পেশাজীবীদের অংশ। তাদের মাতৃভাষা উর্দু ছিল এ অঞ্চলের উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের মিলিত মাতৃভাষা।

—

৬. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh*

এভাবে দেখা গেল যে, যেসব জনগোষ্ঠী পাকিস্তান পেলো, তাদের মধ্যে পূর্ব বাংলার বাঙালিরাই কেবল পর্যায়ক্রমে উত্তর ভারতের মুগল ও তাদের অনুচরদের, বৃটিশ শাসকদের ও হিন্দু জমিদারদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্বের শিকার হয়েছিল। সুতরাং পূর্ব বাংলার পশ্চাৎপদতা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সম্পদের উপর এ অঞ্চলের জনগণের নিয়ন্ত্রণ না থাকার সাথে সম্পর্কিত। পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে স্বায়ত্তশাসন লাভের আন্দোলনের দিকে দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করে। এটা পূর্ব বাংলার বাঙালিদের চেতনার মধ্যে স্থায়ীভাবে কাজ করতে থাকে। কাজেই এ প্রক্রিয়াটিকে কয়েকটি পৃথক পৃথক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে দেখা উচিত হবে না।

বাঙালিদের অর্থনৈতিক বঞ্চনা

কতিপয় ধারণাগত প্রশ্ন

অর্থনৈতিক বঞ্চনাকে চূড়ান্ত ও আপেক্ষিক উভয়ভাবেই দেখা যেতে পারে। দারিদ্র্যপীড়িত কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনার পরিমাপ সুনিশ্চিতভাবে করা যায় সে কতো ক্যালোরিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পারে বা কতো কম জিনিসপত্র, মালামাল ইত্যাদি তার আছে সেটা বিবেচনা করে। অপরাপর ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা ভূখণ্ডের সম্পদ ও সুবিধাদির বিচারে বঞ্চনা আপেক্ষিকও হতে পারে। বাঙালিদের জন্য একটি জাতীয় পরিচিতি নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে বঞ্চনা প্রসঙ্গে বলতে গেলে আমাদেরকে একটি মিলিত জাতীয় আবাসস্থলে বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও অঞ্চলের কথা বিবেচনায় রেখে বিষয়টার প্রতি নজর দিতে হবে। বিশ্লেষণে আমরা উৎপাদনশীল উপায়উপকরণ, অস্থাবর সম্পত্তি ও চাকুরির উপর অধিকার বা কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে বঞ্চনার পরিমাপ করবো। এসব বঞ্চনা দেশীয় ও বৈদেশিক সম্পদের উপর কর্তৃত্ব এবং শেষপর্যন্ত নীতিনির্ধারণপ্রক্রিয়ার উপর কর্তৃত্বের ব্যাপারে বিদ্যমান বঞ্চনার সাথে সম্পর্কিত হবে।

এ পরিচ্ছেদে পূর্ব বাংলা (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) ও সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করে এর আপেক্ষিকতার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা হবে। এটা করা হবে প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানের অঞ্চলসমূহ ও পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ)-এর মধ্যে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্যের আলোকে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে উৎপাদনী সম্পদের বিন্যাসের প্রতিও অবশ্য দৃষ্টিপাত করা হবে। এটা গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু বাঙালিদের ঐতিহাসিকভাবে অনুভূত আপেক্ষিক বঞ্চনাবোধের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান ছিল স্থানীয় অর্থনীতির উপর বাইরের লোকদের কর্তৃত্ব।

আঞ্চলিক হিসাবে পৃথকীকরণ

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অদ্ভুত ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারটি পৃথকীকরণের ধারণাকে অধিকতর পরিমেয় করে তোলে। দু'টি আঞ্চলিক অর্থনীতিকে দু'টি স্বতন্ত্র

অর্থনীতিরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে উঠে।[৭] তা সম্ভব হয় প্রতিটি অঞ্চলের জি. ডি. পি. ও জি. এন. পি, সঞ্চয়বিনিয়োগ, শ্রম ও পুঁজির আন্তঃআঞ্চলিক গতিবিধির মোটামুটি হিসাব নির্ধারণ, বাণিজ্য ও প্রদত্ত অর্থের স্বতন্ত্র মূল্যহারের পৃথক ব্যালেন্স প্রস্তুতকরণ এবং বাজেটের মাধ্যমে ও বৈদেশিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ ও ব্যয়ের আলাদা হিসাব প্রণয়নে।

সমস্যা দেখা দেয় কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিসমূহের খরচ ও সুবিধাদির হিসাব নির্ধারণের সময়। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সংগৃহীত রাজস্বের হিসাব রাজস্ব সংগ্রহের আঞ্চলিক উৎসগুলো থেকে সব সময় পাওয়া যেতো বটে, তবে পশ্চিম পাকিস্তানে সমিতিভুক্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর নিজ নিজ হেড অফিস থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে কর দেয়ার ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় না। আদমজী, বাওয়ানী, আমিন, দাউদ প্রভৃতি কতিপয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আয়ের একটি বড় অংশ আসতো পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে। অথচ তারা ট্যাক্স দিত পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত তাদের হেড অফিস থেকে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে, টেলিযোগাযোগ ও রেলওয়ের মতো খাতে অঞ্চলবিশেষকে সুনির্দিষ্ট সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়বরাদ্দ করা যথেষ্ট সহজ ছিল। কেন্দ্রীয় প্রশাসন, বৈদেশিক সার্ভিসসমূহ ও প্রতিরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যয় প্রধানত কর্মচারী ও দপ্তরসমূহের জন্য হলেও এবং এসব বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বৃহত্তর অংশ পশ্চিম পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও এসব বিভাগের বা সার্ভিসের চাকুরিতে পাকিস্তানের উভয় অংশের লোকদের সম অধিকার রয়েছে বলে গণ্য করা হতো, এবং এসব ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য ব্যয় নির্দিষ্ট করে দেয়া সম্ভব নয় বলে মনে করা হতো। বাঙালি অর্থনীতিবিদরা দৃঢ়ভাবে এ অবস্থার বিরোধিতা করেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, প্রতিরক্ষা ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সুফলসমূহ যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানই পায়, সেহেতু এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে একটা যথাযথ অংশ বা হার অনুযায়ী ঐ সব ব্যয় ভাগ করা উচিত।

কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও অর্থবরাদ্দের সিদ্ধান্তগুলোর মাধ্যমে এটাও দেখা যায় যে, বিভিন্ন সার্ভিসের চাকুরির সুফলও পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানই অনেক বেশি ভোগ করে। ঐ সব সুফল পক্ষপাতহীনভাবে বণ্টন করা হচ্ছে বলে মেনে নিতে বাঙালিরা সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের এরকম

৭. Rehman Sobhan, "How to build Pakistan into a well-knit Nation", *Paper* Presented at a Conference conveyed by the Pakistan Bureau of National Integration in Lahore in September 1961 (mimeo). The concept of two economy was discussed by the conference of Bengali Economists on the First Five Years Plan, held in Dhaka in 1956, and by a number of other Bengali economists such as the late Dr A Sadeque, Director, Bureau of Statistics and the late Dr Habibur Rahman of the Pakistan Planning Commission.

'অবরাদ্দযোগ্য' সম্পদ বণ্টনের পরিমাপ করতে গিয়ে বাঙালি অর্থনীতিবিদরা দেখেন যে, চাকুরি এবং কেন্দ্রীয় ব্যয় অন্যায়ভাবে অঞ্চলবিশেষে চলে গেছে।[৮]

এসব দাবি ও অভিযোগের তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদ ও অর্থের বেশিরভাগ কোথায় যায় সেটার হিসাব নেয়াটা সম্ভব করে দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের আপেক্ষিক বঞ্চনার ধারণাকে এটা পরিমাণগতভাবে কিছুটা নিখুঁত করে তোলে। আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে এমন অপরাপর দেশে পূর্ব পাকিস্তানের আপেক্ষিক বঞ্চনার মতো ব্যাপার এতোটা চট করে নজরে পড়ে না। কেবল আঞ্চলিক বৈষম্যের পরিমাপই নয়, বছরের পর বছর ধরে এর গতিধারার নকশা তৈরি ও ব্যাখ্যা করার সুযোগ ও ক্ষমতা অর্থনীতিবিদদের নাগালের মধ্যে থাকায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের হিসাব নিরূপণ

বৈষম্যের অতি সহজ প্রাপ্য পরিমাপটি আঞ্চলিক জি ডি পি ও মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাপের সাথে সম্পর্কিত। আঞ্চলিক মাথাপিছু আয় এবং আঞ্চলিক বৈষম্যের যেকোন সূচক হাতের কাছেই রয়েছে।[৯] এসব হিসাবের বেশিরভাগ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের জাতীয় আয় সংক্রান্ত হিসাব থেকে নেয়া উপাত্তসমূহের ভিত্তিতে প্রাপ্ত বলে বছরে বছরে বিভিন্ন উৎসের হিসাবে গরমিল দেখা যায়। এসব পরিসংখ্যানগত বিভিন্নতার কোনটা সঠিক বা কতটা সঠিক সে বিচারে না গিয়ে আমরা পাকিস্তানের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রণেতা অর্থনীতিবিদদের জন্য পেশকৃত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদদের দুটো পৃথক রিপোর্টে প্রদত্ত মাথাপিছু বৈষম্যের হিসাবকে কাজে লাগাতে পারি। তবে আঞ্চলিক অর্থনীতির বৈষম্যের পূর্ণতর বিবরণ দানের জন্য আমরা অন্যান্য উপাত্তের প্রতিও দৃষ্টিপাত করবো।

যেসব তথ্য-প্রমাণ রয়েছে তাতে দেখা যায়, ভারতবিভাগের সময় পাকিস্তানের দুই অংশ যে অর্থনীতির উত্তরাধিকারী হয় তাতে তাদের বিকাশের স্তরে কোন তাৎপর্যপূর্ণ বৈষম্য ছিল না।[১০] উভয় অঞ্চলের শিল্পভিত্তিই ছিল উপেক্ষণীয়।[১১] তবে পশ্চিম পাকিস্তান

৮. দেখুন, *Report of the Panel of Economists on the Fourth Five Year Plans*, Government of Pakistan, (Comments of E P Members)

৯. T M Khan and A Bergen, "Measurement of Structural Change in the Pakistan Economy: A Review of the National Income Estimates 1949-50 to 1963 64", *PDR*, Summer 1966, M Huq, *The Strategy of Economic Planning-A Case Study of Pakistan*, (Karachi 1963)

১০. ঐ।

১১. G Papanek, *Pakistan's Development—Social Goals and Private Incentives*, (Harvard University Press 1966)

রাস্তাঘাট, সেচব্যবস্থার সুবিধা ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি থেকে একটা উন্নততর অবকাঠামো লাভ করে।[১২] উভয় অংশের জি. ডি. পি. প্রায় সমানই ছিল।[১৩] দেশজাত উৎপন্নদ্রব্যের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জি ডি পি পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে সামান্য পরিমাণে বেশি এবং তা ১৯৫৩-৫৪ সাল পর্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকে।[১৪] তবে জি. ডি. পি.-এর অবরাদ্দযোগ্য অংশগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের সাথে যুক্ত করলে দেখা যায় যে, ১৯৪৯-৫০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের হিস্যা পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে সামান্য পরিমাণে বেশি ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের মাত্রা বেশি হবার কারণেই এটি ঘটে। ১৯৪৯-৫০ সালে জি. ডি. পি.-এর পশ্চিম পাকিস্তানী হিস্যা ছিল ৫০.৫%। ১৯৫৯-৬০ সাল নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানের হিস্যা বেড়ে ৫২.৫% শতাংশে দাঁড়ায়। এ ব্যবধান ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ আরো প্রসারিত হয়ে পাকিস্তানের জি. ডি. পি.-তে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ দাঁড়ায় ৫৭.৪%।[১৫]

কাঠামোগত পরিবর্তনে ভিন্নতা

এসব আঞ্চলিক বৈষম্য দেখিয়ে দেয় যে, ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৬৯-৭০-এর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জি. ডি. পি. পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে দ্রুততার সাথে বর্ধিত হয়।[১৬] পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের ১.৯%-এর তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধির হারের গড় ছিল ৩.৭%। ষাটের দশকে এ ব্যবধান আরো বেড়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের ৪.৩%-এর তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৬.৪%-এ।

পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির এ দ্রুততর বিকাশের হার পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির সাথে তুলনায় উচ্চতর হারে বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বৈচিত্র্য আনয়নের ফল। ১৯৫১-৫২ ও ১৯৫৯-৬০ সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক আয়ের ক্ষেত্রে শিল্পের হিস্যা ৭% থেকে ১০%-এ উন্নীত হয়।[১৭] একই সময়ে শিল্পখাতের মধ্যে বৃহৎশিল্পের হিস্যা দাঁড়ায় ৪১% থেকে ৭২%। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৫% থেকে ৪৩%। পাকিস্তানের উভয় অংশে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ এভাবেই ঘটেছিল। ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোৎপাদন ৩২

---

১২. World Bank, *Bangladesh Development in a Rural Economy*, 3 Vol., (Washington D C 1974)

১৩. Khan and Bergen, "Measurement of Structrul Change".

১৪. দেখুন, *Reports of the Economists on the Fourth Five Year Plans*, Government of Pakistan, (Comments of W P Member)

১৫. প্রাগুক্ত।

১৬. ঐ।

১৭. Huq, *Strategy of Economic Planning*

কোটি থেকে ৬৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তা বৃদ্ধি পায় ৮৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা থেকে ১৮০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকায়।[১৮] এ থেকেই বোঝা যায় যে, শিল্পের বিকাশ পাকিস্তানের উভয় অংশে ঘটলেও পঞ্চাশের দশকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ব্যবধান অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে যায়।

পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনীতির দ্রুততর উন্নতি ও কাঠামোগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি ষাটের দশকেও অনুরূপ বৈষম্যকে স্থায়ী রাখার পরিবেশ তৈরি করে।

এ একই সময়ের মধ্যে ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানের জি. ডি. পি.-তে শিল্পের হিস্যা ১৬%-এ বর্ধিত হয়, পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে তা বৃদ্ধি পায় ৮.৯%।[১৯]

সারণি ১ : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য (টাকার অঙ্কে)

সন	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান (২-১)	বৈষম্য	বৈষম্যের অনুপাত (২-১) $\left(\frac{২-১}{২}\right)$ স১০০
১৯৪৯/৫০	২৮৮	৩৫১	৬৩	২১.৯
১৯৫৪/৫৫	২৯৪	৩৬৫	৭১	২৪.১
১৯৫৯/৬০	২৭৭	৩৬৭	৯০	৩২.৫
১৯৬৪/৬৫	৩০৩	৪৪০	১৩৭	৪৫.২
১৯৬৯/৭০	৩৩১	৫৩৩	২০২	৬১.০

উৎস : সারণি ১.১ ও ১.২। পাকিস্তানের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপর অর্থনীতিবিদদের প্যানেলের *রিপোর্ট* (পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদদের রিপোর্ট)।

রপ্তানি খাতে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, ১৯৫৫-৬০ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পাকিস্তানের মোট রপ্তানিবাণিজ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৮.৬% ভাগ।[২০] ১৯৬০-৬৫ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানির হিস্যা ৪০.৫%-এ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৫-৭০ সালের তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক রপ্তানির পরিমাণ পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানির পরিমাণকে অতিক্রম করে ৫০.২%-এ দাঁড়ায়।

১৮. Akhlaqur Rahman, *Partition, Integration, Economic Growth and Interregional Trade*, (Karachi 1963)

১৯. Khan and Bergen. "Measurement of Structural Change," Table 3.1

২০. World Bank. *Bangladesh Development*

পূর্ব পাকিস্তান রপ্তানির ক্ষেত্রে শুধু যে পশ্চিম পাকিস্তানকে স্থান ছেড়ে দিচ্ছিল তা-ই নয়, এর রপ্তানিকাঠামো গোটা পাকিস্তানী শাসনামলে অত্যধিক পরিমাণে পাটনির্ভর থেকে যায়। ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৮-৫৯ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মোট আন্তর্জাতিক ও আন্তঃআঞ্চলিক রপ্তানিবাণিজ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির হিস্যা ছিল ৭৬.১০ শতাংশ।[২১] ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে পাটের উপর পূর্ব পাকিস্তানের নির্ভরশীলতা সামান্য পরিমাণে হ্রাস পায় এবং মোট আঞ্চলিক রপ্তানির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা দাঁড়ায় ৬৯.৫ শতাংশ। প্রকৃতপক্ষে, গোড়ার দিকে বিদেশে পাকিস্তানের মোট রপ্তানির ক্ষেত্রে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির হিস্যা ছিল ৯০.৫ শতাংশ। আরো সাম্প্রতিককালে এটা ৯১.৪ শতাংশে দাঁড়ায়। পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানিকাঠামোর মধ্যে যে পরিবর্তন আনা হয় সেটা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানমুখী। পক্ষান্তরে, পশ্চিম পাকিস্তানে কাঁচা তুলা, সুতা ও সুতীবস্ত্রের উপর তার যে নির্ভরশীলতা ছিল সেটার অবসান ঘটে।[২২]

জীবনযাত্রামানের বৈষম্য

পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনীতির অধিকতর দ্রুত উন্নতি ও বহুমুখীকরণ অনিবার্যভাবে জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ১ নং সারণিতে মাথাপিছু আয়বৈষম্যের একটি মোটামুটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যাদিতে দেখা যায় যে, মাথাপিছু আয়ের বৈষম্যগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে চূড়ান্ত ও আপেক্ষিকভাবে বেড়ে যায় ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে। ১৯৫০-এর দশকে বৈষম্যের বৃদ্ধি ঘটে ৫০ শতাংশ এবং ১৯৬০-এর দশকে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। ১৯৫৯-৬০ সালে বৈষম্য ছিল ৩২.৫ শতাংশ, ১৯৬৯-৭০ সালে এটা দাঁড়ায় ৬১ শতাংশ।

তর্ক তোলা হয়েছে যে, এসব হিসাবে উচ্চহারের ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যকে কম করে দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, মাথাপিছু আয়ের হিসাব তৈরি করার সময় পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে টাকার আপেক্ষিক কম ক্রয়ক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনা করা হয় নি।[২৩] পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য চাল ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য গমের মূল্যের তারতম্য লক্ষ্য করলেই এ বৈষম্য বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তানের ক্যালোরিযুক্ত চালের দাম পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি পড়ে যায়। এ সত্যটি অনুভব করেন মাহবুবুল হক। ১৯৫৯-৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যখন এক টন চালের দাম ছিল ৫১৮ টাকা, তখন পশ্চিম পাকিস্তানে তার দাম ছিল ৩৩৪ টাকা। ঐ সময় এক টন গমের দাম ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ৫১৭ টাকা, পশ্চিম

২১. ঐ।

২২. *Pakistan Statistical Year Book (PSYB)*, 1968

২৩. Huq, *Strategy of Economic Planning:* Khan and Bergen, "Measurement of Structrul Change", A Ghafur, "A Comparison of Interregional Purchasing Power of Real Wages in Pakistan," *PDR*, Winter 1967

পাকিস্তানে ২৬৭ টাকা।[২৪] এ সত্যের ভিত্তিতে মাহবুবুল হক আঞ্চলিক মাথাপিছু আয়ের হিসাবটা নতুন করে তৈরি করেন। তাঁর হিসাব অনুযায়ী ১৯৫৯-৬০ সালে আঞ্চলিক মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে ৬০ শতাংশে দাঁড়ায়। জনাব হক দেখিয়েছেন যে, প্রচলিত পদ্ধতির হিসাবে এ বৈষম্যটা ৬০ শতাংশের স্থলে মাত্র ২৭ শতাংশ হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে এক মণ চালের দাম ছিল ৪২ টাকা ৩৭ পয়সা আর পশ্চিম পাকিস্তানে এক মণ গমের দাম ছিল ২২ টাকা। তখন যদি জনাব হকের পদ্ধতিতে হিসাব করা হতো, তাহলে বৈষম্য পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে বৃদ্ধি পেয়ে ৬১ শতাংশে পৌঁছতো।[২৫]

মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্যের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হয় বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য-সেবা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের ব্যাপারে বিরাজমান বৈষম্য। ২ নং সারণিতে আমরা ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে মূল ভোগ্যবস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈষম্যের প্রবণতা তুলে ধরেছি। প্রাপ্ত প্রমাণাদিতে দেখা যায় যে, কৃষিজাত দ্রব্যাদি ভোগের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে বৈষম্য তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়, যদিও অপরিশোধিত ও পরিশোধিত চিনির চাহিদা পশ্চিম পাকিস্তানে বেশি এবং কালক্রমে এ বৈষম্য বেড়ে চলে।

অত্যন্ত স্থূল বৈষম্য সৃষ্টি হয় কারখানাজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে। কাপড়, কাগজ, সিগারেট, দিয়াশলাই ও বিদ্যুৎশক্তির মাথাপিছু ব্যবহারের মাত্রা পশ্চিম পাকিস্তানে লক্ষণীয়ভাবে অনেক বেশি। এতে পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চতর হারে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি তথা শিল্পায়নের দ্রুততর গতি প্রতিফলিত হয়। এ বৈষম্য বছর বছর বেড়ে চলে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের গৃহস্থালির আয়-ব্যয় সংক্রান্ত জরিপ রিপোর্টে প্রাপ্ত মোটামুটি মাথাপিছু ভোগের প্রবণতাগুলোর দিকে তাকালে পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চতর হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও দ্রুততর গতিতে শিল্পায়ন সংক্রান্ত বক্তব্যটি আরো সুদৃঢ় হয়। ২ নং সারণিতে উল্লেখিত কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের জরিপে আমরা দেখি যে, ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি পায় ১৯৬০ ও ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে।

পণ্যদ্রব্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্যের অনুরূপ বৈষম্য দেখা দেয় জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানাদির সুযোগলাভের ক্ষেত্রে। ৩ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে যে, জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হাসপাতাল, মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণকেন্দ্র নির্মাণ, হাসপাতালের বেডসংখ্যা ও ডিসপেনসারির সংখ্যা এবং ডাক্তার ও নার্সদের সংখ্যার দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশি এটা মেনে নিলেও দেখা যায় যে, এ অঞ্চলের জনগণের জন্য চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায়

২৪ Huq *Strategy of Economic Planning*

২৫. *Pakistan Economic Survey (PES), 1969-70,* Table 38

অত্যন্ত কম এবং এ বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বছরের পর বছর ব্যাপী প্রায় কিছুই করা হয় নি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির অনুপাত ঐতিহ্যগতভাবে বেশি ছিল। কিন্তু ৩ নং সারণি ইঙ্গিত করে যে, ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৬ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষার সর্বস্তরে ছাত্রসংখ্যার অনুপাত বেশ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে মাইলের হিসাবে রাস্তা, রেলপথ, মোটরগাড়ি ও ব্যবহারাধীন রেডিওর সংখ্যা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে বেশি। তবে পরবর্তী বছরগুলোতে এসব বৈষম্য আরো ব্যাপক হয়। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে মাইলের হিসাবে রাস্তা ১০ গুণ বৃদ্ধি পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানে রাস্তার দৈর্ঘ্য তখনো ২০ হাজার মাইলের বেশি থেকে যায়। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের রাস্তায় ২ লক্ষের বেশি মোটরগাড়ি চলাচল করতে থাকে। এ বৈষম্য অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের নদীমাতৃক প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে। কিন্তু এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, পশ্চিম পাকিস্তানে মাইলের হিসেবে রাস্তা ও যানবাহন বৃদ্ধির তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের নদীপথের অনুরূপ সম্প্রসারণ ঘটে নি। স্থায়ীভাবে নাব্য নদীপথের মাইলের হিসাবে ১৯৫৯-৬০ সালে তা ছিল ২৬৬৮ মাইল এবং ১৯৬৯-৭০ সালে তা দাঁড়ায় ৩৩৫২ মাইল।[২৬]

বাঙালিদের বিশ্বাস জন্মে যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা ভাল খায়, ভাল পরে, উন্নততর স্বাস্থ্যপরিচর্যা ও শিক্ষালাভ করে, উন্নততর যানবাহন, টেলিযোগাযোগব্যবস্থা ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাসহ অধিকতর উন্নত পরিবেশে বাস করে। এ বিশ্বাস তাদের আপেক্ষিক বঞ্চনার ধারণাকে তীব্র করে। এমনি করে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানসমূহ অধিকাংশ বাঙালির এ বিশ্বাসকেই শুধু বদ্ধমূল করে যে, স্বাধীনতার সুযোগগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের লোকরাই অনেক বেশি পরিমাণে ভোগ করে।

বৈষম্য এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা

অঞ্চলসমূহের উত্তরাধিকার

পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক বিশ্বাস জন্মে যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের মূলে ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট নীতি ও বরাদ্দমূলক সিদ্ধান্তসমূহ। এ অভিমত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক কাঠামো, প্রাকৃতিক সম্পদ, ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা ও বাজারশক্তিগুলোর অবদানকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের উপর কিছু বেশি ক্ষমতা

২৬. প্রাগুক্ত

আরোপ করে। কাঠামোগত উত্তরাধিকার পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বিশেষভাবে অনুকূল ছিল না, যদিও রাস্তাঘাট, রেলপথ, সেচ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থাসহ তার ছিল একটা উন্নততর অবকাঠামো। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে বৃষ্টি হতো অনেক বেশি পরিমাণে, এখানকার জমি ছিল অধিকতর উর্বর এবং এখানে ছিল নদীপথে মালামাল ও যাত্রীপরিবহনের একটি বেশ উন্নত ব্যবস্থা। পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষিসম্ভাবনা পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল বলে বিশ্বাস করার কোন কারণই ছিল না, যদিও জনসংখ্যার দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তান নিঃসন্দেহে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। তবে পূর্ব পাকিস্তানের ভূমির উৎপাদনক্ষমতাও ছিল বেশি। শিল্পক্ষমতার দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের মতোই শোচনীয় ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে আর কিছু না থাকলেও একটি অনেক উন্নত গ্রামীণ শিল্পাঞ্চল ছিল। তাঁতশিল্প এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের একটা বড় অংশের বস্ত্রের যোগান দিতে পারতো।

শিক্ষাসম্পদের দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে নিকৃষ্ট ছিল না। শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের স্তর এখানে উৎকৃষ্টতর ছিল, যদিও পশ্চাৎপদতার মাত্রায় তেমন কোন ইতরবিশেষ ছিল না।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সামরিক বাহিনীসমূহে অফিসার-কর্মচারী, উচ্চ পদাধিকারী প্রশাসক, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের সংখ্যা ও অবস্থানের দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান সুস্পষ্টভাবে বেশি লাভবান হয়। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ছিল বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে লোকভর্তির গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে পাকিস্তান যে সশস্ত্র বাহিনীগুলো পায় সেগুলো ছিল প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়ে গঠিত, অনেকগুলো ক্যান্টনমেন্ট এবং অর্ডন্যান্স ডিপোর অবস্থানও ছিল সেখানে।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যবসায়ী শ্রেণী

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মানবিক সম্পদের মধ্যে ব্যবসায়ী-কারবারীরা ছিল অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। অবিভক্ত ভারতের ব্যবসাজগতে মুসলিম ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের স্থান ছিল অতি নগণ্য। এ নগণ্য অবস্থার কারণেই করাচীর হারুন, কলকাতার আদমজী-ইস্পাহানীদের মতো ব্যবসায়ী পরিবার পাকিস্তান সংগ্রামে মুসলিম লীগকে সমর্থন করে। স্যার আদমজী, হাজি দাউদ, মির্জা আহমদ ইস্পাহানী ও তাঁর ছোট ভাই হাসান ইস্পাহানী পর্যায়ক্রমে বাংলার মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।[২৭] এসব ব্যবসায়ী ছিলেন পশ্চিম ভারতের ইসমাঈলী, বোহ্‌রা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক। চিনিওটীরা এসেছিলেন পাঞ্জাব থেকে। ইরানী বংশোদ্ভূত ইস্পাহানীরা প্রধানত ব্যবসার কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং বাংলার মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার কাছ থেকে কিছু পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন।[২৮] কিন্তু তাঁরা ছিলেন

২৭. Harun-or Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*
২৮. ঐ।

অধিকতর শক্তিশালী হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রভাববলয়ের অধীন। হিন্দু ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রাধান্য ছিল শহরাঞ্চলের মাড়োয়ারি, গুজরাটী ও পার্সী গোত্রের লোকদের।

মুসলিম ব্যবসায়ীরা ভেবেছিলেন, পাকিস্তান হবে এমন একটি দেশ, যেখানে হিন্দুদের প্রতিযোগিতার হুমকি থাকবে না এবং যেখানে তারা বিনা প্রতিযোগিতায় পুঁজির প্রসার ঘটাতে পারবেন। পশ্চিম পাকিস্তানে রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে হিন্দু ও শিখরা দলে দলে দেশত্যাগ করলে ঐ অঞ্চলে একটা বড় রকমের ব্যবসা-বাণিজ্যিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়। তখন ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প বলতে যা-কিছু ছিল তা হিন্দু ও শিখরা নিয়ন্ত্রণ করতো। ওরা চলে যাওয়ায় ভারত থেকে আগত মুসলিম উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়ীরা এ শূন্যতা পূরণের আশা করেছিল। সুতরাং এসব পরিবারের অনেকেই যে দেশান্তরী হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। করাচী ছিল পশ্চিম ভারতে তাদের পিতৃভূমির কাছাকাছি এবং সংস্কৃতিগতভাবেও পাকিস্তানের ঐ অঞ্চলের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতর।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পূর্ব বাংলায়ও ঘটে। তবে এখানকার স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রভুত্বকারী হিন্দু ও মাড়োয়ারিরা এ অঞ্চল ত্যাগ করে চলে যাবার কোন প্রবল তাগিদ অনুভব না করায় এখানে পশ্চিম পাকিস্তানের মতো শূন্যতার সৃষ্টি হয় নি। এর ফলে ভারত থেকে উদ্বাস্তু ব্যবসায়ীরা এখানে আসতে উৎসাহবোধ করে নি। কিন্তু কলকাতাভিত্তিক ব্যবসায়ী পরিবার ঢাকায় এসে আস্তানা গাড়ার চেষ্টা করে। তবে তাদের মধ্যে একমাত্র ইস্পাহানীরা এবং চামড়ার কারবারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিনিওটী আমিন পরিবার ঢাকায় তাদের সদর দপ্তর স্থাপন করে।

বাজারশক্তিগুলোর ভূমিকা

উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের হাতে যে অসমঞ্জস কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হয়, তা উন্নয়নপ্রক্রিয়া শুরু করার ব্যাপারে বাজারশক্তিসমূহের সীমাবদ্ধতাকে আবারো প্রকটিত করে তোলে। এ কথা বারবার বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের বাজারের আকার বড় হওয়ায় সেখানে অর্থনৈতিক বিকাশে গতিসঞ্চার হয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ১৯৪৯-৫০ সালের জি ডিপি-এর হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের জি ডি পি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কিছুটা বেশি (পূর্ব পাকিস্তানে ১২৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে ১২০৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা)।[২৯] জিডিপি-এর আকারই প্রাথমিকভাবে বাজারের আকার স্থির করে। বাজারের সাথে যদি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের করাচীতে অবস্থান, তার নিরাপত্তা ও বেসামরিক খাতে ব্যয়, চাকুরি ইত্যাদিকে যুক্ত করি, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের বাজারসম্ভাবনা কিছু পরিমাণে বেশি দাঁড়ায় বৈকি।

২৯. Khan and Bergen, "Measurement of Structural Change" Table A-2.

তবে পূর্ব পাকিস্তান রপ্তানিআয়ের প্রধান উৎস থেকে যায়। ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৫৪-৫৫ সালের মধ্যে অর্জিত সকল বৈদেশিক মুদ্রার ৫১.৫% আসে পূর্ব পকিস্তানের রপ্তানি থেকে।[৩০]

এর বিপরীতে দেখা যায় যে, পাকিস্তানে গোড়ার দিকের বছরগুলোতে অনিয়ন্ত্রিত আমদানির সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান সকল আমদানির ৭০% গ্রাস করে। এতে দেখা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানিক্ষমতা বেশি।[৩১] তবে আমদানির চাহিদা গড়ে উঠে যতোটা না সমষ্টিগত চাহিদা থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি আয়ের বণ্টন থেকে। এভাবে মনে হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চতর আমদানিচাহিদাসম্পন্ন অধিকতর সচ্ছল মানুষের একটা বৃহত্তর শ্রেণী রয়েছে। তদুপরি, পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষাখাতে ক্রয়, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য ব্যয় এবং কেন্দ্রের করাচীতে অবস্থান—এগুলো আমদানিগ্রাসী। জনগণের চাহিদা, দাবি ও উন্নয়নের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে এভাবে ক্ষমতাকেন্দ্রের অবস্থান ও আয়ের ভিত্তিতে আমদানিচাহিদা নির্ধারিত হতে দেয়া ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান অর্জনকারী পূর্ব পাকিস্তান হলেও তার প্রধান ব্যবহারকারী হতে দেয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানকে।

তখন থেকে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, উদার আমদানির এ পর্যায় চলাকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পুঞ্জীভূত পাকিস্তানের স্টার্লিংউদ্বৃত্তের হিস্যা এবং তার বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় হ্রাস পায়। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার উপরও কিছুকাল ধরে ভয়ানক চাপ পড়ে এবং টাকার মূল্যমান বৃদ্ধি করতে হয়।

ঐ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে বসতিস্থাপনকারী উদ্বাস্তু বণিকশ্রেণী আমদানিবাণিজ্যের উপর একচেটিয়া দখল কায়েম করে এবং এ বাণিজ্য থেকে বিপুল মুনাফা অর্জন করে। এসব মুনাফাই পরে ১৯৫০-এর দশকে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়নে বীজ-পুঁজি যোগায়। শিল্পায়নের এ প্রক্রিয়াকে কঠোরভাবে আমদানিনিরোধ ও মুদ্রার বিনিময়হার বৃদ্ধির মাধ্যমে সংরক্ষণ দিয়ে জোরদার করে তোলা হয়।[৩২]

এটা সুস্পষ্ট যে, কিছুটা উন্নততর বাহ্যিক অবকাঠামো, কেন্দ্রীয় সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সদর দপ্তরের অবস্থিতি, পশ্চিম পাকিস্তানে বসতিস্থাপনের ইচ্ছা নিয়ে আগত উদ্বাস্তু পেশাজীবী ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের বৃহত্তর অংশের আকস্মিক উপস্থিতি ইত্যাদি ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তান উত্তরাধিকারসূত্রে কতিপয় নিশ্চিত সুবিধা লাভ করে। ১৯৪৯-

৩০. Akhlaqur Rahman, *Partition, Integration, Economic Growth.*

৩১. ঐ।

৩২. A R Khan, *The Economy of Bangladesh,* (London 1972)

৫২ কালপর্বে আমদানি উদারকরণের পর্যায়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে বিপুল পুজি সঞ্চিত হয়। ঐ পর্যায়ে পাকিস্তান যদি অবাধ অর্থনীতি গ্রহণ করতো, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তান হয়তো পূর্ব পাকিস্তান থেকে এগিয়ে যেতো। ক্রমবর্ধিষ্ণু কার্যকারণসম্বন্ধের নিয়ম এসব বৈষম্যকে স্পষ্টতর করে তুলতো।[৩৩]

কিন্তু পাকিস্তানের ইতিহাসের বাস্তবতা থেকে দেখা যায়, কোরীয় যুদ্ধের দরুন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার আকস্মিক অবসানের পরে বাজার নয়, বরং রাষ্ট্রই পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে কোথায় কি পরিমাণে সম্পদ বরাদ্দ ও অর্থনৈতিক তৎপরতা চলবে সেটাকে প্রভাবিত করার প্রধান নিয়ামক হয়ে উঠে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ সরাসরি রাষ্ট্রীয় নীতির এখতিয়ারে ছিল। বৈদেশিক মুদ্রা কেন্দ্র কর্তৃক বা প্রদেশ কর্তৃক বিতরিত হতো, ওটা কোন্ অঞ্চলে ব্যয় করা হবে, কোন খাত অগ্রাধিকার পাবে এবং প্রায় ঐ গোটা সময়টায় বৈদেশিক মুদ্রা পেয়ে কোন্ কোন্ ব্যক্তি লাভবান হবেন—এসবই রাষ্ট্রীয় নীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। এটা শিল্পায়নের স্থান ও গতিপ্রকৃতি, তাকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা কোন্ অঞ্চলে কতটুকু রয়েছে এবং আমদানি ও পুঁজিসঞ্চয়জনিত চলতি ভোগের পরিমাণ কোন্ অঞ্চলে কতটা হবে এসবকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। পাকিস্তানের ইতিহাসের পুরো সময়টায় টাকার অতিরিক্ত মূল্যনির্ধারণের দ্বারাই এসব করা সম্ভব হয়। টাকার মূল্যবৃদ্ধি পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিখাতকেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত করে নি, বরং আমদানিকারক কিংবা শিল্পপতি হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা হস্তগত করাকে উৎসাহিত করে। এমনি করে বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তিকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইচ্ছামতো সম্পদ ও অনুগ্রহ বন্টনের হাতিয়ারে পরিণত করা হয়।

বৈদেশিক মুদ্রা প্রসঙ্গে

পাকিস্তানের রপ্তানিআয় থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির সাথে বছরের পর বছর ধরে বৈদেশিক সাহায্য যোগ হয়। ১৯৫০-৫১ সালের কোরীয় যুদ্ধকালীন রমরমা অবস্থার সময়টা বাদে ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে পাকিস্তানের ব্যালেন্স অব পেমেন্টের ক্ষেত্রে স্থায়ী ঘাটতি চলতে থাকে। প্রাথমিকভাবে এ ঘাটতি পূরণ করা হয় জমা স্টার্লিং ব্যালেন্স ক্ষয় করে। ১৯৫৩-৫৪ সালের পরে সরকারি উন্নয়ন সহায়তার খাতে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রবাহিত অর্থ পাকিস্তানের আমদানি ও উন্নয়নের জন্য বর্ধিষ্ণু হারে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৬১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পাকিস্তান মঞ্জুরি ও ঋণ বাবদ আনুমানিক ৬ বিলিয়ন ডলার পায়।[৩৪] ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে পাকিস্তানের আমদানির ৪৪% আসে এ অর্থ থেকে।[৩৫] এতে বোঝা যায় যে, বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তি বৈদেশিক মুদ্রার উপর দাবিকে

---

৩৩. Gunnar Myrdal, *Economic Theory and Underdeveloped Regions*

৩৪. *Pakistan Economic Survey*, 1969-70

৩৫. পাকিস্তানের আমদানিব্যয়ের হিসাবের তালিকা পাবেন A. M. A. Muhith, *Bangladesh: Emergence of a Nation*, (Dhaka 1979) গ্রন্থে।

জোরদার করে এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবিত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অঞ্চলগুলোর মধ্যে বৈদেশিক সাহায্য বণ্টনের সিদ্ধান্তগুলোও প্রধানত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই থেকে যায়, যেহেতু বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল প্রচুর এবং প্রাপ্ত সাহায্যের চেয়ে অনেক বেশি।

রাষ্ট্রের নিয়ামক ভূমিকা

আঞ্চলিক উন্নয়নের ছাঁচকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবধান অতি গুরুত্বপূর্ণ থেকে যাওয়ায় আঞ্চলিক উন্নয়নের ভারসাম্যকে প্রভাবিতকরণে ভোক্তা ও বিনিয়োগকারী হিসেবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছিল নিয়ামক। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে পাকিস্তান সরকার রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে ১১৩ বিলিয়ন টাকা খরচ করে।[৩৬] আঞ্চলিক অর্থনীতিতে কার্যকর চাহিদা স্থির করার ব্যাপারে এটা রাষ্ট্রকে রীতিমতো অসাধারণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা প্রদান করে। এ ব্যয়ের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারটি আঞ্চলিক পণ্যের বাজার ও জনকল্যাণব্যবস্থাগুলোর উপর একটা তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এ ব্যয়ের যে অংশ উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট হয়, তার পরিমাণ ছিল ৫০ বিলিয়ন টাকা। এটা অবকাঠামো, সরকারি খাতে শিল্পবিকাশ ও মানবিক সম্পদ উন্নয়নকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে অঞ্চলসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নক্ষমতার উপর প্রভাববিস্তার করে। বেসরকারি খাতের বিকাশও কোন স্বাধীন স্বতন্ত্র কিছু ছিল না। বেসরকারি খাতের উন্নয়ন ছিল প্রত্যক্ষভাবে সরকারি ঋণ ও ভর্তুকি এবং অপ্রত্যক্ষভাবে অবকাঠামো ও দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য সরকারি অর্থবিনিয়োগ দ্বারা, সরকারি ব্যয়ে সৃষ্ট বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং সরকারি নীতির চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত। এগুলো অর্থনৈতিক তৎপরতার উৎসাহপ্রদায়ক কাঠামোকে প্রভাবিত করে। আমরা নিম্নে বর্ণিত সরকারি হস্তক্ষেপের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, যথা, সরকারি ও বেসরকারি ব্যয়, বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ, বৈদেশিক সাহায্য বরাদ্দ, সরকারি ব্যয়ের জন্য অর্থপ্রদান এবং সরকারি নীতির গতিপথ বা লক্ষ্য ইত্যাদিতে আঞ্চলিক পক্ষপাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করবো।

সরকারি ব্যয়

সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পক্ষপাতও আমরা দেখবো ৪ নং সারণিতে। এতে দেখা যাবে যে, ১৯৫৯-৭০ কালপর্বে রাজস্ব থেকে পূর্ব পাকিস্তান সকল ব্যয়ের মাত্র ২৩ শতাংশ পায়। সারণিতে প্রদত্ত পরবর্তী সময়ের মধ্যে এই প্রবণতার কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে নি। কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থিতি কোথায় সেটা বিবেচনা করলে আঞ্চলিক

---

৩৬. Rounaq Jahan, *Pakistan*, Table III 1. 62

ব্যয়ের এ নমুনা পুরোপুরি বিস্ময়কর ঠেকবে না। কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে অবস্থান করে করাচীতে এবং পরে ইসলামাবাদে। তিনটি সশস্ত্র বাহিনীর সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ার অর্থ ছিল এই যে, প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় প্রধানত সেখানেই হতো। সশস্ত্র বাহিনীসমূহের গঠনে দেখা গেছে যে, সেনাবাহিনীতে জওয়ানদের মধ্যে ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৭.৪ জন, বিমানবাহিনীতে ২৮ জন এবং নৌবাহিনীতে ২৮.৮ জন।[৩৭] অফিসারদের অনুপাত ছিল আরো নিম্নে। আমলাতন্ত্রের মধ্যে ১৯৬৬ সাল অবধি প্রথম শ্রেণীর কেন্দ্রীয় অফিসারদের শতকরা মাত্র ৩০ জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানী।[৩৮] কেন্দ্রীয় সরকারের নিম্নতর পদের চাকুরিতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল আরো কম। এসব কর্মচারী ছিল প্রধানত করাচীবাসী।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য ব্যয়, স্টোরগুলোর জন্য কেনাকাটার ব্যয়, আবাসিক ভবনাদি ও দপ্তরসমূহের বেসামরিক বিনির্মাণের ব্যয়, বৈদ্যুতিকশক্তি, টেলিযোগাযোগ ও রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য ব্যয় প্রধানত করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। অনুরূপ কেন্দ্রীয় ব্যয় দ্বারাই গড়ে উঠে করাচী, রাওয়ালপিন্ডি এবং পরে ইসলামাবাদে একটি সম্পূর্ণ নতুন জাতীয় রাজধানী। এসব ব্যয়ের দরুন সৃষ্ট নিয়োগের বেশিরভাগও পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে চলে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপরোক্ত ব্যয়সমূহ পশ্চিম পাকিস্তানে পণ্যদ্রব্যাদি ও জনসেবামূলক ব্যবস্থার চাহিদা বৃদ্ধি দ্বারা বেসরকারি অর্থনৈতিক তৎপরতাকে জোরদার করে তোলে।

বাঙালিরা রাজস্বব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান এ গুরুতর অসমতাকে পাকিস্তানের দুই অংশের অসমতা স্থায়ীকরণের নিয়ামক কারণ রূপে দেখে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে 'প্যারিটি' বা সমতার দাবি, নৌবাহিনীর সদর দপ্তর চট্টগ্রামে এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানাদির অংশবিশেষ পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরের দাবি কেবল ক্ষমতা, চাকুরি ও সিদ্ধান্তগ্রহণক্ষমতার অংশীদার হবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই উঠে নি, ঐ দাবিগুলো উঠেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের সম্ভাব্য ব্যয়ের সুফল লাভের প্রত্যাশায়। প্রশাসন ও সশস্ত্র বাহিনীর চাকুরির জন্য বাঙালিদের যোগ্যতা কম—এ অভিমত বাঙালিরা কখনো মেনে নেয় নি। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের (সি. এস. পি.) মতো উচ্চতর পদের প্রথম শ্রেণীর চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা প্রবর্তন আদিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান করাচীতে হওয়ার দরুন সৃষ্ট অসমতা ও বিভাগকালে ভারত সরকারের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অসমতাকে কখনো দূর করতে পারে নি। সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালিদের নিযুক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে দৈহিক সামর্থ্য সংক্রান্ত প্রশ্ন তোলা হয়। অথচ স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে সশস্ত্রবাহিনীসমূহের বিকাশ প্রমাণ করে যে, সশস্ত্রবাহিনীর চাকুরিতে নিয়োগলাভের জন্য

৩৭. ঐ।

৩৮. প্রাগুক্ত

উপযুক্ত বাঙালির কোন অভাব ছিল না এবং নিয়মিত উপযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ এবং শরীরচর্চা যেকোন জাতিসত্তার জনগনের দৈহিক স্বাস্থ্য ও যোগ্যতা বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে পারে। পাকিস্তান সরকার যদি শুরু থেকে সচেতনভাবে বেসামরিক ও সশস্ত্র বাহিনীর চাকুরিতে সমতা আনার চেষ্টা করতো, তাহলে হয়তো দশ বছরের মধ্যে সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হতো। সেক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গীকারের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে বাঙালিদেরধারণা অনেকাংশে পরিবর্তিত হতো।

উন্নয়নব্যয়

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাতের মূল কারণ থেকে যায় সরকারি উন্নয়নব্যয় বণ্টনে পক্ষপাত। পাকিস্তানে শুরু থেকেই জাতীয় সংসদে এ মর্মে প্রশ্ন উঠতে থাকে যে, সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান তার প্রাপ্য হিস্যার চাইতে কম পাচ্ছে। ১৯৫০-৫৫ সালের প্রাক-পরিকল্পনা আমলে সরকারি উন্নয়নব্যয়ের মাত্র ৭০ কোটি টাকা জোটে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যে। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান পায় ২০০ কোটি টাকা।[৩৯] বণ্টনবরাদ্দে এ ধরনের পক্ষপাতিত্বের কি যুক্তি থাকতে পারে তা কখনো স্পষ্ট করে বলা হয় নি। সরকারি ব্যয়বরাদ্দের পশ্চাতে কোন কৌশলগত চিন্তা ছিল না—এ কথা বলে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্তানকে সরকারি ব্যয়ের শতকরা মাত্র ৩৬ ভাগ প্রদানকে আর কোনক্রমেই যুক্তিগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। আদায়কৃত ব্যয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা দাঁড়ায় আরো করুণ। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সরকারি ব্যয়ের মাত্র ৩০ শতাংশ পায় পূর্ব পাকিস্তান।

১৯৫৬ সালে বাঙালি অর্থনীতিবিদরা পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা করার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমালোচনা করেন। তাঁরা শুধু সরকারি সম্পদের অধিকতর পক্ষপাতশূন্য বণ্টনই নয়, পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বতন্ত্র উৎপাদনকারী ও ভোক্তা ইউনিটরূপে গণ্য করারও দাবি তোলেন। তাঁরা পাকিস্তানকে একটি অখণ্ড পরিকল্পনাসত্তা হিসেবে না দেখে দুটো অর্থনীতি হিসেবে গণ্য করার এবং দুই অর্থনীতির জন্য দু'টি পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা বলেন।[৪০]

---

৩৯. দেখুন, *Report of the Panel of Economists on the Fourth Five year Plans*, Government of Pakistan, (Comments of E. P. Members).

৪০. S. V. Khan, "A measure of economic growth in East and West Pakistan", *PDR*, Autumn-1961
উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত (১৮-২১ ডিসেম্বর ১৯৫৬) পাকিস্তান ইকোনমিক এ্যাসোসিয়েশন-এব এক সম্মেলনে একাধিক বাঙালি অর্থনীতিবিদ পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের জন্য দুটি আলাদা অর্থনীতি গড়ে তোলার পক্ষে যুক্তি প্রদান করেন। যেমন, এস. এম. মুজিবুর রহমান সম্মেলনে পঠিত তাঁর প্রবন্ধে দুই অর্থনীতির সমর্থনে মন্তব্য প্রকাশ করে বলেন ঃ 'But we cannot ignore the hard reality and here got to admit that there are actually two economics in the country ... The superstructure of political oneness must be built on economic twoness and let us nurture this twoness so far it is congenial to the whole gamut of our economic life." দেখুন S. M. Mujibur Rahman, "Inter Zonal Trade in Pakistan", *Pakistan Economic Journal*, Vol. 7 (March 1957), No. 1

পাকিস্তানী নীতিনির্ধারকরা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অর্থববাদ্দেব বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতেন যে, প্রদেশটির পরিশোষণক্ষমতা কম। তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারকে পরিকল্পনার অধীনে বরাদ্দকৃত অর্থ অব্যবহৃত থেকে যাওয়ার বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতো। বাঙালি অর্থনীতিবিদ ও প্রশাসকরা যুক্তি দেখাতেন যে, পরিশোষণক্ষমতা তহবিল প্রদান ও কেন্দ্র থেকে প্রাদেশিক সরকারেব কাছে কর্তৃত্ব হস্তান্তর-এ উভয়ের উপর নির্ভর করে। পূর্ব পাকিস্তানে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি অবকাঠামোর : আপেক্ষিক দুর্বলতা এমনিতেই পরিশোষণে বাধা সৃষ্টি করে। ১৯৫১-৫২ সালে কিলোওয়াট প্রতি বিদ্যুতের মাথাপিছু ব্যবহার পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৮.৬ এবং পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ০.৫।[৪১] ১৯৫০-এর দশকে বিদ্যুৎশক্তিখাতে পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল অর্থবিনিয়োগের ফলে ১৯৫৯-৬০ সাল নাগাদ সেখানে বিদ্যুতের ব্যবহার ২৮.৮ কিলোওয়াটে উন্নীত হয়। সে তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যুতের মাথাপিছু ব্যবহারেব পরিমাণ অতি সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে মাত্র ১.৬ কিলোওয়াটে পৌঁছে। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যে পাশ্চিম পাকিস্তানে মাইলের হিসেবে রাস্তা বৃদ্ধি পায় ৫৬০৩ মাইল, অথচ পূর্ব পাকিস্তানে রাস্তা বৃদ্ধি পায় মাত্র ৪৬০ মাইল।[৪২]

পূর্ব পাকিস্তানের তহবিল ব্যবহারে বিলম্বের কারণ ছিল ঝামেলাপূর্ণ অনুমোদনপ্রক্রিয়া। চার চারটি পৃথক সংস্থা দ্বারা এখানে যেকোন বড় প্রজেক্ট অনুমোদন করিয়ে নিতে হতো। সংস্থাগুলো হচ্ছে : প্রাদেশিক উন্নয়ন ওয়ার্কিং পার্টি, প্রাদেশিক প্ল্যানিং কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ওয়ার্কিং পার্টি ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের পরিচালনা কমিটি (একনেক)। এরকম পরিস্থিতিতে কেন্দ্র যতো দ্রুততার সাথে স্কিমগুলো অনুমোদন করতো ও পরে তহবিল ছাড়তো, সেটা সম্পদের ব্যবহারকে ততোটা প্রভাবিত করতো। তবে এমনকি তহবিল ছাড়ার পরেও বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তিতে বাধা-বিঘ্ন, ইস্পাত ও সিমেন্ট ইত্যাদি উপকরণ (পূর্ব পাকিস্তানে যেগুলোর ঘাটতি ছিল) সংগ্রহে বিঘ্ন, বিদ্যুৎ সববরাহের স্বল্পতা, যানবাহন ও যোগাযোগের অপর্যাপ্ততা প্রজেক্টগুলোকে বিলম্বিত করে দিতে পারতো। পরিকল্পনায় বরাদ্দ ও বাস্তবায়নহারের ক্ষেত্রে যে অঙ্ক নির্ধারিত হয়েছে তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

বৈষম্য প্রশ্নে বিতর্ক

১৯৬০-৬৫ সালের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে আঞ্চলিক বরাদ্দ ও তার সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশ্নাদি কিছুটা গভীরভাবে আলোচিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার উপর আলোচনার প্রস্তুতি উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পনা বোর্ড তৎকালে করাচীতে অবস্থিত

---

৪১. প্রাগুক্ত।

৪২. ঐ।

পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট-এ কর্মরত আখলাকুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তৎকালীন রিডার মোশাররফ হোসেইন ও তৎকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে কর্মরত বর্তমান প্রবন্ধকারকে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সম্পদ বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান স্থিরীকরণে বোর্ডকে সাহায্য করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ওয়ার্কিং গ্রুপের আলোচনায় অর্থনীতিবিদরা পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে একত্রে অংশগ্রহন করেন। তাঁরা আঞ্চলিক পরিকল্পনায় সম্পদের বন্টনকে জনসংখ্যার আকারের সাথে সম্পর্কিত করার গুরুত্বের কথা এবং ১৯৫০-এর দশকে সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে অসমতা ঘটেছে তা সংশোধনের কথা বলেন। এসব আলোচনায় সিদ্ধান্তগ্রহণক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তবায়নক্ষমতার উন্নয়ন, পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনের (পিআইডিসি) দ্বিধাবিভক্তি এবং কয়েকটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরের উপর জোর দেয়া হয়।

পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশন মোটেই এসব যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। তখন দেশে সামরিক আইন চালু থাকায় বাঙালি অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন সেমিনার ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে যেসব প্রশ্নে সামান্য বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেসব প্রশ্ন রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে উত্থাপন করার উপায় ছিল না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রকাশিত হবার পর দেখা গেল, পরিকল্পনাব্যয়ের শতকরা ৪১ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।[৪৩] প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তুলনায় এটা অনেক বেশি। প্রথম পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানে আদায়কৃত বিনিয়োগ ছিল শতকরা মাত্র ২০ ভাগ।[৪৪] দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে একটা আঞ্চলিক অসমতার ব্যাপার রয়েছে সেটাকে বিশদভাবে স্বীকার করে নি। এ পরিকল্পনা পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়, তবে যুক্তি দেখায় যে, ঐতিহাসিকভাবে কোন দেশেই সকল অঞ্চলে একই সাথে এবং সমহারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে নি।[৪৫]

সুতরাং এটা বিস্ময়কর নয় যে, আঞ্চলিক প্রশ্ন আবারো পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের তীব্র বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে। ১৯৬০ সালের গ্রীষ্মে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রকাশনা উপলক্ষে রাওয়ালপিন্ডিতে আয়োজিত এক বর্ধিত সেমিনারে পরিকল্পনাটির প্রথম সমালোচনা উচ্চারিত হয়। এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগদানকারী নূরুল ইসলাম ও বর্তমান প্রবন্ধকার, পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কের তদানীন্তন ডেপুটি ম্যানেজিং

৪৩. Huq, *Strategy of Economic Planning*, Table 55.

৪৪. দেখুন, *Reports of the Panel of Economists on the Fourth Five year Plans*, Government of Pakistan. (Comments of E P. Members).

৪৫. Government of Pakistan, *The Second Five year Plans*, 1960-65.

ডিরেক্টর এম. রশিদসহ কয়েকজন বাঙালি সিএসপি অফিসার আঞ্চলিকতার প্রশ্নে পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান সাইদ হাসান, প্রধান অর্থনীতিবিদ এম. এল. কোরেশী, কমিশনের যুগ্ম প্রধান অর্থনীতিবিদ আফতাব আহমদ খান, উপ-প্রধান অর্থনীতিবিদ মাহবুব উল হক এবং পাকিস্তানের নীতিনির্ধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ বেসামরিক আমলারা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থনীতিবিদদের প্যানেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এন. হুদা ও মাযহারুল হক অংশগ্রহণ করেন। প্যানেল আঞ্চলিক প্রশ্নকে খাটো করে দেখে এবং মেনে নেয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির গতিশীলতার দরুন ঐ অঞ্চলে অধিকতর বিনিয়োগ হওয়া উচিত। তবে তাঁরা যুক্তি দেন যে, দ্রুত বিকাশশীল অঞ্চল থেকে এবং বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করা দরকার যাতে সেখানে উন্নয়ন দ্রুততর হয়।[৪৬] একটা সুপারিশে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে উন্নততর আঞ্চলিক ভারসাম্যের তাগিদে পশ্চিম পাকিস্তানে কিছু লাভজনক বিনিয়োগ বাদ দেয়া উচিত, তবে যে সীমার মধ্যে সে নীতি কাজ করবে তা সুস্পষ্টভাবে বেঁধে দিতে হবে যাতে অর্থনীতির সার্বিক বিকাশের হারে কোন গুরুত্ব হ্রাস পেতে দেখা না যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজির উৎপাদনক্ষমতা, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং বিনিয়োগহার পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে বেশি—এমন অযাচাইকৃত ও ভ্রান্ত ধারণা থেকে এ কথা বলা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের শতকরা ৫ ভাগের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে সঞ্চয়ের হার ছিল শতকরা ৮ ভাগ। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে মোট বিনিয়োগহার ছিল ৭%, আর পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩%।[৪৭]

পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পরিশোষণক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্যানেল প্রস্তাব করে যে, কেন্দ্র ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকৌশলী ও প্রশাসনিক কর্মচারী মোতায়েনের মাধ্যমে কেন্দ্রের উচিত পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব সরাসরি গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাদলিল এবং অর্থনীতিবিদদের প্যানেলের মধ্যে এরকম দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে যে, পাকিস্তানের অর্থনীতি অখণ্ড এবং সেখানে আঞ্চলিক অসমতা দূরীকরণের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে গেলে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ বিঘ্নিত হতে পারে। এই দুশ্চিন্তা তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলাকালেও কেন্দ্রীয় পরিকল্পক ও পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদদের মন ঘিরে থাকে।

৪৬. দেখুন, *Reports of the Panel of Economists on the Fourth Five year Plans*, Government of Pakistan.

৪৭. Huq, *Strategy of Economic Planning* Tables 28, 29

বলাবাহুল্য, পরবর্তী তথ্য-প্রমাণে দেখা গেছে যে, বিনিয়োগদক্ষতার ক্ষেত্রে যেমন পশ্চিম পাকিস্তানের কোন শ্রেষ্ঠতা ছিল না, তেমনি পূর্ব পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তরের জন্য উচ্চতর সঞ্চয়ও তার ছিল না, বরং প্রাক-পরিকল্পনা ব্যয় হিসেবে সিন্ধু অববাহিকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বিনিয়োগ এবং জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা হ্রাসকল্পে বিনিয়োগকে হিসাবের মধ্যে ধরলে প্রমাণিত হবে যে, ভেল্কিবাজি করে পরিকল্পনার মধ্যে অধিকতর আঞ্চলিক ভারসাম্য নিশ্চিত করার কথা বলে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ব্যয় ও আয়ের বৈষম্যকে স্থায়ী করে রাখা হয়।

দুই অর্থনীতির ধীকল্প

প্ল্যানিং ও সম্পদ বণ্টনের ভিত্তি হিসেবে একটি অখণ্ড জাতীয় অর্থনীতির ধী-কল্প (idea) দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রকাশিত হবার পরপরই পরিত্যক্ত হয়। ১৯৬১ সাল নাগাদ বিতর্কটি সেমিনারকক্ষ ও সরকারি চেম্বারগুলো থেকে রাজপথে ও প্রচারমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আইয়ুবের মার্শাল ল' সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে গণতান্ত্রিক সমাবেশ জোরদার হয়ে উঠার সাথে সাথে আঞ্চলিক বৈষম্য ও সম্পদ বরাদ্দের বৈষম্য বাঙালিদের দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ হয়ে উঠে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে দেখা হয় মার্শাল ল' পরিকল্পনা হিসেবে, যা পূর্ববর্তী দশকে পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনাকে সংশোধনের পরিবর্তে সেই একই অবিচার স্থায়ী করার জন্য সরকারি নীতি ও সম্পদকে ব্যবহারের চেষ্টা করে। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, উন্নয়নক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের অবসান ও প্রদেশগুলোর হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণের উপর জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। কিছু কিছু বাঙালি অর্থনীতিবিদ এ সময় বাঙালিদেরমধ্যে জাতীয় অধিকার ও দাবিদাওয়াভিত্তিক যে আন্দোলন গড়ে উঠছিল তার মুখ্য প্রচারক হয়ে পড়েন। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত সেমিনারগুলোতে পাকিস্তানের অখণ্ড জাতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রচলিত কল্পকাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করা হয়।[৪৮]

এসব অর্থনীতিবিদদের কারো কারো দ্বারা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত ছাত্রআন্দোলনের ক্রমবর্ধমান জঙ্গিপনা আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রশ্নকে রাজনৈতিক শক্তি প্রদান করে। তা না হলে প্রশ্নটি সেমিনারকক্ষগুলোতে পণ্ডিতী বিতর্কের মধ্যে আবদ্ধ থেকে যেতো। ১৯৬১ সালে ঢাকা সফরকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বাঙালি অর্থনীতিবিদদের সাথে এক আলোচনাবৈঠকে মিলিত হন। ঐ বৈঠকে স্থানীয় অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন অধিকতর মুখর, তাঁদের জোরালো যুক্তি প্রেসিডেন্টকে বিচ্ছিন্ন ও নিরুত্তর করে দেয় এবং প্রবীণতম অর্থনীতিবিদগণ অধিকতর সহনীয় ভাষায় তাঁদের মতামত ব্যাখ্যা করেন। পরে এক জনসভায় প্রেসিডেন্ট প্রথমবারের মতো আঞ্চলিক অসমতার সমস্যাটিকে স্বীকৃতি দেন এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকারি সম্পদ বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা ও সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি জাতীয় অর্থকমিশন গঠন করেন।

---

৪৮. Rehman Sobhan, "How to build Pakistan"

ফিন্যান্স কমিশন

প্রথম ফিন্যান্স কমিশনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় করাচীতে ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে। এই প্রথম পাকিস্তানে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রশ্নে আলোচনার জন্য একটি সরকারি কমিটির প্রথম বৈঠক বসে।[৪৯] কমিশনের পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব ডি কে পাওয়ার, এম রশীদ, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থসচিব আবুল খায়ের এবং নূরুল ইসলাম। বর্তমান প্রবন্ধকার কমিশনকে সহায়তা করেন। তিনি জনাব নূরুল ইসলামের সাথে একত্রে কাজ করে একটা রিপোর্ট তৈরি করেন, যা পরে কমিশনের পৃথক রিপোর্ট হয়ে দাঁড়ায়। তিনটি রিপোর্ট পেশ করা হয়---একটি পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের তরফ থেকে, একটি পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের পক্ষ থেকে এবং একটি কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক। পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যদের রিপোর্টে মাথাপিছু আয়বৈষম্যে শতকরা হিসাবের দিকে দৃষ্টি রেখে জনসংখ্যার অনুপাতের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সম্পদসমূহ বরাদ্দের জন্য একটি সুসমন্বয়কারী ফর্মুলার কথা বলা হয়। বলা হয় যে, বৈষম্য দূরীকৃত হওয়া মাত্রই জনসংখ্যার অনুপাত সংক্রান্ত ফর্মুলাটি প্রদত্ত হবে। সে সময় পাকিস্তানে সংবিধান প্রণীত হচ্ছিল। পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যরা এ ফর্মুলাটি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেন। তবে কমিশনের পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যরা বৈষম্য বিলোপে সরাসরি ব্যবহার করা উচিত এমন সব রাজস্বসম্পদকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আস্থা স্থাপন করেন। এটা ছিল রাজস্বের স্থানীয় সংগ্রহের ভিত্তিতে রাজস্বখাতে প্রাপ্ত আয় আরো বেশি পরিমাণে প্রদেশগুলোর হাতে রেখে দেয়ার যে দাবি কমিশনের পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যরা তুলেছিলেন সেটার প্রতি চ্যালেঞ্জ। চাকুরিসুবিধা, আয়বৃদ্ধি ও এর উপায় সৃষ্টি, বাজারের বিকাশ ও নগরায়ণের উপর স্থানীয় প্রভাবের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নবহির্ভূত বরাদ্দ আরো বেশি হওয়ার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। তাঁরা পরিশোষণক্ষমতাকে বিঘ্ন হিসেবে না দেখে উন্নয়নের একটা উপায় হিসেবে দেখেন এবং প্রজেক্টগুলোর বাধাবিপত্তি উত্তরণে বৈদেশিক কারিগরি সাহায্য ব্যবহারের কথা বলেন।

আঞ্চলিক প্রশ্নে জনগণের উদ্বেগ যখন চরমে পৌঁছে যাচ্ছে, তখন ফিন্যান্স কমিশনের মধ্যে এ বিতর্ক চলতে থাকায় আইয়ুব সরকার ১৯৬২ সালের সংবিধানে আঞ্চলিক মাথাপিছু আয়বৈষম্য হ্রাসের স্পষ্ট উদ্দেশ্যে সরকারি সম্পদ বণ্টনের অঙ্গীকারটি অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হয়। ১৯৬০ এর মধ্যভাগে দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রকাশনা ও ১৯৬২ সালের প্রথমদিকে সংবিধানের প্রকাশনাকালের মধ্যে এটা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে একটি নাটকীয় মতপরিবর্তন। সংবিধান গৃহীত হবার পর বৈষম্যহ্রাসের সাংবিধানিক লক্ষ্য পূরণে

৪৯. দেখুন, *Reports of the Panel of Economists on the Fourth Five Year Plans*. Government of Pakistan. (Comments of E P Members).

অগ্রগতি পর্যালোচনাকল্পে দ্বিতীয় অর্থ-কমিশন নিয়োগ করা হয়। কিন্তু বৈষম্য সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য উপাত্তের অভাবে কমিশনের কাজ ব্যাহত হয় এবং তত্তীয় পরিকল্পনা বৈষম্য দূরীকরণে কতটা সফল হবে তা অনুমান করতে কমিশন অক্ষম হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

১৯৬৫ সালে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয় এমন একটা সময়ে, যখন আঞ্চলিক বরাদ্দের প্রশ্নে জনগণের বিতর্ক সাংবিধানিক অঙ্গীকার ও আঞ্চলিক অর্থবরাদ্দের প্রশ্নকে পরিকল্পনাবিষয়ক বিতর্কের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে এসেছে। ফলে তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পিত বিনিয়োগের ৫১ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়ার কথা বলা হয়। সরকারি ব্যয়ের ৫৩ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানে হবে বলে নির্দিষ্ট হয় এবং বেসরকারি বিনিয়োগে সমতা বজায় রাখার কথা বলা হয়। তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সিন্ধু অববাহিকা উন্নয়নে পরিকল্পনাবহির্ভূতভাবে ব্যয়িত ৩৬০ কোটি টাকা ছিল বণ্টনের পাল্লাকে পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। কার্যত তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন সময়ে সরকারি বিনিয়োগের শতকরা ৫৫ ভাগ ব্যয়িত হয় পাশ্চিম পাকিস্তানে। এতে পরিকল্পনাকে বৈষম্য হ্রাসকল্পে কাজে লাগানোর সাংবিধানিক অঙ্গীকার অপূর্ণ থেকে যায়। পরিকল্পনাকালের মধ্যে বৈষম্য ১৯৬৪-৬৫ সালের শতকরা ৪৫.৪ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালে ৬১.৫ শতাংশে বর্ধিত হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনার অর্থনীতিবিদ প্যানেলে মোশাররফ হোসেন এবং এ প্রবন্ধকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্যানেলের আলোচনায় আঞ্চলিক বৈষম্য, সরকারি খাতের ভূমিকা ও ভূমিসংস্কার বিষয়ে বিতর্ক এমন তীব্র হয়ে উঠে যে, প্যানেলের চেয়ারম্যান কমিশনের মুখ্য অর্থনীতিবিদ এম. এল. কোরেশী দুই বা তিনটি বৈঠকের পরই প্যানেলের আলোচনা হঠাৎ এবং অসময়ে বন্ধ করে দেন।

আঞ্চলিক বৈষম্য প্রশ্নে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে পার্লামেন্টের এমন কোন অধিবেশনই চলে নি, যেখানে বৈষম্য বিষয়টি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল না। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতারা বাঙালি অর্থনীতিবিদদের সাথে যোগ দিয়ে বৈষম্যকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করেন। ১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের গোলটেবিল বৈঠকে (আর. টি. সি) আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে উত্থাপিত ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি মূলত আঞ্চলিক অসমতাকে ভিত্তি করেই রচিত হয়। এতে পাকিস্তানে দুই অর্থনীতিযুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। ছয় দফার তিনটি দফা অর্থ, রাজস্ব ও বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি নির্ধারণের ক্ষমতা অঞ্চলগুলোর হাতে অর্পণ

সংক্রান্ত উদ্বেগ প্রকাশ করে। তবে ছয় দফা প্রণয়নের সাথে কোন অর্থনীতিবিদই জড়িত ছিলেন না, যদিও বাঙালি অর্থনীতিবিদদের রচনাসমূহ উক্ত কর্মসূচিকে সুস্পষ্টভাবে প্রভাবিত করে। কোন কোন অর্থনীতিবিদ প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতাদের সাথে বসে অর্থনৈতিক সমস্যাদি আলোচনা করেন।

আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রশ্নকে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠার কেন্দ্রবিন্দু করে তোলে। আন্দোলনের লক্ষ্য বৈষম্য দূরীকরণের দিক থেকে স্বায়ত্তশাসনের দিকে সরে যায়। ১৯৬৯ সালের গোড়ার দিকে আইয়ুব সরকার যে রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়, তা নিরসন ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধন সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান ইসলামাবাদে এক গোলটেবিল বৈঠক ডাকেন। কারাগার থেকে সদ্যমুক্ত শেখ মুজিবুর রহমান গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য পেশকালে তাঁকে সহায়তাদানের জন্য তিনজন প্রখ্যাত বাঙালি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক আনিসুর রহমান ও অধ্যাপক ওয়াহিদুল হককে এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানে স্বায়ত্তশাসনের ছয় দফা দাবি অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে সংবিধানের সংশোধনী প্রণয়নের জন্য ডক্টর কামাল হোসেনকে আমন্ত্রণ জানান।

আইয়ুব সরকারের পতনের পরে ১৯৬৯ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী লড়াইয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ছয় দফাই ছিল মূল রণধ্বনি। তার মানে, বৈষম্যের ইস্যুটি আবার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। "সোনার বাংলা শ্মশান কেন" শিরোনামে আওয়ামী লীগ কর্তৃক তৈরি পোস্টারটি নির্বাচনী প্রচারের অত্যন্ত ফলপ্রদ হাতিয়ারে পরিণত হয়। এ পোস্টারটিতে আপেক্ষিক অর্থনৈতিক বঞ্চনা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদরা যেসব পরিসংখ্যান এক সময় তুলে ধরেছিলেন সেগুলো সন্নিবেশিত হয়। পোস্টারটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে যায়। এভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি পরিবারের রাজনৈতিক সচেতনতার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। তখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে ক্রমবর্ধমানভাবে বাংলাদেশ বলে মনে করা হতে থাকে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ছয় দফার ইস্যুতে যখন নির্বাচনী প্রচারণা অভিযান চলছে সে অবস্থায় চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন একটি গৌণ দৃশ্যে পরিণত হয়। খসড়া পরিকল্পনায় পশ্চিম পাকিস্তানের ৩৮০০ কোটি টাকার তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া হয় ৩৭০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট উন্নয়নব্যয়ের শতকরা ৪৯.৩ ভাগ। তবে তখনকার আবেগপূর্ণ পরিস্থিতিতে জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল পরিকল্পনা কমিশনকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাসকল্পে পরিকল্পনাটিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে বলে। পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়ায় পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া হয় ৩৯.৪ বিলিয়ন টাকা (সরকারি খাতে ২৯.৪ বিলিয়ন + বেসরকারি খাতে ১০ বিলিয়ন টাকা)

এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে দেয়া হয় ৩৫.৬ বিলিয়ন টাকা (সরকারি খাতে ১৯.৬ বিলিয়ন + বেসরকারি খাতে ১৬ বিলিয়ন টাকা)।[৫০] এই প্রথমবার পূর্ব পাকিস্তানকে পরিকল্পনার বৃহত্তর হিস্যা প্রদান করা হয়।

চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যালোচনার জন্য গঠিত অর্থনীতিবিদদের প্যানেলে বাঙালি অর্থনীতিবিদগণ ছিলেন মাযহারুল হক, নূরুল ইসলাম, আখলাকুর রহমান, আনিসুর রহমান ও বর্তমান লেখক। বাঙালি অর্থনীতিবিদগণ পরিকল্পনা কমিশনের তদানীন্তন মুখ্য অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হকের সভাপতিত্বের অধীনে এ কারণে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানান যে, যাঁদের তৈরি বণ্টননীতির দরুন আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। প্যানেলগুলোর ইতিহাসে সেই প্রথমবার পরিকল্পনা কমিশনের মুখ্য অর্থনীতিবিদ সভাপতির আসনে বসতে পারেন নি। পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক সমিতির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মাযহারুল হককে প্যানেলে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্যানেলের আলোচনার শুরুতেই পূর্ব পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদগণ একটি অন্তর্বর্তীকালীন সামরিক প্রশাসন কর্তৃক চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়নের সৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের মতে, কাজটি আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের শেষে যে সরকার গঠিত হবে সেই সরকারের। তবে তাঁরা প্যানেলের কাজে অংশ নেন এ প্রত্যাশায় যে, আঞ্চলিক বৈষম্য সম্পর্কে এবং সেগুলো দ্রুত দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পর্কে তাঁরা বড় রকমের বক্তব্য রাখতে পারবেন।

আঞ্চলিক প্রশ্নে সৃষ্ট পার্থক্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, এমনকি ১৯৭০ সালে পাকিস্তান যখন আঞ্চলিক প্রশ্নের চাপে দ্রুত ভেঙে পড়ছিল, তখনো প্যানেলের পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যরা ঐতিহাসিক অসমতাসমূহ দূর করার অঙ্গীকার প্রদানে তাঁদের পূর্ব পাকিস্তানী সহকর্মীদের সাথে হাত মেলাতে পারেন নি। উভয় গ্রুপই জানতেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তাঁদের কাজ রাজনীতিপ্রভাবিত অকার্যকর কসরৎ মাত্র। তবু তাঁরা দু'টি পৃথক রিপোর্ট পেশ করেন।

বাঙালি অর্থনীতিবিদগণ দু'টি বিকল্প মডেল উপস্থিত করেন। একটিতে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের পরিকল্পনার কথা বলা হয়, যার ৭৫ বিলিয়ন টাকার ৪০.৫ বিলিয়ন (৫৪%) পাবে পূর্ব পাকিস্তান এবং ৩৪.৫ বিলিয়ন (৪৬%) পাবে পশ্চিম পাকিস্তান। দ্বিতীয় মডেলটি ছিল অপেক্ষাকৃত বড় আকারের পরিকল্পনার। এতে পশ্চিম পাকিস্তানের ঐতিহাসিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখার জন্য পূর্বেকার অনুপাত অক্ষুণ্ণ রেখে ৪৩.২ বিলিয়ন টাকা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এবং ৩৬.৮ বিলিয়ন টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়।

৫০. *Pakistan Economic Survey*, 1970-71

প্যানেলের পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া হয় ৩৬.৩৫ বিলিয়ন (৪৮%) টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানকে দেয়া হয় ৩৮ বিলিয়ন টাকা। পরিকল্পিত ব্যয়ের পর্যায়গুলো অবশ্য এমনভাবে স্থির করা হয় যাতে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষদিকে (১৯৭০-৭৫) পরিকল্পনাব্যয়ের ৫৪% হিস্যা পূর্ব পাকিস্তান পায়। আঞ্চলিক পুঁজির উৎপাদন অনুপাতে পেমেন্ট একাউন্টের আঞ্চলিক ব্যালেন্স, সম্পদের চলন্ত আঞ্চলিক স্থানান্তর ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয় প্যানেলের সদস্যদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে রাখে। দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁদের এসব বিতর্ক কিছুটা অবাস্তব শোনায়।

শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, চতুর্থ পরিকল্পনার চূড়ান্ত দলিলে এসব বিতর্কের রাজনৈতিক চরিত্রকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। সংশোধিত পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত বরাদ্দের অনুপাত পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যদের দেয়া অনুপাতের কাছাকাছি। প্যানেলের উভয় গ্রুপের সদস্যদের রিপোর্টে আঞ্চলিক মাথাপিছু আয়বৈষম্য, সম্পদের আন্তঃঅঞ্চল স্থানান্তর ইত্যাদির হিসাব সংক্রান্ত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সন্নিবেশিত থাকায় এগুলো পাকিস্তানের আঞ্চলিক প্রশ্ন বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসে পরিণত হয়েছে।

পাকিস্তানের পরিকল্পিত উন্নয়নের স্থিতিপত্র

পাকিস্তানে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের ২০ বছর শেষ হলে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক বৈষম্য ১৯৪৯-৫০-এর মাথাপিছু আয়ের ২১.৯ শতাংশ থেকে প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৯-৭০ সালে ৬১.৫ শতাংশে পৌঁছেছে। এ থেকেই বোঝা যায় পাকিস্তান রাষ্ট্র বণ্টন ও নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ১৯৫৯-৭০ কালপর্বে সকল উন্নয়নব্যয়ের শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত হয়েছে। পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহের আমলে এ বৈষম্য কিছুটা হ্রাস পেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এতে বোঝা যায় যে, জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানে একের পর এক পরিকল্পনার আমলে মাথাপিছু বিনিয়োগে সুনিশ্চিত বৈষম্যসমূহ বেড়েই চলেছে। এভাবে মাথাপিছু উন্নয়নব্যয়ক্ষেত্রে বৈষম্য ১৯৫১-৫৫ সালের ৮৬ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৫-৭০ সালে ২৮১ টাকায় পৌঁছে।[৫১] তার মানে, মাথাপিছু বিনিয়োজিত সম্পদের ব্যবধান বছরের পর বছর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনুরূপ বরাদ্দব্যবস্থার অধীনে আন্তঃআঞ্চলিক মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধি ছিল অবধারিত।

ইনক্রিমেন্টাল ক্যাপিটাল আউটপুট রেসিও (আইকোর)-তে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ছোটখাটো উদ্যোগের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পুঁজি পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশি উৎপাদনক্ষম ছিল। এর উপর ভিত্তি করে চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া ও পশ্চিম পাকিস্তানী প্যানেলের অর্থনীতিবিদদের রিপোর্টে বরাদ্দের হিস্যা স্থির করা হয়। বিনিয়োগের পাল্লা

৫১. দেখুন, *Report of the Panel of Economists on the Fourth Plans*, Government of Pakistan, (Comments of E P Members)

পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে ঝুঁকে থাকা সত্ত্বেও দুটো পরিকল্পনাকালে সরকার মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য হ্রাস করতে চায়। তাঁরা চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্তানে আইকোর নিচু থাকবে বলে ধরে নেন। এ অনুমানকে প্যানেলের পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যরা চ্যালেঞ্জ করেন। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্তানে 'আইকোর' সত্যি কম হলে এবং পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলোর আমলেও তাই থাকলে পরিকল্পিত সর্বাধিক বৃদ্ধির কারণে পূর্ব পাকিস্তানে আগের পরিকল্পনাগুলোর সময়ের চাইতে বরাদ্দের পরিমাণ আপেক্ষিকভাবে বেশি হবার কথা। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও পশ্চিম পাকিস্তানে অধিকতর বিনিয়োগকে ন্যায্য প্রমাণ করার জন্য অধিকতর বিনিয়োগদক্ষতার একই যুক্তি ব্যবহৃত হয়। কার্যত 'আইকোর' সংক্রান্ত তথ্যগুলোই দুর্বল। কাজেই, সম্পদ বরাদ্দকে প্রভাবিতকরণের ভিত্তি হিসেবে পুঁজির উৎপাদনশীলতার যুক্তি বাদ দেয়া এবং শুধু বরাদ্দের হিস্যা ও মাথাপিছু আয়ের দিকে তাকানোই নিরাপদ। বরাদ্দের হিস্যা ও মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য বছরের পর বছর বৃদ্ধিই পেয়েছে।

বৈষম্য স্পষ্টকরণে বেসরকারি খাতের ভূমিকা[৫২]

মোটমাট ব্যয়ের উপাত্তগুলোর দিকে তাকাতে গিয়ে আমরা বেসরকারি খাতে উন্নয়নব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অনেক প্রবলতর বৈষম্যকে দৃষ্টির আড়ালে রেখে দিই। সরকারি খাতের ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫০-৭০ কালপর্বে ব্যয়ের ৪০% পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়। কালক্রমে এ হিস্যা ১৯৫০-৫৫ সালের ২৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৫-৭০ সালে ৪৮ শতাংশে দাঁড়ায়। সরকারি উন্নয়নব্যয় স্বদেশে সংগৃহীত সরকারি সম্পদ ও বৈদেশিক উৎস থেকে সংগৃহীত সম্পদ থেকে সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাহ করা হয়। এ দিক থেকে রাষ্ট্র কোন অঞ্চলকে বা কোন কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে সরকারি খাতে উন্নয়নব্যয়ের মাধ্যমে তা সরাসরি প্রতিফলিত হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানী নীতিনির্ধারক ও অর্থনীতিবিদরা যুক্তি দিয়ে এসেছেন যে, মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যের মূলে রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে বেসরকারি খাতের গতিময়তা। ১৯৫০-৭০ কালপর্বে বেসরকারি খাতে উন্নয়নব্যয়ের শতকরা ৭৭ ভাগ নির্বাহ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৫০-৭০ সময়কালে মোট উন্নয়নব্যয়ের শতকরা ৪৮ ভাগ বেসরকারি খাতে নির্বাহ করা হয় বিধায় (পশ্চিম পাকিস্তানে ৫১% এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৩২%) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিনিয়োগবৈষম্যের মূল উৎস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের বেসরকারি খাত। পূর্ব পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদগণ এটা স্বীকার করে নিয়ে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে বেসরকারি খাত অধিকতর গতিময় হবার কারণেই রাষ্ট্রের উচিত পূর্ব পাকিস্তানে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। তাঁরা আরো

৫২. Figures in the Sector are derived from Table IV.

যুক্তি দেখান যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় থেকেই পরিকল্পনা কমিশন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি খাতের জন্য অবাস্তব বিনিয়োগলক্ষ্য স্থির করে দেয়। কমিশন ভাল করেই জানতো যে, ওসব লক্ষ্য কখনো বাস্তবায়িত হবে না। এটা প্রমাণিত হয় এ তথ্য দ্বারা যে, পরবর্তী পরিকল্পনাগুলোর আমলে পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি খাত তার ব্যয়ের লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে পড়ে, অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়িত কিংবা অতিক্রান্ত হয়। পরিকল্পনার শুরুতেই সার্বিক উন্নয়নব্যয়ের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য কমিয়ে আনার কৃত্রিম ধারণা সৃষ্টির অভিসন্ধি নিয়েই কাজটি করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদগণ যুক্তি দেখান যে, সার্বিক উন্নয়নব্যয়ে সমতা আনার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি ব্যয়ের হিস্যা বেশি প্রয়োজন। চতুর্থ পরিকল্পনার প্যানেলের বাঙালি সদস্যরা যুক্তি দেন যে, খসড়া পরিকল্পনার সুপারিশকৃত ৫৫% এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় কার্যত আদায়কৃত ৪৮%-এর স্থলে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ ৬২% নির্ধারিত হোক। খসড়া পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ মোট পরিকল্পনাব্যয়ের ৩৮.৫ শতাংশ নির্ধারিত হয়। বাঙালি অর্থনীতিবিদরা বেসরকারি বিনিয়োগের এ হিস্যাটি কাটছাঁট করার সুপারিশ করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি খাতের যে আপেক্ষিক দুর্বলতা আমরা লক্ষ্য করেছি, তা দুই অঞ্চলের ভিন্ন রকম উত্তরাধিকারের অংশ। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে কোথাও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় ব্যবসায়িক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিল না। সিন্ধুতে ব্যবসা-বাণিজ্য সবই হিন্দুরা নিয়ন্ত্রণ করতো। পাঞ্জাবের ব্যবসা-বাণিজ্যে শিখ ও হিন্দুর প্রাধান্য ছিল। চামড়ার ব্যবসার সাথে যুক্ত পাঞ্জাবী মুসলিম চিনিওটীরা পাঞ্জাবের বাইরে ব্যবসা করতে পছন্দ করতো। বাংলায় বাঙালি মুসলিমরা সকল পর্যায়ের ব্যবসা-বাণিজ্যে অনুপস্থিত ছিল। সুতরাং ভারত থেকে আগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলোই ব্যবসা-বাণিজ্যের পাল্লা পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে ভারী করে তোলে। তবে এ সম্প্রদায়ও পশ্চিম পাকিস্তানে কলকারখানা স্থাপনে রাতারাতি বিনিয়োগের জন্য বস্তা বস্তা সোনা নিয়ে পাকিস্তানে আসে নি। তারা এনেছিল ব্যবসাবুদ্ধি ও দক্ষতা। সেটা দ্বারা পাকিস্তানের সূচনাপর্বে বৈদেশিক মুদ্রা উদ্বৃত্ত থাকার বছরগুলোতে আমদানিবাণিজ্যের মাধ্যমে তারা বিপুল মুনাফা অর্জন করে। কোরীয় যুদ্ধের রমরমা অবস্থা ধ্বসে পড়ার পর এসব উদ্বৃত্ত সংরক্ষণশীল বাণিজ্যনীতির আওতায় শিল্পায়নের বীজ-পুঁজিরূপে কাজ করে।

এটা পরিষ্কার যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে উভয় অঞ্চলের শিল্পক্ষমতাই ছিল নগণ্য এবং বস্ত্র-উৎপাদন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সমপরিমাণ ছিল। সিগারেট ও সিমেন্ট উৎপাদনে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা ছিল সামান্য। পূর্ব পাকিস্তান ছিল বড় রকমের চা-উৎপাদনকারী। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের কলকারখানায় নিয়োজিত কর্মীসংখ্যা ছিল ১১৭, ৩৫৫ জন, আর পূর্ব পাকিস্তানে এদের সংখ্যা ছিল ৫৫,০৭৪ জন। ১৯৫৪ সাল নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায়। সেখানে চাকুরিরত লোকের সংখ্যা প্রায় ৮৮ হাজার ছাড়িয়ে যায়। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে তা বৃদ্ধি পায় মাত্র ৩৩

হাজার। পশ্চিম পাকিস্তানে বৃহদায়তন শিল্পউৎপাদন ১৯৪৯-৫০ সালের ২১ কোটি টাকা থেকে দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় পৌঁছে। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে তা ৩ কোটি ৮০ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।[৫৩] পশ্চিম পাকিস্তানে সুতার উৎপাদন ১৯৪৮-৪৯ সালের ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড থেকে ১৯৫৪-৫৫ সালে ২৫ কোটি ২০ লক্ষ পাউন্ডে উপনীত হয় এবং বস্ত্রের উৎপাদন একই সময়ে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ গজ থেকে ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ গজে বর্ধিত হয়।[৫৪] পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে সুতা ও কাপড়ের উৎপাদন সামান্যই বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৫৪-৫৫ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প ও যানবাহন খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৭০ কোটি টাকা, আর পশ্চিম পাকিস্তানে ঐ খাতগুলোতে বিনিয়োগ করা হয় ২১৩ কোটি টাকা।[৫৫] বেসরকারি খাতের বিকাশের আরেকটি পরিমাপ পাওয়া যেতে পারে অঞ্চলগুলোর জন্য প্রদত্ত পুঁজির অনুমোদন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান থেকে। ১৯৪৮-৫১ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১০ কোটি ৬ লক্ষ টাকার পুঁজি প্রদান অনুমোদিত হয়। আর পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য অনুমোদিত হয় ৪২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা।[৫৬] তা থেকে ৩০ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা (৭৩%) অনুমোদিত হয় করাচীর জন্য। এমনি করে পাকিস্তানে শিল্পায়নের গোড়ার দিকে করাচীতে বসবাসরত বহিরাগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলোর হাতে পুঞ্জীভূত বাণিজ্যিক পুঁজি একটি নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়।

পাকিস্তানের প্রথম বছরগুলোতে অবাধ অর্থনীতির অধীনে ব্যবসার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র অবিন্যস্তভাবে যে কাজ করেছে সেটাই হয়তো পাকিস্তানে আদি পুঁজি গঠন বা পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্বের একটা ব্যাখ্যা দিতে পারে। রাষ্ট্র তখনো বেসরকারি খাতে পুঁজি গঠনের জন্য অর্থ যোগানোর একটা তাৎপর্যপূর্ণ উৎস হয়ে উঠে নি। পাকিস্তানের প্রথম বছরগুলোতে যে একমাত্র এজেন্সি হাতের কাছে ছিল তা হচ্ছে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (পিআইএফসি)। এর ২ কোটি টাকার আদায়কৃত মূলধনের শতকরা মাত্র ৫১ ভাগ ছিল সরকারের।[৫৭] বৈদেশিক মুদ্রার উপর হাত না থাকায় এর ঋণদান তৎপরতা দারুনভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে এটা কেবল শতকরা ৬ টাকা সুদে ঋণদান করতে থাকে। ১৯৪৯-৬০ সময়কালে পিআইএফসি প্রায় ২৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ঋণদান করে। এর ৫৬ শতাংশ যায় বস্ত্রকারখানা ও পাটশিল্পে এবং অধিকাংশ যায় বৃহৎ কলকারখানার মালিকদের হাতে। ঐ প্রাথমিক যুগে বেসরকারি খাতে এ রকম সব বড় কলকারখানা স্থাপিত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। কাজেই এটা অনুমান করা ন্যায়সঙ্গত হবে যে, পিআইএফসি থেকে খুব স্বল্প সংখ্যক

---

৫৩ Akhlaqur Rahman, *Partition, Integration, Economic*

৫৪ ঐ।

৫৫ Haq, *Strategy of Economic Planning*

৫৬ *Pakistan Statistical Year Book 1968*

৫৭ S. A. Abbas and Beecher, Foreign Aid and Industrial Development of Pakistan (U.K. 1972)

বাঙালিই উপকার পেয়েছে, যদিও এর ঋণ কয়েকটি অবাঙালি পরিবার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত পাটকলে বিনিয়োগে সহায়তা করে।

এটাও অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হবে যে, পাকিস্তানের প্রথম যুগের শুরুতে বেসরকারি শিল্পখাতে যে বিনিয়োগ হয় তা এসেছিল ব্যবসা এবং পরে পণ্য উৎপাদনে অর্জিত মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ থেকে। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এসব উৎসের সৃষ্টি হয়েছিল পুঁজি বা অর্থ জমানোর ক্ষেত্রে 'যে যা পারো হাতিয়ে নাও' নীতির ফল হিসেবে। ১৯৫২ সালের পরে ব্যবসাভিত্তিক পুঁজিসঞ্চয় আমদানি লাইসেন্স প্রাপ্তির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল থাকে। অতিরিক্ত মূল্যের বিনিময়হার, আমদানি সীমাবদ্ধকরণ এবং শিল্পখাতে আমদানি লাইসেন্স নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ—এসবের মানে দাঁড়ায় এই যে, বরাদ্দ সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ একচেটিয়া মুনাফা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিতে পরিণত হয়েছিল। আমদানি লাইসেন্স বিতরণ এমনি করে কে কোথায় কি শিল্প স্থাপন করবে তা নির্ধারণের ব্যাপারে সরকারের একটা নীতিগত হাতিয়ারে পরিণত হয়। ১৯৫১ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে দেখা যায় যে, পাকিস্তান সরকার ১১০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বাণিজ্যিক আমদানি লাইসেন্স বরাদ্দ করেছে এবং তার ৬৭% পেয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী আমদানিকারকরা। এসব লাইসেন্স শিল্পে বিনিয়োগের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর সম্পদ এনে দেয়।

যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে, পাকিস্তান সরকার শিল্পায়নের এই প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপত্তিস্থল, প্রাথমিক বাসস্থান ও নগদ টাকার উৎস যেখানেই হোক না কেন, তা বিচার না করে বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগে বাধ্য করতে পারতো। অনুরূপভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বৈধ বাণিজ্যিক আমদানির লাইসেন্সসমূহও পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস ও কর্মরত ব্যবসায়ীদেরকে দেয়া যেতো। বাঙালিদেরকে পুঁজিসঞ্চয়ের একটা উৎস প্রদানের বিষয়টাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া যেতো। আঞ্চলিক বৈষম্য স্থায়ীকরণে বিনিয়োগের স্থান ও পুঁজিসঞ্চয়ের ক্ষমতা একটা বাজারসৃষ্ট শক্তি—এ ধারণাটি ১৯৫০-এর দশকে পাকিস্তানের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকালীন অর্থনীতির ব্যাপারে কোনক্রমেই খাটে না।

শিল্পায়নের, বিশেষকরে মাঝারি ও বৃহৎশিল্পের গতিবেগ বৃদ্ধিকল্পে পাকিস্তান সরকার পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন (পিআইডিসি) স্থাপন করে। কথা ছিল, এ সরকারি সংস্থাটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনার জন্য সরাসরি কিংবা বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় শিল্প স্থাপন করবে এবং শেষোক্তগুলো থেকে অবিলম্বে বা পর্যায়ক্রমে সরকারি হোল্ডিংসমূহ প্রত্যাহার করবে। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পায়নে পিআইডিসি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, তবে পশ্চিম পাকিস্তানেও তা সক্রিয় ছিল। ১৯৫২ সালে জন্মের সময় থেকে ১৯৭০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত পিআইডিসি ১১৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা

বিনিয়োগ করে পশ্চিম পাকিস্তানে ৫৮টি শিল্পপ্রজেক্ট স্থাপন করে। এর ২০.৯% বিনিয়োগ আসে বেসরকারি খাত থেকে।[৫৮] পূর্ব পাকিস্তানে পিআইডিসি ১৮৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে ৭৪ টি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট স্থাপন করে।[৫৯] এতে দেখা যায়, পিআইডিসি-এর ৬১ শতাংশ বিনিয়োগ যায় পূর্ব পাকিস্তানে। যুক্তি দেখানো যায় যে, বেসরকারি খাত পশ্চিম পাকিস্তানে বিনিয়োগে অধিকতর আগ্রহী থাকার ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার জন্য এসব সরকারি শিল্পবিনিয়োগের আরো বৃহত্তর অংশ পূর্ব পাকিস্তানে আসতে পারতো।

১৯৫০-এর দশকের শেষদিকে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সহায়তাকল্পে পিআইডিসি আরো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান শিল্প ঋণ কর্পোরেশন (পিআইসিআইসি) এবং ১৯৬১ সালে পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (আইডিবিপি) স্থাপন করে। ব্যাঙ্কটি পিআইএফসি ও-এর সম্পদ ও দায় অধিগ্রহণ করে। পাকিস্তান সরকারও ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান বিনিয়োগ কর্পোরেশন এবং ১৯৭০ সালে ইকুইটি পার্টিসিপেশন ফান্ড গঠন করে। এসব এজেন্সি পাকিস্তানে বেসরকারি শিল্পকে উৎসাহ প্রদানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৬৫৭-৬০ সালের মধ্যে এসব এজেন্সি কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ৪৮০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা থেকে ১৯২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রকল্পসমূহ।[৬০] কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ১৭২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা (৪২%) পূর্ব পাকিস্তানে আসে।[৬১] পাকিস্তানের সরকারি উন্নয়ন ফিন্যান্স ইনস্টিটিউটসমূহের (পিডিএফআই) ঋণদান নীতি এটাই প্রতিপন্ন করে যে, পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদানে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তারা বেসরকারি বিনিয়োগের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে হবার ব্যাপারটি সংশোধন করতে পারে নি, ফলে ১৯৫০ সালের মধ্যে বেসরকারি খাতের উন্নয়নব্যয়ের শতকরা ৭৭ ভাগ চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। পিডিএফআই কার্যত এসব বৈষম্যে উৎসাহ প্রদান করে, যেহেতু বেসরকারি খাতের বিনিয়োগে সরকারি ঋণদান কার্যক্রম সবসময়েই অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এসেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি খাতে অবাঙালিদের প্রাধান্য

পাকিস্তান আমলে যেটা কম নজরে পড়েছে তা হলো এই যে, পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি বিনিয়োগ বলতে বাঙালিদের দ্বারা বিনিয়োগ বুঝাতো না। পাকিস্তানে

---

৫৮. *Pakistan Economic Survey*, 1970-71

৫৯. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *Public Enterprise in an Intermediate Regime: A Study in the Political Economy of Bangladesh*, (Dhaka 1980).

৬০. ঐ।

৬১. Muinth, *Bangladesh*

গণবিতর্কের মূলকথা ছিল বিনিয়োগের স্থান হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানকে নির্বাচন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ যাতে সেভাবেই হয় সেজন্য রাষ্ট্রীয় নীতি ও সম্পদকে কাজে লাগানো। কিন্তু কার্যত বাঙালি মুসলিমদের দুর্বল ব্যবসায়িক যোগ্যতার কারণে পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে অবাঙালিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, অবাঙালি মুসলিমরা অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগ প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় বিত্তবান ব্যবসায়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল। বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মধ্যে এ শ্রেণীটি ছিল যথেষ্ট প্রভাবশালী। ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালের মধ্যে পিআইডিসি আনুমানিক ২২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার স্থির পরিসম্পৎসহ পূর্ব পাকিস্তানে ১২টি জুট মিল স্থাপন করে। এতে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে অবাঙালিদের অবস্থান যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠে। জুটমিলগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় অবাঙালি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে।[৬২] ইপিআইডিসি এসব পাটকল স্থাপনে বৈদেশিক মুদ্রা যোগায়। পরবর্তীকালে তা ১৯৫৪ সালে কর্ণফুলী কাগজের মিলটি ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যে দাউদগোষ্ঠীর কাছে হস্তান্তর করে। এ অঙ্কটি ছিল মিলটির প্রকৃত মূল্যের চাইতে অনেক কম।[৬৩] পূর্ব পাকিস্তানে পিআইসিআইসি এবং আইডিবিপি প্রদত্ত ঋণের এক-তৃতীয়াংশ লাভ করে অবাঙালিরা।[৬৪] ১৯৬৯-৭০ সালে বাঙালি ব্যবসায়ী শিল্পোদ্যোক্তাদের ঋণদান ত্বরান্বিত করা হয়। ১৯৫৭ সালের মধ্যে আইডিবিপি এবং পিআইসিআইসি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের ৪২.২ শতাংশ অর্থাৎ ১০২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা কেবল বাঙালিদেরকেই দেয়া হয়। এটা করা হয় ইতিপূর্বে পিডিএফআই বাঙালিদেরকে উপেক্ষা করেছিল বলে।[৬৫] এ সময়টুকু (১৯৬৯-৭১) বাদ দিয়ে আমরা যদি ধরে নেই যে, ১৯৫৭-১৯৬৯ কালপর্বেই পিডিএফআই পূর্ব পাকিস্তানে তার সকল ঋণ অবাঙালিদেরকে দিয়েছিল, তাহলে দেখা যায় যে, ১৯৬৯ পর্যন্ত অবাঙালিরা পিডিএফআইসমূহের দেয়া ১১৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ঋণের ৬২ শতাংশ লাভ করেছে।[৬৬]

প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় স্পন্সরশীপ এবং অবকাঠামোর উন্নয়ন ও আঞ্চলিক বাজারের প্রসারের সাথে বিনিয়োগের উৎস হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন অবাঙালি ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা এদিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রাক-মুহূর্তে পূর্ব

---

৬২. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *Public, Enterprise*

৬৩. T Hexner *EPIDC-A Conglomerate in East Pakistan*, (Harvard Institute of International Development 1969)

৬৪. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmede, *Pablic Enterprise.*

৬৫. ঐ।

৬৬. ঐ।

পাকিস্তানের শহরাঞ্চলীয় অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে অবাঙালিদের কব্জায় ছিল।[৬৭] শিল্পখাতে তারা শতকরা ৪৭ ভাগ শিল্পপরিসম্পৎ নিয়ন্ত্রণ করতো। ইপিআইডিসি নিয়ন্ত্রণ করতো শতকরা ৩৪ ভাগ এবং বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল শতকরা ২৩ ভাগ। তবে বেসরকারি শিল্পখাতে অবাঙালিরা শতকরা ৭২ ভাগ শিল্পপরিসম্পৎ নিয়ন্ত্রণ করতো। অবাঙালিরা ২৮টি চা-বাগানও নিয়ন্ত্রণ করতো। চা-এর মোট উৎপাদনের শতকরা ১৯ ভাগ আসতো এ বাগানগুলো থেকে।

বাণিজ্যখাতে বড় আমদানি ক্যাটাগরিহোল্ডারদের শতকরা ৯৩ ভাগই ছিল অবাঙালি এবং তাদের মধ্যে শতকরা ৫৭ জন ছিল মেমন সম্প্রদায়ভুক্ত।[৬৮] পাকিস্তানের দুই অংশের আন্তঃবাণিজ্যেও নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ছিল অবাঙালিদের। অবাঙালিদেরকে আমদানি লাইসেন্স দেয়া হলে বহু ক্ষেত্রে তারা সেগুলো অপেক্ষাকৃত সুপ্রতিষ্ঠিত অবাঙালিদেরকাছে বিক্রি করে দিত। মাত্র শতকরা ৯৫ জন তালিকাভুক্ত বাঙালি আমদানিকারক অত্যন্ত ছোট লাইসেন্সই পেতো।[৬৯] রপ্তানিবাণিজ্য অনুরূপভাবে অবাঙালিকবলিত ছিল। পাটের রপ্তানিবাণিজ্যে অবাঙালিদেরহিস্যা ছিল ২৫%, বাঙালিদের ৩৩% এবং বাকিটা নিয়ন্ত্রণ করতো বিদেশী ও সরকারি খাতের ধারকগণ। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের চা, কাগজ, কাগজজাত দ্রব্যাদি, দিয়াশলাই, ট্যাগ করা দ্রব্যাদি রপ্তানিতে অবাঙালিরাই ছিল প্রধান। পূর্ব পাকিস্তানের পাইকারি ব্যবসা এবং শহরাঞ্চলের খুচরা ব্যবসার বেশিরভাগও তারাই নিয়ন্ত্রণ করতো।

ব্যাঙ্কিং-এর এলাকায় ডিপোজিটের শতকরা ৭০ ভাগই যেতো অবাঙালি ব্যাঙ্কগুলোতে। বীমা ব্যবসার বেশিরভাগ চালাতো অবাঙালি বীমা কোম্পানিগুলো।[৭০] অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনের ক্ষেত্রে অতি বৃহত্তম জাহাজ-মালিকদের দুজনই ছিলেন অবাঙালি।

পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক অবাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক অর্থনৈতিক খাতও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করতো। এর ফলেই তারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ব্যবসাবাণিজ্য থেকে অর্জিত মুনাফা পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগের জন্য সেখানে নিয়ে যেতে পারতো। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি বিনিয়োগ দ্রুততর করার প্রয়াসজনিত প্রবৃদ্ধি পশ্চিম থেকে পূর্ব পাকিস্তানে রপ্তানির জন্য বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনৈতিক বিকাশকে উৎসাহিত করে। ১৯৭১ সাল নাগাদ পূর্ব

---

৬৭. ঐ।

৬৮. H Papnek, *Entrepreneurs in East Pakistan*, South Asian Series Research Paper NO 16, Publishfd by Asian Studies Centre, Michigan State University, 1969

৬৯. ঐ।

৭০. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *Public Enterprise*

পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহদায়তন শিল্পখাতের ১৫ শতাংশ উৎপন্নদ্রব্যের বাজারে পরিণত হয়।[৭১]

পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদান করতে হলে সম্পদ যাতে বাঙালিদের হাতে যায় সে ব্যবস্থা করতে হতো। কিন্তু পাকিস্তানের অখণ্ড বহুজাতিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে এরকম জাতিভিত্তিক ব্যবস্থা সম্ভব ছিল না, যদিও মালয়েশিয়াতে চীনাদের মুখোমুখি মালয়ীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে এটা বহু বছর ধরে নীতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। তদুপরি, সরকারি সম্পদাদি গ্রহণে ইচ্ছুক বাঙালি ব্যবসায়ী উদ্যোক্তার সংখ্যাল্পতাও ছিল একটা সমস্যা। আমদানি লাইসেন্সসমূহ, শিল্পস্থাপনের অনুমতি এবং পিডিএফআই-এর ঋণ প্রায়ই চলে যেতো অবাঙালি ব্যবসায়ীদের হাতে। যাই হোক, ১৯৬০-এর দশকে পিডিএফআই-এর সম্পদসমূহ যাতে বাঙালি ব্যবসায়ীরা পায় সেজন্য একটা সচেতন প্রচেষ্টা নেয়া হয় এবং প্রথমবারের মতো একজন বাঙালিকে আইডিবিপি-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯৬৯ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী গণঅভ্যুত্থানের পরে পিডিএফআইগুলো পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ঋণদান তৎপরতা বাড়িয়ে দেয় এবং বাঙালি আবেদনকারীদেরকে ঋণদান বৃদ্ধি করে।

বাঙালি উদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশ

বাঙালিদেরব্যবসা ও শিল্পোদ্যোগের যোগ্যতা কম থাকায় ই পিআইডিসি-এর নেতৃত্বে সরকারি খাতকে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পায়ন জোরদারকরণে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। সরকারি খাতকে বেসরকারি ব্যবসায়িক উদ্যোগের স্থান গ্রহণ করতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানী আমলাতন্ত্র অর্থনীতিতে অবাঙালিদের অধিকতর প্রভুত্ব নিরোধের গুপ্ত কৌশলরূপে সরকারি খাতের সম্প্রসারণকে ব্যবহার করে। ১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে ই পিআইডিসি বাঙালিদেরকে পাটশিল্পে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। এটি বাঙালি উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় ১০টি পাটকল স্থাপনের জন্য ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে।[৭২] পিডিএফআইসমূহ থেকে অধিকতর সাহায্য পাওয়ার ফলে উক্ত মিলগুলোর বাঙালি মালিকদেরকে মিলগুলো স্থাপনে প্রয়োজনীয় মোট বিনিয়োগ ১৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার শতকরা মাত্র ২০ ভাগ দিতে হয়। ইপিআইডিসি সুবিধাজনক শর্তে ২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা নিয়ে একটি কাপড়ের মিল ও ৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকায় একটি চিনিকল থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে বাঙালি উদ্যোক্তাদের হাতে ছেড়ে দেয়।[৭৩]

৭১. Computed from estimates of value added in manufacture in West Pakistan Reported in *Pakistan Economic Survey*, 1971 and estimates of interwing trade, reported in World Bank, *Bangladesh Development*.

৭২. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *Public Enterprise*.

৭৩. T. Hexner, *FPIDC*.

একটি বাঙালি উদ্যোক্তাশ্রেণী গড়ে তোলার উপরোক্ত প্রয়াসসমূহের ফল হিসেবে স্বাধীনতা অর্জনকালে আধুনিক শিল্পখাতে স্থির পরিসম্পৎ-এর ১৮ শতাংশ ছিল বাঙালিদেরহাতে। তবে উক্ত বিনিয়োগগুলোর পাঁচ ষষ্ঠাংশই ছিল পাট ও বস্ত্রখাতে এবং একটি পুঁজি-প্রত্যাহৃত চিনিকলে। এতে বাঙালি উদ্যোগ ও মালিকানার বেশিরভাগই সীমাবদ্ধ থেকে যায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের কলকারখানায়।

ব্যাঙ্কিং খাতে বাঙালিরা ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক ও দি ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন নামে দু'টি ব্যাঙ্ক স্থাপন করে। বীমাখাতে স্বাধীনতা অর্জনকালে বাঙালিদের ১২টি কোম্পানি ছিল।[৭৪] এগুলোর পরিসম্পৎ-এব হিস্যা ছিল অতি ক্ষুদ্র। এগুলো ব্যবসা করতো প্রধানত পাটরপ্তানি ক্ষেত্রে। বাঙালি পাট রপ্তানিকারকদের বেশিরভাগ স্মল শিপারস এসোসিয়েশনের সদস্য হলেও মিলিতভাবে পাটের মোট শিপমেন্টের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তারাই করতো। জহুরুল ইসলাম পরিবারের মতো কিছু সংখ্যক বাঙালি বেসামরিক বিনির্মাণের বড় বড় ঠিকাদারি পেতে শুরু করেছিল। সিভিল সার্ভিসের কোন কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী আমলাতন্ত্রের মধ্যে তাঁদের যোগসংযোগগুলোকে কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত লাভজনক ইনডেন্টিং ব্যবসায়ে ঢুকে পড়েন। ইনডেন্টিং ব্যবসায়ে, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সরবরাহের ক্ষেত্রেও অবাঙালি প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। বাঙালি ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাশ্রেণী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অর্জিত এসব সাফল্যের অধিকাংশ ১৯৬০-এর দশকের এবং বিশেষকরে ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগের ফসল, যখন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ক্রমবর্ধমান চাপ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে আমলাতন্ত্রের মধ্যে উপরে উঠার ও ব্যবসার ক্ষেত্রে অধিকতর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সুযোগ এনে দিচ্ছিল। তবে এই উদীয়মান বাঙালি ব্যবসায়ী শিল্পপতিশ্রেণী অবাঙালিদের কনিষ্ঠ অংশীদার থেকে যায় এবং স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবসাজগতে অবাঙালি প্রাধান্য অব্যাহত থাকে।

সুতরাং এটা যুক্তিসঙ্গত যে, ব্যবসা-শিল্পগত উদ্যোগের ব্যাপারটি সব সময় পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে কাজ করে। ভারত থেকে আগত উদ্বাস্তু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়সমূহের আকস্মিক বসতিস্থাপনের দরুন পাকিস্তানের গোড়ার দিনগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানই এগিয়ে ছিল। এটা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান ব্যবধানকে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তোলে এবং আরো প্রসারিত করে। বাঙালি ও অবাঙালি উদ্যোক্তাদের মধ্যকার ব্যবধানও এর ফলে আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে আমরা পরবর্তী অংশে দেখবো যে, অর্থনৈতিক নীতির দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই প্রধান প্রভাববিস্তারকারী হিসেবে থেকে যায়। পশ্চিম পাকিস্তান প্রথম থেকে যে সুবিধা ভোগ করে তার ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার জন্য রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি ব্যবসাশিল্পকে উৎসাহদান ও সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, উভয় কাজই করতে পারতো।

৭৪. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *Public Enterprise*

রাষ্ট্র যে সামন্ত ও পেশাজীবী শ্রেণীগুলোকে শিল্পের ক্ষেত্রে টেনে আনার ব্যাপারে একটা নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে পারতো তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬০-এর দশকে পাঞ্জাবী ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ব্যবসায়ী পরিবারগুলোর দ্রুত উত্থানের মধ্যে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা কোন রকম ব্যবসায়িক পশ্চাৎভূমিহীন এক ব্যক্তিকে পাকিস্তানের ৪৩ টি শীর্ষস্থানীয় পরিবারের অন্যতম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কি করতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে আছে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ছেলের শ্বশুর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশবাসী জেনারেল হাবিবুল্লাহ খান খট্টকের মালিকানাধীন গান্ধারা ইন্ডাস্ট্রিজ-এর উত্থান। আজ লাহোর করাচীর মতোই পাকিস্তানের একটি গতিশীল বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের একটি নতুন প্রজন্ম সমৃদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে তেমনটি ঘটে নি।

বাঙালিরা তাদের নিজেদের দেশে এ বিদেশী উপস্থিতির ছায়ায় বাস করছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবসার সুযোগগুলোতে হাত দিতে পারছিল না। নতুন উদ্যোগ গ্রহণ বা ব্যবসার সুযোগলাভের জন্য করাচী-ইসলামাবাদে ছোটাছুটি করতে তারা বিরক্তিবোধ করতো এবং এসব কাজে অবাঙালি আমলারা বাঙালি ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো বলে তারা অসন্তুষ্ট হতো। গোড়ার দিকের বছরগুলোতে অবাঙালি সিভিল সার্ভেন্টরাই পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয় চালাতো। পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করার পর বাঙালিরা ইসলামাবাদের তুলনায় তাদের ক্ষমতাহীনতা এবং সম্পদ ও দায়িত্বের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণহীনতার দরুন হতাশায় ভুগতো। বাঙালির আইডিবিপি'র মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ এবং কেন্দ্রে সচিব পদে নিযুক্তিলাভ শুরু হবার পরেই কেবল বাঙালি ব্যবসায়ীদের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, সুযোগের পাল্লা তাদের দিকে ঝুঁকছে। সুতরাং পাকিস্তান যেমন চিনিওটী ও মেমনদেরকে অবিভক্ত ভারতের মাড়োয়ারি ও গুজরাটি ব্যবসায়ীদের প্রধান্য থেকে মুক্তিলাভের সুযোগ এনে দিয়েছিল, তেমনি কেন্দ্রে বাঙালিদেব ক্ষমতালাভ এবং প্রদেশে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বর্ধিষ্ণু বাঙালি ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের জন্য অবাঙালি বাণিজ্যিক প্রাধান্য থেকে মুক্তিলাভের সুযোগ এনে দেয়।

অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে পক্ষপাতিত্ব

সম্পদবরাদ্দ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ব-পশ্চিম বিরোধের কারণ হিসেবে থেকে যায়। সরকারি সম্পদ ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ন্ত্রিত হতো সরকারি নীতি দ্বারা, যা অর্থনৈতিক তৎপরতার স্থান ও অর্থ যোগানোর উৎস উভয়কেই প্রভাবিত করতো। আমরা সরকারি নীতির চারটি এলাকার উপর দৃষ্টিপাত করবো। এগুলো অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্বকে প্রতিফলিত করেছে, বঞ্চনাবোধকে সুদৃঢ় করেছে এবং এ বঞ্চনাবোধ বাঙালি জাতীয়তাবাদের আগুনে ঘি ঢেলেছে। এ এলাকাগুলোর মধ্যে পড়ে বাণিজ্যনীতি, বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের হার নির্ধারণ, ফেডারেল ফিন্যান্স ও বহিঃসম্পদ আহরণ নীতি।

বাণিজ্যিক নীতি

বাঙালিদের মনে অত্যন্ত গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল যে বিষয়টি, তা হলো পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারে বঞ্চনা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রধান বাজার ছিল ভারত। পাকিস্তানের ৬৫ শতাংশ ভাগ পাট যেতো ভারতে এবং অবশিষ্ট ৩৫ শতাংশ রপ্তানি হতো বিশ্বের অন্যান্য দেশে।[৭৫] এ পরিস্থিতি শিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলার বৈষম্যকে প্রতিফলিত করেছে। ভারতের পাটকলগুলো ছিল পশ্চিম বাংলায়, আর সেরা পাট উৎপন্ন হতো পূর্ব বাংলায়। ১৯৪৭-এর পরেও ভারতের সাথে পাটের বাণিজ্য পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবীর জীবনরক্ষার একমাত্র অবলম্বন থেকে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে পাট ও পশ্চিম পাকিস্তানে কাঁচা তুলা উৎপাদন যাতে বন্ধ হয়ে না যায় প্রধানত সে কারণেই ১৯৪৭-এর পরে ভারতের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চলে। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান তার উৎপাদিত কাঁচা তুলার শতকরা ৮০/৯০ ভাগ ভারতে রপ্তানি করেছে। ভারতবিভক্তির পরে কাঁচা পাট ও তুলার নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করার সচেতন প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৪৮ সাল নাগাদ উৎপন্ন কাঁচা পাটের ৪৮ শতাংশ অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়, কিন্তু কাঁচা পাটের ১৮ শতাংশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের তুলা ফসলের ৪৩ শতাংশ তখনো ভারতেই রপ্তানি হতো।

১৯৪৯ সালে টাকার অবমূল্যায়নে ভারতের সাথে যোগ দিতে পাকিস্তানের অস্বীকৃতির পরিণাম হিসেবে ভারতের সাথে বাণিজ্যসম্পর্ক রহিত হবার ফলে পাট উৎপাদনকারীরা বিপদের সম্মুখীন হয়।[৭৬] এ বিরোধের গুণাগুণ যাই থাকুক না কেন, এর ফলে সৃষ্ট দুর্ভোগের পুরো বোঝাটাই পড়ে পূর্ব বাংলার পাটচাষীদের ঘাড়ে। পাটের বিক্রি ও মূল্য হ্রাস পাওয়ায় পাটচাষীদের আয় মারাত্মকভাবে কমে যায়। পাটের মূল্যের সূচক ১৯৪৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৪৯ সালের মার্চ এবং ১৯৫০-এর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১০০ থেকে ৭১-এ নেমে আসে।[৭৭] আরো অধিকতর পতন থেকে রেহাই পাওয়া যায় আকস্মিকভাবে কোরীয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে। এতে পাটসহ সকল দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্যমূল্য ও আয় অনেক বেড়ে যায়। পূর্ব বাংলার রপ্তানিআয় ১৯৪৯-৫০ সালের ৬২ কোটি টাকা থেকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫০-৫১ সালে ১২১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।[৭৮] এ ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা হলো করাচীতে নির্ধারিত বাণিজ্যিক নীতি পূর্ব বাংলার উৎপাদকদের জীবনকে কেমনভাবে প্রভাবিত করে তা দেখানোর জন্য।

---

৭৫. Akhlaqur Rahman, *Partition, Intergration, Economic.*

৭৬. প্রাগুক্ত।

৭৭. ঐ।

৭৮. ঐ।

ভারতে পাট রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষতি পোষানো সম্ভব হয় পাটের বিকল্প বাজার সৃষ্টি হওয়ায় এবং পূর্ব বাংলা থেকে পাট রপ্তানি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়ার পরিণতি হয় আরো দীর্ঘস্থায়ী। পূর্ব ভারতে পাটের উৎপাদন ১৯৪৫-৪৬ সালের ১ কোটি ৫৭ লক্ষ গাঁট থেকে বেড়ে ১৯৫১-৫২ সালে ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ গাঁট এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ৫ কোটি ২০ লক্ষ গাঁটে উন্নীত হয়।[৭৯] পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে রপ্তানি ১৯৪৫-৪৬ সালে ৪০ লক্ষ গাঁট থেকে ১৯৫১-৫২ সালে ২৬ লক্ষ গাঁটে এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ২ লক্ষ গাঁটে নেমে আসে।

বিনিময়হার নীতি

বাঙালিদের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক নীতির পার্থক্যমূলক চরিত্রের কুফল আমদানি ও বিনিময়হারনীতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব দ্বারা আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৫২ সালে কোরীয় যুদ্ধকালীন রমরমা অবস্থার অবসান ঘটার পরে পাকিস্তান আমদানিতে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এটা পাকিস্তানের পরবর্তী ইতিহাসে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত টাকার অতিরিক্ত মূল্যায়নকে টিকিয়ে রাখে। এর দরুন বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক রেশনিং এবং উচ্চহারে আমদানিশুল্ক প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়। ১৯৫০-এর দশকে ১৯৫৫ সালের অবমূল্যায়নের সময় পর্যন্ত টাকার মূল্য ১০০% অতিরিক্ত ছিল।[৮০] ১৯৫৮ সালের পরে এ অতিরিক্ত মূল্যায়ন কিছু কমানো হলেও তা ১৯৬০-এর দশকেও শতকরা ৭৪ থেকে ১০০-এর মধ্যে থেকে যায়।

পূর্ব পাকিস্তান দু'ভাবে এ বিশেষ নীতি-ব্যবস্থার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। টাকার এ অতিরিক্ত মূল্যায়নের অর্থ ছিল এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানী আমদানিকারকরা পাচ্ছিল ভর্তুকি, আর পাট উৎপাদনকারীরা পাচ্ছিল তাদের রপ্তানির জন্য কম দাম। একজন প্রখ্যাত বাঙালি অর্থনীতিবিদ হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ১৯৫৯-৬০-এর একটি মাত্র বছরে টাকার এ অতিরিক্ত মূল্যায়নের মাধ্যমে পাটচাষীদের আয় থেকে ৬.৪% গোপন কর আদায় করা হয়।[৮১] প্রথমদিকের ও শেষদিকের বছরগুলোতে টাকার আরো অতিরিক্ত মূল্যায়ন ঘটায় পাটচাষীদের আয়ের উপর এ কর ১০% পর্যন্ত উঠে থাকতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তানের আমদানিকারকরা অনুরূপ কোন সুবিধা পায় নি, যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্রের কঠোর আমদানিনীতির দ্বিতীয় পরিণাম ছিল বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের ক্ষেত্রে পশ্চিম

---

৭৯. ঐ।

৮০. A. I. Islam, 'An estimation of the extent of the overvaluation of the domestic currency at the official exchange rate. *PDR*, Spring 1970

৮১. A. R. Khan , *Economy of Bangladesh*.

পাকিস্তানী আমদানিকারকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। ১৯৫২ সাল থেকে পাকিস্তানের আমদানিবাজারে অবাধ নীতির অতি সামান্যই বজায় ছিল। টাকার অতিরিক্ত মূল্যায়নভিত্তিক বিনিময়হার বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহের চাইতে চাহিদাবৃদ্ধি নিশ্চিত করে। একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা দ্বারা স্থির হয় কারা আমদানির সুযোগ পাবে এবং সেভাবেই বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করা হয়।[৮২] বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের এ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা যে পক্ষপাতদুষ্ট ছিল তা পরিস্ফুট হয়ে উঠে এ সত্যের মাধ্যমে যে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে পাকিস্তানের মোট আমদানির ৬৯ শতাংশ যায় পশ্চিম পাকিস্তানে।[৮৩]

আমদানিতে এ আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্বের অংশবিশেষ উদ্ভূত হয়েছে বাজারের গতিময়তা থেকে। একটি বৃহত্তর ও অধিকতর গতিময় অর্থনীতি ভোগ্য, মধ্যবর্তী ও মূলধন দ্রব্যাদির আমদানিচাহিদা বৃদ্ধি করে। এর ফলে অধিকতর আনুকূল্যপ্রাপ্ত অঞ্চলের যে বিকাশ ঘটে সেটা আমদানির চাহিদা আরো বাড়িয়ে দেয়। এমনি করে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে দ্রুততর উন্নয়ন ও শিল্পায়নের ফলে সেখানে আমদানির জন্য বৃহত্তর বাজার সৃষ্টি হয়। অবশ্য যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, অতিরিক্ত মূল্যায়নের কারণে পাকিস্তানের উভয় অংশের আমদানিচাহিদাই অপূর্ণ ছিল। কঠোর আমদানিনিয়ন্ত্রণব্যবস্থার অধীনে এক অঞ্চলের তুলনায় অপর অঞ্চলের আমদানিচাহিদা অধিকতরভাবে মেটানো নীতিনির্ধারকদের বিবেচনার আওতায় থেকে যায়। পশ্চাৎপদ পূর্বাংশের উন্নয়ন দ্রুততর করার জন্য সম্পদ প্রদানের প্রয়োজন থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের আনুকূলে অনুরূপ পার্থক্যমূলক আমদানিনীতি অনুসৃত হলে তা এ অঞ্চলে যে সম্পদ আকর্ষিত হতো সেটা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর আঞ্চলিক সমতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতো এবং উৎপাদন ও আয়ের বৈষম্য কমিয়ে আনতো।

কার্যত আমদানি রেশনিং ভিন্নমুখী কাজ করে। ১৯৫০-এর দশকে বাণিজ্যিক আমদানির জন্য প্রদত্ত নগদ আমদানি লাইসেন্সসমূহের সিংহভাগ কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানিকারকদের হাতে চলে যায় তা আমরা লক্ষ্য করেছি। আমদানি রেশনিং-এর পদ্ধতিটা এসেছে আমদানির অধিকার কাদের রয়েছে সেটা স্থির করার ব্যবস্থা থেকে। সেটার ভিত্তি ছিল ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকের ওজিএল নীতি, যেজন্য আমদানির বেশিরভাগ চলে গিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এ ব্যবস্থার অধীনে পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে সৃষ্ট আদি বৈষম্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থায়ী হয়ে পড়ে।[৮৪] ১৯৫০-এর দশকের শুরুতে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পস্থাপনের জন্য যেসব আমদানি লাইসেন্স দেয়া

৮২. P Thomas, S N H Naqvi, N Chowdhury, *Basic Statistics Tables: Import Licensing in Pakistan, 1953-64*, Research Report No, 35, PIDE, 1965.

৮৩. Muhith, *Bangladesh*

৮৪. Thomas, Naqvi and Chowdhury, *Basic Statistics*

হয় সেগুলো পরবর্তীকালে শিল্পে কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানকে আমদানি অধিকারের বৃহত্তর হিস্যা প্রদানের ভিত্তিতে পরিণত হয়। পূর্ব পাকিস্তানকে ৯০% বাণিজ্যিক আমদানি লাইসেন্স দেয়ার সচেতন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পূর্ব পাকিস্তান থেকে নতুন আমদানিকারক গ্রহণ (বাঙালি) এবং কিছুকালের জন্য কেবল পূর্বাংশেই শিল্পস্থাপনের অনুমতি দান ব্যতিরেকে এ ব্যবস্থার অধীনে আমদানির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান যে পশ্চিম পাকিস্তানের সমপর্যায়ে যেতে পারবে তার কোন উপায়ই ছিল না। অনুরূপ হস্তক্ষেপমূলক ব্যবস্থা স্পষ্টতই রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতো না এবং পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানির সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে ব্যবধান বেড়ে চলার দরুন গুরুতর বাজারসমস্যাও সৃষ্টি করতো।

বিনিময়হার নীতিতে এ বিকৃতি এবং আমদানির অধিকার বরাদ্দে বিভেদাত্মক নীতির ফল আরো অবনতির দিকে যায় এ কারণে যে, পূর্ব পাকিস্তানে বাণিজ্যিক ও শিল্পখাতে আমদানিকারক হিসেবে যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় মূলত অবাঙালিরাই উপকৃত হয়। সুতরাং এ বাণিজ্যিক ও বিনিময়হার নীতি কেবল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদ বরাদ্দের ব্যাপারেই অবিচার করে নি, পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরে বাঙালি পাটউৎপাদনকারী ও অবাঙালি শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের মধ্যে বরাদ্দের ক্ষেত্রেও অবিচার করেছে।

বাণিজ্যঘাটতি পূরণে অর্থসং্‌ন

বাজারের স্থান ও কার্যকারণ সম্পর্কের বর্ধিষ্ণু গতিময়তার যুক্তি কিছুটা বেশি সহনীয় হতো যদি পূর্ব পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস না হতো। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৯-৭০-এর মধ্যে পাকিস্তানের মোট রপ্তানিআয়ের ৫৫ শতাংশ অর্জন করে পূর্ব পাকিস্তান।[৮৫] তেইশ বছরের মধ্যে মাত্র ৬ বছর পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানি আয় পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে বেশি ছিল। এর মধ্যে ৩ বছর ছিল ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৫২-৫৩ পর্যন্ত। শেষ তিন বছরে অর্থাৎ ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত পশ্চিমাংশে বহু বছর ধরে উচ্চহারে শিল্পবিনিয়োগের সুফল পাওয়া যেতে থাকে রপ্তানির ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি ও রপ্তানিকাঠামোর অধিকতর বৈচিত্র্যের মাধ্যমে। ১৯৬৩-৬৪ ও ১৯৬৪-৬৫ বাদে ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে আমদানির চাইতে রপ্তানিতে একটানা উদ্বৃত্ত থাকে। শুধু শেষ তিন বছরে ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত আমদানিবৃদ্ধি ও রপ্তানিতে স্থবিরতার দরুন পূর্ব পাকিস্তানে বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসেবে ঘাটতি দেখা যায়। তুলনায় পুরো ২৩ বছরের মধ্যে ১৯৫০-৫১ ছাড়া বাকি প্রত্যেকটি বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি বিদ্যমান ছিল। পশ্চিমের ২৩.২ বিলিয়ন টাকার ঘাটতির তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের মোট উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫.৫ বিলিয়ন টাকা।[৮৬]

৮৫. ঐ।

৮৬. Thomas, Nuqvi and Chowdhury, *Basic Statistics*, Table 7, 8.

আঞ্চলিক বাণিজ্যের হিসাবে উপরোক্ত অসমতা থেকেই এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের দ্রুততর শিল্পায়ন, শিল্পের বিকাশ ও বৈচিত্র্যসাধনের খরচ যোগানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ স্থানান্তরিত হয়েছে, বিশেষকরে ১৯৫০-এর দশকে।

পূর্ব পাকিস্তানের সাথে আন্তঃঅঞ্চল বাণিজ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত ছিল স্থায়ী ব্যাপার। এ অসমতা পরবর্তী সময়ে এবং ১৯৬০-৭০ সাল নাগাদ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭.৫ বিলিয়ন টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানীরা দাবি করতো যে, বৈদেশিক বাণিজ্য খাতে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তরের ক্ষতি আংশিকভাবে পুষিয়ে দেয়া হতো দুই অংশের আন্তঃঅঞ্চল বাণিজ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত দ্বারা। বাঙালি অর্থনীতিবিদরা এ যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, পূর্ব-পশ্চিম অংশের বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্তসমূহ টাকার অতিরিক্ত মূল্যায়নের কারণে তুলনীয় নয়। তদুপরি, পাকিস্তানে পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনশিল্পের অনুপস্থিতিতে উন্নয়ন ও কাঠামোগত পরিবর্তন চালিয়ে যাবার প্রয়োজনে একমাত্র বৈদেশিক মুদ্রায় ওসব দ্রব্যাদি কিনতে হতো বলে টাকার উদ্বৃত্তের সাথে বৈদেশিক মুদ্রার উদ্বৃত্তের তুলনা করা চলে না।

বৈদেশিক সাহায্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য

বৈদেশিক সাহায্য বিদেশ থেকে অর্থপ্রাপ্তির একটা বড় উৎস হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় পরিস্থিতি কিছুটা জটিল আকার ধারণ করে। ১৯৫০-এর দশকের শেষদিক থেকে পাকিস্তান তার উন্নয়ন তৎপরতা অব্যাহত রাখার জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর ক্রমেই বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান ৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ঋণ ও মঞ্জুরি পায়।[৮৭] এর মধ্যে ৫.৬ বিলিয়ন ডলার আসে ঋণ হিসেবে এবং ১.৪ বিলিয়ন ডলার আসে মঞ্জুরি হিসেবে।[৮৮] ঋণতহবিলের ২ বিলিয়ন ডলার প্রজেক্ট সাহায্য ও ০.৯ বিলিয়ন ডলার প্রজেক্টবহির্ভূত সাহায্য ছিল এবং ০.১৫ বিলিয়ন ডলার আসে মার্কিন পিএল ৪৮০-এর অধীনে খাদ্য ও পণ্যঋণ হিসেবে।[৮৯] মঞ্জুরি তহবিলের বেশিরভাগই খাদ্যসাহায্য। তবে তার মধ্যে কিছু প্রজেক্ট ও পণ্যসাহায্যও ছিল। ৫ নং সারণিতে এ সাহায্য ও ঋণ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কিভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে তা দেখানো হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণে দেখা যায় যে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত পাকিস্তানকে প্রদত্ত ৭.৬ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্য থেকে পূর্ব পাকিস্তান পায় ২.০২ বিলিয়ন ডলার (২৬.৬%)। ১৯৪৭-৭০-এর মধ্যে প্রদত্ত তহবিলের প্রায় ৬.৪ বিলিয়ন

৮৭. ঐ।

৮৮. ঐ।

৮৯. প্রাগুক্ত।

ডলার কাজে লাগানো হয়। তা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে কাজে লাগানো হয় ১.৯ বিলিয়ন ডলার (৩০%)।

বিদেশী সাহায্য পাকিস্তানের উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে দেখা দেয়। ১৯৪৯ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে পাকিস্তানে উন্নয়নখাতে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯১.৯৪ বিলিয়ন টাকা। হিসাবে দেখা যায়, এর ৬১.৫৮ বিলিয়ন টাকা অর্থাৎ ৬৭ শতাংশই ছিল প্রদত্ত বৈদেশিক সাহায্য।[৯০] পশ্চিম পাকিস্তানের মোট ৬২ বিলিয়ন টাকা উন্নয়নব্যয়ের শতকরা ৬৮ ভাগই ছিল বৈদেশিক সাহায্য। পূর্ব পাকিস্তানের ৩০ বিলিয়ন উন্নয়নব্যয়ের ৬৪.৫% ছিল বৈদেশিক সাহায্য।

কাজেই এটা পরিষ্কার যে, উন্নয়নব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদত্ত বৈদেশিক সাহায্য ও তা ব্যয়ের সাথে অতিমাত্রায় সম্পর্কিত ছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি, পূর্ব পাকিস্তান ব্যয়িত বৈদেশিক সাহায্যের ৩০ শতাংশ এবং মোট উন্নয়নব্যয়েরও ৩০ শতাংশ লাভ করে। এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে বৈষম্যমূলকভাবে বৈদেশিক সাহায্যের অর্থ প্রদান ও ব্যয় দুই অঞ্চলের উন্নয়নে বিদ্যমান বৈষম্যকে প্রভাবিত করে। সুতরাং এটা মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে, বৈদেশিক সাহায্য হাতে পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য বাঙালিদের বঞ্চনাবোধকে আরো তীব্র করে তোলে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্যের ন্যায্য হিস্যা পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক আত্মসাতের প্রশ্নে উত্তপ্ত বিতর্কের জন্ম দেয়।

পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তর

পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক সাহায্যের অংশ পশ্চিম পাকিস্তানকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারটি সম্পদ স্থানান্তরের প্রশ্নের সাথে যুক্ত হয়। ১৯৫০-এর দশকে বাঙালিরা বিশ্বাস করতো যে, তাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি পূরণ করা হচ্ছে। এ স্থানান্তরের দরুন পূর্ব পাকিস্তানের যে ক্ষতি হয় সেটা পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্যঘাটতি দ্বারা পূরণ হয় নি। যাহোক, এর সাথে যদি আমরা পশ্চিম পাকিস্তানকে ছেড়ে দেয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য বৈদেশিক সাহায্যের অংশকে যোগ করি, তাহলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তরের অধিকতর ব্যাপক পরিমাপ পাওয়া যেতে পারে।

এসব বিতর্কের অংশবিশেষের মধ্যে ধারণাগত বিভ্রান্তি ও হিসাবে গুরুতর সমস্যা দেখা যায়। চতুর্থ পরিকল্পনার প্যানেলভুক্ত বাঙালি অর্থনীতিবিদগণ অত্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে এটা স্পষ্ট করে দেন। ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৬৯-৭০-এর মধ্যে সকল বছরে পাকিস্তানী টাকার যে অতিরিক্ত মূল্যায়ন হয়েছে তার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অঙ্কে টাকার মূল্য

৯০. সারণি ৪-এ উপস্থাপিত হিসাব থেকে প্রাপ্ত।

নির্ধারণ করে তাঁরা আন্তঃঅঞ্চল ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেনের একটা কাছাকাছি হিসাব দাঁড় করাতে সক্ষম হন।

৬ নং সারণিতে আমরা অর্থনীতিবিদ প্যানেলের তৈরি আঞ্চলিক ব্যালেন্স অব পেমেন্টের মোটামুটি হিসাব তুলে ধরবো। ১৯৬০-৬১ পর্যন্ত দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত থাকে এবং সেটা অধিক মূল্যের হিসেবে ৫.৪ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি দাঁড়ায় ২১ বিলিয়ন টাকা। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে উভয় অঞ্চলেরই ঘাটতি হয়, যদিও পশ্চিম পাকিস্তানে ঘাটতি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে ৩.৭ গুণ বেশি। উভয় অঞ্চলের ঘাটতি পূরণ হয় বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা। পশ্চিম পাকিস্তান এভাবে বৈদেশিক সাহায্যের বৃহত্তর হিস্যা লাভ করে। ১৯৬০-এর দশকে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য ও পেমেন্টের উদ্বৃত্ত এবং তৎসহ সকল বৈদেশিক সাহায্য আত্মসাৎ করে এবং এর জন্য আন্তঃঅঞ্চল রপ্তানির মাধ্যমে আংশিকভাবে মূল্য দিতে থাকে। ১৯৫০-এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানে উদ্বৃত্ত থাকার কারণে এখান থেকেই সম্পদ রপ্তানি হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান কোন বৈদেশিক সাহায্য পায় নি। পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্য হিস্যা পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক আত্মসাৎকরণের মাধ্যমেই পূর্ব থেকে পশ্চিমে সম্পদের স্থানান্তর ঘটে। বৈদেশিক সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানের 'প্রাপ্য' হিস্যা ও প্রাপ্ত হিস্যার পার্থক্য থেকেই বৈদেশিক সাহায্যের খাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ স্থানান্তরের হিসাব পাওয়া যায়।

৭ নং সারণিতে আমরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তরের একটা প্রাক্কলন পেশ করবো। অঙ্কগুলো প্যানেলের বাঙালি অর্থনীতিবিদদের তৈরি হিসাব থেকে নেয়া। সারণিতে দেখা যাবে যে, ১৯৫০-এর দশকে দায় পরিশোধের উদ্বৃত্ত থাকার কারণে ও বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্য হিস্যা পশ্চিম পাকিস্তানকে দেয়ার কারণে পূর্ব পাকিস্তান ৮.৯৬ বিলিয়ন টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তর করে। তবে ১৯৬০-এর দশকে দায় পরিশোধের হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের ঘাটতি ছিল। কিন্তু তবু পূর্ব পাকিস্তান তার বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্য হিস্যা থেকে ১২.২ বিলিয়ন টাকা ছেড়ে দেয়, যার ফলে স্থানান্তরের পরিমাণ ১৯৫০-এর দশকের তুলনায় বেশ কিছুটা কম থাকে। ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত বিশ বছরে পূর্ব পাকিস্তান মোট ১১.৮ বিলিয়ন টাকার সম্পদ স্থানান্তর করে, যা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে নিয়োজিত হয়। ওটা ছিল ঐ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট উন্নয়নব্যয়ের ১৯ শতাংশ। উক্ত ১১.৮ বিলিয়ন টাকা পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হলে এ অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ৩৯% ভাগ বৃদ্ধি পেতো।

সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে উচ্চতর অনুপাতে সম্পদ সমাবেশের ক্ষমতার কারণেই পশ্চিম পাকিস্তানে দ্রুততর গতিতে উন্নয়ন ঘটেছে এমন ধারণা গুরুতর ভ্রান্তিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের সঞ্চয় ও বৈদেশিক সাহায্যের হিস্যাই পশ্চিম

পাকিস্তানকে তার সাধ্যের বাইরে উন্নয়ন সাধনে সক্ষম করে তোলে। ১৯৬০-৬৫ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের ০.৯%-এর তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে সঞ্চয়ের হার ছিল ৪.৩%।[৯১]

পাকিস্তানের আপেক্ষিকভাবে অধিক পশ্চাৎপদ ও অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলটি তার সম্পদসমূহ ও গোটা দেশের নামে আনীত তার বৈদেশিক সাহায্যের হিস্যা পাকিস্তানের অধিকতর উন্নত অংশের উন্নয়নের জন্য ছেড়ে দেয়, এটা সত্যি একটি নির্মম পরিহাস। ন্যায়পরায়ণতা ও গণতন্ত্র এর উল্টোটাই দাবি করতো। কাজেই সম্পদ স্থানান্তরের বিষয়টি যে তিক্ত বিতর্কের প্রশ্নে পরিণত হয় এবং বাঙালিদের মধ্যে বঞ্চিত হবার চেতনাকে আর যেকোনো কিছুর চাইতে বেশি বদ্ধমূল করে দেয় তাতে বিস্ময়েব কিছু নেই।

ফেডারেল ফিন্যান্সের সমস্যা

বাণিজ্যিক ও বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ তো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অসমতা স্থায়ীকরণের একটা প্রধান মাধ্যমরূপে বিদ্যমান ছিলই, তার পাশাপাশি ফেডারেল ফিন্যান্স ব্যবস্থা ছিল আর একটা সমান্তরাল মাধ্যম। ফেডারেল বাজেটে রাজস্ব সংগৃহীত হয় উভয় অঞ্চলে রাজস্ব আদায় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্বৃত্ত থেকে। পরে এসব রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকার কিম্বা প্রাদেশিক সরকারসমূহ দ্বারা দুই অঞ্চলের যেকোন অঞ্চলে ব্যয়িত হয়। একটি কারণ ছাড়া রাজস্ব সংগ্রহের হিসাব নিরূপণে স্বাভাবিকভাবে কোন সমস্যা ছিল না। সেই কারণটি হচ্ছে এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানে সদর দপ্তর, কিন্তু ব্যবসা করে উভয় অঞ্চলে এমন বহু কোম্পানি তাদের রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়ে নিত তাদের সদর দপ্তরের মাধ্যমে। তদুপরি, জাহাজযোগে পশ্চিম পাকিস্তানে যেসব তৈরি ও আধা-তৈরি পণ্য প্রেরিত হতো সেগুলোর কাস্টমস ও আবগারি কর অবশেষে পূর্ব পাকিস্তানী ভোক্তাদেরকেই দিতে হতো। কেন্দ্র তা সংগ্রহ করতো পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত আমদানিকারক ও প্রস্তুতকারীদের কাছ থেকে। হিসাবটা এমনভাবে করা হতো যাতে পূর্বাংশে প্রকৃতপক্ষে সংগ্রহকৃত রাজস্ব আঞ্চলিক একাউন্টে আসলে জমা দেখানো হয়েছে তার ১০% ভাগ কম।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহের প্রকৃত প্রাক্কলনে পশ্চিম পাকিস্তানে সংগ্রহের উচ্চহার দেখা যায়। ১৯৬১ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানে রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে ২২%।[৯২] ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, ঐ তিন বছরে পূর্ব পাকিস্তানে ২৫.৫% থেকে ২৯.৮% পর্যন্ত কেন্দ্রীয় রাজস্ব

৯১. Rehman Sobhan, 'Who pays for development,' *Forum,* (Dhaka), February 28, 1970.

৯২. Rounaq Jahan, *Pakistan*

সংগৃহীত হয়।[৯৩] কেন্দ্রীয় রাজস্ব সংগ্রহ, উৎপাদন, বিক্রয় ও আয়ের উপর কাস্টমসশুল্ক ও করভিত্তিক হওয়ায় এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এটা আমদানি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্থানের ব্যাপারে আঞ্চলিক বৈষম্যকে প্রতিফলিত করে। সুতরাং কেন্দ্রীয় রাজস্বভাণ্ডারে পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চতর অবদান থেকে উন্নয়নবৈষম্যের আরেকটি পরিমাপই শুধু পাওয়া যায়।

বৈষম্যের উৎসরূপে রাষ্ট্র

প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্য খাতের মতো সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানে ঘাটতি ছিল বিরাট। ৪ নং সারণিতে সরকারি রাজস্বব্যয়ের পর্যালোচনা দ্বারা এটা তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বব্যয়ের পরিমাণ মাত্র ২৩%। তার মানে হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তান রাজস্বখাতে যা দিয়েছিল তার চাইতে সামান্য কম পেয়ে জমা-খরচের সমতার দিকে যাচ্ছিল। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে পাচ্ছিল একটু বেশি। কার্যত রাজস্বের হিসাবে এ উদ্বৃত্ত ও ঘাটতির মানে তেমন বেশি কিছু ছিল না, যেহেতু উন্নয়নের বৃহত্তর অংশের জন্য অর্থ যোগাতো বৈদেশিক সাহায্য। যাই হোক, আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চতর মাত্রায় রাজস্বব্যয় সেখানকার অধিবাসীদের জন্য চাকুরির অধিকতর সুযোগ ও অর্থনেতিক তৎপরতা চালিয়ে যাবার কার্যকর চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

স্বাধীনতার পথ

এ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি ও তাকে স্থায়ী করার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। রাজস্ব ও উন্নয়ন উভয় খাতে এর সরকারি ব্যয় বরাদ্দের নীতি, এর বৈদেশিক ব্যয়বরাদ্দের নীতি, এর বৈদেশিক সাহায্যবরাদ্দের নীতি ও বৈদেশিক মুদ্রাবরাদ্দের নীতি সর্বদা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছে। বিনিময়হার ও আমদানি সংক্রান্ত নীতিপদ্ধতি বেসরকারি খাতের জন্য একটা উৎসাহপ্রদায়ক কাঠামো সৃষ্টি করে, যা ছিল কৃষির চাইতে শিল্পের প্রতি এবং বাঙালিদের চাইতে অবাঙালিদের প্রতি বেশি অনুকূল। সুতরাং পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠন, কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেই আলোচনার ইতি টানা ঠিক হবে।

৯৩. Muhith, *Bangladesh*

গণতন্ত্র ও বৈষম্য

রাষ্ট্রযন্ত্রের গঠন অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যসমূহ অপেক্ষাকৃত বেশি সহনীয় হতো। পাকিস্তান রাষ্ট্র তার গোটা অস্তিত্বকালে দেশ শাসনে বাঙালিদেরকে কার্যকর ভূমিকা পালন করা থেকে বঞ্চিত রাখে। পাকিস্তানের পুরো আমলব্যাপী প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল বশংবদ। ১৯৪৭ সালে একটা জাতীয় সংসদ গঠনের জন্য কোন প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। ১৯৪৭ ও ১৯৭১-এর মধ্যে ব্যালটের মাধ্যমে কেন্দ্রে একবারও ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে নি। কাজেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা সঠিক হবে যে, পাকিস্তানের জন্মের পরবর্তী কয়েক বছর বাদে বাকি সময়ের কোন কেন্দ্রীয় আইনসভা জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে গঠিত ছিল না।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগুরু। ভোটারসংখ্যার দিক থেকেও তাদের ছিল সংখ্যাধিক্য। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুপস্থিতি তাদের জন্য ছিল সবচেয়ে ক্ষতিকর। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণভার বাঙালিদের কেউ কোন পর্যায়ে পায় নি। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে অর্ধেক সময়ের জন্য তিন জন বাঙালি প্রধানমন্ত্রীরূপে কাজ করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন সাক্ষীগোপাল এবং একজন ছিলেন একটি কোয়ালিশনের সংখ্যালঘু অংশীদাররূপে ক্ষমতাসীন। কিন্তু আইনসভার কোন তোয়াক্কা না করে মাত্র ১৩ মাসের মধ্যে শেষোক্ত জনকে অপসারিত করা হয়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান দু'জন সৈনিক প্রেসিডেন্ট যোগায়। তাঁরা কেন্দ্রে অবিসংবাদী ও সীমাহীন ক্ষমতা ভোগ করেন।

প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বলতার দরুন এবং জাতীয় আইনসভাসমূহের গুরুত্ব না থাকার কারণে পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র, সশস্ত্রবাহিনী এবং শেষদিকে ভূস্বামী ও ব্যবসায়ী শ্রেণী কর্তৃক কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়। ঐ ব্যবসায়ীরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল। ফেডারেল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকার কেবল অভ্যন্তরীণ রাজস্বের মূল উৎসগুলো এবং বৈদেশিক সাহায্য ও রপ্তানিআয় বরাদ্দের ক্ষমতাই হাতে রাখে নি, অর্থনীতি সংক্রান্ত সকল প্রধান নীতিনির্ধারক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে থাকে। ফলে প্রাদেশিক সরকারগুলো ছিল কেন্দ্রের সৃষ্ট পুতুল।

কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে আমলাতন্ত্র ও সশস্ত্র বাহিনীগুলোর কর্তৃত্বাধীন ছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে, বিশেষত তাদের উচ্চতর স্তরে প্রাধান্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের। ৮ নং সারণিতে কেন্দ্রের ক্ষমতাকাঠামোর গঠন কি রকম ছিল তার একটা চিত্র দেয়া হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতার উচ্চতর স্তরগুলো থেকে বাঙালিদের কোটার পরিমাণ বাদ দিয়ে রাখা হয়েছিল। তা ঐ সারণিতে কম করে দেখানো হয়েছে। পাকিস্তানে ছিল মূলত অতিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতাসম্পন্ন একটি অপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার। আইয়ুব খান ও পরে খানের মতো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্ট থাকার মানে হচ্ছে

বাঙালিদেরকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে রাখা। পাকিস্তানের ইতিহাসে কোন বাঙালি অর্থমন্ত্রী হন নি কিংবা বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা নিয়ন্ত্রণকারীর পদে কোন বাঙালি কখনো নিযুক্ত হন নি। ১৯৭১ সালে পরিকল্পনা কমিশন বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সে অবধি কোন বাঙালি পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হন নি। কোন বাঙালি কেন্দ্রীয় সরকারের কোন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি হন নি। শুধু ১৯৬৯ সালে একজন বাঙালি প্রথমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কোন বাঙালি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নর হন নি। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে কোন বাঙালি যুগ্ম-সচিবের পদ পর্যন্ত উঠতে পারেন নি। আর সশস্ত্রবাহিনীগুলো তো ছিল কমবেশি পশ্চিম পাকিস্তানীদেরই একচেটিয়া।

কাজেই এ কথা বলা মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বাঙালিদেরকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের উচ্চতর এবং এমনকি মাঝারি পদ থেকে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রগুলো থেকে, বিশেষকরে অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কেন্দ্রগুলো থেকে দূরে রাখা হয়েছিল।

প্রাদেশিক সরকারকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখা

১৯৫০-এর দশকে কেন্দ্রের প্রাথমিক অপকর্মগুলো পূর্ব বাংলার প্রথম মুসলিম লীগ সরকার নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতো প্রত্যক্ষ করে। এগুলোই আন্তঃআঞ্চলিক বৈষম্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এই প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিত্বমূলক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার দরুন তার কেন্দ্রের মোকাবেলা কবার ক্ষমতা হ্রাস পায়। ১৯৫৪-৫৮ সালে যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ শাসনের কালে কেন্দ্রের কাছ থেকে সম্পদ দাবি ও প্রদেশের ক্ষমতা রক্ষার কিছু প্রচেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু ১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকে প্রাদেশিক সরকারগুলোর অধীন প্রাদেশিক আমলাতন্ত্রের উঁচু পদগুলোতে বসে ছিলেন আবাঙালিরা। সংস্কৃতি ও চাকুরিসূত্রে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকায় এসব অবাঙালি অফিসার কেন্দ্রের মোকাবেলায় তাঁদের বাঙালি মন্ত্রীদেরকে খুব কমই সমর্থন দিতেন। আওয়ামী লীগ সরকার আমলাতন্ত্রের বাইরে গিয়ে প্রবীণ বাঙালি অর্থনীতিবিদদের নিয়ে একটা পরিকল্পনা বোর্ড গঠনের প্রয়াস নেয়। কিন্তু তাঁদের এসব প্রচেষ্টা প্রাদেশিক প্রশাসনকে অবাঙালি আমলাদের কবলমুক্ত করতে অথবা কেন্দ্রের সাথে তাদের আমলাতান্ত্রিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে সফল হয় নি। ফলে, পরিকল্পনা বোর্ড প্রাদেশিক প্রশাসনের মধ্যে একটি নতুন কর্তৃত্বের উৎসরূপে কাজ করতে না পেরে কেন্দ্রের সাথে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বৈঠকে বাঙালিদের দাবিদাওয়া নিয়ে ওকালতির একটি সংস্থায় পরিণত হয়।

১৯৬০-এর দিকে বাঙালিরা প্রাদেশিক সচিবের পদ লাভ করতে শুরু করার পর কেন্দ্রের সাথে সম্পদ বরাদ্দ সংক্রান্ত বিতর্কে বাঙালিদের দাবি উত্থাপনের অধিকতর সচেতন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, সামরিক আইন প্রবর্তন এবং

জাতীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে এক পশ্চিম পাকিস্তানী প্রধান নির্বাহীর কুক্ষিগত হবার পর কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয় স্তরে বাঙালি মন্ত্রী ও প্রাদেশিক গভর্নরদের চাকুরি প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা বা খেয়ালখুশির অধীন হয়ে পড়েছিল। তাঁদের প্রতিনিধিত্বমূলক মর্যাদা কিংবা রাজনৈতিক সমর্থন না থাকায় অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থার উপর পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর প্রাধান্যের বলয়ে বাঙালি আমলাদেরকে এমন একটা অবস্থার মধ্যে কাজ চালাতে হয়, যেখানে বাঙালি মন্ত্রীরা কেন্দ্রের সাথে যেকোন মোকাবেলার সময় আসলেই তাঁদেরকে রক্ষা করতে পারতেন না। প্রাদেশিক প্রশাসনের ক্ষমতাহীন ও সম্পদহীন প্রকৃতির দরুন অনুরূপ ওকালতির সুযোগ এমনিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রদেশে ও কেন্দ্রে কর্মরত বাঙালি আমলারা এভাবে প্রায় ক্ষেত্রেই গোপন তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করতে পেরেছেন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষ সমর্থনকারী অর্থনীতিবিদদের পরামর্শদাতায় পরিণত হয়েছেন।

ব্যবসা খাতে বাঙালিদের কোণঠাসা অবস্থা

পাকিস্তানের ইতিহাসের গোটা সময়টায় বাঙালিরা অনুভব করে যে, তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রধান উৎস, যথা প্রেসিডেন্ট পদ, আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর প্রধান প্রধান পদ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। সত্যিই তাদেরকে এসব পদের বাইরে রাখা হয়েছিল। জাতীয় ক্ষমতাকাঠামোর মধ্যে জাঁদরেল অবাঙালি ব্যবসায়ীদের উত্থানও বাঙালিদেরকে জোর দিয়ে কথা বলার কোন সুযোগ দেয় নি। যে ৪৩টি পরিবার পাকিস্তানী অর্থনীতির উপর প্রভুত্ব করতো, তাদের মধ্যে একজন মাত্র বাঙালি ছিলেন এ. কে. খান।[৯৪] ১৯৫৯ সালের এক জরিপে দেখা গেছে যে, পাকিস্তানের সকল শিল্পপরিসম্পৎ-এর মাত্র ২.৫ ভাগ ছিল বাঙালি মুসলমানদের হাতে।[৯৫] সে পর্যায়ে যেসব বাঙালি হিন্দু পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবসা করতো, তাদের হাতে ছিল পরিসম্পৎ-এর শতকরা ৮.৫ ভাগ। এতে বাঙালি মালিকানাধীন পরিসম্পৎ দাঁড়ায় ১১%। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে হিন্দুদের মালিকানাধীন পরিসম্পৎ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল এবং তাদের কাজ-কারবারগুলো অবাঙালি মুসলিমরা দখল করে নিচ্ছিল। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর সকল 'হিন্দু' পরিসম্পৎ (মাড়োয়ারিদের ২.৫%-এর যাকিছু অবশিষ্ট ছিল সেসব সহ) ১৯৬৫ সালের শত্রুসম্পত্তি অর্ডিন্যান্সের বলে বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হয়। এতে কার্যত বাঙালিদের হাতে থাকে শিল্পপরিসম্পৎ-এর শতকরা ৫ ভাগেরও কম। এভাবে বাঙালিদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সকল ধাপের বাইরে রাখার কাজটি পুরোপুরি সম্পন্ন হয়। ক্লীব ও প্রতিনিধিত্বহীন রাষ্ট্রীয় আইনসভায় বাঙালিদের ৫০ শতাংশ আসন ছিল বটে, কিন্তু তাদের মন্ত্রীরা একজন পশ্চিম পাকিস্তানী প্রেসিডেন্টের খেয়ালখুশির অধীন থাকায় বাঙালিরা বরাবর পাকিস্তানের ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে অবস্থান করে।

৯৪. L J. White, *Industrial Concentration and Economic Power in Pakistan,* (Princeton, USA 1974)

৯৫. G Papanek, *Pakistan's Development*

বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জীবনে বাঙালি জনগণকে সুস্পষ্টভাবে বঞ্চিত করার ফলে বাঙালিরা জাতীয় ক্ষমতা থেকে তাদেরকে বাইরে রাখার ব্যাপারটিকে আঞ্চলিক বৈষম্যের সাথে এবং একটি শক্তিশালী কেন্দ্র কর্তৃক একচেটিয়া ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করে। একটি অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছিল জাতীয় ক্ষমতার হিস্যা লাভকল্পে বাঙালিদের দ্বারা পরিচালিত সংগ্রামেরই অংশ। কিন্তু ১৯৫৮ সালে মার্শাল ল' প্রবর্তনের ফলে ১৯৫৯ সালের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বানচাল হওয়া, ১৯৬২ সালে প্রদেশগুলোকে কোন ক্ষমতা না দিয়ে প্রধান নির্বাহী ও কেন্দ্রের হাতে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন এবং প্রত্যক্ষ ভোটের অধিকার হরণ বাঙালিদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, তারা জাতীয় ক্ষমতার হিস্যা কখনো পাবে না। ১৯৬৩ সালে আওয়ামী লীগ নেতা এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু সেই একমাত্র ব্যক্তিটিকে দৃশ্যপট থেকে অপসারিত করে, যাঁর একটি জাতীয় নির্বাচকমণ্ডলী ছিল এবং যিনি জাতীয় ক্ষমতা পেতে চেয়েছিলেন। আওয়ামী লীগে তাঁর, বিশেষকরে শেখ মুজিবুর রহমানের মতো উত্তরাধিকারীদের বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে, বাঙালিরা কোনদিন জাতীয় ক্ষমতা পাবে না এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে কখনো ন্যায়বিচার পাবে না। এরকম ধারণার যৌক্তিকতা আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে এটা ১৯৬০-এর দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদীয়মান নেতাদেরকে প্রভাবিত করে। এরকম একটা ধারণা বা বোধ থেকেই লক্ষ্য করা যায় যে, ১৯৬৫ সালের সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে বিরোধীপক্ষ আইয়ুব খানকে আসনচ্যুত করতে ব্যর্থ হবার পরে আওয়ামী লীগ এবং বেশিরভাগ অন্যদল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়োজিত করে।

আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় আন্দোলন শুরু করার উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী নেতৃবৃন্দের এক গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ একটি ছয় দফা সম্বলিত স্বায়ত্তশাসন কর্মসূচি পেশ করে। পাকিস্তানের জনগণের উদ্দেশ্যে ঘোষিত ছয় দফা দেখিয়ে দেয় যে, বাঙালি নেতৃত্ব আইয়ুবের অপসারণের মাধ্যমে জাতীয় ক্ষমতা দখলের চাইতে পাকিস্তানী শাসন থেকে বাঙালিদের মুক্তি ও তাদের জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ব্যাপারেই অধিকতর আগ্রহী।

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠার দাবির মধ্যে বাঙালি মুসলিমদের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি নিহিত ছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার যে দাবি তুলেছিলেন এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম[৯৬], তাও বাঙালি মুসলিমদের সেই দাবিরই পুনরুক্তি। লাহোর প্রস্তাবের পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ এবং

৯৬. Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*

সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমের 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা' এই উভয় উদ্যোগের পিছনে এ ধারণাই কাজ করেছিল যে, বাঙালিরা কখনো কেন্দ্রীয় ক্ষমতার হিস্যা পাবে না, কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারে একমাত্র স্বায়ত্তশাসন লাভের মাধ্যমে।

ছয় দফার উৎপত্তি হয় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ১৯তম দফা থেকে। এতে বলা হয়েছিল :

> ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা এবং কেবল প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়সমূহ ও মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে রেখে আর সকল বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের বৈধ কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসা হবে। এমনকি প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও এমন ব্যবস্থা করা হবে যাতে সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে এবং নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে থাকে। প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং বর্তমান আনসার বাহিনীকে পুরাদস্তুর মিলিশিয়াতে পরিবর্তিত করা হবে।

পরবর্তী ১২ বছরে ১৯৫৪ সালে উত্থাপিত স্বায়ত্তশাসনের এ দাবিটি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এবং বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে সমগ্র পাকিস্তানের জনগণকে গণতন্ত্র থেকে বঞ্চিত রাখার দরুন ১৯৬৬ সালে এ দাবিটি আরো তীব্র ও চূড়ান্ত আকারে পুনরুজ্জীবিত হয়।

ছয় দফার ২য় দফায় ২১ দফার মতোই প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়টি কেন্দ্রের এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু মুদ্রাব্যবস্থার উপর কেন্দ্রের এখতিয়ারকে সীমাবদ্ধ করা হয়। তৃতীয় দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুটো বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয় :

> পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটো পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে না, থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে।
>
> অথবা, দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা থাকবে কেন্দ্রের হাতে। কিন্তু শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এ বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে এবং দুই অঞ্চলে দু'টি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে।

বিগত এক যুগের কেন্দ্রনির্ধারিত মুদ্রানীতির অভিজ্ঞতা থেকেই এ দাবিটি তোলা হয়েছিল। ছয় দফা কর্মসূচিতে মুদ্রানীতিকে আঞ্চলিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে চাওয়া হয়েছিল অঞ্চলের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক তৎপরতাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে। তৃতীয় দফায় ধরে নেয়া হয় যে, মুদ্রানীতির উপর আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম হলে এ অঞ্চলে ব্যবসারত অবাঙালি ব্যবসায়ীরা তাদের পুঞ্জীভূত উদ্বৃত্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্থানান্তরিত করতে পারবে না, অর্থাৎ এ অঞ্চল থেকে পুঁজিপাচার নিয়ন্ত্রিত হবে। মুদ্রার অবাধ বা সহজ বিনিময়যোগ্যতা গ্রহণ ও পুঁজির আন্তঃঅঞ্চল চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের কথাসহ

এ দফাটি কিছুটা পরস্পরবিরোধী। বাণিজ্যিক নীতির পরিবর্তে মুদ্রানীতির মাধ্যমে সম্পদ স্থানান্তর নিরোধের এ ধারণাটি ছিল কিছুটা ভ্রান্তিপূর্ণ, যেহেতু এতে ধরে নেয়া হয় যে, সম্পদ স্থানান্তরের উপায় বাণিজ্যিক চ্যানেল নয়, মুদ্রাব্যবস্থা।

ছয় দফার চতুর্থ দফা দাবি করে ঃ

> সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে ফেডারেশনভুক্ত আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আপনা হতেই আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হয়ে যাবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর এ মর্মে বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকবে। এ ব্যবস্থা দ্বারা খাজনা-ট্যাক্স-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতাকে বাংলাদেশে সম্পদ সৃষ্টির উপায়রূপে এবং উন্নয়নকে উৎসাহিত করার নীতিগত হাতিয়াররূপে কাজে লাগাতে চাওয়া হয়েছিল। এতে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করা হয়েছিল রাজস্বের একটা তোলা বা লেভি ব্যবস্থার মাধ্যমে। শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকবে যে আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত খাজনা-ট্যাক্স থেকে ফেডারেল সরকারের লেভি বা টাকা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হয়ে যাবে।

ছয় দফার এ দফাটিই কয়েকটি কারণে অত্যধিক উদ্বেগ সৃষ্টি করে এবং বলা হয় যে, এটাই নাকি ছয় দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ভণ্ডুল করার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে কৃতসংকল্প করে তোলে। কার্যত এ দফাটি প্রথমদিকে স্বায়ত্তশাসিত পূর্ব পাকিস্তানের জন্যই বেশি অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারতো। দেশজ রাজস্ব থেকে স্বীয় উন্নয়নের তহবিল যোগানোর দায় নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে এ অঞ্চলের মধ্যে কার্যত আদায়কৃত জাতীয় রাজস্বের ৩০ শতাংশের উপর নির্ভর করতে হতো। উন্নয়নের নিম্ন স্তর এবং দুর্বল করভিত্তির কারণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দায় গ্রহণ করার জন্য মোটা অঙ্কের রাজস্বউদ্বৃত্ত গড়ে তুলতে বাংলাদেশের অনেক সময় লেগে যেতো। এমনকি প্রদেশগুলো থেকে কেন্দ্রের জন্য দেয় লেভিকে আঞ্চলিক জিডিপি-এর আকারের ভিত্তিতে আনুপাতিক করা হলেও পশ্চিম পাকিস্তান তার প্রতিরক্ষা স্থাপনাগুলোকে চালিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় সব রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারতো। অদ্ভুত শোনালেও সত্য এই যে, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা হাতে রেখেই একটি শক্তিশালী কেন্দ্র প্রতিরক্ষা বাজেটকে খর্ব করে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় রাজস্ব পুনর্বণ্টন করতে পারতো। সেক্ষেত্রে বার্ষিক বাজেট হয়ে দাঁড়াতো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি, কেন্দ্রীয় মঞ্জুরির জন্য প্রদেশসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দাবি এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধু-করাচীর মতো অপেক্ষাকৃত ধনী প্রদেশগুলোর নিজেদের অঞ্চলে সংগৃহীত রাজস্বের বৃহত্তর অংশ নিজেদের অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য রেখে দেয়ার দাবির মধ্যে অবিরত দড়ি টানাটানির খেলা। আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় বাজেটের একটি লক্ষ্য ছিল

বাংলাদেশে সম্পদ হস্তান্তর করা। এই হস্তান্তর প্রশ্নে ছয় দফার চতুর্থ দফার দাবিটি ছিল পাঞ্জাব ও সিন্ধুর জন্য এবং সেনাবাহিনীর জন্য সবচেয়ে বাস্তবমুখী প্রস্তাব। সেনাবাহিনীর জন্য চতুর্থ দফা স্বার্থহানিকর ছিল না এজন্য যে, বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সংগৃহীত সেনাবাহিনীর রাজস্ব-বাজেট ছিল সমাজতান্ত্রিকভাবে গ্যারান্টিযুক্ত।

পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের বিষয়ে পঞ্চম দফাটিই ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এতে বলা হয় :

> ফেডারেশনভুক্ত ইউনিটসমূহের স্ব স্ব সবকারের অধীনে প্রত্যেক ইউনিটেব বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকতে হবে।
>
> ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা ফেডারেশনভুক্ত ইউনিটদ্বয় থেকে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হবে।

পঞ্চম দফার এ অংশটি আপত্তিকর ছিল না। ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি আয় যখন পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে অনেক বেশি ছিল তখন এটা বৈপ্লবিক হতে পারতো। কিন্তু ১৯৬৭-৬৮ সাল নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানের আয় কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল এবং তাদের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যের দরুন এ ব্যবধান তাদের অনুকূলে প্রসারিত হতো। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রপ্তানিদ্রব্য ও পাটজাত দ্রব্যাদি, যা থেকে তার বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রায় ৯০% আসতো, তা একটি বিশ্বব্যাপী ক্ষয়িষ্ণু শিল্পে পরিণত হচ্ছিল। ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ এই শেষ তিন বছরে বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাবে প্রথমবারের মতো পূর্ব পাকিস্তানের ঘাটতি হতে শুরু করে। কাজেই পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত আয় গ্রাস করার কোন সুযোগ ছিল না।

পঞ্চম দফার যে প্রস্তাবটি পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে হজম করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাতে বলা হয় :

> শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী দেশের বৈদেশিক নীতির সাহায্যকাঠামোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সাহায্য সম্বন্ধে বিদেশের সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের ও আমদানি-রপ্তানি করার ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলোর হতে ন্যস্ত থাকবে।

এ প্রস্তাব পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদেরকে গুরুতর ঝুঁকির সম্মুখীন করে। ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের আমদানির ৪৫ শতাংশ তারা সরবরাহ করে এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাদের রপ্তানির পরিমাণ ছিল তাদের মোট রপ্তানির ৪৮ শতাংশ।

পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার ও নিজের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের অধিকার থাকার মানে হলো সর্বাধিক প্রতিযোগিতামূলক উৎসগুলো থেকে তার আমদানির অধিকার থাকা। পশ্চিম পাকিস্তানীরা বেশি ভয় করছিল একারণে যে, সেরকম হলে পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের বাণিজ্যসম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তান

ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে সে রকম বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হলে পশ্চিম পাকিস্তানী রপ্তানিকারকরা অধিকতর প্রতিযোগী হতো কিনা সেটা একটা তর্কের বিষয়। পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু পণ্যের (যথা কাঁচা তুলা, তৈলবীজ, চাউল ইত্যাদি) পূর্ব পাকিস্তানে চাহিদা ছিল। এ চাহিদা প্রকৃতপক্ষে তৈরি হয়েছিল কৃত্রিমভাবে। পূর্ব পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যঘাটতি, বৈদেশিক মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা এবং বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে টাকার উচ্চমূল্য রক্ষার নীতিই ছিল ঐ চাহিদার কারণ।

সুতরাং, পূর্ব পাকিস্তানকে বৈদেশিক সাহায্যের জন্য বিদেশের সাথে আলোচনার অধিকারদান সংক্রান্ত প্রশ্নটিই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে অনুমান ছিল এই যে, (ক) বাঙালি আলোচকরা কেন্দ্রের কাছ থেকে পূর্ব পাকিস্তান বৈদেশিক সাহায্যের যেটুকু পায় তার চাইতে অনেক বেশি আনতে পারবেন এবং (খ) বিদেশ থেকে আলোচনার মাধ্যমে আনীত সেই সাহায্য কাজে লাগানোব অধিকার থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্যের হিস্যা পশ্চিম পাকিস্তান হস্তগত করতে পারবে না। পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্যের হিস্যা হারানোর ব্যাপারটা যদি পশ্চিম পাকিস্তানী সাহায্য সংক্রান্ত আলোচকরা তাদের উচ্চতর আলোচনার দক্ষতা দ্বারা সামলাতে না পারতো, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য উন্নয়নব্যয় অনেক বেশি পড়ে যেতো। চতুর্থ পরিকল্পনার প্যানেলভুক্ত পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদরা এবং ১৯৬৯-৭০-এর কান্ট্রি মেমোরেন্ডামে বিশ্বব্যাঙ্ক উপরোক্ত বক্তব্যই তুলে ধরে। উভয়ে যুক্তি দেখায় যে, স্বীয় পুঁজি ও মধ্যবর্তী পণ্যাদি আমদানির অর্থ যোগানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্যের কিছু কিছু অংশ আরো কয়েক বছর আত্মসাৎ করা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য প্রয়োজন। ১৯৭০ সাল অবধি আন্তঃআঞ্চলিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক এরকম ঔপনিবেশিক ও অদূরদর্শী মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত ছিল যে, স্বায়ত্তশাসন পেলে পূর্ব পাকিস্তান তার বৈদেশিক সাহায্যের অংশ ছাড়বেনা এবং অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক উৎসগুলো থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনবে। এ সম্ভাবনাই পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে ছয় দফা দাবির বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতিবাদে মুখর করে তোলে। উক্ত সম্ভাবনা এবং প্রতিরক্ষা বাজেট সম্পর্কে সশস্ত্রবাহিনীগুলোর ভয়কে ঘিরেই হয়তো বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর কাছে অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা

১৯৬৯ ও ১৯৭১ সালের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে ছয় দফা কর্মসূচির তাৎপর্য বোঝাতে এবং দাবির উপর তাঁদের অবস্থানের দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা করতে বাঙালি অর্থনীতিবিদরা তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। এ পারস্পরিক ক্রিয়াটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ফলে নেতৃবৃন্দ বুঝতে সক্ষম হন যে, ছয় দফা কার্যোপযোগী এবং এ

কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে একটা সংবিধান রচনা করা যেতে পারে ; কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ছয় দফা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনায় বসার এবং তাদের সুনির্দিষ্ট আপত্তিগুলো তুলে ধরার বিন্দুমাত্র আগ্রহ পশ্চিম পাকিস্তানী কোন নেতাই দেখান নি। না ইয়াহিয়া খান ও তাঁর উপদেষ্টারা, না ভুট্টো ও তাঁর সহযোগীরা। ১৯৭১-এর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে ইয়াহিয়া ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) সঙ্গে আওয়ামী লীগের বৈঠক সাধারণ বিষয়ে মতামত বিনিময় ও বাগ্মিতা প্রদর্শনে সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাতে অর্থবহ কিছুই হয় নি। পিপিপি কিংবা ইয়াহিয়া ছয় দফার সমালোচনায় কোন বাস্তব যুক্তি তুলে ধরেন নি।

ছয় দফার উপর বাস্তব আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় একমাত্র ১৯৭১ সালের সেই সঙ্কটময় দিনগুলিতে, যখন ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ ও কামাল হোসেনের সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনার জন্য জাস্টিস কর্নেলিয়াস ও কেন্দ্রীয় সরকারের লিগ্যাল ড্রাফটস্‌ম্যান কর্নেল হাসানসহ এম. এম. আহমদকে নিয়ে আসেন। আওয়ামী লীগের আলোচকদেরকে সহায়তা করে বাঙালি অর্থনীতিবিদদের একটি দল। অর্থনীতিবিদরা বৈঠকে উত্থাপিত সকল অর্থনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে আওয়ামী লীগের আলোচকদের সাথে আলোচনা করেন। পাকিস্তানের অর্থনীতির এককালের ক্ষমতাবান 'মুগল' এম. এম. আহমদ ছয় দফার মূল অর্থনৈতিক দফাগুলো মেনে নেন। প্রকৃতপক্ষে উভয় আলোচক দল ১৯৭১ সালের ২২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সাংবিধানিক পদ্ধতি সম্পর্কে একটা ঐকমত্যে উপনীত হন।

তবে ঐ সময়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করা হবে রক্ত আর গুলিগোলা দিয়ে, রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নয়। কিন্তু ২৩ মার্চ নাগাদ শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের ভূখণ্ডে স্বায়ত্তশাসন কায়েম করে ফেলেন। নির্বাচিত বাঙালি নেতারা ১৯৭১ সালের মার্চে সমসাময়িক ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ শাসন করছিলেন। তাঁদের আদেশ-নির্দেশ আমলাতন্ত্রের সকল অংশ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মেনে নিয়েছিল, কিন্তু অবাঙালি ব্যবসায়ীরা ছিল আনুগত্য প্রদর্শনে অত্যন্ত নারাজ।

১৯৭১ সালের ১ মার্চের মধ্যেই প্রজন্মের পর প্রজন্মের রাজনৈতিক সংগ্রাম যা অর্জন করতে পারেনি সেটা অর্জিত হয়ে গিয়েছিল ১৯৭০-এর শেষে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনের জন্য পরিচালিত প্রচার অভিযানে, দুই বছরের রাজনৈতিক আন্দোলনসমাবেশের মধ্য দিয়ে। নির্বাচনী অভিযান হয়ে উঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধাতুকে পিটিয়ে গঠন করার কামারশালা। ১৯৭১ সালের মার্চের স্ব-শাসন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইস্পাতকে কাঠিন্য প্রদানের নেহাই।

সারণি ২ : মূল ভোগ্যবস্তু ও ভোগ্যব্যয়ের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রবণতা

পণ্য	মাথাপিছু পরিমাপের ইউনিট	১৯৫১/৫২		১৯৫৯/৬০		১৯৬৩/৬৪	
		পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম
১. খাদ্য শস্য	প্রতি আউন্স, পি.ডি.	১৪.৯	১৫.৭	১৬.৫	১৫.২	১৬.৮	১৭.৪
২. চিনি	প্রতি আউন্স, পি. এম.	২৪.৫	৪৩.৭	২১.২	৭৫.৭	১০.২	৩৮.৪
৩. চা	প্রতি আউন্স, পি.এম.	০.১৩	০.৬	০.১৩	১.৩	০.১৬	১.১২
৪. দিয়াশলাই	না. পি. ওয়াই	৭.০	১০.০	১৩.০	১৬.০		
৫. কাপড়	গজ পি. এ.	১.৭	১.৪	৩.০	৯.০		
৬. সিগারেট	না. প্রতি পি. এ.	৫.০	৭৬.০৯	৩৩.০	১৮৩.০		
৭. কেরোসিন	গ্যালন পি. এ.	০ ৫	০.৫	০.৬	০ ৯		
৮. কাগজ	পাউন্ড পি. এ.	০.২	০.৫	০.৩	১.৪		
				১৯৬১			
৯. দুধ-মাখন	পাউন্ড পি. এম.			৩.৭	৯.৭	২.১	৮.৬
১০. গরু-খাসির মাংস ও মাছ	পাউন্ড পি. এম.			৩.১	০.৭	০.৪	১.৭
			১৯৬০		১৯৬৩/৬৪		১৯৬৬/৬৭
১১. গৃহস্থালি, টাকায়, মাসিক ভোগ্য ব্যয়		১২১.৯	১৪৩.৮	১২৩.২	১৭০.২	১৫১.৫	২১১.৪
১২. বৈষম্য % সূচক পশ্চিম-পূর্ব (*১০০) পূর্ব		১২১.৯ ২৬.৬	১৪৩.৮	১২৩.২ ৩০.৮	১৭০.২	১৫১.৫ ৪০.০০	২১১.৪

সূত্র : (১-৭) ১৯৫১-৫২ এবং ১৯৫৯-৬০ এর জন্য এম ইউ খান প্রদত্ত বিবরণ দেখুন। অবশিষ্টগুলো [illegible]

১৯৬৭ সালের মার্চ থেকে ১৯৭১ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর রাজনৈতিক সমর্থকরা এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র দলসমূহ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বাণীকে বাংলাদেশের প্রতিটি গৃহে পৌঁছে দেন। এ বাণীর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রশ্ন এবং সমাপ্তিতে নিজেদের সমস্যা সমাধানে বাঙালিদেরকে ক্ষমতাদানের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন-সমাবেশের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ১৯৭১ সালের মার্চে স্ব-শাসনের প্রশ্নটি জোরদার হয়ে উঠেছিল। নির্বাচন স্ব-শাসনের জন্য রাজনৈতিক ম্যান্ডেট প্রদান করে এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগকে ৭ কোটি বাঙালির

সারণি ৩ : সামাজিক ও বাহ্য অবকাঠামোর ক্ষেত্রে বৈষম্য

বিষয়	পরি-মাপের ইউনিট	১৯৫১/৫২		১৯৫৯/৬০		১৯৬৭/৬৮	
		পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম
১. বিদ্যুৎ	কিলো-য়াট পি.এ.	০.৫	৮.৬	১.৬	২৮.৮	৩৭৮ মেগাওয়াট (১৯৫৯-এর ডিসেম্বরে মোট জেনারেটিং ক্যাপাসিটি)	১৫৫৯ মেগাওয়াট
২. রেলওয়ের রুট মাইলেজ	মাইল	১৬৮২	৫৩১৬	১৭১৪	৫৩২৭	১৭১২	৫৩৩৪
৩. রোড মাইলেজ	মাইল	৪০৫	১৭১৫২	১০৪০	১৯৬৮৪	২৫৮৮	২২৫০৮
৪. মোটর গাড়ির সংখ্যা				১৪৪১০	১০৯২২৮	৫৬২৮৫	২৫৯৩৯৫
৫. প্রদত্ত রেডিও লাইসেন্স		৮৮৪৮	৭০৫১৩	৩৭৭১৩	২৯৩৬০৭	৩৫৮২৪১	৭৩৮২১৫
৬. হাসপাতাল বেড		-	-	৪৯৭৩	২২১০০	৬৯৮৪ (১৯৬৬)	২৬২০০ (১৯৬৬)
৭. ডাক্তার		-	-	৫৪৯২	৬১৩২	৮৮১০০ (১৯৬৯)	১৩১০০০ (১৯৬৯)
				১৯৪৭/৪		১৯৫৯/৬০	১৯৬৬/৬৭
৮. প্রাইমারি স্কুল		২৯৬৩৩	৮৪১৩	৮ ২৬৫১৩	১৭৯০১	২৮২২৫	৩৩২৭১
৯. প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রভর্তি (মিলিয়নের হিসাবে)		২.০২	০ ৫৪	৩.১৮	১.৫৫	৪.৩১	২ ৭৪
১০. প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক		৭৫৬২৪	১৭৮২০	৭৮৪৬২	৪৪৮৪৮	৯৭২৫৬	৭৫৬৯৭
১১. মাধ্যমিক স্কুল		৩৪৮১	২৫৯৮	৩০৫৩	৩০৪৩	৪৩৯০	৪৫৬৩
১২. মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রসংখ্যা (মিলিয়ন হিসাবে)		০.৫২৬	০.৫০৮	০.৫৩০	০ ৯১২	১ ০৫৭	১ ৫২৯
১৩. মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা		৭৪৩৬২	১৮৮৪৮	২৩৫৭১	৩১৩৫৫	৩৮২৮৩	৫৬২২৮
১৪. বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি		১৬২০	৬৫৪	৩৯৭০	৫০৮৪	৯৯৮৪	১৪৪২৫

উৎস : (বিদ্যুৎ, ১৯৫১-৫২ ও ১৯৫৯-৬০ ঃ এস. ইউ. খান, *পাকিস্তান ইকনমিক সার্ভে*, ১৯৬৯-৭০ (৬ ও

সারণি ৪ : পাকিস্তানে আঞ্চলিক ব্যয়, ১৯৫০/৫৭-১৯৬০/৭০

(১০ লক্ষ টাকার হিসাবে)

পূর্ব পাকিস্তান						পশ্চিম পাকিস্তান				
	রাজস্ব	মোট	উন্নয়ন সরকারি	বেসরকারি	মোট সরকারি (১+৩)	রাজস্ব	রাজস্ব মোট	উন্নয়ন সবকারি	উন্নয়ন বেসরকারি	মোট সরকারি (৬+৮)
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯৫০/৫১ ১৯৫৪/৫৫	১৭১০	১০০০	৭০০	৩০০	২৪১০	৭২০০	৪০০০	২০০০	২০০০	৯২০০
১৯৫৫/৫৬ ১৯৫৯/৬০	২৫৪০	২৭০০	১৯৭০	৭৩০	৪৫১০	৮৯৮০	৭৫৭০	৪৬৪০	২৯৩০	১৩৬২০
১৯৬০/৬১ ১৯৬৪/৬৫	৪৩৪০	৯৭০০	৬৭০০	৩০০০	১১০৪০	১২৮৪০	২৩৭১০	১৩০১০	১০৭০০	২৫৮৫০
১৯৬৫/৬৬ ১৯৬৯/৭০	৬৪৮০	১৬৫৬০	১১০৬০	৫৫০০	১৭৫৪০	২২২৩০	৩৫৬০০	১৯৬০০	১৬০০০	৪১৮৩০
সর্বমোট	১৫০৭০	২৯৯৬০	২০৪৩০	৯৫৩০	৩৫৫০০	৫১২৫০	৬১৯৮০	৩০৬৩০	৩১৬৩০	৮১৬০০
সর্বমোট ব্যয়ে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা (%)	২৩	৩০	৪০	২৩	৩৩					

উৎস : চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থনীতিবিদ প্যানেলের *রিপোর্ট* ঃ সারণি ২ (পৃ. ৬)

স্ব-শাসনলাভের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য অবিসংবাদী ক্ষমতা দান করে। ১৯৭১-এর মার্চে মুজিব আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করে কার্যত বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক নীতির দিকনির্দেশনা ও সম্পদসমূহের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ ও আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের মধ্যেকার আলোচনায় দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত প্রধান পাকিস্তানী আলোচক এম. এম. আহমদ বাংলাদেশের অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা প্রশ্নে যে নতুন বাস্তবতার উদ্ভব ঘটেছে তা মেনে নিয়েছেন। ছয় দফার অর্থনৈতিক দফাগুলোকে আইনগত স্বীকৃতিদানের জন্য প্রস্তাবিত সাংবিধানিক সংশোধনীগুলো তিনি গ্রহণ করে নেন।

বাঙালিদের এ স্ব-শাসন লাভের দাবিকে পাকিস্তান রাষ্ট্র স্বীকার করে নিতে পারলো না কেন? অধিকতর সুনির্দিষ্ট গবেষণা ছাড়া এর জবাব দিতে গেলে তা বড়জোর কল্পনানির্ভর এবং সেকারণেই বিতর্কমূলক হবে। লেখক অন্যত্র বিশদভাবে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন[৯৭]

৯৭. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *Public Enterprise*

সারণি ৫ : প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের আঞ্চলিক বণ্টন ১৯৪৮/৪৯ —১৯৬৮/৬৯

বিষয়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	মোট
(ক) সর্বোচ্চ মূল্যে টাকায় রূপান্তরিত ডলার সাহায্যের ব্যয় (বিলিয়ন টাকার হিসাবে)			
১. ১৯৪৮/৪৯॥১৯৬০/৬১	৪.৮৪	১০.৭৭	১৫.৬১
%	৩১.০	৬৯.০	১০০
২. ১৯৬১/৬২॥১৯৬৮/৬৯	১৪.৪৯	৩১.৪৮	৪৫ ৯৭
%	৩১.৫	৬৮.৫	১০০
৩. মোট	১৯.৩৩	৪২.২৫	৬১.৫৮
%	৩১.৪	৬৮.৬ কেন্দ্র ৩৯২	১০০
(খ) ডলারে সাহায্য ব্যয় (মিলিয়ন ডলারের হিসাবে)	১৯৪১	৪১০৬	৬৪৩৯
%	৩০.১	৬৯.৯	১০০
(গ) মার্কিন ডলারে (১০ লক্ষ ডলার) প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্য			
১. ১৯৪৭-৬০	৫৪২	১৫১৬	২০৫৮
%	২৬.৩	৭৩.৭	১০০
২. ১৯৬০-৭০	১৪৮২	৪১০০	৫৫৮২
%	২৬.৪	৭৩.৫	১০০
৩. মোট	২০২৪	৫৬১৬	৭৬৪০
%	২৬.৪	৭৩.৬	১০০
(ঘ) ডলারে ব্যয়িত সাহায্যের গঠন (১০ লক্ষ ডলারের হিসাবে)			
১. কারিগরি সহায়তাসহ প্রজেক্টসাহায্য	৮২৫ (২৫.২)	২১২৭	৩২৭১
%	৪২.৩	৫১.৮	৫০.৮
২. প্রজেক্টবহির্ভূত ও পণ্য-সাহায্য	৬৭১ (৩৪.৮)	১২৪৮	১৯২৭
%	৩৪.৬	৩০.৪	২৯.৯
৩. খাদ্য সাহায্য	৪৪৫ (৩৫.৯)	৭১১	১২৪১
%	২২.৯	১৯.৩	১৯.৩
৪. মোট	১৯৪১	৪১০৬	৬৪৩৯

উৎস : (ক) অর্থনীতিবিদদের প্যানেল (পূর্ব পাকিস্তান)
(খ), (গ), (ঘ), (মুহিত ১৯৭৮)।

সারণি ৬ : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যালেন্স অব পেমেন্ট (১৯৪৮/৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯)

(১০ লক্ষ টাকা)

সময়	মূল্য	পূর্ব	পশ্চিম
১৯৪৮/৪৯ থেকে	সাধারণ মূল্য	+৫৯২	-৮১১৬
১৯৬০/৬১	উচ্চমূল্য	+৫৩৬৮	-২০৯৮৯
১৯৬১/৬২ থেকে	সাধারণ মূল্য	-৬৫২৬	-১৮১৮০
১৯৬৮/৬৯	উচ্চমূল্য	-৯৩৮৬	-৩৪০৭৫
মোট		৫৯৩৪	-২৬২৯৬
১৯৪৮/৪৯ থেকে	সাধারণ মূল্য		
১৯৬৮/৬৯	উচ্চমূল্য	-৪০১৮	-৫৫০৬৪

উৎস : নতুন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থনীতিবিদদের প্যানেলের *রিপোর্ট*। সারণি ১-ক, খ, গ, পৃ. ৭৬-৭৮

সারণি ৭ : পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তর (১৯৪৮/৪৯— ১৯৬৮/৬৯)

(১০ লক্ষ টাকার হিসাবে)

বিষয়	১৯৪৮/৪৯ থেকে ১৯৬০/৬১	১৯৬১/৬২ থেকে ১৯৬৮/৬৯	১৯৪৮/৪৯ থেকে ১৯৬৮/৬৯
১. পূর্ব পাকিস্তানে কার্যত ব্যয়িত বৈদেশিক সাহায্য	৪৮৪০	১৪৪৯০	১৯৩৩০
২. জনসংখ্যার অনুপাতে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর পূর্ব পাকিস্তানে প্রাপ্য হিস্যা	৪৪৩০	২৬৭১০	৩৫১৪০
৩. পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে বৈদেশিক সাহায্য স্থানান্তর (২-১)	+৩৫৯০	+১২২২০	+১৫৮১০
৪. পূর্ব পাকিস্তানের ব্যালেন্স অব পেমেন্ট	+ ৫৩৭০	- ৯৩৯০	- ৪০২০
৫. পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদ স্থানান্তর (৩+৪)	+৪৯৬০	+২৮৩০	+১১৭৯০

উৎস : চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থনৈতিক প্যানেলের *রিপোর্ট*, সারণি ১, পৃ. ৭৫।

যে, সবচেয়ে বড় কারণ ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরিত্র পরিবর্তন। ১৯৬৯ ও ১৯৭১ সালে যা ছিল মূলত ঐতিহ্যগতভাবে শহরাঞ্চলের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্বেগপ্রভাবিত আন্দোলন, সেটাই এক বিরাট গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এ প্রবণতা প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৬৮-৬৯-এর শীত কালের আইয়ুববিরোধী বিদ্রোহের মাধ্যমে। সে সময়

শহরাঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণী রাজপথে ছাত্রদের সাথে যোগ দিয়ে আইয়ুবশাহীবিরোধী গণআন্দোলনে একটি নয়া শ্রেণীসচেতন জঙ্গিপনার সৃষ্টি করে। কিন্তু স্ব-শাসনের দবিকে

সারণি ৮ : পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্রের আঞ্চলিক উৎপত্তিস্থল॥শতকরা কতজন বাঙালি

	বিষয়	সেনাবাহিনী	বিমানবাহিনী	নৌবাহিনী
১.	সামরিক সংস্থাপনা (১৯৬৩)			
	(ক) কমিশন্ড অফিসার	৫	১৭	১
	(খ) জুনিয়ার কমিশন্ড অফিসার	৭.৪		
	(গ) ওয়ারেন্ট অফিসার		১৩.২	
	(ঘ) অন্যান্য র‍্যাঙ্ক	৭.৪	২৮.০	
	(ঙ) শাখা অফিসার			৫
	(চ) চীফ পেটি অফিসার			১০.৪
	(ছ) পেটি অফিসার			১৭.৩
	(জ) লীডিং সীম্যান ও তার নিচে			২৮.৮
২.	আমলাতান্ত্রিক সংস্থাপনা (১৯৬৬)		পূর্ব	পশ্চিম
	কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটে			
	প্রথম শ্রেণীর অফিসার		১৭০	৬৩১
	পশ্চিম-পূর্ব বৈষম্য ($\frac{WP-EP}{EP}$ ×১০০)			২৭১
৩.	ব্যবসায়ী শিল্পপতি (১৯৫৯)		১১% (স্থির পরিসম্পৎ-এর শতকরা হিসাবে। বাঙালি মুসলিম ও বাঙালি হিন্দু মিলিয়ে)	

উৎস : (১ ও ২) জাহান, ১৮৭২

(৩) পাপানেক, ১৯৬৭।

গ্রাম-গ্রামান্তরে নিয়ে যান এবং বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারকে বঞ্চনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ ১৯৬৯-৭১-এর নির্বাচনী অভিযানের মধ্য দিয়ে। এই বঞ্চনার সাথে যুক্ত হয়েছিল বাঙালিদের স্ব-শাসন প্রদানে অস্বীকৃতি, যার ফলে বাঙালি জনসাধারণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের চালিকাশক্তিতে এবং ছয় দফা দাবির চূড়ান্ত জিম্মাদারে পরিণত হয়। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিপুলভাবে ভোট দিয়ে তারা জাতীয়তাবাদের পক্ষে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ব্যক্ত করে এবং পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এখন তাদের ম্যান্ডেট দ্বারা আবদ্ধ।

ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে শেখ মুজিব কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল ছয় দফা ম্যান্ডেটের প্রতি প্রকাশ্য অঙ্গীকার ঘোষণা করা। এই জনগণই ১৯৭১ সালের মার্চে শহর ও গ্রামাঞ্চলে স্ব-শাসনকে টিকিয়ে রেখেছিল এবং ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পরবর্তীকালে নিজেদের জীবন দিয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সশস্ত্র আগ্রাসনের মোকাবেলা করেছিল। এই জনগণই বাংলাদেশকে বিদেশী দখলমুক্ত করার দাবিতে মুক্তিযুদ্ধে লড়েছিল ও প্রাণ দিয়েছিল।

জনগণকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনা না হলে পাকিস্তান রাষ্ট্র বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর ক্ষুধা মিটিয়ে তাদেরকে সম্ভবত মানিয়ে রাখতে সক্ষম হতো। ১৯৬০-এর দশকে এবং বেশিকরে ১৯৬৯-এর মার্চের পরে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির, একটি বাঙালি বুর্জোয়াশ্রেণী গড়ে তোলার, পাবলিক ওয়ার্কস প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রামের ধনী কৃষকদের দিকে সম্পদ প্রবাহিত করার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পদগুলোতে বাঙালি সিভিল সার্ভেন্টদেরকে উন্নীত করার একটি প্রচেষ্টা নেয়া হয়। এ প্রক্রিয়া হয়তো পূর্ণ অংশীদারিত্ব পর্যন্ত পৌঁছাতো না, কিংবা ছয় দফার স্বায়ত্তশাসন দাবি মেনে নেয়া পর্যন্ত এগুতো না, তবে এটা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর জন্য সুযোগের নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারতো। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রণী বাহিনী মধ্যবিত্তকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে স্বশাসনের সংগ্রামকে বানচাল করার এ সম্ভাবনাটি শেখ মুজিবুর রহমানের নজরে পড়েছিল। তিনি যে আন্দোলনকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার ও জনগণকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের রক্ষক ও অভিভাবকে পরিণত করার সচেতন সিদ্ধান্ত নেন তার উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনের মধ্যবিত্ত নেতৃত্বকে বিভক্ত করে আন্দোলন থেকে সরিয়ে নেয়ার ঐ সম্ভাবনাটিকে আগে থেকেই নস্যাৎ করে দেয়া।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হবার পর পাকিস্তান রাষ্ট্র বুঝতে পারে যে, এ নেতৃত্বকে কিনে ফেলা যাবে না। হয় স্ব-শাসনের বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে, যেমন তারা মেনে নিয়েছিল ১৯৭১-এর মার্চে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনাকালে, নতুবা বাঙালি জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বকে ধ্বংস করে দিতে হবে। তারা আন্দোলনের গণভিত্তি বুঝতে পারে নি এবং ১৯৬৯-৭১ সালের একটানা বিক্ষোভ-সমাবেশের ফলে জনগণের সচেতনতা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল তাও উপলব্ধি করতে পারে নি। এটাই মনে হয় তাদের ভ্রান্ত হিসাবের খতিয়ান। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তারা পাকিস্তান রাষ্ট্রকেই ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র যে তার রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের দাবিগুলোকে জায়গা করে দিতে পারে নি তার চূড়ান্ত স্বীকৃতি হলো বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গণহত্যা অভিযান।

নির্ঘণ্ট